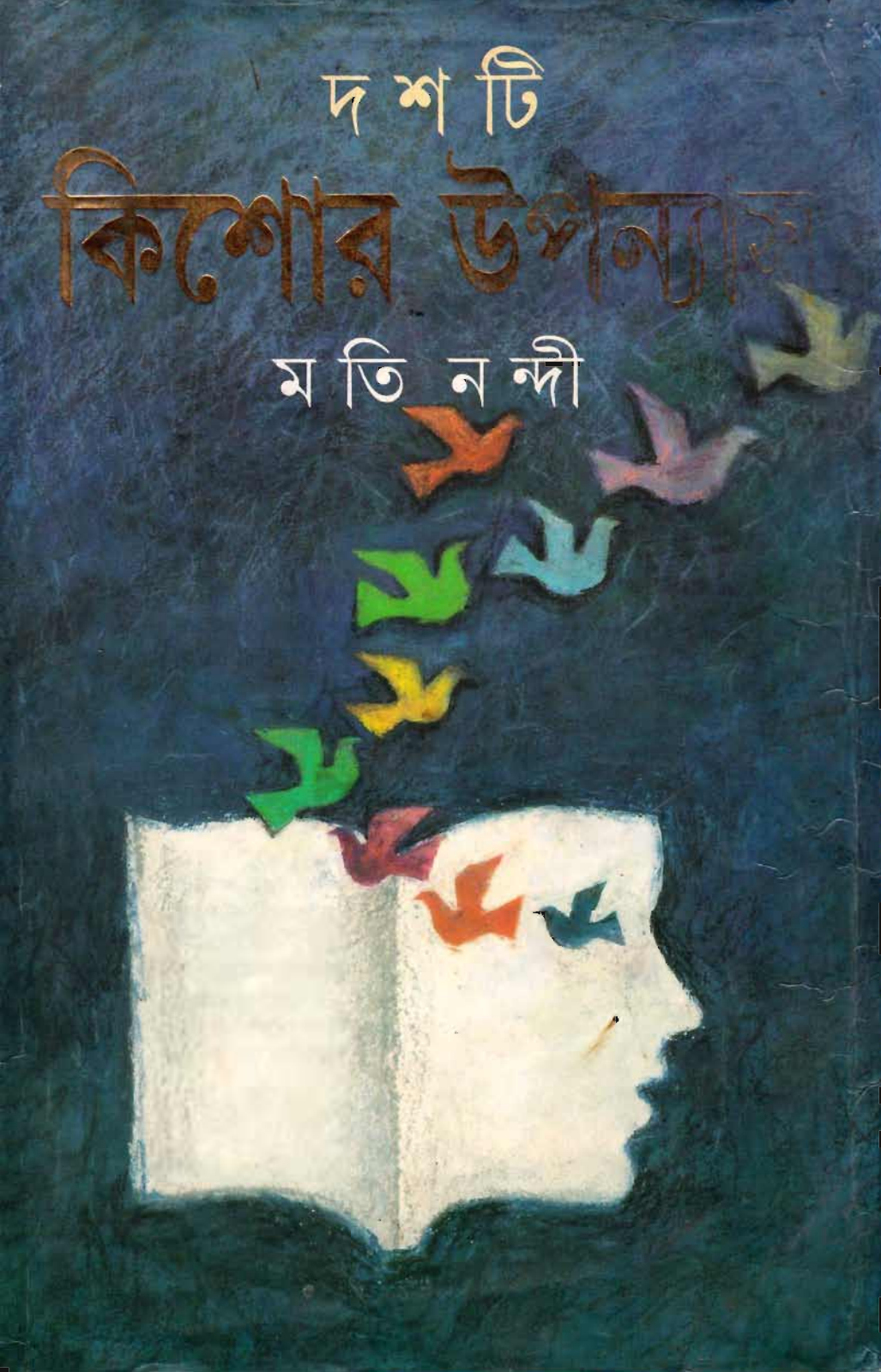
দশটি
কিশোর উপন্যাস

মতি নন্দী




২১ শে বইমেলা
ekushèboimela.com


Boierjagat.com
বইয়ের জগৎ


বইয়ের হাট
BOIERHUT.COM


eবই.in


দুনিয়ার পাঠক এক হও!
আমারবই.কম
amarboi.com


Boierdunia.com
বইয়েরদুনিয়া


BOIERDESH.COM
বইয়ের দেশ

গোয়েন্দা গল্প, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান, অভিযান কিংবা হাসির উপাখ্যানের ধরাবাঁধা পরিমণ্ডলের বাইরে এক নতুন ধরনের কিশোর-কাহিনী লিখে মতি নন্দী ছোটদের মন জয় করে নিয়েছেন। এই নতুন স্বাদের উপন্যাসগুলি তিনি লিখেছেন ক্রীড়া-জগতের আলেখ্যকে উপজীব্য করে। বিষয়সীমার এমন ব্যাপক সম্প্রসারণ তাঁর আগে কেউ ঘটাতে পারেননি। এদিক থেকে মতি নন্দী কিশোরকাহিনী রচয়িতাদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র নাম।

খেলতে খেলতে যারা বড় হয়ে উঠছে, তাদের কাছে এই কাহিনীগুলির জনপ্রিয়তা কেবল খেলাধূলার পরিচিত প্রতিচ্ছবিতে নয়। খেলার সূত্রে যে-লড়াই আর হারজিতের কথা বলা হয়েছে এইসব গল্পে, সেই দিকগুলি কিশোরপাঠকদের অনুপ্রাণিত করে সবচেয়ে বেশি। তারা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে, এ গল্প তাদেরই। তাদেরই পাড়া, খেলার মাঠ, ক্লাব, পাড়ার লোক, আত্মীয়স্বজনের কথা এখানে। এ কাহিনী তাদেরই প্রত্যয় ও সংকল্পের, প্রয়াস ও স্বপ্নের।

ক্রীড়া-জগতের আলো-অন্ধকার, জয়-পরাজয়, প্রস্তুতি-পরীক্ষা, সংযোগ-প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে আলো ফেলে এক অপরাজেয় বহুবর্ণী জীবনের উপাখ্যান চিত্রিত হয়েছে এই দশটি উপন্যাসে: ননীদা নট আউট, স্ট্রাইকার, স্টপার, অপরাজিত আনন্দ, নারান, ফেরারি, দলবদলের আগে, শিবার ফিরে আসা, তুলসী এবং মিনুচিনুর ট্রফি।

.....
ISBN 81-7756-118-9



জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই খেলা আর মাঠের সঙ্গে যে-অন্তরঙ্গতা এবং উত্তর কলকাতার পুরনো পাড়ায় বংশানুক্রমে প্রায় একশো বছরের বসবাসের ফলে পরিবেশের সঙ্গে যে-ঘনিষ্ঠতা, এ-দুইয়েরই জীবন্ত উজ্জ্বল ছাপ মতি নন্দীর সাহিত্য-রচনায়। সাহিত্যে প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া। সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে আয়োজিত উপন্যাস-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পান। প্রথম গল্প—সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৫৭ সালে। পুজো সংখ্যায় প্রথম গল্প 'পরিচয়' পত্রিকায়, ১৯৫৮-য়। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও ক্রিকেটের নিয়মকানুন ও রেকর্ডস নিয়ে বই লিখেছেন।

বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে রচনা। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে কাহিনী। 'সাদা খাম' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন ১৯৯১ সালের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।

.....

প্রচ্ছদ নির্মলেন্দু মণ্ডল

দ শ টি
কিশোর উপন্যাস

মতি নন্দী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রকাশকের নিবেদন

মতি নন্দী সম্ভবত ভারতের একমাত্র সাহিত্যিক, খেলাকে যিনি সফলভাবে এনেছেন সাহিত্যে। তাঁর বিভিন্ন সময়ে খেলার চালচিত্রে লেখা ননীদা নট আউট, স্ট্রাইকার, স্টপার, অপরাজিত আনন্দ, নারান, ফেরারি, দলবদলের আগে, শিবার ফিরে আসা, তুলসী ও মিনু চিনুর ট্রফি এই দশটি উপন্যাস একত্রে আনন্দ পাবলিশার্সের দশটি কিশোর উপন্যাস গ্রন্থমালায় সংকলিত হল।

সূচিপত্র

ননীদা নট আউট ৯
স্ট্রাইকার ৫১
স্টপার ১১৯
অপরাজিত আনন্দ ১৮৯
নারান ২৬৩
ফেরারি ৩৩৭
দলবদলের আগে ৩৯৭
শিবার ফিরে আসা ৪৭৯
তুলসী ৫৬৩
মিনু চিনুর ট্রফি ৬৩৩

গ্রন্থপরিচিতি ৭১৯

ননীদা নট আউট



১

ক্রিকেট সিজনের শুরুতেই সি সি এইচ-এর অর্থাৎ ক্রিকেট ক্লাব অফ হাটখোলার নেট পড়ে মহামেডান মাঠের পাশে, মেম্বার গ্যালারির পিছনে।

চার শরিকের মাঠ। সি সি এইচ দেয় বছরে চারশো টাকা। হেড মালী দুর্যোধন মহাপাত্র। পুজো শেষ হলেই মাঠের মাঝে একখণ্ড জায়গার চারকোণে বাঁশ পুঁতে দড়ি দিয়ে ঘিরে দেয়। জল ঢেলে আর কয়েকদিন রোলার টেনে ডলাই-মলাই করে, দুর্যোধন যখন সগর্বে ঘাসবিহীন পাথুরে পিচের দিকে হাত তুলে বলল, "কী একখানা পিচো বনাইছি দেখ ননীবাবু, লরি চালাই দাও কিছু হবেনি।"

তখন ননীদা গম্ভীর থেকে আরও গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "ক্রিকেট লরি-ড্রাইভারদের খেলা নয়, দুর্যোধন।"

"মো কি সে কথা বলিছি! গত বৎসর আপোনি বলিলেন, কড়া ইস্তিরি-করা শার্টের মতো পেলেন পিচ না হলি ব্যাটোসম্যান স্টোরোক করি খেলিব কেমনে? তাই এবছর ইস্তিরির মতো করি রোলার টানিছি।"

"ক্রিকেট ধোপাদেরও খেলা নয়, দুর্যোধন।"

দুর্যোধন একটু ঘাবড়ে গেল ননীদার আরও ঠাণ্ডা গলার স্বরে। ক্ষুণ্ণ হয়েই সে বলল, "গত বৎসরের আগের বৎসরো বলিলেন, কী পিচ বনাইছিস, এ যে খেতি জমি, ধানো ছড়াই দিলি গাছো হই যিব।"

"ক্রিকেট চাষাদেরও খেলা নয়, দুর্যোধন।"

এবার দুর্যোধন ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত চোখে ননীদার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিরিকেট তবে কারা খেলে?"

"ভদ্রলোকেরা।" ননীদা আকাশবাণী ভবনের গম্বুজ থেকে শহিদ মিনারের ডগায় উদাস চাহনিটাকে সুইপ করে নিয়ে গেলেন। "পিচ হবে স্পোর্টিং, বোলার আর ব্যাটসম্যানকে ফিফটি-ফিফটি সুযোগ দেবে।"

দুর্যোধনের বেঁটে শরীরটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো বেঁকে গেল একটা অদৃশ্য ভারী গদা তুলতে গিয়ে। দাঁত কিড়মিড় করে সে বলল, "তংকা বাড়াও, ইডেন মতো মো পিচো বনাই দিব।"

"তারপর এই মাঠেই গ্যালারি বসিয়ে টেস্টখেলা হোক আর কী।" ননীদা শহিদ মিনারের গা বেয়ে সরসর করে চোখটাকে নামিয়ে এনে হা হা করে ছু. গেলেন— "বাইরে দিয়ে, বাইরে দিয়ে। বাহারসে যাইয়ে।"

লোক দুটো থমকে গেল পিচের কিনারে এসে। পরস্পরের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "কাহে বাহার সে যায়গা?"

"পূজা হোগা। হোম-যজ্ঞকে লিয়ে এই স্থান সাফ কিয়া থা।" ননীদা সসম্ভ্রমে পিচের দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। "ক্রিকেট দেওতা কা পূজা হোগা।" শুনেই ওরা অবনত মস্তকে পিচের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করে, মহমেডান মাঠের বেড়া ঘেঁষে হাইকোর্ট মাঠের দিকে চলে গেল, সম্ভবত চিড়িয়াখানা কি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে।

এতক্ষণ আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ও শুনছিলাম। ননীদা কাছে আসতেই বললাম, "এটা কী হল?"

"ট্যাকটিক্স, কুইক আউট করে দিলুম। যদি বলতে—ইয়ে হ্যায় ক্রিকেট পিচ, ইসকা উপর সে হাঁটা মানা হ্যায়, তা হলে অনেক তর্ক, অনেক ঝামেলা শুরু হত। ব্যাটসম্যানকে সেটল করতে দেবার আগেই ফিরিয়ে দেবে। মনে রেখো মতি, এবছর তুমি সি সি এইচ-এর ক্যাপ্টেন। তোমাকে ট্যাক্টফুল হতে হবে।"

সবিনয়ে ঘাড় নেড়ে বললাম, "নিশ্চয়। তা ছাড়া আপনি তো আছেনই, দরকার পড়লে পরামর্শ নিশ্চয় করব।" খুশি করার জন্য কথাগুলো বলিনি, বিপদে ননীদাকে সত্যিই দরকার হবে। ননীদার ট্যাকটিক্স, যাকে আমরা 'ননীটিক্স' নামে আড়ালে অভিহিত করি, কতবার যে সি সি এইচ-কে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে তা লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবে দু'চারটের কথা অবশ্যই উল্লেখ করব।

ননীদা গত বছর পর্যন্ত আমাদের ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছিলেন । কত বছর ছিলেন সেটা আমার পক্ষে খাতাপত্তর না দেখে বলা শক্ত। সম্ভবত সিকি-শতাব্দী। বারো বছর মাত্র এই ক্লাবে আছি। তার মধ্যে ননীদাকে যে রূপে দেখেছি তা বোঝাতে হলে, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ট্রেজারার, সিলেকটর, স্কোরার, মালী, সাবস্টিটিউট ফিল্ডার, ক্যাপ্টেন প্রভৃতিকে একত্রে একটি লোকের মধ্যে ভরে দিলে যা হয়, উনি তাই। ওঁর মুখের উপর কথা বলতে পারে বা ওঁর কথা অগ্রাহ্য করার সাহস দেখাতে পারে এমন কাউকে এখনও সি সি এইচ-এ দেখিনি। অনেককে গাঁইগুই করতে শুনেছি, কিন্তু আড়ালে। দুর্যোধনের পোষা নেড়িকুত্তাটা পর্যন্ত ননীদার গলার আওয়াজ পেলে লেজটাকে নামিয়ে সরে যায়। ননীদাকে এল বি ডবল্যু আউট দিয়ে এক আম্পায়ারকে দেখেছিলাম খেলা শেষে উইকেট থেকে তাঁবুতে না ফিরে হনহনিয়ে উলটোদিকে বঙ্গবাসী কলেজ-মাঠ পেরিয়ে একটা চলন্ত বাসে লাফ দিয়ে উঠে পড়তে।

ননীদার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ বারো বছর আগে সি সি এইচ-এর এই নেটে।

আমাদের পাড়ার বিশ্বনাথদা চুয়াল্লিশ সালে মোহনবাগানে ক্রিকেট খেলেছেন, সেই বছর রঞ্জি ট্রফিতে বাংলা দলের পনেরোজনের মধ্যেও নাকি ছিলেন। আমরা ওঁকে খুব খাতির করি, বিশেষ করে আমি আর চিতু, অর্থাৎ চিত্তপ্রিয়। আমাদের দুজনের ইচ্ছে বিশ্বনাথদার সুপারিশে মোহনবাগানে ঢোকা, তারপর খেলা দেখিয়ে উন্নতি করা। উন্নতি বলতে টেস্ট খেলা।

বিশ্বনাথদাকে বলতেই তো চোখ পিটপিট করে বললেন, "মোহনবাগানে?"

আমাদের আপাদমস্তক বার চারেক দেখে আবার বললেন, "খেলবি? বলিস কী! তোদের সাহস তো কম নয়!"

চিতুটা টেঁটিয়া ছেলে। ফস করে বলল, "আপনি খেলেছেন, আমরা পারব না কেন?"

"দুখিরামবাবুর ডাইরেক্ট শিষ্য ফকিরবাবুর কাছে আমি তালিম নিয়ে তবেই মোহনবাগানে খেলার কথা চিন্তা করেছি। আর তোরা? এখনও রাস্তায় ক্যাম্বিসবল পেটাস, ঘাস চিনলি না গড়ের মাঠের, ফুলটস আর ইয়র্কারের প্রভেদ জানিস না, অথচ মোহনবাগানে খেলতে চাস! পিচের উপর একটা আধলা রেখে তার উপর বল ফেলতে পারতুম। কেন জানিস? এবেলা চারঘণ্টা ওবেলা চারঘণ্টা, নাগাড়ে আন্ডার দ্য ওয়াচফুল আইজ অফ ফকিরবাবু আমি বল করেছি নেটে। যখন আউট অফ হানড্রেড পঁচানব্বুইটা বল আধলায় ফেললুম তখন ফকিরবাবু বললেন, এবার তোকে রিজার্ভে আনব। এই রকম ব্যাপার ছিল আমাদের সময়। গুরু ছিল, কঠিন সাধনা ছিল। আর এখন?"

চিতু বলল, "আমরাও সাধনা করতে রাজি যদি কেউ দেখিয়ে দেন একটু। আপনি দেবেন?"

"আমি!" বিশ্বনাথদা আকাশ থেকে পড়লেন, "আমি অফিস ফেলে এখন ক্রিকেট শেখাব? বরং তোরা ননীর কাছে যা। আমার গুরুভাই, গুড কোচ, ক্রিকেট নিয়েই দিনরাত পড়ে আছে, ভেরি হার্ড টাস্কমাস্টার। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি তাই নিয়ে দেখা কর। আগে ছোট ক্লাবে খেলে তারপর বড় ক্লাবে খেলতে হয়, বুঝেছিস।"

বিশ্বনাথদার চিঠি নিয়ে আমি আর চিতু এক দুপুরে গড়ের মাঠে ক্রিকেট ক্লাব অফ হাটখোলার তাঁবুতে হাজির হলাম। মাঠে চারটি ক্লাবের চারটি নেট পড়েছে। প্রতি নেটে গড়ে দশজন। চিতু বলল, "কোনটা সি সি এইচ-এর হবে বল তো?"

আমি অত্যন্ত মনোযোগে চারটি নেট লক্ষ করে শেষে বললাম, "ওই ডানদিকেরটা— যেখানে টাকমাথা, ঢলঢলে প্যান্টপরা, বেঁটে কালো লোকটা কথা বলছে, ওই বোধ হয় ননীদা।"

"কী করে বুঝলি?"

"প্যান্টটা দেখ, মনে হচ্ছে নাকি ওটা ফকিরবাবুর আমলের তৈরি? আর কেউ কি অমন প্যান্ট পরে এখানে আছে?"

চিতু সারা মাঠে চোখ বুলিয়ে বলল, "চল তা হলে ওর কাছে।"

"আপনিই কি ননীবাবু?" চিতু কাছে গিয়ে খুব স্মার্টলি লোকটিকে বলল।

ব্যাট হাতে লোকটি তখন চশমাপরা রোগা ফরসা একটি ছেলেকে নেটের বাইরে থেকে বোঝাচ্ছিল কীভাবে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলতে হয়। ছেলেটি তটস্থ হয়ে শুনছে। লোকটি বাধা পেয়ে বিরক্ত চোখে একবার চিতুর দিকে তাকাল মাত্র। ছেলেটিও তাকাল।

"লুক হিয়ার।" লোকটির বাজখাঁই কণ্ঠস্বরে ছেলেটির সঙ্গে আমিও চমকে উঠলাম। চিতু এক-পা পিছিয়ে এল।

"এই হচ্ছে স্টান্স।" লোকটি দেখাতে শুরু করল। "লেফট শোলডার থাকবে এইভাবে, আমার পা লক্ষ করো, শরীরের ওজন সমানভাবে দুপায়ে চারিয়ে দিয়েছি, বোলারের দিকে মুখটা...ভাল কথা, তুমি লেফট-হ্যান্ডার না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" ছেলেটি ঢোঁক গিলে বলল।

"গুড, ভেরি গুড। আমি একটা লেফট-হ্যান্ডারই চাইছি। হ্যাঁ, তা হলে হবে রাইট শোলডার। বোলার বল করতে আসছে...এখন ডেলিভারি স্টাইলে, দ্যাখো ভাল করে দ্যাখো...এইভাবে ব্যাট উঠছে, ব্যাক লিফট কমপ্লিট...তারপর কী করবে?"

"ফরোয়ার্ড খেলব।" ছেলেটি প্রবল উৎসাহে চটপট বলল।

লোকটি সেকেন্ড পনেরো ওর মুখের দিকে ঠায় তাকিয়ে রইল, যেন চাঁদের নুড়ি দেখছে। তারপর ধীরস্বরে বলল, "গবেট।" ছেলেটির ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠল।

"আমি কি বলেছি বলের ডেলিভারি হয়েছে? বল এখন তো বোলারের হাতে! উইকেটের পেস কেমন, বাউন্স কেমন তাই জান না, আর আগে থেকেই বলে দিলে ফরোয়ার্ড খেলব?"

"আপনি ফরোয়ার্ড কীভাবে খেলতে হয় শেখাচ্ছেন তো, তাই বললুম।" ছেলেটি প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল। লোকটি আবার সেকেন্ড পনেরো তাকিয়ে থেকে বলল, "বলটা শর্ট পিচ কি ওভার পিচ, স্টাম্পের মধ্যে না বাইরে, কতটা সুইং বা কতটা স্পিন, এসব না দেখেই ফরোয়ার্ড খেলবে?"

ছেলেটির ভ্যাবাচাকা মুখ দেখে চিতু হাসি সামলাতে পারল না। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের তর্জনীটি চিতুকে লক্ষ্য করে বাঁকিয়ে ঘুড়িতে টুঙ্কি দেবার মতো তিনবার নেড়ে বলল, "কাম হিয়ার।"

চিতু খুব স্মার্ট ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে বিশ্বনাথদার চিঠিটা এগিয়ে ধরল। "আপনিই যে ননীবাবু, তা দেখেই বুঝে গেছি।"

"বটে," লোকটি চিঠিটা পড়তে পড়তে বলল, "বুঝে গেছ?"

"আমি নয়, মতিই আপনাকে চিনেছে ঢোলা প্যান্টটা দেখে।"

ননীদা সেকেন্ড দশেক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কেমন ভয়-ভয় অস্বস্তি শুরু হল আমার, চিতুটার উপর রাগও ধরল। ফোঁপরদালালি করে এত কথা বলার কী দরকার! ননীদা কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করেছেন, চিতু অমনি বলল, "আমার নাম চিত্তপ্রিয়, আই অ্যাম এ লেফট-হ্যান্ডার।"

ননীদার খোলা ঠোঁট দুটি একটা ফাস্ট ইয়র্কারকে সামাল দেবার মতো ঝটিতি বন্ধ হয়ে গেল।

"অ্যান্ড অ্যান ওপেনিং ব্যাট লাইক নরি কন্ট্রাক্টর।" চিতু বুক চিতিয়ে বলল। কন্ট্রাক্টর তখন দারুণ খেলছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আগের বছরই একটা সেঞ্চুরি করেছে টেস্টে।

"তোমার লোয়েস্ট রান কত?"

চিতু একটু থতমত হলেও বেশ দ্রুতই বলল, "ঠিক মনে পড়ছে না, তবে দশের কম নয়।"

"ক'টা জিরো করেছ?"

"একটাও না।"

লক্ষ করলাম ননীদার ঠোঁট দুটো এবার ফুলটস দেখে ব্যাট তোলার মতো খুলতে শুরু করল এবং সপাটে পুল করল—"তার মানে এখনও খেলাই শেখোনি।"

অবধারিত বাউন্ডারি, সুতরাং রানের জন্য দৌড়বার দরকার নেই, এইরকম ভঙ্গিতে ননীদা চিতুর দিকে পিছন ফিরলেন এবং এতক্ষণ অপেক্ষমাণ ছাত্রটিকে উদ্দেশ করে বললেন, "ব্যাট যখন ওপর থেকে নামবে একদম পারপেন্ডিকুলার, স্ট্রেট নামবে। এসো দেখাচ্ছি।"

নেটের মধ্যে ননীদা যখন একটা বল গুড লেংথ বরাবর পিচের উপর রেখে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলার মহড়া দিচ্ছিলেন, তখন চিতুকে বললাম, "এখানে পেঁয়াজি করিসনি, লোকটা কড়া আর খেলাও বোঝে।" চিতু তাচ্ছিল্যভরে কাঁধ ঝাঁকাল।

ননীদা নেট থেকে বেরোলেন। তাঁবুর লোহার ফেন্সিংয়ের ধারে একটা জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছাত্রটিকে বললেন, "ওখানে গিয়ে যেমনটি দেখালুম, ঠিক সেইভাবে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভের শ্যাডো প্র্যাকটিস করো পঞ্চাশবার, যাও।" তারপর চিতুর দিকে ফিরে বললেন, "ইয়েস মিস্টার নরি কন্ট্রাক্টর, প্যাড অন।"

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "তোমার নাম মতি, ফাস্ট বল করো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" এবং নিমেষে লিন্ডওয়ালকে হুক করার জন্য প্রয়োজনীয় ফুটওয়ার্কের দ্রুততায় যোগ করলাম, "মানে চেষ্টা করি।"

"দেখি কেমন চেষ্টা করো। যাও কন্ট্রাক্টরকে বল করো।"

এইবার আমার উভয় সংকট। চিতু আমার বলে সুবিধা করতে পারে না, বিশেষ করে শর্টলেংথগুলো। যদি তেড়ে বল করি তা হলে ননীদার সামনে চিতুর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। হয়তো সি সি এইচ এ ওকে নেবেই না। আবার আমি যদি চিতুর মুখ চেয়ে ঢিলে বল করি, তা হলে আমাকেই হয়তো আউট হতে হবে। মাঝামাঝি পথ নিলাম। যত জোরে পারি উইকেটের বাইরে দিয়ে বল করতে লাগলাম। বলের পেস কেমন ননীদা সেটুকু বুঝলেই হল।

নেটের পিচ খুবই খারাপ। কয়েকটা বল বিশ্রীভাবে লাফিয়ে উঠল, শুট করল। চিতু তাহলে বাঁয়ে গাঁইতির মতো ব্যাট চালাল। যেগুলো ব্যাটে-বলে হল তার বেশির ভাগই ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপ বা উকেটকিপারের (যদিও নেটে কেউ ছিল না) মাথার উপর দিয়ে নেট টপকে গিয়ে মহমেডান মাঠের বেড়ায় ঠকাস ঠকাস শব্দ করল।

আড়চোখে ননীদার দিকে তাকালাম। দেখি, একদৃষ্টে তিনি নভেম্বর আকাশের শোভা নিরীক্ষণ করছেন। নেটের মধ্যে কী হচ্ছে না-হচ্ছে সে সম্পর্কে উদাসীন। ফেন্সিং-এর ধারে ননীদার ছাত্রটি সমানে টিউবওয়েল হ্যান্ডেল টেপার মতো ব্যাট হাতে সামনে ঝুঁকে ওঠানামা করে যাচ্ছিল। পাম্প করা থামিয়ে এখন সে

ফ্যালফেলিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে। ননীদা তাঁর দৃষ্টি আকাশ থেকে আকাশবাণী ভবনের চূড়া এবং তারপর ইডেনের প্রেসবক্স হয়ে মোহনবাগান মাঠের সবুজ গ্যালারির উপর রেখে বাজখাঁই গলায় বললেন, "ক'টা হল?"

বোলিং মার্কে ফিরে যাচ্ছিলাম। থমকে বললাম, "গুনিনি তো!"

ননীদা আর একটু গলা চড়িয়ে বললেন, "পঞ্চাশটা হয়েছে?"

সঙ্গে সঙ্গে ফেন্সিং-এর ধারে দ্রুত টিউবওয়েল পাম্প শুরু হল। ননীদার আঙুলের তিনটি টুক্কিতে চিতু নেট থেকে বেরিয়ে এল।

"উই ডোন্ট প্লে ফর ফান। ক্রিকেট একটা আর্ট, আয়ত্ত করতে সাধনা লাগে। দু'রকমের ক্রিকেটার হয়, একদল ব্যাটকে কোদাল ভাবে, বাকিরা ভাবে সেতার। একদল কুলি, অন্যরা আর্টিস্ট।"

"পিচ যদি কোদাল চালাবার মতো হয় তা হলে ব্যাটকে কোদালই করতে হয়।" প্যাড খুলতে খুলতে চিতু বলল।

ননীদার মুখ থমথমে হয়ে গেল। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "উইকেট-সোজা বল করবে আর লেংথে বল ফেলবে, কথাটা মাথায় ঢুকিয়ে রাখো, লেংথ আর ডিরেকশন। এ দুটোয় কমান্ড আনতে না পারলে বোলার হতে পারবে না। শুধু তখনই এই দুটো জিনিস ভুলবে যখন কুলিরা ব্যাট করবে। সোজা মাথা টিপ করে তখন বল ছাড়বে। তুমি কাল থেকে নেটে আসবে রেগুলার। আর, ওহে কন্ট্রাক্টর, তুমি অন্য ক্লাব দেখতে পারো।"

ননীদা কথা শেষ করেই তাঁবুর দিকে হনহনিয়ে চলে গেলেন। চিতুর জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়াতে। অপমানে চিতুর মুখটা তখনও বেগুনি হয়ে আছে। ওকে বললাম, "চল বরং অন্য ক্লাব দেখি আমরা। ঢের ঢের ক্লাব আছে গড়ের মাঠে।"

চিতু গোঁজ হয়ে রইল। ননীদার ছাত্রটি চুপ করে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। চশমার কাচ রুমালে মুছতে মুছতে বলল, "প্রথম দিন আমায় বলেছিলেন বছর তিনেক দুর্যোধনের সঙ্গে পিচে জল দেওয়ার কাজ করতে। তাতে যদি ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু জ্ঞান হয়।"

"তারপর পাঁচ বছর রোলার টানার কাজ!" চিতু তিক্তস্বরে মন্তব্য করল। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমিও খুব বিরক্তিপূর্ণ ভঙ্গিতে বললাম, "এই রকম একটা পাগলের কাছে আসতে হবে জানলে, কে আর আসত। ভাবা যায়, ব্যাট নিয়ে পঞ্চাশবার করে করে ওঠানামা করা?"

"কাল ব্যাক লিফট শিখেছি, গুনে একশোবার ব্যাট তুলতে হয়েছে আর নামাতে হয়েছে।"

"বলেন কী!" আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। "এরপর ড্রাইভ, হুক, কাট, পুল এসবও কি পঞ্চাশবার একশোবার ওইভাবে করতে হবে?"

শিউরে উঠে ছেলেটি বলল, "না, না, তারও আগে ফিলডিং শিখতে হবে বলেছে। কমপ্লিট ক্রিকেটার তা না হলে হওয়া যায় না। দু'শো থ্রো আর দু'শো ক্যাচ লোফা,

রো-ও-জ।"

"রানিং বিটুইন দ্য উইকেট?" আমি ওকে ভয় পাওয়াবার জন্য বললাম। "প্যাড পরে ব্যাট হাতে একশোবার ছোটাছুটি করতে হবে না?"

চিতু এবার বিরক্ত স্বরে বলল, "বাজে কথা রাখ তো, এভাবে উজবুকেরাই খেলা শেখে।"

এরপর চিতু আমাকে ফেলেই রেড রোড অভিমুখে চলে গেল। পরদিনই সি সি এইচ এর চির প্রতিদ্বন্দ্বী রূপোলি সঙ্ঘের সম্পাদকের সঙ্গে সে দেখা করল। আমি নিজা চোখেলাতেই রয়ে গেলাম। ননীদার ছাত্রটির সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। ওর নাম অঞ্জন কর। বড়লোকের ছেলে। ক্রিকেটের বই অনেক পড়েছে। ব্র্যাডম্যানের 'আর্ট অফ ক্রিকেট' বইটা পড়ে প্রচুর জ্ঞান সংগ্রহ করে ফেলেছে কিন্তু ক্রিকেট কখনও খেলেনি। তাই প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং নিতে এসেছে ননীদার কাছে, বড় খেলোয়াড় হবার মোটেই ইচ্ছে নেই। ভদ্র এবং লাজুক অঞ্জন আমাকে একবার বলেছিল, "খুব ইচ্ছে করে নেভিল কার্ডাসের মতো লেখক হতে। ওর সব বই আমার পড়া হয়ে গেছে।" আমি তখনও কার্ডাসের নাম জানতাম না, তাই বোকার মতো শুধু হেসেছিলাম আর মনে মনে বলেছিলাম, ছেলেটা আমারই বয়সি, কিন্তু পণ্ডিত। ওকে আমার ভাল লাগে এইজন্য যে, অনেক জেনেও চালিয়াত নয়, বাজে তর্ক করে না এবং ক্রিকেটে তার যে কিছুই হবে না, অকপটে তা স্বীকার করে। অঞ্জন এরপর এনজিনিয়ারিং পাশ করে বিলেত যায়। ফিরে এসে এখন দুর্গাপুরে বড় চাকরি করছে। সি সি এইচ-এর সঙ্গে ওর সংযোগ কখনও ছিন্ন হয়নি। ক্রিকেটকে ও সত্যিই ভালবাসে।

২

বারো বছর পর আজ আমার হঠাৎ সি সি এইচ নেটে প্রথম দিনের কথা মনে পড়ল।

নেটের ধারে আমি, ননীদা এবং ভবানী দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস লক্ষ করছি। এখন আমি ক্লাবের সিনিয়ার প্লেয়ার। এ বছরের ক্যাপ্টেন। প্রতিবারের মতো এবারও নতুন কয়েকটি ছেলে এসেছে। আমরা তিনজন সিলেকশন কমিটিরও মেম্বার, অবশ্যই নামকা ওয়াস্তে। কেননা ননীদা যা সিলেক্ট করেন আমরা তাতেই সই করে দিই বিনা প্রশ্নে। দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব, প্লেয়াররা কেউ চাঁদা দেয় না। বছরের বাজেট প্রায় দু'হাজার টাকা। কীভাবে যে টাকা আসে একমাত্র ননীদাই তা জানেন।

ম্যাচ খেলার দিন তিনটি ব্যাটের মুখ দেখা যায়। খেলার শেষে ননীদা ব্যাটগুলি কাঠের বাক্সটায় ভরে তালা এঁটে নিজের কাছে চাবি রাখেন। ব্যাট তিনটি দিয়ে অন্তত আশিটা ম্যাচ খেলা হয়েছে। এ বছর নতুন একজোড়া না কিনলেই নয়। ননীদাকে সেকথা বলতেই উনি ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন, "হবে, হবে। একখানা যা মক্কেল এবার পাকড়েছি। ব্যাট কেন, গ্লাভস, প্যাড, নেট সব হবে।"

ক্লাবের প্যাড চার জোড়া। ব্যাটিং গ্লাভস তিন জোড়া। ব্যবহার করতে করতে ঢলঢলে হয়ে গেছে সেগুলো, আঙুল থেকে খুলে পড়ে। ঘামে এবং ময়লায় এখন এমন দুর্গন্ধ ছড়ায় যে উইকেটকিপাররা পর্যন্ত পিছিয়ে বসে। গৌতম জানিয়েছে, নতুন উইকেটকিপিং গ্লাভস না পেলে সে এবছর ম্যাচে চল্লিশটা বাই দেবেই। প্র্যাকটিসের জন্য একটা ব্যাট ঠিক করা আছে। কেউ বলে সেটা কাঁটাল কাঠের কেউ বলে শালের। কেউ সঠিক বলতে পারে না, যেহেতু প্রায় পুরো ব্লেডটাই কালো সুতোর ব্যান্ডেজ ঢাকা। যেটুকু দেখা যায়, সেটার রং দু'শো বছরের পুরনো কাগজের মতো। ওজন ছ-সাত পাউন্ড, হ্যান্ডেলটা মচমচ করে। গোটা চারেক বল নেট প্র্যাকটিসের জন্য বরাদ্দ থাকে।

সি সি এইচ সাধারণত একটি বলে দু-তিনটি ম্যাচ খেলে। আমি একবার আপত্তি তুলে বলেছিলাম, "ননীদা, বলের ব্যাপারে অন্তত খরচ কমাবার চেষ্টা করবেন না। নতুন বল না হলে সুইং করানো যায় না। তা ছাড়া পুরনো বল নিয়ে খেলতে নামছি এতে কি ক্লাবের প্রেসটিজ থাকে?"

ননীদা পনেরো সেকেন্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর বলেছিলেন, "আইনে কি বলা আছে, নতুন বল নিয়ে খেলতে হবেই, নয়তো খেলতে দেওয়া হবে না?"

"তা লেখা নেই।" মাথা চুলকে বললাম।

"বল সুইং করলেই ম্যাচ জেতা যাবে?"

"না, তা কেন, কিন্তু সম্ভাবনা তো—"

"জেতার জন্যই খেলা। পুরনো কি নতুন যে বলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে সেই বলেই খেলবে।"

এরপর আর কথা চলে না। ম্যাচে খেলা বলগুলি ননীদা কাঠের বাক্সটায় রেখে দেন। প্র্যাকটিসের বল নরম হয়ে তুবড়ে ফুলে উঠলে বা সেলাই ছিঁড়ে গেলে বাক্স থেকে বার করে বদলি করে দেন।

সাতটি ছেলে নেটে রয়েছে। ননীদা ঘড়ি ধরে এক-একজনকে ব্যাট করাচ্ছেন। অধিকাংশই সেকেন্ড ডিভিশনের তুলনায়ও কাঁচা। বিরক্তিতে ননীদার মুখ কুঁচকে রয়েছে। এক-একজনের দিকে মিনিটখানেক তাকান আর আকাশে চোখ তুলে বিড়বিড় করেন, "যত্তসব এসে জোটে আমারই ঘাড়ে।" তারপর চেঁচিয়ে ওঠেন, "নেক্সটম্যান।"

ভবানী এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছিল, "একটাও পাশ করবে না, দেখে নিস, আজ নিয়ে আঠারোটা ছেলের ট্রায়াল হল। সোবার্স-কানহাই না পেলে বুড়োর মন উঠবে না। আরে বাবা এটা কি টেস্ট টিমের ট্রায়াল? থাকব তো আমরা লিগটেবলের তলার দিকে, অত বাছাবাছি করে নেবার দরকার কী! য়্যা, ক্লাবে চিরকাল থাকতে তো আর আসছে না, আমাদের মতো। ডানা গজালেই ফুড়ুক করে উড়ে পালাবে। আমার মতে ভাল প্লেয়ার নেয়াই উচিত নয়। তুই কী বলিস?"

ভবানীকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। কিছু বললেই সেটা ননীদার কানে তুলে দেবে।

তাই চুপ করে রইলাম। তাতে ওর কথা বলায় কোনও অসুবিধা হল না। "এই ছেলেটাকে দ্যাখ। স্টাইলটা ভালই মনে হচ্ছে।" ভবানী খুব মন দিয়ে, নেটে ব্যাট করছে যে ছেলেটি তার দিকে নয়, ননীদাকে লক্ষ করতে লাগল। ননীদা বেশ আগ্রহ ভরেই ছেলেটিকে দেখছেন। দু-একবার মাথা নেড়ে যেন তারিফ করলেন। ভবানী সঙ্গে সঙ্গে "লাভ্‌লি" বলে চেঁচিয়ে উঠল। ননীদা ভ্রূ কোঁচকালেন, ভবানী "ওহ্, নো নো" বলে উঠল সখেদে। ভবানীর খুব শখ, অন্তত একবার সি সি এইচ-এর ক্যাপ্টেন হওয়ার। কিন্তু ননীদা বাদ সেধেছেন। দু-দুবার তিনি ভবানীর দাবি নাকচ করেছেন এই বলে, "টিমটাকে কি ডোবাতে চাও! ক্যাপ্টেনসি মানেই ট্যাকটিক্স অর্থাৎ বুদ্ধির খেল দেখাতে হবে। ওর বুদ্ধির ভাঁড়ে তো মা ভবানী।"

ভবানী কিন্তু হাল ছাড়েনি। সমানে ননীদাকে খুশি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভবানী তার অফিসে নিজেকে ক্লাবের ক্যাপ্টেন রূপে পরিচিতি দিয়েছে। তা ছাড়া যে মেয়েটিকে সে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে, সে ভবানীর অফিসেই চাকরি করে। বিবাহে মেয়েটি এখনও গড়িমসি করছে। তার মতে ভবানীর নাকি যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব নেই। তাই মাঠের মাঝে কর্তৃত্ব ও দাপট, মেয়েটিকে দেখাবার ইচ্ছা তার খুবই। আমাকে অনুরোধ করেছে চুপিচুপি, "দু-একটা ম্যাচে তুই বোস না, তা হলে আমি ক্যাপ্টেনসির চান্স পাই সিনিয়ারমোস্ট প্লেয়ার হিসেবে। প্লিজ মতি, আমার অনুরোধটা রাখ। নয়তো আমার বিয়ে করা হয়ে উঠবে না। মিনুকে যে ভাবেই হোক ইমপ্রেস করাতেই হবে।"

আমি ওকে কোনও কথা দিইনি। তাইতে ও মনে মনে চটে আছে আমার উপর, আমিও সাবধানে আছি ওর সম্পর্কে। কখন বিপদে ফেলে দেবে, কে জানে। ভবানীর একমাত্র গুণ—অনেকক্ষণ উইকেটে থাকতে পারে রান না করে। এজন্য টিমে ওকে অবশ্যই রাখতে হয়। ভবানীকে চটাবার ইচ্ছে আমার একদমই নেই, যেহেতু এবছর আমি ক্যাপ্টেন। জানি, ওর শরণাপন্ন হতেই হবে কোনও না কোনও সময়। ঠিক করেই রেখেছি, একটা সহজ ম্যাচের আগে আঙুলে চোট লাগার অজুহাত দিয়ে বসে যাব।

"হল না, হল না", বলতে বলতে ননীদা নেটের মধ্যে ঢুকে ছেলেটির হাত থেকে ব্যাটটা ছিনিয়ে নিলেন। "বলের লাইন হচ্ছে এই, আর তোমার বাঁ পা থাকছে ওখানে...লাইনে পা আনো, বাঁ কাঁধটা এইভাবে।" ননীদা কাল্পনিক বলের লাইনে পা রেখে ব্যাট চালালেন এবং একস্ট্রা কভারে কাল্পনিক বলটির বাউন্ডারি লাইন পার না হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন। "এইভাবে ড্রাইভ আর ফলো-থ্রু হবে, মাথা আর কাঁধ আসবে বলের পিচের উপর।"

ব্যাটটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে, ননীদা আমার পাশে এলেন। "বুঝলে, স্ট্রেট ব্যাট আর ডিফেন্স হল ব্যাটসম্যানশিপের নাইনটি পারসেন্ট। অথচ আজকালকার ছোকরারা এ দুটো রপ্ত না করেই ব্যাট চালায় সোবার্সের মতো।"

নেটের মধ্যে থেকে ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে ননীদার দিকে তাকাল একবার। কাঁধটা ঝাঁকিয়ে স্টান্স নিল।

বল করছে তিনটি ছেলে। তার মধ্যে একটি মাঝে মাঝে গুগলি ছাড়ছে। ননীদা বিড়বিড় করল, "লেংথে বল ফেলা শিখল না, বাবু এখনি গুগলি দিচ্ছে। কিসসু হবে না।" ওর প্রথম বল লেগ স্টাম্পের বাইরে পড়ে অফ ব্রেক করে বেরিয়ে গেল। ব্যাটসম্যান ছেড়ে দিল। ননীদা বলে উঠলেন, "ভেরি গুড।" ভবানী সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "কারেক্ট!"

এর পরের ছেলেটির কাছ থেকে এল সোজা একটি হাফ ভলি। ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলে আস্তে বোলারের কাছে বলটা ঠেলে দিল। ননীদা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "এটা লং অন বাউন্ডারিতে পাঠানোর কথা।" ভবানী চিৎকার করে উঠল, "ড্রাইভ, ড্রাইভ, হিট হার্ড মাই বয়।"

ছেলেটি বিরক্ত চোখে আমাদের দিকে তাকাল। পিচে বোধহয় ইটের কুচি আছে, তৃতীয় বলটি হঠাৎ ফণা তোলার মতো সোজা খাড়া হয়ে ছেলেটির কানের পাশ দিয়ে নেট ডিঙিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য ওর মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হল।

"হুক করার বল ছিল।"

"হুক হুক। সপাটে। ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড।"

পরের বলটি পিচে পড়ার আগেই ছেলেটি লাফিয়ে দু-গজ বেরিয়ে বলটিকে সোজা সত্তর গজ দূরে কাস্টমস টেন্টের উপর ফেলে দিল। ননীদা উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "দ্যাখো, বলের লাইন থেকে পা কত দূরে ছিল।"

"তার আগে দেখুন বলটা কত দূরে গেল।" ছেলেটি কাস্টমস টেন্টের দিকে ব্যাটের ডগা তুলে বলল। "এতে ছ'টা রান পাওয়া যাবে। আর রানের জন্যই ব্যাট করা, তাই না?"

ননীদার মুখ থমথমে হয়ে গেল। ভবানী অসহায় ভাবে আমার আর ননীদার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ "দুর্যোধন, দুর্যোধন" বলে ডাকতে ডাকতে ননীদা টেন্টের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

ভবানী বলল, "ঠিক জবাব দিয়েছে, কী বলিস?"

এড়িয়ে গিয়ে বললাম, "আগের থেকে ননীদার সহ্যশক্তি অনেক বেড়ে গেছে।" তারপর চেঁচিয়ে ছেলেটিকে বললাম, "তোমার নাম কী ভাই?"

"তন্ময় বোস।" এই বলেই তন্ময় লেগব্রেক করা বলটাকে অফ স্টাম্পের উপর থেকেই লেটকাট করল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি ননীদাকে দেখার জন্য তাঁবুর দিকে তাকালাম। ফেন্সিংয়ের গেটের কাছে ননীদা কথা বলছেন দুর্যোধনের সঙ্গে, কিন্তু তাকিয়ে আছেন নেটের দিকে। দেখলাম বিরক্তি ভরে মাথাটা নাড়ছেন। আমি জানি মনে মনে এখন উনি কী বলছেন। বারো বছর আগে আমায় বলেছিলেন, "ফ্যান্সি শট, এ সব হচ্ছে ফ্যান্সি শট। সিজন শুরু হবার একমাসের মধ্যে খবরদার লেটকাট করবে না।"

"ন্যাচারাল ক্রিকেটার। ছেলেটার হবে মনে হচ্ছে।" ভবানী বিজ্ঞের মতো বলল। "অবশ্য যদি গেঁজে না যায়।"

"কিন্তু এখনই লেটকাট করল! এ সম্পর্কে ননীদা কী বলেন, তোর মনে আছে

কি?" ভবানীকে উশকাবার জন্য বললাম।

"নিশ্চয় মনে আছে।" ভবানী ভারিক্কি চালে নেটের কাছে গিয়ে বলল, "দ্যাখো তন্ময়, লেটস্ কাট ফাট জানুয়ারি মাসের আগে আমাদের ক্লাবে মারা বারণ।"

তন্ময়ের মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটে উঠল। মনে হল, হাসবে না রাগবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। ভবানী ভারী গলায় এবার বলল, "উই ডোন্ট প্লে ফর ফান।"

"তা হলে কী জন্য খেলেন?" তন্ময় আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

ভবানী ভাবাচাকা খেয়ে আমার দিকে তাকাল। ও আশা করেনি এই রকম একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন কোনওদিন হতে হবে। আমি কিঞ্চিৎ খুশি হয়েই মুখে বিব্রত ভাব ফোটালাম। ভবানী জবাবের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম,"ননীদা বলেন, আমরা খেলি জেতার জন্য।"

"নিশ্চয়, আমিও সেই জন্য দেখতে চাই।" তন্ময় নেট থেকে বেরিয়ে প্যাড খুলতে খুলতে বলল। "কিন্তু মজাটাকে বাদ দিয়ে নয়। মজা না পেলে খেলা আর খেলা থাকে না, খাটুনি হয়ে যায়। আমি তো মজা পাব বলেই ক্রিকেট খেলতে এসেছি। পা কিংবা কাঁধ বলের লাইনে এল কি না, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বলটা ব্যাটের ঠিক মাঝখানে লাগার সুখটা পেতে চাই।"

ভবানী বলল, "সুখ চায় যারা স্বার্থপর। কিন্তু ক্রিকেট টিমগেম। দলের কথা ভেবে খেলতে হয়।"

তন্ময় বলল, "স্বার্থপর কিছু প্লেয়ার আছে বলেই লোকে খেলা দেখতে আসে। যারা পিটিয়ে খেলে, তাদের খেলাই কি দেখতে ইচ্ছে করে না?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভবানী "ননীদা বোধহয় ডাকছেন" এই বলে হঠাৎ তাঁবুর দিকে চলে গেল। আমি জানি, তন্ময়ের কথাগুলি ননীদার কানে তুলে দেবার জন্যই ও গেল।

তন্ময়ের নিকষ কালো রং। ছিপছিপে লম্বা বেতের মতো শরীর, বাড়তি মেদ ও মাংস কোথাও নেই। মাথার চুল হাল আমলের বিবাগীদের মতো ঝাঁকড়া হয়ে ঝুলে পড়েছে ঘাড় পর্যন্ত, জুলপিটাও ইঞ্চি চারেক। ওর বুটটা পুরনো আর তালি-মারা। জামা, প্যান্ট ময়লা। চোখের চাহনিতে ঔদ্ধত্য ও চ্যালেঞ্জ ঝকঝক করছে। ক্যাপ্টেন হিসেবে কেমন একটু আশ্বস্ত বোধ করলাম। এইসব ছেলেরাই হারা ম্যাচ হঠাৎ জিতিয়ে দিতে পারে।

নিজের নাম বলে ওকে জানালাম, এ বছর আমি সি সি এইচ-এর ক্যাপ্টেন। তারপর বললাম, ননীদা বা ভবানীর মনোভাবের সঙ্গে আমার ক্রিকেট ধারণার একদমই মিল নেই। ওঁরা গোঁড়াপন্থী, খেলাটাকে জীবন-মরণ সমস্যা বলে ধরে নেন। কিন্তু খেলাকে আমি ধরি নিজেকে প্রকাশ করার একটা উপায় হিসেবে।

আমার কথা তন্ময় ঠিকমতো বুঝল কি না জানি না, তবে হাসল। "আমাকে কি এরা খেলাবে?"

"খেলানো তো উচিত। ব্যাটসম্যান দু-তিনজনের বেশি নেই।"

"এরা পয়সাকড়ি কিছু দেবে কি?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তুমি কি ফুটবল পেয়েছ? কলকাতায় ক্রিকেট প্লেয়ার ক'জন টাকা পায়, তাও সেকেন্ড ডিভিশন ক্লাবে!"

"আমাকে বুট কিনতে হবে, জামা-প্যান্টও করাতে হবে।"

আমি চুপ করে রইলাম। টেনেটুনে একজোড়া বুটের দাম হয়তো সি সি এইচ দিতে পারবে, কিন্তু তার আগে তন্ময়কে প্রমাণ করতে হবে—সে অপরিহার্য।

"আচ্ছা ওই টাকমাথা, বেঁটে কালো লোকটা এই ক্লাবের কে?"

"ক্রমশ টের পাবে ননীদা এই ক্লাবের কে এবং কতখানি!"

তন্ময় পকেট থেকে একটা দোমড়ানো সিগারেট বার করে আমায় বলল, "দেশলাই আছে দাদা?"

৩

প্রতি বছর মরশুম শুরুর আগে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে একটা ম্যাচ খেলা হয়। সভাপতির একাদশ বনাম ননীদার একাদশ। ম্যাচ না বলে ফিস্ট বলাই ভাল। লাঞ্চের নামে হয় ভূরিভোজ। তারপর আর কারুর খেলায় উৎসাহ থাকে না, অবস্থাও থাকে না। মিষ্টি নরম রোদে ঘাসের উপর বেশির ভাগই গড়িয়ে পড়ে। রিজার্ভে যে ছেলেরা থাকে তারাই তখন খেলে।

ননীদা খেলাটাকে প্রীতি-সম্মেলন হিসাবে দেখেন পঞ্চাশ ভাগ। পৃষ্ঠপোষকদের তোয়াজ করার জন্য পঁচিশ ভাগ রেখে, বাকি অংশটুকু নবাগতদের ট্রায়াল হিসেবে গণ্য করেন। সভাপতি হন তাঁর নিজের টিমের ক্যাপ্টেন, আর একদিকের ননীদা। ক্লাবের যাবতীয় কর্মকর্তা ও তাদের বাচ্চা ছেলেরা থাকে সভাপতির দলে আর জনা দশেক অতিরিক্ত নিয়মিত প্লেয়ার ও একজন উইকেটকিপার। খেলা শুরুর আধঘণ্টার মধ্যেই একে একে অতিরিক্তদের মাঠে ডাক পড়ে। ননীদার দলে থাকে নবাগত ছেলেরা ও ননীদার সমসাময়িক ও তদূর্ধ্ব বয়সি বিগত দিনের কয়েকজন প্লেয়ার।

যদিও দুটি দলের নামে 'একাদশ' শব্দটি আছে, আসলে সেটা অষ্টাদশ কি ত্রয়োবিংশও হতে পারে। নির্ভর করে মাঠে খেলার আগে ক'জন হাজির হয়েছে। সদ্যস্যরা গেস্টও আনতে পারে, সেজন্য মাথাপিছু পাঁচ টাকা দিতে হয়। ভবানীর গেস্ট এবার মিনতি ওরফে মিনু; অফিসের দারোয়ান-ইন-চার্জ কাম রিসেপশনিস্ট গুঁপো রঞ্জনবাবু আমার গেস্ট। অফিসে যত লোক দেখা করতে আসে রঞ্জন সেনগুপ্ত তার শতকরা পাঁচজনকে ভিতরে যেতে দেয়। আশা করছি এরপর আমার সঙ্গে যারা দেখা করতে আসবে তারা ওই শতকরা পাঁচজনের অন্তর্ভুক্ত হবে। টপ কর্মকর্তারা, যারা বাৎসরিক মোটা দক্ষিণা দেয়, তাদের গেস্টদের জন্য চাঁদা নেওয়া হয় না। তাদের সঙ্গে আসে স্ত্রী-পুত্রকন্যারা।

ক্লাব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও ননীদার হাতে। অর্থবান, যশোলোভী, ঈষৎ বোকা ধরনের, তোষামোদপ্রিয় লোক খুঁজে বার করে, তাকে নানানভাবে জপিয়ে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে (ননীদা বলেন, 'ট্যাকটিক্স প্রয়োগ করে') মোটা টাকা আদায় করার দায়িত্ব

ননীদাই এতকাল বহন করে আসছেন। এই টাকার উপরই ক্লাবের জীবন-মরণের অর্ধেক নির্ভর করে।

আগের প্রেসিডেন্ট ছিল কাউন্সিলার দুলাল দাঁ। ইলেকশনে হেরে গিয়ে ডোনেশন ছাঁটাই করে, ১/৬-এ নামিয়ে এনেছে। ননীদা প্রতিশ্রুত ছিলেন ইলেকশনে সি সি এইচ খাটবে। কিন্তু কাজের সময় লুচি-আলুর দমের বাক্স সংগ্রহ ছাড়া ছেলেরা আর কিছুই করেনি। এবার ননীদা নাকি শাঁসালো একজনকে পাকড়িয়েছেন। চাঁদমোহন শ্রীমানী টেস্ট ম্যাচের পাঁচটি টিকিট চেয়েছে, বিনিময়ে দেড় হাজার টাকা দেবে। ননীদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সি এ বি-তে তাকে কোনও একটা কমিটিতে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। শ্রীমানী, বলাই বাহুল্য, এ বছর আমাদের প্রেসিডেন্ট। গুড়, ঘি ও চালের আড়তদার, গোটা পাঁচেক রেশন দোকানের সে মালিক।

শ্রীমানীকে প্রথম দেখলাম এই খেলার দিন। গৃহিণী ও দুই ছেলেকে নিয়ে ওর মোটর পৌঁছতেই ননীদা ছুটে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিলেন। গাড়ি থেকে প্রথমে যখন শ্রীমানীর পা বেরোল, কে যেন পিছন থেকে আস্তে বলল, "এ যে হাথি মেরা সাথি।" পিছন ফিরে দেখলাম, তন্ময় আর গুটি চারেক নতুন ছেলে ফিক ফিক হাসছে। শ্রীমানী নামার পর হাঁফ ছেড়ে গাড়ির স্প্রিং এক ইঞ্চি উঁচু হয়ে গেল । শ্রীমানী-গিন্নি নামার পর আর এক ইঞ্চি উঠল। দুই ছেলে নামতে ৩/৪ ইঞ্চি আরও উপরে উঠল। গাড়িতে রয়েছে পাঁচ বাক্স সন্দেশ, পাঁচ হাঁড়ি দই, এক ঝুড়ি কমলালেবু। সেগুলো নামানো হল না। ননীদা বললেন, "গাড়িতে চাবির মধ্যে থাকুক। লাঞ্চের সময় বার করব। এখন টেন্টে নিয়ে গিয়ে রাখলে কিছু বাকি থাকবে না।"

"কেন, ক্লাবে বুঝি চোর-ফোর খুব আছে!" শ্রীমানী বলল। মনে হল বাঘ ডাকছে।

ননীদা কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "ছেলেপুলেরা একটু দুষ্টু হয়ই, বোঝেনই তো, হেঁ হেঁ হেঁ, চুরি করে খেতেই ওদের ভাল লাগে। কিন্তু চোর ওরা নয়।"

"নয় যে, বুঝলেন কী করে? ক্রিকেটাররা বুঝলেন, রিলেতে শুনেছি, খেলতে খেলতে মাঠের মধ্যেই চুরি করে। পুষ্পেন সরকারকে পরিষ্কার বলতে শুনেছি— অম্বর রায় একটা রান চুরি করল এই ফাঁকে। বুঝুন, মাত্র একটা রান, কতই বা তার দাম। কিন্তু লোভ সামলাতে পারল না।" শ্রীমানী-গিন্নি ক্ষুব্ধস্বরে বলল।

শ্রীমানী-পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে টেন্টের দিকে এগোতে লাগলাম। ননীদা আমায় চোখ টিপলেন। মুখে গদগদ ভাব এনে শ্রীমানীকে বললাম, "আপনি যে ক্রিকেট খেলতেন তা আপনার হাঁটা দেখেই বোঝা যায়।"

"এখন একটু মোটা হয়ে গেছি," শ্রীমানীর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "একসময় দারুণ খেলতাম। খালি ছক্কা মারতাম। বল মাটিতে পড়ার আগেই পাঁচ হাত বেরিয়ে হাঁকড়াতাম। তখন অনেক রোগা ছিলুম। আমায় নামতে দেখলেই ফিল্ডাররা আপনা থেকেই বাউন্ডারির ধারে সরে যেত।"

"আজ তা হলে আপনার ছক্কা দেখা যাবে।" বলতে যাচ্ছিলুম 'দেখার সৌভাগ্য হবে', কিন্তু তন্ময়দের দলটা কাছেই থাকায় বলতে পারলাম না।

"ভাল বোলার আছে কি? ফাস্ট বোলার?" ব্যাঘ্রকণ্ঠে শ্রীমানী বলল। "ফাস্ট বল না হলে আমি ঠিক ভাল খেলতে পারি না।"

ননীদার দিকে তাকালাম সঠিক ট্যাকটিক্সের জন্য। ননীদা ইশারায় আমাকে চুপ করতে বলে, খুব বিষণ্ণ গলায় বললেন, "ফাস্ট বোলার! নাহ্ আমাদের ক্লাবে নেই। কোথাও নেই, না বেঙ্গলে না ইন্ডিয়াতে। তাই তো ভাল ব্যাটসম্যানও পাওয়া যাচ্ছে না। আপনাদের আমলে বাঘা বাঘা বোলার ছিল তাই আপনারাও বাঘের মতো ব্যাট করেছেন।"

"ঠিক ঠিক। এখন বোলাররা ইঁদুর, তাই ব্যাটসম্যানরা ইঁদুর হয়ে গেছে।" শ্রীমানী গর্জন করে উঠল।

"আপনারা যদি একটু ইন্টারেস্ট নেন তা হলে আবার নিশ্চয় ফাস্ট বোলার পাব। মাঝে মাঝে আপনি যদি আমাদের ম্যাচগুলোয় নামেন তা হলে আপনার হাঁকড়ানোর ঠেলা খেয়ে বোলাররা জোরে বল করার জন্য ইন্সপায়ারড হবে।"

"বুঝলেন ননীবাবু, আমার খুবই খেলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ব্যবসায় এত টাইম দিতে হয় যে—" ইঞ্জিনের স্টিম ছাড়ার মতো শ্রীমানীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

সব থেকে মজবুত লোহার চেয়ারটা দেখিয়ে ননীদা ওকে বললেন, "আপনি বিশ্রাম করুন।" আর লোহার চেয়ার ছিল না। দৌড়ে টেন্ট থেকে আর একটি শ্রীমানী-গিন্নির জন্য আনলাম। দুটো আঙুল দিয়ে চেয়ারটার বসার জায়গা টিপে পরীক্ষা করে তিনি বসলেন।

সারসের মতো গলা ও ঠ্যাং নিয়ে ভাইস-প্রেসিডেন্ট অ্যাটর্নি মাখন দত্ত সস্ত্রীক হাজির হলেন। বছরে ইনি ত্রিশ কিলো আলু, দশ কিলো মাংস, পঞ্চাশ পাউন্ড পাউরুটি ও পাঁচ কিলো সরষের তেল দেবেন। ওঁর জন্য বরাদ্দ দুটি টেস্টম্যাচ টিকেট। দত্ত-গিন্নিকে বসালাম শ্রীমানী গিন্নির পাশে। মাখন দত্ত, শোনা যায় কলেজ টিমে দু-চারবার খেলেছে।

কতকগুলো গোপন নিয়ম এই ম্যাচের জন্য স্থির করা আছে। খেলার দুই আম্পায়ার, স্কোরার এবং আমার মতো পুরনো দু-একজনই তা জানে। নিয়মগুলি ননীদার তৈরি। খেলার প্রথম একঘণ্টা আমি স্কোরার। শাঁসালো কেউ শূন্য রানে কোনওক্রমেই যাতে আউট না হয়, সেটা দেখবে আম্পায়ার। স্কোরারের কাজ দশকে পনেরো এবং পনেরোকে কুড়ি করা। বাই রান খুব সাহায্য করে টোটালকে তিরিশ-চল্লিশ রান বাড়াতে।

ভবানী আজ খুবই ব্যস্ত। শ্রীমানী একাদশের বিপর্যয় রোধ করার দায়িত্ব আজ তার ঘাড়ে। মিনুকে সে দত্ত-গিন্নির পাশে বসিয়েছে। শ্রীমানী নিজে ব্যাটিং অর্ডার করেছে। ভবানীকে রেখেছে দ্বাদশ স্থানে। তাই নিয়ে ভবানী খুবই অসন্তুষ্ট। অত দেরি করে নেমে কী খেলা সে মিনুকে দেখাবে? একটা লেমনেড মিনুর হাতে দিয়ে সে হাত নেড়ে কী সব বলছে। কানে এল ওর গলা, "ভাল রিলায়েবল্ ব্যাটসম্যানরাই শেষদিকে থাকে। যখন গোড়ার দিকে ফেল করে তখন তারা আটকায়। যেমন সোবার্স এখন ছয়-সাতে নামছে।"

মিনু বলল, "শুনেছি ব্র্যাডম্যান তিন নম্বরে নামত।"

"নামবে না কেন, ওদের তো এগারো নম্বরও সেঞ্চুরি করতে পারে। আমাদের টিমে সেরকম কেউ তো আর নেই। তাই আমাকে—"

শ্রীমানী-গিন্নি কটমট করে তাকিয়ে আছে দেখে ভবানী থমকে পড়ল।

"তোমাদের টিমের ক্যাপ্টেনটা ঠিক রোড রোলারের মতো। দৌড়বে কী করে, রান আউট হয়ে যাবে যে!" মিনু হাসতে হাসতে ঠোঁটে স্ট্র চেপে ধরল।

শ্রীমানী-গিন্নির দিকে তাকিয়ে ভবানী বলল, "আমি চট করে রান্নার দিকটা একবার দেখে আসি। তুমি বরং এখানে থাকো।" বলতে বলতে ভবানী টেন্টের পিছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শ্রীমানী-গিন্নি একটু চেঁচিয়েই দত্ত-গিন্নিকে বলল, "ক্রিকেট মাঠে আজকাল, বুঝলেন দিদি, বড় আজেবাজেরা খেলা দেখতে আসে। এমন সব মন্তব্য তারা করে যে খেলা দেখাই দায় হয়ে ওঠে। চলুন আমরা বরং ওধারটায় বসি।"

"সেই ভাল।" দত্ত-গিন্নি উঠে দাঁড়ালেন।

ওরা এসে স্কোরারের টেবলের পিছনে একটা বেঞ্চে বসল।

ননীদা টসে জিতে সভাপতির দলকে ব্যাট করতে দিলেন। লাঞ্চের পর খেলার ইচ্ছা ওদের থাকে না বলেই, সভাপতির দলকেই প্রথমে ব্যাট করতে দেওয়া হয়। প্রথমে ব্যাট করতে নামল মাখন দত্ত আর পল্টু চৌধুরী। নামার আগে শ্রীমানী দুজনকে জানিয়ে দিল, "তাড়াহুড়ো করবেন না। দেখে দেখে খেলবেন, বলের পালিশ উঠলে তবেই সামান্য হাত খুলবেন। তারপর আমি তো আছিই।"

নতুন একটি ছেলেকে ননীদা বল করতে দিয়েছেন। প্রবল উৎসাহের জন্যই ওর প্রথম বলটি ফুলটস হয়ে গেল। মাখন দত্ত ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে যাবার সময় ব্যাটটিকে হাতপাখার মতো সামনে একবার নেড়ে দিল। ব্যাটে লেগে বলটি শ্লিপে দাঁড়ানো তন্ময়ের পাশ দিয়ে তিরবেগে থার্ডম্যান বাউন্ডারিতে পৌঁছল। হই হই করে উঠল দর্শকরা। ব্যাঘ্র গর্জন উঠল, "তাড়াহুড়ো নয়, বি স্টেডি।"

দত্ত-গিন্নি পুলকে লাল হয়ে শ্রীমানী-গিন্নিকে বলল, "বিয়ে হওয়ার পর এই প্রথম ব্যাট ধরলেন।"

"তাই নাকি, ওম্মা! দেখে তো মনে হল না।" শ্রীমানী-গিন্নি বিস্ময় প্রকাশ করল। "উনিও বড়ছেলে হবার পর আর মাঠমুখো হননি। খেলার কোনও জিনিসই তো আর নেই, তাই আর্জেন্ট অর্ডার দিয়ে প্যান্ট জামা বুট করালেন। কী যে শখ!"

মাখন দত্তর অফ স্টাম্প ঘেঁষে পর পর দুটি বল বেরিয়ে যাওয়া মাত্র ননীদা বোলারের কাছে গিয়ে কী যেন বললেন। ছেলেটি অবাক হয়ে কী যেন বলতে গেল কিন্তু ননীদা তা শোনার জন্য অপেক্ষা না করে শর্ট লেগে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন।

পরের তিনটি বল লোপ্পাই ফুলটস এবং লেগস্টাম্পের বাইরে। মাখন দত্ত হুমড়ি খেয়ে তিনবার ঝাড়ু দিলেন, ব্যাট বলে লাগল না। পরের ওভারে ননীদা বল নিলেন। ভাল লেগব্রেক করাতেন, এখনও পারেন, পল্টু চৌধুরীকে দুটি বল অফ স্টাম্পের

বাইরে লেগব্রেক করালেন। শ্রীমানীর নির্দেশ ভুলে গিয়ে পল্টু চৌধুরী ব্যাটটাকে ছিপের মতো বাড়িয়ে রইল। বল ব্যাটে লেগে তিনবারই পয়েন্টের দিকে গেল।

"ইয়েয়েস", মাখন দত্ত রান নেবার জন্য দৌড়ল, তন্ময় শ্লিপ থেকে ছুটে গিয়ে ব্যাকোয়ার্ড পয়েন্ট থেকে বলটা কুড়িয়ে সোজা উইকেটকিপারের গ্লাভসে বল পাঠাতেই সে উইকেট ভেঙে দিল। মাখন দত্তের তখন ক্রিজে পৌঁছতে চার হাত বাকি।

"হাউউউজ দ্যাট!" কোরাসে আবেদন হল।

দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার হাবলোদা বলল, "নট আউট।"

নতুন ছেলেরা এমন ডাহা অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনার ভঙ্গিতে ননীদার দিকে তাকাল। ননীদা বললেন, "বেনিফিট অব ডাউট দিয়েছে আম্পায়ার।"

"চার হাত বাইরে, এতে কোনও ডাউট থাকতে পারে?" তন্ময় বিরক্ত হয়ে বলল।

ননীদা কথাটা শুনেও শুনলেন না। তন্ময় বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কোমরে হাত দিয়ে শ্লিপে দাঁড়িয়ে রইল। এই ম্যাচের গোপন নিয়মগুলো তন্ময়ের জানার কথা নয়। জানলে হয়তো এভাবে রাগ দেখাত না। সি সি এইচ-এর মতো ছোট ছোট ক্লাবগুলো কাদের দয়ায় চলে সে কথা যেদিন জানবে, সেদিন ও নিশ্চয় ক্লাবকে ভাল না বেসে পারবে না।

এক ঘণ্টা খেলার পর সভাপতি দলের স্কোর পাঁচ উইকেটে ৮১। মাখন দত্ত ৩১ নট আউট। যে পাঁচজন আউট হয়েছে তার মধ্যে ভুলু গোঁসাই একডজন বল দেয়, বিকাশ মাইতি দেয় একশো টাকা। গোঁসাইকে ২০ আর মাইতিকে ২৫ রানের মাথায় আউট দেওয়া হয়েছে। হাবলোদা আর পটাবাবু এ পর্যন্ত নির্ভুল আম্পায়ারিং করে চলেছে। তারা দুজনে এগারোটা এল বি ডব্লু, সাতটা রান আউট, নটা স্টাম্পিং ও তিনটে ক্যাচ আউটের আবেদন নাকচ করেছে। ঠিক করা আছে শ্রীমানীকে হাফ-সেঞ্চুরি করাতেই হবে, নয়তো পরের বছর ওকে প্রেসিডেন্ট পদে ধরে রাখা যাবে না।

পঞ্চাননদা এসে আমার কানে কানে বললেন, "পোলোয়া চড়ানো হল এখন, তারপর চাটনি।"

ঘড়ি দেখে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। চাটনি নামলেই লাঞ্চ। বড় মন্থরগতিতে রান উঠছে, এতক্ষণে মাত্র পাঁচটি উইকেট পড়েছে। অথচ লাঞ্চের আগেই শ্রীমানীকে অন্তত হাফ-সেঞ্চুরি করিয়ে দিতে হবে। ব্যাটিং অর্ডারে সে নিজেকে রেখেছে ভবানীর আগে, এগারো নম্বরে। নবম উইকেট না পড়লে শ্রীমানী নামছে না, তার মানে দুটোর আগে নয়। কিংবা আড়াইটেও বাজতে পারে, কেন না আর এক ভাইস-প্রেসিডেন্ট দয়াশঙ্কর যোশির (তিন জোড়া প্যাড) আট বছরের পুত্র আট নম্বরে। তাকে ১৫ রান করাতেই হবে।

ভাবলাম শ্রীমানীকে বলি, আপনি ৯ নম্বরে এসে লাঞ্চটাকে তাড়াতাড়ি করিয়ে দিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ব্যাটিং অর্ডার তৈরি করার সময় নিজের নামের পাশে ১১ লিখে শ্রীমানী বলেছিল, 'তলার দিকে নিজেকে রাখলুম কেন বলুন তো?'

ননীদা এবং আমি তখন, বাঘ মিউ না করে হালুম করে কেন, এমন এক প্রশ্নের জবাব খোঁজার মতো মুখ করে তাকিয়ে ছিলাম। শ্রীমানী মুচকি হেসে বলেছিল, 'যদি ঝরঝর করে উইকেট পড়ে তা হলে আটকাবে কে?' ওর বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতায় স্তম্ভিত আমার মুখের দিকে ননীদা সপ্রশংস চোখে তাকিয়েছিলেন। তখন ভবানী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিনুকে এগিয়ে আসতে দেখে 'রান্নার দিকটা একবার ঘুরে আসি' বলে দ্রুত মিলিয়ে যায়।

শ্রীমানীকে বিপর্যয়রোধের সুযোগ দেওয়া ও লাঞ্চকে ত্বরান্বিত করার জন্য মাঠে ননীদার কাছে চিরকুট পাঠালাম—"পোলাও চড়েছে। সভাপতিকে নামাবার ব্যবস্থা করুন।"

চিরকুট পাঠাতে ননীদা হাত তুলে বোঝালেন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। দুটি টুঙ্কি দিয়ে শ্লিপ থেকে তন্ময়কে ডেকে এনে, হাতে বল তুলে দিলেন। তারপর আম্পায়ারের দিকে তাকিয়ে মাথাটা হেলালেন। হাবলোদাও একই ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন। দুর্যোধনকে ডেকে আমি বললাম, "কলাপাতা, খুরি, গেলাসগুলো এবার ধুয়ে রেডি করে রাখ।"

হঠাৎ চোখে পড়ল আমার গেস্ট গুঁপো রঞ্জনবাবু আসছে। কাঁধে একটা ক্যামেরা ঝুলছে। আমায় দেখে একগাল হেসে বলল, "ক্যামেরাটাও আনলুম। ক্রিকেটের ছবি তোলা আমার দারুণ হবি। ভাল অ্যাকশন পেলে তুলব। লাঞ্চের কদ্দূর?"

বললাম, "খুব শিগগিরই।" মাথায় তখন একটা আইডিয়া এসে গেছে। শ্রীমানীর ছবি তুলে প্রেজেন্ট করলে কেমন হয়! নেটটা একদম অচল হয়ে গেছে। নতুন একটা কি খুশি হয়ে দেবে না?

"রঞ্জনবাবু, দারুণ অ্যাকশন পাবেন যদি ওই লোকটার ছবি তোলেন।"

"কোন লোকটা বললেন? ওই মোটা হোঁদল-কুতকুতের?"

"আস্তে, রঞ্জনবাবু আস্তে।" বলেই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি শ্রীমানী-গিন্নি রঞ্জনবাবুকে দেখছে।

"আরে দূর মশাই, অমন মোটার আবার অ্যাকশন! ফরোয়ার্ড খেললে তো হাতির মতো দেখাবে, ব্যাক খেললে গণ্ডার মনে হবে।"

"প্লিজ রঞ্জনবাবু, ছবি চাই না, চুপ করুন।"

"আরে দূর মশাই, ভাল সাবজেক্ট পাব বলে ক্যামেরাটা—" রঞ্জনবাবু থেমে গিয়ে চোখ দুটো সরু করে টেন্টের পিছন দিকে দৃষ্টি পাঠিয়ে দিল। প্যাড পরে ভবানী গদ্‌গদ হয়ে মিনুকে কী বলছে। মিনুর হাতে ভবানীর ব্যাট। সে ব্যাটটা দোলাতে দোলাতে ভবানীর কথা শুনছে।

"দ্যাটস এ গুড আনন্দবাজার রবিবাসরীয়-র সাবজেক্ট।" বলেই ক্যামেরা বাগিয়ে রঞ্জনবাবু কুঁজো হয়ে শিকারির মতো এগোল। শ্রীমানী-গিন্নি জ্বলন্ত চোখে রঞ্জনবাবুকে লক্ষ করে যাচ্ছে।

শ্রীমানী ব্যাট করার জন্য তৈরি হয়ে হাজির। স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, "ওগো, গাড়ি থেকে সন্দেশ, দই, লেবুগুলো আনিয়ে রাখো।"

"আনবখন।" শ্রীমানী-গিন্নি মন্দ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল।

শ্রীমানী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তখনই মাঠ থেকে ননীদার বিকট চিৎকার উঠল, "আউজাট?" পটাবাবু কট অ্যান্ড বোল্ড হওয়া মাখন দত্তকে বিদায় সঙ্কেত জানাতে এবার আর দ্বিধা করল না। ৩১ রানেই ডগমগ হয়ে মাখন দত্ত ফিরল।

"ওয়েল প্লেড," শ্রীমানী তারিফ ছুড়ে দিল।

আমি বললাম, "মিস্টার শ্রীমানী, আপনাকে কিন্তু কয়েকটা ছক্কা আজ দেখাতেই হবে।"

হাই তুলে শ্রীমানী মুখগহ্বরের ফটকে কয়েকটা তুড়ি দিয়ে বলল, "ফাস্ট বোলার তো তেমন দেখছি না। ছক্কা মারব কাকে?"

আমি মাথা চুলকে সরে এলাম। পরের ওভারেই দুটি উইকেট পড়ল। শ্রীমানী গ্লাভস পরতে শুরু করল। সভাপতির দল আট উইকেটে ৯৭। তন্ময়ের ওভারের প্রথম বলেই নবম উইকেটের অফ স্টাম্পের বেল উড়ে গেল। শ্রীমানী উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

চাঁদমোহন শ্রীমানী মন্থর গতিতে উইকেটে পৌঁছল। তন্ময় কোমরে হাত দিয়ে একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে। ননীদা লেগ ও অন থেকে যাবতীয় ফিল্ডসম্যান সরিয়ে অফে পাঠাতে শুরু করলেন। সাবধানের মার নেই। ফট্ করে কেউ ক্যাচ ধরে ফেলতে পারে। তারপর তন্ময়কে ডেকে কানে কানে কী বললেন। বাধ্যের মতো তন্ময় মাথা নাড়ল।

শ্রীমানী মিনিট চারেক ক্রিজের চার বর্গগজ এলাকা গভীর মনোযোগে ঘাড় হেঁট করে পরীক্ষা করল। গুটি চারেক কাঁকর আবিষ্কার করে খুঁটে তুলে ফেলে দিল। ব্যাট দিয়ে কয়েকটি স্থান দুরমুশ করে ক্রিজে দাঁড়িয়ে গার্ড চাইল, ওয়ান লেগ। হাবলোদা নিখুঁত গার্ড দেবার জন্য মিনিট পাঁচেক সময় নিল। তারপর বুটের ডগা দিয়ে ক্রিজে দাগ কেটে শ্রীমানী শুরু করল ফিল্ড প্লেসিং নিরীক্ষণ। তাও হয়ে যাবার পর স্টান্স নিল।

তন্ময় এতক্ষণ বোলিং মার্কে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে দেখছিল। এবার বল করার জন্য ছুটতে শুরু করল এবং যখন মধ্যপথে, শ্রীমানী উইকেট থেকে তাড়াতাড়ি দু-পা পিছিয়ে গেল।

কী ব্যাপার! সকলের চোখ সাইট স্ক্রিনের দিকে ফিরল। দুর্যোধনের কুকুরটা সেখানে ঘাড় চুলকোতে ব্যস্ত।

হাবলোদা হেট হেট করে ছুটে যেতেই, বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে কুকুরটা লং অফ বাউন্ডারির দিকে সরে গেল। শ্রীমানী আবার চারিদিক পর্যবেক্ষণ করে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। মুখে মৃদু হাসি।

অদ্ভুতভাবে তন্ময়ের অফ কাটারটা আধহাত বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকে শ্রীমানীর অফ স্টাম্পটাকে শুইয়ে দিল। বেচারা শ্রীমানী। যে কোনও প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান ওই বল সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাবে।

দর্শকদের গুঞ্জন থেমে গেল। শ্রীমানী ফ্যালফ্যাল করে শায়িত স্টাম্পটির দিকে

তাকিয়ে। তন্ময়ে কোমরে হাত রেখে হাসছে। ননীদা শুধু আম্পায়ারের উদ্দেশ্যে মাথাটা দু'বার নাড়লেন।

"নো বল।"

চমকে সবাই তাকিয়ে দেখল, হাবলোদা নির্বিকার মুখে ডান হাতটি ট্র্যাফিক পুলিশের মতো বাড়িয়ে দিয়েছে। শ্রীমানী ক্রিজ থেকে রওনা হয়েছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিল্ডাররা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। তন্ময় ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে হাবলোদার দিকে তাকিয়ে বোলিং মার্কে ফিরে গেল।

শ্রীমানী ক্রিজে দাঁড়িয়ে উইকেটকিপারকে বলল, "নো বলটা ডাকতে লেট না হলে একটা ছক্কা দেখাতুম।"

পরের বল সোজা কপাল টিপ-করা। শ্রীমানী মুখের সামনে ব্যাটটা তোলার সময়টুকু মাত্র পেয়েছিল। বলটা কনুইয়ে লাগতেই খটাং শব্দ হল। তারপর টাল সামলাতে না পেরে ঘুরে পড়ল উইকেটের উপর। মড়াৎ করে স্টাম্প ভাঙার শব্দ হল। তন্ময় ঘুরে দাঁড়িয়ে আম্পায়ার হাবলোদাকে বলল, "নো বঅঅল।"

মাঠের মধ্যে সর্বাগ্রে ছুটে গেল ক্যামেরা হাতে রঞ্জনবাবু, তারপর আমি। শ্রীমানীকে আটজন চ্যাংদোলা করে যখন আনছে, শ্রীমানী-গিন্নি রাগে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল।

"দারুণ সাবজেক্ট মতিবাবু, দারুণ।" স্ন্যাপ নিতে নিতে রঞ্জনবাবু মহাফুর্তিতে বলে উঠল।

খপ করে শ্রীমানী-গিন্নি ক্যামেরাটা ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে বলল, "নিকুচি করেছে তোর সাবজেক্টের। হতভাগা মিনসে ছবি তোলার আর জিনিস পেল না। যা না মুখপোড়া ওই ফড়িংয়ের মতো মেয়েটার ফস্টিনস্টির ছবি তোল না গিয়ে।"

রঞ্জনবাবু নির্বাক। আমরা সবাই কী বলব বা করব ভেবে পাচ্ছি না। তন্ময় শান্ত গলায় বলল, "এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যান, বোধহয় কনুইয়ের হাড় ভেঙেছে।"

সপরিবারে শ্রীমানীকে গাড়িতে তুলে ননীদা পি জি হাসপাতালে রওনা হলেন। আমরা মুহ্যমান হয়ে নিচু গলায় কথা বলছি। দুর্যোধন এসে বলল, "পাতা পাতি দিব কি?"

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। এরপর আর খেলার দরকার কী! রঞ্জনবাবু ক্যামেরার ভাঙা টুকরোগুলো হাতে নিয়ে আমার কাছে এসে বলল, "মতিবাবু, আমার দামি ক্যামেরাটা আপনার জন্য ভাঙল।"

"আমার জন্য!"

"নিশ্চয়। আপনিই তো বলেছিলেন হোঁদল-কুতকুতটার ছবি তুলতে।" রঞ্জনবাবুর গলা ভারী হয়ে এল। কয়েক ফোঁটা জল চোখ থেকে নেমে গোঁফ ভিজিয়ে দিল। আমার তখন একটা কথাই মনে হল, অফিসের দরজা দিয়ে হাতি ঢুকে গেলে রঞ্জন সেনগুপ্ত তাকাবে না, কিন্তু আমার পরিচিত একটি মাছিকেও আর গলতে দেবে না।

ভবানী ভীষণ মনমরা হয়ে বলল, "এখুনি লাঞ্চ করার দরকার কী, আমার ব্যাটিংটা হয়ে গেলেই তো হতে পারত। মিনুর আবার কবে মাঠে আসার সময় হবে কে

জানে।"

লাঞ্চের সময় তন্ময় বলল, "সরি, আই অ্যাম রিয়েলি সরি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দই সন্দেশ লেবুও গাড়ি করে চলে যাবে এটা একদম ভাবিনি। লাঞ্চটা আমিই মাটি করে দিলুম।"

কিন্তু সি সি এইচ-এর কী ক্ষতি হল, সেটা আমার মতো দু-চারজন ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারল না।

৪

এইবারই আমার প্রথম ক্যাপটেনসি। রীতিমতো ভয় ভয় করছে। এতকাল ননীদার আওতায় খেলে এসেছি, কোনও ভাবনাচিন্তা ছিল না। পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম। এখন বুঝতে পারছি ননীদাকে কতখানি দরকার। আমার অনভিজ্ঞতার কথা বলে ওঁর সাহায্য প্রার্থনা করতেই, ননীদা একগাল হেসে পিঠে গোটা চারেক থাপ্পড় মারলেন।

"অত ঘাবড়াবার কী আছে! এবারের টিম তো খুব খারাপ নয়! তা ছাড়া ম্যাচ জেতা কিংবা হার বাঁচানো, সেটা তো আর সব সময় টিমের শক্তি দিয়ে হয় না, হয়—" ননীদা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, অনুক্ত শব্দটি পূরণ করে দেব এই আশায়।

আমি বললাম, "স্ট্র্যাটেজি।"

ননীদা ভীষণ খুশি চাপতে চাপতে বললেন, "পারবে, তুমি পারবে। তবে তুমি একটু ভিতু গোছের আর চক্ষুলজ্জাটা একটু বেশি। ওসব থাকলে কিন্তু বিপদ কাটিয়ে বেরোতে পারবে না।"

"সেইজন্যই তো আপনার কাছে এলাম।"

ননীদা কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললেন, "স্ট্র্যাটেজি নির্ভর করবে স্থান, কাল আর পাত্র বিচার করে। এজন্য তিনটে জিনিসের উপর জোর দেবে; এক আইনের ফাঁক খুঁজে বার করে তার সুযোগ নেওয়া। বেশির ভাগই তো ক্রিকেট আইন না জেনে খেলতে নামে, তা ছাড়া আইনের নানান ব্যাখ্যাও করা যায়। তুমি দেখো, অনেক ফাঁক বেরিয়ে পড়বে যেখান দিয়ে গলে যেতে পারবে। দুই, আম্পায়ারদের স্টাডি করবে। উকিলরা যেমন জজকে স্টাডি করে, তার মনের প্রবণতা, দুর্বলতার সুযোগ নেয়, তেমনি। সব আম্পায়ার যে আইনের মারপ্যাঁচ বোঝে তাও নয়। তা ছাড়া আইনের ব্যাখ্যা আর প্রয়োগ বেশ শক্ত ব্যাপার। মানুষ মাত্রই চাটু কথা পছন্দ করে, এটা ভুলে যেয়ো না। তিন অপোনেন্ট প্লেয়ারদের ঘাবড়ে দিয়ে নার্ভাস করা, ধাঁধায় ফেলা। ডবলু জি গ্রেস এটা করত। জিততে হলে সব কিছু করতে হবে। ভদ্রতা করলে কোনও কিছুতেই জেতা যায় না, এই কথাটা বরাবর মনে রাখবে।"

ননীদার উপদেশ শিরোধার্য করে বিদায় নিয়েছিলাম। না করে উপায় নেই। ওই তিন থিওরি অনুসরণ করে ননীদা যে কতবার সি সি এইচ-কে উদ্ধার করেছেন তার

ইয়ত্তা নেই। কয়েকটার কথা জীবনে ভুলব না।

তরুণ মিলনের সঙ্গে খেলার কথা মনে পড়ল। ওদের ৪৮ রানে নামিয়ে দেওয়ার পর আমরা করলাম ৮ উইকেটে ৩২। হার অবধারিত। ননীদা তখন খেলতে নামলেন। আর একদিকে ব্যাট করছে অঞ্জন। ননীদা-নির্দেশিত 'টিউবওয়েল টেপা' ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলে প্রায় আধঘণ্টা উইকেটে রয়েছে। ননীদা ক্রিজে পৌঁছে বলে দিলেন, "বলের লাইনে পা, মাথা নিচু, স্ট্রেট ব্যাট। বাকি যা করার আমি করছি।"

পরপর ননীদা ননস্ট্রাইকার এন্ডে গিয়ে এগারো রানে ছয় উইকেট পাওয়া তরুণ মিলনের ওয়েস হলের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। আমাদের দুজনের কপালে আলু খেলা পরপর একজনের দুটি দাঁত কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এই বোলারটিই দায়ী। বাইশ পা দূরের বোলিং মার্কে ফিরে যাচ্ছে বোলারটি, ননীদাও তার সঙ্গে চললেন কথা বলতে বলতে।

"অনেক বড় বড় স্পিনার দেখেছি—ভেরিটি থেকে শুরু করে প্রসন্ন পর্যন্ত, কিন্তু কোনও স্পিনারকে আপনার মতো এতটা দৌড়ে এসে বল করতে দেখিনি!" ননীদা দারুণ বিস্মিত স্বরে বললেন।

"স্পিনার!" বোলারটি থেমে গেল। "আমি স্পিনার? আপনি অন্ধ নাকি! আমার বল দেখে কি আপনার তাই মনে হল?"

"সেই রকমই তো লাগছে।" নিরীহ মুখে ননীদা একগাল হাসলেন।

রাগে বোলারটির চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম। কথা না বলে সে আবার বোলিং মার্কের দিকে চলল, সঙ্গে ননীদাও।

"তবে মানতেই হবে, গুপ্তে কি রামাধিন কি বেনোর থেকে কিছুটা জোরে বল করেন।"

মার্কে পৌঁছে বোলারটি ঘুরে দাঁড়াল। দু'চোখ দিয়ে এবার আগুন বেরোচ্ছে। ননীদা ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চললেন, "আপনার বোলিং অ্যাকশন অনেকটা ফাস্ট বোলারেরই মতো, চেহারাটাও বেশ, তা হলে জোরে বল করেন না কেন?"

"আম্পায়ার!" তরুণ মিলনের ওয়েস হল বাইশ পা দূর থেকে চিৎকার করে উঠল।

"আপনি কি এ লোকটার কাণ্ড দেখতে পাচ্ছেন না? একে থামাবেন তো!"

আম্পায়ার কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ননীদা চিৎকার করলেন, "আম্পায়ার, আইনে কোথাও কি বলা আছে যে, বোলারের সঙ্গে কেউ হাঁটতে পারবে না?"

মাথায় টোকা দিতে দিতে আম্পায়ার খুবই বিজ্ঞের মতো বলল, "ঠিক ঠিক। আইনে বারণ করা নেই।"

বোলারটি বিড়বিড়িয়ে কতকগুলো অনুচ্চার্য শব্দ মুখ থেকে নির্গত করে ছুটতে শুরু করা মাত্র ননীদাও ওর সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগলেন—"নো বল যেন না হয়। বোলিং ক্রিজের দিকে নজর রাখুন।"

তখনি বোলারটির দৌড়ের মধ্যে কী একটা গোলমাল হয়ে গেল, ফলে

ডেলিভারির সময় ডান পা-টি বোলিং ক্রিজের এক হাত বাইরে বেরিয়ে গেল। অঞ্জন 'নো বল' শোনামাত্র ননীদার নির্দেশ ভুলে গিয়ে চোখ বুজে ব্যাট চালাল। মাঠের সবাই মাথা তুলে দেখল, বলটি চমৎকারভাবে মিড উইকেট বাউন্ডারি টপকে ছ'টা রান সংগ্রহ করছে।

বোলারটি কটমট করে ননীদার দিকে তাকাতেই, ননীদা বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন, "বলেছিলুম বোলিং ক্রিজের দিকে নজর রাখুন। কথাটা শুনলেন না।"

পরের বল দেবার জন্য বোলার বোলিং মার্কে যাবার সময় ননীদা আবার তার সঙ্গ নিল।

"আম্পায়ার, দেখতে পাচ্ছেন না লোকটা কী করছে!"

"দেখেছি", আম্পায়ার উদাসী গলায় বলল, "সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। আইনে বারণ করা নেই।"

বল করার জন্য ছুটতে শুরু করামাত্র ননীদা চাপাস্বরে বললেন, "এবার যেন নো বল না হয়, বোলিং ক্রিজে নজর রাখুন।"

এবার নো বল হল না। কিন্তু বোলিং ক্রিজে চোখ রাখার ফলেই, বল হাত থেকে বেরিয়ে যে-পথ ধরে এগোল তাতে থার্ড স্লিপের পরলোকগমন অবশ্যম্ভাবী ছিল, যদি না সে 'বাপ্‌রে' বলে গালির ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ত। আম্পায়ার ওয়াইড সঙ্কেত দেখাতে গিয়ে বাই বাউন্ডারির সঙ্কেত দেখাল।

আট উইকেটে ৪২। আর সাত রান করলেই আমাদের জিত। ননীদা ছায়ার মতো বোলারকে অনুসরণ করে চললেন। এবার বোলারটি আর সহ্য করতে না পেরে হাতা গুটিয়ে ননীদার দিকে এগোতেই, ননীদা ছুটে আম্পায়ারের কাছে এসে বললেন, "দেখুন, মারতে আসছে।"

"ইউ ব্লাডি...(ছাপার অযোগ্য) ...ইউ উল্লুক...(ছাপার অযোগ্য)...খুন করে ফেলব।"

"শুনলেন আম্পায়ার, শুনলেন!" ননীদা ঢালের মতো আম্পায়ারকে সামনে রেখে চেঁচাতে লাগলেন। "ক্রিকেটের মতো খেলায় এই রকম অসভ্য গালাগাল!"

"নিকুচি করেছে তোর ক্রিকেটের।" বোলারটি সোজা এক রাইট হুক্ চালাল। ননীদা দক্ষতার সঙ্গে ঢালের আড়ালে আশ্রয় নিলেন। আম্পায়ার "বাবা রে" আর্তনাদ করে ধীরে ধীরে বাঁ গালে হাত চেপে বসে পড়ল।

এক সপ্তাহ পরে আম্পায়ারের রিপোর্টের ভিত্তিতে সি এ বি লিগ সাব-কমিটি আমাদের পুরো পয়েন্ট দেয়। বোলারটি এক বছরের জন্য সাসপেন্ড হয়। তখন ননীদা শুধু বললেন, "ট্যাকটিকস্।"

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার দ্বারা এইরকম ট্যাকটিকস্ উদ্ভাবন সম্ভব নয়। কথাবার্তা ভাল করে গুছিয়ে বলতে পারি না, গায়ে পড়ে আলাপও জমাতে পারি না। অথচ ননীদার ট্যাকটিকস্ প্রয়োগ করতে হলে কথা বলাটাকে যে শিল্পের পর্যায়ে উঠিয়ে আনতে হবে, সেটা একবার হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম ইস্ট সাবার্বানের সঙ্গে খেলায়।

মাঠে নামার মুখে আম্পায়ার দুজনের মধ্যে যে বয়স্ক, ননীদা তার সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলেন।

"আরে অনেকদিন পর দাদার সঙ্গে দেখা হল, আছেন কেমন?"

"আর থাকা। চলে যাচ্ছে একরকম করে। আপনি কেমন আছেন?" আম্পায়ার যথোচিত সৌজন্য দেখাল।

"আপনি যা বললেন, চলে যাচ্ছে একরকম করে।" ননীদা ঝট করে গলা নামিয়ে ফেলে বললেন, "বুড়ো বয়সেও খেলতে নামতে হচ্ছে। এখনকার ছোকরারা কিসসু জানে না। বোঝেও না। আমাকে এখনও ঠেকা দিয়ে যেতে হচ্ছে। স্টান্ডার্ড যে কোথায় নেমে গেছে, আপনাকে আর বোঝাব কী, নিজের চোখেই তো দেখছেন।"

আম্পায়ার অনুমোদনসূচক মাথা নাড়ল।

"ক্রিকেট খেলতে আসে অথচ ক্রিকেটের আইন জানে না। আজেবাজে অ্যাপিল করে, ঝগড়া করে, জোচ্চুরি করে, খেলাটাকেই মাটি করে দেয়; যাকগে ওসব কথা, বাতের ব্যথাটা এখন কেমন?"

"মাঝে মাঝে চাগাড় দিচ্ছে।" আম্পায়ার যথেষ্ট অবাক হয়েই বলল। অবাক হবার কারণ, ননীদা জানল কী করে?

"আমাদের পাড়ায় এক কোবরেজের অদ্ভুত একটা তেল আছে। আমার কাকিমার পনেরো বছরের পুরনো বাত, মাত্র দু' হপ্তা ব্যবহার করেই সেরে গেল।"

"সত্যি!" আম্পায়ার ব্যস্ত হয়ে বলল, "ঠিকানাটা দেবেন?"

"উহুঁ" ননীদা দুষ্টু দুষ্টু হেসে বললেন, "কোবরেজের ঠিকানা নয়, আপনার ঠিকানা দিন। তৈরি করিয়ে আমি নিজে আপনাকে দিয়ে আসব। খেলার শেষে বরং আমাকে লিখে দেবেন।"

এইখান থেকেই ইস্ট সাবার্বানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। ননীদা যখন বল করতে এলেন, তখন সাবার্বানের বিনা উইকেটে ৪১ রান। ওর প্রথম বলটা অনেকখানি ঘুরল, অফ স্টাম্প থেকে শর্ট ফাইন লেগে। সুইপ করতে গিয়ে ব্যাটসম্যান ফসকাল এবং প্যাডে লাগল। আম্পায়ারের দিকে ঘুরে ননীদা দু'হাত তুলেই জিভ কাটলেন। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে যেন নিজের মনেই বললেন, "হয়নি হয়নি, আপিল করা চলে না। বেরিয়ে যাচ্ছিল বল।" তারপর বেশ গম্ভীর হয়ে আম্পায়ারকে বললেন, "এখনকার ছোকরারা আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করত।"

বাতের হাত থেকে মুক্তিকামী আম্পায়ার দ্রুত ঘাড় নেড়ে ননীদাকে খুশি করল। দুটি বল পরেই অফ স্টাম্পের এক হাত বাইরে, ব্যাটসম্যান প্যাড প্লে করতেই ননীদা লাফিয়ে "হা-আ-আ-উ" বলেই হাত দিয়ে মুখ চেপে আপিলটা আর সম্পূর্ণ করলেন না। ঘাড় বেঁকিয়ে বলের পিচের দিকে ২৫ সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন। তারপর প্রায় অনুনয়ের সুরে বললেন, "ইগনোর ইট আম্পায়ার, কমপ্লিটলি ইগনোর দ্য আপিল। সরি, ভেরি সরি আপনাকে বিরক্ত করার জন্য।"

"তাতে কী হয়েছে, উত্তেজনায় ও রকম মুখ থেকে বেরিয়ে যায়ই।" আম্পায়ার সান্ত্বনা দিয়ে বলল।

"কিন্তু কেন বেরোবে?" ননীদা অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে বললেন, "ডেড শ্যিওর না হয়ে কেন আপিল করব?"

ওভার শেষে মাথা নাড়তে নাড়তে ননীদা মিড অনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আম্পায়ার গেল স্কোয়ার লেগে। পরের ওভারের দ্বিতীয় বলে ব্যাটসম্যানরা বিপজ্জনক একটি রান নিল। ননীদা বলটা উইকেটকিপারকে ছুড়তেই সে যখন উইকেট ভেঙে দিল, নন-স্ট্রাইকার তখন পপিং ক্রিজে পৌঁছে, পেরিয়ে গেছে। ননীদা চিৎকার করে উঠলেন রান আউটের আপিল করে। স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার দ্বিধা না করে আঙুল তুলল।

"গুড ডিসিশ্যান।" ননীদা আম্পায়ারকে শুনিয়ে তারিফ করলেন। বিস্মিত ব্যাটসম্যানটি আম্পায়ারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রওনা হল। আমি ছিলাম সেকেন্ড শ্লিপে। এমন ডাহা বাজে রানআউট কল্পনা করা যায় না। একসময় ননীদাকে চাপা গলায় বললাম, "ব্যাপার কী?"

"সাইকোলজি।" ননীদা জবাব দিলেন।

"ওর বাত আছে, সেটা কি জানতেন?"

"একদমই নয়। তবে পঞ্চাশ বয়সের উপর শতকরা ষাটটা বাঙালিরই তো বাত, নয়তো অম্বল আছে। তেল নয়তো বড়ি, দুটোর একটা লেগে যাবেই।"

"যদি লোকটার বাত না থাকত?"

"তা হলে ওর বাবা মা জ্যাঠা জ্যাঠি কারুর না কারুর তো পাওয়া যাবেই।"

ননীদার আপিলে সেই আম্পায়ারের কাছ থেকে চারটি এল বি ডবল্যু, দুটি কট বিহাইন্ড, একটি স্টাম্পিং ও দুটি রানআউট পেয়ে আমরা বিনা উইকেটে ৪১ রানের ইস্ট সাবার্বানকে ৬২ রানে নামিয়ে দিলাম।

কয়েকদিন পরে ননীদাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তিসির তেলে রসুন, গোবর, কাঁচা লঙ্কাবাটা মিশিয়ে এক শিশি পাঠিয়ে দিয়েছেন আম্পায়ারকে। আমরা পরে ননীদার এই সব ট্যাকটিক্সের নাম দিয়েছিলাম—ননীটিক্স্।'

আর একটি ননীটিক্স্ও সিজনের প্রথম খেলার দিন সকালে মনে পড়ে গেল। ব্যাটসম্যান যখন খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে এবং বোলার বল করায় উদ্যত, তখন সেকেন্ড শ্লিপ থেকে উইকেটকিপারের সঙ্গে ননীদার কথা বলে যাওয়া। ব্যাটসম্যান বল খেলুক, খেলতে গিয়ে ফসকাক বা ইচ্ছে করে ছেড়ে দিক—ননীদা কিন্তু সমানে "আ হ্ হ্ হ্" "উ হ্ হ্ হ্", "ই স্ স্ স্," "আর একচুল যদি বলটা ঘুরত," "এবার নির্ঘাত গালিতে হয়ে যাবে" ইত্যাদি রানিং কমেন্টারি করে যাবেনই। স্টাম্পের এক গজ বাইরে দিয়ে বল বেরিয়ে গেলেও এমন করবেন যেন উইকেট ভেদ করে গেল।

নতুন ব্যাটসম্যান উইকেটে এসে দেখত ননীদা ভুরু কুঁচকে গম্ভীর মুখে গুডলেংথের কাছাকাছি একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে। তারপর ব্যাটসম্যানকে শুনিয়ে আমাকেই বলতেন, "একই রকম আছে হে মতি, ঠিক সেই রকম। কালও দুর্যোধনকে পইপই বলেছি, ভাল করে রোলার টানবি, নয়তো কোনদিন যে মানুষ খুন হবে কে জানে।

এই সময় আমার কাজ হল লক্ষ করা—ব্যাটসম্যান উৎকর্ণ হয়েছে কি না। যদি

হয় তা হলে বলব, "সত্যিই খেলা যায় না। তপনের কথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে...ভাল কথা, ননীদা কাল হাসপাতালে গেছলেন?"

"না গেলেই ভাল ছিল, চোয়ালটা ঠিকমতো সেট হয়নি, মুখটা বেঁকে আছে। সামনের দাঁত দুটোরও কিছুই করার নেই।"

"তা হলে চিত্তকে আস্তে বল করতে বলুন।" আমি ভীষণভাবে উদ্বেগ দেখাই।

"এখনও তো বল লাফায়নি। আগে দেখি লাফায় কি না।"

এরপর ব্যাটসম্যানের টিকে থাকা বা না থাকা নির্ভর করে তার নার্ভের ক্ষমতার উপর। তবে প্রায় ক্ষেত্রেই দু' ওভারের মধ্যেই তারা ফিরে যায়। ননীদা তাঁর এই ট্যাকটিক্স্‌কে বলেন—প্রোপাগান্ডা।

আমার প্রথম ম্যাচ, ভ্রাতৃসঙ্ঘের বিরুদ্ধে ননীদার প্রোপাগান্ডা ট্যাকটিক্স্‌ প্রয়োগ করলাম। ওদের সাত নম্বর ব্যাটসম্যানটি এগারো রান করে আট ঘন্টা ধরে অটল অনড় হয়ে রীতিমতো জ্বালাচ্ছে। শুরু করলাম নতুন উইকেটকিপার বিষ্ণু মিশ্রের সঙ্গে পিচের ভয়াবহতা এবং গত ম্যাচে তপনের মুখমণ্ডল কী আকৃতি ধারণ করেছে, সেই বিষয়ে উদ্বেগজনক আলোচনা। বিষ্ণু রীতিমতো অবাক হয়ে বলল, "তপন তো লং অনে ফিল্ডিং করছে।"

চট করে লক্ষ করলাম, ব্যাটসম্যানটি আমাদের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসছে। তাতে বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম। অবশেষে আর থাকতে না পেরে পরের ওভারে তাকে বললাম, "পিচটা খুবই খারাপ, তাই না?"

ব্যাটসম্যান লাজুক হাসল।

"আগের ম্যাচে আমাদের বেস্ট ডিফেনসিভ ব্যাট তপন ঘোষের চোয়াল আর দাঁত ভেঙেছে। মালীটাকে এবার তাড়াতেই হবে, কিসসু কাজ করে না।"

ব্যাটসম্যান আবার লাজুক হাসল।

"তারককে অবশ্য বলে দিয়েছি, ওভারপিচ হয় হোক, তবু ওই স্পটে যেন বল না ফেলে। ম্যাচ জেতার জন্য তো আর মানুষ খুন করা যায় না?"

ব্যাটসম্যান এবারও হাসল আরও জড়োসড়ো হয়ে। আমি অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেলাম। পরের ওভার শুরুর আগে অপর ব্যাটসম্যানকে বললাম, "আপনার পার্টনারটি কেমন লোক মশাই, একটা কথারও জবাব দেয় না, শুধু হাসে?"

সখেদে উত্তর পেলাম, "আমাদেরও এই একই মুশকিল হয়, হাবু একদমই কালা আর বোবা।"

ননীটিক্স্‌কে এই প্রথম ব্যর্থ হতে দেখলাম!

৫

চাঁদমোহন শ্রীমানী জানিয়ে দিয়েছে তার ব্যবসায় এখন মন্দা যাচ্ছে, পাঁচশো টাকার বেশি দিতে পারবে না। আমরা বুঝলাম তন্ময়ের জন্যই ক্লাবের হাজার টাকা জরিমানা হল। এত বড় ধাক্কা সামলানো ক্লাবের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। ননীদা দারুণ

মুষড়ে পড়লেন। আমি বললাম, "গোটা চার-পাঁচ ম্যাচ খেলে বরং এই সিজনের মতো খেলা বন্ধ করে দেওয়া যাক, তাতে খরচ বাঁচবে।"

"সে কী কথা!" ননীদা যতটা না অবাক হলেন তার থেকে বেশি রেগে উঠলেন। "একটা বাঁদরের উৎপাতে সি সি এইচ খেলা বন্ধ করে দেবে? আমাদের ট্র্যাডিশন আছে, তা থেকে সরে আসব আমি বেঁচে থাকতে?"

এরপর আর আমি সাহস পাইনি জিজ্ঞাসা করতে—বাঁদরটা কে, শ্রীমানী না তন্ময়?

দ্বিতীয় লিগ ম্যাচে তন্ময় ১০৮ নট আউট রইল। ম্যাচ জিতলাম। এগারো বছর পর এই প্রথম সি সি এইচ-এর কেউ সেঞ্চুরি করল। ক্লাবের ট্র্যাডিশন, কেউ সেঞ্চুরি করলেই একটা নতুন ব্যাট পায়। এ কথাটা ননীদা প্রতি বছর সিজনের শুরুতেই জানিয়ে দেন। এ বছরও দিয়েছেন।

খেলা শেষে তন্ময় কথাটা মনে করিয়ে দিল ননীদাকে। খুব মেজাজে ছিলেন ননীদা, বললেন, "আলবৎ পাবে। কথার খেলাপ আমার হয় না।"

"তাই বলে কাঁঠাল কাঠের ব্যাট যেন দেবেন না। জি কে-র ব্যাট চাই।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়।"

"কবে দিচ্ছেন?"

"সামনের হপ্তায়ই পেয়ে যাবে।"

ননীদাকে একসময় বললাম, "শ'খানেক টাকার কমে তো ব্যাট হবে না। পাবেন কোত্থেকে? ক্লাবের যা অবস্থা!"

"আরে, টাকা ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। দেখলে, ফাস্ট বোলারটাকে যে ছয়টা মারল সেকেন্ড ওভারে? এগিয়ে যেই দেখল পাবে না, সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে ব্যাকফুটে স্ট্রেট বোলারের ওপর দিয়ে। ছেলেটার হবে, বুঝলে মতি! এত বছর গড়ের মাঠের ঘাসে চরছি, বুঝতে ঠিকই পারি। তবে বড্ড ডেয়ারিং, অধৈর্য, রিস্কি শট নেয়। ওকে তুমি একটু কন্ট্রোল করো। আমার কথা তো শুনবে না।"

বললাম, "আমার কথাও শুনবে না। আজকাল ছেলেরা একটু অন্য রকম, বোঝেনই তো।"

পরের ম্যাচ খেলতে নামার আগে তন্ময় তাঁবুর মধ্যে চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়েই বলল, "ব্যাটটা যে এখনও পেলুম না। দেবেন তো, নাকি ক্যালকাটা কর্পোরেশন হয়ে থাকবেন?"

"না, না, অবশ্যই দোব।" ননীদা খানিকটা কাঁচুমাচু হয়ে বললেন।

এ খেলায় তন্ময় ১০১ করল। ননীদা আহ্লাদে যে কী করবেন, ভেবে পেলেন না। আমি শুধু বললাম, "আর একখানা ব্যাট দিতে হবে, মনে থাকে যেন!"

"রেখে দাও তোমার ব্যাট!" ননীদা ধমকে উঠলেন। "কলকাতার ক'টা ব্যাটসম্যান পারে লেগ স্টাম্পের বাইরে সরে এসে লেগের বল অমন করে স্কোয়ার কাট্ করতে? মতি, তুমি ব্যাটের কথাই শুধু ভাবছ, ছেলেটা যে আর্টিস্ট সেটা বলছ না!"

চুপ করে রইলাম। লাঞ্চের সময়ই, যা আন্দাজ করেছিলাম তাই ঘটল। তন্ময়

টেবিলে বসেই হেঁকে বলল, "আগের ব্যাটটা তো এখনও পেলুম না। আর কতদিন সময় দিতে হবে, ননীদা?"

"পাবে, পাবে! এক সঙ্গেই দুটো পাবে!"

"ঠিক আছে! তবে সামনের ম্যাচের আগে না পেলে আমি আর আসছি না।"

কথামতোই তন্ময় এল না পরের ম্যাচে। দুটো কেন, একটা ব্যাট দেওয়ার সামর্থ্যও সি সি এইচ-এর নেই। তন্ময় ব্যাট না পাওয়ায় অন্য প্লেয়াররাও গুঞ্জন তুলল। আমরা চার উইকেটে ত্রিবেণী ইউনাইটেডের কাছে হারলাম। পরের খেলা রূপোলি সঙ্ঘের সঙ্গে। এখন রূপোলির ক্যাপ্টেন চিতু। দুটো ম্যাচ খেলে, তন্ময় একাই ম্যাচ দুটো জিতিয়ে দিয়েছে। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা জেগেছে, সি সি এইচ চ্যাম্পিয়ন হবার চেষ্টা করলে এবার বোধ হয় হতে পারবে। শক্ত গাঁট রূপোলি সঙ্ঘ। ওরা আর আমরা যেন মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল। একের কাছে অন্যের হার কল্পনাতীত ব্যাপার।

রূপোলি সঙ্ঘের সঙ্গে সি সি এইচ-এর হাড্ডাহাড্ডির শুরু পঁচিশ বছর আগে শনিবারের একটা ফ্রেন্ডলি হাফ-ডে খেলা থেকে। ননীদা এমন এক ননীটিক্স্ প্রয়োগ করে ম্যাচটিকে ড্র করান, যার ফলে এগারো বছর রূপোলি সঙ্ঘ আমাদের সঙ্গে আর খেলেনি। গল্পটা শুনেছি মোনা চৌধুরীর (অধুনা মৃত) কাছে। মোনাদা এ খেলায় ক্যাপ্টেন ছিলেন। উনি না বললে, এটাকে শিব্রাম চকরবরতির লেখা গল্প বলেই ধরে নিতাম।

সি সি এইচ প্রথম ব্যাট করে ১৪ রানে সব আউট হয়ে যায়। মোনাদা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ড্রেসিং রুমে। সবারই মুখ থমথম। এক ওভার কি দু' ওভারেই রূপোলি সঙ্ঘ রানটা তুলে নেবে। ওদের ড্রেসিং-রুম থেকে নানান ঠাট্টা এদিকে পাঠানো হচ্ছে। ক'টা বলের মধ্যে খেলা শেষ হবে তাই নিয়ে বাজি ধরছে। রূপোলির ক্যাপ্টেন এসে বলল, "মোনা, আমরা সেকেন্ড ইনিংস খেলে জিততে চাই, রাজি?" মোনাদা জবাব দেবার আগেই ননীদা বলে উঠলেন, "নিশ্চয় আমরা খেলব। তবে ফার্স্ট ইনিংসটা আগে শেষ হোক তো!"

সবাই অবাক হয়ে তাকাল ননীদার দিকে। রূপোলির ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে, "তাই নাকি?" বলে চলে গেল। ননীদা বললেন, "এ ম্যাচ রূপোলি জিততে পারবে না। তবে আমি যা বলব তাই করতে হবে।"

মোনাদা খুবই অপমানিত বোধ করছিলেন রূপোলির ক্যাপ্টেনের কথায়, তাই রাজি হয়ে গেলেন। তখন বিষ্টুকে একধারে ডেকে নিয়ে ননীদা তাকে কী সব বোঝাতে শুরু করলেন আর বিষ্টু শুধু ঘাড় নেড়ে যেতে থাকল। তিরিশ মাইল রোড রেসে বিষ্টু পর পর তিন বছর চ্যাম্পিয়ন। শুধু ফিলডিংয়ের জন্যই ওকে মাঝে মাঝে দলে নেওয়া হয়। ব্যাট চালায় গাঁইতির মতো, তাতে অনেক সময় একটা-দুটো ছক্কা উঠে আসে।

রূপোলি ব্যাট করতে নামল। ননীদা প্রথম ওভার নিজে বল করতে এলেন। প্রথম বলটা লেগস্টাম্পের এত বাইরে যে, ওয়াইড সঙ্কেত দেখাল আম্পায়ার। দ্বিতীয় বলে

ননীদার মাথার দশ হাত উপর দিয়ে ছয়। তৃতীয় বলে পয়েন্ট দিয়ে চার। পরের দুটি বলে, আশ্চর্য রকমের ফিল্ডিংয়ে কোনও রান হল না। শেষ বলেই লেগবাই। বিষ্টু লং অন থেকে ডিপ ফাইন লেগে যেভাবে দৌড়ে এসে বল ধরে, তাতে নাকি রোম ওলিম্পিকের ১০০ মিটারে সোনার মেডেল পাওয়া যেত। তা না পেলেও বিষ্টু নির্ঘাত বাউন্ডারি বাঁচিয়ে যখন উইকেটকিপারকে বল ছুড়ে দিল, রূপোলির দুই ব্যাটসম্যান তখন তিনটি রান শেষ করে হাঁফাচ্ছে।

ওভার শেষ। স্কোর এখন সমান-সমান। দু' দলেরই ১৪। বিষণ্ণতায় সি সি এইচ-এর সকলের মুখ ম্লান। শুধু ননীদার মুখে কোনও বিকার নেই। সাধারণত অতুল মুখুজ্জেই এরপর বল করে। সে এগিয়ে আসছে কিন্তু তাকে হাত তুলে নিষেধ করে ননীদা বলটা দিলেন বিষ্টুর হাতে। সবাই অবাক। বিষ্টু তো জীবনে বল করেনি! কিন্তু কথা দেওয়া হয়েছে, ননীদা যা বলবেন তাই করতে দিতে হবে। বিষ্টু গুনে গুনে ছাব্বিশ কদম গিয়ে মাটিতে বুটের ডগা দিয়ে বোলিং মার্ক কাটল। ব্যাটসম্যান খেলার জন্য তৈরি। বিষ্টু তারপর উইকেটের দিকে ছুটতে শুরু করল।

বোলিং ক্রিজে পৌঁছবার আগে অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল। বিষ্টু আবার পিছু হটতে শুরু করেছে। তারপর গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল। সারা মাঠ অবাক, শুধু ননীদা ছাড়া।

বিষ্টু কি পাগল হয়ে গেল? ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, ঘুরছে আবার পাক খাচ্ছে, লাফাচ্ছে, বোলিং মার্কে ফিরে যাচ্ছে, ডাইনে যাচ্ছে, বাঁয়ে যাচ্ছে কিন্তু বল হাতেই রয়েছে।

"এ কী ব্যাপার!" রূপোলির ব্যাটসম্যান কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, "বোলার এভাবে ছুটোছুটি করছে কেন?"

ননীদা গম্ভীর হয়ে বললেন, "বল করতে আসছে।"

"এসে পৌঁছবে কখন?"

"পাঁচটার পর। যখন খেলা শেষ হয়ে যাবে।"

এরপরই আম্পায়ারকে ঘিরে তর্কাতর্কি শুরু হল। ননীদা যেন তৈরিই ছিলেন, ফস করে পকেট থেকে ক্রিকেট আইনের বই বার করে দেখিয়ে দিলেন, বোলার কতখানি দূরত্ব ছুটে এসে বল করবে, সে সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। সারাদিন সে ছুটতে পারে বল ডেলিভারির আগে পর্যন্ত।

বিষ্টু যা করে যাচ্ছিল তাই করে যেতে লাগল। ব্যাটসম্যান ক্রিজ ছাড়তে ভরসা পাচ্ছে না, যদি তখন বোল্ড করে দেয়! ফিল্ডাররা কেউ শুয়ে, কেউ বসে। ননীদা মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন আর হিসেব করে বিষ্টুকে চেঁচিয়ে বলছেন, "আর দেড় ঘণ্টা!"..."আরও এক ঘণ্টা!"..."মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট!"

কথা আছে পাঁচটায় খেলা শেষ হবে। পাঁচটা বাজতে পাঁচে নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হল। বল ডেলিভারি দিতে বোলার ছুটছে, তার মাঝেই খেলা শেষ করা যায় কি না? দুই আম্পায়ার কিছুক্ষণ আলোচনা করে ঠিক করলেন, তা হলে সেটা বেআইনি হবে।

সুতরাং বিষ্টুর পাক দিয়ে দিয়ে দৌড়নো বন্ধ হল না। মাঠের ধারে লোক জমেছে। তাদের অনেকে বাড়ি চলে গেল। অনেক লোক খবর পেয়ে দেখতে এল। ব্যাটসম্যান সাস্ত্রীর মতো উইকেট পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যা নামল। বিষ্টু ছুটেই চলেছে। চাঁদ উঠল আকাশে। ফিল্ডাররা শুয়েছিল মাটিতে। ননীদা তাদের তুলে ছ'জনকে উইকেটকিপারের পিছনে দাঁড় করালেন, বাই রান বাঁচাবার জন্য। এরপর বিষ্টু বল ডেলিভারি দিল।

রূপোলির ব্যাটসম্যান অন্ধকারে ব্যাট চালাল এবং ফসকাল। সেকেন্ড শ্লিপের পেটে লেগে বলটা জমে গেল। ননীদা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ম্যাচ ড্র।"

রূপোলির ব্যাটসম্যান প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, বল ডেলিভারির মাঝে যদি খেলা শেষ করা না যায়, তা হলে ওভারের মাঝেও খেলা শেষ করা যাবে না। শুরু হল তর্কাতর্কি। বিষ্টুকে আরও পাঁচটা বল করে ওভার শেষ করতে হলে, জেতার জন্য রূপোলি একটা রান করে ফেলবেই—বাই, লেগবাই, ওয়াইড যেভাবেই হোক। কিন্তু ননীদাকে দমানো সহজ কথা নয়। ফস্ করে তিনি আলোর অভাবের আপিল করে বসলেন। চটপট মঞ্জুর হয়ে গেল।

আমার ধারণা, মোনাদা কিছুটা রং ফলিয়ে আমাকে গল্পটা বলেছেন। আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তগুলো, ফ্রেন্ডলি ম্যাচে হলেও, সঠিক হয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ননীদাকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জানে, তারা কেউ এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে খুব বেশি প্রশ্ন তুলবে না।

৬

তন্ময়ের অনুপস্থিতি আমাকে ব্যস্ত করে তুলল।

ঠিকানা জোগাড় করে তন্ময়ের বাড়ি হাজির হলাম। সরু গলি। আধা-বস্তি অঞ্চল। নম্বর অনুযায়ী কড়া নাড়তে এক প্রৌঢ়া দরজা খুললেন। তাঁর চেহারা ও বেশে দারিদ্র্যের তকমা আঁটা কিন্তু কথায় ও আচরণে প্রাক্তন আভিজাত্যের ছাপ। উনি তন্ময়ের মা।

"তমু তো দু' দিন হল বাড়ি নেই। বর্ধমানের কোথায় যেন ফুটবল খেলতে গেছে।"

গ্রামাঞ্চলে শীতকালেই ফুটবল টুর্নামেন্টগুলো হয়। কলকাতার ফার্স্ট ডিভিসন ফুটবলারদের তখন ভাড়া পাওয়া যায়। তা ছাড়া, ধান ওঠার পর অবসর ও অর্থ দুই-ই তখন হাতে আসে। এক-একটা গ্রামের ফুটবল টিমে কলকাতারই এগারোজনকে দেখা যায়। এই রকমই কোনও টিমের হয়ে তন্ময় ভাড়া খেলতে গেছে। আমার ঠিকানা দিয়ে বললাম, "তন্ময় ফিরলেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।"

দু'দিন পরই তন্ময় আমার বাড়িতে এল।

"হল না, মতিদা! পরপর দুটো জায়গায় সেমিফাইনাল আর ফাইনাল খেললুম। দুটোতেই ডিফিট, মোট একশো কুড়ি টাকা পাওয়ার কথা—পেলুম পঞ্চান্ন।"

"ফুটবল খেললে ক্রিকেটের বারোটা বাজবে!" ক্ষুণ্ণস্বরে বললাম, "কখন চোট লাগবে কে বলতে পারে!"

তন্ময় হাসল। বলল, "বাঁ-কাঁধটা নাড়তে কষ্ট হচ্ছে, ব্যাকটা এমন ঝাঁপিয়ে পড়ল।" তারপরই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি জানি কেন দেখা করতে বলেছেন। দুটো সেঞ্চুরির জন্য দুটো ব্যাট আমার পাওনা হয়েছে। না পেলে আমি যাব না আর।"

"কিন্তু আমাদের ক্লাব গরিব, কুড়িয়ে বাড়িয়ে কোনওক্রমে টিকে আছে। তুমি এ দিকটা নিশ্চয় বিবেচনা করবে।"

"আমিও গরিব। কুড়িয়ে বাড়িয়েই চলে আমাদের সাত জনের সংসার। বাবার যা রোজগার তাতে টেনেটুনে পনেরো দিনের বেশি চলে না। আমি বড় ছেলে, প্রি-ইউ পাশ, মাঝে মাঝে ফুটবল খেলার কয়েকটা টাকা বাড়িতে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই সাহায্য করতে পারি না। ব্যাট দুটো পেলে বিক্রি করে কিছু টাকা মাকে দিতে পারব। ক্লাব যদি ব্যাটের বদলে তার দামটা দেয় তা হলে আমি যাব। আমার এখন একটা চাকরি ভীষণ দরকার।"

"চাকরি বা টাকা, কোনওটা দেওয়াই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

"তা হলে আমার পক্ষেও খেলা সম্ভব নয়।"

কথাটা ননীদাকে জানালাম।

বললাম, "রূপোলির কাছে গত দশ বছর আমরা হারিনি। ভবানী জানিয়েছে, পুরী বেড়াতে যাচ্ছে, তাই খেলতে পারবে না, বিষ্টুর পেটের গোলমাল, কাল থেকে অফিসে যাচ্ছে না। কাকে নিয়ে তা হলে খেলব?"

শুনে ননীদা শুকনো হেসে বললেন, "আচ্ছা, ব্যাটের টাকা জোগাড় করছি।"

রূপোলি সঙ্ঘের সঙ্গে খেলার দিন তন্ময়কে কিটব্যাগ হাতে হাজির হতে দেখে অবাক হলাম। ননীদা কোন ননীটিক্‌স্ প্রয়োগ করে ওকে হাজির করালেন, সেটা জানার জন্য ননীদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "টাকা পেলেন কোথায়?"

"কীসের টাকা?"

"ব্যাটের দাম না পেয়েই তন্ময় এল?"

"ওহ্!" ননীদা হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে কী যেন মনে করতে চেষ্টা করলেন, তারপরই যেন মনে পড়ল।

"পিচটা দেখেছ কি? দুর্যোধনকে বলেছিলুম আজ যেন একদম জল না দেয়। ওদের একটা ভাল স্পিনার আছে..." বলতে বলতে ননীদা মাঠের দিকে প্রায় দৌড়লেন।

তন্ময়কে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আজ সকালে ননীদা একশো টাকা ওকে দিয়ে এসেছেন। আরও তিরিশ টাকা দেবেন ও-মাসে। ননীদা এবং ক্লাব দুয়েরই অবস্থা জানি, তাই বিস্মিত হয়ে যখন ভাবছি, টাকাটা এল কোত্থেকে, তখন একগাল হেসে চিতু প্যাভেলিয়ানে ঢুকল। দু-চারটে কথা হবার পরই চিতু বলল, "হ্যাঁরে, তোদের ক্লাবে একটা ছেলে নাকি দারুণ ব্যাট করছে? আজ খেলবে নাকি?"

আমি ঘাড় নাড়লাম। ও বলল, "দেখতে হবে তো কেমন খেলে!"

রূপোলি ১৬৭ রান করল। অবিশ্বাস্য দুটো ক্যাচ ধরল তন্ময়, যার ফলে রূপোলির দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান ৪ রানেই আউট হয়। এরপর ওদের থার্ড উইকেট পার্টনারশিপে ৫১ রান উঠতে তন্ময় স্লিপ থেকে স্কোয়ার লেগে ছুটে গিয়ে বল ধরে সোজা উইকেটে মেরে রানআউট করল। ফোর্থ উইকেটে চিতু এল এবং এলোপাথাড়ি পিটিয়ে একাই ৪৭ রান করল। বোল্ড হয়ে চলে যাবার সময় একগাল হেসে আমায় বলল, "কোদাল চালিয়েই তোদের কবর খুঁড়ব।"

তন্ময় অবশ্য তা হতে দিল না। দেখে দেখে অত্যন্ত সাবধানে এবং ধীরে খুটখাট করে খেলে দেড় ঘণ্টায় পঞ্চাশ করল। সাধারণত এত মন্থর ও খেলে না। আমাদের প্রথম চারটে উইকেট ২৩ রানেই পড়ে যায়। কিন্তু সেজন্য এত সময় ব্যয় করে তন্ময় খেলবে ভাবিনি। ৫০ থেকে ৫১ করতে ওর দশ মিনিট লাগল। ৬০-এ পৌঁছতে আরও আধ ঘণ্টা।

সি সি এইচ যখন ৫ উইকেটে ১০৭, তখন আমি নামলাম। খেলার আর বাকি আধ ঘণ্টা। তন্ময়ের রান ৭৫। আমরা যে হারব না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেছি। রূপোলিও বুঝে গেছে তারা জিতছে না।

চিতু একসময় আমায় বলল, "ছোকরা আজ তোদের অনেক টাকা খসাবে।"

বলেই চিতু পিটপিট করে হাসল। আমি বললাম, "কেন। টাকা খসাবে মানে?"

"সেঞ্চুরি করবে। করলেই নতুন ব্যাট সি সি এইচ-কে দিতে হবে। এবার আমি বল নোব, তিনটে লং হপ আর তিনটে ফুলটস, ব্যস, তোর ননীদার পাঁজর খুলে যাবে।"

ননীদা মানেই সি সি এইচ। চিতুর দুষ্টু বুদ্ধি যে হাটখোলার সঙ্গে এতদূর পর্যন্ত খেলবে কল্পনা করিনি। তন্ময় এখন ৮৫। খেলা শেষ হতে পনেরো মিনিট বাকি। চিতু ওকে এক ওভারেই পনেরো রান দিয়ে দেবে। তা হলেই হাটখোলার একশো টাকা খরচ। উপায়? ক্লাবের যা অবস্থা, একটা ব্যাট কিনতে হলে এই সিজনে আর পুরো ফিক্সচার খেলা যাবে না। তন্ময় সেঞ্চুরি করলে তার নিজের নাম বাড়বে কিন্তু ক্লাবের কোনও উপকার হবে না। একমাত্র ক্ষতি ছাড়া। তা হলে উপায়?

ওভার শেষ হল। আমি এবার স্ট্রাইকার। তন্ময় এগিয়ে এসে বলল, "মতিদা, সময় তো খুবই কম, আপনি একটা রান নিয়ে এদিকে চলে আসুন।"

ওর কথাটা শোনামাত্র হঠাৎ আমার মাথায় সি সি এইচ-এর লোকসান বাঁচানোর স্ট্র্যাটেজি খেলে গেল। আমি বললাম, "আমি কল্ দিলেই বেরোবে, রেডি থেকো।"

প্রথম বলটা পেলাম অফ স্টাম্পের উপর হাফ ভলি। চমৎকার অফ ড্রাইভ করতে পারতাম। না করে, বোলারের কাছে ঠেলে দিলাম, তন্ময় কিছুটা বেরিয়ে এসেছিল রানের আশায়। হাত নেড়ে ওকে ফিরে যেতে বললাম।

দ্বিতীয় বলটা একই রকমের। এবার ড্রাইভ করলাম বেশ জোরে। বল ধরার জন্য বোলার হাত পেতেই তুলে নিল। এক্সট্রা কভার থেকে ফিল্ডার ছুটে যাচ্ছে, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে থাকলাম। তন্ময় বেরিয়ে এসে পিচের মাঝ বরাবর পৌঁছে চেঁচাচ্ছে, "মতিদা, রান, রান।"

ফিল্ডার বল ধরে বোলারের উইকেটে ছুড়েছে, তখন আমি চেঁচিয়ে বললাম, "নো নো, গো ব্যাক, গো ব্যাক।"

তন্ময় ঘুরে আবার উইকেটে পৌঁছবার আগেই চিৎকার উঠল—"হাউজা।" আম্পায়ার স্বচ্ছন্দে হাত তুলে দিল। আমি মনে মনে কেমন একটা আরাম পেলাম। সি সি এইচ-এর বেশ কিছু টাকা বাঁচল। তন্ময় আমার দিকে তাকাতে তাকাতে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল। আমি এবার চিতুর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। মনে হল, ও যেন দাঁত কিড়মিড় করল।

খেলা ড্র হল। মাঠ থেকে আসতেই ননীদা বললেন, "এটা কী করলে তুমি—"

ননীদাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আর একটা ব্যাট কিনে দেবার ক্ষমতা কি হাটখোলার আছে?"

ননীদা সেকেন্ড দশেক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ভেরি গুড স্ট্র্যাটেজি।"

হেসে মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে দেখলাম চিতু হাত নেড়ে তন্ময়কে কী বলছে আর তন্ময়ের মুখ থমথমে হয়ে উঠছে। বুঝলাম, চিতুর দুষ্টবুদ্ধি এখনও খেলা করছে।

দুই দলের খেলোয়াড়রা যখন চা খাচ্ছে তন্ময় হঠাৎ সকলকে শুনিয়েই আমাকে বলল, "ব্যাট আমার চাই না, কিন্তু সেঞ্চুরিটা হতে দিলেন না কেন?"

"তার মানে?" আমি বললাম, "কে তোমার সেঞ্চুরি হতে দেয়নি?"

"আপনি। ইচ্ছে করে রানআউট করালেন, অতি সহজ রান ছিল। কিন্তু একটা ব্যাট দেবার ভয়ে এই নীচতা আপনি করলেন।"

তন্ময় এরপর অকথ্য ভাষায় কয়েকটা কথা বলল, যাতে রূপোলির ছেলেরাও না শোনার ভাণ করতে বাধ্য হল। অপমানে মুখ কালো করে আমি আর ননীদা চুপ করে রইলাম। চিতু ফিসফিস করে কানের কাছে বলল, "কী রে, ননীদাকে যে ঘোল করে ছেড়ে দিল। ছেলেটাকে সামনের বছরই রূপোলিতে নিয়ে নেব।"

আমি তখন জ্বলছি। জবাব দিলাম না।

৭

পরের ম্যাচ স্টার স্পোর্টিং-এর সঙ্গে। হাটখোলার ক্যাপ্টেন ভবানী। পুরী যাওয়া বন্ধ করেছে ভবানী এই জন্য। আমি মাঠে এসেছি দর্শক হিসেবে। বলা বাহুল্য, একটা চেয়ারে মিনুকে দেখতে পেলাম। তন্ময়কে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তার অভব্যতার জন্য।

পরশুদিন রাতে ননীদা আমার বাড়িতে এসে অনুরোধ করেন, "মতি, এই ম্যাচটায় তুমি বসে যাও।"

"কেন?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

"টাকার দরকার। ব্যাটটা কিনে দেব তন্ময়কে। নয়তো সি সি এইচ-এর মান থাকবে না। ভবানী বলেছে সে একশো টাকা দেবে যদি সামনের ম্যাচে ক্যাপ্টেনসি

করতে দেওয়া হয়! তুমি তো বোঝই কী ভাবে ক্লাব—"

ননীদা অসহায়ভাবে থেমে গেলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাই। তারপর কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "আগের দুটো ব্যাটের জন্য একশো টাকা তন্ময়কে কী ভাবে দিলেন?" ননীদা প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন অন্য কথা তুলে। চেপে ধরতে বলে ফেললেন, "তোমার বউদির একজোড়া কানপাশা ছিল, বিক্রি করলাম।" নিঃসন্তান ননীদার স্ত্রী বছর দশেক আগে মারা গেছেন।

ভবানী যথারীতি হাঁকডাক করে দারুণ ব্যস্ত ভাবে টেন্ট আর মাঠ করছে। মাঝে মাঝে মিনুর কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে।

"কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না। ওয়ান ডাউন রাজেন বলছে সিক্স ডাউন খেলবে।"

"কেন?" মিনু বলল।

"ভয় পেয়েছে। স্টারের একটা ফাস্ট বোলার আছে, দারুণ পেস।"

"তা হলে তুমি নামো ওয়ান ডাউন।"

"আমি?" ভবানী একটু যেন ঘাবড়ে গেল। "আমি তো রেগুলার সিক্স ডাউন নামি।"

"আজ তা হলে ওঠো।"

"ইন-কেস যদি কোল্যাপস্ করে তা হলে কে আটকাবে? ভেরি ইমপরট্যান্ট এটা, তুমি ঠিক বুঝবে না, কতবার এরকম হয়েছে, শেষে আমি গিয়ে ঠেকাই।" বলতে বলতে ভবানীর খেয়াল হয়, আমি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি। চুপ করে গেল সে।

ভবানী ওয়ান ডাউনেই নামল এবং হাটখোলা পনেরো মিনিটেই পাঁচ উইকেটে ১১ রান হল। ভবানী তার মধ্যে এক রান করে নট আউট। স্টারের ফাস্ট বোলারটি একাই উইকেট পাঁচটি নিল। কিন্তু ভবানী সত্যিই আজ পরাক্রান্ত, দুর্ভেদ্য। একবারও কোনও সুযোগ দেয়নি, যেমন বল তেমন খেলছে। সত্যিই অধিনায়কোচিত খেলা। ছয় উইকেটে ১৮, ভবানী তখনও এক রানে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে ক্রিজ থেকে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। মিনু তার রুমালটা তখন নাড়ায়, তাই দেখে ভবানী দ্বিগুণ উদ্যমে লড়াই শুরু করে।

সাত উইকেটে ৩২ হল। ভবানী তিন রান করেছে। মিনু এই সময় প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "আমরা কি হেরে যাব?"

স্কোরবোর্ড দেখে আমারও মুখ শুকিয়ে এল। বললাম, "ক্রিকেটে কিছুই বলা যায় না। হয়তো ভবানী এখন একটা সেঞ্চুরি করে ফেলতে পারে।"

"ও কিন্তু দারুণ খেলছে!" মিনু বলল।

"অসাধারণ! কী অথরিটি নিয়ে স্ট্রোক দিচ্ছে, মনেই হচ্ছে না সাতটা উইকেট পড়েছে।" আমি যথাসাধ্য ভবানীর প্রশংসা করলাম।

কথা শেষ করেছি আর ভবানী একটা ছয় মারল। আমরা হইহই করে উঠলাম, মিনু রুমাল নাড়ল। এর পর ভবানীর উপর যেন দৈব ভর করল। পরের তিন ওভারে সে ৫২ রানে পৌঁছল। হাটখোলার সাত উইকেটে ৮৬। পরের দু' ওভারে ভবানী করল আরও ২৯ রান, অর্থাৎ ৮১ হল। এর পর দুটো উইকেট পড়ল ১২ রান যোগ করে।

এখন হাটখোলার ৯ উইকেটে ১২৭ রান। শেষ ব্যাটসম্যান নামতেই মিনু উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, "ওর কি সেঞ্চুরি হবে না?"

বললাম, "ক্রিকেটে কিছুই বলা যায় না।"

এবং শেষ পর্যন্ত হল না। ভবানী তার ৯৭ রানের মাথায় তাড়াহুড়ো করে রান নিতে যাওয়ায় এগারো নম্বর রান আউট হয়ে গেল। মিনু রুমালে চোখ মুছতে শুরু করল।

ভবানী ফিরে এসে দার্শনিকের মতো বলল, "ক্রিকেট আর জীবন একই রকম।"

মিনু বলল, "পরের বার ঠিক সেঞ্চুরি হবে, আমি বলছি হবে। যদি না হয় তো—"

পরের ম্যাচ সত্যসন্ধির সঙ্গে। ভবানী প্রথম বলেই বোলড্ হয়ে গেল। এবারও আমি মাঠের বাইরে দর্শক। মিনু চোখে রুমাল চেপে ধরেছে। ভবানী ফিরে এসে বলল, "ক্রিকেটের সঙ্গে জীবনের কতটুকুই বা সম্পর্ক!"

দুটি ম্যাচেই সি সি এইচ হেরে গেছে। ভবানী জানিয়েছে, আর সে অধিনায়ক হতে চায় না, প্রয়োজনও নেই। পরের ম্যাচ পাইকপাড়া স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে। ভবানী পুরী চলে গেছে, তন্ময় আর আসে না, টিমের আরও দু'জন পরীক্ষার জন্য খেলতে আসে না। দুটো বাচ্চা ছেলে ওদের বদলে খেলল এবং হারতে হারতে আমরা ড্র করলাম।

এখন আমরা লিগ টেবিলের মাঝামাঝি কয়েকটা ক্লাবের সঙ্গে সমান পয়েন্ট। উপরের প্রথম তিনটি ক্লাবের পয়েন্টও সমান-সমান। তার মধ্যে রূপোলিও আছে। ওদের সঙ্গে সি সি এইচ-এর তফাত মাত্র দুই পয়েন্টের। লড়তে পারলে আমরা এখনও চ্যাম্পিয়ন হতে পারি।

ননীদার ইচ্ছা নয় চ্যাম্পিয়ানশিপ লড়াইয়ে। ফার্স্ট ডিভিশনে উঠলে তো ক্লাবের খরচ বেড়ে যাবে। এখনই আমরা পাঁউরুটি আর আলুর দম দিয়ে লাঞ্চ শুরু করেছি। প্লেয়াররা রীতিমতো অসন্তুষ্ট। আমি কিন্তু চ্যাম্পিয়ানশিপ ফাইট করারই পক্ষে। ফার্স্ট ডিভিশনে যে করেই হোক একবার উঠতেই হবে। পরের বছরই নয় নেমে যাব, তবু তো বলতে পারব, আমার অধিনায়কত্বে সি সি এইচ একবার ফার্স্ট ডিভিশনে উঠেছিল। প্লেয়ারদের ক'দিন ধরেই তাতাচ্ছি ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার ইজ্জতের লোভ দেখিয়ে।

ক'দিন ধরে ননীদা মাঠে আসছেন না। একটা ম্যাচ খেলা হয়ে গেল ননীদার উপস্থিতি ছাড়াই। আমরা জিতলাম শুধু ফিল্ডিং-এর জোরে। বেলেঘাটা স্পোর্টিং-এর কাছে আচমকা রূপোলি সঙ্ঘ এক উইকেটে হেরে আমাদের সমান হয়ে গেল। হঠাৎ আমার তন্ময়কে মনে পড়ল। এই সময় ও যদি থাকত, তা হলে বাকি ম্যাচ ক'টা বোধ হয় জিততে পারব, এই রকম একটা ধারণা আমার মনে উঁকি দিতে লাগল। ভাবলাম ননীদাকে বলি, যদি দরকার হয় তন্ময়কে বাকি ক'টা ম্যাচ খেলবার জন্য ডেকে আনি। কিল খেয়ে অনেক সময় কিল চুরি করতেই হয়। তা ছাড়া, অপরাধী তো আমিই। ওকে ইচ্ছে করে রান আউট করে দেওয়ার পর থেকেই আমার মনে খচখচ করে একটা কাঁটা বিঁধছে। সেটা উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত স্বস্তি পাব না।

বলামাত্র ননীদা তেলে-বেগুনে হয়ে উঠলেন।

"তোমার লজ্জা করে না, মতি? যেভাবে, যে ভাষায় বাইরের টিমের সামনে আমাদের অপমান করেছে, তারপরও তুমি ওকে আনতে চাও? কী আছে ওর খেলায়, য়্যাঁ? কী আছে? নেমেই দুমদাম ব্যাট চালায়, বরাতজোরে ব্যাটে-বলে হয়ে গেছে তাই রান পেয়েছে। একটু বুদ্ধিমান বোলারের পাল্লায় পড়লে তিন বলে ওকে তুলে নিয়ে যাবে। ক্রিকেট অত সোজা ব্যাপার নয়, এটা ফুটবল নয় যে গোল খেলেও গোল শোধ দেওয়ার সুযোগ পাবে। প্রত্যেকটা বলের ওপর ব্যাটসম্যানের বাঁচা-মরা নির্ভর করে, একটা ভুল করেছ কি তোমার মৃত্যু ঘটে যাবে। কী ভীষণ ডিসিপ্লিনড্ হতে হয়, কী দারুণ কনসেনট্রেশন দরকার হয় বড় ব্যাটসম্যান হতে গেলে। তোমার ওই তন্ময়ের মধ্যে তা কি আছে?"

আমি চুপ করে ননীদার উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই লোকটিই, মাসখানেক আগে যার ব্যাটিং দেখে উচ্ছ্বসিত হতেন, আজ তাকে ব্যাটসম্যান বলতে রাজি নন! ননীদা একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "খেলাটাই বড় কথা, টাকাই সব কিছু নয়।"

"কিন্তু ননীদা, টাকা অত্যন্ত দরকারি জিনিস। প্লেয়ারের বেঁচে থাকার জন্য এটা প্রথমেই দরকার। এখানে টাকা না পেলে তন্ময় ফুটবলে চলে যাবে। ছেলেটা ফুটবলও ভাল খেলে।"

"তাই খেলুক। যে ক্রিকেট ভালবাসে সে অন্য খেলা খেলবে কেন?"

আমি চুপ করে রইলাম।

বাড়িতে ফিরে দেখি তন্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রথমেই বলল, "মতিদা, আমি খেলব।"

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, "হঠাৎ যে!"

ও ইতস্তত করল কিছু বলার জন্য। মাথা নামিয়ে রইল। আমি আবার বললাম, "খেলবে, সে তো ভাল কথা, কিন্তু আর আসবে না বলে আবার নিজে থেকেই এসে খেলতে চাইছ, ব্যাপার কী?"

তন্ময় বলল, "আমার একটা চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কে। ওরা ক্রিকেট টিম করে লিগে সামনের বছর খেলবে। প্রায় তিনশো টাকা মাইনে। ক্রিকেট সেক্রেটারি আর ডেপুটি ম্যানেজার আমার খেলা দেখতে চায়।"

"চাকরি দেবে তো? অনেক সময় দেব বলে খেলিয়ে নিয়ে আর চাকরি দেয় না।"

"তা জানি না। তবে যদি দেয়, একটা চান্স নিয়ে তো দেখি। ওদের ফুটবল টিম অফিস লিগে খেলে। সেখানেও আমাকে খেলাতে পারবে। চাকরি সত্যিই আমার দরকার। সংসার প্রায় অচল হয়ে এসেছে।"

"তা হলে সামনের রোববার খেলো। একটা ক্রুশিয়াল ম্যাচ রয়েছে কসবা ভ্রাতৃসঙ্ঘের সঙ্গে। যদি জিততে পারি তা হলে ফ্রেন্ডস্ স্পোর্টিং আর আমরা সমান পয়েন্ট হয়ে লিগ-টেবলের টপে চলে যাব। রূপোলি তা হলে দু' পয়েন্ট পিছিয়ে যাবে আমাদের থেকে।" বলতে বলতে আমার হাসি পেল। রূপোলি সঙ্ঘ আমাদের

পিছনে থাকবে এটাই বড় কথা, লিগ চ্যাম্পিয়ান হই বা না হই—এই মনোভাব দেখছি আমার মধ্যেও বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

তন্ময় বলল, "ননীদা কোনও আপত্তি করবেন না তো?"

"করে যদি তো কী হবে? আমি ক্যাপ্টেন, আমি যাকে খেলাব সেই খেলবে। কেউ আপত্তি করলেও শুনব না।"

৮

ননীদা কিন্তু আপত্তি করলেন না তন্ময়কে দেখে। রবিবার আমাদের মাঠেই ভ্রাতৃসঙ্ঘের সঙ্গে খেলা। সাতজন মাত্র আমাদের প্লেয়ার হাজির হয়েছে। শুকনো মুখে আমি আর ননীদা তাঁবুর মধ্যে যাচ্ছি আর ফিরে আসছি। খেলার কুড়ি মিনিট মাত্র তখন বাকি। এমন সময় তন্ময় এসে পৌঁছল। ননীদা কপাল এবং ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, "তন্ময় আজ খেলবে।"

"আমি তো জানতাম না! টিমে তো ওর নাম দেখছি না?"

"আপনাকে বলতে ভুলে গেছি আজ তন্ময় খেলছে। টিমের কাউকে বসিয়ে দিয়ে ওকে খেলালেই হবে।" আসলে আমি ইচ্ছে করেই আগে বলিনি। ননীদা যদি বাগড়া দেন এই ভয়ে।

"টিমে যে আছে তাকে বিনা দোষে বসানো উচিত নয়।" এই বলে ননীদা আবার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তন্ময়কে না খেলিয়ে উপায় ছিল না। চারজন খেলোয়াড় আর এলই না। লিগের শেষ দিকে এই রকমই অবস্থা হয় আমাদের ক্লাবে।

ননীদাকে বাইরে এসে ধরলাম। "তন্ময়কে আজ খেলাতে চাই কেন জানেন, শুধু আমাদের দরকারেই নয়, ওরও দরকার! একটা চাকরি পাবার কথা হচ্ছে। সেক্রেটারি আজ খেলা দেখতে আসবে ওর। যদি শো করাতে পারে তা হলে চাকরিটা হয়েও যেতে পারে।"

"কাউকে চাকরি করে দেবার জন্য তো আমরা লিগ খেলি না।"

"কিন্তু খেলে যদি কেউ চাকরি পায়ই তাকে আমাদের সাহায্য করা উচিত নয় কি? ননীদা, আপনি বউদির গহনা বিক্রি করেও ওকে ব্যাটের টাকা দিয়েছিলেন কেন?"

"ক্লাবকে অপমান থেকে বাঁচাতে।"

"মোটেই নয়, আপনি বলেছিলেন ছেলেটা আর্টিস্ট। ওর ক্রিকেট আর্টে মুগ্ধ হয়ে পুরস্কার দিয়েছিলেন।"

"সেজন্য আমি দুঃখিত। বিনা পরিশ্রমে আর্টিস্ট হওয়া যায় না। এ ছেলেটা ফাঁকিবাজ।" ননীদা আর কথা না বলে যথারীতি দুর্যোধনের খোঁজে চলে গেলেন।

তন্ময়কে নিয়ে আটজন। অবশেষে ননীদাকেও নামতে হল। একটা বাড়তি ট্রাউজার্স আমার ব্যাগে থাকেই। সেটা পরলেন। ঝুলে বড়, কোমরে ছোট, ঘের অর্ধেক। কেডস্ জোগাড় হল। সাদা পাঞ্জাবিটা ট্রাউজার্সে গুঁজে নিলেন। আমরা টসে

জিতে ন'জনে ফিল্ড করতে নামলাম।

ননীদা স্লিপে প্রথম দু' ওভারে তিনটি ক্যাচ ফেললেন। তা সত্বেও ভ্রাতৃসঙ্ঘ সুবিধা করতে পারল না, আমাদের নতুন মিডিয়াম পেসার ছেলেটির বলে। তিন উইকেটে ৭৪ থেকে সবাই আউট হল ৯৬ এ।

ননীদা বললে, "আমাকে উপরাদিকে ব্যাট করতে পাঠিও না, মাঝামাঝি রেখো।"

তন্ময় একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। সে আমার দিকে হাত তুলে ছুটে এল। "মতিদা, ওরা এসেছে।"

"তা হলে ওয়ার্ম আপ করে যাও।"

"না না, আর একটু তলায় দিন।"

তন্ময়কে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে। নিজের উপর যেন আস্থা রাখতে পারছে না। বললাম, "খেলা যদি দেখাতে চাও তা হলে তলার দিকে ব্যাট করে লাভ কী হবে। যদি সবাই আউট হয়ে যায়, তুমি শুধু নট আউটই থাকবে । কিন্তু ওরা এসেছে তোমার স্কোর দেখতে।"

আমাদের দুটি উইকেটে ২২, তন্ময় নামল। নেমেই প্রথম বলে এক্সট্রা কভারে চার। হাঁফ ছাড়লাম আমি অপর উইকেটে দাঁড়িয়ে। এরকম কতকগুলো মার মারতে পারলে কনফিডেন্স পাবে। ৩২ রানের মাথায় আমি স্ট্যাম্পড হলাম ভ্রাতৃসঙ্ঘের অফস্পিনারের বল হাঁকড়াতে গিয়ে। এরপরই তন্ময়ের খেলা কেমন যেন গুটিয়ে গেল। ১১ রান করে ও আর ব্যাট তুলতেই চায় না। আধ ঘণ্টা কোনও রান করল না।

ননীদা হঠাৎ আমায় বললেন, "ব্যাটিং অর্ডারটা একটু বদলাও, এরপর আমি ব্যাট করতে যাব।"

আমার মনে একটা খারাপ চিন্তা এল।

তন্ময় যে অপমান করেছে তার চমৎকার শোধ ননীদা এখন নিতে পারেন। ওর চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনার দফা রফা হয়ে যাবে, ঠিক যে ভাবে আমি ওর ব্যাট পাওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করেছিলাম। ননীদা এখন মাঠে নেমে যদি তন্ময়কে রান আউট করে দেন? বললাম, "ননীদা, আমাদের তো দুজন কম। আপনি যদি ফাইভ কি সিক্স ডাউন যান তা হলে ভাল হয়। শেষদিকে আটকাবার কেউ নেই।"

কী ভেবে ননীদা বললেন, "আচ্ছা।"

পরপর আমাদের দুটো উইকেট পড়ল ৪৬ ও ৪৯ রানে। ননীদা খুব মন দিয়ে খেলা দেখছেন। একবার আমাকে বললেন, "অফস্পিনারটা ভাল ফ্লাইট করাচ্ছে। তন্ময়টা বোকার মতো খেলছে, এখুনি শর্ট লেগে ক্যাচ দেবে।"

হঠাৎ চিতুকে দেখি আমাদের স্কোরারের পিছনে দাঁড়িয়ে স্কোর বুকে উঁকি দিচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, "পাঁচ উইকেটে উনপঞ্চাশ, পারবি না তোরা। হাতে আছে তিন উইকেট। সাতচল্লিশ তুললে তবেই জিত। পারবি না, হেরে যাবি।" বলে চিতু হাসতে লাগল।

"তোর খেলা নেই আজ?"

"হচ্ছে, গ্রিয়ার মাঠে। আমরা ব্যাট করছি। আমি আউট। ভাবলাম, দেখে আসি এ

মাঠে নামা হচ্ছে! আমরা প্রায় জিতে গেছি। তোদের তো শোচনীয় ব্যাপার।"

মাঠে একটা হায় হায় শব্দ উঠল। তন্ময়ের সহজ ক্যাচ শর্ট লেগ ফেলে দিয়েছে। তন্ময়ের মুখ পাংশু। পঞ্চাশ মিনিট খেলে করেছে ১৮ রান।

"ব্যাপার কী? তন্ময় যে আজ এমন করে খেলছে?" ননীদা প্যাড পরতে পরতে আমায় বললেন।

"যাদের আসার কথা তারা খেলা দেখতে এসে গেছে। তাই নার্ভাস হয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে।"

"সেলফিশ! নিজের জন্য খেলছে, টিমের জন্য খেলছে না!" গম্ভীর হয়ে ননীদা বললেন আর তখনি ৫৭ রানের মাথায় আউট হল ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান। অফস্পিনারের পঞ্চম শিকার।

"তোদের হয়ে গেল!" চিতু চেঁচিয়ে বলল, ননীদা মাথা নিচু করে গ্লাভস পরছিলেন। চিতুর দিকে তাকালেন।

"কী হয়ে গেল?" ননীদা গম্ভীর স্বরে চিতুকে প্রশ্ন করলেন।

"ম্যাচ হয়ে গেল।"

"আজও তুমি ক্রিকেটের 'ক' বুঝলে না। একটা কুলিই রয়ে গেলে।"

চিতুর রাগী মুখটা দেখার জন্য ননীদা আর অপেক্ষা করলেন না।

উইকেটে পৌঁছে তন্ময়কে ননীদা কী যেন বললেন, অফস্পিনারটি বল করছে। ননীদা প্রত্যেকটা বলে পা বাড়িয়ে ব্যাটটা শেষ মুহূর্তে তুলে নিয়ে প্যাডে লাগাতে লাগলেন। ওদিকে হঠাৎ তন্ময় পরপর দুটো স্ট্রেট ড্রাইভ থেকে আট রান নিল।

ননীদার দিকে রয়েছে অফস্পিন বোলারটি। ওকে একটার পর একটা মেডেন দিয়ে যেতে লাগলেন ননীদা। কিন্তু তন্ময়কে এদিকের উইকেটে খেলতে দিচ্ছেন না। দু-একবার রান নেবার জন্য তন্ময় ছুটে এসেছে, ননীদা চিৎকার করে বারণ করেছেন।

নিজের ৪৮ রানে পৌঁছে তন্ময় গ্লান্স করেই দৌড়ল দুটি রান নিয়ে হাফ-সেঞ্চুরি পূর্ণ করবে বলে। দৌড়বার আগে লক্ষই করেনি শর্ট স্কোয়ার লেগ বল থেকে কতটা দূরে। তন্ময় যখন পিচের মাঝামাঝি, ননীদা ওকে ফেরত যাবার জন্য চিৎকার করছেন। তন্ময় ফিরে তাকিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। আর কিছু করার নেই তার। স্কোয়ার লেগের ছোড়া বল উইকেটকিপার ধরেছে। তন্ময় চোখ বন্ধ করে ফেলল।

"হাউজ্যাট?" চিৎকারে অন্য মাঠের লোকও ফিরে তাকাল। তন্ময় আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখল ননীদা হাসছেন। তারপর মাথাটা কাত করে রওনা হলেন। তন্ময় চোখ বুজিয়ে থাকায় দেখতে পায়নি, ননীদা কখন যেন ছুটে তাকে অতিক্রম করে নিজে রান আউট হলেন।

ননীদা প্যাড খুলছেন। বললাম, "কী ব্যাপার?"

বললেন, "ক্রিকেটে অসাবধান হলেও যেমন মৃত্যু আছে, তেমনি আত্মহত্যাও আছে। সেঞ্চুরি, ডাবল সেঞ্চুরি করে এখন আমার হবেটা কী? তার থেকে যার ভবিষ্যৎ আছে, সে খেলুক।"

পরের ওভারে তন্ময় দুটি ওভার বাউন্ডারি মারল। আমরা জিতে গেলাম। ওকে কাঁধে তুলে আনার জন্য আমরা মাঠে ছুটে গেলাম।

বহুক্ষণ পর, তাঁবু তখন প্রায় ফাঁকা। দুর্যোধন এসে আমায় বলল, "বাবু দেখিবারে আসো।"

ওর সঙ্গে তাঁবুর পিছনে গিয়ে দেখি, ফেন্সের ধারে তন্ময় ব্যাট নিয়ে একটা কাল্পনিক বলে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলে স্ট্যাচুর মতো হয়ে আছে। আর ননীদা পিছনে দাঁড়িয়ে।

"দ্যাখো, পা-টা কোথায়? বলের লাইনের কত বাইরে? কাল থেকে দু'শোবার রোজ স্যাডো প্র্যাকটিস করবে। দু'শোবার!"

স্ট্রাইকার



॥ ১ ॥

কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।

আমাদের গলিটা এঁকেবেঁকে তিনটে মোড় ঘুরে যেখানে বড় রাস্তায় পড়েছে, একটা বিরাট সাদা মোটর গাড়ি সেখানে এসে থামল। অত বড় গাড়ি আমাদের পাড়ার লোকেরা কখনও দ্যাখেনি। তাই তারা ভিড় করে গাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল কুচকুচে কালো এক মধ্যবয়সী বিদেশি। মুখে চুরুট, চোখে কালো চশমা, গাড়ির রঙের মতনই পরনে সাদা কোট ও ট্রাউজারস। চুল কাঁচা-পাকায় মেশা।

ভিড়ের দিকে তাকিয়ে, বিদেশি হাত নেড়ে পোর্তুগিজ ভাষায় কী বলল। আমার পাড়ার লোকেরা বাংলা এবং একটুআধটু ইংরেজি, হিন্দি আর ওড়িয়া ছাড়া কোনও ভাষা বোঝে না। তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকল। বিদেশি আবার কথা বলল। কথার ভঙ্গিতে বোঝা যায়, কিছু একটা জানতে চাইছে বা খোঁজ করছে।

ভিড় থেকে নুটুদা এগিয়ে গেলেন, "কেয়া মাঙ্‌তা, কী চাই?" তারপর মনে মনে কয়েকটা কথা তর্জমা করে বললেন, "হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?"

এবার বিদেশি পরিষ্কার বাংলায় বলল, "প্রসূন ভট্টাচার্য নামে একটি ছেলে কি এই রাস্তায় বাস করে?"

বিদেশির মুখে বাংলা শুনে ওরা থতমত হয়ে অবাক হল, ভরসাও পেল। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলে ভনভন করে বলে উঠল—প্রসূন? প্রসূন! প্রসূন!! কী দরকার? কেন এসেছে লোকটা?

"প্রসূন, মানে অনিল ভটচাজের বড় ছেলে?"

"হ্যাঁ, তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।" বিদেশি আশ্বস্ত হয়ে নুটুদাকে বলল। নুটুদা আমাদেরই পাশের ঘরের আর এক ভাড়াটে। ছাপাখানায় কমপোজিটরের কাজ করেন। বছর দুয়েক আগে ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন। সংসারে একমাত্র মেয়ে নীলিমা ছাড়া আর কেউ নেই। মানুষটি অতি সরল, সাদামাঠা। দোষের মধ্যে অযাচিত উপদেশ দেন; বারোয়ারি একটা কিছুর, রবীন্দ্রজয়ন্তী বা শীতলা পুজোর সুযোগ পেলেই চাঁদা তুলতে শুরু করেন। ছেলে-বুড়ো সবাই ওঁকে 'নুটুদা' বলে ডাকে। নীলিমা প্রায় আমারই বয়সী। ক্লাস টেন-এ পড়ে, সারা দিন পরিশ্রম করে ঘরে বাইরে। ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব।

নুটুদা সন্দিহান চোখে সেই বিদেশিকে বললেন, "প্রসূনের সঙ্গে কেন দেখা করবেন?"

বিদেশির চুরুটটা নিভে গেছিল। লাইটার জ্বেলে সেটা ধরাতে ধরাতে বলল, "আমি ব্রাজিল থেকে আসছি। স্যানটোস ফুটবল ক্লাবের নাম শুনেছেন বোধ হয়। আমি সেই ক্লাবের ম্যানেজার। প্রসূন যদি রাজি হয়, আমরা ওকে নেব।"

নুটুদা বললেন, "নেবেন মানে ?"

বিদেশি ব্যস্ত হয়ে বলল, "এজন্য নিশ্চয় টাকা দেবে আমার ক্লাব। বছরে একবার বাড়ি আসার প্লেন ভাড়াও।"

"কত টাকা দেবেন শুনি ?"

বিদেশি সতর্কভাবে বলল, "সেটা ওর বাবার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করব। প্রসূন তো এখনও নাবালক। আমরা সব খবর সংগ্রহ করেছি। ওর বয়স এখন সতেরো বছর চার মাস।"

নুটুদা বিদেশিকে নিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। পিছনে পাড়ার লোকের মিছিল। আমাদের বাড়িতে যেতে হলে আড়াই হাত চওড়া একটা মাটির গলিতে ঢুকতে হয়। একতলায় আমরা আর নুটুদারা ভাড়া থাকি দেড়খানা করে ঘর নিয়ে। দোতালায় থাকে বাড়িওয়ালা বিশ্বনাথ দত্ত। তার চার মেয়ে। দুজনের বিয়ে হয়ে গেছে।

বিশ্বনাথ বা বিশুবাবু বাড়ি থেকে তখন বের হচ্ছিলেন, হঠাৎ একজন বিদেশির পিছনে সারা পাড়ার লোককে গলিতে ঢুকতে দেখে ভড়কে গেলেন। তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে সেজো মেয়ে সোনামুখীকে পাঠিয়ে দিলেন। বিশুবাবুর পুলিশকে ভীষণ ভয়।

বাবা ঘরে চৌকিতে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মা রান্নাঘরে। আমরা দুই ভাই এক বোন। আমার পর পিন্টু, তার পর পুতুল। নুটুদা বাড়িতে ঢুকেই "অনিলবাবু ! অনিলবাবু !"—বলে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করলেন। বাবা গম্ভীর প্রকৃতির, অত্যন্ত কম কথা বলেন। অধিকাংশ দিন আমার সঙ্গে তো একটাও কথা হয় না। আমি ওঁকে এড়িয়ে চলি।

"অনিলবাবু, সন্তোষ ক্লাবের ম্যানেজার এসেছে !" নুটুদা উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছেন। "জানেন তো, পেলে ওই ক্লাবের প্লেয়ার !"

"কে পেলে ?" বাবা ভারী গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, "কোথায় বাড়ি ?"

নুটুদা থতমত হয়ে গেলেন। বিদেশি মৃদু হেসে এগিয়ে এসে বলল, "স্যানটোস ক্লাব ব্রাজিলে। স্যানটোস খুব নামকরা বন্দর, সেখান থেকে কফি চালান যায় সারা পৃথিবীতে। আমাদের ক্লাব পৃথিবীর সেরা ক্লাবগুলোর একটা। পেলে পৃথিবীর সেরা ফুটবলার। অত বড় গুণী প্লেয়ার এখনও দেখা যায়নি।"

বাবা পিছনের ভিড়ের উপর আলতোভাবে চোখ বুলিয়ে বললেন, "আমি ফুটবলের কোনও খবর রাখি না। আপনার কী প্রয়োজন, বলুন।"

"আপনার ছেলে প্রসূনকে আমাদের ক্লাবে খেলাতে চাই।"

"প্রসূনের সঙ্গে কথা বলুন। এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।" বাবা এই বলেই ঘরে ঢুকে গেলেন। বিদেশিও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল এবং পিছনে নুটুবাবু।

বিশুবাবু ইতিমধ্যে পুলিশ নয় জেনে এগিয়ে এসে আমাদের ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন।

বিদেশি বলল, "প্রসূন নাবালক, ও তো কনট্রাক্ট সই করতে পারবে না, ওর অভিভাবক হিসেবে আপনাকেই তা করতে হবে।"

"না। আমি ফুটবল খেলার কোনও কিছুতে সই করব না। আমি ছেলের সর্বনাশ করে তার অভিশাপ কুড়োতে চাই না।"

নুটুদা ফিসফিস করে বিদেশিকে বললেন, "অনিলবাবু এক সময়ে ফুটবল খেলতেন। কলকাতার সব থেকে বড় টিম 'যুগের যাত্রী'-র দুর্ধর্ষ লেফট-ইন ছিলেন। তার পর রোভারস খেলতে গিয়ে বাঁ হাঁটুতে চোট লাগল, খেলা ছেড়ে দিলেন।"

"কে বলেছে খেলা ছেড়ে দিই ?" বাবা হঠাৎ তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন, "খেলা আমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। সেই ইনজুরির কোনও চিকিৎসা হয়নি। আমার নিজের সাধ্য ছিল না, ক্লাবও ট্রিটমেন্ট-এর জন্য একটা পয়সা দেয়নি। ছেঁড়া কারটিলেজ নিয়ে আজও আমি চলছি। ক্লাব আমাকে সেই চোট নিয়েই জোর করে খেলাল। আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে। খেলা ভাঙার তিন মিনিট আগে, তখনও গোললেস। ওপেন নেট গোল আমার সামনে, তাজ মহম্মদ মাটিতে, ব্যোমকেশ বোস ছুটে আসছে, ঘটক গোল ছেড়ে বেরোবে কি না ঠিক করতে পারছে না, সারা মাঠ আকাশ কাঁপিয়ে গোলের জন্য চিৎকার করে উঠেছে, আর মাত্র ছ' গজ দূর থেকে আমি বাইরে মারলাম।"

উত্তেজিত হয়ে এত কথা বলে বাবা যেন লজ্জা পেলেন। মাথা নিচু করে বাঁ পা মেঝেতে ঘষড়ে ঘষড়ে তক্তপোশে গিয়ে বসলেন। তার পর ফ্যাকাশে হেসে মুখ তুলে বললেন, "আমি বলেছিলাম, পারব না, খেলতে পারব না। জোর করে আমায় খেলাল ইনজেকশান দিয়ে। বলেছিল, খেললে একটা চাকরি করে দেবে। আমি কিন্তু অনেক, সত্যিই অনেক চেষ্টা করেছিলাম গোলে মারতে।" বাবা চুপ করে যেতে যেতে অস্ফুটে বললেন, "আমার সারা মুখে থুথু দিয়ে ওরা বলল, ঘুষ খেয়েছি। বাড়ি ফেরার সময় মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল।" বাবা অন্যমনস্কের মতো কপালের ঠিক মাঝে টিপের মতন কাটা দাগটায় আঙুল বোলালেন।

বিদেশি সহানুভূতির স্বরে বলল, "পৃথিবীর সব জায়গায়ই ফুটবলারদের এই ভাগ্যই হয়।"

"কেন হবে ?" বাবা জ্বলজ্বলে চোখে প্রশ্ন করলেন। ভয়ংকর রাগ আর ঘৃণা তাঁর চোখ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে। "আমি যখন হাঁটু চেপে মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম —সবাই বলল, ভাণ করছি। ওরা একবার ভেবে দেখল না, যে লোকটা ছ' গজ থেকে শট নিতে পারল না, সে এত দিন ২৫-৩০ গজ থেকে অনায়াসে গোল করেছে, সে দু' বছর টপ স্কোরার হয়েছে লিগে ! ওরা নিষ্ঠুরের মতো অপমান করল। অথচ শিল্ড উইনারের মেডেলের জন্য আমি কত দিন স্বপ্ন দেখেছি।

আমার গোলে ক্লাব শিল্ড পাচ্ছে—"

বাবা চুপ করলেন।

"আমরা ভাল টাকা দেব। প্রথম সিজন-এ মাসে যা দেব, ভারতীয় মুদ্রায় তার মূল্য দু' হাজার টাকা। সেকেন্ড টিমে আমরা এই রকমই দিই। খেলা দেখিয়ে ফার্স্ট টিমে এসে যদি ভাল খেলে—তবে মাইনে, বোনাস, বিজ্ঞাপন থেকে রোজগার সব মিলিয়ে বছরে দু' লক্ষ টাকা তো পাবেই।"

তখন বিশুবাবু 'অ্যাঁ' বলে ঘরে ঢুকে এলেন। নুটুদা ফ্যালফ্যাল করে বিদেশির মুখের দিকে তাকিয়ে, কথা বলতে পারছেন না। দরজার বাইরে ভিড়টা সরব হয়ে উঠল।

"প্রসূনের এত এলেম, অ্যাঁ, ছোঁড়াটাকে দেখে তো কিছু বোঝা যায় না!" বিশুবাবু বললেন।

বাবা অরুণা গ্লাস ফ্যাকট্রিতে টাইম-কিপারের কাজ করেন, তিন মাসের ওপর লক আউট চলছে। পঁয়ত্রিশ টাকা ঘর ভাড়া কিন্তু বাবা এক মাসের জন্যও বাকি ফেলেননি। অসম্ভব আত্মসম্মানবোধ। বাড়িওয়ালা অপমান করবে এটা তাঁর কাছে অসহ্য ব্যাপার। মা'র কাছে শুনেছি একটা ওষুধের দোকানে কাজ করেন। প্রতিদিন দুপুরে বাবা কাজে বেরিয়ে যান। ফেরেন অনেক রাতে, তখন আমি ঘুমিয়ে থাকি।

"আপনি প্রসূনের সঙ্গেই কথা বলুন। গত কুড়ি বছর আমি ফুটবল মাঠে যাইনি। খবরের কাগজে খেলার পাতা পড়ি না। আমি এ ব্যাপারে হ্যাঁ বা না, কোনও কথাই বলব না।"

"অনিলবাবু!" নুটুদা চাপা স্বরে মিনতি করলেন, "লক্ষ টাকা পর্যন্ত রোজগার করবে প্রসূন। আপনি রাজার হালে থাকবেন।"

"ভাবা যায় না, অ্যাঁ, বলে লাথি মেরেই এত টাকা! লোকটা যা বলছে রাজি হয়ে যান মশাই, রাজি হয়ে যান।" বিশুবাবু বললেন।

"ফুটবলারের আত্মসম্মানবোধ আছে বিশুবাবু। আমি কোনও দিন প্রসূনকে ফুটবল খেলতে বলিনি। সে নিজের আগ্রহে খেলে। আমি কোনও দিন তার খেলা দেখিনি। ফুটবল সম্পর্কে কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। আমার যা বলার বলে দিয়েছি।"

বিদেশি অনেক কথা বাবাকে বলল। বাবা শুধু ঘাড় হেঁট করে একগুঁয়ের মতো মাথা নেড়ে গেলেন। নুটুদা, বিশুবাবু বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে বিদেশি একটা কার্ড বাবার হাতে দিয়ে বলল, "এতে আমার ঠিকানা লেখা আছে। আপনি চিন্তা করুন। তার পর আমাকে চিঠি দেবেন। পেলে রিটায়ার করবে শিগগিরই! আমরা সেই জায়গায় প্রসূনকে খেলাব বলে এখনই ওকে তৈরি করে নিতে চাই।"

বিদেশি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে সবাই। ফাঁকা ঘরে বাবা একা বসে। হাতে কার্ডটা। তার পর উঠে জানলায় এলেন। কার্ডটা কুচিকুচি করে

জানলা দিয়ে ছুড়ে দিলেন উঠোনে। একরাশ শিউলিফুলের মতো কুচিগুলো ছড়িয়ে পড়ল। মা রান্নাঘর থেকে ছুটে গিয়ে কার্ড-এর টুকরোগুলো কুড়োতে শুরু করলেন, তাঁর পিছনে নীলিমা। কুড়োতে কুড়োতে নীলিমা আমার ঘরের জানলার কাছে এসে ফিসফিস করে ডাকল, "প্রসূন, এই প্রসূন ! ওঠো, ওঠো, পাঁচটা যে বাজে।"

॥ ২ ॥

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। জানলায় তাকিয়ে দেখি নীলিমা। ও বলল, "ডেকে দিতে বলেছিলে না ?"

আমাদের ঘড়ি নেই। নীলিমাকে কাল রাতে বলে রেখেছিলাম ভোর পাঁচটায় ডেকে দিতে। ওর স্কুল সকালে। খুব ভোরে উঠে জল তুলে, উনুন ধরিয়ে বাবার জন্য ভাত রেঁধে ও স্কুলে যায়। আজ সকালে শোভাবাজার ইউনিয়নের মাঠে আমি, নিমাই আর আনোয়ার ট্রায়াল দিতে যাব। হর্ষদা ইউনিয়নের কোচ বিপিন সিংহকে বলে রেখেছেন।

বিছানায় কিছুক্ষণ বসে স্বপ্নের কথা ভাবলাম। ভাবতে ভাবতে লজ্জা পেলাম। এ রকম অবাস্তব উদ্ভট স্বপ্ন যে কেন দেখতে গেলাম ভেবে অবাক লাগল। তবে স্বপ্নে অবাস্তব অকল্পনীয় ব্যাপারই ঘটে। পোর্তুগিজভাষী ব্রাজিলের লোক কিনা বাংলায় কথা বলছে ! এমন না হলে আর স্বপ্ন বলা হয় কেন ! কিন্তু শুনেছি অকারণে কেউ স্বপ্ন দেখে না ; কোনও না কোনও সময়ে যা ভাবি বা মনে মনে পেতে বা হতে ইচ্ছে করে, সেটাই স্বপ্ন হয়ে ফুটে ওঠে।

তা হলে আমি কি পেলে হতে চাই ? উফ্ কী সাহস আমার ! 'পে-এ-লে।' নামটা খুব নরম স্বরে ফিসফিসিয়ে বার কয়েক উচ্চারণ করলাম। ওর গল্প হর্ষদার কাছে বহুবার শুনেছি। হর্ষদা ভীষণ বই পড়েন আর খেলা দেখেন, জীবনে কখনও ফুটবল খেলেননি। আগে আমাদের পাড়ায় থাকতেন। ছোটবেলা থেকে আমায় চেনেন। হর্ষদাই প্রথম আমায় বলেন—'প্রসূন, তোমার মধ্যে ফুটবল খেলা আছে, মন দিয়ে খেলো, বড় হতে পারবে।' কিন্তু পেলে হবার ইচ্ছাটা কখন যে মনের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে, সেটা তো একদমই টের পাইনি। আমার ডান পায়ে প্রচণ্ড শট, কিন্তু বাঁ পা ভাল চলে না, বল নিখুঁতভাবে ট্র্যাপ করতে পারি না, হেড করার সময় চোখ বুজে কুঁকড়ে যাই। সবাই বলে বটে আমি খুব স্পিডি আর ভাল ড্রিব্‌লও করতে পারি, কিন্তু সত্তর মিনিট খেলার দম আমার নেই। কখন ফাঁকা জমিতে গিয়ে বলের জন্য অপেক্ষা করব তাও জানি না।

আরও অনেক ঘাটতি আমার আছে অথচ, আমি কিনা পেলে-র জায়গায় খেলার স্বপ্ন দেখছি। আমি যে আস্ত গাড়োল, তাতে সন্দেহ নেই। নিজের উপর খানিকটা রাগও হতে লাগল। স্বপ্নের কথা যদি নিমাইটা শোনে, তা হলে আমায় নিয়ে হাসাহাসি তো করবেই। দু' লক্ষ টাকা বছরে ! রীতিমতো মাথা খারাপ হলে

তবেই এত টাকার কথা কল্পনা করা যায়।

কালও দুপুরে আমরা ছ' খানার বেশি রুটি কেউ খাইনি, রাত্রে চারখানা। নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছিল, তবু রাত্রে পুতুল আর পিন্টুকে আমার থেকে একখানা ছিঁড়ে দু' ভাগ করে দিয়েছি। মাকে বলে রেখেছিলাম, আমার জন্য আজ সকালে দু'খানা রুটি যেন রেখে দেয়। আজ ট্রায়ালের দিন। একদম খালি পেটে মাঠে নামতে ভরসা হচ্ছে না, যদি ব্যথা খিমচে ধরে! মাকে অবশ্য ট্রায়ালের কথা বলেছি, আর জানে নীলিমাও।

আমার ঘরটা স্যাঁতসেঁতে আর দুপুরেও মনে হয় যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অর্ধেক দেয়ালের বালি খসে গেছে, কড়িকাঠে উই, একমাত্র জানলাটার দুটো কপাটেরই কবজা ভাঙা। বৃষ্টি হলে বেশ অসুবিধা হয়। এই ঘরটাকে পুরো-ঘর কোনওভাবেই বলা যায় না। লম্বায় আট ফুট, চওড়ায় পাঁচ ফুট। আমি একা থাকি। একটা টুলও রাখার জায়গা নেই। দেয়ালে তাক আছে। আমার স্কুলের কয়েকটা বই সেখানে পড়ে আছে। দুটো প্যান্ট আর জামা দড়িতে ঝুলছে।

মা ঘরে ঢুকলেন। আমার মা'র মতন মা পৃথিবীতে আর দুটি আছে কি না জানি না। আমাদের এত কষ্টের সংসার, মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায় ক্ষিধেয়, গরমে অপমানে আর হতাশায়। মা'র কিন্তু সব সময় হাসিমুখ। কম কথা বলেন। মিষ্টি মৃদু স্বর শুনলে মনে হয় দুঃখ বলে কোনও জিনিস পৃথিবীতে নেই। মা ঘরে ঢুকেই বললেন, "খোকা, উঠে পড়েছিস! এখুনি বেরোবি?"

"হ্যাঁ। বাবা উঠেছে?" আমি ঘর থেকে বেরোবার সময় বললাম।

"না, গা-টা কেমন গরম গরম, জ্বর আসবে বোধ হয়। তোর জন্য রুটি রেখেছি।"

মা আমায় চারখানা রুটি দিলেন। আমার বরাবরই মনে হয়, সকলের থেকে মা আমাকেই বেশি ভালবাসেন। রাত্রে নিশ্চয় না খেয়ে আমার জন্য রুটি রেখে দিয়েছেন। অন্য সময় এই নিয়ে রাগারাগি শুরু করে দিতাম, আজ করলাম না। সাতটার মধ্যে মাঠে পৌঁছতে হবে। নিমাই আর আনোয়ার বটতলা বাস স্টপে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে।

বেরোবার সময় মাকে হঠাৎ প্রণাম করলাম। ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাবে খেলতে যাচ্ছি না, ট্রায়াল দিতে যাচ্ছি মাত্র। যদি বিপিন সিংহের পছন্দ হয়, তা হলে ময়দানের ঘেরা মাঠে খেলার সুযোগ আসবে। ফুটবল আমার কাছে রূপকথার একটা প্রাসাদ। যে আশা মনে মনে বহু দিন ধরে লালন করে আসছি, আজ তার দরজায় পৌঁছোতে যাচ্ছি মাত্র। যদি ঢুকতে পারি, তা হলে এক একটা তলা নীচে ফেলে উপরতলায় উঠবই, উঠতেই হবে। সে জন্য যত পরিশ্রম করা দরকার, করবই। মা আমাকে বুকে চেপে ধরে কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। তার পর বললেন, "খোকা, মন দিয়ে চেষ্টা করবি।"

॥ ৩ ॥

কিট ব্যাগটা হাতে নিয়ে হনহনিয়ে যখন বটতলার দিকে যাচ্ছি, তখন মনের মধ্যে মা'র কথাটাই গুনগুন করছিল। মন দিয়ে কেন, প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব, মা সারা জীবন কষ্টে কাটিয়েছেন, ওঁকে সুখী করবই। ফুটবলাররা চাকরি পায়, ক্লাব থেকে টাকাও পায়। আমি জানি শোভাবাজার ইউনিয়ন টাকা দেবে না, দেবার সামর্থ্যও নেই। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা যুগের যাত্রীতে আমাকে যেতেই হবে। যাবার প্রথম ধাপ শোভাবাজার। এক কি দু' বছরের মধ্যে চোখে পড়াতেই হবে আমার খেলা। খেলা দেখিয়েই বড় ক্লাবে যেতে চাই, তার পর একদিন ইন্ডিয়ার জারসি-ও পরব। টাকা আর খ্যাতি দুটোই আমার চাই, তবে এখন দরকার শেষেরটা।

নিমাই আর আনোয়ার বটতলায় দাঁড়িয়ে। আমি পৌঁছনো মাত্র আনোয়ার হাতঘড়িতে সময় দেখে বলল, "সাড়ে ছ'টার মধ্যেই পৌঁছে যাব।"

আমরা তিনজনেই যে উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার শিকার হয়েছি সেটা বোঝা গেল, কেউ আমরা কথা বলতে চাইলাম না। সব থেকে বেশি কথা বলে নিমাই। লোকের পিছনে লাগতে কিংবা কারুর ভঙ্গি বা গলার স্বর নকল করে হাসাতে নিমাই ওস্তাদ। আমাদের বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে শান্তিপল্লি নামে এক জবর-দখল কলোনিতে থাকে। বাবা নেই, দাদার কাপড়ের দোকান আছে হাতিবাগানে। নিমাই ক্লাস ফাইভে ফেল করার পর আর স্কুলে যায়নি।

বন্ধুদের মধ্যে অবস্থা ভাল আনোয়ারের। টকটকে রং, ছ' ফুট লম্বা, ওজন পঁয়ষট্টি কেজি। একটা হোটেল আর দুটো বস্তির মালিক ওর বাবা। ধীর শান্ত প্রকৃতির আনোয়ারের খেলা তার ব্যবহার এবং জামা-প্যান্টের মতন পরিচ্ছন্ন। এখন পার্ট ওয়ান কমার্স-এর ছাত্র। আমার এবং নিমাইয়ের থেকে বছর তিনেকের বড়। আনোয়ার সঙ্গে থাকলে আমাদের পকেট থেকে একটা পয়সাও বার করতে হয় না। বলা বাহুল্য ওকে ছাড়া আমরা সিকি মাইলও চলি না।

বাসে আমরা শ্যামবাজার পর্যন্ত কেউ একটাও কথা বললাম না। আমার একবার শুধু মনে হয়েছিল, বাবাকেও প্রণাম করলে হত। কিন্তু মনের কোথায় যেন একটা চাপা অভিমান বাবার সম্পর্কে রয়ে গেছে। একদিনও আমাকে খেলার বিষয়ে একটা কথাও বলেননি, একবারও খোঁজ নেননি আমি কেমন খেলছি, আমার খেলা দেখতেও যাননি কখনও। ফুটবল সম্পর্কে বাবার তীব্র ঘৃণা আমি ওঁর ঔদাসীন্যের মধ্য দিয়েই বুঝতে পারি। মা মাঝে মাঝে বলতেন, 'তোর বাবার কাছ থেকে জেনেটেনে নিস না!' তারপর বলতেন 'থাকগে।' একবার শুধু কানে এসেছিল, মা'র কী একটা কথার জবাবে বাবা বললেন, "ফুটবল আমাকে ফোঁপরা করে দিয়েছে, খোকাকেও দেবে। ওকে বারণ করো।"

শ্যামবাজার থেকে বাস বদল করে এসপ্লানেডে নামলাম ঠিক সওয়া ছটায়। শোভাবাজার টেন্ট-এ পৌঁছে দেখি জনা বারো ছেলে ড্রেস করায় ব্যস্ত।

একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, "বিপিনদা আসবে সাতটায়। আমরা এখন রেড রোড দিয়ে সোজা গিয়ে ট্রাম লাইন পেরিয়ে, প্যারেড গ্রাউন্ডটাকে চক্কোর দেব। ফিরে এসে দেখব বিপিনদা অপেক্ষা করছে।"

ভেবে পেলাম না, এখন আমরা তিনজন কী করব। আনোয়ারই বলল, "বসে থেকে কী করব, চল ওদের সঙ্গে দৌড়োই। বিপিনদা তাতে ইমপ্রেসড হবে।"

আমরাও ড্রেস করে ওদের সঙ্গে দৌড়ে যোগ দিলাম। মিনিট পাঁচেক দৌড়োবার পর, ওরা প্যারেড গ্রাউন্ডের দিকে না ঘুরে বাঁ দিকে এসপ্লানেড-মুখো হল। তার পর ময়দান হকার্স মারকেট-এ ঢুকে টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে জামায়, মুখে, পায়ে ছিটিয়ে আমাদের দিকে হাসল।

"দাঁড়িয়ে দেখছ কী, গায়ে জল লাগাও। ঘামে জবজব না করলে বিপিনদা খুশি হবে না, আবার ছোটাবে। এবার এখান থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে সোজা টেন্ট-এ।" ওদের মধ্যে সব থেকে বয়স্ক যে, আমাদের লক্ষ্য করে বলল।

"খবরদার বিপিনদাকে এ সব বলবে না। যদি ফাঁস করো, তা হলে"—গাঁট্টাগোট্টা একজন ভয়ংকর চোখে আমাদের তিনজনের দিকে তাকাল।

আমরা কোনও প্রশ্ন না করে ওদের মতন গায়ে মাথায় জল দিয়ে 'ঘাম-জবজবে' হয়ে নিলাম। যেহেতু নতুন, তাই একজন অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল, "রোজ রোজ এতখানি করে একঘেয়ে দৌড় কি ভাল লাগে ? দৌড়ের পরই পার্টি করে খেলা, তার পর পাতলা দু' পিস্ রুটি আর একটা ডিম। এক মাসেই তো টি বি ধরে যাবে ! তাই খাটুনি কমাবার জন্যই এ সব করি। বিপিনদা জানতে পারলে কিন্তু রক্ষে নেই, মাঠে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে কুড়ি পাক দৌড় করাবে।" এই বলে সে হাসতে শুরু করল।

"আমরা তো আর চ্যামপিয়নশিপ ফাইট করতে যাব না, নেমেও যাব না, এখন তো রেলিগেশন প্রমোশন বন্ধ। তবে এত দৌড়োবার দরকারটা কী ? অফিসের খেলা আছে, খেপের খেলা আছে, এত ধকল কি সামলানো যায় ?" আর একজন এই বলে আমাদের যাবতীয় কৌতূহল মিটিয়ে দিল।

প্রথম দিনেই এই রকম রূঢ় ধাক্কায় গড়ের মাঠ সম্পর্কে মোহভঙ্গ হবে আশা করিনি। আমাদের টগবগে উৎসাহ এইখানেই খানিকটা থিতিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর 'এইবার চল রে' বলে ওরা টেন্ট-এর দিকে আবার দৌড় শুরু করল। আমরাও ওদের পিছু নিলাম।

বেঁটে, টাকমাথা এক প্রৌঢ় মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে। পায়ের কাছে গুটি-চারেক বল। হাফপ্যান্টটা হাঁটুর নীচে ঢলঢল করছে। ভুঁড়ি দেখে মনে হয় গেঞ্জির নীচে আর একটি বল রয়েছে। আমরা দৌড়ে এসে ওঁকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ালাম। একজন পেটে হাত দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁফাতে লাগল, একজন শুয়ে পড়ল, আর একজন বলল, "বিপিনদা যা খাটান, উফ আর পারা যায় না ! এবার আমরা মরে যাব।"

বিপিনদার মুখ খুশিতে ঝকমক করে উঠল। কিন্তু যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে

বললেন, "কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে ? বড় প্লেয়ার কি অমনি-অমনি হওয়া যায় ? তোদের আর কী খাটাচ্ছি, আমরা খেলার দিন আড়াইশো ডন, পাঁচশো বৈঠক আর মাঠে চল্লিশ পাক দিয়ে গুনে গুনে একশো শট মেরে দু' সের দুধ আর আধ সের বাদাম খেয়ে বাবুঘাটে চলে যেতুম। গঙ্গামাটি মেখে দু' ঘন্টা বসে থাকতুম। দুপুরে পাঁচ ঘন্টা ঘুমিয়ে মাঠে নামতুম।"

আমার পিছনে দাঁড়ানো সেই গাট্টাগোট্টা ছেলেটি চাপা স্বরে বলল, "ফুটবল খেলত না কুস্তি করত ?"

বিপিনদা বোধ হয় আঁচ করতে পেরেছেন যে, কেউ একজন মন্তব্য করেছে। তিনি আন্দাজে আমার দিকে তাকালেন। আমি কাঁটা হয়ে গেলাম।

"ইয়েস, কী যেন বললে ?"

আমি রীতিমতো নারভাস হয়ে, কী বলব ভেবে পাচ্ছি না, তখন পিছন থেকে বলে উঠতে শুনলাম, "আমি বলছিলুম যে বিপিনদাদের সময়ে মিলিটারিদের সঙ্গে খেলতে হত কিনা, তাই ট্রেনিং, খাওয়াদাওয়া ছিল মিলিটারি ধরনের। তাই শুনে এ বলল, ওইভাবে কুস্তি হয়, ফুটবল খেলা যায় না।"

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি গাট্টাগোট্টার তর্জনী আমার দিকে তোলা এবং মুখটি নির্বিকার সারল্যে ভরা। অনেকে মুখ টিপে হাসছে। আনোয়ার হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "বাজে কথা, প্রসূন আগাগোড়া চুপ করে আছে। কুস্তির কথা তুমিই বলেছ, আমি পরিষ্কার শুনেছি।"

"কে বলেছে আমি বলেছি ?" গাট্টাগোট্টা তেরিয়া হয়ে এক পা এগিয়ে এসেই কী ভেবে থমকে গেল। আনোয়ার তার হাফপাউন্ড পাঁউরুটির মতো বাইসেপ দুটো একবার শক্ত করেই আলগা করে দিল। বিপিনদা কিন্তু বেশ খুশি হয়েই বললেন, "কারেক্ট, কারেক্ট, ফুটবল খেলতে হলে কুস্তির কিছু কিছু প্যাঁচ জানা দরকার, বিশেষ করে লেঙ্গি মারা।" তার পর আমাদের তিনজনের দিকে লক্ষ করে বললেন, "তোমরা হর্ষর কাছ থেকে এসেছ ?"

আমরা ঘাড় নাড়লাম। উনি আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললেন, "যাও, ও ধারে গিয়ে শট করো। কত দূর মারতে পারো, দেখি।"

॥ ৪ ॥

যাক, কিছু একটা দেখাবার মতো কাজ প্রথম দিনে পাওয়া গেল ! আমি আর নিমাই এক দিকে আর ৬০/৬৫ গজ দূরে আনোয়ার। আনোয়ারের শটের জোর প্রচণ্ড। আনোয়ারের পেনালটি শট আটকাতে গিয়ে এক গোলকিপারের কবজি ভেঙে যায়। শুনেছি শৈলেন মান্নার শটে খুব জোর ছিল। আমি জোর দেখাবার বদলে কেরামতি দেখাতে লাগলাম। আউট সুইং করালাম, চিপ করলাম, ভলি আর সিজারিয়ান মারলাম, দু'-চারবার বাইসাইকেল কিক করার চেষ্টা করলাম, হল না।

পেলের ছবি দেখে এটা নকল করার চেষ্টা করেছিলাম। পরে অবশ্য বুঝি, রীতিমতো জিমন্যাসটিকস্ না জানলে এই শট মারা যায় না। একজন দেখিয়ে দেবার লোকও চাই।

আনোয়ার বিরাট বিরাট শট করে যাচ্ছে। নিমাই কুড়িয়ে আনছে আর গাঁইগুঁই করছে, "আমি যেন চাকর। কিছু হবে না...শুধু শট করতেই জানে...আমরা বাদ পড়ে যাব প্রসূন, বুঝলি !...আনোয়ারটার স্কিল বলতে তো ঘণ্টা, বিপিনদাকে বল না এবার একটু ট্র্যাপিং, হেডিং, ড্রিবলিং করে দেখাই।"

বিপিনদা অন্য ছেলেদের দিয়ে একই জিনিস করাচ্ছিলেন, লম্বা লম্বা শট। ওঁর কাছে গিয়ে বললাম, "বিপিনদা, এবার একটু স্কিল প্র্যাকটিস করব ?"

"স্কিল !" মনে হল বিপিনদা শব্দটা প্রথম শুনলেন। "স্কিল ? কী করবে তা দিয়ে ?"

মাথা চুলকে বললাম, "মানে, খেলতে গেলে স্কিল ছাড়া তো খেলা যাবে না।"

"শোভাবাজার ইউনিয়নে স্কিল ?" বিপিনদার মুখ এমন হয়ে উঠল যেন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে কাউকে জুতো পায়ে ঢুকতে দেখছেন। "আঠাশটা ম্যাচ খেলে আমরা গতবার সাত পয়েন্ট পেয়েছি, তার আগের বছর পেয়েছিলাম পাঁচ পয়েন্ট। লিগের ওঠা-নামা ছিল না তাই রক্ষে। স্কিল লাগে যারা চ্যামপিয়নশিপ ফাইট করে—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, যুগের যাত্রী এদের। আমরা ফাইট করি রেলিগেশন, নেমে যাওয়া আটকাতে। স্কিল দিয়ে আমাদের কী দরকার ?"

"তা হলে এই যে লম্বা লম্বা কিক প্র্যাকটিস করাচ্ছেন !" আমি অতি বিনীতভাবেই তর্ক করার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করলাম।

বিপিনদা একগাল হেসে বললেন, "এই হচ্ছে পদ্ধতি, আমার পদ্ধতি। প্রেশারের মধ্যে সব ম্যাচ আমাদের খেলতে হবে। অপোনেন্ট-এর ন'জন আগাগোড়া আমাদের পেনালটি বক্স-এ থাকবে, তখন কী করবে ?"

"ক্লিয়ার করব।"

"গুড ! গুড ! তোমার দেখছি ব্রেন আছে। কিন্তু কীভাবে ক্লিয়ার করবে ?"

"কিক করে।"

"ভেএএরি গুড ! সেই জন্যই এই লং কিকিং প্র্যাকটিস। এই একটা স্কিলই আমাদের বেশি কাজে লাগে। এর পর গোটা দুয়েক ট্যাকলিং শেখাব, যাও মন দিয়ে এখন বল মারো। তোমার সঙ্গে এসেছে ওই যে ছেলেটা, নাম কী ?" বিপিনদা আঙুল তুললেন আনোয়ারের দিকে। নামটা শুনে বললেন, "গুড প্লেয়ার, স্টপারে ভাল মানাবে।"

বুঝলাম আনোয়ারের চান্স হয়ে গেল। তাতে ভালই লাগল। আমার পোজিশন হল স্ট্রাইকার, আনোয়ার আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

নিমাইয়ের কাছে গিয়ে বিপিনদার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে বললাম। শুনে নিমাই বলল, "আমি মোটেই ঘাবড়াচ্ছি না। লেঙ্গি মারার কায়দা দেখিয়ে চান্স করে নেব। তুই বরং নিজের জন্য ভাব।"

আমি মনে মনে বেশ দমে গেছি। ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবলের সঙ্গে এইভাবে পরিচয় হবে ভাবিনি। ফুটবলের সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো জানব, চর্চা করব, তারিফ পাব, অনেক উঁচুতে উঠব, এই সব যা ভাবতাম বিপিনদা তা চুরমার করে দিলেন। আমি গুটিগুটি মাঠের বাইরে এসে বসে পড়লাম। কেউ আমাকে লক্ষ করল না। চারটে বল নিয়ে মাঠে এখন প্র্যাকটিস হচ্ছে হেডিংয়ের। একজন পর পর কর্নার কিক করে যাচ্ছে, গোলের মুখে দশ-বারোজন হেড করে বল বের করে দিচ্ছে। ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, হাসাহাসি, গালিগালাজ করছে। একবার হেড করার জন্য সবাই লাফাল, তার পরই একজন নাক চেপে মাঠ থেকে বেরিয়ে এল। কনুই দিয়ে কেউ মেরেছে। আর একবার, গোলকিপার লাফিয়ে উঠে বল-এ হাত দিয়েও ধরল না। কে তার প্যান্টটা এমন জায়গায় টেনে নামিয়ে দিয়েছে যে গোলের থেকে লজ্জা বাঁচানোটাই সে জরুরি কাজ গণ্য করতে বাধ্য হয়েছে।

নাকে ভিজে রুমাল চেপে সেই ছেলেটি আমার কাছে এসে দাঁড়াল। ডিগডিগে রোগা, বয়সে আমার থেকে বছর ছয়-সাতের বড় হবে। চোখাচোখি হতেই বলল, "কোন পজিশনের ?"

বললাম, "স্ট্রাইকার।"

"কোথা থেকে ?"

"পাড়ার ক্লাব। এই প্রথম গড়ের মাঠে।"

আনোয়ার হঠাৎ তলপেটে হাত চেপে কুঁজো হয়ে গেল। কেউ হাঁটু দিয়ে মেরেছে। ও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সামলে উঠল। লক্ষ করলাম, গাঁট্টাগোট্টার দিকে আনোয়ার হিংস্র চোখে তাকাচ্ছে। আমি আঙুল তুলে ছেলেটিকে বললাম, "আচ্ছা, ওই বেঁটেটার নাম কী ?"

"পলাশ টিকাদার। ডেনজারাস ছেলে। গত বছর রেফারিকে চড় মেরেছিল, একজনের পা ভেঙে দিয়েছে, টাকা খেয়ে সেমসাইড গোল করে ম্যাচ হারিয়েছে, টেন্ট থেকে একবার চারটে টেরিলিন ফুলপ্যান্ট একসঙ্গে চুরি করেছে। আমরা ওর থেকে দূরে দূরে থাকি।"

"আপনার নাকে মারল কে ? পলাশ ?"

"না, রবি। ছেলেটা ভাল। বিপিনদার ইনস্ট্রাকশন, কী আর করবে।"

লক্ষ করলাম, পলাশ আনোয়ারের থেকে দূরে দূরে রয়েছে। আনোয়ার যতবার ওর পাশে আসছে, ও সরে যাচ্ছে। নিমাই ভিড় থেকে তফাতে।

"আপনি শোভাবাজারে ক' বছর ?" আমি কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম।

"পাঁচ বছর হবে।"

"ক্লাব বদলাবেন না ?"

ওর মুখ ম্লান হয়ে গেল। রক্তমাখা রুমালটা চোখের সামনে অনেকক্ষণ ধরে থেকে বলল, "বিপিনদা একটা দোকানে কাজ জোগাড় করে দেবে বলেছে।" তার পর রুমালটা মুঠোয় ভরে, "এইবার নামি" বলে মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

হেডিং প্র্যাকটিস শেষ হয়ে গেছে। এইবার বোধ হয় পার্টি করে খেলা হবে।

আমি পা থেকে বুট খুলতে শুরু করলাম।

ফেরার সময়ও আসার মতোই কেউ বিশেষ কথা বললাম না। নিমাই একবার বলেছিল, "মাঠ থেকে উঠে গেলি কেন ? এ সব ক্লাবে অত মেজাজ চলে না।" আর একবার বলেছিল, "পলাশটা মরবে। আনোয়ারকে যা খেপিয়েছে !"

বাড়িতে মা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কী হল ?" মন ভাল ছিল না। দায়সারা জবাব দিলাম, "প্র্যাকটিস হল খানিকটা, দম করার জন্য দৌড়োলুম কিছুক্ষণ। প্রথম প্রথম এই সবই চলবে।"

নীলিমা কোনও প্রশ্ন করেনি, তাতে হাঁফ ছেড়েছি। ওর কাছে ফার্স্ট ডিভিশন সম্পর্কে বলে বলে আমি এমন একটা ধারণা করিয়ে দিয়েছি, ময়দানের ঘেরা মাঠ তিনটে যেন দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট আর ঠনঠনের কালীমন্দির ; সেই ধারণাটা প্রথম দিনেই ভেঙে দিলে হয়তো ওর চোখে আমি নেমে যাব।

॥ ৫ ॥

সন্ধ্যায় হর্ষদার বাড়ি গেলাম। সব শুনে বললেন, "আরে বিপিন সিংহী যা করতে বলে, করে যাবি। যা গল্প বলবে, শুনে যাবি। ওর কাছে তো খেলা শেখার জন্য তুই যাসনি। গেছিস একটা ফার্স্ট ডিভিশন টিমে ঢুকে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান কি যুগের যাত্রীর চোখে পড়তে। সে জন্য একটা ক্লাব তো দরকার। শোভাবাজার না হলে তোর মতো অজানা অনামী একটা জুনিয়ারকে চান্স দেবে কে ? স্পোর্টিং ইউনিয়ন কি জর্জ টেলিগ্রাফে গেলেও তো পাত্তা পাবি না।"

"চান্স পাবার থেকেও আমি আগে খেলা শিখতে চাই।"

"ম্যাচ খেলাটাও শেখার পক্ষে দরকারি ব্যাপার। এ-বছরটা একটু নাম কর, পরের বছর এরিয়ান কি ভ্রাতৃসঙ্ঘে চেষ্টা করব। বয়স কম রয়েছে, ছোট ক্লাবে দু-তিন বছর থেকে এক্সপিরিয়ান্স তৈরি হলে বরং সুবিধেই হবে বড় ক্লাবে।"

হর্ষদার সঙ্গে তর্ক করা যায় না। একটা না একটা যুক্তি খাড়া করে চুপ করিয়ে দেবেই। ওকে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল—দু-তিন বছরই বা নষ্ট করব কেন ছোট ক্লাবে পড়ে থেকে ? আমি এখুনি মোহনবাগানে খেলতে চাই। আমার ফেভারিট টিম মোহনবাগান, আমার স্কুলের পুরনো খাতায় খবরের কাগজ থেকে কেটে চুনি গোস্বামীর ছবি পাতার পর পাতায় সেঁটে রেখেছি। মোহনবাগান টেন্টটাকে দূর থেকে তাজমহল ছাড়া আর কিছু ভাবি না।

গোঁড়া ইস্টবেঙ্গলি নিমাই একবার বলেছিল, ওর স্বপ্ন মোহনবাগানের এগেনস্টে হ্যাট্রিক করা। সে দিন থেকে ওর সম্পর্কে এক টুকরো ঘৃণা মনের মধ্যে জমাট বেঁধেছে। বহু সময় সেটাই নিমাইয়ের বিরুদ্ধে আমার রাগে ফেটে পড়ার কারণ হয়। পরে অবশ্য লজ্জা পাই, কেননা আমায় রাগতে দেখলে নিমাই চুপ করে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে। তার পর বলে, "তোর বড্ড মেজাজ। ভীষণ অধৈর্য তুই।"

আমি খেলিনা, খেলা দেখার মতো মন আমার নেই। সেটা আনোয়ারের আছে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ও খেলে। অত বড় দেহটা বেড়ালের মতো নাড়াচাড়া করায়। চালচলনে রাখের মতো রোখ নিয়ে অথচ পরিচ্ছন্নভাবে। কেউ ওকে ফাউল করলে, আকারে শুধু তার দিকে তাকায়। সাধারণত তার পর আর ফাউল হয় না। সেই তুলনায় নিমাই মিনিটে একটা-দুটো ছোটখাটো ফাউল করে যাবেই। বেশির ভাগই রেফারির চোখের আড়ালে ঘটে। স্টপারটাকে কিছুতেই নড়ানো যাচ্ছে না, মাঝখানটা এঁটে ধরে আছে, অমনি নিমাই তার পিছনে লেগে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দেখা যাবে, বল ছেড়ে সে নিমাইয়ের পিছু নিয়েছে রাগী মুখে। তার পর আমার কাজ ফাঁকা অঞ্চলটাকে ব্যবহার করা এবং সেটা পারেও থাকি।

অসম্ভব ভাল থ্রু দিতে পারে নিমাই, আর বল সমেত টিঙটিঙে শরীরটাকে পাঁকাল মাছের মতো হড়কিয়ে নিয়ে যেতে পারে তিন-চারজন ডিফেন্ডারের মধ্য দিয়ে। ও জানে, আমি কোথায় থাকব। বলটা ঠিক আমার পায়েই ছুটে আসে পোষা কুকুরের মতো। তখন একটা কাজই বাকি থাকে—হয় আলতো করে, নয়তো প্রচণ্ড জোরে বলটাকে গোলের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া। অনেকে বলে, নিমাই না থাকলে আমি গোল করতে পারব না। শুনে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি, রাগও হয়। কারুর ওপর নির্ভর করে খেলছি, গোল দিচ্ছি, আমার কোনওই কৃতিত্ব নেই—এটা মানতে চাই না। নিমাইকে আমি সত্যিই ঘৃণা করি। কিন্তু ও তা জানে না। ও আমাকে ভালবাসে।

শোভাবাজার ইউনিয়নে আমি প্রথম ১৬ জনের মধ্যে রয়ে গেলাম। আনোয়ার আর নিমাই ফার্স্ট টিমে পর পর সাতটা লিগ ম্যাচে খেলল। সাতটাই আমরা হারলাম। ইস্টবেঙ্গল দিল পাঁচ গোল, ইস্টার্ন রেল চার, কালীঘাট দুই, মহামেডান চার, এরিয়ান পাঁচ, স্পোর্টিং ইউনিয়ন দুই, বি-এন-আর তিন। আমরা একটাও গোল দিতে পারিনি।

আনোয়ার সাতটা ম্যাচই পুরো খেলেছে। বিপিনদার অত্যন্ত ফেভারিট হয়ে উঠেছে ও। সাতটা খেলায় শোভাবাজার ২৫ গোল খেয়েছে। আমার ধারণা, স্টপারে আনোয়ার না থাকলে সংখ্যাটা ৫০ হত। প্রমিসিং হিসেবে ওর বেশ নাম হয়ে গেছে এই ক'টা খেলাতেই। নিমাই দুটো ম্যাচ পুরো খেলেছে, বাকিগুলোয় আধা আর সিকি।

নিমাইয়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে আমার। দু'জন-তিনজনকে কাটিয়ে গোলের মুখে অভ্যাস মতো বল ঠেলে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দ্যাখে কেউ নেই, ওদের ব্যাক কিংবা গোলকিপার বলটা ধরেছে। নিমাই মাঠের চারধারে তাকায়। ওর খেলার ধরন একমাত্র যে বোঝে, সে তখন মাঠের বাইরে বেঞ্চ-এ ড্রেস করে বসে আছে। নিমাই যত গোল ওপেন করেছে, তার শতকরা নব্বুইটা থেকে আমি স্কোর করতে পারতামই। দেখতে দেখতে চোখে জল এসে যায়। নিমাই অসহায়ের

মতন আমার দিকে যখন তাকায়, মুখ ঘুরিয়ে ফেলি।

আমি জানি, ওরও আমার মতন অবস্থা। আমাকে খেলানো হচ্ছে না অথচ ও চান্স পাচ্ছে, তাতেও ও মরমে মরে আছে। তার উপর নিজের যাবতীয় চেষ্টা বিফল হতে দেখে শেষের দিকে নিমাই আর গা লাগায় না। রাগে আমার সর্বাঙ্গ রি রি করে, যখন দেখি উইংগার কি আর এক ইনসাইড ভুল জায়গায় পাস দেওয়ার জন্য নিমাইকে দাঁত খিঁচোচ্ছে।

আমি আর আনোয়ার ওকে বলেছিলাম, তুই নিজেই গোল কর। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় নিমাই তিনবার শান্ত আর নঈমের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে সামনে থঙ্গরাজকে পেয়েও গোল করতে পারেনি। দু'বার বাইরে মারল, আর একবার হাতে তুলে দিল। "কী রকম যেন হয়ে গেলুম"—নিমাই পরে আমাকে বলে, "অত বড় একটা চেহারা দু' হাত মেলে এগিয়ে আসছে! ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি মেরে দিলুম।"

আমিও রেগেই জবাব দিলাম, "আর মিথ্যা কথা বলে সাফাই দিতে হবে না। যা বল পেয়েছিলি, তাতে গোলে ইয়াসিন থাকলেও গোল হয়। তুই বাঙাল, তাই গোল করিসনি। আমি যদি মোহনবাগানকে এভাবে পেতুম, বলাই দে সুদ্ধু গোলে ঢুকিয়ে দিতুম।"

নিমাই একগাল হেসে বলল, "তার পর দু'দিন উপোস করে প্রায়শ্চিত্তি করতিস।" কিছুক্ষণ পর ও গলা নামিয়ে বলল, "খেলার পর যখন টেন্টে ডেকে নিয়ে গেল জল খাওয়াবার জন্য, তখন পি. সিন্‌হা আমার নাম, কত দিন খেলছি, কোথায় থাকি জিজ্ঞাসা করল। কেন বল তো?"

"সামনের বছর পরিমল দে-কে বিদেয় করে তোকে আনবে বলে।"

নিমাই অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেল। তার পর বেশ রেগেই বলল, "মোহনবাগানকে গুনে গুনে তিন গোল দেব তা হলে।"

রাজস্থানের সঙ্গে খেলার আগের দিন নোটিশ বোর্ড-এ টিমের লিস্ট-এ আমার নাম উঠল। তিন দিন ধরে আকাশ মেঘলা। বৃষ্টিও হয়ে গেছে দু' দিন। লিস্ট-এ এগারোজনের নামের মাথায় লেখা 'ইফ রেইন'। পাঁচজনের নামের পাশে পাঁচটি নাম, তাদের মাথায় লেখা 'ইফ নট রেইন'। আমার নাম 'ইফ নট রেইন'-এর তালিকায়। ব্যাপারটা একজন বুঝিয়ে দিল। বৃষ্টি পড়লে কারা খেলবে আর না পড়লে কারা খেলবে। আমার নামের পাশে টিকাদারের নাম। যদি বৃষ্টি পড়ে তা হলে আমি বাদ, টিকাদার খেলবে।

রাতে ঘুমোতে পারলাম না। ঘন ঘন জানলা দিয়ে আকাশ দেখতে লাগলাম। তারা দেখা যায় না, ঘোলাটে গঙ্গাজলের মতন আকাশ। কাল বিকেলে বৃষ্টি হবে কি হবে না, ঘেরা মাঠে প্রথম খেলার সুযোগ আসবে কি আসবে না, এই চিন্তা করতে করতে একটা ভয় ক্রমশ আমাকে পেয়ে বসল। কাল নির্ঘাত আমি ওপেন নেট মিস করব। এ রকম আগেও হয়েছে।

॥ ৬ ॥

চাতরায় একবার ফাইনাল খেলাতে নিয়ে গেছিল পাইকপাড়া অগ্রগামী। সারা রাত চিন্তা করেছিলাম অপোনেন্ট ত্রিবেণী যুব সঙ্ঘের স্টপার আর দুটো ব্যাকের কথা। সেমিফাইনালে চারটে গোল দিয়ে মাঠ থেকে বেরোচ্ছি, তখন যে লোকটি আমায় বলেছিল, "খোকা, তুমি তো বেশ খেলো! কিন্তু তোমার বাঁ পা যে একদম চলে না।"

পরে শুনলাম তার নাম 'ল্যাটা মন্টে'। ফাইনালে আমাদের অপোনেন্ট স্টপার। বছর কুড়ি আগে কলকাতা মাঠে খুব নামকরা ফরোয়ার্ড ছিলেন এরিয়ানে। এখন মাঝে মাঝে খেলেন স্টপারে। ওঁর ভাল নামটা কেউ বলতে পারল না। ব্যাক দুটি ক' মাস আগেই জুনিয়ার ইন্ডিয়া টিমের সঙ্গে এশিয়ান ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে গেছিল ব্যাংকক না সিওল-এ। ওদের সেমিফাইনালের খেলা দেখতে দেখতে পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "রাইট ব্যাকটার কী নাম, দাদা?"

"সুধীর কর্মকার। যে রকম খেলছে নাম করবে মনে হচ্ছে।"

ফাইনালের আগের রাতে ঘুমোতে পারিনি, শুধু মাথার মধ্যে অবিরাম গুনগুন করেছে ল্যাটা মন্টের কথাটা, 'তোমার বাঁ পা যে একদম চলে না' আর চোখে ভেসেছে সুধীর কর্মকারের ট্যাকলিং। ফাইনালের দিন সকালে ল্যাটা মন্টে আমাদের ঘরে এলেন। ত্রিবেণী টিম পাশের ঘরেই কাল থেকে রয়েছে। আমাদের নীলেদা ওকে দেখেই খাতির করে বসিয়ে বলল, "মন্টেদা, আজ খেলছেন তো?"

"ভাবছি। শরীরটা বড় ম্যাজম্যাজ করছে, গঙ্গায় সাঁতার কেটে ফিট না হলে খেলব না। সাঁতারের মতো এত ভাল 'বডি ফিট' করার আর কিছু তো হয় না।"

আমার বয়স তখন চোদ্দো। কথাগুলো শোনা মাত্র 'বডি ফিট' করার জন্য আনচান করে উঠলাম।

"আমার এক্সপিরিয়ান্স থেকে যা বুঝেছি, বুঝলি নীলে, খেলার দিন কোনও রকম প্র্যাকটিস নয়। সকালে শুধু সাঁতার আর দুপুরে রেস্ট—কষে ঘুম। বিকেলে অদ্ভুত ঝরঝরে হয়ে যায় শরীরটা, ব্রেনও খুব ভাল ফাংশন করে। ফরোয়ার্ডদের তো অবশ্যই সাঁতার কাটা দরকার। হ্যাঁ, তার আগে আচ্ছাসে তেল মেখে ডলাই-মলাই, মানে মাসাজ করে মাস্‌লগুলোকে আলগা করে নিতে পারলে তো কথাই নেই। গোষ্ঠ পাল, সামাদ থেকে শুরু করে পিকে, চুনি সবাই ম্যাচের দিন সাঁতার কাটত। ওরা রোম ওলিমপিক-এ হারল কেন জানিস?"

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। মন্টেদা একটা সিগারেট ধরিয়ে শতরঞ্চিতে বাবু হয়ে বসলেন। আমাদের রাইট আউট ইস্টার্নরেলে খেলে, খুব বইটই পড়ে। বলল, "হাঙ্গেরি টিমে অ্যালবারটো ছিল যে!"

"থাকলেই বা!"

"টিচি ছিল।"

"তাতে কী হয়েছে ?"

আমরা খুবই দমে গেলাম কারণটা খুঁজে না পেয়ে। মন্টেদা কষে সিগারেটে টান দিয়ে শতরঞ্চি উলটিয়ে মেঝেয় ছাই ঝেড়ে বললেন, "যেখানে ইন্ডিয়া টিমকে থাকতে দিয়েছিল, সেখানে সাঁতার কাটার মতো একটা চৌবাচ্চাও ছিল না ! বডি ফিট করতে পারেনি ম্যাচের দিন। চুনি-প্রদীপ সারা সকাল অনেক খুঁজেছিল যদি একটা পুকুর কি ডোবাও পাওয়া যায় ! পায়নি।"

আমি বললাম, "ম্যাচের দিন চুনি কি সাঁতার কাটে ?"

"নিশ্চয় ! ওকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, ওর অমন ডজ, অমন স্পিড, অমন ব্রেন হয় কী করে ? সবই মা গঙ্গার কৃপায়। যে জলে কারেন্ট আছে, সেখানে সাঁতার কাটার উপকারিতা যে কী, তা তো জানো না ? অরুণ ঘোষ এমন দারুণ খেলে কী করে ? শিবপুরে বাড়ি, পা বাড়ালেই গঙ্গা।"

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মন্টেদা উঠলেন, "যাই, তেলটেল জোগাড় করিগে।"

নিমাই নেই। আনোয়ার আর আমাকে পাইকপাড়া অগ্রগামী খেলাতে এনেছে। আনোয়ারকে বললাম, "যাবি গঙ্গায় ?" ও আঁতকে উঠল, "গঙ্গায় ! আরে বাপ্‌স ! চৌবাচ্চায় পর্যন্ত নামি না—সাঁতার জানি না বলে।"

কিন্তু ইস্টার্ন-এর রাইট আউট আর স্পোর্টিং ইউনিয়নের লেফট হাফব্যাক সরষের তেলের খোঁজে ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। আধ কিলো নিয়ে আমরা চারজন চাতরার গঙ্গার ঘাটে বসে মন্টেদার কথামতো মাস্‌লগুলোকে আধ ঘন্টা ধরে আলগা করে জলে যখন নামলাম, মন্টেদা তখন ছোট্ট একটা তেলের বাটি হাতে ঘাটে এসে বসলেন। বেশ আরামে সাঁতার কাটা শুরু করলাম।

মন্টেদা চিৎকার করে বললেন, "ঘাটের কাছে ফুরফুর করে মেয়েদের মতো সাঁতার ! তোরা কি ফুটবলার না, লুডো প্লেয়ার ?"

প্রবল বিক্রমে আমরা মাঝ গঙ্গার দিকে রওনা হয়ে গেলাম এবং আধ ঘন্টা পরে যখন ফিরলাম, তখন দম ফেলতে পারছি না। মন্টেদা বাহুতে মালিশ করতে করতে বললেন, "এই তো, একেই বলে সাঁতার। এখন রেস্ট, জলে ফ্লোট করো এবার।"

অতঃপর আমরা চিত হয়ে জলে ভাসতে শুরু করলাম। মিনিট দশেক পর পাড়ের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। ভাঁটার টানে চাতরা-ঘাট থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। টানের বিরুদ্ধে সাঁতরে ফিরে এসে ঘাটের সিঁড়িতেই আমরা এলিয়ে পড়লাম।

মন্টেদা জলে নামতে নামতে গম্ভীর হয়ে বললেন, "এবার ভাত খেয়েই শুয়ে পড়বে। মনে রেখো, বিকেলে ফাইনাল খেলা।" তার পর কানে আঙুল ঢুকিয়ে কয়েকটা ডুব দিয়েই তিনি উঠে পড়লেন।

গনগনে খিদে পেয়েছিল। গোগ্রাসে ভাত আর মাংস খেয়েই শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙিয়ে দিল, সারা টিম তখন ড্রেস করে মাঠে রওনা হবার জন্য তৈরি।

সর্বাঙ্গে ব্যথা, মাথা ঝিম ধরে আছে, চোখে ঘুম জড়ানো, পেট ভার। ডাক ছেড়ে আমার কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল।

থ্রু বাড়িয়ে দিচ্ছে, ছুটতে পারছি না, হেড করার জন্য শরীর তুলতে পারছি না, সামান্য সাইড পুশেই ছিটকে পড়ছি, ভলি মারতে পা উঠছে না। মাত্র দশ গজ দূরে একবার ফাঁকা গোল পেয়েও শট নেবার আগেই সুধীর কর্মকার পা থেকে বল ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মাঠের চারদিক থেকে টিটকারি আর গালাগাল, বিশেষ করে আমাকেই। কেননা মাঠের মধ্যে সব থেকে বয়স্ক মন্টেদা যে রকম অনায়াসে সব থেকে কনিষ্ঠকে বোকা বানাচ্ছেন, তাতে দর্শকরা মজাই পাচ্ছিল, শুধু পাইকপাড়া অগ্রগামীর অফিসিয়ালরা ছাড়া। হাফ টাইমে আমাকে এবং লেফট হাফ ব্যাককে বসানো হল।

বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত লজ্জায় আমি আর মাথা তুলতে পারিনি। আনোয়ারকে হিংসে করেছিলাম সাঁতার না জানার জন্য। বাঘের মতন ও খেলেছিল। ত্রিবেণী ২—০ গোলে জিতেছিল। প্রথম গোলটা পেনালটি থেকে ; মন্টেদা পেনালটি কিক করেন। আনোয়ার পরে বলেছিল, বলটা স্পটে বসিয়ে মন্টেদা একবার গোলকিপারের দিকে তাকান। গোলকিপার দেখল মন্টেদার চোখ ট্যারা ! বেচারা ভ্যাবাচাকা খেয়ে কোন দিকে পজিশন নেবে বুঝতেই পারেনি। তার বাঁ দিকে তিন হাত দূর দিয়ে বল গোলে ঢোকে, সে ডান দিকে ডাইভ দিয়েছিল।

রাজস্থানের সঙ্গে খেলার আগের দিন রাত্রে জানলা দিয়ে গঙ্গার মতন ঘোলাটে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার চাতরার ফাইনালের কথা মনে পড়ল। আর হাসি পেল। ওপেন নেট মিস করেছিলাম। কাল করব না, হে ভগবান কাল বৃষ্টি দিও না। আমি 'ইফ নট রেইন'-এর লিস্টে আছি। জীবনের প্রথম ঘেরা মাঠে খেলার সুযোগটা নষ্ট করে দিও না। তার পর শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ ৭ ॥

সকালে উঠে দেখি, কখন যেন বেশ ভালই বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে মাঝে মাঝে নীল রঙের ছোপ। মেঘ অনেকটা কেটে গেছে। শরীরটা ঝরঝরে তাজা লাগল। মাকে বললাম, "আজ আমার খেলা আছে।"

কথাটাকে মা গুরুত্ব দিলেন না। খেলা আমার প্রায় রোজই থাকে। বললাম, "আজ প্রথম খেলব ফার্স্ট ডিভিশনে।"

মাকে আজ অন্যমনস্ক লাগল। খুবই সাধারণভাবে বললেন, "ভাল করে খেলিস।"

আশা করেছিলাম উৎসাহে মা'র চোখমুখ ঝলসে উঠবে, কিন্তু কিছুই হল না। অভিমানে আর ওই প্রসঙ্গ না তুলে বললাম, "খাবার আছে ?" মা'র মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ব্যাপারটা আমি বুঝলাম এবং রেগে উঠলাম। কিন্তু কার উপর রাগ করব ভেবে পেলাম না। অরুণা গ্লাস ফ্যাক্টরি ? যেখানে লক আউট চলছে আর

তাই বাবা বেকার ! বাবা এখন দোকানে সামান্য একটা কাজ করেন, যা পান তাতে দু' বেলা কয়েকটা রুটি ছাড়া আর কিছু আমাদের জোটে না।

পিন্টু বুঝতে শিখেছে আমরা দরিদ্র, ওর হাবভাবে এখনই যেন কেমন বুড়োটে ছাপ পড়ে গেছে। বায়না আবদার বা অভিমান কি রাগারাগি একদম করে না, গম্ভীর হয়ে শুকনো মুখে বেরিয়ে যায়। শুধু কান্নাকাটি জুড়ে দেয় পুতুলটা। তখন নীলিমা ওকে টেনে নিয়ে যায় নিজেদের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় পুতুল খেলা করছে। নীলিমার মা দু' বছর আগে মারা গেছেন। সেই থেকে সে সংসারের কর্ত্রী। বাবা টাকা এনে ওর হাতে দেয়, নীলিমা গুছিয়ে হিসেব মতো খরচ করে।

রাগটা শেষ পর্যন্ত নিজের উপরই এসে পড়ে। আমারও তো কিছু করণীয় আছে। আজ পর্যন্ত আমি শুধুই নিয়েছি, কিছুই দিইনি। ক্লাস টেনে ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছি। স্কুল ভাল লাগে না, তা ছাড়া আমি বুঝে নিয়েছি লেখাপড়া করার মতন মাথাও আমার নেই। আমি ফুটবল খেলতে ভালবাসি ; শুধু ফুটবলই খেলি। তাতে বাবা, মা, ভাই, বোন—কারও কোনও উপকারই হয় না।

সংসারে বিন্দুমাত্র সাহায্যও আমি করতে পারি না ! মাঝে মাঝে নিজেকে ফালতু মনে হয়। শুধু আড্ডা আর খেলা ! কোন মুখে আমি সংসারে দু' মুঠো ভাত দাবি করব ? ফুটবল এখনও আমাকে কিছু দাবি করার মতন জোর দেয়নি। আমার সামনে টাকা রোজগারের একমাত্র পথ খোলা রয়েছে, মাঠে। বড় ফুটবলার না হতে পারলে দেশে আমি আর একটা অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়াব মাত্র।

তীব্র একটা জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ড্রেস করে ফুটবলটা হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ঢালাই লোহার নানা রকম জিনিস তৈরির একটা কারখানা মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই, তার গায়ে ছোট এক খণ্ড জমি আমাদের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড। এই জমিতেই ফুটবল খেলা শুরু করি। পিন্টু রাস্তায় তার বন্ধুদের সঙ্গে তুমুল তর্ক করছিল, কানে এল ওর চিৎকার—"য্যা য্যা, জারনেলের মতন স্টপার হতে গেলে নঈমকে আবার নতুন করে খেলা শিখে আসতে হবে।"

আমাকে দেখেই পিন্টু ছুটে এল, "দাদা, যাব তোর সঙ্গে ?"

"আয়।"

বলটা আমার হাত থেকে ও নিয়ে নিল। ক্লাব থেকে বলটা চেয়ে নিয়ে রেখেছি। দুটো তাপ্পি দেওয়া, আকারে অনেকটা পেয়ারার মতন। সকাল বা দুপুরে যখনই পারি রোজ একা একা স্কিল প্র্যাকটিস করি। মাঝে মাঝে পিন্টু আর তার বন্ধুরা আমার সঙ্গী হয়।

আগে বাঁশের কঞ্চি চার হাত অন্তর পুঁতে বল নিয়ে এঁকেবেঁকে ড্রিবল প্র্যাকটিস করতাম। হর্ষদা একদিন বললেন, "গ্যারিনচাকে এভাবে প্র্যাকটিস করতে বলায়, সে নারাজ হয়ে বলে, 'অপোনেন্ট তো আর খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সে নানাভাবে বাধা দেবেই, কাজেই প্র্যাকটিস করতে হলে সচল মানুষের সঙ্গে ড্রিবল করা দরকার'।"

কথাটা আমার মনে ধরেছিল। সেই থেকে আমি পিন্টু আর তার বন্ধুদের পেলেই প্র্যাকটিসে ডাকি। আজ ওর বন্ধুরা কেউ এল না। কারণ জিজ্ঞাসা করতে ইতস্তত করে পিন্টু বলল, "দরকার নেই ওদের আসার।"

"কেন, কী হল ? ঝগড়া হয়েছে ?"

পিন্টু চুপ করে রইল। খানিকক্ষণ পর বলল, "তুমি নাকি একদিনও খেলায় চান্স পাওনি, বসিয়ে রেখে দিয়েছে। আনোয়ারদা আর নিমাইদা রোজ খেলে ?"

আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল, "হাঁটুতে চোট রয়েছে। প্র্যাকটিসে টিকাদার বলে একজন এমন ট্যাপ করেছে যে ভাল করে এখনও শট নিতে পারি না।"

পিন্টুর মুখ স্বস্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর আমি মনে মনে কুঁকড়ে গেলাম। ওর কাছে আমি হিরো, আর সেটা বজায় রাখতে মিথ্যে কথাগুলো আপনা থেকেই কেন বেরিয়ে এল, ভেবে পেলাম না। হয়তো ভয়ে। প্রচণ্ড এক স্ট্রাইকার আমার ইজ্জতের ডিফেন্স ভাঙবার জন্য আঘাত হানতে উদ্যত। আমি একটা বিশ্রী ফাউল করে তাকে আটকালাম।

কারখানার তিনতলা সমান উঁচু দেয়ালটাকে গোল বানিয়ে টারগেট শুটিং করি। ইট দিয়ে দাগ টেনে মাটি থেকে ৮ গজ × ৮ ফুট একটা ঘর করে সেটাকে ছয় ভাগ করে ১, ২, ৩ লিখে দিয়েছি। পিন্টু বা আর কেউ চেঁচিয়ে নম্বর বলে আর আমি শট করি। দেয়ালে লেগে বল ফিরছে, তখন আবার চেঁচিয়ে নম্বর বলে, আমি ফিরতি বল না থামিয়ে হেড দিয়ে কি শট করে আবার টারগেটে পাঠাই। এভাবে মিনিট দশেকেই হাঁফিয়ে যাই। একটু জিরিয়ে আবার শুরু করি। এভাবে প্র্যাকটিস করতে হর্ষদা আমায় বলে দিয়েছিলেন। কোনও দিন শুধুই পেনালটি শট করি গুনে গুনে একশোটা, কিংবা চিপ করি, কেউ বল ছুড়ে দেয় হেড করি, ভলি মারি আর পিন্টুর পাঁচ-ছ জন বন্ধুর সঙ্গে ড্রিবল করি।

আজ শুধুই পিন্টু। গোলে অর্থাৎ দেওয়ালে শট করছি, পিন্টু পিছন থেকে নম্বর বলছে। বল মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে ছিটকে গেলে আমিই ছুটে কুড়িয়ে আনছি। এক সময় দেখি, নীলিমা দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। বুকের কাছে বইয়ের গোছা, পরনে নীলপাড় সাদা শাড়ি। স্কুল থেকে ফিরছে। শাড়ি পরলে ওকে কিছুটা বড় দেখায়। ওর স্কুলটা মাইলখানেক দূরে। বাসে দশ পয়সা ভাড়া, যাতায়াতের সেই কুড়িটা পয়সা বাঁচাবার জন্য হেঁটে যায় আর আসে।

বলটা রাস্তার দিকে যেতেই নীলিমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। ও হাসল। আমি বললাম, "স্কুল থেকে ?" ও ঘাড় নাড়ল। মুখটা শুকনো। কপালে কয়েকটা চুল ঘামে সেঁটে রয়েছে। আঁচল দিয়ে গলা ও ঘাড়ের ঘাম মুছল।

"আমার স্কুল বসবে বিকেলে !" বলে আমি হেসে উঠলাম।

"তাই বুঝি পড়া তৈরি করছ ?" নীলিমার সাজানো দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল।

"আমি খুব খারাপ ছাত্র, প্রমোশন পাব কি না জানি না !" হতাশার ভাণ করে বললাম।

"খাটলে পাশ করবেই করবে।"

নীলিমার স্বরে, চোখে, এমনকী দাঁড়াবার ভঙ্গিতে আর পরিহাস নেই। আমার ভিতরে আলতোভাবে একটা প্রত্যয় পাখির মতন ডানা মেলে ভেসে এল। হাতের বলটাকে হঠাৎ কিক করে সোজা শূন্যে তুলে দিলাম। পিন্টু চিৎকার করে উঠল, "তিন।"

একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে ফেললাম। চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে বলটাকে ব্যাক ভলি করলাম। এভাবে জীবনে কখনও মারিনি। আশ্চর্য, আশ্চর্য, তিন নম্বর টারগেটের মাঝখানে বলটা দুম করে লেগে ফিরে এল। পিন্টু দু' হাত তুলে চিৎকার করে বলটার পিছু ধাওয়া করল। নীলিমার বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে গেছে, আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমিই প্রসূন ভট্চাজ কি না !

"দাদা আর একবার।" পিন্টু আমার কাছে বলটা পাঠিয়ে দিয়ে বলল।

ভালভাবেই জানি, ব্যাপারটা আন্দাজে এবং ভাগ্যের জোরে হয়ে গেছে। আর একবার করতে গেলে, কারখানার চালার উপর দিয়ে বল উড়ে যাবে কি রাস্তার ওপরে পড়বে, তা ভগবানও জানে না।

"হাঁটুতে একটা চোট আছে, এখনও ভাল করে সারেনি।" নীলিমাকে বললাম, "ফট করে যদি লেগে যায়..."

"না না, আর করতে হবে না !" নীলিমা ব্যস্ত হয়ে বলল।

"আর একবার মারি।"

"না না, আগে পুরোপুরি সারুক।" নীলিমা হাত তুলে বারণ করল। আমি হাঁফ ছাড়লাম। স্ট্রাইকারকে আটকাতে ছোটখাটো ফাউল করাটা খেলার মধ্যেই পড়ে।

"বড্ড খিদে পেয়েছে।" পেটে হাত দিয়ে চোখ মুখ করুণ করে তুললাম। আমি জানি, নীলিমার সঙ্গে ছোট্ট একটা প্লাসটিকের পয়সা রাখার ব্যাগ সব সময় থাকে।

"অমনি খিদে পেয়ে গেল, পড়া শুরু করতে না করতেই !" দু' আঙুলে ব্লাউজের মধ্য থেকে ব্যাগটা বার করতে করতে নীলিমা ধমকে উঠল। খুট করে ব্যাগের বোতামটা খুলে ও বলল, "বেশি নেই, তিরিশটা পয়সা বড়জোর দিতে পারি।"

"মোটে তিরিশ ! এমন একটা ব্যাক ভলি দেখালাম !"

"আচ্ছা, পঁয়ত্রিশ।"

"না না, প্লিজ, আট আনা করো। বদুর দোকানে চারটে কচুরি আর দুটো জিলিপি। ভীষণ খিদে !"

এবার আর ভাণ নয়। আন্তরিকতার সঙ্গেই বললাম। নীলিমা আমার মুখ দেখেই বুঝল এবং একটি আধুলি দিল।

"ধার রইল।"

"এই নিয়ে কত হল ?" গম্ভীর হয়ে নীলিমা বলল।

"হিসেব রেখো, সব একবারে শোধ করে দেব।"

নীলিমা বাড়ি চলে গেল। গত এক বছরে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট টাকা এইভাবে ওর কাছ থেকে নিয়েছি। প্রতিবারই বলেছি, লিখে রেখো, সব শোধ দিয়ে দেব। নিশ্চয়ই দেব। আমার এই পরিশ্রম বৃথা যাবে না, যেতে দেব না।

পয়সা হাতে আসতেই খিদেটা চনচনে হয়ে চাড়া দিল। বলটা পিণ্টুকে দিয়ে বললাম, "বাড়ি চলে যা।"

"আর খেলা উচিত নয়। চোটটা আবার চাগিয়ে উঠতে পারে।" বিজ্ঞের মতন পিণ্টু আমাকে উপদেশ দিল। হাসি পেলেও হাসলাম না আমি। পিণ্টু বল নিয়ে ধাপাতে ধাপাতে চলে গেল।

মিনিট পনেরো পরে বদুর দোকানে গরম কচুরি আর জিলিপি খেয়ে জলের গ্লাসটা হাতে নিয়েই মনে পড়ল, পিণ্টুরও খাওয়া হয়নি আজ। পাথর হয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ। শুধু পেটের মধ্যেটা মুচড়ে উঠল।

॥ ৮ ॥

আমি আর পলাশ টিকাদার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আবার আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশের উত্তর আর পুব নীলে-ধূসরে মাখা। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমে গাঢ় কালো মেঘ। বাতাস বইছে না। ভ্যাপসা গরমে আমরা ঘামছি। বৃষ্টি হবে কি হবে না, বোঝা যাচ্ছে না। আমার প্রথম খেলার ভাগ্য লেখা রয়েছে আকাশে।

ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। মেঘটা ছড়িয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে—তার একটা কোণ মহমেডান মাঠের দিকে। টিকাদারের মুখ খুশিতে ভরে উঠল। বুট পরার জন্য সে টেন্টের ভিতরে চলে গেল। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেঘটা ছড়াচ্ছে পশ্চিম দিকে, হাওয়া বইছে পশ্চিমে। হাঁফ ছাড়লাম।

বুট পরে টেন্ট থেকে বেরিয়ে টিকাদার আকাশে তাকিয়েই বিরক্ত হল। আমার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখে সে আবার টেন্টে ঢুকে গেল। এর দশ মিনিট পরেই এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে ভেসে পালাল একটা ছোট্ট মেঘ। আমি বুট হাতে শুকনো মুখে টেন্টের এক কোণে দাঁড়িয়ে। নিমাই বুট পরতে পরতে আমাকে লক্ষ করছিল। কাছে এসে বলল, "খেলবি আজ ?" জবাব না দিয়ে আমি মুখ ঘুরিয়ে টেন্টের বাইরে চলে গেলাম।

মিনিট পাঁচেক পরই বিপিনদা ব্যস্ত হয়ে আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন !

"কাণ্ড দ্যাখো তো, খেলার ঠিক আগেই বমি শুরু হল। প্রসূন কোথায়, প্রসূন...এই যে দ্যাখো তো নিমাইয়ের কাণ্ড ! যাও, যাও ড্রেস করো।"

বেঞ্চে নিমাই শুয়ে। হাত দিয়ে চোখ ঢাকা। হঠাৎ নাকি বমি করতে শুরু

করেছে। ড্রেস করে বেরোবার সময় আনোয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী হল রে ?"

নির্বিকার ভাবে আনোয়ার বলল, "আধ শিশি আইডিন খেলে বমি তো হবেই।"

শোনামাত্র বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। শুধু বললাম, "বাঙালটা সব পারে।" নিমাইয়ের কাছে গিয়ে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললাম, "গুনে গুনে তিনটে গোল দেব।"

চোখ থেকে হাত না সরিয়ে নিমাই বলল, "মোহনবাগানকে তো ?"

"না—" শেষ করার আগেই থেমে গেলাম। হাত নামিয়ে নিমাই জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে।

বললাম, "আজকে।"

আমি হ্যাট্রিক করতে পারলাম না প্রথম খেলায়। শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের ডিফেনডিং জোনে নেমে এসে আমাকে ট্যাক্‌ল করতে হল রাজস্থানের হাফ ব্যাকদের। আনোয়ারের দু' পাশ দিয়ে দুটো ছেলে, সুকল্যাণ আর সুভাষ বেরোচ্ছে। আমরা দশজন পেনালটি বক্সের মধ্যে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে পাঁচ গোল খেয়ে যাওয়ার কথা। সুকল্যাণের ডান পা থেকে বেরোনো তিনটে গোলার একটা পোস্টে, একটা আনোয়ারের কাঁধে আর অন্যটা কোন জাদুমন্ত্রে জানি না, বারের উপর দিয়ে তুলে দিল গোলকিপার। বাকি দুটো নষ্ট করল সুভাষ নিজেই। তার পর ১৮ মিনিটে কীভাবে যেন একটা বল ছিটকে সেন্টার লাইনের কাছে চলে এল। আমি বলটা ধরে রাজস্থান গোলের দিকে তাকিয়ে দেখি—গোলকিপার আর আমার মাঝে শুধু ওদের স্টপার ব্যাক ফেন।

মাঝ-মাঠ থেকে আমি বল নিয়ে দৌড়োতে শুরু করলাম, একটু কোনাকুনি, ডান দিকের কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে। ফেন আমার সঙ্গেই দৌড়চ্ছে, তার বাঁ দিক কভার করে। লেফট ব্যাক নেমে আসছে। বয়স্ক ফেনকে মুখোমুখি কাটাতে পারব বলে ভরসা হল না। স্পিডে হারাব স্থির করেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলটা বাঁ দিকে প্রায় পনেরো গজ ঠেলে দিয়ে ফেনকে ডান দিক থেকে প্রচণ্ড দৌড়ে পিছনে ফেলে দিলাম। পেনালটি বক্স-এর মধ্যে যখন ঢুকছি, গোলকিপার অরুণ তীরবেগে এগিয়ে আসছে ! সেই সঙ্গে দু পাশ থেকে দুই ব্যাক।

আমি শুধু অরুণের শরীরের ভঙ্গিটা লক্ষ করলাম। লাফ দেবার আগে বেড়াল যেমন করে, সেই রকম শরীরটাকে ধনুকের ছিলার মতন টেনেছে। আমি বাঁ দিকে হেলে যাওয়া মাত্রই ও দু' হাত বাড়িয়ে ভেসে এল। আমি মুহূর্তে ডান দিকে বলটাকে টেনে নিলাম এবং ডান পায়ের নিখুঁত নিচু পান্‌চ-এ ডান পোস্ট ঘেঁষে বলটাকে গোলের মধ্যে পাঠালাম আর সেই সঙ্গেই লেফট ব্যাকের প্রচণ্ড চার্জে মাটিতে ছিটকে পড়লাম।

আমার প্রথম গোল ! মাটিতে কাত হয়ে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটার দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি আর জালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বাদামি রঙের ওই গোলাকৃতি বস্তুটা কী নিরীহভাবে বিশ্রাম করছে। আমার সারা পৃথিবী এখন মনে হচ্ছে ওই বলটা। ইচ্ছে করছিল বলটাকে দু হাতে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরি।

আমাকে তুলে ধরল দুজনে। রাইট উইং আর রাইট ইনসাইড আনোয়ার দু হাত তুলে ছুটে আসছে। আমার মাথা ঘুরছে তখন। আনোয়ার কী সব বলতে বলতে গালে চুমু খেল। মেম্বার গ্যালারির দিকে তাকালাম। গোটা পঞ্চাশেক লোকও হবে না। মাত্র এই ক'জন সাক্ষী রইল আমার প্রথম গোলের। শোভাবাজারের গোটা টিমটাই আমাকে জড়িয়ে ধরছে, পিঠ চাপড়াচ্ছে। গ্যালারি থেকে কে একজন চিৎকার করে ঠাট্টা করল, "হয়েছে রে হয়েছে, এবার সেন্টার কর, যেন শিল্ড পাবার গোল দিয়েছিস !" শুনে আমি খুব লজ্জা পেলাম।

দু' মিনিটের মধ্যেই রাইট উইং-এর ক্রস সেন্টার থেকে সুভাষ হেড করে গোল করল। পরের মিনিটেই আবার একটা একইভাবে হেড করে। হাফ টাইম-এর সময় বিপিনদা এসে উত্তেজিতভাবে আমায় নির্দেশ দিলেন, "নামবে না তুমি, একদম নামবে না সেন্টার লাইনের এধারে। গোল খাই খাব, তুমি উঠে থাকবে। আর রতন, তুই শুধু বল বাড়াবি।"

রতন হচ্ছে সেই ছেলেটি, প্রথম দিনে যার নাক ফাটতে দেখেছি প্র্যাকটিসের সময়, আর যাকে বিপিনদা একটা চাকরি দেবেন বলেছেন। রতন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার ক্লান্ত শরীরটা মাটিতে শুইয়ে চোখ বুজল।

একটা অ্যালুমিনিয়ামের গেলাশ আর এক বালতি জল। একজন জল খেয়ে গেলাশটা আর একজনের হাতে দিচ্ছে, সে বালতিতে ডুবিয়ে জল তুলে খাচ্ছে। গেলাশের জন্য অপেক্ষা করছি, তখন টিকাদার বলল, "খাওয়াচ্ছিস তো আজ !"

"কেন ?" বিরক্ত হয়ে বললাম।

"সিজনে শোভাবাজারের প্রথম গোল স্কোর করলি !"

আমি ফিকে হেসে জলের গেলাশের জন্য হাত বাড়ালাম। টিকাদার বলল, "টিমে আমার জায়গাটা তো খেলি, কমপেন্‌সেট্ করবি না ?"

শুনে আমার ভালই লাগল। বললাম, "আজ নয়, আর একদিন।"

মাঠে নামবার আগে একবার গ্যালারির দিকে তাকালাম। একেবারে মাথায় এক কোণে কুঁজো হয়ে নিমাই বসে। ওকে আমরা টেন্টের মধ্যে শুইয়ে রেখে বেরিয়ে ছিলাম। আমায় তাকাতে দেখে চট করে ও হাত তুলল। দেখলাম হাতের আগায় তিনটে আঙুল উঠে রয়েছে।

সুভাষের হ্যাট্রিকের জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে ওরা আরও দুটো গোল নষ্ট করার পর সুকল্যাণ হঠাৎ একটা গোল করে মুষড়ে পড়ল। ও বুঝতেই পারেনি পনেরো গজ দূর থেকে মারা বলটা বিনা বাধায় গোলে ঢুকে যাবে। সুভাষ বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের ঘুষি মেরে রাগে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে ফিরে গেল এবং দু' মিনিটের মধ্যেই আনোয়ারকে ছিটকে ফেলে দিল শোল্ডার চার্জে।

আমার কিন্তু অবাক লাগল রতনকে। বিপিনদার নির্দেশই শুধু নয়, ও যেন নিজের দলের বাকিদের কথাও ভুলে গেছে। বল পেয়ে ও একাই ছুটছে। আমি চেঁচাচ্ছি বলের জন্য, কিন্তু রতন কানেই নেয় না। জিরজিরে বুকটা হাপরের মতন ওঠানামা করছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে, মুখ লাল, ঘাম গড়াচ্ছে রগ বেয়ে থুতনি পর্যন্ত। তবু রতন তাড়া করছে, বল ধরে আবার একাই এগোচ্ছে এবং যথারীতি ওর পা থেকে বল ওরা কেড়ে নিচ্ছে। কিছু যেন ভর করেছে ওকে, সারা মাঠ চষছে, কিন্তু বোকার মতন, অযথা। আমি অধৈর্য, বিরক্ত হয়ে পড়ছিলাম। মাঠের বাইরে থেকে বিপিনদার চিৎকার কানে এল, "বল ছাড়, রতন! বল ছাড়, প্রসূনকে দে!"

রতন বল ছাড়ার বদলে নিজেই মাঠ ছাড়ল। পায়ে পা জড়িয়ে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারছিল না। দু-তিনজনে ওকে ধরে মাঠের বাইরে রেখে এল আর ওর জায়গায় নামল টিকাদার। তার পরই রাজস্থান পেনালটি পেল। ওদের লেফট আউট আমাদের দুজনকে কাটিয়ে গোল পোস্টের কাছে এসে ব্যাক সেন্টার করতে যাবে, টিকাদার তার পেটে লাথি মারল। পেনালটি থেকে গোলটা করল সুভাষ।

৪—১ গোলে এগিয়ে থেকে ওরা এবার একটু আলগা দিল। আমি দু'বার বল পেয়েও কিছু করতে পারলাম না। রাইট উইং-এর একটা ক্রস পাস ভলি মেরে বারের উপর দিয়ে পাঠালাম। আর একবার দুজনকে কাটিয়ে সামনেই পড়ল ফেন। পাশে কেউ নেই যে ওয়াল করব। তাড়াতাড়ি পেনালটি বক্সের মাথা থেকেই গোলে মারলাম, অরুণ আঙুলের ডগা দিয়ে বলটা তুলে বারের ওপারে পাঠিয়ে দিল।

আমার তখন নিমাইয়ের কথা মনে হল। নিমাই থাকলে, ওকে বলটা ঠেলেই ডান দিকের পোস্ট-এর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ বরাবর আমার জায়গায় চলে যেতাম। নিমাই ঠিক বলটা পাঠিয়ে দিত আমার এক গজ সামনে। তার পর শরীরটাকে বাঁ দিকে একটু হেলিয়ে ডান পা-টাকে পিছনে এক ফুট তুলে বিদ্যুৎ গতিতে একটি ছোবল।

খেলার শেষ বাঁশি বাজার পর মাঠেই আনোয়ার আর টিকাদারের মধ্যে একটা খণ্ডযুদ্ধ প্রায় বেধে যাচ্ছিল। কারণ সেই পেনালটি। আনোয়ারের মতে, টিকাদার অযথা গোল খাইয়েছে লাথিটা মেরে। লেফট আউট ব্যাক-সেন্টার করতই, কিন্তু তা থেকে গোল নাও হতে পারত, চান্স পাওয়া যেত ক্লিয়ার করার। কিন্তু পেনালটি করিয়ে টিকাদার রাজস্থানকেই শিওর চান্স করিয়ে দিয়েছে।

জবাবে টিকাদার কতকগুলো অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারণ করল, তখন আনোয়ার তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। টিকাদার ভয়ংকর চোখে আনোয়ারের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে, দাঁত চেপে 'আচ্ছা, দেখা যাবে—' বলে মাঠ থেকে বেরিয়ে এল।

নিমাই গ্যালারি থেকে নেমে এসেছে। বিপিনদা আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "বেশ, বেশ, ভালই খেলেছ।" রতন আমার দিকে অদ্ভুত চোখে একবার

তাকাল। কেমন বিষণ্ণতা আর ভয় ওর চাহনিতে। দুটো টোস্ট আর একটা সিদ্ধ ডিম খেয়ে যখন আমরা তিনজন বাড়ির পথে রওনা হচ্ছি, রতন ইশারায় আমাকে ডাকল।

"তুমি গরিব ঘরের ছেলে, আমিও তাই", রতন ভারী এবং স্থির স্বরে বলল, "এখানে টাকা দেয় না, সুতরাং তুমি নিশ্চয়ই পরের বছর অন্য ক্লাবে যাবে। যাবেই, আমি জানি। তোমার খেলা আছে, তুমি এখানে পচে মরবে কেন!"

আমি চুপ করে রইলাম। রতন আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "একটা চাকরি দেবেন বলেছেন বিপিনদা।"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে বললাম, "জানি।"

"তুমি যদি চাকরি চাও, তা হলে বিপিনদা আগে তোমার জন্যই চেষ্টা করবেন। আমি জানি, আজ তোমার খেলা দেখে বুঝতে পেরেছি।" রতনের স্বর হঠাৎ করুণ দুর্বল হয়ে এল। কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে আমার হাতটাও চেপে ধরল, "চাকরিটা আমার দরকার! আমার বাড়িতে ভীষণ খারাপ অবস্থা, আমার আগে চাকরিটা দরকার, প্রসূন। কথা দাও, তুমি এখানে কিছু চাইবে না। কথা দাও, তুমি এখানে সামনের বছর থাকবে না।"

আমি ওর চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না। অন্য দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি এখানে থাকতে আসিনি। আরও বড় হতে চাই! বড় ক্লাবে যেতে চাই।"

রতন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হাতে চাপ দিয়ে বলল, "কোথায় যেতে চাও, আমার অনেক চেনা আছে। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, এরিয়ান, যুগের যাত্রী?"

"মোহনবাগানে।"

"এখনই? না, আর একটা বছর অন্তত কোথাও কাটাও। তুমি এখনও নেহাতই জুনিয়ার। এখনই অত বড় ক্লাবে যেয়ো না, বসিয়ে রাখবে। এখন একটা বছর নষ্ট হওয়া মানে ভীষণ ক্ষতি। দেখছ না, আমার অবস্থা। লোভে পড়ে বড় ক্লাবে একদিন আমিও গেছলুম। বসিয়ে রেখে দিল। বড় ক্লাবের মোহ ছাড়তে পারলুম না। আশায় আশায় পরের বছরও রইলুম। একটা মাত্র ম্যাচ খেলালে। তাও আধখানা। তার পর উয়াড়ি, তার পর এখানে। আমারও ইচ্ছে ছিল তোমার মতন—আরও বড় হব।"

রতনের স্বর মৃদু হতে হতে গড়ের মাঠের আবছা সন্ধ্যার সঙ্গে মিশে গেল। আমার মনটা ভারী হয়ে উঠল, মাথা নামিয়ে চুপ রইলাম। রতন গাঢ় স্বরে বলল, "আজ আমি খেলেছি ভয় পেয়ে। তুমি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। টিমে আমার পোজিশন বোধ হয় গেল, এই চিন্তাই শুধু মাথায় ঘুরছিল। কিছু মনে কোরো না!" ও আমার হাতে চাপ দিল। আমি মাথা নাড়লাম।

রতন গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "তুমি গোল দাও, অনেক গোল দাও, বড় ক্লাবে যাও। আর শরীরের যত্ন কোরো। আরও ওজন বাড়াতে হবে, আরও খাটতে হবে তোমায়; এজন্য স্বার্থপর হতে হবে, বাড়ির জন্য ভেবে উপোস দিয়ো না, বরং অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে খাবে। গরিবদের নিষ্ঠুর হতে হবে যদি বড়

হতে চায়, নয়তো আমার মতন হবে ; এই রকম স্বাস্থ্য নিয়ে কি বড় ফুটবলার হওয়া যায় ? প্রসূন, দয়ামায়া মমতা বড় ভয়ংকর শত্রু।"

রতন আচমকাই আমাকে ফেলে রেখে টেন্টের মধ্যে চলে গেল। আনোয়ার আর নিমাই অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। কাছে আসতেই ওরা জানতে চাইল, কী কথা হচ্ছিল। আমার মন ভারী বিষণ্ণ হয়ে গেছিল। বললাম, "পরে বলব। এমন কিছু সিরিয়াস কথা নয়।" তার পর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, "হ্যাট্রিক হল না রে, নিমাই।"

"খেলা দেখতে দেখতে ইচ্ছে করছিল রাজস্থানের দিকে নেমে পড়ি। শিওর তা হলে সুভাষের হ্যাট্রিক করিয়ে দিতাম।" নিমাই খুব গম্ভীর হয়ে বলল, "কী রকম ডিফেন্স্ ভেঙে ঢোকে দেখেছিস ?"

কথাটা আনোয়ারের গায়ে লাগল। তাচ্ছিল্য ভরে বলল, "দেখেছি, সব তো এক-ঠেঙে। শুধু স্পিড আর শট ছাড়া আছেটা কী ? হাবিবকে ওয়াচ করিস। কী রকম ওঠানামা করে, অন্যকে খেলায়, স্পেস কভার করে, কী দারুণ রোখ নিয়ে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

নিমাই আর কথা বলল না। বাসে ওঠার আগে আমি ওদের বললাম, "কিন্তু সামনের বছর অন্য ক্লাব দেখতে হবে। এখানে আর নয়।"

॥ ৯ ॥

বিপিনদা কীভাবে যেন জানতে পারলেন, সামনের বছর আমরা তিনজনই শোভাবাজার ইউনিয়ন ছাড়ব ঠিক করেছি। তিনি আমাদের তিনজনকেই একদিন আড়ালে ডেকে বললেন, "তোদের জুনিয়ার বেঙ্গলে খেলাব, সামনের বছরটা থেকে যা।"

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কেউ কথা বললাম না। ভিতরে একটা অস্বস্তি শুরু হল, কেননা আমরা জানি বিপিনদা তা পারেন। আই-এফ-এ-তে শোভাবাজারের সেক্রেটারি পরিমল ভট্চাজের একটা দল আছে, যারা সব কটা কমিটি দখল করে আছে। তারাই শলা-পরামর্শ করে লিগে ওঠা-নামা বন্ধ করিয়েছে গভর্নিং বডির মিটিং-এ। এতে তাদের বড় লাভ—ফুটবল লিগে প্লেয়ারদের জন্য যে খরচ করতে হত, সেটা আর করতে হল না। কেউ টাকা চাইলেই তারা এখন বলে দিতে পারে—গেট খোলা আছে, বেরিয়ে যাও। আমরা রাস্তা থেকে এগারোটা ছেলে ধরে এনে খেলাব। সব ম্যাচ হারলেও, একটা পয়েন্ট না পেলেও কিছুই আসে-যায় না, ওঠা-নামা তো বন্ধ !

সত্যি বলতে কী, অবস্থাটা এই রকম না হলে আমাদের মতন আনকোরা উটকো তিনজন ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার সুযোগ এত তাড়াতাড়ি পেতাম কি না সন্দেহ। প্রতি বছরই শোভাবাজারের অন্তত দু-তিনজন জুনিয়ার বেঙ্গল টিমে থাকে জুনিয়ার ন্যাশনাল চ্যামপিয়নশিপে। জুনিয়ার ইন্ডিয়া টিমেও দুজন ছিল গত বছর।

"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথা ?" বিপিনদা খুব গম্ভীর হয়ে বললেন।

"না-না, তা কেন, তবে " নিমাই আমাদের মুখপাত্র হয়ে বলল।

"তবে কী ? টাকা চাই, চাকরি চাই ?"

"না, তা নয়, বড় ক্লাবে খেলার ইচ্ছে তো সকলেরই থাকে।" নিমাই বলল।

"ভ্যানিয়ান বেঙ্গল, ভ্যানিয়ার ইন্ডিয়া, এর থেকেও বড় ক্লাব আর কী আছে! আগে এ সব ছাপ নিয়ে নে, তখন দেখবি, বড় ক্লাব তোদের বাড়িতে গিয়ে সাধাসাধি করবে।"

বলতে ইচ্ছে করল, অমন গণ্ডা গণ্ডা ইন্ডিয়া ছাপ মারা প্লেয়ার ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্লেয়ার তো মাত্র দু-তিনজন হতে পেরেছে। কিন্তু এ সব কথা এখন বলে কোনও লাভ নেই, তাতে তিক্ততাই শুধু বাড়বে। তাই বললাম, "বিপিনদা, আমরা ভাল করে খেলা শিখতে চাই, ভাল প্লেয়ারদের পাশে থেকে খেলতে চাই। দেখছেন না, প্রত্যেকটা ম্যাচে নিমাই-আনোয়ারের অবস্থা, আমার অবস্থা। কেউ সামলাতে পারে না, আটকাতে পারে না, একটা পাস দিতে পারে না ঠিকমতো, দম নেই, স্কিল নেই, বুদ্ধি নেই। এখানে আমি উৎসাহ পাই না। একা একা কি ফুটবল খেলা যায় ?"

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। গলা চড়ে গেল। নিমাই আর আনোয়ার আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছিল।

বিপিনদার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। "তোরা ক্লাব ছাড়লে পরিমলদা চটবে। ওকে চটিয়ে পারবি উঁচুতে উঠতে ? প্রত্যেকটা ক্লাব ওকে ভয় করে। ইন্ডিয়া টিমে তোদের খেলা বন্ধ করে দিতে পারে, যতই তোরা ভাল খেলিস না কেন। আর, তারই ক্লাবে তোরা খেলবি না, রিকোয়েস্ট সত্ত্বেও ?"

আমরা আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

আমরা যে দ্বিধায় পড়েছি বিপিনদা বোধ হয় সেটা বুঝতে পারলেন। "একটা বছর থেকে যা। সামনের বছর সম্ভবত আবার প্রমোশন রেলিগেশন চালু হবে। আমাদের ক্লাবের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস, কয়েকটা মাত্র মেম্বার, আই-এফ-এর ডোনেশনে কি সারা বছর এতগুলো খেলা চলে ? এর-ওর কাছে ভিক্ষে করেই চালাতে হয়। তবু কথা দিচ্ছি, সামনের বছর প্রথম কিছু কিছু হাত খরচা দেবার চেষ্টা করব। থেকে যা তোরা। শোভাবাজারই তোদের প্রথম ফার্স্ট ডিভিশনে খেলিয়েছে, এটা ভুলে যাসনি। তোরা বড় হবি, ফেমাস হবি—এটা কি আমরাও চাই না ? তখন কি আমরাও গর্ব করব না ?"

বিপিনদাকে অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছে। গলার স্বর গাঢ় আর ভিজে। ভিতরে ভিতরে আমরা বিচলিত হয়ে পড়ছি। পরিমল ভট্চাজকে আমরা চোখে দেখেছি মাত্র, আর ওঁর সম্পর্কে শুনেছি অনেক কথা। নিজের স্বার্থ আর ক্ষমতা রক্ষার জন্য উনি যাবতীয় অপকর্ম করতে পারেন ও করেন। যে কোনও ফুটবলারের কেরিয়ার খতম করা ওঁর পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার। বিপিনদা সে সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন একটা হুমকিও দিলেন।

নিমাই হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, আমরা দু দিন ভেবে আপনাকে জানাব।"
বিপিনদা আমাদের তিনজনের মুখের দিকে পর পর তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

আমি হর্ষদার কাছে গেলাম। ছাদে গোটা কুড়ি টবের মাঝে উবু হয়ে হর্ষদা ফুলগাছের পরিচর্যা করছিলেন। আমার কথা শুনতে শুনতে উনি টবের মাটি খুঁড়ে যাচ্ছিলেন একটা শিক দিয়ে। অনেকক্ষণ কথা বললেন না। একটা গোলাপের শুকনো মরা ডাল গাছ থেকে সাবধানে ভেঙে নিয়ে হর্ষদা মৃদু স্বরে বললেন, "তোর ইচ্ছেটা কী ?"

"আমি এখনও ঠিক করতে পারিনি ক্লাব বদল করব কি করব না। নিমাই-আনোয়ারেরও আমার মতন দোটানা অবস্থা। ওরা একবার বলছে, থেকেই যাই, একটা বছর তো ! আবার বলছে, ধ্যুত, একটা বছর স্রেফ অযথা নষ্ট করা।"

"প্রসূন, এখন তোর সামনে চ্যালেঞ্জ, নিবি কি নিবি না, সেটা তুই-ই ঠিক কর।"

আমি শক্ত হয়ে গেলাম, হর্ষদার গলার স্বর অত্যন্ত ঠাণ্ডা অথচ দৃঢ়। আমি চুপ করে রইলাম মরা গোলাপ ডালটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। হর্ষদা তা লক্ষ করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "ডালটা মরে গেছে, কিন্তু গাছটা দ্যাখ কেমন জীবন্ত। অন্য ডালে কতগুলো কুঁড়িও ধরেছে। এ রকম হয়, সর্বক্ষেত্রেই হয়। মানুষ বেড়ে ওঠে আর ফেলে যায় তার মরা ডালপালা। নতুন ডালে ফুল ফোটায়। এজন্য পরিচর্যা চাই। সার, জল, রোদের তাপ তাকে দিতে হয়। শিকড় থেকে পাতার মধ্য দিয়ে সে প্রাণশক্তি আহরণ করে। যদি শিকড় নষ্ট হয়, পরিচর্যা না পায়, তা হলে বাড়তে পারে না। মানুষের শিকড় তার চরিত্র। তুই যদি অনুগ্রহ নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে বড় হতে চাস তো তোর শিকড় পচে যাবে। এই গাছটা বেড়েছে ফাইট করে ! আমি একে হেল্‌প করেছি মাত্র। মানুষ হেল্‌প নাও পেতে পারে, তখন নিজেকে নিজে হেল্‌প করতে হয়। যার চরিত্র পচে গেছে, সে পারে না। হেরে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। চ্যালেঞ্জ নানা রকম চেহারা নিয়ে আসে, আর মানুষকে তার মোকাবিলা করতে হয়।"

শুনতে শুনতে টের পেলাম সারা শরীরে কলকল শব্দে রক্ত ছুটছে, আর দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট একটা স্বরের মতন আমার বুকের মধ্যে ঢেউ উঠছে। সেই ঢেউয়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে কে যেন বলছে, "স্ট্রাইকার ! স্ট্রাইকার ! তোমার সামনে দুর্ভেদ্য ডিফেন্স। ভাঙতে কি পারবে না ?"

আমি মাথা নামিয়ে নিজেকে শুনিয়ে বললাম, "পারব।"

হর্ষদা অবাক হয়ে একবার তাকালেন, তার পর মরা ডালটা ছুড়ে ফেলে বললেন, "মনে আছে, তোকে হেমিংওয়ের একটা গল্প একবার বলেছিলাম—ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি ! তাতে এক জায়গায় আছে, ম্যান ক্যান বি ডিফিটেড, বাট...তুই লেখাপড়া শিখলি না কেন রে প্রসূন ? তা হলে ইংরিজিতেই বইটা নিজে পড়তে পারতিস। মুখে বললে অনেক কিছু যে নষ্ট হয়ে যায়।"

"আমার মনে আছে হর্ষদা, মানুষকে হারানো যেতে পারে, কিন্তু ধ্বংস করা যেতে পারে না, তাই না ?" এই বলে আমি আর সেখানে থাকিনি।

॥ ১০ ॥

রাস্তায় বেরিয়ে এলোমেলো হাঁটতে শুরু করি। একা প্রায় ঘণ্টাখানেক আমি হাঁটি। অনেক চেনা ছেলের সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু আমি তাদের দেখতে পেলাম না। তারা চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল। অনেক ডাকল, আমি শুনতে পেলাম না। ভূতে পাওয়ার মতন আমি শুধু হাঁটলাম। আর হর্ষদার কথাটা আওড়ালাম মনে মনে, "এখন তোর সামনে চ্যালেঞ্জ, নিবি কি নিবি না, সেটা তুই ঠিক কর।"

"অ্যাই প্রসূন, দেখতেই পাচ্ছ না যে।" থমকে দাঁড়ালাম। নীলিমা সামনে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে। কোমরে হাত, চোখে বিস্ময়।

"বাব্বাঃ, খবরের কাগজে নাম বেরোয়, তাতেই এই—ছবি বেরোলে কী হবে ?"

লজ্জা পেয়ে আমতা আমতা করে বললাম, "যাঃ, ও রকম নাম গণ্ডা গণ্ডা লোকের রোজই বেরোয়। শোভাবাজার ইউনিয়নের প্লেয়ারের আবার নাম ! সত্যি বলছি, দেখতে পাইনি তোমায়। কোথায় গেছিলে ? বাড়ি যাচ্ছ এখন ?"

লজ্জাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য এলোপাতাড়ি প্রশ্ন করলাম, প্রেশারে পড়ে গ্যালারিতে বল ওড়ানোর মতন।

নীলিমা এবার সত্যিই অবাক হয়ে বলল, "সে কী, এই সময়ে টিউশনি থেকে রোজ ফিরি, তা ভুলে গেছ ? কী ব্যাপার, বলো তো ? হাত তুলে দাঁড়াতে বললাম, দাঁড়ালে না। একমনে চলেছ তো চলেছই। কথা বলছ, যেন এই মাত্র পরিচয় হল। উঃ, হয়েছে কী ?"

"একটা ব্যাপারে মুশকিলে পড়ে গেছি, সেটা নিয়েই চিন্তা করছিলুম। হর্ষদার বাড়ি থেকে ফিরছি। চলো একটু হাঁটা যাক।"

আমরা দুজনে মন্থরগতিতে হাঁটতে শুরু করলাম। কেউ কথা বলছি না। নীলিমা গম্ভীর হলে গিন্নিবান্নি দেখায়। মা-মরা সংসার দু বছর ধরে চালাতে চালাতে ও রীতিমতো ভারিক্কি হয়ে গেছে। নানান দিক ভেবেচিন্তে বাবার সামান্য আয় আর নিজের টিউশনির টাকায় ওকে সংসার চালাতে হয়। তার উপর নিজের স্কুলের পড়া আছে।

হর্ষদার কথাগুলো মনে পড়ছে আর যেন গায়ে ছ্যাঁকা লাগে—'যার চরিত্র পচে গেছে, সে পারে না !' 'মানুষের শিকড় তার চরিত্র !' 'চ্যালেঞ্জ নানা রকম চেহারা নিয়ে আসে !' ব্যাপার কী ! এই সব ভাল ভাল কথা দিয়ে আমি কী করব ? ফুটবল, ক্লাব বদল, বেঙ্গল কি ইন্ডিয়া টিমে খেলার সঙ্গে এগুলির কী সম্পর্ক ? আমার স্কিল, স্পিড, ড্রিবলিং, স্ট্যামিনা, বুদ্ধি দিয়ে খেলব—এ সবের সঙ্গে চরিত্রের যোগ কোথায় ? ভিতরে ভিতরে ছটফট করে উঠলাম এক অসহ্য অসহায়তায়। ধরতে পারছি না আমার অপোনেন্ট যে কে, কী যে তার স্ট্র্যাটেজি, বুঝতে পারছি

না।

হালকা হবার জন্যই কথা শুরু করলাম, "টিউশনি থেকে আসছ বুঝি ?"

"না, এক পাবলিশারের কাছে গেছিলাম। প্রুফ দেখার কাজ শিখছি, বাবাই ঠিক করে দিয়েছেন।"

"অনেক টাকা পাওয়া যায় ?"

নীলিমা মাথা হেলিয়ে পিছন থেকে বেণীটা সামনে টেনে আনল। বেণীর গোড়ার আলগা চুলগুলো আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, "অনেক, এক লক্ষ, দু লক্ষ টাকা।"

"ঠাট্টা করছ !"

"মোটেই না। কষ্ট করে সৎভাবে রোজগার করা একটা টাকা আমার কাছে এক লক্ষ টাকার সমান।"

"আমি এখনও রোজগার করতে পারলাম না। বাড়িতে একটা পয়সাও দিই না।" আমি হাসবার চেষ্টা করলাম। নীলিমাও আমার মতন হাসল।

"ফুটবল খেলে তো হাজার হাজার টাকা বছরে পাওয়া যায় শুনেছি। এটাও তো এক রকমের কাজ। যেমন অফিসে, স্কুলে, কলেজে, কারখানায় লোকে কাজ করে। ফুটবলারকে তো ওদের মতনই শিখতে হয় ?" নীলিমা আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

"নিশ্চয়। আমি তো শিখতেই চাই।" এক মুহূর্ত ভেবে আবার বললাম, "জানো, এখন যে ক্লাবে খেলছি, সেখানে কিছুই শিখতে পারি না। ওরা আর এক বছর থাকতে বলছে। তা হলে কিছু টাকা দেবে, জুনিয়ার বেঙ্গল টিমে খেলিয়ে দেবে, এমনকী ইন্ডিয়া টিমেও। কী যে করি, ভেবে পাচ্ছি না। যদি ওদের কথা না শুনি, তা হলে এসব খেলা বন্ধ করে দেবে। শোভাবাজারের পরিমল ভট্চাজের ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স অল ইন্ডিয়ায়। ওকে চটিয়ে কোনও ফুটবলার বড় হতে পারে না।"

নীলিমা কিছুক্ষণ কথা বলল না। দেখে মনে হল গভীরভাবে ভাবছে। আমি আবার বললাম, "হর্ষদা বললেন, এটা একটা চ্যালেঞ্জ।"

"আর কী বললেন ?"

ইতস্তত করে বললাম, "গাছ বেড়ে ওঠে শিকড়ের গুণে। শিকড় হচ্ছে চরিত্র, পচে গেলেই মানুষ মরে যায়।"

নীলিমা রাস্তার উপর থমকে ঘুরে দাঁড়াল। "প্রসূন, যারা চ্যালেঞ্জ নিয়ে বড় হতে পারে না, তারা বড় হবার যোগ্য নয়। প্রসূন, শিক্ষায় যে ফাঁকি দেয় না, সেই একমাত্র বড় হতে পারে। বড় হতে পারে না কাপুরুষেরা। তুমি কি কাপুরুষ, তুমি কি পরিশ্রমে অনিচ্ছুক ?"

"না, তবে সব কিছুতেই ভাগ্য লাগে। পেলে-গ্যারিনচা থাকা সত্ত্বেও ব্রাজিল তো হেরেছে।"

"জানি না কে পেলে কে গ্যারিনচা, কেমন তারা খেলে, কিন্তু তাদের পালটা

টিমেও তো ভাল প্লেয়ার থাকতে পারে ! জ্যাঠামশায়ের ভাগ্য খারাপ, তাই পা নষ্ট করে অপমানিত হয়ে ফুটবল থেকে বিদায় নিয়েছেন। তোমার ভাগ্যে তা নাও হতে পারে। তা ছাড়া, তোমার উচিত নয় কি বাবার অপমানের শোধ নেওয়া ? যারা একদিন তাঁর মুখে থুথু দিয়েছিল, তাদেরই সেই থুথু চাটতে বাধ্য করা ? বড় প্লেয়ার না হলে, বড় কিছু একটা না করলে তা পারবে কী করে ? কাউকে খুশি করে ইন্ডিয়া টিমে খেলতে পারো, কিন্তু বড় প্লেয়ার হতে পারো না।"

আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম বড় বড় চোখ দুটোর দিকে। যে পাষাণ ভারটা চেপে বসেছিল বুকে, সেটা সরে যাচ্ছে। হালকা ঝরঝরে লাগছে নিজেকে। বাবা, আমার বাবা গভীর মর্যাদাবান এক অপমানিত ফুটবলার। ফুটবলকে, হাজার হাজার দর্শককে, তাঁর ক্লাব যুগের যাত্রীকে দিয়েছেন অনেক কিছু, বদলে কিছুই পাননি। দিন-রাত এখন সংসারটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন চাবুক খাওয়া বলদের মতন। বাবা, আমার বাবা ক্লান্ত নিঃসঙ্গ অপমানিত এক ফুটবলার। আর আমি তাঁর স্বার্থপর ছেলে।

"নীলিমা, তুমি আমার বাবাকে ভালবাসো ! নিমাই আর আনোয়ার বাদে তুমি আর মা-ই আমার সব থেকে বড় বন্ধু।"

নীলিমা শোনামাত্র মুখ লাল করে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "হয়েছে হয়েছে, ধার দেবার মতন পয়সা এখন আমার হাতে নেই।"

"একটা চানাচুরের দোকান পর্যন্ত যাবার ক্ষমতাও কি তোমার ব্যাগটার নেই ?"

॥ ১১ ॥

মোহনবাগানের সঙ্গে খেলাটার জন্য ছটফটিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আনোয়ার-নিমাইকে আমি জানিয়ে দিয়েছি, সামনের বছর ক্লাব বদল করবই। ওরা আমাকে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু আমি ঘাড় নেড়ে গেছি গোঁয়ারের মতন। আমি বলেছি, বড় প্লেয়ার হতে চাই, আর কিছু নয়। সেজন্য যত ঝুঁকি নিতে হয়, নেব। ওরা শুনে চুপ করে থেকেছে।

শনিবার মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা আমার জীবনের প্রথম বড় ম্যাচ। প্রথম খেলা। বছরে দু-তিনবার মাত্র আমাদের মতন ছোট ক্লাবের জীবনে এত লোকের সামনে খেলার, চোখে পড়ার, খবরের কাগজে দু-এক লাইন উল্লেখ পাওয়ার সুযোগ আসে। আগের ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফ দু' গোলে হেরেছে, দুটোই আমার দেওয়া গোল।

শুক্রবার ক্লাবে এসে নোটিশ বোর্ডে তাকালাম। প্লেয়ারস্ লিস্ট টাঙানো রয়েছে। সোজা দশ নম্বরে চোখ রাখলাম। এ কী ! এস দত্ত কেন ? সাধন দত্ত কেন ? সাধন, সেই লম্বা সাধন, যে বলে কিক্ করলেই মাটির চাপড়া ওঠে, কেউ চার্জ করতে এলে বল জমা দিয়ে দেয়। আমার নাম কোথায় ? লিস্টের গোড়া থেকে চোখ বুলিয়ে আস্তে আস্তে পাথর হয়ে গেলাম। নিমাই আর আনোয়ারের

নাম আছে।

বিপিনদার কাছে গেলাম। গম্ভীর মুখে উনি বললেন, "ওরা আমার রিকোয়েস্ট রাখবে বলেছে। ওরা নেমকহারাম নয়।"

শোভাবাজার টেন্টটা আমার পায়ের নীচে কাঁপতে শুরু করেছে। আঘাত এসেছে। বুকের মধ্যে কে বলে উঠল, 'প্রসূন, এইবার তুমি মাঠে নেমেছ। প্রথম গোল খেয়েছ। স্ট্রাইকার, বি রেডি, শোধ দিতে হবে। তার পরেও উইনিং গোল দেওয়া চাই, চাই-ই!'

পরদিন আমরা ৬—০ গোলে হারলাম। গ্যালারিতে বসে ছিলাম। খেলা শেষে নিমাই আর আনোয়ার আমায় দেখে ফ্যাকাশে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

তার পর শোভাবাজার ইউনিয়ন টেন্টে আর যাইনি।

ভি আই পি রোডে হর্ষদার এক বন্ধুর বিরাট মোটর সারভিসিং ও পেট্রল ফিলিং স্টেশন। সেখানে তিনি আমাকে কাজ ঠিক করে দিলেন। সারভিসিং-এর জন্য নানান যন্ত্রপাতি—এয়ার কমপ্রেশার, ন্যুম্যাটিক গ্রিজ ও মোবিল পাম্প, হাইড্রলিক লিফট, ওয়াটার কমপ্রেশার, গ্রিজ ও ওয়াটার গান ইত্যাদি নিয়ে আলাদা বিভাগ। দৈনিক আড়াই টাকা মজুরিতে আমি মেট নিযুক্ত হলাম।

আমার কাজ সকাল আটটায় শুরু। 'H' আকৃতির লিফটের উপর মোটরটা প্রথমে ওঠানো হত। তার তলায় দাঁড়িয়ে একটা লোহার খুন্তি দিয়ে মাড-গারড্ আর শ্যাশি থেকে শুকনো কাদা চেঁছে ফেলে ওয়াটার গান দিয়ে ধুয়ে দেওয়ার কাজ আমাকে দেওয়া হয়। হেড মেকানিক মধু সাহা খুঁটিয়ে আমার কাজ লক্ষ করে তফাতে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা নীল টুপি আর নাকে ন্যাকড়া বেঁধে বেশ ভয়ে ভয়েই কাজ করি। মাঝে মাঝে মধু সাহা আঙুল তুলে হুঙ্কার দেয়, "ওই যে, ওই যে রয়ে গেছে, ডিফারেনশিয়াল বক্সের তলাতে...দ্যাখ, চোখ দিয়ে টাই-রডটার জয়েন্টটা দ্যাখ।"

এখন সকালের প্র্যাকটিস প্রায় বন্ধই। আমার ছটফটানি শুরু হয়ে গেল। ভোরে উঠে পাঁচ মাইল দৌড়ে আর আধ ঘণ্টা বল নিয়ে কসরত করে কাজে যাই। কিন্তু এইটুকুতে ভাল প্র্যাকটিস তো হয়ই না, উপরন্তু কাজের সময় ক্লান্তি লাগে। মধু সাহার দাঁতখিঁচুনি শুনতে হয়। পাঁচটায় ছুটির পর বলে তো আর পা দিতে ইচ্ছে করে না। আমি রীতিমতো ভাবনায় পড়ে গেলাম। এখানে চাকরি করলে আমার ফুটবল খেলা উচ্ছন্নে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে গাড়িতে পাম্প থেকে ডিজেল বা পেট্রল ভরে দেবার কাজটায় অনেক খাটুনি কম। যদি ওই কাজে বদলি করে দেয়, আর রাতের শিফটে, তা হলে সারা দিন সময় পাব। রাতে শুনেছি ঘুমোনোও যায়। যার তেল দরকার সে হাঁকাহাঁকি করে ডেকে তোলে।

হর্ষদাকে অসুবিধার কথা বললাম। শুনে বললেন, "আচ্ছা।" দু'দিন পরে মালিক শিশিরবাবু তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

"তুমি ফুটবল খেলো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" তটস্থ হয়ে বললাম।

"তোমার অসুবিধে হচ্ছে খেলায় ?"

"খেলায় নয়, প্র্যাকটিসে। খেলা এখন বন্ধ রেখেছি।"

"কেন বন্ধ ?" ভ্রূ তুলে উনি জানতে চাইলেন। আমি ওঁকে সব বললাম। "আই সি, আই সি !" বলে কলমটা দিয়ে কপালে টোকা দিতে দিতে কী ভাবলেন। তার পর বললেন, "তুমি রাতেই যখন কাজ করতে চাও, তাই করো কাল থেকে।"

আমি হাঁফ ছাড়লাম।

আই এফ এ শিল্ডের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। শোভাবাজারের খেলা প্রথম রাউন্ডে বার্নপুর ইউনাইটেডের সঙ্গে। টিকিট কেটে মোহনবাগান মাঠের গ্রিন গ্যালারিতে বসে খেলা দেখলাম। আর একজন মাত্র ছিল পুব দিকের প্রায় বারো হাজার লোক বসার সেই গ্যালারিগুলোয়। খুব অবাক লেগেছিল লোকটিকে দেখে। টিকিট কেটে এই খেলা দেখতেও কেউ আসে ! আমার কাছে প্লেয়ারস কার্ড ছিল, কিন্তু আমি চাই না নিমাই বা আনোয়ারের মুখোমুখি হতে। এখনও আমার কাছে ব্যাপারটা ধাঁধার মতন। প্রসূন-নিমাই-আনোয়ার মানেই 'থ্রি মাসকেটিয়ারস্'। বহু টুর্নামেন্টে আমরা ওই নামেই পরিচিত হয়েছিলাম। এক সঙ্গে খেলতাম, বেড়াতাম, আড্ডা দিতাম। গত ছ'-সাত বছরে মনে পড়ে না এমন কোনও দিন যে, আমাদের রোজ না দেখা হয়েছে।

অথচ আমি আলাদা হয়ে গেলাম ওদের থেকে। ছটফট করেছি দেখা করার জন্য, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছি, ওরা আমাকে না জানিয়ে চুপি চুপি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার মানে ওরা আমাকে আর চায় না। আমাদের মধ্যে তফাত ঘটে গেছে। আমার পথে ওরা ফুটবল নিয়ে এগোতে রাজি নয়। এক এক বার মনে হয় ওরাই ঠিক করেছে। উপরে ওঠার মই কেউ এগিয়ে দিলে, তাতে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি চাই নিজে মই বানাতে। তফাতটা শুধু এই—আমি পরিশ্রম করতে চাই ওদের থেকে বেশি।

নিমাই বা আনোয়ারও আমার সঙ্গে দেখা করেনি। বোধ হয় ওরা নিজেদের অপরাধী ভাবছে। আমাকে শোভাবাজার ইউনিয়ন বসিয়ে দিল, অথচ ওরা তার প্রতিবাদ করল না ! ভাবতেই মনে হল, ভালই করেছে ওরা আমার সঙ্গে দেখা না করে। যদি জিজ্ঞাসা করি, কেন তোরা আমার পক্ষ নিলি না, কেন খেললি, তখন কী জবাব দেবে ? তবু মনে মনে আমি আজও কষ্ট পাই ওদের অভাবে। কাজটা পেয়ে তবু কিছুটা ভুলে থাকতে পেরেছি। সকালে চার ঘণ্টা টানা মাঠে আর রাস্তায় খাটবার পর দুপুরে খানিকটা ঘুমোই। বিকেলে একটা ক্লাবে যাই একসারসাইজ করতে। রাতে বারোটার পর কদাচিৎ কোনও গাড়ি আসে। ঘুমোবার জন্য অনেক সময় পাওয়া যায়।

॥ ২ ॥

বার্নপুর ৩—১ গোলে জিতল। নিমাই চমৎকার খেলছিল। এখন আর ও থ্রু বাড়ায় না। বুঝে গেছে সেগুলো শুধু নষ্টই হবে। নিজেই বল নিয়ে এগোয়, গোলে মারে। দুজন ওকে পাহারায় রেখেছে, তবুও নিমাই মাঝে মাঝে বেরিয়েছে। একটা গোলও দিয়েছে। কিন্তু ঝরঝরে একটা টিমকে একজন-দুজন কি সামাল দিতে পারে ? গোল খেয়েই বার্নপুর শোভাবাজারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরল। আনোয়ার পর্যন্ত তিনটে ফাউল করল নিরুপায় হয়ে। হাফ টাইমে বার্নপুর ২—১ গোলে জিতছে।

এর পর বলটা একবার বার্নপুরের লেফট হাফের মিস-কিক্ থেকে উড়ে এসে গ্যালারিতে পড়ে ড্রপ খেতে খেতে গ্যালারির নীচে ঢুকে গেল। বার করার জন্য অগত্যা আমাকেই গ্যালারির ফাঁক দিয়ে গলে নীচে নামতে হল। বলটা কিক করে মাঠে পাঠাব বলে তুলে ধরেছি, দেখি, নিমাই এগিয়ে আসছে বলটা নিতে। আমি বল হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও আমাকে চিনতে পারা মাত্র দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি বলটা ছুড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, "ভাল করে খেল।" ওর মুখে একটা যন্ত্রণা ঝিলিক দিয়েই শুকনো হাসিতে রূপান্তরিত হল। এর পর লক্ষ করলাম, নিমাই আর খেলতে পারল না, বা ওর মধ্যে খেলার কোনও ইচ্ছা দেখতে পেলাম না। খেলা শেষ হবার আগেই আমি মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

অরুণা গ্লাস ফ্যাক্টরির লক আউট সমানে চলেছে। খুব ভোরে কাজ থেকে বাড়ি ফিরি দৌড়ে মাইল পাঁচেক ঘুরে। রাস্তার লোকেরা আমার হাফ প্যান্ট গেঞ্জি কেডস্ পরা চেহারাটার সঙ্গে এখন যথেষ্ট পরিচিত, কেউ আর তাকায় না। বাড়িতে ঢুকি প্রায় চোরের মতন। বাবা ঘরে বসে পিন্টু আর পুতুলকে পড়ান এই সময়। আমার খুপরিতে ঢুকে ঢাকা খুলে চটপট রুটি ক'খানা শেষ করেই, বলটা নিয়ে বেরিয়ে যাবার পথে রান্নাঘরে মাকে একটা টাকা দিই। আমার নিজের রোজগারের টাকা। দেবার সময় দারুণ একটা আনন্দ হয়। বাকি দেড়টা টাকায় আমি বেছে বেছে এমন জিনিস কিনে খাই, যাতে বেশি ক্যালরি পাওয়া যায়। আমি সিনেমা দেখা বন্ধ করে দিয়েছি। টেরিলিনের জামা প্যান্টের বয়স প্রায় দেড় বছর হল, সেলাই করে চালাচ্ছি। একজোড়া বুট না কিনলেই নয়। দু-তিনজন এসেছিল টুর্নামেন্টে খেলবার জন্য ডাকতে, রাজি হলে বুট কেন, জামা প্যান্টের সমস্যাও মিটে যেত। আমি রাজি হইনি। সকালে যখন বল হাতে মাঠের দিকে যাই, তখন বই খাতা হাতে মেয়েরা স্কুলে-কলেজে যায়, বাচ্চা ছেলেরা প্রাইমারি স্কুলে। তখন নীলিমার কথাটা মনে পড়ে আর নিজের মনেই বলি : আমিও তো স্কুলে যাচ্ছি। আমার স্কুল মাঠে, আমার বই খাতা এই বলটা।

বাবাকে একদিন সকালে দেখলাম মাথা নিচু করে অন্যমনস্কের মতন কোথায় চলেছেন। আমি আর পাড়ারই কয়েকটি ছেলে, কারখানার মাঠে তখন হেডিং প্র্যাকটিস করছিলাম। একটি ছেলে বলল, "প্রসূনদা, আপনার বাবা যুগের যাত্রীতে

খেলতেন ?"

"হ্যাঁ, কোথায় শুনলি ?"

"মেজকাকা কাল বলছিলেন, দারুণ নাকি খেলতেন। দু পায়ে টেরিফিক শট !"

"বাবার খেলা আমি দেখিনি। আমি জন্মাবার এক বছর পরই খেলা ছেড়ে দেন।"

লক্ষ করলাম আমার কথা শোনামাত্র দু-তিনজন নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুখ টিপে হাসল। প্রথমে বুঝতে পারিনি এর কারণ।

"আপনার বাবা শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলেছিলেন, তাই না ?" একজন বলল।

"ওইটেই তো ওঁর জীবনের শেষ খেলা।" আর একজন বলল।

"কাকা বললেন, একবারে ফাঁকা একটা গোল মিস না করলে, ইস্টবেঙ্গল নাকি হেরে যেত। ও রকম গোল নাকি অন্ধেও দিতে পারে।"

"হ্যাঁ, পারে।" আমি বললাম রাগ চাপতে চাপতে ঠাণ্ডা গলায়, "তোমার কাকা জীবনে কখনও ফুটবল খেলেছেন কি ?"

ছেলেটি থতমত হল।

"সম্ভবত খেলেননি।"

"আপনি জানলেন কী করে ?" উদ্ধত চোয়াড়ে ভঙ্গিতে ছেলেটি বলল।

"খেললে কখনও বলতে পারতেন না যে, অন্ধেও গোল দিতে পারে।"

"অনেক ক্ষেত্রে পারে, কিন্তু ঘুষ খেলে পারে না।"

"তার মানে ?" থরথর করে উত্তেজনায় আমি কাঁপছি। মাথার মধ্যে গলানো বাষ্প উড়ছে। আমি কিছু আর দেখতে পাচ্ছি না।

"তার মানে আবার কী ! সবাই জানে ব্যাপারটা।" ছেলেটি ঠোঁট মুচড়ে দিতেই বাকিরা মুখ টিপে হাসল।

এর পর আমি আবিষ্কার করলাম আমি হাঁটছি। ছেলেটি পেট চেপে ধরে মাটিতে পড়ে বোধ হয় এখনও কাতরাচ্ছে। ফাটা ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখেছি। লাথি মেরেছি না ঘুঁষি, এখন আর মনে নেই। আমি হনহনিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

ঘণ্টাখানেক পর বাড়ি ফিরছি, দেখি আমাদের সরু গলিটায় ভিড়। একটা লোক—চেহারায় স্বচ্ছলতা, মাথায় টাক, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে মুঠো তুলে চিৎকার করছে, "আলবাৎ বলব, ঘুষখোর ! ঘুষখোর ! ঘুষখোর ! আমিও সেদিন মাঠে ছিলাম, আমি নিজে চোখে দেখেছি। সেদিন—" লোকটির গলা ধরে এল, "সেদিন সেই চান্স !" দেখলাম লোকটি সিল্কের পাঞ্জাবির হাতায় চোখ ঘষল, তার পর ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল, "আজও আমরা শিল্ড পাইনি।"

আমি পায়ে পায়ে পিছু হটে গলি থেকে বেরিয়ে এলাম। আবার রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফেরা মাত্র মা ছুটে এসে উঠোনের উপরই আমার চুল

মুঠোয় ধরে ঠাস ঠাস করে চড় কষাতে শুরু করলেন।

"কেন, কেন তুই পরের ছেলেকে মেরেছিস ! বাড়ি বয়ে তোর বাবাকে অপমান করে গেল। তুই, তুই, তোর জন্যই—"

মা হাঁফিয়ে পড়লেন। ছোট্ট নরম ঠাণ্ডা স্বল্পবাক হাসিখুশি মা। মা'র হাতে ব্যথা লাগছে। দুচোখ বেয়ে দরদর জল পড়ছে। পিণ্টু, পুতুল গম্ভীর মুখে দূরে দাঁড়িয়ে। বাবার ঘরের দরজার পাল্লা ভেজানো। বিশুবাবুর মেয়েরা উপর থেকে দেখছে। পাশের বাড়ির জানলাগুলোয় অনেক মুখ। নীলিমা এসে মা'র হাত চেপে ধরতেই দ্বিগুণ জোরে মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "কুলাঙ্গার ! কুলাঙ্গার ! বাপের মান যে নষ্ট করে, তেমন ছেলের মুখ দেখাও পাপ।"

নীলিমা মাকে টেনে রেখেছে। আমি ভেজানো পাল্লা দুটো দড়াম করে খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। বাবা চিত হয়ে শুয়ে, চোখের উপর বাঁ হাত আড়াআড়ি রাখা। শব্দ হতেই হাত সরিয়ে একবার মাত্র তাকালেন।

"বাবা, তুমি ঘুষ নিয়েছিলে ?" আমি উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করলাম।

বাবা কথা বললেন না, শুধু দেখলাম ওঁর গালের চামড়াটা একবার কেঁপে গেল।

"আমার জানা দরকার।"

"আমি তোমায় জানানোর কোনও প্রয়োজন বোধ করছি না। যদি তোমার লজ্জা হয়, তা হলে পিতৃ-পরিচয় দিয়ো না।"

"ওরা যা বলে আমি তা বিশ্বাস করি না।"

বাবা চুপ করে রইলেন। আমার দিকে একবারও তাকাননি। ওঁর শায়িত দেহটাকে হঠাৎ মনে হল ভাঙা একটা গাছের ডাল। শুকনো, মরা।

"আমার অনুরোধ, তুমি আর আমার জন্য কারও সঙ্গে ঝগড়া করবে না। গায়ে হাত দেবে না। হাজার হাজার লোককে মারধোর করে তো তোমার বিশ্বাসকে তাদের মধ্যে সঞ্চার করতে পারবে না। তার থেকে আমি যেমন আছি, তেমনই থাকতে দাও।"

বাবা চোখ থেকে হাত নামিয়ে আমার দিকে তাকালেন। কপালের মাঝখানে মসৃণ চামড়ার বাদামি টিপটা চকচক করছে। বড় বেশি চকচকে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন মা রান্নাঘরে বসে উনুনে বাতাস দিচ্ছিলেন। আমি টাকাটা চৌকাঠে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছি বল হাতে। মা ডাকলেন, কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বাচ্চা মেয়ের মতো মুখ উঁচু করে বললেন, "আমার হাতে কাল খুব লেগেছে।"

আমি হেসে ফেললাম। "লাগবেই তো। অত জোরে জোরে কখনও মারে ?"

"তুই ভাল করে খেলবি ? বল, খেলবি ?"

আমি একদৃষ্টে মায়ের অপূর্ব মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তার পর আমি মায়ের গলা জড়িয়ে বুকে মুখ চেপে ধরে বললাম, "খেলব।"

মা আমার মাথায় হাত রেখে ফিসফিস করে বললেন, "তোর বাবার মতন বড় হতে পারবি ?"

হঠাৎ আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। মাথায় মায়ের স্পর্শ, ঘ্রাণ পাচ্ছি মায়ের দেহের, মনে হচ্ছে মখমলের মতন সবুজ দূর্বা বিছানো মাঠে, হালকা সাদা-কালো ফুটকি দেওয়া বল নিয়ে ড্রিবল করছি। একের পর এক কাটাচ্ছি, দুলে দুলে এগোচ্ছি। ডাইনে ভাঙছি-বাঁয়ে হেলছি, শূন্যে উঠছি—কখনও হরিণ, কখনও চিতা, কখনও চিলের মতন। নিজেকে বললাম—প্রসূন, সুন্দর খেলার আনন্দ বোধ হয় এই রকম। বড় প্লেয়ার হও, তা হলে মাঠেও তুমি মায়ের বুকে থাকবে। তুমি কি তাই চাও ?

"হ্যাঁ, আমি তাই চাই।" আচ্ছন্ন গলায় মাকে উত্তর দিলাম।

॥ ১৩ ॥

বছর ঘুরে গেল। আমার এক বছর বয়স বাড়ল। মাথায় লম্বা হয়েছি পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি, ওজন তুলনায় কমই, পঁয়ষট্টি কিলোগ্রাম। নীলিমা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। আমি এখন দিনে সাড়ে তিন টাকা পাচ্ছি, অবশ্য কাজটা রাতেই। অরুণা গ্লাস ফ্যাক্টরি এখনও খোলেনি, চোদ্দো মাস বন্ধ হয়ে রয়েছে। বাবা যথারীতি রোজ দুপুরে বেরোন। আরও শুকিয়ে গেছেন, আরও কম কথা বলেন। আমাদের রাত্রের রুটির বরাদ্দ একই রয়েছে, আমিষ খাদ্য বোধ হয় বছরখানেক রান্না করার সুযোগ মা পাননি। দোতলায় বাড়িওয়ালার রান্নাঘর থেকে যে দিন মাংস কষার গন্ধ আসে, পিন্টু আর পুতুল সে দিন প্রাণপণে পড়ার মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টা করে। হর্ষদা আমায় কয়েকবার বলেছিলেন—প্রসূন, এত যে খাটছ, এতে শরীরে ক্ষয় হচ্ছে—সেই ক্ষয় পূরণ করে খাদ্য। ফুটবলারের ভীষণ দরকার প্রোটিন। মাংস, দুধ, ডিম তোমায় খেতেই হবে, নয়তো বিপদে পড়বে। শুনে আমার ভয় হয়েছিল। শরীর ক্ষয়ে গেলে আমার আর রইল কী ! কিন্তু মাংস আমি খাব, পয়সা কোথায় ?

কাগজে দেখেছিলাম, বি সি রায় ট্রফি খেলার জন্য জুনিয়ার বেঙ্গল টিমের নাম ঘোষিত হয়েছে। এক দিন ভোররাত্রে হাঁকাহাঁকি করে একটা লোক ঘুম ভাঙাল। পেট্রল চাই দশ লিটার, এখনই ভোরের ফ্লাইট ধরতে হবে। মোটরের ভিতর তাকিয়ে আমার চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেল। পিছনের সিটে নিমাই আর আনোয়ার, সামনে বিপিনদা বসে। ওরা আমায় দেখে অবাক ! বিপিনদা বললেন, "কী রে প্রসূন, খেলা ছেড়ে এখন এই কচ্ছিস ? ভাল, ভাল ! একটু তাড়াতাড়ি দে বাবা, দিল্লির ফ্লাইটে এদের তুলে দিতে হবে।"

আমি হাসলাম মাত্র। মোটরে পেট্রল ঢালছি মিটারের দিকে তাকিয়ে। বিপিনদা চেঁচিয়ে গাড়ি থেকে মুখ বার করে বললেন, "আমার কথা তো বিশ্বাস করলি না, এই দ্যাখ নিমাই, আনোয়ার জুনিয়ার ন্যাশনালে খেলতে যাচ্ছে। তুই

থাকলে তুইও যেতিস। তোর এত পসিবিলিটি ছিল।"

বিপিনদা জিভটা টাকরায় লাগিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন আক্ষেপের। টাকার ভাঙানি ফেরত দেবার সময় আমার মাথাটা মুখের কাছে টেনে এনে চাপা স্বরে উনি বললেন, "সামনের বছর আয়, দেড় হাজার দেব, এদের থেকেও বেশি। নিজেকে এভাবে নষ্ট করিস না। এবার রেলিগেশন-প্রোমোশন আছে।"

আমি আবার হাসলাম। ওরা দুজন জড়ভরতের মতন বসে। আনোয়ার বাইরে তাকিয়ে, কিন্তু নিমাই একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে। গাড়িটা চলে যাবার পর আমার সত্যিই হিংসা হল। শোভাবাজারে থাকলে আজ আমিও এই মোটরে চেপে দিল্লির প্লেন ধরতে যেতাম। তার পর পরিমল ভট্‌চাজ ঢুকিয়ে দিত জুনিয়ার ইন্ডিয়া টিমে, তার পর ব্যাংকক, সিওল কি টোকিওয়। শুধু একটা বছর যদি থাকি।

নিজের উপর রাগ হল। বোধ হয় বোকামিই করেছি, ক্ষতি করলাম নিজেরই। মুহ্যমান হয়ে খাটিয়ার উপর বসে যখন এই সব ভাবছি, তখন ফিসফিস করে বুকের মধ্যে কে কথা বলে উঠল : 'কী ক্ষতি করেছ, প্রসূন ? পূরণ করে নেবার সময় অনেক পাবে। যাও যাও, প্র্যাকটিসে নামো। খাটো, আরও খাটো। কিচ্ছু বোকামি করোনি। মনে রেখো, কদর পাবে একমাত্র খেলা দিয়েই, বেঙ্গল বা ইন্ডিয়ার ছাপ দিয়ে নয়।'

ভি আই পি রোড ধরে যখন দৌড়োচ্ছি, একটা প্লেন মাথার উপর দিয়ে নিচু হয়ে পশ্চিমে চলে গেল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে ঊর্ধ্বশ্বাসে হঠাৎ পাগলের মতন ছুটতে শুরু করলাম।

॥ ১৪ ॥

"তোমার কথা রতন আমাকে বলছিল।" সাদা চুলে ভরা মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে নেড়ে পঁয়ষট্টি বছরের দাসুদা অর্থাৎ দাসু গুহ গম্ভীরভাবে আমার আপাদমস্তক দেখলেন। তার পর চেয়ার থেকে উঠে এসে ধাঁ করে বুকে ঘুষি মারলেন। আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। লেগেছে ভালই, কিন্তু মুখে যন্ত্রণা ফোটালাম না। উনি আমার পিছনে গেলেন। বুঝতে পারছি না, এবার কী করবেন। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলাম। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলাম।

দাসুদার মুখে হাসি ফুটল। "স্ট্রাইকার ?"

আমি মাথা হেলালাম। উনি চেঁচিয়ে ডাকলেন, "কমল, কমল !"

বেঁটে ফরসা কমল পণ্ডিত ছুটে এল। দাসুদা বললেন, "ছেলেটাকে পঁচিশ পাক দৌড় করা।"

কমলদা সোনালি সংঘের ট্রেনার। ইন্ডিয়া টিমে ব্যাক খেলেছেন বছর দশেক আগে। অসম্ভব দম আছে শুনেছি।

"প্যান্ট এনেছ ?"

"না।"

কমলদা প্যান্ট জোগাড় করে দিলেন। মাঠে হকি খেলা হচ্ছে। কিছু দর্শক ছড়ানো ছেটানো। লক্ষ করলাম, ফুটবল-বুট পায়ে খালি গায়ে তিন-চারটি ছেলে টেন্টের বাইরে গান করছে। মনে হল, ওরা প্র্যাকটিসে নামবে হকি খেলাটা শেষ হলেই। ওরা কৌতূহলে আমার দিকে তাকাল। ওদের মধ্যে গোলকিপার রুনুকে মাত্র চিনলাম। দু-একবার শোভাবাজার টেন্ট-এ দেখেছি রতনের সঙ্গে। তবে আলাপ নেই।

কমলদা আমাকে নিয়ে দৌড়োতে শুরু করলেন মাঠের বাইরে দিয়ে। জোরে হাঁটার থেকে কিছু জোরে। পাঁচ পাকের পর দেখি, কমলদা আমার সামনে এবং গতি ক্রমশই বাড়াচ্ছেন। আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। আঠার মতন সঙ্গে লেগে রইলাম। সতেরো পাকের সময় হকি খেলা শেষ হতে দেখলাম, ফুটবল নিয়ে ওরা মাঠে নেমে পড়েছে। কুড়ি পাকের মাথায় কমলদাকে পিছনে ফেলে এগোতে শুরু করলাম। দাসুদা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের দিয়ে পাসিং ও ইনটার-পাসিং করাচ্ছেন, এখন তিনি আমাদের দৌড়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে। দম আমার বুক ভর্তি রয়েছে। কমলদা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছেন। শেষ পাকটা স্প্রিন্ট করলাম। কমলদাকে পুরো দেড় পাক পিছনে রেখে থামতেই দাসুদা হাত নেড়ে মাঠের মধ্যে ডাকলেন।

"তোর নামটা যেন কী ?"

"প্রসূন।"

"বুট আনিসনি কেন ?"

শুনেছি দাসুদা যাদের বুট আনতে বলেন, তারাই ফার্স্ট টিমে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে ধরে নিতে হয়। খুশিতে আমি মাথা চুলকোতে লাগলাম। কমলদা তখন এসে আমায় জড়িয়ে ধরেছেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "এই প্রথম আমি হারলাম, দাসুদা।"

"ছোঁড়ার দম আছে।" এই বলে দাসুদা আবার প্র্যাকটিস করানোয় মন দিলেন। মাঠের বাইরে এসে আমি ওদের প্র্যাকটিস দেখতে লাগলাম। ডান দিক থেকে উঁচু ক্রস পেনালটি বক্সে ফেলছে একজন, আর তিনজন ছুটে যাচ্ছে বলটা হেড বা ভলি করতে। ফসকাচ্ছে বা বারের অনেক উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমি গুটিগুটি মাঠের মধ্যে দাসুদার পাশে দাঁড়ালাম।

"আমি একবার চেষ্টা করব ?"

দাসুদা মাথা দোলালেন। আমি এগিয়ে গেলাম।

একসঙ্গে দুজন ছুটেছি ; বল নিয়ে ডাইনের সাইড লাইন ধরে ছুটে সেন্টার করল একজন। সেন্টারটা ভাল হয়নি, আমাদের দুজনের পিছনে বল পড়ছে। আমি ঘুরে গেলাম গোলের দিকে পিছন ফিরে। বলটা পড়ার আগেই ইনস্টেপ দিয়ে শূন্যে থামিয়ে টুক করে উপরে তুলেই সঙ্গে সঙ্গে পিছনে হেলে মাথার উপর দিয়ে বাইসাইকেল কিক করলাম। মাথা ঘুরিয়ে দেখি, বারের তলায় লেগে বলটা গোলে

ঢুকল, আর গোলকিপার হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। নীলিমাকে এই কিক্‌ই দেখিয়েছিলাম আন্দাজে মেরে। কিন্তু এখন দশটার আটটাই গোলে পাঠাতে পারি।

দাসুদা আর কমলদা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন, অন্য ছেলেরা আমাকে সপ্রশংস চোখে দেখছে। একজন বলল, "আর একবার করো তো !"

করতে পারলাম না। বলটা পেলাম বুকের উপর, বুক থেকে উরুতে নিলাম, তুললাম ধাক্কা দিয়ে কিন্তু শরীর থেকে বাঁ ধারে বলটা একটু সরে গেল। বাইসাইকেল কিকের চেষ্টা না করে আধ পাক ঘুরে ডান পায়ে ভলি মারলাম। গোলকিপার দুহাত বাড়িয়ে ডান দিকে ঝাঁপাবার আগেই বল গোলে ঢুকে গেছে।

দাসুদা হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে যাওয়া মাত্র জানতে চাইলেন, বাড়িতে কে কে আছেন, বাবা কী করেন, আমি কী করি, কত দূর লেখাপড়া করেছি...ইত্যাদি।

"কাজটা ছেড়ে দে !" দাসুদা বললেন, তার পর আমার বিস্ময় লক্ষ করে যোগ করলেন, "ও টাকা আমরা দিয়ে দেব তোকে মাসে মাসে, আর কিছু দিতে পারব না।"

আমি রাজি হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গেই। ছোট টিমগুলোর মধ্যে সোনালি সংঘের নাম আছে ছক বাঁধা আধুনিক পদ্ধতিতে খেলার। এখানকার ছেলেরা সিরিয়াস, মন দিয়ে প্র্যাকটিস করে দাসুদার চোখের সামনে। কমলদা মাঠের মধ্যে ওদের স্কিল রপ্ত করান। সোনালির নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত কড়া, সেটা শুধু মাঠেই নয়, বাড়িতেও প্রত্যেক প্লেয়ারকে পালন করতে হয়। দাসুদা প্রায়ই এক এক জনের বাড়িতে হঠাৎ হাজির হয়ে খোঁজ নেন, কী খাচ্ছে, কখন ফিরছে, কখন ঘুমোচ্ছে।

"সামনের হপ্তা থেকে ট্রান্সফার শুরু হবে, কমলের সঙ্গে আই এফ এ অফিসে গিয়ে সই করে আসবি। কাল ভোর থেকেই প্র্যাকটিসে আয়।"

ফেরার সময় শ্যামবাজারের বাসের দম বন্ধ করা ভিড়ের মধ্যে একবার আমার মনে পড়ল, দাসুদা যখন জিজ্ঞাসা করলেন বংশে কেউ কখনও ফুটবল খেলেছে কি না, তখন আমি 'না' বলেছিলাম।

॥ ১৫ ॥

আই এফ এ অফিসে সই করতে গিয়ে বিপিনদার সঙ্গে দেখা। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিস পর্যন্ত সুতারকিন স্ট্রিটে হাজারখানেক লোকের জটলা। তার মধ্যে বিপিনদা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে হাত তুলে থামতে ইশারা করলেন। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম।

"সোনালিতে সই কচ্ছিস খবর পেয়েছি।"

"আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"উইথড্র করাব আজ নিমাই, আনোয়ারকে। ওরা দুটোর সময় আসবে।"

বিপিনদা ঘড়ি দেখলেন। "তুই তা হলে আমার কথাটা ভেবে দেখলি না ? এরা কত দেবে ?"

"এক পয়সাও নয়।"

বিপিনদা অবাক হয়ে, 'অ' বলেই সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঠিক দুটোর সময় আনন্দবাজারের গেটের সামনে কমলদার থাকার কথা। আমি সে দিকে এগিয়ে গেলাম। একদল ছেলে খুব উত্তেজিত হয়ে তর্কাতর্কি করছে। বিষয় নঈম, অরুণ ঘোষ, অসীম মৌলিক, পাপান্না, হাবিব, ধীরেন দে, জ্যোতিষ গুহ, মান্না। হঠাৎ কী যেন হল, ওরা ছুটে গেল আই এফ এ অফিসের দিকে 'নঈম নঈম' বলে। একটু পরেই ফিরে এল, 'যত্তোসব উড়ো গুজব' বলতে বলতে। আমি ভাবলাম, আমার জন্য এরাও একদিন এখানে এইভাবে অপেক্ষা করবে। আমি দল বদলাতে আসছি শুনে ছুটে যাবে। অথচ এরা জানে না, আমি এখন এদের পাশেই দাঁড়িয়ে। ভাবতেই আমার খুব হাসি পেয়ে গেল।

কমলদার সঙ্গে যখন আই এফ এ অফিসের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, তখন নিমাই আর আনোয়ার বিপিনদার পিছনে নামছে। আমি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পথ দিলাম। নিমাই চমৎকার ঘিয়ে রঙের একটা প্যান্ট পরেছে। ভীষণ টাইট, কোমরের অনেক নীচে নামানো। জুতোর মুখটা ছুঁচলো। চুল আঁচড়াবার ঢঙটাও বদলেছে, কপালের আধখানা জুড়ে চুল নামানো। আনোয়ার পরেছে একটা নীল নায়লনের স্পোর্টস্ গেঞ্জি, ফরসা রঙের সঙ্গে সুন্দর মানিয়েছে।

"কেমন আছিস ?" আমি বললাম।

ওরা থতমত হল, আশা করেনি আমি কথা বলব।

নিমাই তাড়াতাড়ি বলল, "তুই রোগা হয়ে গেছিস প্রসূন।"

আমি হাসলাম।

"পরে কথা বলব, এখন চলি।" আনোয়ার মৃদু স্বরে বলল। আমি মাথা কাত করলাম।

পরদিন সন্ধ্যায় মাঠ থেকে ফিরতেই মা দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "এ ঘরে আয় শিগগিরই, একটা জিনিস দেখাব।" আমি ছুটে গেলাম। মা'র হাতে পাঁচটি একশো টাকার নোট।

"কোত্থেকে পেলে ?" প্রশ্ন করলাম অবাক হয়ে। মা একটা চিঠি হাতে দিলেন। চিঠিতে লেখা : "প্রসূন, কাল ঠিক দুটোর সময় আমি অপেক্ষা করব আই এফ এ অফিসের কাছে, যেখানে তোর সঙ্গে গতকাল দেখা হয়েছিল। ইতি, বিপিনদা।"

মা'র হাত থেকে নোটগুলো নেবার জন্য হাত বাড়ালাম।

"এ টাকা এখুনি ফেরত দিতে হবে। এটা ঘুষ।"

মা'র হাত থেকে নোটগুলো পড়ে গেল। মনে হল যেন ফেলে দিলেন। ফ্যাকাশে মুখে শুধু বললেন, "ঘুষের টাকা !"

বিপিনদার বাড়ি পৌঁছোলাম রাত দশটায়। অবাক হয়ে বললেন, "এত রাতে,

ব্যাপার কী রে ?"

নোটগুলো ওঁর টেবিলে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে আসার সময় বললাম, "কয়েক ঘন্টার জন্য টাকাটা আমার কাছে থেকে গেছিল। সে জন্য সুদ আপনার প্রাপ্য। শোভাবাজারের সঙ্গে যে দিন খেলা থাকবে, সে দিন সেটা শোধ দেব।" বলে দরজা পেরোচ্ছি, পিছনে বলতে শুনলাম, "বটে !"

॥ ১৬ ॥

লিগের তৃতীয় ম্যাচ শোভাবাজারের সঙ্গে। এরিয়ানের সঙ্গে ২—২ করে, উয়াড়িকে ৩—০ হারিয়েছে সোনালি। পাঁচটা গোলই আমার, লিগে প্রথম হ্যাট্রিকও। যুগান্তরে লিখেছে, "সোনালি সংঘের নবাগত ফরোয়ার্ড পি ভট্টাচার্য সুযোগসন্ধানীরূপে পরিচয় দিয়ে গুনে গুনে তিন তিনটি গোল দিয়ে মরসুমের প্রথম হ্যাট্রিক লাভের গৌরব অর্জন করেন।" পিন্টু কাগজ থেকে কেটে রেখে দিয়েছে। ও প্রায়ই এখন বায়না ধরে আমার খেলা দেখার জন্য। যদি খারাপ খেলি ওর সামনে, এই ভয়ে ওকে কখনও মাঠে আনিনি। ও আমার সব থেকে বড় ভক্ত। কিন্তু আজ ওকে এনেছি, আজ আমি কনফিডেন্ট, ভাল খেলবই।

আনোয়ার দূর থেকে হাত তুলল। আমিও হাত তুললাম। তখন খেলার আগে ওয়ারমিং আপ চলেছে। আনোয়ার জগ করতে করতে আমার কাছে এসে বলল, "খুব গোল দিচ্ছিস, আজ পারবি না।"

"জুনিয়ার ইন্ডিয়া ক্যাম্পে তোর আর নিমাইয়ের নাম আছে দেখলাম।"

আনোয়ার হেসে চলে গেল। নিমাই আমাদের দিকে এল না। রতন একবার বল কুড়োতে এসে বলে গেল, "সাবধানে থাকবি আজ।"

"কেন ?"

"বললুম।"

রতন চলে যাবার পর আমি ওর কথার মানে বোঝার চেষ্টা করেও কোনও হদিস পেলাম না। অবশেষে বুঝলাম হাফ টাইমের মিনিট তিনেক আগে। শোভাবাজার পেনালটি বক্সের মধ্যে আমাদের রাইট আউট ব্যাক সেন্টার করতেই ছুটে গেলাম। আমার সঙ্গে টিকাদারও। বলটা দু' গজ দূরে ড্রপ পড়ে উঠছে, কী করব ? ভলি মারলে বারের দশ হাত উপর দিয়ে যাবে। একমাত্র উপায় ডাইভ দিয়ে হেড। সামনে গোলকিপার বেরিয়ে আসছে, আনোয়ারের বুটের ধপ্‌ধপ্ বাঁ দিকে, আমি ঝাঁপ দিলাম।

মাথায় বলের স্পর্শ পাবার সঙ্গে সঙ্গে, ডান পাঁজরে প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা ছুরির ফলার মতো বিঁধল। টিকাদার লাথি কষিয়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে, চোখে অন্ধকার দেখছি। তার মধ্যেই রেফারির লম্বা হুইস্‌ল শুনতে পেলাম।

সাইড লাইনের বাইরে আমাকে শোয়ানো হল। জারসি খুলে বুকে বরফ ঘষা

হচ্ছে। চোখ খুলতেই পিন্টুর কাঁদো-কাঁদো মুখটা প্রথমে চোখে পড়ল। হাত তুলে ওকে আশ্বাস দিতে গিয়ে খচ করে বুকে যন্ত্রণা উঠল। হাসলাম শুধু। দাসুদা, কমলদা ঝুঁকে রয়েছেন। এখন হাফ টাইম।

"গোলটা হয়েছে?" আস্তে উচ্চারণ করলাম।

"হ্যাঁ।" কমলদা বললেন।

"কেউ নেমেছে নাকি?"

"সুশান্ত নামছে।"

"বারণ করুন, আমি খেলব, আমি পারব।" ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। "আমার কিছু হয়নি।"

"তোকে খেলতে হবে না প্রসূন।"

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। আনোয়ারের টকটকে রাঙা মুখ চোখে পড়ল। "আবার লাগলে সিজনের মতো বসে যাবি।"

রাগে আমি জ্বলে উঠলাম। "সেই ব্যবস্থাই তো তোরা করেছিস। কাওয়ার্ড।"

আনোয়ারের চোখ দুটো দপ্ করে উঠল, কথা না বলে চলে গেল।

"খেলতে পারবি? আমার আপত্তি নেই যদি খেলতে চাস।" দাসুদা বললেন।

"কিন্তু দাসুদা—" কমলদা থেমে গেলেন দাসুদার তোলা হাতটাকে দেখে। পিন্টু ফিসফিস করে বলল, "আনোয়ারদা একা দু' হাতে তোমায় মাঠ থেকে তুলে আনল। কী গায়ের জোর!"

মাঠে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বল এখন আমাদের ডিফেনডিং জোনে। নিমাই যথেচ্ছ কাটাচ্ছে, একটার পর একটা বল বাড়াচ্ছে আর শোভাবাজারের ফরোয়ার্ডরা প্রত্যেকটা নষ্ট করছে। শেষে নিমাই শোধ করল গোলটা। আমি জানি, ও করবেই। ওকে রোখার সাধ্য সোনালির ডিফেনসের নেই। আমাদের আটজন পেনালটি বক্সের মধ্যে। এক ছুটের ওপর তিনজনকে কাটিয়ে শরীরটাকে ডান দিকে বাঁ দিকে করিয়ে ছোট্ট একটা চিপ, বেটাল গোলকিপারের ফ্যালফ্যালে চোখের উপর দিয়ে বলটা গোলে ঢুকে গেল।

আমি দু'-এক বার ছোটার চেষ্টা করে বুঝলাম, পারব না। টিকাদার ছায়ার মতো সঙ্গে রয়েছে। তবু চেষ্টা করলাম। রাইট হাফ উঠে এসেছে। ওর সঙ্গে ওয়াল পাস করে বক্সের মাথায় পৌঁছোলাম। রাইট স্টপার ব্যাক ট্যাকল করতে এল। কাটালাম। লেফট হাফ সামনে। ঠেলে দিলাম বলটা বাঁ দিকের ফাঁকা জায়গায়। আমাদের লেফট আউট উঠে আসছে দেখছি। আনোয়ারের পিছনে চমৎকার জায়গা পড়ে আছে, ওখান থেকে গোল দশ গজ। ছুটে গেলাম সেখানে। লেফট আউট দিল আমাদের লেফট ব্যাককে। বল ধরে ও কাকে দেবে খুঁজছে, আমি হাত নাড়তেই ঠেলে দিল। শোভাবাজারের চারজন আমার দিকে ছুটে এল।

বলটা ঠিকমতো থামাতে পারলাম না। ছিটকে বেরিয়ে গেল পা থেকে। আনোয়ার ছুটে এসে পড়েছে। এবার সোজা গ্যালারিতে পাঠিয়ে দেবে, তা ছাড়া

উপায় নেই। তবু একবার শেষ চেষ্টা করলাম। আনোয়ার বলটা মারবার জন্য পা তুলে থমকে গেল। হুড়মুড়িয়ে আমি আর টিকাদার বলের জন্য এগিয়ে গেলাম।

"ওরে বাপ্‌স।"

একটা চাপা আর্তনাদ উঠল। আনোয়ার আর টিকাদার মাটিতে পড়ে। বলটা গড়াচ্ছে। ছুটে গিয়ে ধরলাম বলটা। গোল মাত্র পাঁচ-ছ' গজ দূরে। একটা টোকা দিয়ে বাকি কাজটা সেরে ফিরে তাকিয়ে দেখি, টিকাদার তলপেট চেপে কাটা পাঁঠার মতো ছটফটাচ্ছে। আমি আনোয়ারের মুখের দিকে তাকালাম।

"কী করলি ?"

"বেশ করেছি, তোর কী ?"

বিপিনদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন মাঠের মধ্যে চিৎকার করতে করতে : "সাসপেন্ড করব তোকে। নিজের প্লেয়ারকে মারলি, জানোয়ার কোথাকার ! বন্ধুত্বের প্রতিদান হল, সব বুঝি, সব বুঝি।"

আমি লজ্জা পেয়ে সরে গেলাম। রতন আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, এমন একটা ব্যাপার যে হবে তা সে জানত। টিকাদারকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাবার পর শোভাবাজার আর খেলতে পারল না। আমাদের রাইট আউট পর পর দুটো গোল করল। দাসুদা হাত নেড়ে আমাকে মাঠ থেকে চলে আসতে বললেন।

রাত্রে আমার বুকে ব্যথা শুরু হল। মাকে ডাকলাম। পিন্টু বাড়ি এসে মাকে নিশ্চয় মাঠের কথা বলেছে, নয়তো মা প্রথমেই ক্ষুব্ধ স্বরে বলবেন কেন, "কী দরকার ছিল অমন করে ডেনজারাস্‌লি গোল দেবার ? বুকে লাথি খেতে হয় যেখানে, দরকার কি সে কাজ করার ?"

মা'র মুখে ইংরিজি শুনলে হাসি পায় আমার। আসলে পিন্টুর কথাই মা'র মুখ দিয়ে বেরোল। বললাম, "গোল ডেনজারাস্‌লিই পেতে হয়।" গজগজ করতে করতে মা সরষের তেল গরম করে আনলেন। বুকে মালিশ করতে করতে একবার শুধু বললেন, "ফুটবলই আমার সর্বনাশ করবে।"

॥ ১৭ ॥

সকালে বুক টাটিয়ে উঠল। আমার শুধু একটাই ভয়, এত পরিশ্রম করলাম সারা বছর, বুঝি বিফলে গেল। চোট পেয়েছি জানলে দাসুদা বসিয়ে দেবেন। অথচ বড় ম্যাচ একটাও খেলা হল না এখনও। পরশুই খিদিরপুরের সঙ্গে খেলা। আজ কি কাল ক্লাবে না গেলে নিশ্চয়ই কেউ খোঁজ করতে আসবে, জেনে যাবে চোট পাওয়ার কথা।

ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম দাসুদা কি কমলদাকে জানিয়ে দিই যে, আমি কলকাতায় নেই। মাসির বিয়েতে মামাবাড়ি চলে গেছি। কিন্তু কাকে দিয়ে খবর পাঠাব ! পিন্টু ছাড়া আর কেউ নেই। কালীঘাটে দাসুদার বাড়ি কি গড়িয়ায়

কমলদার বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার মতো ডাঁটো এখনও সে হয়নি। দাসুদার টেলিফোন আছে, নম্বরটা জানি না। ওঁর ভাল নামটাও জানি না। হর্ষদা জানতে পারেন। পিন্টুকে হর্ষদার কাছে পাঠিয়ে দিলাম, আর সাবধান করে দিলাম, একদম যেন চোট পাওয়া সম্পর্কে একটি কথাও না বলে, তা হলে আর কোনও দিন মাঠে নিয়ে যাব না।

পিন্টু টেলিফোন নম্বর আনল। এবার সমস্যা কাকে দিয়ে টেলিফোন করাব। নীলিমাকে ডাকলাম, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই ও গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল এবং টেলিফোন নম্বর নিয়ে বেরিয়ে গেল। আধ ঘন্টা পর নীলিমা ফিরল। ওর সাড়া পেয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ধক করে গলায় আটকে গেল। দুই মূর্তি দাঁড়িয়ে, আনোয়ার-নিমাই।

ওদের দেখাচ্ছিল খুবই ব্যস্ত আর সিরিয়াস। আনোয়ার মোটা মোটা আঙুলগুলো আমার বুকে রেখে আলতো চাপ দিল। আমার মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখে নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করল। নিমাইও গম্ভীর হয়ে মাথাটাকে দু'বার উপর-নীচ করল। তার পর দুজনে ফিসফিস কী কথা হল, নিমাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আনোয়ার মাকে বলল, "মাসিমা, ওকে জামা পরিয়ে দিন, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।"

আমি একটাও কথা বলিনি। শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাকে কোনও পাত্তা না দিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিল। মা আমাকে জামা পরিয়ে দিতে আনোয়ার বলল, "হাঁটতে পারবি?" আমি মাথা নাড়লাম। নিমাই ট্যাক্সি এনেছে। দু'পাশে দুজনে ধরে আমাকে ট্যাক্সিতে তুলল। আমরা শ্যামবাজারের দিকে রওনা হলাম।

হাড় ভাঙেনি। এক্স-রে না করলে চিড় খেয়েছে কি না বোঝা যাবে না। ডাক্তার কষে ব্যানডেজ করে দিল বুকটা। শুয়ে থাকতে হবে, নড়াচড়া বারণ। ট্যাক্সিতে ফিরে এলাম। ওরা কেউ আমার সঙ্গে কথা বলল না, আমিও বললাম না। পৌঁছে দিয়ে, মা'র সঙ্গে কথা বলেই ওরা চলে গেল। নীলিমাকে দেখা মাত্র রেগে বললাম, "কে তোমাকে সর্দারি করে ওদের ডাকতে বলেছে?"

নীলিমা উত্তর দিল, "টেলিফোন করেছি। বলেছি, দিন পনেরো মামাবাড়ি থাকবে।" এই বলে গম্ভীরভাবে ও আঙুলের ইশারায় আমাকে শুয়ে থাকতে বলে বেরিয়ে গেল।

এক্স-রে রিপোর্টে কিছুই পাওয়া গেল না।

খিদিরপুর, ইস্টার্ন রেল, মহামেডান, কালীঘাট, রাজস্থান—পাঁচটা ম্যাচ শুয়ে রইলাম বাড়িতে। তিনটে হেরেছি, দুটো ড্র। এর পর আর শুয়ে থাকা গেল না। একদিন সকালে অল্প দৌড়োলাম, সামান্য ব্যায়ামও করলাম, কোনও অসুবিধা হল না। বিকেলে টেন্ট-এ গেলাম। পরদিনই স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলা। এত দিন মামাবাড়িতে থাকার জন্য দাসুদা মৃদু বকুনি দিলেন এবং জানালেন, টিম হয়ে গেছে। তবে আমি খেলছি। আমার জায়গায় যাকে নামানো হয়েছিল, সে একদম

সুবিধা করতে পারছে না।

সাবধানে, ঝুঁকি না নিয়ে প্রায় দাঁড়িয়েই খেললাম। জিতলাম ৩—০। পেনালটি বক্সের মাথায় বল পেয়ে দুটো শট থেকে গোল করলাম। পরের ম্যাচ বি এন আর-এর সঙ্গে। এবার অরুণ ঘোষের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে যাচাই করব, এই ভেবে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু মাঠে এসে যখন শুনলাম অরুণ ঘোষ খেলছে না, তখন বেশ ক্ষুণ্ণ হই। মনে হল, অরুণ ঘোষ আমাকে বঞ্চিত করল। নয় মিনিটের মধ্যে দুটো গোল দিয়ে মাঠকে অবাক করে দিলাম। ছোট টিম সোনালি শুরু থেকেই ডিফেনসিভ খেলবে, বোধ হয় এই রকম একটা ধারণা করেছিল বি এন আর। বদলে আমরা সোজা তাদের গোলের দিকে এগিয়ে যাই। পাঁচ মিনিটের পর রাইট আউটের ক্রস করা বল গোলকিপার এগিয়ে এসে পান্চ করে সামনে ফেলতেই ছুটে এসে ভলি মেরে নেটে পাঠিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় গোল একইভাবে। এর পর বি এন আর গুছিয়ে নিয়ে আমাদের কোণঠাসা করলেও আর গোল দিতে পারেনি। আমাদের গোলকিপার রবি নিশ্চিত চারটে গোল বাঁচিয়েছিল।

পরের ম্যাচে যুগের যাত্রীর সামনে পড়লাম আমরা। লিগে যাত্রী এখন সবার উপরে, একটাও পয়েন্ট নষ্ট করেনি। মোহনবাগান হেরেছে ইস্টার্নের কাছে, ইস্টবেঙ্গল ড্র করেছে রাজস্থানের সঙ্গে। এ বছরে পাঁচটা ম্যাচ খেলেছি মাত্র, কিন্তু তাতেই ময়দানের আনাচে কানাচে, অনেক টেন্টে আমাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সামনের বছর কোন ক্লাব আমাকে তুলে নেবে, কত দর হবে, এ সব কথাও নাকি বলাবলি হচ্ছে। লিগের টপ স্কোরার এখন আমি—পাঁচটি ম্যাচে এগারোটা গোল। অসীম মৌলিক দশটা ম্যাচে দশ গোল, অশোক চ্যাটার্জি এগারোটা ম্যাচে আট গোল।

॥ ১৮ ॥

নীলিমা স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে সেকেন্ড ডিভিশনে। বাড়িতে হইহই পড়ে গেছে সকালেই। তখনও আমি বিছানা ছেড়ে উঠিনি। বাড়িওয়ালা বিশু দত্ত চেঁচাচ্ছে : "নুটুবাবু, খাওয়াতে হবে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, কী খাবেন বলুন !"

"রাবড়ি। বড়বাজারের রাবড়ি।"

ঘরের বাইরে এলাম। দেখি, নীলিমা প্রণাম করছে মাকে। তার পর আমাদের ঘরে ঢুকল। বাবা আছেন ঘরে। মা ফিসফিস করে আমাকে বললেন, "তোর কাছে টাকা আছে ? একটা শাড়ি দিতুম ! আহা, কত কষ্ট করে লেখাপড়া করেছে।"

"বাবার কাছে নেই ?"

"এই মাসটা চালাবার মতন আছে।"

"আমার কাছে টাকা বারো আছে। তাই দিয়ে কি শাড়ি হবে ?"

মা ভেবে বললেন, "থাক তা হলে, পরে দেবখন।"

"জ্যেঠিমা, প্রসূন আমার থেকে কত বড় ?" নীলিমা ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, "ছ' মাসের বেশি কি ?"

মা হেসে বললেন, "ওই রকমই হবে।"

এর পরই একটা ভয়ংকর অপ্রতিভতার মধ্যে নীলিমা আমাকে ফেলে দিল। গোল থেকে এক গজ দূরে বল পেয়ে গোলের বাইরে মারলে মাঠভর্তি লোকের সামনে যা হয়, সেই রকম বোঁ বোঁ করে উঠল মাথাটা। নীলিমা প্রণাম করেছে আমায়। পাশ করলে দেখছি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায় ! আমি আমতা আমতা করে কী সব বলতে বলতে ঘরে পালিয়ে এলাম। শুনলাম নীলিমা বলছে, "প্রসূন যত মন দিয়ে প্র্যাকটিস করে, আমি যদি সেভাবে পড়তাম, তা হলে স্কলারশিপ পেতাম।"

উঁকি মেরে দেখলাম, নীলিমা বালতি হাতে কলঘরে যাচ্ছে। ওকে ডাকলাম।

"এবার তো কলেজ ?"

"হ্যাঁ। টাকা জোগাড় করতে হবে, প্রায় একশো।"

মনে মনে সিঁটিয়ে গেলাম। যদি এখন এত দিনের ধারের টাকা চেয়ে বসে ! তাড়াতাড়ি বললাম, "তোমাকে কিছু একটা উপহার দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু হাতে এমন টাকা নেই যে কিনতে পারি।"

নীলিমা কিছু বলতে যাচ্ছে, এমন সময় পিন্টু ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

"দাদা, একটা লোক তোমায় ডাকছে। বলল, খুব দরকার।"

গলিতে বেরিয়ে দেখি, রঙিন বুশ শার্ট গায়ে, ফরসা, কটা চোখ, বছর চল্লিশের একটি লোক দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই খুব পরিচিতের ভঙ্গিতে বলল, "প্রসূন, একটা কথা ছিল, চলো একটু বাইরে গিয়ে বলব।"

রাস্তায় এসে বললাম, "যা বলবার এখানেই বলুন, আমি আর যাব না, কাজ আছে।"

একটা ফিয়াট গাড়ি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে লোকটা বলল, "চলো না একটু ঘুরে আসি, মোটরে বসেই বলব। কথাটা খুবই প্রাইভেটলি বলতে চাই।"

লোকটার চালচলন আমার বিশ্রি লাগছে, তার উপর 'প্রাইভেটলি' কথা বলার প্রস্তাবটা ভাল লাগল না। বললাম, "আপনার প্রাইভেট কথা এখানে দাঁড়িয়েও বলতে পারেন, কেউ শুনতে পাবে না।"

লোকটা এধার-ওধার তাকিয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "কালকের ম্যাচটা তুমি খেলো না।"

"যাত্রীর সঙ্গে খেলব না ?" আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম। "বলছেন কী আপনি !'

"তুমি কত টাকা আর পাও সোনালি থেকে, মাসে মাসে একশো...খবর রাখি, সব ক্লাবেরই খবর রাখি।" লোকটা হঠাৎ পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট

বার করে আমার হাতটা টেনে মুঠোয় গুঁজে দিল। "খেলতে চাও যদি, নিশ্চয়ই খেলবে। কুড়ি-পঁচিশ বছর কলকাতায় কোনও বড় ট্রফি আমরা পাইনি, এবার ভাল চান্স এসেছে লিগ পাবার, কাল তুমি ব্যাগড়া দিয়ো না ভাই।"

আমি তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠিনি। বললাম, "আমি ব্যাগড়া দেব ?"

"ভয় তোমাকেই প্রসূন। কলকাতার সব ক্লাব এখন তোমাকে ভয় করে ; মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান সবাই। কাল তুমি গোল দিয়ো না।"

এতক্ষণে আমি সংবিৎ ফিরে পেয়েছি। একশো টাকার নোটটা লোকটার বুকপকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম, "এখন থাক। আপনি আমাদের বাড়িতে আসুন, আমার বাবার হাতে এটা দেবেন।"

লোকটা ইতস্তত করে বলল, "তোমার বাবা কী করেন ?"

"বেকার। একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। লক আউট হয়ে বন্ধ।"

"তা হলে তো তোমরা বেশ অসুবিধের মধ্যে রয়েছ।" লোকটা বুকপকেটে হাত দিয়ে বেশ খুশি হয়েই বলল, "তোমার উচিত সংসারকে হেল্‌প করা।"

আমি কথা বললাম না। লোকটাকে নিয়ে সটান বাবার সামনে হাজির করলাম। নীলিমা তখন বাবার কাছে বসে কলেজে ভর্তি হওয়ার অসুবিধা নিয়ে কথা বলছে। আমি কোনও ভূমিকা না করে বললাম, "বাবা, কাল যুগের যাত্রীর সঙ্গে আমাদের খেলা। কাল আমি যেন না খেলি বা খেললেও যেন গোল না দিই, এই কথা ইনি বলছেন আর একশো টাকা আমায় দিতে চাইছেন।"

আচমকা এমন ভাবে বললাম যে, শুধু বাবা আর নীলিমাই নয়, কটা-চোখ লোকটাও আড়ষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে বাবা মৃদু স্বরে বললেন, "কোন ক্লাবের সঙ্গে খেলা ?"

"যুগের যাত্রী।" আমি বললাম। মনে হল বাবার চোখ ঝলসে উঠল। ওঁর কপালের উপর আমি অবধারিত চোখ রাখলাম।

বাবা মাথা নিচু করে বললেন, "আমি জানি না। আমি কোনও কথা বলব না। তুমি নিজেই ঠিক করো ঘুষ তুমি নেবে কি না।"

বাবা মাথা তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার বুক কাঁপতে শুরু করেছে। নীলিমা কী যেন বলবার চেষ্টা করছে আর আমি কী যেন একটা করতে চাইছি। আর মনের মধ্যে তখনই কার কণ্ঠস্বর শুনলাম, "প্রসূন, দ্যাখো দ্যাখো, তোমার বাবার অপমানিত কপাল। ওখানে বিজয়তিলক এঁকে দেবে তুমি, হ্যাঁ তুমিই।"

"কাল যাত্রীকে আমি হারাবই", দাঁতে দাঁত চেপে বললাম। তার পর লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে বললাম, "গেট আউট !"

লোকটা অবাক হল মাত্র, কিন্তু ঘাবড়াল না। যাবার সময় মুচকি হেসে বলে গেল, "তুমি গোল দিতে হয়তো পারো, কিন্তু গোল খাওয়া বন্ধ করতে পারবে না। ফুটবল এগারো জনের খেলা মনে রেখো।"

আমার খুপরিতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে আমি বসে

ছিলাম। ঘরে কে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে দেখি, নীলিমা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে। সাগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা কিছু বললেন কি তার পর ?"

"না, শুধু অনেকক্ষণ পর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মুছে নিতে দেখেছি।"

"আমি ঠিক করিনি নীলিমা ?"

নীলিমা ভারী স্নিগ্ধ নরম স্বরে বলল, "তুমি আজ সব্বাইকে এত বড় উপহার দিলে প্রসূন। ওহ্ এত বিরাট ! প্রসূন, কাল তুমি দারুণ খেলবে, ঠিক জিতবে।"

॥ ১৯ ॥

ফুটবল যে এগারো জনের খেলা, এই সত্য নির্মমভাবে উপলব্ধি করলাম পরদিন। আর একটি শিক্ষা পেলাম—'জিতবই' এমন কথা কদাচ বলবে না। যাত্রীর কাছে আমরা ২—৩ গোলে হেরে গেলাম। মাঠে যে এত ভিড় হবে কল্পনা করিনি। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টারই বেশি। ওরা যাত্রীর হার চায়, তাই সোনালিকে মদত দিতে ওরা সবাই সোনালির সাপোর্টার হয়ে গেছে। ওরা আশা করেছিল, আমি একটা কিছু করব।

কিন্তু যাত্রী শোভাবাজার নয়। অত্যন্ত আঁটসাট আর চমৎকার গুছোনো ডিফেনস। ওদের লেফট হাফ অমিয় আর রাইট স্টপার ব্যাক দুলাল গত বছর মারডেকা টুরনামেন্ট খেলে এসেছে। গোলকিপার শ্যাম যে দিন খেলে, সে দিন একটি মাছিও গোলে ঢুকতে পারে না। তবে সেই দিনটি যে কোন খেলায় আসবে, তা কেউ বলতে পারবে না, শ্যামও না।

রাইটইন বিষ্ণু মিশ্র এ বছর জুনিয়ার ইন্ডিয়া ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে, বলের উপর ভাল কনট্রোল আছে, তবে নিমাইয়ের মতো নয়। কিন্তু অনেক বেশি পরিশ্রমী আর যেমন ওঠে তেমনই নেমেও আসতে পারে। বুদ্ধিটা একটু কম। লেফট আউট আব্রাহামের মতো দ্রুত উইঙ্গার কলকাতায় দ্বিতীয় নেই। পেনালটি বক্সের কোণ থেকে ডান পায়ে এমন শট নেয়, যার শতকরা নব্বুইটা গোলে ঢুকবেই। লেফট-ইন শিবরমন ছোটখাটো, অত্যন্ত চতুর, বক্সের মধ্যে ছুঁকছুঁক করে বেড়ায়। কখন যে গোল ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, বোঝা কঠিন। বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা জানতে দেয় না।

আমরা মরিয়া হয়ে খেলব প্রতিজ্ঞা করে নেমেছিলাম। পনেরো মিনিট পর্যন্ত দু' পক্ষই সতর্ক হয়ে শুধু মাঝ মাঠে খেলেছি। তার পরই বিষ্ণু হঠাৎ বল নিয়ে এগোয় আমাদের গোলের দিকে। রাইট হাফ ওর পিছু নেয়। বিষ্ণু বাঁ দিকের কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে সরে গেল, আব্রাহাম ভিতরে ঢুকে এল। বিষ্ণু ব্যাক পাস দিল অমিয়কে, সে দিল আব্রাহামকে। কুড়ি গজ থেকে গোলে দুর্বল নিচু শট করল আব্রাহাম। সোনালির গোলকিপার রবি ঝাঁপিয়ে ধরতে পারল না। আমার মনে হল, রবি যেন ইচ্ছে করেই দেরিতে ঝাঁপিয়েছে। হঠাৎ সেই কটা চোখের কথাটা মনে চমকে উঠল, "গোল দিতে হয়তো পারো, কিন্তু গোল খাওয়া বন্ধ করতে

পারবে না।"

আমি শিউরে উঠলাম। তা হলে একশো টাকার নোটের কাছে নিজেকে বিক্রি করার লোক সোনালিতে ওরা পেয়েছে। কিন্তু ক'জনকে কিনেছে জানি না। প্রত্যেকের উপর আমার সন্দেহ হচ্ছে এখন। রাইট আউট একটা সহজ বল ট্র্যাপ করতে গিয়ে বাইরে পাঠাল, অমনি সন্দেহ হল। পারলে নিশ্চয় আমাকেই দিতে হত, কেননা চমৎকার জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে। আব্রাহাম রাইট ব্যাককে কাটাতে গিয়ে পারল না। রাইট ব্যাক বলটা পায়ে রেখে লোক খুঁজতে তাকাচ্ছে, আব্রাহাম বল ছিনিয়ে নিল আর আমার সন্দেহ হল। সোনালির গলদ দেখছি আর সন্দেহ হচ্ছে।

হাফ টাইমের দু' মিনিট আগে যাত্রী দ্বিতীয় গোল দিল। ডান দিক থেকে চমৎকার মুভ করে বাঁ দিক থেকে শেষ করল আব্রাহাম। পোস্ট আর ক্রসবারের কোণ দিয়ে বিদ্যুৎবেগে বলটা ঢুকল। রবির কিছুই করার ছিল না। হাফ টাইমে দাসুদাকে বললাম আমার সন্দেহের কথা, আর গতকাল যা ঘটেছে। দাসুদা রবির কাছে গিয়ে কথা বলতে লাগলেন। দূর থেকে দেখলাম রবি খুব অবাক হয়ে গেল, হাত নেড়ে তর্ক শুরু করতেই দাসুদা ইশারায় রিজার্ভ গোলকিপার অজিতকে ওয়ারম-আপ করতে বললেন। রবির মুখ ফ্যাকাশে হতে দেখলাম।

খেলা আবার শুরু হতেই আধ মিনিটের মধ্যে আমি গোল দিলাম। সেন্টার লাইন থেকে বল নিয়ে তিনজনকে কাটিয়ে ষোলো গজ থেকে শট নিলাম। শ্যাম ঠাওর করতে পারেনি, অন্তত তিন গজ বাইরে দিয়ে যাওয়ার কথা যে বলের, সেটা বেঁকে এসে ঢুকতে পারে। বিরাট গর্জন উঠল ইস্টবেঙ্গল মাঠ কাঁপিয়ে। আমি এই প্রথম গোল দেওয়ার পর এত বড় আওয়াজ পেলাম। তিন মিনিট পর রাইট আউট তরতরিয়ে উঠে ক্রস করল। শ্যাম গোল ছেড়ে বেরোতে সেকেন্ড তিনেক মাত্র দেরি করে, বল মাটিতে পড়া মাত্র হাফ ভলিতে নেটে পাঠিয়ে দিলাম।

গ্যালারিতে যেন বাজ ডেকে উঠল আর মাঠ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। চার-পাঁচ জন আমাকে জাপটে ঘাড়ে পিঠে ওঠার চেষ্টা করছে। দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার মতো অবস্থা। এর পর গ্যালারি থেকে শুধু "প্রসূনকে বল দে, প্রসূনকে, প্রসূনকে" রব উঠতে লাগল।

যাত্রী দ্বিগুণ উদ্যমে আক্রমণ শুরু করেছে। একে একে আমরা পিছিয়ে নেমে ঠেকাবার চেষ্টা করছি। চাপ ক্রমশই বাড়ছে। নতুন অনভিজ্ঞ অজিত পাগলের মতো খেলছে। লক্ষ করলাম, আমার কাছে যাত্রীর দুজন দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। পঁয়ষট্টি মিনিট পর্যন্ত যাত্রীকে রুখে আর পারা গেল না। অমিয়র চিপ থেকে বিষ্ণু হেড করল, বারে লেগে বল ফিরে আসছে, রাইট স্টপার বলটা উড়িয়ে দিতে গিয়ে মিস-কিক্ করে বিষ্ণুর পায়েই দিল। সেখান থেকে বিষ্ণু সহজেই গোল দিল।

হেরে গেলাম। মাঠ থেকে বেরোচ্ছি আর শুনছি 'ওয়েল প্লেড প্রসূন...সাবাস প্রসূন!" কিন্তু আমি মনে মনে কুঁকড়ে আছি। 'যাত্রীকে হারাব' বলে বাবার সামনে জাঁক করেছি। হারাতে পারলাম না। হঠাৎ পিঠে একটা মৃদু চাপড়ানি আর চাপা

স্বরে 'তুমি সত্যিই ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে' শুনে পিছনে তাকিয়ে সেই কটা-চোখকে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখলাম।

টেন্টে ফিরে রবিকে কয়েকটা কথা বলার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু বলতে পারলাম না। উন্মনা হয়ে ও এক কোণে বসে রইল, কারও সঙ্গে কথা বলল না। তার পর নিঃশব্দে এক সময় টেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল। পিন্টু আমার সঙ্গে রয়েছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি রওনা হলাম। বাসে পিন্টু বলল, "নিমাইদা আমার সামনে বসেছিল। তোমাকে একটা ছেলে গালাগাল দিতেই নিমাইদা তাকে এক চড় কষিয়ে দিয়েছে।"

"আনোয়ার ছিল ?"

"হ্যাঁ। নিমাইদাকে বার বার বলছিল তুই থাকলে প্রসূন আরও দু-তিনটে গোল পেত।"

"কী বলল নিমাই ?"

"কিছু বলেনি।"

বাড়ি ফিরে অন্ধকার ঘরে শুয়ে রইলাম। খেলার রেজাল্ট পিন্টুই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। মা একবার ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম না খেয়েই।

॥ ২০ ॥

যাত্রী লিগ চ্যাম্পিয়ান হল না। শিল্ডও শেষ হল না কোর্টের ইনজাংশনে। এর থেকেও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটল পরের বছরের শুরুতেই। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, যুগের যাত্রী, তিনটি ক্লাবই আমাকে চেয়েছে। আমার ইচ্ছে মোহনবাগানে যাওয়ার। কিন্তু শুনলাম, হাবিব আর সুকল্যাণকে ওরা নিচ্ছে, সুভাষকে ইস্টবেঙ্গল। আমি দোটানায় পড়েছি—যাব কি যাব না, গেলে খেলার সুযোগ পাব কি পাব না, এমন সময় যাত্রী আমায় ছ' হাজার টাকা দর দিল।

যাত্রীর সম্পাদক অনাদি বিশ্বাসের বাড়িতে কথা হচ্ছিল। আর ছিল সেই কটা চোখ। পরে ওর নামটা জেনেছি, ডাকুদা। যাত্রীর টিম সিলেকশন কমিটির মেম্বার। বছরে হাজার দশেক টাকা খরচ করে। ক্লাবের মধ্যে প্রতিপত্তিতে সম্পাদকেরও উপরে। ডাকুদাই নাকি বিশেষ করে আমাকে চেয়েছে।

"তুমি অনিল ভটচাজের ছেলে। তোমার উপর তো যাত্রীর বিশেষ দাবি আছে।" সম্পাদক এই বলে তাকাল ডাকুদার দিকে। ডাকুদা শুধু মাথা নাড়ল। "বাপ-ছেলে একই ক্লাবে খেলবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তা ছাড়া—" সম্পাদক থেমে গেল। ডাকুদার দিকে একবার তাকিয়ে কেশে বলল, "তোমার বাবার উপর সুবিচার করেনি যাত্রী। আমি জানি। কিন্তু তখন আমি তো ক্লাবের একটা অরডিনারি মেম্বার। সেই ফাইনাল খেলা আমি দেখেছি। আহ, কী খেলা তোমার বাবার, এখনও চোখে ভাসছে। অথচ ওর নামেই কিনা কলঙ্ক রটানো হল। এ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। আমাকেই করতে হবে।" সম্পাদকের যেন আবেগে কণ্ঠরোধ হল। আমার মন দুলে উঠছে বাবার প্রশংসা শুনে। যাক, তা হলে সবাই বিশ্বাস করে না।

"এবার আমরা ইয়ং টিম করব। বয়স হয়ে গেছে বেশির ভাগেরই। তোমাদের দিয়েই রিপ্লেস করাব। বাইরে থেকে আর প্লেয়ার আনব না। কেড়ে নাও, এই সব বুড়োদের হটিয়ে জায়গা কেড়ে নাও। ইন্ডিয়া টিমে যাত্রীর কোটা আছে, আমি তোমায় পুশ করব। স্কুল ফাইনালটা পাশ করো, আমি তোমায় ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢুকিয়ে দেব। যাত্রীর মেস আছে, সেখানে থাকবে। ভাল খাবে, ভাল করে খেলবে...এত অল্প বয়স, কত সম্ভাবনা তোমার সামনে।" সম্পাদক আন্তরিক স্বরে যেভাবে বলল, তাতে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

"ছ' হাজার টাকা এখন তোমায় কেউ দেবে না, কিন্তু আমরা দেব।" ডাকুদা হাতের নখ পরীক্ষা করতে করতে বলল, "এটা কিন্তু ঘুষ নয়।"

আমি এবার একটু লজ্জা পেলাম। বললাম, "আমি সৎভাবে টাকা রোজগার করতে চাই।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, তাই তো উচিত।" সম্পাদক টেবিল চাপড়ে বলে উঠল। ডাকুদা ঘড়ি দেখে বলল, "আচ্ছা প্রসূন, তা হলে এই কথাই রইল। তুমি ভেবে দেখো। এখনও মাসখানেক সময় তো আছে।"

ওখান থেকে আমি সোজা দাসুদার বাড়ি গেলাম। সব কথা শুনে দাসুদা বললেন, "তুই যাত্রীতেই যা। সোনালিতে থাক, এমন কথা আমি বলব না। নিজের ভবিষ্যৎ তোকে দেখতে হবে তো। ফুটবলই তোর সব কিছু। তুই এবার বড় ক্লাবে যা। তবে সাবধানে থাকিস। ওখানে টাকাপয়সা যেমন বেশি, দলাদলিটাও বেশি। ডাকু লোকটা সুবিধের নয়। অনেক ছেলের ক্ষতি করেছে, কেরিয়ার শেষ করে দিয়েছে।"

"আমার কী ক্ষতি করবে ? আমি যদি খেলতে পারি, তা হলে আমায় আটকাবে কে ? খেলা দেখিয়েই এতটা এসেছি, আরও যাব।" আস্থাভরেই কথাগুলো বললাম। দাসুদা হেসে বললেন, "তাই যেন পারিস।"

আমি যাত্রীতেই সই করলাম। ডাকুদা সেই দিনই দু' হাজার টাকা দিল। বাকিটা সারা বছরে চার কিস্তিতে দেবে। আমি সই করার দু' দিন পরেই কাগজে দেখি, আনোয়ার আর নিমাই যাত্রীতে সই করেছে। মনে মনে আমি ভীষণ খুশি হলাম।

দাসুদাকে বলেছিলাম, যদি খেলতে পারি, তা হলে আমায় আটকাবে কে ? কিন্তু খেলার সুযোগই যদি না পাই, তা হলে পারি কি পারি না, প্রমাণ করব কেমন করে ! যাত্রীর প্রথম পাঁচটা ম্যাচ ড্রেস করে সাইড লাইনের ধারে বেনচে বসে থাকলাম। আমাকে খেলানো হচ্ছে না, আমি নাকি খুবই কাঁচা, অনভিজ্ঞ। বালী প্রতিভা কি কালীঘাটের সঙ্গে খেলার মতন যোগ্যতাও নাকি আমার নেই। এই সব টিমের সঙ্গে খেলাতেও যাত্রীর কমিটি মেম্বারদের মুখ শুকিয়ে আসে, নতুন ছেলেদের

নামাতে ভয় পায়। যদি পয়েন্ট যায়, তা হলে দোষ পড়বে কমিটির ঘাড়ে। তার থেকে নামী বুড়ো প্লেয়াররা নিরাপদ, কিছু ঘটলে দায়িত্বটা ওদের।

আনোয়ারকে প্রথম দুটো ম্যাচ খেলানো হয়নি। বালীর সঙ্গে ভাল খেলল, তার পর আর বসেনি। নিমাইও ওই ম্যাচে আধখানা খেলেছে। পরের ম্যাচ খিদিরপুরের সঙ্গেও আধখানা। কালীঘাটের সঙ্গে খেলার দশ মিনিটেই শিবরমনের চোট লাগা হাঁটুতে আবার লাগতে নিমাই নামে। দুটো গোলও দেয়। নিমাইকে এখন আর বসানো যাবে না।

যাত্রীর কোচ প্রিয়দাকে একদিন অধৈর্য হয়ে বললাম, "আমাকে কি বসিয়ে রাখার জন্য এনেছেন ?"

"কী করব ভাই," নির্বিরোধী প্রিয়দা এধার ওধার তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "টিম করে সিলেকশন কমিটি, আর কমিটি মানে ডাকুদা। আমাদের কোনও কথাই কানে নেয় না। তুমি বরং ওকেই জিগ্যেস করো।"

ডাকুদাকে সেই দিনই ধরলাম। ওর কয়েকজন পেটোয়া প্লেয়ার আছে, তার মধ্যে দুজন বিষ্ণু আর আব্রাহাম তখন ডাকুদার সঙ্গে ক্লাব টেন্টের বাইরে বাগানে চেয়ারে বসে গল্প করছিল। আমি সটান জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাকুদা, আমাকে নিয়ে এলেন, কিন্তু খেলাচ্ছেন না কেন ?"

"দরকার হলেই খেলাব।" ডাকুদা হাতের নখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন।

"কবে দরকার হবে ?"

"বলতে পারছি না এখন। হয়তো এই সিজনে দরকার নাও হতে পারে।"

"তা হলে এত টাকা খরচ করছেন কেন আমার জন্য ? বসে থেকে যে আমার খেলা নষ্ট হয়ে যাবে।" কাতর স্বরে আমি বললাম।

"যাত্রীর মতন ক্লাব তোমার মতন দু'-চারটে প্লেয়ারকে বসিয়ে টাকা দিলে দেউলে হয়ে যাবে না। টাকার জন্যই তো খেলা, তা যখন পাচ্ছ তখন এত উতলা হওয়া কেন ?" ডাকুদা তার কটা চোখ দুটো বিরক্তিতে সরিয়ে নিলেন আমার মুখের উপর থেকে।

বিষ্ণু ব্যস্ত হয়ে বলল, "এখন যা তো, আমরা দরকারি কথা বলছি, পরে যা বলার বলিস।"

মুখ কালো করে আমি চলে এলাম। নিমাই হেসে হেসে দুটো ছেলের সঙ্গে টেন্টের মধ্যে কথা বলছে। দেখেই বোঝা যায় পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। প্রায়ই ওদের দেখি, নিমাইকে নিয়ে সন্ধ্যার পর বেরিয়ে যেতে। নিমাই আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার গল্প করতে লাগল। আনোয়ার আজ আসেনি। আমি ক্লাব থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালাম।

একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ল, দু' হাজার টাকা নিয়ে বাড়িতে পৌঁছোনো মাত্র কেমন উৎসবের মতন হইচই শুরু হয়ে গেছিল। বিশু দত্তও নেমে এল উপর থেকে। পিন্টু, পুতুল, নীলিমা ভিড় করে দাঁড়াল।

বাবা বাড়ি ছিলেন না।

"আরে বাব্বাঃ, ফুটবল খেলে অ্যাতো টাকা পাওয়া যায়, তা হলে তো ছোটবেলায় বল পেটালেই লাভ হত দেখছি!" বিশু দত্ত বলল।

"সবার কি আর সব জিনিস হয় দত্ত মশাই, এ সব হল গিয়ে ভগবানদত্ত ব্যাপার। প্রসূনকে তো একটা রিসেপশন দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।" নুটুদা চট করে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"তার আগে একটু খাওয়াদাওয়া হোক। কী প্রসূন, পরোটা আর মাংস হবে নাকি?"

মা তখুনি টাকা দিলেন। বিশু দত্তই বাজারে গেল। সারা বাড়ির নেমন্তন্ন। নীলিমাকে বললাম, "এবার আমার সব ধার শোধ করব। এখন আমিও কলেজে ভর্তি হয়েছি—ফুটবলের কলেজে।"

বাবা অনেক রাত্রে ফেরেন। আমি জেগে শুয়ে ছিলাম। মা নিশ্চয়ই বাবাকে বলবেন। উত্তরে বাবা কী বলবেন? দারুণ খুশি হবেন, না যথারীতি মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকবেন! এক সময় বাবা ফিরলেন। ও ঘরে মা'র কথা বলার শব্দ পেলাম। তার পর আলো নিভে গেল। সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম—বাবাকে বলেছ? মা বললেন, "উনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, আমি সাত বছর খেলেও এত টাকা পাইনি।"

॥ ২১ ॥

আনোয়ার আর নিমাইয়ের সঙ্গে যাত্রীতে এসে প্রথম দেখা প্র্যাকটিস শুরুর আগের দিন। ড্রেসিং রুমে আমরা জনা-কুড়ি, কারোর সঙ্গেই তেমন আলাপ নেই। ওদের দুজনের পাশে আমি বসেছিলাম আড়ষ্ট হয়ে। প্রিয়দা আমাদের কাছে ফুটবল সম্পর্কে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দেন। ওঁর পাশে বসেছিল ডাকুদা। যুগের যাত্রীর ঐতিহ্য এবং তা বহন করার দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে ডাকুদাও দু'-চার কথা বলে।

"ফুটবল খুবই সহজ খেলা, যদি না তুমি একে জটিল করে খেলো।" প্রিয়দা প্রথমেই এই কথাটা বলেছিলেন, "আমরা এত বড়, এত পুরনো টিম, কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও লিগ বা শিল্ড পাইনি। একবার মাত্র ফাইনালে উঠেছিলাম, কিন্তু—" ডাকুদা থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সকলের চোখ আমার উপর এসে পড়েছিল।

আমি প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যেন তারা অদ্ভুত একটা জন্তু দেখছে। কারোর ঠোঁট বাঁকা, কেউ কেউ চোখে চোখে হাসল। আমি মাথা নিচু করে ঘেমে উঠলাম। মনে হল, ডাকুদা ইচ্ছে করেই আমাকে এই অবস্থায় ফেলেছে। যেন কিছু একটার প্রতিশোধ নিচ্ছে। নিমাই তখন হঠাৎ বলেছিল, "ফাইনালে উঠে কেউ না কেউ তো হারবেই। আমরা আবার যাত্রীকে ফাইনালে

তুলব, শিল্ডও নেব।" বলে নিমাই সকলের মুখের দিকে তাকায়। শুধু আনোয়ারই বলে, "নিশ্চয়ই।"

বেলেঘাটায় যাত্রীর মেসে আর চারজনের সঙ্গে নিমাইও থাকে। আনোয়ার আর আমিও ছিলাম লিগ শুরুর আগে পর্যন্ত। সকালের প্র্যাকটিস বন্ধ হওয়ায় আর একটার পর একটা খেলায় বসে থাকায় বিরক্ত ও হতাশ হয়ে আমি বাড়ি চলে আসি। মেসে কারও সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলতাম না।

নিমাই আর আনোয়ারকে বিশেষ করে এড়িয়ে চলতাম। দেখা হলে কথা হত। সাধারণ কথা। আগের মতন গলাগলি আর ফিরে আসেনি। কিন্তু বুঝতে পারি, ওরা চায় আবার আমরা 'থ্রি মাসকেটিয়ারস' হই। কিন্তু আমিই সহজ হতে পারি না। সকলের সামনে ডাকুদা শিল্ড ফাইনালের কথা তোলার পর থেকে আমি কুঁকড়ে গেছি।

বাড়িতে কেউ খেলা নিয়ে কথা বলত না। খেলার দিন দুপুরে যখন বাড়ি থেকে বেরোই, তখন শুধু পিন্টুর কথা মনে পড়ত। কিন্তু ও স্কুলে থাকে দুপুরে। বাড়িতে থাকলেও মাঠে যাবার বায়না ধরবে না। ও বোঝে আমার অবস্থাটা। নীলিমা আর মা, ওরাও কিছু বলে না। দিনরাত পড়াশোনা করে ফেল করলে, বাড়ির লোক যেমন ব্যবহার করে, ওরা তাই করছে। শুধু বিশু দত্ত একদিন দোতলা থেকে চেঁচিয়ে বলেছিল, "কী গো প্রসূন, কাগজে আর নামটাম দেখছি না যে?"

কখন যে চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে শুরু করেছে বুঝিনি। বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস জমে উঠেছিল। ধীরে ধীরে সেটা গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়ায় মিশিয়ে দিলাম। কানে কানে কে যেন বলল, 'হাল ছেড়ো না, হতাশ হয়ো না প্রসূন! উদ্যত থাকো, সময় এলেই আঘাত করবে।' আমি আপন মনে মাথা নাড়লাম। পারব না, আর আমি পারব না। ইডেনের ধারে বাসস্ট্যান্ড। আমি শেষ বাসে উঠে বাড়ি এলাম।

হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গে ৫—০ গোলে যাত্রী জিতছে, খেলা শেষ হতে প্রায় দশ মিনিট বাকি। ডাকুদা ইশারায় প্রিয়দাকে ডাকল। তার পর প্রিয়দা আমার কাছে এসে বললেন, "ওয়ারম আপ প্রসূন।"

অবাক হয়ে গেলাম। তা হলে কি কপাল ফিরল! প্রিয়দা রাইট আউট সলিল করকে ডেকে নিলেন। নামার আগে মাঠে আঙুল ঠেকিয়ে যখন কপালে বুকে ছোঁয়ালাম, সারা শরীর কেঁপে গেল। নিমাই ছুটে কাছে এসে বলল, "বল দেব, গোল কর।"

আধ মিনিটের মধ্যেই নিমাই বল পাঠাল, হাওড়ার হাফ লাইন বরাবর। ছুটে গিয়ে ধরতে পারলাম না। গ্যালারিতে আওয়াজ উঠল। চারদিকে তাকিয়ে কেমন অস্বস্তি হল। নতুন নতুন লাগছে সব। প্লেয়াররা কত দূরে ঠিক আন্দাজ হচ্ছে

না। কখন ছুটব, ফাঁকা জমি কোথায়, বল কোথা থেকে আসবে, কিছু বুঝছি না।

দিন-রাত পড়ে জলের মতন যা মুখস্থ ছিল, এখন আর তা মনে পড়ছে না। অনেক দিন বই না খুললে যা হয়। উৎকণ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ক' মিনিট পরেই হুইসল বাজবে। তার মধ্যে একটা কিছু করতেই হবে। ডজ করব কি তিন-চার জনকে ? চেঁচালাম, "নিমাই, দে।"

গ্যালারিতে হাসির রোল উঠল। একজনকে কাটিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। বলকে সেই রকম আগের মতন অনুভব করতে পারছি না। বলটা পায়ে আছে কি নেই, বুঝতে পারিনি। শরীরটাকে কতখানি দোলাব, কোমর থেকে ঝাঁকুনিটা কখন দেব, আন্দাজ করতে পারিনি।

নিমাই বল নিয়ে ডান দিকের কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে এগোচ্ছে। আমি ভিতরে ঢুকে এলাম বক্সের মধ্যে। নিমাই কাটাল লেফট ব্যাককে। বলটা আমায় ঠেলেই স্টপারকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বলল, "বল দে আমায়।" আমি বল ঠেললাম সোজা স্টপারের পায়ে। গ্যালারি বিরক্তি জানাল বেশ জোরেই। নিমাই করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঘাবড়ে গেছিস। বি স্টেডি।"

পাঁচ গোলে জিতছি, তাই আমার বোকামি আর অপদার্থতা রাগের বদলে মজার জিনিস হয়ে উঠল গ্যালারিতে। খেলার মধ্যে আর কিছু উত্তেজনা নেই, তাই ওরা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। একটার পর একটা ভুল করছি আর মনে হচ্ছে যেন ডুবে যাচ্ছি। বিষ্ণু কোমরে হাত দিয়ে হাসছে। অমিয় মজা পেয়ে বলছে, "অ্যাই, অ্যাই, প্রসূনকে বল দে।" গ্যালারি ফেটে পড়ছে হাসিতে। নিমাইয়ের ডিফেন্স চিরে দেওয়া থ্রু-টা যখন প্রচণ্ডভাবে পোস্টের চার গজ বাইরে মারলাম, তখন হাওড়ার দু-তিনজনও হাসি চাপতে পারল না। আমি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে পড়লাম। আর তখনই খেলা ভাঙার হুইস্‌ল বাজল। কে এসে আমার পিঠে হাত রাখল। মুখ তুললাম। দেখি, নিমাই চলে যাচ্ছে।

আমি যাত্রীর টেন্টের দিকে লিগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর যাইনি। ক্লাব থেকে লোক এসেছিল ডাকতে। শিবরমনের হাঁটুতে জল জমেছে। এই সিজনে আর খেলতে পারবে না। নিমাই আর বিষ্ণুর উপর চাপ পড়ছে খুব। একটা ম্যাচও জিরোতে পারেনি ওরা। মাঝে মাঝে দীপুদাকে খেলানো হয়েছে ওদের একজনকে বসিয়ে। দীপুদা তেরো বছর আগে যাত্রীতে প্রথম খেলা শুরু করেন। এখন আর পারেন না। নতুন ছেলেদের মধ্যে সৌমেন আর বলাইয়ের নাম কাগজে দেখেছি।

যাত্রী লিগে চতুর্থ হয়েছে। বছরের সব থেকে বড় কৃতিত্ব মোহনবাগানের কাছ থেকে একটা পয়েন্ট নেওয়া। নিমাই প্রথমে গোল দিয়েছিল। পেনালটি থেকে প্রণব গাঙ্গুলী শোধ করে। কাগজ পড়ে বুঝতে পারলাম না নিমাই কেমন খেলেছে। রিপোর্টারদের মধ্যে যাত্রীর সাপোর্টার একজনও নেই। মোহনবাগানকে গোল দিতে পেরে নিমাই যে দারুণ খুশি, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

বিকেলে আমার ছোট্ট পাঠশালায় পিন্টুর বন্ধুদের নিয়ে প্র্যাকটিস করছিলাম। তখন নিমাই আর আনোয়ার এসে হাজির। আমি অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম শুধু। ওরা রংচঙে বুশ শার্ট পরেছে, চুলগুলো যেমন বড়, জুলফিও তাই। পায়ে দামি চটি। দুজনেরই হাতে বিদেশি ঘড়ি।

"যাস না কেন টেন্টে ?" নিমাই বলল।

আমি ফিকে হাসলাম। "কেন যাই না সেটা তো বুঝতেই পারিস।"

"ফুটবল খেলায় ওরকম অনেক কিছু হয়। মাঠে আয়, প্র্যাকটিস কর, আবার খেলা ফিরে পাবি। এই ছোট মাঠে বল নিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে ঠুকঠুক করে খেলা আরও খারাপ করছিস কেন ?" আনোয়ার বলল।

তর্ক করতে পারতাম, ইচ্ছে হল না। বললাম, "যাব'খন। প্র্যাকটিস হচ্ছে নাকি ?"

"হবে না ? শিল্ডের খেলা তো এসে গেল। এবার ইন্ডিয়ার বাইরের টিম খেলতে আসছে। তুই আয়, তোকে দরকার। ফরোয়ার্ড আর কেউ তো নেই। বিষ্ণু ইনজুরি নিয়ে খেলেছে লিগের শেষ ক'টা ম্যাচ। আবার লেগে গেলে একদম বসে যাবে।" নিমাই ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল।

"ডাকুদা আমায় খেলাবে ভেবেছিস ?"

"আয় না, তার পর দেখা যাবে। গড়ের মাঠ থেকে দূরে থাকিস না, ওতে ক্ষতিই হবে। সকালে আসিস, কেমন ?"

মনটা চনমন করে উঠল। গড়ের মাঠ, শিল্ড, ফুটবল এই শব্দগুলোয় শিহরন লাগে। শিল্ডে খেলার লুকোনো ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর গ্যালারির বিদ্রূপের হাসিও কানে বেজে উঠল। আমি বলে ফেললাম, "কেমন যেন ভয় করছে।"

ওরা অবাক হয়ে গেল। আনোয়ার বলল, "কীসের ভয় ? পাবলিককে ? গোল দে, দেখবি, ওরাই আবার তোকে মাথায় তুলে নাচবে।"

নিমাই বলল, "গোল তুই পাবিই, আমি তো আছি।" ঘড়ি দেখে বলল, "রাজুরা অপেক্ষা করছে রে, আনোয়ার ! আর নয়, দেরি হয়ে গেছে। তা হলে কাল, কেমন ?"

ওরা চলে যাবার পর মনে হল, আগের দিন হলে এমন করে আমায় ফেলে নিমাই কিংবা আনোয়ার চলে যেত না, এমন পোশাকি ঢঙে কথা তো বলতই না। আমি অনেকক্ষণ ভাবলাম ওদের কথা। ঠিকই বলেছে, এই ছোট জমিতে ছোটদের সঙ্গে খেলে কিছুই হবে না। গড়ের মাঠের বিরাট জমি, হাজার হাজার লোক, সেই আবহাওয়া আর উত্তেজনার কাছাকাছি থাকতে হবে। দেহে মনে শুষে নিতে হবে। ঠিক করলাম, আবার যাত্রীর মাঠে যাব প্র্যাকটিসে।

॥ ২২ ॥

আমার যে কত বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয় আছে, সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম যাত্রী শিল্ড ফাইনালে উঠতেই। টিকিট, টিকিট, একখানা টিকিট। 'প্রসূন, তোকে সেই কত ছোট্টটি দেখেছি, আর কী বড়ই না হয়ে গেছিস...প্রসূন, মনে আছে কী বলেছিলিস...প্রসূনদা আমি কিন্তু ছাড়ব না, আপনার দরজায় হাংগার স্ট্রাইক হবে, মাঠে যেতে দোব না...' ঝালাপালা হয়ে গেলাম আমি। হেসে মাথা নেড়ে 'আচ্ছা দেখব, চেষ্টা করব' এই সব বলে পাশ কাটাচ্ছি। যুগের যাত্রী কুড়ি বছর পর আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে ! সেমি ফাইনালে মহামেডানকে এক গোলে হারিয়েছে। গোলটা দিয়েছে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি—প্রসূন ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয় রাউন্ডে যাত্রীর প্রথম খেলায় আমি আর বিষ্ণু আধাআধি খেলি কটক কম্বাইন্ডের বিরুদ্ধে। বিষ্ণু খোঁড়াচ্ছিল। ওকে তুলে নিয়ে প্রিয়দা আমাকে নামান। ৩—০ জিতি, তার মধ্যে একটা গোল আমার। অমিয়র লম্বা থ্রো নিমাই হেড করে আমার পায়ে ফেলামাত্র হাফ ভলিতে মারি বারো গজ থেকে। গোলকিপার নড়ার সময় পায়নি। তৃতীয় রাউন্ডে গোয়ার ভাসকো ক্লাবকে ২—০ হারালাম। আমি গোল করতে পারিনি, সলিল আর আব্রাহাম গোল দেয়। ও দিক থেকে রেঙ্গুন ইউনাইটেড উঠেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। জলন্ধর লিডারসকে ২—১ গোলে হারিয়ে উঠল সেমি ফাইনালে। এই প্রথম ইডেনে বসে আমি ফুটবল খেলা দেখলাম। রেঙ্গুনের সেন্টার ফরোয়ার্ডের আর রাইট হাফের খেলা আমার ভাল লাগল। আর কারও নাম মনে রাখতে পারিনি, শুধু মংবা আর লি সান ছাড়া। মংবা-র বেশ বয়স হয়েছে, অন্তত পঁয়ত্রিশ তো বটেই। প্রথম গোল খেয়েই রেঙ্গুন চঞ্চল হয়ে ওঠে, খেলার সাময়িক বিশৃঙ্খলা আসে। মংবা বল ধরে শান্ত ধীরভাবে প্লেয়ারকে কাটিয়ে দেখেশুনে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। খেলার গতি ধীর করে আবার টিমকে গুছিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত মংবা তার চমৎকার বল কন্ট্রোল ক্ষমতাকে যেভাবে কাজে লাগাচ্ছিল, তাতে শ্রদ্ধা হল ওর উপর। লি সান-ও বয়স্ক, নিজেদের পেনালটি বক্স পর্যন্ত নেমে এসে বল নিয়ে আবার উঠছিল। চট করে একজনকে বলটা ঠেলে দিয়েই লি সান আচমকা বুলেটের মতো এগিয়ে আবার পাশটা নেয়। একসঙ্গে দুজন কেটে যায় সেই দৌড়ে। দু' পায়ে তৈরি কিক্, হেড দিতে ওঠে সবাইকে ছাড়িয়ে। শুনলাম বর্মা টিম থেকে দুজনেই এবার বাদ পড়েছে।

আমরা এরিয়ান আর শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টারকে হারিয়ে উঠলাম সেমি ফাইনালে। আমি গোল করতে পারিনি দুটো খেলাতেই। মহামেডান দু' দিন ড্র করে ইস্টবেঙ্গলকে এক গোলে হারিয়ে আমাদের সামনে পড়ল, ও দিকে উঠল মোহনবাগান-রেঙ্গুন ইউনাইটেড।

সেমি ফাইনাল খেলার আগের দিন ক্লাব প্রেসিডেন্টের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে

আমাদের রাখা হল। তিনতলায় বিরাট একটা হলঘরে আমরা রইলাম। আব্রাহাম, শ্যাম, অমিয়-রা অনেক রাত পর্যন্ত তাস খেলল। সকালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হল শোভাবাজারের টিকাদারের মতো যেন একজনকে ঢুকতে দেখলাম গেট দিয়ে। একটু পরে প্রিয়দা থমথমে মুখে দুজন সিনিয়ার প্লেয়ারকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

দুপুরে খাওয়ার পর শ্যাম আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "একটা বিশ্রী খবর এসেছে প্রসূন, আনোয়ার নাকি টাকা খেয়েছে।"

থ' হয়ে গেলাম আমি। অকল্পনীয় এবং ডাহা মিথ্যে। আমি বললাম, "বিশ্বাস করি না।"

"সত্যি-মিথ্যের কথা নয়! খেলার ঠিক আগে কারও সম্পর্কে এ ধরনের কথা রটলে তাকে বসাতে হয়। মুশকিল হয়েছে ম্যাচটা মহামেডানের সঙ্গে আর আনোয়ারও মুসলমান। চট করে সবাই বিশ্বাস করে নেবে।"

"খবরটা কে দিল?"

"সকালে দু'বার উড়ো টেলিফোন এসেছে, তা ছাড়া টিকাদার এসেও বলে গেল আনোয়ারকে নাকি পরশু রাতে গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরোতে দেখেছে, সঙ্গে ছিল মহামেডানের দুজন অফিসিয়াল।'

"বাজে কথা!" আমি চিৎকার করে উঠলাম। "আনোয়ার আর আমি পরশু একসঙ্গে টেন্ট থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি গেছি। এ সব টিকাদারের বদমাইসি, ও শোধ নেবার জন্য রটাচ্ছে।"

আমি ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, ডাকুদা আর প্রিয়দা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। বাকি সবাই বিস্মিত, অপ্রতিভ চোখে কেউ কেউ নির্বাক, কেউ চাপা স্বরে দু'-একটা কথা বলছে। ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আনোয়ার বসে।

"আনোয়ারের আজ না খেলাই উচিত।" ডাকুদা বলল, "মনে অস্বস্তি নিয়ে খেলা যায় না।"

"নিশ্চয়ই খেলবে।"

আমার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, সবাই চমকে উঠল। "বাজে মিথ্যা গুজবের কাছে মাথা নোয়াব কেন?"

"যদি আজ যাত্রী হারে, যদি আনোয়ারের গলদেই গোল হয়, তা হলে আমাদের আর আনোয়ারের অবস্থাটা কী হবে বুঝতে পারছ?" ডাকুদা বলল। এত উদ্বিগ্ন হতে কখনও ওকে দেখিনি।

আমি তাকালাম নিমাইয়ের দিকে। নিমাই চুপ করে শুনছিল এতক্ষণ। বলল, "আনোয়ার যদি খেলে, যাত্রী হারবে না।"

গলা খাঁকারি দিয়ে শ্যাম বলল, "আনোয়ার আজ খেলবে। নয়তো আমার বদলে অন্য কেউ গোলে খেলুক।"

আব্রাহাম বলল, "আনোয়ারকো খেলানেই হোগা।"

গড়িয়ে পড়ার একটা শব্দ শুনে আমরা তাকিয়ে দেখি, ঠেস দিয়ে বসা আনোয়ার

জ্ঞান হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

আনোয়ার বিকেলে খেলেছিল। গোলটা আমি দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু একজনে একটা টিমের সঙ্গে কীভাবে লড়তে পারে, সে ধারণাটা সে দিনই প্রথম হল। খেলার পর আমরা আনোয়ারকে কাঁধে করে মাঠ থেকে বেরোই। শ্যাম দু'বার মাত্র বল ধরে সারা ম্যাচে। আনোয়ারকে চারবার আমি মহামেডান পেনালটি বক্সের মধ্যে দেখেছি, গোল করতে উঠে এসেছিল।

পর দিন মোহনবাগান হেরে গেল রেঙ্গুন ইউনাইটেডের কাছে ০—২ গোলে।

॥ ২৩ ॥

রাত্রে ঘুম আসছে না। শিল্ড ফাইনালের আর ৪০ ঘণ্টাও বাকি নেই। কাল সকালে আমরা প্রেসিডেন্টের বাড়িতে জমা হব। সেখান থেকে ফাইনাল খেলতে ইডেনে যাব। ছটফট করছি বিছানায়। অস্বস্তি আর উত্তেজনা, ভয় আর আশা সব মিলিয়ে আমার সারা শরীর দপদপ করছে, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। এমন সময় কে ঘরে ঢুকল। অন্ধকারে তাকিয়ে বুঝলাম, মা।

পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বললেন, "ঘুম আসছে না!"

প্রশ্ন নয়, মা যেন খবরটা জানিয়ে দিলেন। আমি 'উঁ' বলে মা'র কোলে মাথা তুলে দিলাম।

"জানি। এই রকমই হয়। ফাইনাল খেলা কী জিনিস আমার জানা আছে।"

"বাবা কিছু বলেননি! আমি যাত্রীর হয়ে ফাইনাল খেলব, বাবা কিছু বলেননি?"

"ও ঘরে তোর মতোই ছটফট করছে।"

মা আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঘুম নেমে আসছে। স্নিগ্ধ হয়ে জুড়িয়ে আসছে শরীর। মা'র শরীর থেকে দূর্বা ঘাস আর ভিজে মাটির গন্ধে ম ম করে উঠছে ঘরটা। মনে হচ্ছে, বল নিয়ে আমি খেলা করছি। ঘুম জড়িয়ে আসছে সর্বাঙ্গে। তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বললাম, "কাল টিকিট পাঠিয়ে দেব, তুমি দেখতে যেয়ো!"

তার পর আমি সাদা-কালো ফুটকি দেওয়া বলটা নিয়ে হেলে দুলে এগোতে লাগলাম, লাফালাম, হঠাৎ ছুটলাম। পড়ে গিয়ে আবার উঠলাম। মা'র বুকের মধ্যে বড় বড় ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার শব্দ হচ্ছে। প্রবল বেগে বাঁধ-ভাঙা বন্যার জল যেন ছুটে আসছে।

"পরশু তোর বাবাও খেলবে খোকা। তোর মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে আনবে যা হারিয়েছে। তুই জিতবি, ঠিক জিতবি।"

ক্রমশ মা'র গলার স্বর দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আর এগিয়ে আসছে প্রচণ্ড গর্জন।

আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমি কোথায় যাব, কোথায় আশ্রয় নেব? সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠলাম—স্ট্রাইকার, স্ট্রাইকার!

গর্জনটা আরও জোরে আমাকে গোল হয়ে ঘিরে ধরল।

এত লোক! ষাট-সত্তর হাজারের কম নয়। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল আমার শট রেঙ্গুনের বার ছুঁয়ে বেরিয়ে যেতেই। পঁয়ত্রিশ গজ থেকে শটটা নিয়েছিলাম, আচমকা।

বাইরে থেকে প্রিয়দা পাগলের মতন হাত নাড়ছেন, আমাকে পিছিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে দিতে। আজ সকালে বারবার আমাকে বলেছেন, দশ নম্বরের সঙ্গে ছায়ার মতো থাকবে গোপাল। তুই নেমে এসে গোপালের জায়গাটা সামলাবি। লি সান-টাই হচ্ছে ডেনজারাস্। ওকে আটকালে ওদের অ্যাটাক খোঁড়া হয়ে যাবে।

গোপালকে নিয়ে লি সান একবার ডাইনে আর একবার বাঁয়ে যাচ্ছে। বড় বড় গ্যাপ পড়ছে আমাদের ডিফেন্স-এ। আমি নেমে এসে কোন দিক যে সামলাব ভেবে পাচ্ছি না। ওদের অ্যাটাক খোঁড়া করতে গিয়ে যাত্রীর অ্যাটাকই খোঁড়া হয়ে গেছে, তবু মাঝে মাঝে এগিয়েছি আর প্রিয়দা হাত নেড়ে আমাকে পিছিয়ে যেতে বলেছেন। এক সময় নিমাইকে বললাম, "এভাবে চললে আমরা গোল খাব। ওদের বক্সে বল নিয়ে গিয়ে খেলতে হবে। আমাদের ডিফেন্স থেকে প্রেশার তুলতে হবে, নয়তো এই প্রেশার রাখতে পারব না।"

বলতে বলতেই আমরা গোল খেলাম। কর্নার ফ্ল্যাগের কাছ থেকে রেঙ্গুনের লেফট আউট সেন্টার করে। লি সানকে নিয়ে গোপাল ব্যস্ত। লেফট ব্যাক উঠে এসেছিল। চলতি অবস্থাতেই কুড়ি গজ থেকে ধাঁধানো শটে বলটা পোস্টে লেগে গোলে ঢুকল। সারা ইডেন স্তব্ধ। শুধু কয়েকটা হাততালির শব্দ শোনা গেল। খেলার বয়স এখন মাত্র কুড়ি মিনিট।

সেন্টারে বল বসাবার সময় নিমাই বলল, "উঠে খেল। প্রিয়দার দিকে আর তাকাসনি।"

পরের মিনিটেই নিমাই থেকে আব্রাহাম, আবার নিমাই এবং সে দু'জনকে কাটিয়ে রিভারস্ পাস দিল আমাকে। গোল হতে পারে! ইডেন দাঁড়িয়ে উঠে খাপার মতো চিৎকার করে উঠল "গো ও ও ল, গো ও ও ল।" আমার সামনে গোল। স্টপার আর ব্যাকের মাঝখানে একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছি। দ্বিধা করলাম, মাঝখানে যদি গোল না হয়! বরং আর একটু এগিয়ে যাই। ভুল করলাম সেইখানেই। বলটা ঠেলে দিয়ে এগোতে যাবার মুহূর্তে মংবা-র পরিচ্ছন্ন স্লাইডিং ট্যাকলে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। স্টপার বলটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

যখন উঠলাম, ইডেনের আর্তনাদ তখন আছড়ে পড়ছে গ্যালারি থেকে। আমি মাথা নামিয়ে ফিরে যাচ্ছি, তখন প্যাভিলিয়নের সামনের গ্যালারি থেকে কে চেঁচিয়ে

উঠল, "কার ব্যাটা দেখতে হবে তো !" আমি মুখ তুলে তাকালাম।

আনোয়ার অনবদ্য খেলছে, অমিয়ও। শ্যামের আজ সেই দিন, যে দিন ও পাগলার মতো খেলে। পর পর তিনটে অবধারিত গোল বাঁচিয়ে যাত্রীর ডিফেন্সকে ও চাঙ্গা করে তুলেছে। আঠারো গজ লাইনের কাছে এসে ও উইঙ্গারদের ক্রসগুলো ফরোয়ার্ডের মাথা থেকে তুলে নিয়েছে। বক্সের বাইরে পর্যন্ত বেরিয়ে এসে চার্জ করে বল ক্লিয়ার করেছে। গোলটা খাওয়ার পরই আমাকে উপরে রেখে নিমাই আর সলিল নেমে এসেছে যাত্রীর হাফ এলাকায়।

একা মাঝ-মাঠে দাঁড়িয়ে মনে হল গ্যালারি থেকে লোকেরা যদি এখন হুড়মুড় করে নেমে আসে ? কেন যে মনে হল জানি না, আমি ভয়ে পিছিয়ে এলাম। আর ঠিক তখনই আনোয়ার বলটা লব করে রেঙ্গুন হাফ এলাকার ঠিক সেই জায়গায় ফেলল, যেখান থেকে আমি এইমাত্র পিছিয়ে এসেছি। রেঙ্গুনের স্টপার ছাড়া আর কেউ নেই। বলটা ধরবার জন্য সে বাঁদিকে দৌড়োচ্ছে। আনোয়ার চিৎকার করে উঠল, "প্রসূন, বল ধর।"

ওর গলার স্বরে কী যে ছিল, মনে হল পারব। মরিয়া হয়ে ছুটতে শুরু করলাম। স্টপার যখন বুঝতে পারল, তার আগেই আমি বলের কাছে পৌঁছোব, শেষ চেষ্টা হিসাবে সে ঝাঁপ দিল আমার পায়ের উপর। লাফিয়ে উঠলাম, ওকে ডিঙিয়ে মাটিতে পা রেখেই দেখি, আমার সামনে কেউ নেই। শুধু গোলকিপার ইতস্তত করছে গোল ছেড়ে বেরোবে কি না।

বলটাকে সামনে ঠেলে লম্বা দৌড় শুরু করলাম। পিছনে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। ইডেনের গর্জন ধাপে ধাপে উঠছে আর রেঙ্গুনের গোল ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। বক্সে ঢুকে পড়েছি। গোলকিপার এবার বেরিয়েছে। কানে তালা লাগানো চিৎকার আমার চারপাশে। বলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জানি, পিছনে কেউ আসছে বলটা ছিনিয়ে নিতে।

ডান দিকে হেলে বলটাকে মারার জন্য বাঁ পা তুললাম। গোলকিপার বাঁ দিকে ঝুঁকল। মুহূর্তের ভগ্নাংশে বাঁ দিকে হেলে ডান পায়ে বলটা আলতো করে ওর মাথার উপর দিয়ে চিপ করে পাঠালাম। বেচারা বাঁ দিকে ঝোঁকা অবস্থায় অসহায়ের মতো ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, বলটা গোলে ঢুকছে।

তার পর যাত্রীর দশজন আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল আর গর্জনে ভেঙে পড়ল ইডেনের আকাশ। যখন সেন্টারে এসে দাঁড়ালাম, তখনও বুঝতে পারছি না কী ঘটেছে। সত্যিই কি গোল করলাম ! বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই হাফ টাইমের বাঁশি বাজল।

॥ ২৪ ॥

"দারুণ গোল হয়েছে...আমি তো ভেবেছিলুম, এটাও মিস্ করবি।" প্রিয়দা উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছেন।

"এই গোলই মিস্ করেছিল একজন।" পিছন থেকে একটা গলা শুনলাম। আমি ফিরে তাকালাম না। জানি, একজোড়া কটা-চোখ এখন আমার পিঠে বিঁধে রয়েছে। ভোলেনি, অনেকেই ভোলেনি। ড্রেসিং রুমে কে ট্রানজিস্টর খুলেছে। শ্যামল সেনের গলা শুনতে পেলাম, "...শিল্ড ঘরে তুলতে পারবে কি না এখনই বলতে পারছি না, তবে যুগের যাত্রীর তরুণ স্ট্রাইকার প্রসূন ভট্টাচার্য যে অপূর্ব দক্ষতায় গোলটি শোধ দিল তা বহু দিন স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, এই প্রসূনেরই বাবা অনিল ভট্টাচার্য কুড়ি বছর আগে শিল্ড ফাইনাল খেলেছিলেন এই যুগের যাত্রীর হয়ে। পিতা-পুত্রে আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে খেলার নতুন নজির আজ গড়ে উঠল। হয়তো গ্যালারিতে বসে অনিলবাবু এখন দেখছেন..."

বাবা! আসবেন কি খেলা দেখতে! কাল চারটে টিকিট পাঠিয়েছিলাম—বাড়ির জন্য তিনটে, হর্ষদার একটা। কিন্তু বাবা আসবেন বিশ্বাস হয় না। তবু আবার মাঠে নামার সময় গ্যালারিগুলোর দিকে তাকালাম। অজস্র হাত আমার উদ্দেশে নড়ছে। কিন্তু আমি একটা মুখও দেখতে পেলাম না। শুধু আবছা ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে যেন হাজার হাজার বিন্দুর নড়াচড়া চলেছে কতকগুলো রেখা তৈরি করে। এর মধ্যে কোথাও কি বাবা বসে আছেন!

রেঙ্গুন ইউনাইটেড ঝড়ের মতো শুরু করল। মিনিট পাঁচেক আমাদের কাঁপিয়ে দিয়ে হঠাৎ ওদের যেন দম ফুরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী উঠে এল ওদের হাফ লাইনে। নিমাই, আব্রাহাম চমৎকার বল রাখছে মাটিতে, পায়ে বল ছিটকে যাচ্ছে স্ফুলিঙ্গের মতো। নিমাই তছনছ করছে হাফ লাইন পর্যন্ত, কিন্তু নিরেট শক্ত ডিফেন্সের পাঁচিলটা টপকাতে পারছে না। আমি জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি গোলে শট নেওয়ার। কোথাও যদি আলগা থাকে ভিতরে ঢোকার।

গোল হচ্ছে না। খেলা শেষ মুখে এসে গেছে। অধৈর্য গ্যালারির গর্জন উঠছে নামছে। এমন সময় নিমাইকে ফাউল করল ওদের রাইট ব্যাক, আঠারো গজ লাইনের বাঁ দিকে হাত দুয়েক বাইরে। ফ্রি কিক্। বলটা বসিয়ে নিমাই আমার দিকে তাকিয়ে দুটো আঙুল দেখাল। বুঝে গেলাম ও কোথায় বল পাঠাবে। প্র্যাকটিসে এই সঙ্কেতগুলো আমরা ঠিক করে নিয়েছি। ওরা পাঁচজনে পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়েছে। নিমাই আর বিষ্ণু তৈরি হয়েছে শট নিতে। আব্রাহাম হঠাৎ বাঁ দিকে ছুটে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওকে পাহারা দিতে গেল একজন। আমি ডান দিকে সরে গিয়ে তাকালাম ঠিক পেনালটি স্পটে। নিমাই সেটা লক্ষ করল। পাঁচিলের পিছনে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে, যাতে গোলকিপারের দৃষ্টি ব্যাহত না হয়। রেফারি হুইস্‌ল দিতেই নিমাই আর বিষ্ণু এগোল শট নিতে। নিমাই একটু

পিছিয়ে। বোঝা মুশকিল কে শট নেবে। তবে, যে কেউই বুঝতে পারবে এটা বহু ব্যবহৃত একটা প্যাঁচ। বিষ্ণু শট নিতে এসে বলের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাবে আর নিমাই শট করবে।

বলের উপর দিয়ে বিষ্ণু লাফিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে ছুটে গেল, কিন্তু নিমাই শট না নিয়ে বলটা নিখুঁত মাপে চিপ করল পাঁচিলের মাথা ডিঙিয়ে পেনালটি স্পটের উপর। এবার সব কিছু নির্ভর করছে আমার ছুটে যাওয়ার এবং ঠিক সময়ে পৌঁছোনোর উপর। দিনের পর দিন আমার পাঠশালায় পিন্টুকে নিয়ে যার প্র্যাকটিস করেছি, এবার তার পরীক্ষা। মোটরবাইকের হঠাৎ স্পিড তোলার মতো আমি প্রচণ্ড দমকে, ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে ঢুকলাম।

দেরি হয়ে গেছে। চার পা এগোনো মাত্র বুঝে গেলাম বলটাকে হাফ ভলিতে নিলে বারের উপর দিয়ে চলে যাবে। হঠাৎ বুকের মধ্যে কে বলে উঠল, "স্ট্রাইকার, এবার ঘা মারো, সর্বশক্তি দিয়ে মারো!" শেষ চেষ্টায় চার গজ দূর থেকে ঝাঁপ দিলাম। বল থেকে চোখ সরাইনি। কপালের ডান দিকে বলটা লাগছে, হাতুড়ির মতো মাথাটা দিয়ে আঘাত করলাম বলে—আর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়লাম।

চারদিক কেমন শান্ত নিস্তব্ধ! ঘাস আর মাটির মিষ্টি সোঁদা গন্ধে বুক ভরে যাচ্ছে। আমি মুখ তুলে দেখছি অদ্ভুত একটা দৃশ্য, রেঙ্গুন ইউনাইটেডের গোলকিপার গোলের মধ্য থেকে কুড়িয়ে নিল সাদা-কালো ফুটকি আঁকা আমার পৃথিবীটাকে। এর পর ধীরে ধীরে একটা গর্জন আমাকে কাঁপিয়ে দেহের উপর দিয়ে বয়ে যেতে শুরু করল।

লক্ষ্মণ মালি এসে বলল, "আপনাকে একজন মেয়েছেলে ডাকছে।"

যাত্রীর টেন্টের বাইরে তখন উৎসব চলেছে। হাউই, পটকা আর তুবড়ির শব্দে, আলোয় আলোয় ঝলমল করছে গড়ের মাঠের এই দিককার আকাশ। বাইরে এলাম খালি গায়ে। নীলিমা আর পিণ্টু দাঁড়িয়ে। ভেবেছিলাম মাকে দেখব।

"এ কী তোমরা! খেলা দেখতে তুমি এসেছিলে? এখনও বাড়ি যাওনি, মা কোথায়?" একটানা অনেকগুলো প্রশ্ন করলাম। বাড়ির লোককে দেখে সত্যিই ভাল লাগছে।

"জেঠিমা সকাল থেকে দক্ষিণেশ্বরে। আর জ্যাঠামশাই বললেন, একটু অপেক্ষা করে যাই, এবার হয়তো বাজি পোড়ানো হবে, তাই—"

"বাবা! বাবা কোথায়?" আমার গলা ধরে এল।

"বাইরে। বললেন, তোমরাই দেখা করে এসো।"

ছুটে বাইরে যেতে গিয়ে থমকে গেলাম। তার পর ফুলগাছগুলোর মধ্য দিয়ে রেলিং-এর ধারে গিয়ে বাইরে তাকালাম। একটা তুবড়িতে আগুন দেওয়া

হয়েছে। ক্রমশ আলোর ঝাড় চালচিত্রের মতো ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে পেলাম, অনেক লোকের মধ্যে একজনের কপালে চিকচিক করছে একটা টিপ। অত্যন্ত উজ্জ্বল, মর্যাদাবান।

তুবড়ির আলোয় আমাকে দেখতে পেয়ে তখন অনেকে ছুটে আসছে "প্রসূন, প্রসূন!" বলে।

স্টপার



॥ এক ॥

"এসে গেছেন! আচ্ছা এক মিনিট, আপনি বরং এখানেই বসুন।"

অনুরোধ নয়, যেন নির্দেশ। তরুণ সাংবাদিক ঢোঁক গিলে ঘাড় নাড়ল এবং নড়বড়ে লোহার চেয়ারটায় বসে সপ্রতিভ হবার জন্য রুমাল দিয়ে ঘাড় গলা মুছে, পায়ের উপর পা তুলে প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করল, তারপর কী ভেবে সিগারেটটা আবার প্যাকেটে ভরে রাখল।

তার দশ গজ দূরেই ছড়িয়ে রয়েছে হাফপ্যান্ট পরা, কতকগুলো আদুড় দেহ। তারা ঘাসের উপর চিত হয়ে, উপুড় হয়ে বা পা ছড়িয়ে বসে। ঘাম শুকিয়ে এখন ওদের চামড়ার রং ঝামা ইটের মতো বিবর্ণ, খসখসে। সন্তর্পণে তারা শ্রান্ত হাত পা বা মাথা নাড়ছে। চোখের চাহনি ভাবলেশহীন এবং স্থির।

ওদের একজন গভীর মনোযোগে পায়ের গোছে বরফ ঘষছে; ধুতি পাঞ্জাবি পরা স্থূলকায় এক মাঝবয়সী লোক তার সামনে উবু হয়ে দু'বার কী বলল, মাথা নিচু করে ছেলেটি বরফ ঘষেই যাচ্ছে, জবাব দিল না।

উপুড় হয়ে দুই বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজে এতক্ষণ শুয়েছিল যে ছেলেটি, সে হঠাৎ উঠে বসে কর্কশস্বরে চিৎকার করল, "কেষ্ট, কতক্ষণ বলেছি জল দিয়ে যেতে।"

তাঁবুর পিছন দিক থেকে একটা চাপা গজগজানি এর জবাবে ভেসে এল।

তরুণ সাংবাদিক তাঁবুর ভিতরে তাকাল। তাঁবুর মাঝখানে সিমেন্টের একফালি চত্বর। পাতলা কাঠের পাল্লা দেওয়া স্প্রিং-এর দরজা দু'ধারে। দরজাগুলো ঝাপট দিচ্ছে ব্যস্ত মানুষের আনাগোনায়, চত্বরটার পিছনটা খোলা। সেখান দিয়ে পাশের তাঁবু এবং একটা টিউবওয়েল দেখা যাচ্ছে। একটা গোল স্টিলের টেবিল চত্বরের মাঝখানে, সেটা ঘিরে সাত-আটজন লোক বসে এবং গলা চড়িয়ে তারা তর্ক করছে। কয়েকটা চায়ের কাপ টেবিলে। একজন চোখ বুজে টোস্ট চিবোচ্ছে। পাখা ঘুরছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় তাঁবুর ভিতরটায় ভ্যাপসা গুমোট।.

"আপনার চা।"

সাংবাদিক চমকে তাকাল। গেঞ্জি পরা একটা ছেলে, হাতে ময়লা কাপ। দুটি বিস্কুট কোনওক্রমে কাপের কিনারে পিরিচে জায়গা করে রয়েছে।

"আমার! আমি তো—"

"কমলবাবু পাঠিয়ে দিলেন।"

সাংবাদিক হাত বাড়িয়ে পিরিচটা ধরল, আর চা খেতে খেতে মনের মধ্যে গুছিয়ে

নিতে লাগল গত দু'দিন ধরে তৈরি করে রাখা প্রশ্নগুলো।

"তোকে পইপই বললাম, ডানদিকটা চেপে থাক, তবু ভেতরে চলে আসছিলিস।"

"আমি কী করব, শম্ভুটা বার বার বলছে—রাখতে পাচ্ছি না, রাখতে পাচ্ছি না, বলাই একটু এধারে এসে আগলা। সাইড আর মিডল দুটো ম্যানেজ করব কী করে?"

"সলিলটা যদি চোট না পেত! ভালই খেলছিল। সুকল্যাণের ওই শট গোললাইনে বুক দিয়ে আটকানো, বাপ্‌স। আমি তো ভাবলাম বুকটা ফেটে গেল বুঝি।"

"সলিলের লেগেছে কেমন?"

"কে জানে, কমলদা তো ভেতরে নিয়ে গিয়ে কী সব ওষুধ টষুধ দিচ্ছে।"

"পুষ্যিপুত্তুর কিনা, তাই ওর বেলা ওষুধ আর আমাদের বেলা বরফ ঘষো।"

"ট্যালেন্ট। ওর মধ্যে ট্যালেন্ট আছে আর আমাদের মধ্যে গোবর। যাকগে, ছোটমুখে বড় কথা বলে লাভ নেই; বলাই, মনে থাকে যেন কাল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বসুশ্রীর গেটে।"

"এখনও তোর কাছে চার আনা পাই।"

"কীসের চার আনা?"

"ভুলে মেরে দিচ্ছ বাবা, 'দিলকো-দেখো'-র টিকিট কাটার সময় ধার নিয়েছিলি না?"

"উঃ, কবেকার কথা ঠিক মনে রেখে দিয়েছিস তো। চার আনা আবার পয়সা নাকি!"

সাংবাদিক কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছে। ডিগডিগে লম্বা যে ছেলেটি এতক্ষণ চিত হয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে শুয়েছিল, অস্ফুট একটা শব্দ করে হাত নামিয়ে তাকাতেই সাংবাদিকের সঙ্গে চোখাচোখি হল।

"রেজাল্ট?" সাংবাদিক চাপা গলায় জানতে চাইল।

"পাঁচ।"

সাংবাদিক সমবেদনা জানাতে চোখ মুখে যথাসম্ভব দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তুলল। ছেলেটি শুকনো হেসে বলল, "ডজন দিতে পারত, দেয়নি।"

"সিজ্‌নের প্রথম খেলা এটা?"

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে উঠে বসল। ঢোঁক গিলল, শুকনো ঠোঁট চাটল, জিরজিরে বুক। কাঁধে উঁচু হয়ে রয়েছে হাড়। কোমর থেকে পাতা পর্যন্ত পা দুটো সমান। পেশির ওঠানামা কোথাও ঘটেনি। সাংবাদিকের মনে হল ছেলেটিকে গোল পোস্টের মাঝখানে ছাড়া মাঠের আর কোথাও ভাবা যায় না।

"সরি, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। চা দিয়ে গেছে তো?"

একটা চেয়ার টানতে টানতে কমল গুহ সাংবাদিকের পাশে এনে রাখল।

"আর এক কাপ হোক।"

"না না, আমি বেশি চা খাই না।"

"ভাল। বেশি চা খেলে স্বাস্থ্য থাকে না। গত পঁচিশ বছরে আমি ক'কাপ চা খেয়েছি বলে দিতে পারি। ফুটবলারের সব থেকে আগে দেখা উচিত নিজের

শরীরটাকে। নয়তো বেশিদিন খেলা সম্ভব নয়। ফার্স্ট ডিভিশনেই কুড়ি বছর, হ্যাঁ, প্রায় কুড়ি বছরই খেলছি।"

সাংবাদিক ইতিমধ্যে তার নোটবই খুলে বল পেনের আঁচড়ে দু'চার কথা লিখে ফেলেছে।

"আপনার বয়স কত এখন?"

"আপনিই বলুন।"

"কুড়ি বছর যদি ফার্স্ট ডিভিশনে হয় তা হলে অন্তত চল্লিশ।"

কমলের চোখে আশাভঙ্গের ছাপ ফুটে উঠল। "আপনি আমার কেরিয়ার থেকে হিসেব করে বললেন। কিন্তু আমায় দেখে বলুন তো বয়স কত?"

ভ্রূ কুঁচকে সাংবাদিক বোর্ডে দুরূহ কোনও অঙ্কের দিকে তাকানো মেধাবী ছাত্রের মতো ওর দিকে তাকাল। চুলগুলো কোঁকড়া, মোটা, ছোট করে ছাঁটা। দু'কানের উপরে অনেক চুল পাকা। কপালে রেখা পড়েছে তিন-চারটি। সাংবাদিকের মনে পড়ল একটা বইয়ে পাতাজোড়া স্ট্যানলি ম্যাথুজের মুখের ছবি সে দেখেছিল। তলায় লেখা—'দি ফেস অফ থারটিফাইভ ইয়ারস অফ টেনশন ইন ফুটবল।' ম্যাথুজের কপালে পাঁচটি রেখা; ঠোঁটের কোলে একটি, তার পরেই আর একটু বড় আকারের টানাপোড়েনে থরথর দুটি ঢেউ যেন আছড়ে পড়েছে। এরপর চোখের কোণ পর্যন্ত সারা গাল বেলাভূমির মতো কুঞ্চিত। কিন্তু কমল গুহর চোখ ম্যাথুজের মতন বিশ্রামপ্রত্যাশী অবসন্ন নয়। পাথরের মতো ঝকঝকে, কোটরের মধ্যে বসানো। অসন্তুষ্ট, বিক্ষুব্ধ এবং চ্যালেঞ্জ জানায়।

সাংবাদিক নোটবইটা কাত করে, কমল গুহর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায়ই পাতার কোনায় চট করে লিখল—রাগী ভোঁতা, সেন্টিমেন্টাল।

বেশি দুধ দেওয়া চায়ের মতন গায়ের রং কিংবা মেদহীন মধ্যমাকৃতি এই বাঙালি ফুটবলারের চেহারার মধ্যে সাংবাদিক কোনও বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল না। গলার স্বর ঈষৎ ভারী ও কর্কশ। শুধু চোখে পড়ে হাঁটার সময় দেহটি বাহিত হয় শহিদ মিনারের মতো খাড়া মেরুদণ্ড দ্বারা। হাঁটার মধ্যে ব্যস্ততা নেই।

"আটাশ, বড়জোর তিরিশ।" সাংবাদিক ইতস্তত করে বলল।

আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কমল গুহ। সাংবাদিকের অস্বস্তি দেখে হাসিটা আরও বেড়ে গেল। তাঁবুর সামনে দিয়ে দুটো ঘোড়সওয়ার পুলিশ ডিউটি সেরে ফিরছিল। তারা বাধ্য হল ঘোড়ার রাশ টেনে ফিরে তাকাতে।

"বড্ড কমালেন কিন্তু। আমার অফিসের বয়স কমানো আছে বটে, কিন্তু এতটা কমাতে সাহস হয়নি। কিছু মনে করবেন না, আপনার বয়স কত?"

সাংবাদিক গলা খাঁকারি দিয়ে খুব গম্ভীর হতে হতে বলল, "পঁচিশ।"

কমল গুহ ভুরু নাচিয়ে বলল, "আসুন মাঠটা দশ পাক দৌড়ে আসি।"

"তা কী করে সম্ভব!" সাংবাদিক প্রতিবাদ করল। "একজন ফুটবলারের সঙ্গে আমি পারব কেন। আপনাকে যদি বলি এক পাতা লিখতে, পারবেন কি আমার মতন?"

কমল গুহর মুখ থেকে মজার ভাবটা আস্তে আস্তে উবে গেল।

"ঠিক। বলেছেন ঠিকই। আমি পারব না এক পাতা লিখতে। কিন্তু আপনি আমার বয়স জানতে চাইলেন কেন? আমার শরীরের ক্ষমতা সম্পর্কে একটা ধারণা পাবার জন্যই তো? যদি বলি পঁচিশ তা হলে ভেবে নেবেন, অন্তত এগারো সেকেন্ডে আমি একশো মিটার দৌড়োতে পারি। যদি বলি চল্লিশ তা হলে সেটা পনেরো সেকেন্ড হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমরা দুজনে দৌড়োই এবং আপনাকে হারিয়ে দিই, তা হলে কি আমার বয়স পঁচিশ বছর বলে আপনি মেনে নেবেন না? সন তারিখ দিয়ে কি বয়স ঠিক করা যায়, শরীরের ক্ষমতাই হচ্ছে বয়স। বুঝলেন, এখন আমার বয়স সাতাশ।"

সাংবাদিক টুক করে তার নোটবইয়ে 'হামবাগ' কথাটা লিখে প্রশ্ন করল, "আপনার লাস্ট ম্যাচ কোনটা যেটা খেলে রিটায়ার করেন?"

"রিটায়ার, আমি? লাস্ট ইয়ারেও দুটো ম্যাচ খেলেছি হাফ টাইমের পর। দরকার হলে এ বছরও খেলব। সলিলটা আজ হাঁটুতে চোট পেয়েছে, সারতে মাসখানেক লাগবে। হয়তো আমাকে নামতে হতে পারে। স্টপারে খেলা, ছোট একটা জায়গা নিয়ে, খুব একটা অসুবিধে হয় না।"

"স্ট্যানলি ম্যাথুজ তো প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল খেলে গেছেন। ইংল্যান্ডের হয়েই তো খেলেছেন তেইশ বছর।"

"মহাপুরুষ ওঁরা। তাও উইং ফরোয়ার্ডে। অত বয়সে ওই পজিশনে খেলা ভাবতে পারি না। আমি প্রথম যখন ফার্স্ট ডিভিশনে শুরু করি, রাইট ইনে খেলতাম।"

"কোন ক্লাবে?"

"এখানে শোভাবাজার স্পোর্টিংয়েই প্রথম দু'বছর, তারপর ভবানীপুর, দু'বছর পর এরিয়ানে, সেখানে এক বছর কাটিয়ে যুগের যাত্রীতে চার বছর, মোহনবাগানে এক বছর, আবার যুগের যাত্রীতে দু'বছর, তারপর আবার শোভাবাজারে। টু ব্যাক সিস্টেমে খেলা শুরু করে, থ্রি ব্যাক পার করে, ফোর ব্যাকে পৌঁছে গেছি। রাইট ইন থেকে পল্টুদা আমাকে স্টপারে আনেন।"

"কে পল্টুদা?" সাংবাদিক বল-পেন উঁচিয়ে প্রশ্ন করল।

"চিনবেন না আপনি। পল্টু মুখার্জি, আমার গুরু। থার্টি ফাইভে উনি খেলা ছেড়েছেন। দুখিরাম বাবুর হাতে তৈরি, খেলতেনও এরিয়ানে। ওঁর আড্ডা ছিল এই শোভাবাজার টেন্টে তাস খেলার। জুয়া, রেস, নেশাভাঙ করে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কিন্তু তৈরি করেছেন অনেক ফুটবলার। ফুটবলের যতটুকু শিখেছি বা যতটুকু খ্যাতি পেয়েছি সবই ওঁর জন্য। গুরুর ঋণ আমি কোনওদিনই শুধতে পারব না। বলতে গেলে, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আমাকে মানুষ করেছেন। কতদিন ওর বাড়িতেই খেয়েছি, থেকেছি। উনিই আমাকে ম্যাট্রিক পাশ করিয়েছেন।"

কমল গুহ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জামা খুলতে শুরু করল। সাংবাদিক অবাক হয়ে থাকার মধ্যেই চট করে নোটবইয়ে লিখে ফেলল, 'গুরুবাদী'।

জামাটা গলা পর্যন্ত তুলে কমল গুহ পিছন ফিরে বলল, "দেখছেন ঘাড়ের নীচে শিরদাঁড়ার কাছে?"

একটা বহু পুরনো, প্রায় দু'ইঞ্চি দাগ দেখতে পেল সাংবাদিক। "হ্যাঁ, বুটের দাগ।"

"বুটের নয়, কাঁসার বগিথালা দিয়ে পিটিয়েছিলেন।"

"থালা দিয়ে!"

কথাটা কে বলল দেখার জন্য সাংবাদিক পিছন ফিরে তাকাতেই তার শরীর সিরসিরিয়ে উঠল। একটা বনমানুষ যেন জামা প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে। নিকষ কালো রং, ভুরুর এক ইঞ্চি উপর থেকে শুরু মাথার চুল, চোখ দুটো কুতকুতে গর্তে ঢোকানো। নীচের ঠোঁট এত পুরু যে ঝুলে পড়েছে।

কমল গুহ সামনে ফিরে, দু'হাতে মাথার চুলগুলোকে দুধারে টেনে বলল, "এখানে আছে একটা। খড়ম পরতেন তারই প্রমাণ রেখে দিয়েছেন।"

"এইভাবে মার খেয়েছেন, কই, কখনও তো বলেননি!" ছেলেটির মুখ দেখে বোঝা যায় না তার মনে ভয় বা শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে! কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত মুখের জমি প্রায় সমান। যেন ভূমিষ্ঠ হবার সময়ই মুখে প্রচণ্ড থাবড়া খেয়েছে। কণ্ঠস্বর ওর মনের ভাব প্রকাশ করে।

"খেলা শেখার মাশুল; দস্তুর মতো মার খেয়ে শিখেছি। থালাটা পিঠে পড়েছিল আমাকে সিনেমা হল থেকে বেরোতে দেখে, খড়মটা মাথায় পড়ে টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে।" বলতে বলতে কমল গুহর গলার স্বর ভারী হয়ে এল। চিকচিক করে উঠল চোখের সাদা অংশ। "গুরু হতে গেলে যা হয়, তাই ছিলেন। এখন এভাবে খেলা শেখার কথা ভাবাই যায় না। শট মারতেও শিখল না, বলে কত টাকা দেবেন? যদি বলো ট্রেনিংয়ে আসনি কেন, অমনি চোখ রাঙিয়ে বলবে, আমি কি ক্লাবের চাকর? ওই জন্য কিছু আর বলি না। পচা পচা, সব পচা। যে হতে চায় তাকে তাগিদ দিতে হয় না।"

কমল গুহ কথাগুলো বলল ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে। মুখ নামিয়ে ছেলেটি দাঁড়িয়ে।

"আজই ডাক্তারের কাছে যাবি। হাঁটু খুব বিশ্রী ব্যাপার, কোনওরকম গাফিলতি করবি না। বহু ভাল ফুটবলারকে শেষ করে দিয়েছে এই হাঁটু। ট্যাক্সিতে যা, টাকা আছে তো?"

ছেলেটি ঘাড় নাড়ল।

কমল গুহ সন্দিহান হয়ে বলল, "কই, টাকা দেখি?"

"ঠিক চলে যাবখন।" ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে বলল। কমল গুহ পকেট থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বার করে এগিয়ে ধরল।

"না, না, বাসেই চলে যেতে পারব।"

"যা বলছি তাই কর।"

ছেলেটিই শুধু নয়, সাংবাদিকও সেই গম্ভীর আদেশ শুনে কুঁকড়ে গেল। নোটটা নিয়ে ছেলেটি কমল গুহকে প্রণাম করল। কমল গুহ আলতো হাত রাখল পিঠে, তারপর ও চলে গেল বাঁ পা টেনে টেনে।

"ছেলেটা সিরিয়াস। গুড মেটিরিয়াল। পড়াশুনা হয়নি, বুদ্ধি কম, কিন্তু খাঁটি

সোলজার। যা হুকুম হবে তাই পালন করবে। প্রাণ দিতে বললে দেবে। এমন প্লেয়ারও দরকার হয়। দেখি কতখানি তৈরি করা যায়।" কমল গুহর স্বর এই প্রথম কোমল শোনা গেল।

"আপনি কি ওর কোচ?" সাংবাদিক বলপেন বাগিয়ে ধরল।

"কোচ? ওহ্ না, ক্লাবে এন আই এস থেকে পাশ করা কোচ একজন আছে। তবে সলিলকে আমি নিজের হাতে গড়ছি। বস্তিতে থাকে, ন'টা ভাই বোন, যতটুকু পারি সাহায্য করি। বেঁচে থাকার লোভ তো সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু একটা সময় আসে যখন মানুষকে মরতেই হয়। তখন সে বেঁচে থাকে বংশধরের মধ্য দিয়ে। ফুটবলারকেও একসময় মাঠ ছাড়তে হয়। কিন্তু সে বাঁচতে পারে ফুটবলার তৈরি করে। সলিলই আমার বংশধর।"

"আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?"

কমল গুহর মুখের উপর দিয়ে ক্ষণেকের জন্য বেদনা ও হতাশার মেঘ ভেসে চলে গেল। "একটি মাত্র ছেলে। বয়স সতেরো, প্রি-ইউ পড়ে। আমার বিয়ে হয়েছিল খুবই অল্প বয়সে।"

"কোথায় খেলে এখন?"

"কোথাও না। জীবনে কোনওদিন ফুটবলে পা দেয়নি। হি হেটস্ ফুটবল। এমনকী খেলা পর্যন্ত দেখে না। আমার খেলাও দেখেনি কখনও। ভাবতে খুব অবাকই লাগে, তাই নয়?"

"আপনার স্ত্রীর ইন্টারেস্ট নেই আপনার খেলা সম্পর্কে?"

কমল গুহ মাথা নাড়ল ক্লান্ত ভঙ্গিতে। "নেই নয়, ছিল না। দশ বছর আগে মারা গেছে, আমার খেলার জীবনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেনি একদিনও। অমিতাভ তার মা'র কাছ থেকেই ফুটবলকে ঘৃণা করতে শিখেছে। পলিটিক্সের কথা বলে, তাই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে, গান গায়, কবিতা লেখার চেষ্টা করে, কিন্তু ফুটবল সম্পর্কে একদিনও একটি কথা বলেনি।"

"স্ট্রেঞ্জ!" সাংবাদিক তারপর নোটবইয়ে লিখল, 'স্যাড লাইফ'।

কমল গুহ আনমনা হয়ে স্থির চোখে বহুদূরে এসপ্ল্যানেডের একটা নিওন বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাংবাদিক অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। যে সব ফুটবলার খালি গায়ে শুয়ে-বসে ছিল, তারা স্নান সেরে ফিটফাট হয়ে এখন পাঁউরুটি আর মাংসের স্টু খাওয়ায় ব্যস্ত। তাঁবুর মধ্য থেকে ভেসে আসা টুকরো টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে।

"কালীঘাটের খেলার রেজাল্ট কী হল রে..."

"চলে না দাদা, চলে না, ওসব প্লেয়ার কলকাতা মাঠে সাতদিন খেলবে। বৃষ্টি নামুক, দেখবেন তখন কীরকম মাল ছড়াবে..."

"একশো টাকা হারব যদি কখনও নিমু হেড করে গোল দেয়..."

"আমাদের নেক্সট ম্যাচ কার সঙ্গে রে..."

"তুই বলটা শ্রীধরকে না দিয়ে গোপালকে চিপ করলি কেন, এয়ারে নায়িমের সঙ্গে

কি ও পারে?"

"আপনার আর কি প্রশ্ন আছে?"

সাংবাদিক ইতস্তত করে বলল, "বহু প্রশ্ন ছিল।"

"যেমন?" কমল গুহ নিরুৎসুক স্বরে জানতে চাইল।

"আপনি ফিফটি সিক্স ওলিম্পিকে যাবেন বলেই সবাই ধরে নিয়েছিল কিন্তু যেতে পারেননি। কী তার কারণ? আপনি চারবার সন্তোষ ট্রফিতে খেলেছেন, রাশিয়ান টিমের সঙ্গে দুটো ম্যাচ খেলেছেন, ইন্ডিয়ার সেরা স্টপার হিসেবে আপনার নাম ছিল। অথচ কত আজেবাজে প্লেয়ার এশিয়ান গেমসে বা মারডেকায় খেলতে গেল আর আপনি একবারও ইন্ডিয়ার বাইরে যেতে পারেননি, কেন?"

"আর কী প্রশ্ন?"

কমল গুহর নিরুৎসুক স্বর একটুও বদলায়নি। সাংবাদিক তাইতে গম্ভীর হয়ে ওঠা উচিত মনে করল। "কলকাতার মাঠে আপনাদের মতো ফুটবলার আর পাওয়া যাচ্ছে না, তার কারণ কী? নব্বুই মিনিটের ফুটবল আমাদের পক্ষে খেলা সম্ভব কি না? ফুটবল সিজন্ শীতকালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে খেলা আরও ভাল হবে কি না...।"

সাংবাদিক থেমে গেল। তাঁবুর মধ্যে ফোন বাজছিল। একজন চিৎকার করে ডাকল, "কমলদা, আপনার ফোন।"

কমল গুহ চেঁচিয়ে তাকে বলল, "আসছি, এক মিনিট ধরতে বল।"

তারপর দ্রুত সাংবাদিককে বলল, "আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে অনেকক্ষণ সময় লাগবে, আপনি বরং আর একদিন আসুন।"

"যদি আপনার বাড়িতে যাই?"

তাঁবুর দিকে যেতে যেতে কমল গুহ বলল, "তাও পারেন। ছুটির দিনে আসবেন। সকালে।"

সাংবাদিক তার নোটবইটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কিছু একটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করল এবং গভীর বিরক্তিতে ভ্রু কুঞ্চিত অবস্থায় শোভাবাজার স্পোর্টিংয়ের বেড়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে একবার পিছু ফিরে তাকাল। তাঁবুর একটা জানলার মধ্যে দিয়ে কমল গুহকে দেখা যাচ্ছে, ঘাড় নিচু করে ফোনে কথা বলছে।

"অরু! অরুণা? কী ব্যাপার, হঠাৎ যে...অ্যাঁ! পল্টুদা পড়ে গেছেন? ব্লাডপ্রেশার আবার...ডাক্তার কী বলেন!...দেখানো হয়নি! হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি, এখুনি রওনা হচ্ছি। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তুমি ডাক্তার আনো।" ফোন রেখে কমল ঘরের একমাত্র লোক শোভাবাজারের সহ সম্পাদক অবনী মণ্ডলকে বলল, "কিছু টাকা এখুনি চাই, শ'খানেক অন্তত।"

"অ্যাক—শো! এখন কোথায় পাব?"

"যেখান থেকে হোক, যেভাবে হোক এখনি।"

"চাই বললেই এখন কোথায় পাই, শোভাবাজারের ক্যাশে কত টাকা তা তো আপনাকে বলার দরকার নেই।"

কমল একটা অসহায় রাগে আচ্ছন্ন হয়ে কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। অবনী যা

বলল তা সত্যি। কিন্তু এখনি টাকাও চাই। এই তাঁবুতে যারা গল্প করছে বা তাস খেলছে তারা কেউ একশো টাকা পকেটে নিয়ে ঘোরে না।

"পল্টুদার স্ট্রোক হয়েছে, এই নিয়ে তিনবার। ওর বড় মেয়েই ফোন করেছে। কিন্তু কী করে এই মুহূর্তে টাকা পাওয়া যায় বলুন তো? বাড়িতে আছে কিন্তু এখন বাগবাজারে গিয়ে আবার নাকতলায় যেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।"

"তাই তো, গড়ের মাঠে এই সময় একশো টাকা—" অবনী মণ্ডলের চিন্তিত গলা থেমে গেল। কমল ফোনটা তুলে দ্রুত ডায়াল করছে।

"রথীন মজুমদার আছে? আমি কমল, কমল গুহ শোভাবাজার টেন্ট থেকে বলছি। খুব দরকার...হ্যাঁ ধরছি।"

মিনিট দুয়েক অধৈর্য প্রতীক্ষার পর ওদিক থেকে সাড়া পেয়ে কমল বলল, "কমল বলছি।" সংক্ষেপে একশো টাকা চাওয়ার কারণটা জানিয়ে বলল, "যদি পারিস তো দে, চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব তোর কাছে। অনেক তো করেছিস আমার জন্যে, এটাও কর। গুরুদক্ষিণা তো জীবনে দেওয়া হল না, চিকিৎসাটুকুও যদি করতে পারি। কালই অফিসে নিশ্চয়ই টাকাটা দিয়ে দেব।"

ওধার থেকে জবাব শোনার জন্য অপেক্ষা করে কমল বলল, "যুগের যাত্রী টেন্টে? এখনি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দশ মিনিটেই পৌঁছোচ্ছি।"

কমল রিসিভারটা ছুড়েই ক্রেড্‌লের উপর ফেলল। তাঁবু থেকে দ্রুত বেরিয়ে বেড়ার দরজা পার হয়ে ময়দানের অন্ধকারে ঢোকার পর সে প্রায় ছুটতে শুরু করল যুগের যাত্রীর তাঁবুর দিকে।

॥ দুই ॥

গত পনেরো বছরে কমল দু' বার চাকরি, ছয় বার বাসা এবং ছয় বার ক্লাব বদল করেছে। শোভাবাজার স্পোর্টিং, ভবানীপুর, এরিয়ান, যুগের যাত্রী, মোহনবাগান, এবং আবার যুগের যাত্রী হয়ে এখন শোভাবাজারে আছে। এই সময়ে সে দর্জিপাড়া, আহিরিটোলা, শ্যামপুকুর, কুমারটুলি, আবার শ্যামপুকুর হয়ে এখন বাগবাজারে বাসা নিয়েছে। ক্লাবের জন্ম শোভাবাজারে এবং নাম শোভাবাজার স্পোর্টিং হলেও তার কোনও অস্তিত্ব জন্মস্থানে এখন আর নেই, যেমন কমলের জন্ম ফরিদপুরে হলেও, তিন বছর বয়স সেখান থেকে চলে আসার পর আর সে দেশের মুখ দেখেনি। শোভাবাজার স্পোর্টিং এখন ময়দানের তাঁবুতে আর বেলেঘাটায় কেষ্টদার অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রসাদ মাইতির বাড়িতেই বিদ্যমান।

কমল যুগের যাত্রীর তাঁবুতে শেষ বার পা দিয়েছিল সাত বছর আগে। মোহনবাগান থেকে যাত্রীতে আসার জন্য ট্রান্সফার ফর্মে সে সই করে এক হাজার টাকা আগাম নিয়ে। কথা ছিল পাঁচ হাজার টাকা যাত্রী তাকে দেবে।

বছর শেষে সে মোট পায় চার হাজার টাকা। দিল্লিতে ডুরান্ডে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে আসার পরই সে গুলোদার কাছে বাকি টাকাটা চায়। যুগের যাত্রীর সব থেকে

ক্ষমতাশালী গুলোদা অর্থাৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রতাপ ভাদুড়ি। সকালে প্র্যাকটিসের পর প্লেয়াররা কী খাবে, কোন ম্যাচে কোন প্লেয়ার খেলবে, কোন প্লেয়ারকে যাত্রীতে নেওয়া হবে, এবং কত টাকায়, এসব স্থির করা ছাড়াও গুলোদা এবং তার উপদলের নির্দেশেই নির্বাচিত হয় ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, ফুটবল সম্পাদক, এমনকী প্রেসিডেন্টও। ফুটবল চ্যারিটি ম্যাচের বা ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচের টিকিট গুলোদার হাতেই প্রথমে আসে, তারপর মেম্বারদের বিক্রি করা হয়। আই এফ এ এবং সি এ বি-র তিন-চারটি সাব কমিটিতে গুলোদা আছে। একটি ছোট্ট প্রেসের মালিক গুলোদা গত বছরে দুটি বাড়ি করেছে ভবানীপুরে ও কসবায়।

গুলোদা নম্রস্বরে বিনীতে ভঙ্গিতে কথা বলে।

"সে কী, তুই টাকা পাসনি এখনও!" গুলোদার বিস্ময়ে কমল অভিভূত হয়ে যায়।

"ছি ছি, অন্যায়, খুব অন্যায়। আমি এখুনি তপেনকে বলছি।"

গুলোদা অ্যাকাউন্ট্যান্ট তপেন রায়কে ডেকে পাঠাল। সে আসতেই ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলল, "একী, কমলের টাকা পাওনা আছে যে? না না, যত শিগগির পারো দিয়ে দাও, কমল আমাদের ডিফেন্সের মূল খুঁটি, ওকে কমজোরি করলে যাত্রী শক্ত হয়ে দাঁড়াবে কী করে!"

কমল সতর্ক হয়ে বলে, "গুলোদা, টাকাটা রোভার্সে যাবার আগেই পাচ্ছি তো?"

"তুই ভাই তপেনের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নে।" বলতে বলতে গুলোদা ফোন তুলে ডায়াল করতে শুরু করে দেয়।

তপেন তিন দিন ঘুরিয়ে টাকা দেয়নি। কমলও রোভার্সে যায়নি। ফুটবল সেক্রেটারির কাছে খবর পাঠায়, হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। তাই শুনে গুলোদা শুধু বলেছিল, "বটে।"

পরের মরশুমের জন্য ফুটবল ট্রান্সফার শুরু হবার আগে গুলোদা ডেকে পাঠায় কমলকে। ও আসা মাত্র ড্রয়ার থেকে একশো টাকার দশটি নোট বার করে একগাল হেসে গুলোদা বলে, "গুনে নে। তোরা যদি রাগ করিস, তা হলে যাত্রী চলবে কী করে বলতে পারিস? না না কমল, ছেলেমানুষি করা তোর পক্ষে শোভা পায় না। দশ বছরের ওপর তুই ফার্স্ট ডিভিশনে খেলছিস। ইন্ডিয়া কালার, বেঙ্গল কালার পরেছিস। চ্যাংড়া ফুটবলারদের মতো তুইও যদি টাকা নিয়ে...না না, তোকে দেখেই তো ওরা শিখবে, ক্লাবকে ভালবাসবে। ইউ মাস্ট বি ডিগ্‌নিফায়েড্। এবার ভাল করে গুছিয়ে টিম কর। কাকে কাকে নিতে হবে সে সম্পর্কে ভেবেছিস?"

গুলোদা সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে ইশারা করল। কমল হাতের নোটগুলো প্যান্টের পকেটে রেখে চেয়ারে বসতেই গুলোদা আবার শুরু করে, "প্লেয়ার কোথায়? একটু আগে দেবু টাকা চাইতে এসেছিল। বললুম, টাকা তো দেব, কাগজ পেনসিল নিয়ে বসে একবার হিসেব কর, ক'মিনিট খেলেছিস, কত গজ দৌড়েছিস, ক'টা ভুল পাশ দিয়েছিস, ক'টা বল রিসিভ করতে পারিসনি, ক'টা ওপেন নেট পেয়ে বাইরে মেরেছিস।...মেম্বাররা লিগ চায়, শিল্ড চায়, আরে বাবা, যে ক'টা প্লেয়ার, সবই তো মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল নিয়ে বসে আছে। প্লেয়ার না হলে ট্রফি আনবে কে!

একা কমল গুহ যা খেলে তার সিকিও যদি দুটো ব্যাক খেলতে পারত, তা হলে ইন্ডিয়ার সব ট্রফি আমরা পেতাম। ক্লাস—ক্লাস, ক্লাসের তফাত। তোর ক্লাসের প্লেয়ার কলকাতা মাঠে এখন ক'টা আছে আঙুলে গুনে বলা যায়। তুই কিন্তু ট্রান্সফারের প্রথম দিনেই উইথড্র করবি।"

কমল বলতে শুরু করে, "কিন্তু টাকার কথাটা তো..."

"আহ্, ওসব নিয়ে তোর সঙ্গে কি দর কষাকষি করতে হবে! গত বছর যা পেয়েছিস এবারও তাই পাবি।"

কমল ট্রান্সফারের প্রথম দিনেই ওল্ড ফ্রেন্ডসে সই করেই উইথড্র করে। লিগে সাতটি ম্যাচে তাকে ড্রেস করিয়ে সাইড লাইনের ধারে বসিয়ে রাখা হয়। অষ্টম ম্যাচ স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে পাঁচ গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় খেলা শেষের দশ মিনিট আগে কোচ বিভাস সেন এসে বলে, "কমল নামতে হবে, ওয়ারম্ আপ করো।"

শোনা মাত্রই ঝাঁঝিয়ে ওঠে কমলের মাথা। দিনের পর দিন হাজার হাজার লোকের সামনে আনকোরা প্লেয়ারের মতো সেজেগুজে লাইনের ধারে বসে থাকার লজ্জা আর অপমানের ক্ষতে যেন নুনের ছিটে এই দশ মিনিটের জন্য খেলতে নামানো।

"এতদিনে হঠাৎ মনে পড়ল যে?" কমল অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা স্বরে বলে।

"রাগ করিসনি ভাই, বুঝিসই তো, আমার কোনও হাত নেই। সবই একজনের ইচ্ছেতেই তো হয় এখানে।" বিভাস চোরের মতো এধার-ওধার তাকিয়ে বলে, "খেলার আগেই গুলোদা বলে দেয় কমলকে দশ মিনিট আগে নামিও।"

কমল বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে গ্যালারির দিকে তাকায়। একেবারে উপরে গুলোদা তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে। কমল সটান উঠে এসে গুলোদার সামনে দাঁড়াল। জার্সিটা গা থেকে খুলে হাতে ধরে বলল, "বয়স হয়েছে, খেলাও পড়ে এসেছে। কিন্তু কমল গুহ যতদিন বল নিয়ে ময়দানে নামবে, ততদিন এই জার্সিকে সে ভয়ে কাঁপাবে।"

জার্সিটা হতবাক গুলোদার কোলে ছুড়ে দিয়ে, খালি গায়ে কমল শত শত লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির ভিড় কাটিয়ে গ্যালারি থেকে নেমে আসে। তাঁবুতে এসে জামা প্যান্ট পরে, নিজের বুট এবং অন্যান্য জিনিসগুলো ব্যাগে ভরে যখন সে বেরোচ্ছে, তখন খেলা শেষের বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে হাউইয়ের মতো একটা উল্লাস আকাশে উঠে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ল। কমল থমকে পিছন ফিরে তাকাল। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটে বলল, "এই শব্দকে কাতরানিতে বদলে দেব।"

যুগের যাত্রী তাঁবুর চৌহদ্দিতে কমল আর পা দেয়নি। পরের বছর ট্রান্সফারের প্রথম দিনেই সে সই করে আসে শোভাবাজার স্পোর্টিংয়ে খেলার জন্য। লিগ তালিকায় শেষের পাঁচ-ছ'টি দল প্রথম ডিভিশনে টিকে থাকার জন্য জোট পাকায় আর পয়েন্ট ছাড়াছাড়ি করে, শোভাবাজার তাদেরই একজন। তিনটি খেলায় এগারো গোল খেয়ে সে বছর ওদের খেলা পড়ে যায় যাত্রীর সঙ্গে। কমল খেলতে নেমেছিল এবং শুধু তারই জন্য যাত্রীর ফরোয়ার্ডরা পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকেই বার বার

ফিরে যায়। খেলা ০—০ শেষ হয়। শেষ বাঁশির সঙ্গে মাঠে থমথমে গাম্ভীর্য নেমে আসে। কমল শোভাবাজারের দু'জন প্লেয়ারের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে মাঠ থেকে বেরোবার সময় বলে "শরীরে আর একবিন্দুও শক্তি নেই রে, নইলে এখন আমি একটা দারুণ চিৎকার করতুম।"

ফিরতি লিগে শোভাবাজারের যখন পঁচিশটা খেলায় চোদ্দো পয়েন্ট, তখন পড়ল যাত্রীর সামনে। লিগ তালিকায় যাত্রী তখন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান আর এরিয়ান্সের পরে, বি এন আরের ঠিক উপরে। চ্যাম্পিয়ান হওয়ার কোনও আশা তো নেই—এটা শুধু ছিল মানরক্ষার খেলা।

হাফ টাইমে যাত্রীর মেম্বাররা কুৎসিত গালিগালাজ করতে করতে গুলোদার দিকে জুতো, ইট, কাঠের টুকরো ছুড়তে শুরু করে। তাদের চিৎকারের মধ্যে একটা গলা শোনা গেল, "কমলকে কেন ছেড়ে দেওয়া হল?" খেলার ফল তখন ০—০।

এরপর গুলোদার এক পার্শ্বচর দ্রুত গ্যালারি থেকে নেমে গিয়ে শোভাবাজারের সম্পাদক কৃষ্ণ মাইতির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে এল।

হাফ টাইমের পর মাঠে নামতে গিয়ে কমল অবাক হয়ে দেখল, যে সিধু এতক্ষণ দারুণ খেলে অন্তত তিনটি অবধারিত গোল বাঁচাল, তাকে বসিয়ে নতুন ছেলে ভরতকে গোলে নামানো হচ্ছে। খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাত্রীর লেফট হাফ প্রায় তিরিশ গজ থেকে একটি অতি সাধারণ শট গোলে নিল। কমল শিউরে উঠে দেখল, বলটা ধরতে ভরত সামনে এগিয়ে এসে হঠাৎ থমকে গেল, তার সামনেই ড্রপ পড়ে মাথা ডিঙিয়ে বল গোলে ঢুকল।...মিনিট দশেক পর কমলের পায়ে আবার বল। যাত্রীর দুটো ফরোয়ার্ড দু'পাশ থেকে এসে পড়েছে। ওদের আড়াল করে কমল ফাঁকায় দাঁড়ানো রাইট ব্যাককে বলটা দিতেই ছেলেটি কিছু না দেখে এবং না ভেবে আবার কমলকেই বলটা ফিরিয়ে দিল। যাত্রীর লেফট ইন ছুটে এল বল ধরার জন্য। পরিস্থিতিটা এমনই দাঁড়াল যে, কর্নার করা অথবা গোলকিপারকে বলটা ঠেলে দেওয়া ছাড়া কমলের আর কোনও পথ নেই। সে গোলের দিকে বলটা ঠেলে দিয়ে দেখল, ভরত অযথা একটা লোকদেখানো ডাইভ দিল এবং বল তার আঙুলে লেগে গোলে ঢুকল। ০—২ গোলে শোভাবাজার হেরে গেল। গ্যালারির মধ্যেকার সরু পথটা দিয়ে যখন মাথা নিচু করে বেরোচ্ছে, উপর থেকে চিৎকার করে একজন বলল, "কী রে কমল, যুগের যাত্রীকে কাঁপাবি না?"

তিনদিন পর ভরতকে আড়ালে ডেকে কমল জিজ্ঞাসা করেছিল, "এরকম করলি কেন?"

ভরতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তর্ক করার ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশেষে স্বীকার করে, "কেষ্টদা বলল, রেগুলার খেলতে চাস যদি তা হলে দুটো গোল আজ ছাড়তে হবে। রাজি থাকিস তো নামাব। আমি লোভ সামলাতে পারলুম না কমলদা। দু' বছর রিজার্ভেই কাটালুম, মাত্র চারটে পুরো ম্যাচ খেলেছি।" তারপরেই সে ঝুঁকে কমলের পা দু'হাতে চেপে ধরল। "আমাকে মাপ করুন কমলদা, এমন কাজ আর করব না।" কমল তখন আপন মনে নিজেকে উদ্দেশ করেই বলে, "স্টপার, কোন দিকের আক্রমণ

তুমি সামলাবে!"

পরের বছর যাত্রীর সঙ্গে লিগের প্রথম খেলায়, শুরু সাত মিনিটেই কমল পেনাল্টি বক্সের একগজ বাইরে নিরুপায় হয়ে একজনকে ল্যাং দিয়ে ফেলে দেয়। বাঁশি বাজাতে বাজাতে রেফারি রাধাকান্ত ঘোষ ছুটে এল পেনাল্টি স্পটের দিকে আঙুল দেখিয়ে।

তাজ্জব হয়ে কমল জিজ্ঞাসা করল, "পেনাল্টি কীসের জন্য?"

"নো নো, ইটস পেনাল্টি।" রাধাকান্ত বলটা হাতে নিয়ে দাগের উপর বসাল।

"বক্সের অনেক বাইরে ফাউল হয়েছে।" কমল নাছোড়বান্দার মতো তর্ক করতে গেল।

"নো আরগুমেন্ট। আই অ্যাম কোয়ায়েট সিওর অফ ইট।"

"বুঝেছি।" কমল তির্যককণ্ঠে বলল। রাধাকান্ত না শোনার ভান করে বাঁশি বাজাল। কমল চোখ বন্ধ করে দু'কানের পাশে তালু চেপে ধরল। এখনি সেই মর্মান্তিক চিৎকারটা উঠবে।

একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ল। কমল অবাক হয়ে চোখ খুলে দেখল, ভরত বলটা দু'হাতে বুকের কাছে আঁকড়ে উপুড় হয়ে। এরপর শোভাবাজার দ্বিগুণ বিক্রমে যাত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাফ টাইমের আগের মিনিটে রাইট উইং বল নিয়ে টাচ লাইন ধরে তরতরিয়ে ছুটে চমৎকার সেন্টার করে। বলটা পেনাল্টি বক্সের মাথায় দাঁড়ানো রাইট ইন বুক দিয়ে ধরেই সামনে বাড়িয়ে দেয়। লেফট উইং যাত্রীর দুই ব্যাকের মধ্যে দিয়ে ছিটকে ঢুকে এসে বলটা গোলে প্লেস করা মাত্র রাধাকান্ত বাঁশি বাজিয়ে ছুটে আসে। অফসাইড। তখন কমল মনে মনে বলে, "আক্রমণ, স্টপার কী করে এই আক্রমণ রুখবে!"

যুগের যাত্রী খেলাটা ১—০ জিতেছিল। প্রায় শেষ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে শোভাবাজার গোলের মুখে বল পড়েছিল। ভরত এগিয়ে পাঞ্চ করতেই যাত্রীর রাইট উইংয়ের মাথায় বল আসে। সে হেড করে গোলের দিকে পাঠাতেই ভরত পিছু হটে বলটা ধরতে গিয়ে আটকে যায়। যাত্রীর লেফট ইন তার প্যান্ট ধরে আছে। বিনা বাধায় বল গোলে ঢোকে।

খেলা শেষে মাঠের মধ্যে শোভাবাজার প্লেয়াররা ভিড় কমার জন্য অপেক্ষা করছিল। এমন সময় রথীনকে দেখতে পেয়ে কমল হেসে এগিয়ে এসে বলল, "আজ আমরা এক গোলে জিতেছি!"

রথীন শুকনো হেসে বলল, "এ বছর আমি যাত্রীর ফুটবল সেক্রেটারি।"

"ওহ, তাই তো। মনেই ছিল না। সরি, আমার বরং বলা উচিত, রেফারি আজ জিতেছে। এভাবে না জিতে ভাল করে টিম কর। খেলার মতো খেলে জেত।"

কথাটা গায়ে না মেখে রথীন বলল, "এভাবে কদ্দিন তুই আমাদের জ্বালাবি বল তো?"

"আমি জ্বালাচ্ছি! তুই তা হলে ফুটবলের 'ফ'-ও বুঝিস না। তোদের গুলোদাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি বোঝেন বলেই আমাকে দু'বছর আগেই ড্রেস করিয়ে সাইড

লাইনের বাইরে বসিয়ে রাখতেন।"

"তোকে দেখলে হিংসে হয়, এখনও দিব্যি খেলাটা রেখেছিস, আর আমরা কেমন বুড়িয়ে গেলুম।"

"তার বদলে তুই আখেরটা গুছিয়ে নিতে পেরেছিস। শুনেছি প্রগ্রেসিভ ব্যাঙ্কে এখন বেশ বড় পোস্টে আছিস। একটা চাকরি বাকরি দে না।" হাসতে হাসতে কমল বলল, "তা হলে আর যাত্রীকে জ্বালাব না। খেলে কি আর তোদের মতো বড় ক্লাবের সঙ্গে পারা যায়!"

"আর ইউ সিরিয়াস, চাকরি সম্পর্কে? তা হলে টেন্টে আয়, কথা বলা যাবে।"

"সরি রথীন।" কঠিন হয়ে উঠল কমলের মুখ। "চাকরি আমার দরকার, দু'মাস ধরে বেকার। কিন্তু যাত্রীর টেন্টে যাব না।"

আর কথা না বলে কমল সরে আসে রথীনের কাছ থেকে। এসব পাঁচ বছর আগের ঘটনা।

॥ তিন ॥

যুগের যাত্রীর টেন্টের সামনে রাস্তায় একটা সবুজ পুরনো ফিয়াট মোটর দাঁড়িয়ে। কমল দেখা মাত্র চিনল, এটি রথীনের। মাস ছয়েক আগে রথীনের পদোন্নতি হয়ে ডিপার্টমেন্টাল ইনচার্জ হয়েছে। এখন মাইনে সতেরো শো। ব্যাঙ্কে রীতিমতো ক্ষমতাবান। চলাফেরা কথাবার্তায় সেটা সে সর্বদা বুঝিয়েও দিতে চায়। তা ছাড়া রথীন সুদর্শন, যদিও এখন ভুঁড়ি হয়ে আগের মতো আর ততটা কমবয়সী দেখায় না।

পাঁচ বছর আগে সেদিন রথীনকে নিছকই ঠাট্টা করে কমল চাকরির কথা বলেছিল। পরের দিনই রথীন শোভাবাজার টেন্টে ফোন করে তাকে দেখা করতে বলে। কমল খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। গোঁয়ারের মতো এক কথায় বেঙ্গল জুট মিলের চারশো টাকার চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে দু'মাস ধরে অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে আসছিল। কমল ব্যাঙ্কে গিয়ে রথীনের সঙ্গে দেখা করে। রথীন বলে, "আমাদের অফিস টিমে তোকে খেলতে হবে। অফিস স্পোর্টস ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পারিস দরখাস্ত দিয়ে যা। ডেসপ্যাচ সেকশনে লোক নেওয়া হবে।"

"মাইনে কত?" কমল প্রশ্ন করে।

রথীন ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, "যদি বলি একশো টাকা! দু'মাস বেকার আছিস, মাইনে যদি পঞ্চাশ টাকাও হয়, সেটাও তো তোর লাভ।"

কমল আর কথা বাড়ায়নি। পরদিনই দরখাস্ত নিয়ে হাজির হয় এবং যে চাকরিটি পায় তার বেতন এই পাঁচ বছরে ৪৬১ টাকায় পৌঁছেছে। কমল জানে, তার যা শিক্ষাগত যোগ্যতা তাতে এই চাকরি কোনও ভাবেই তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হত না, যদি না রথীন পাইয়ে দিত। পঞ্চান্ন থেকে ষাট সাল নাগাদ কমল গুহর যে নাম ছিল, এখন তার অর্ধেকও নেই। ফুটবল ভাঙিয়ে চাকরি পাওয়ার দিন তার উতরে গেছে।

তবু পেয়েছে একমাত্র রথীনের জন্যই।

সাত বছর পর যাত্রীর টেন্টে আবার ঢুকতে গিয়ে কমলের মনে হল, তাকে দেখে সবাই নিশ্চয়ই অবাক হবে। কিন্তু কেউ যদি অপমান করার চেষ্টা করে? অবশ্য নিজের জন্য টাকা চাইতে নয় এবং ফুটবল সেক্রেটারি আসতে বলেছে বলেই এসেছি, সুতরাং, কমল মনে মনে বলল—আমার মনে গ্লানি থাকার কোনও কারণ নেই।

টেন্টের বাইরে ইতস্তত ছড়ানো বেঞ্চে যাত্রীর প্রবীণ মেম্বাররা গল্পে ব্যস্ত। তারা কেউ কমলকে লক্ষ করল না। টেন্টের মধ্যে ঢুকে কমলের সঙ্গে প্রথম চোখাচোখি হল যুগের যাত্রীর অ্যাকাউন্ট্যান্ট তপেন রায়ের। টেবিলে আরও দু'জন লোক বসে। একজনকে কমল চেনে। গুলোদার 'চামচা' হিসাবে খ্যাতি আছে তার।

"আরে, কমল যে, কী ব্যাপার!"

"রথীন কোথায়? এইমাত্র ফোনে আমায় এখানে আসতে বলল।"

"হ্যাঁ, আমার কাছে একশো টাকা চেয়েছিল তোমাকে দেবার জন্য।"

বলতে বলতে তপেন বুকপকেট থেকে একটি নোট বার করে এগিয়ে ধরল। কমলের মনে হল টাকা নিয়ে তপেন যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছে।

গুলোদার চামচাটি ব্যস্ত হয়ে বলল, "ভাউচারে সই করাতে হবে না?"

তপেন তাচ্ছিল্যভরে বলল, "না, এটা ক্লাবের টাকা নয়। কমল তো যাত্রীর টাকা ছোঁবে না, আমার পকেট থেকেই দিচ্ছি।"

কমল গম্ভীর গলায় বলল, "টাকাটা কালই রথীনের হাতে দিয়ে দেব। ও এখন কোথায়?"

"ঘরে কথা বলছে প্লেয়ারদের সঙ্গে। কাল কুমারটুলির সঙ্গে খেলা।"

কমল ইতস্তত করল। রথীনকে একবার বলে যাওয়া উচিত। কিন্তু প্লেয়ারদের সঙ্গে হয়তো কালকের খেলা সম্পর্কে আলোচনা করছে, তা হলে যাওয়াটা উচিত হবে না বাইরের লোকের।

"কমল এ বছর খেলছ তো?" তপেন রায় হাই চাপার জন্য মুখের সামনে হাত তুলে রেখে বলল। তারপর স্বগতোক্তির মতো মন্তব্য করল, "আর কত দিন চালাবে!"

কমল হাসল মাত্র।

"তপেনদা, কমলের বডিটা দেখেছেন!" চামচা বলল। "এখনকার একটা ছেলেরও এমন ফিট বডি নেই।"

তপেন কথাগুলো না শোনার ভান করে তার আগের কথার জের ধরে বলল, "চার ব্যাক হয়ে বয়স্ক ডিফেন্সের প্লেয়ারদের সুবিধেই হয়েছে। কেরিয়ারটার সঙ্গে সঙ্গে রোজগারটাও বাড়াতে পেরেছে। শোভাবাজার থেকে এখন পাচ্ছ কত?"

"একটা আধলাও নয়।"

তপেনের ভ্রূ কুঞ্চিত হল কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

"ফ্রি সার্ভিস এই বাজারে!" চামচা অবাক হল। "অবশ্য কমল লিগে দুটো ছাড়া তো ম্যাচই খেলে না।"

"শুধু দুটো ম্যাচ! কেন, আর খেলে না?" তপেন প্রশ্ন করল চামচাকে।

"লাস্ট টু ইয়ার্স তো কমল শুধু আমাদের এগেন্স্টেই খেলেছে।" চামচা চোখ পিটপিট করল। "যাত্রীকে কিন্তু কাঁপাতে পারেনি কমল। আমরা ফুল পয়েন্ট তুলেছি। যাত্রীর জার্সি সকলের সামনে খুলে ছুড়ে ফেলেছিল বটে, কিন্তু দম্ভ রাখতে পারেনি। ফুটবল কি একজনের খেলা!"

কমলের বলতে ইচ্ছে হল, "প্লেয়ার, অফিসিয়াল, রেফারি, সবকিছু ম্যানেজ করেই তো ফুল পয়েন্ট তুলেছ।" কিন্তু বলতে পারল না। রথীন স্প্রিংয়ের পাল্লা ঠেলে এই সময় ঘর থেকে বেরোল। সঙ্গে চারটি ছেলে। কমলকে দেখে সে বলল, "অঃ, কখন এলি? তপেনদা দিয়ে দিয়েছেন?"

তপেন ঘাড় নাড়তেই রথীন বলল, "আমি টালিগঞ্জের দিকেই এখন যাব। কমল, তুই তো নাকতলায় যাবি, যদি মিনিট কয়েক অপেক্ষা করিস, তা হলে আমার সঙ্গে যেতে পারিস।"

কমল বলল, "আমি তোর গাড়িতে গিয়ে বসছি। তুই তাড়াতাড়ি কর।"

তপেন মৃদুস্বরে বলল, "টাকাটা ফেরত দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না, কমল।"

"কেন?"

"যখন দরকাব হবে আমি চেয়ে নেব। তোমার প্রয়োজনের সময় দিতে পেরেছি, শুধু এইটুকু মনে রাখলেই আমি খুশি হব। তুমি বিপদে পড়ে যাত্রীর কাছেই এসেছ এটা ভাবতে আমার ভালই লাগছে।"

শুনতে শুনতে কমলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এল। সে বলল, "আমি টাকা চেয়েছি রথীনের কাছে, যাত্রীর কাছে নয়। চেয়েছি অন্যের জন্য, নিজের জন্য নয়।"

কমল বলতে যাচ্ছিল, এ টাকা যদি যাত্রীর হয় তা হলে এখনি ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু পল্টুদার মুখটা ভেসে উঠতেই আর বলতে পারল না। তার মনে হচ্ছে, অদ্ভুত একটা খাঁচার মধ্যে সে ঢুকে পড়েছে, যার চারদিকটাই খোলা অথচ বেরোনো যাচ্ছে না।

তপেন তার স্মিত হাসিটা কমলের মুখের উপর অনেকক্ষণ ধরে রেখে বলল, "যদি আরও টাকার দরকার হয় আমাকে বাড়িতে ফোন কোরো। পল্টু মুখার্জির চিকিৎসায় আমাদেরও সাহায্য করা কর্তব্য। এ টাকা ধার নয় কমল, পল্টুদাকে আমার...যুগের যাত্রীর প্রণামী।"

কমল শুনতে শুনতে হঠাৎ নিজেকে অসহায় বোধ করল। তার মনে হচ্ছে, পেনাল্টি বক্সের মধ্যে বল নিয়ে দুটো ফরোয়ার্ড এগিয়ে আসছে। সে একা তাদের মুখোমুখি। ব্যাকেরা কোথায় দেখার জন্য চোখ সরাবার সময়ও নেই।

গাড়িতে দু'জনের কেউই অনেকক্ষণ কথা বলল না। রেড রোড ধরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের পশ্চিম দিয়ে যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কাছে পৌঁছেছে তখন রথীন মুখ ফিরিয়ে বলল, "অফিসের দুটো খেলায় তুই খেলিসনি!"

"এসব খেলা অর্থহীন, আমার ভাল লাগে না খেলতে। তা ছাড়া শোভাবাজারের প্র্যাকটিস ম্যাচ ছিল। কতকগুলো নতুন ছেলে কেমন খেলে দেখার জন্যই গেছলুম।"

"কিন্তু ব্যাঙ্ক চাকরি দিয়েছে তার হয়ে খেলার জন্য।"

কমল চুপ করে রইল।

"এই নিয়ে কথা উঠেছে। তা ছাড়া রোজই তুই কাজ ফেলে সাড়ে তিনটে-চারটেয় বেরিয়ে যাস।"

"কে বলল, নিশ্চয় রণেন দাস?"

"যেই বলুক, সেটা কোনও কথা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তারা মিথ্যে বলেনি।"

পুলিশ হাত তুলেছে। রথীন ব্রেক কষল। ডানদিকে মোড় ফিরে হরিশ মুখার্জি রোডে এবার গাড়ি ঢুকবে। কমল পুলিশটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। রথীন মোড় ঘুরে গিয়ার বদল করে শান্ত মৃদু স্বরে বলল, "বুঝিস না কেন, তোর আর আগের মতো নাম নেই, খেলা নেই। এখনকার উঠতি নামী প্লেয়াররা যে অ্যাডভান্টেজ অফিসে পায় বা নেয়, তোর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তোকে এখন চাকরিটাকেই বড় করে দেখতে হবে। তার জন্য যে সব নিয়ম মানতে হয় মেনে চলতে হবে। অন্য পাঁচজনের থেকে তুই এখন আর আলাদা নোস।"

"আমি আর পাঁচজনের মতো—কোনও তফাতই নেই?" কমল প্রায় ফিসফিস করে বলল।

রথীনের মুখে অস্বস্তিকর বেদনার ছাপ মুহূর্তের জন্য পড়ে মিলিয়ে গিয়েই কঠিন হয়ে উঠল।

"বিপুল ঘোষ, রণেন দাস কি সতু সাহার মতো কেরানিদের সঙ্গে আমার তফাত নেই, রথীন এ তুই কী বলছিস! আমি ইন্ডিয়া টিমে খেলেছি, দেশের জন্য আমার কন্ট্রিবিউশন আছে। জীবনের সেরা সময়ে দিনের পর দিন পরিশ্রম করেছি, কষ্ট করেছি, লেখাপড়া করার সময় পাইনি, জীবনের নিরাপত্তার কথা ভাবিনি, সংসারের দিকে তাকাইনি। কী স্যাক্রিফাইস ওরা করেছে, বল? ওরা আর আমি সমান হয়ে যাব কোন যুক্তিতে?"

রথীন চুপ করে থাকল। গাড়ি চালানোয় ওর মনোযোগটাও বেড়ে গেল হঠাৎ।

"আমি এখনও ফুটবলের জন্য কিছু করতে চাই। প্লেয়ার তৈরি করতে চাই। তাই অফিস থেকে আগে বেরোই। আর অফিস লিগে খেলাটা তো এলেবেলে।"

"কমল, আমাদের দেশে খেলোয়াড়কে ততদিনই মনে রাখে যতদিন সে মাঠে নামে। তারপর স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। নতুন 'হিরো' আসে, তাকে নিয়ে নাচানাচি করে। দ্যাখ না, যাত্রীতে এখন প্রসূন ভট্চাজকে নিয়ে কী কাণ্ড চলছে, অথচ ওর বাবাকেই একদিন সাপোর্টাররা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল ঘুষ খেয়েছে বলে। তোকে মনে রাখবে এমন একটা কিছু কর।"

"রথীন, আমার বয়স হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার মতো সামর্থ্য নেই। ফুটবলারের সামর্থ্য তো শরীর।"

"তা হলে মন দিয়ে চাকরিটা কর। তোকে চাকরি দেওয়ায় ইউনিয়ন থেকে পর্যন্ত অপোজিশন এসেছিল। সবাই বলেছিল উঠতি নামী অল্প বয়সীকে চাকরি দিতে। তুই

তো জানিস, সেকেন্ড ডিভিশনে খেলে অপূর্ব ছেলেটাকে চাকরি দেওয়া হবে বলে গত বছর আটটা ম্যাচ খেলানো হয়। ভালই খেলে কিন্তু এখনও চাকরি পায়নি। কমিটি মেম্বাররা বড় বড় নাম চায়। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চার জনের নাম উঠেছিল। আমি তর্ক করে বলি, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, অফিসের খেলায় এইসব বড় ক্লাবের নামী প্লেয়াররা একদমই খেটে খেলে না। ওরা থেকেও টিম হারে। এতে অফিসের কোনও লাভ হয় না। বরং পড়তি প্লেয়াররা ভাল সার্ভিস দেয়। তোর জন্য এ জি এম পর্যন্ত ধরাধরি করেছি। এখন তুই যদি অফিসের হয়ে না খেলিস তা হলে আমার মুখ থাকে কোথায়? অফিসে নানা দিকে নানা কথা উঠছে, এরকম ফাঁকি দিলে তো আমাকে তোর এগেন্স্টে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতে হবে।"

"কিন্তু আমার পক্ষে শোভাবাজারের ম্যাচের দিন পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে থাকা কিংবা অফিসের হয়ে খেলা সম্ভব নয়।"

কমল গোঁয়ারের মতো গোঁজ হয়ে বসল। রথীনের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল।

"অনেকগুলো চাকরি তো ছেড়েছিস। এই বয়সে এই চাকরিটা যদি হারাস, তা হলে কী হবে ভেবে দেখিস। আমার তো মনে হয় না, আর কোথাও পাবি। দেশের লেখাপড়া জানা বেকার ছেলেদের সংখ্যাটা কত জানিস?"

"না, জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই। এখানে থামা।"

কমল অধৈর্য ভঙ্গিতে প্রায় চিৎকার করে উঠল। রথীন একটু অবাক হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেক কষে গাড়ি থামাল।

"আরও এগিয়ে তোকে নামিয়ে দিতে পারি।"

"না, এখানেই নামব আর টাকাটা কাল তোকে অফিসেই দিয়ে দেব।"

কমল গাড়ি থেকে নেমে অনাবশ্যক জোরে দরজাটা বন্ধ করে হনহনিয়ে পিছন দিকে হাঁটতে শুরু করল বাস স্টপের দিকে।

॥ চার ॥

বাসে উঠে দমবন্ধ করা ভিড়ে কমল মাথার উপরের রড ধরে মনে করতে চেষ্টা করল পুরনো কথা। তেরো বছর আগে প্রথমবার যুগের যাত্রীতে খেলার সময় রথীন ছিল রাইট ব্যাক, কমল স্টপার। রথীন সে বছর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ক্যাপ্টেন হয়ে লখনৌ থেকে স্যার আশুতোষ ট্রফি এনেছে। মোটামুটি কাজ চালাবার মতো খেলত। তখন ডাকত 'কমলদা'। রথীন ছিল গুলোদার খুবই প্রিয়পাত্র। মালয়েশিয়ায় নতুন টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে মারডেকা নামে। ইন্ডিয়া টিম খেলতে যাবে। বোম্বাইয়ে ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলা থেকে বারো জন গিয়েছিল। যাত্রী থেকে তিনজন—রথীন, আমিরুল্লা আর সুনীত। বলা হয়েছিল, কমলের হাঁটুতে চোট আছে তাই ট্রায়ালে পাঠানো হয়নি, তা ছাড়া চোখেও নাকি কম দেখছে। দুটোই ডাহা মিথ্যে কথা।

কমল সামান্য একটু চোট পেয়েছিল ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে খেলায়। পরের ম্যাচে কমল বসে, রথীন স্টপারে খেলে কালীঘাটের বিরুদ্ধে।

ভালই খেলেছিল। তার পরের ম্যাচে এরিয়ান্সের কাছে এক গোলে যাত্রী হারে। কমল একটা হাই ক্রসের ফ্লাইট বুঝতে না পেরে হেড করতে গিয়ে ফসকায়। সেন্টার ফরোয়ার্ড পিছনে ছিল, বলটা ধরেই গোল করে। খেলার পর ক্লাবে কানাঘুষো শোনা যায়, কমল চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না।

কমল ছুটে গেছল পল্টু মুখার্জির কাছে।

"পল্টুদা, এরা আমায় বসিয়ে দিল একেবারে।"

"সে কী রে, একেবারে বসে গেছিস!" পল্টুদা সদর দরজার বাইরে একচিলতে সিমেন্টের দাওয়ায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে কাগজ পড়ছিলেন। খুব একচোট প্রথমে হো হো করে হাসলেন।

"বসে গেছিস? কই দেখছি না তো, দিব্বি তো দাঁড়িয়ে আছিস।"

"না পল্টুদা, ঠাট্টা নয়। আর ভাল লাগছে না কিছু। আমি খেলা ছেড়ে দেব।"

"ভাল লাগছে না বুঝি! আচ্ছা, ভাল লাগার ব্যবস্থা করছি। এখান থেকে একদৌড়ে যাদবপুর স্টেশন যাবি আর একদৌড়ে আসবি। এখুনি।"

কমল কথাটাকে আমল না দিয়ে বলল, "আমি সত্যিই খেলা ছেড়ে দেব। এমন জঘন্য অন্যায়, নখের যুগ্যি নয় রথীন, সে—" বলতে বলতে কমল থেমে গেল।

পল্টুদা ইজিচেয়ারে খাড়া হয়ে বসেছেন। নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। দু'চোখে ঘনিয়ে উঠেছে রাগ।

"অরু!" পল্টুদা ঘরের দিকে তাকিয়ে গুরুগম্ভীর গলায় ডাকলেন, "অরু, শুনে যা।"

পল্টুদার বড় মেয়ে অরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই পল্টুদা বললেন, "আমার লাঠিটা নিয়ে আয়।"

কমল শোনা মাত্র অজান্তে এক পা পিছিয়ে গেল। অরুণা অবাক হয়ে বলল, "এখন আবার কোথায় বেরোবে?"

"লাঠিটা নিয়ে আয় বলছি।" পল্টুদা হুঙ্কার দিলেন।

বাচ্চা ছেলের মতো কমলের সন্ত্রস্ত মুখটা দেখে অরুণা আঁচ করতে পারল যে, লাঠি আনার কাজটা উচিত হবে না। এরকম দৃশ্য সে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে। শুধু মজা করার জন্য বলল, "মোটা লাঠিটা আনব বাবা?"

পল্টুদা উত্তর দিলেন না। অরুণা ঘরের দিকে পা বাড়ানো মাত্র কমল আর একটিও কথা না বলে ঘুরেই দ্রুত ছুটতে শুরু করল। যতক্ষণ দেখা যায় অপসৃয়মাণ ছুটন্ত কমলকে দেখতে দেখতে পল্টুদা এগিয়ে গেলেন। রাস্তার ধারে এসে থুতনি তুলে চেষ্টা করলেন কমলকে দেখার।

অবাক হয়ে রাস্তার লোকেরা তাকিয়ে। বহু লোক কমলকে চেনে। এত বড় এক নামকরা ফুটবলারকে জুতো, জামা আর ফুলপ্যান্ট পরা অবস্থায় সকাল আটটার সময় গিজগিজে ভিড়ের রাস্তা দিয়ে ছুটতে দেখবে, এমন দৃশ্য কল্পনাও করতে পারে না।

পল্টুদা অবসন্নের মতো ফিরে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। বাঁ হাতটা চোখের উপর রাখলেন। অরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাবার কপালে সে হাত রাখতেই

পল্টুদা চোখ থেকে বাঁ হাতটা নামালেন। জলের শীর্ণ ধারা দু'টি গাল বেয়ে নেমে আসছে।

"মনে বড় দাগা পেয়েছে ছেলেটা। দুঃখ তো জীবনে আছেই, কিন্তু এমন অন্যায় পথ ধরে দুঃখগুলো কেন যে আসে!" পল্টুদা আবার চোখের উপর হাত রাখলেন।

অনেকক্ষণ পর পল্টুদার রান্নাঘরের জানলায় উঁকি দিল দরদর ঘাম ঝরা আর পরিশ্রমে লাল হয়ে ওঠা কমলের মুখ।

"অরু!"

অরুণা মুখ তুলল বাটনা বাটা বন্ধ করে।

"কমলদা? এখনও তো—।"

"অ্যাঁ, এখনও?"

"হ্যাঁ, লাঠিটা তো হাতেই রেখেছে দেখলাম। তুমি যাদবপুর স্টেশন পর্যন্ত ঠিক গেছ তো?"

"ফুটবলের দিব্যি।"

"দাঁড়াও দেখে আসি।"

আধ মিনিট পরেই অরুণা ফিরে এসে বলল, "সদর দরজা দিয়ে এসো। না, হাতে লাঠি নেই আর।"

পল্টুদা তখন ছুঁচ-সুতো নিয়ে জামায় বোতাম লাগাতে ব্যস্ত। কমলকে একনজর দেখে বললেন, "খেয়ে এসেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"ছেলে কেমন আছে? বয়স কত হল?"

"ভাল, পাঁচ বছর পূর্ণ হবে এই সেপ্টেম্বরে।"

"প্র্যাকটিসটা আরও ভাল করে কর। হতাশা আসবে, তাকে জয় করতেও হবে। ইন্ডিয়া টিমে খেললেই কি বড় প্লেয়ার হয়? বড় তখনই হয়, যখন সে নিজে অনুভব করে মনের মধ্যে আলাদা এক ধরনের সুখ, প্রশান্তি। সেখানে হতাশা পৌঁছোয় না। তুই খেলা ছেড়ে দিবি বলছিস, তার মানে তুই বড় খেলোয়াড় হতে পারিসনি।"

কমল মাথা নিচু করে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। একটা অদ্ভুত ক্ষোভ আর কান্না মিলেমিশে তখন তার বুকের মধ্যে দুলে উঠেছিল।

আর এখন, তেরো বছর আগের ওই সব কথা মনে করতে করতে যখন সে বাস থেকে নেমে মিনিট চারেক হেঁটে পল্টুদার বাড়িতে ঢুকল, তখন একটা অদ্ভুত মমতা আর বেদনা কমলের বুকের মধ্যে ফেঁপে উঠছিল। থাক দেওয়া তিনটে বালিশের উপর হেলান দিয়ে পল্টুদা আধশোয়া। ওকে দেখে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

"ভালই আছি।" মৃদুস্বরে পল্টুদা বললেন।

"কথা বলা একদম বারণ।" অরুণা কথাটা বলল কমলকে লক্ষ্য করে।

কমল তাকাল অরুণার দিকে। সাদা থান পরনে। পাঁচ বছর আগে বিধবা হয়ে একটি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়িতেই রয়েছে। এখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। পল্টুদা

আরও তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। স্ত্রী দু'বছর আগে মারা গেছেন। সংসারে ছোট মেয়ে করুণা ছাড়াও আছে এক বিধবা বোন। শুকনো মুখে তারা খাটের ধারে দাঁড়িয়ে। অরুণার ছেলে পিন্টু দাদুর খাটের একধারে বসে।

"কেমন আছেন?" কমল ফিসফিস করে অরুণাকে জিজ্ঞেস করল। "ডাক্তার দেখানো হয়েছে?"

"হ্যাঁ, বললেন কিছু করার নেই।'

"ওষুধ?"

"দিয়েছেন লিখে। আনা হয়নি। বাবাই বারণ করলেন।"

"প্রেসক্রিপশনটা দাও।" কমল হাত বাড়াল।

পল্টুদা ওদের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। ক্লান্ত এবং গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমার জন্য আর টাকা নষ্ট করার দরকার নেই।"

বাড়ানো হাতটা কমল সন্তর্পণে নামিয়ে নিল।

"আর কেউ আসেনি?" কমলের প্রশ্নে অরুণা মাথা নাড়ল। পল্টুদার হাতে গড়া চার জন প্লেয়ার ইন্ডিয়া টিমে খেলেছে, পনেরো জন বেঙ্গল টিমে।

"ব্যালান্স, কমল, ব্যালান্স কখনও হারাসনি। আমি ব্যালান্স রাখতে পারিনি তাই কিছুই রেখে যেতে পারছি না, একমাত্র তোকে ছাড়া।" পল্টুদা ডান হাতটা পিন্টুর মাথায় রেখে চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বললেন, "এই পৃথিবীটা ঘুরছে ব্যালান্সের ওপর। মানুষ হাঁটে ব্যালান্সে, দৌড়োয়, ড্রিবল করে, এমনকী মানুষের মনও রয়েছে ব্যালান্সের ওপর। চালচলনে, ব্যবহারে ও চিন্তাধারায় কখনও ব্যালান্স হারাসনি। কে আমায় দেখতে এল কি এল না, তাই নিয়ে আমার আর কিছু যায়-আসে না। তুই এসেছিস, জানতুম তুই আসবি।" এক মুহূর্ত থেমে বললেন, "এদের তুই একটু দেখিস। আজ তোর কাছে এইটেই আমার শেষ চাওয়া।"

"পল্টুদা, আমি থাকলে আপনি কথা বলেই যাবেন, তার থেকে আমি বরং চলে যাই।"

"পারবি যেতে?" মুচকি হাসলেন পল্টুদা, "যদি বলি আমার সামনে তুই শুধু দাঁড়িয়ে থাক। আমি তোকে দেখব আর সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠবে তোর বল কন্ট্রোল, মুখ তুলে বলটাকে পায়ে স্ট্রোক দিতে দিতে এগিয়ে যাওয়া, এধার-ওধার তাকানো। আমার তখন কেন জানি না অভিমন্যুর কথা মনে পড়ত। শুটিংয়ের পর ফলো থ্রু-র ভঙ্গিটা, আর সেই ডজটা। ডান দিকে হেলে, বাঁ দিকে ঝুঁকেই আবার ডান দিকে— একটুও স্পিড না কমিয়ে। পারিস এখনও?"

"না। আমার বয়স হয়ে গেছে পল্টুদা।"

"না, হয়নি। চেষ্টা করলেই পারবি। করবি?"

কমল বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল পল্টুদার মুখের দিকে। শীর্ণ মুখে দুটি চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। কিন্তু কী অদ্ভুত জ্বলজ্বল করছে। প্রায় কুড়ি বছর আগে অমন করে তাকাতেন।

"তুই আমার কাছ থেকে যা শিক্ষা পেয়েছিস সেটা দেখাবি?" পল্টুদার সেই

হুকুমের গলা নয়, মিনতি।

কমলের হাত অদৃশ্য সুতোর টানে পুতুলের মতো মাথায় উঠে গেল। চুলগুলো ফাঁক করে মাথা হেঁট করল পল্টুদাকে দেখাবার জন্য। তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা হেলিয়ে অস্ফুটে বলল, "হ্যাঁ করব।"

তার চোখে পড়ল খাটের নীচে একটা রবারের বল, সম্ভবত পিন্টুর। কমল বলটা পা দিয়ে টেনে আনল। চেটোর তলা দিয়ে বলটাকে ডাইনে বাঁয়ে খেলাল। তাই দেখে পিন্টু খাট থেকে নেমে গুটিগুটি কমলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ কচি পা-টা বাড়িয়ে দিল। বলটা ছিটকে দেয়ালে গিয়ে লাগল। ঘরে একমাত্র পিন্টু ছাড়া আর কেউ হেসে উঠল না।

ছিলে টানা ধনুকের মতো কমল কুঁজো হয়ে গেল নিজের অজান্তেই। সামনে যেন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বল কেড়ে নিতে অপেক্ষা করছে। কমল একদৃষ্টে পিন্টুর দিকে তাকিয়ে বলটাকে চেটো দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে গড়িয়ে গড়িয়ে সারা ঘরটা ঘুরতে লাগল, পিন্টু এলোপাথাড়ি লাথি ছুড়ছে, বলে পা লাগাতে পারছে না। কমল হঠাৎ একটা পাক দিয়ে পিন্টুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোমর থেকে শরীরের উপরটা ডাইনে ঝাঁকিয়ে, বাঁয়ে হেলেই সিধে হয়ে গেল। পিন্টু ব্যালান্স হারিয়ে মেঝেয় পড়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে অরুণাকে জড়িয়ে ধরল লজ্জা লুকোবার জন্য।

কমলের কোনও খেয়াল নেই। আস্তে আস্তে সে ভুলে গেল ঘরটাকে, ঘরের মানুষদের, মৃত্যুপথযাত্রী পল্টুদাকেও। তার মনে হচ্ছে সে মাঠেই নেমে খেলছে। গ্যালারি ভরা দর্শক তাকে তুমুল উচ্ছ্বাসে তারিফ জানাচ্ছে। প্রমত্ত নটরাজের মতো কমল বুঁদ হয়ে আপন মনে বলটাকে নিয়ে দুলে দুলে সারা ঘর ঘুরছে। কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে একের পর এক কাটাচ্ছে। বলটাকে পায়ের পাতার উপর তুলে নাচাতে নাচাতে উরুর উপর, সেখান থেকে কপালে আবার উরু, আবার পাতা—কমলের সর্বাঙ্গে বল খেলা করছে।

পল্টুদা নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মুখ হাসিতে ভরে রয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে চোখ বুজলেন।

কিছুক্ষণ পর মৃদুস্বরে অরুণা বলল, "কমলদা, বাবা বোধ হয় মারা গেলেন!"

॥ পাঁচ ॥

সকাল নটায় অফিসে বেরিয়ে পরদিন রাত ন'টায়, ছত্রিশ ঘণ্টা পর কমল বাড়ি ফিরল। চোখ দুটি লাল, চুল এলোমেলো, ক্লান্তিতে নুয়ে পড়েছে সটান শরীরটা।

একতলায় দুটি ঘর নিয়ে কমল থাকে। একটিতে সে, অপরটিতে অমিতাভ। দুটি লোকের এই সংসারের যাবতীয় কাজ ও রান্না করে দিয়ে কালোর মা রাতে চলে যায়। দশ বছর আগে শিখা মারা যাবার পরই সাত বছরের অমিতাভকে তার দিদিমা গৌহাটিতে নিয়ে চলে যান। দু'বছর আগে সে বাবার কাছে ফিরেছে। প্রথমে দু'জনের

সম্পর্কটা ছিল স্কুলে ভর্তি হওয়া নতুন দুটি ছেলের মতো।

দু'বছরেও কিন্তু ওদের মধ্যে ভাব হয়নি। ওরা কথা কমই বলে, দু'জনে দু'জনকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে। কেউ কারোর ঘরে পর্যন্ত ঢোকে না। তবে একবার রেজেস্ট্রি চিঠি সই করে নেবার জন্য অমিতাভর ঘরে কমল ঢুকেছিল কলমের খোঁজে। একটা খাতার মধ্যে কলম পায়। তখন দেখেছিল, খাতাটা কবিতায় অর্ধেক ভরা আর টেবিলের উপর থাক দিয়ে রাখা বইয়ের ফাঁকে অমিতাভর মায়ের ফোটো। ছবিটা কমলের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ছিল। কমল দুঃখ পেয়েছিল। অমিতাভ তার মা'র ছবিটা চুরি না করে যদি চেয়ে নিত তা হলে সে খুশিই হত। মেধাবী গম্ভীর মৃদুভাষী ছেলেকে কমল ভালবাসে। শুধু অস্বস্তি বোধ করে তার দুর্বল পাতলা শরীর ও পুরু লেন্সের চশমাটার দিকে তাকালেই। অমিতাভ তার বাবাকে 'আপনি' বলে। কমলের ইচ্ছে ও 'তুমি' বলুক।

অমিতাভর ঘরে আরও দুটি ছেলে বসে কথা বলছে। কমল একবার সেদিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। ইজিচেয়ারটা পাতাই ছিল, তাতে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। একে একে তার মনে ভেসে উঠতে লাগল গত চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাপারগুলো। কান্না, ছোটাছুটি, টেলিফোন করা, শ্মশান যাওয়া, আবার পল্টুদার নাকতলার বাড়ি। পল্টুদার জামাইরা এসেছিল, তাদের আর্থিক সঙ্গতিও ভাল নয়। একশোটা টাকা খুবই কাজে লেগেছে।

পায়ের শব্দে কমল চোখ খুলল। অমিতাভ, তার পিছনে ছেলে দুটি।

"এরা আমার কলেজের বন্ধু, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।" অমিতাভর বিব্রত স্বর কমলের কানে বিশ্রী লাগল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে সে বলল, "আজ থাক, অন্য আর একদিন এসো। আজ আমার শরীর মন দুটোই খারাপ।"

কথা না বলে ওরা চলে গেল। কমল আবার চোখ বন্ধ করল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রতিদিনের মতো ঠিক পাঁচটায় ওর ঘুম ভাঙল। ঘরের আলোটা পর্যন্ত নেভানো হয়নি, জামা প্যান্টও বদলানো হয়নি। কমল তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে হিটারে চায়ের জল বসিয়ে, প্রতিদিনের মতো অমিতাভর ঘরের দরজায় কয়েকটা টোকা দিয়ে, খাওয়ার টেবিলে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। অমিতাভ এসে যখন চেয়ার টেনে বসল তখন চা তৈরি হয়ে গেছে।

"পরশু আমার গুরু মারা গেলেন, তাই বাড়ি ফেরা হয়নি।"

অমিতাভ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, "কে?"

"পল্টু মুখার্জি।" কমল আর কিছু না বলে অমিতাভর একমনে রুটিতে জেলি মাখানো দেখতে লাগল।

"তুমি অবশ্য ওঁর নাম নিশ্চয় শোনোনি।"

"না। খেলার আমি কিছুই জানি না।"

"পল্টুদা হচ্ছেন," কমল উৎসাহ দেখিয়ে বলে উঠল, "সাহিত্যে যেমন ধরো..."

অমিতাভর পুরু লেন্সের ওধারে চোখ দুটোকে কৌতূহলভরে তাকিয়ে থাকতে

দেখে কমল ঘাবড়ে গেল।

"যেমন রবীন্দ্রনাথ?"

"না না, অত বড় নয়!" কমল অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। এবং অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে বলল, "কিন্তু আমার জীবনে উনি রবীন্দ্রনাথের মতোই।"

"তা হলে আপনি খুবই আঘাত পেয়েছেন।"

কমল চুপ করে রইল।

"মা মারা যেতে আঘাত পেয়েছিলেন কি?"

কমল তীব্র দৃষ্টিতে অমিতাভর দিকে তাকাল। সে মাথা নামিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল।

"তোমার মা মানিয়ে নিতে পারেনি আমার জীবনকে, আকাঙ্ক্ষাকে। একজন ফুটবলারের স্ত্রী হতে গেলে তাকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়, সহ্য করতে হয়। তা করার মতো মনের জোর তার ছিল না। ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে থেকেছি, টুর্নামেন্ট খেলতে বাইরে গেছি—এসব সে পছন্দ করত না। তাই নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হত। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যাত্রীর সঙ্গে রোভার্সে খেলতে যাই। তখনই ঘটনাটা ঘটে।"

"মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর আপনাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। কিন্তু আপনি আসেননি।" অমিতাভ কঠিন ঠাণ্ডা গলায় অভিযুক্ত করল কমলকে। 'আসেননি'-র পর নিঃশব্দে একটি 'কেন' আপনা থেকেই ধ্বনিত হল কমলের কানে। সঙ্গে সঙ্গে রাগে পুড়ে গেল তার মুখের কোমল বিষাদটুকু।

"আগেও বলেছি তোমায়, সেই টেলিগ্রাম আমাদের ম্যানেজার গুলোদার হাতে পড়ে। সেটাকে তিনি চেপে রাখেন, কেননা পরদিনই ছিল হায়দ্রাবাদ পুলিশের সঙ্গে সেমি ফাইনাল খেলা। আমাকে বাদ দিয়ে যাত্রীর পক্ষে খেলতে নামা সম্ভব ছিল না।" কথাগুলো বলতে বলতে কমল তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল অমিতাভর দিকে।

বাঁকানো ঠোঁটের কোলে মোটা দাগে আগের মতোই অবিশ্বাস ফুটে রয়েছে। আজও ওকে বোঝানো গেল না, টেলিগ্রামটা পেলে সে অবশ্যই খেলা ফেলে মুম্বই থেকে ছুটে আসত।

কমল খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে পড়ল। ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়িতে হাত বোলাল। বেশ বড় হয়েছে। কিন্তু অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না। দাড়ি না কামালেও চলে। গালে কয়েকটা পাকা চুল। কমল কাঁচি দিয়ে সেগুলো সাবধানে কাটতে বসল।

সদর দরজা খোলার শব্দ হল। কালোর মা বোধ হয়, কিংবা খবরের কাগজওলা। কমল কাঁচি রেখে প্যান্টের পকেট থেকে টাকা বার করতে লাগল। বাজার করে কালোর মা। টাকা পেতে দেরি করলে গজগজ শুরু করে।

"কমলদা!"

সলিল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে।

"কী রে, এত সকালে?"

"মাঠ থেকে আসছি। প্র্যাকটিস করতে গেছলুম।"

"তোর না পায়ে চোট!"

"ডাক্তারবাবু বললেন কিছু নয়, রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।" সলিল খাটের উপর বসল। কমলের মনে হল ও যেন অন্য কিছু বলতে এসেছে।

"পল্টুদা মারা গেলেন!"

"হুঁ। তিয়াত্তর বছর বয়স হয়েছিল।" কমল দাড়ি কাটতে কাটতে আয়নার মধ্যে দিয়ে সলিলকে লক্ষ করতে লাগল।

"কিছু বলবি আমায়?"

সলিল মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙুলটা মেঝেয় কিছুক্ষণ ঘষাঘষি করে ধরা গলায় বলল, "কমলদা, দু'দিন আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি। আমাদের সংসারে আটটা লোক।"

কমল ভেবে পেল না এখন সে কী বলবে! এ রকম কথা প্রায়ই সে শোনে ময়দানে। প্রথম প্রথম একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে কেঁপে উঠত, এখন শুধু তার চোয়ালটা শক্ত হয়ে যায়।

"একটা কার্ডবোর্ড কারখানায় কাজ পেয়েছি, হপ্তায় আঠারো টাকা। আজ থেকেই কাজে লাগতে হবে।"

"ফুটবল?"

সলিল আবার মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল। কমল দেখল, টসটস করে ওর চোখ বেয়ে জল পড়ছে। তারপর নিঃসাড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওকে ডাকবে ভেবেও কমল ডাকল না।

জীবনে প্রথম বড় সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে ছেলেটা। এখন ওর মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছে ফুটবলের সঙ্গে সংসারের। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মায়া-মমতা-ভালবাসার। যদি ফুটবলকে ভালবাসে, বড় খেলোয়াড় হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তা হলে ওকে নিষ্ঠুর হতে হবে। সংসারের সুখ-দুঃখ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। বাঙালিরা বড় কোমল। বেশির ভাগ ছেলেরাই তা পারে না। সংসারের সর্বগ্রাসী হাঁ-এর মধ্যে ঢুকে যায়। ও নিজেই সিদ্ধান্ত নিক। দু-চারটে টাকা দিয়ে করুণা করে ওকে ফুটবলার হয়ে ওঠায় সাহায্য করা যাবে না।

কমলের নিজের কথা মনে পড়ে গেল। মা মারা যাওয়ার পর সংসার দেখাশুনোর জন্য জোর করে বাবা তার বিয়ে দেয়। তখন বয়স মাত্র কুড়ি। তারপর অদ্ভুত একটা লড়াই তাকে করে যেতে হয় অমিতাভর মায়ের সঙ্গে। কিন্তু ছেলে সেসব কথা বুঝবে না। ওর বন্ধুরা আগ্রহ নিয়ে আলাপ করতে আসে অথচ অমিতাভ তার বাবার খেলা সম্পর্কে উদাসীন। একদিনও বলেনি, টিকিট দেবেন—খেলা দেখতে যাব! কমলের বহু দিনের সাধ ছেলে তার খেলা দেখতে আসুক।

"বাবা, দর্জির দোকান থেকে আজ প্যান্টটা আনার তারিখ।"

"আজকেই," কমল ব্যস্ত হয়ে চাবি নিয়ে দেরাজের দিকে এগোল। "কত টাকা?"

"কুড়ি।"

টাকাটা অমিতাভর হাতে দেবার সময় কমলের মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল, সলিল হপ্তায় মাত্র আঠারো টাকা মাইনের একটা চাকরি নিচ্ছে। অমিতাভ আর সলিল প্রায় এক বয়সী হবে।

॥ ছয় ॥

বিকেলে কমল শোভাবাজার টেন্টে এল। পল্টু মুখার্জি মারা যাবার খবর সবাই জেনে গেছে। কমলকে অনেকের কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিতে হল। শোভাবাজারের কোচ সরোজ বলল, "কমলদা, কাল রাজস্থানের সঙ্গে খেলা! একবার তো বসতে হয় টিমটা করার জন্য।"

"বসার আর কী আছে! আগের ম্যাচে যারা খেলেছে, তাদেরই খেলাও। শুরুতেই বেশি নাড়াচাড়া করার দরকার কী?"

"সলিল বলছে, খেলবে। কিন্তু আমি মনে করি না ও ফিট। সকালে প্র্যাকটিসে দেখলাম, দুটো ফিফটি মিটার স্প্রিন্ট করার পর লিম্প্ করছে। লাফ দেওয়ালাম, পারছে না।"

"অন্তত দু সপ্তাহ রেস্ট দাও।"

"কিন্তু রাইট স্টপারে খেলবে কে? প্লেয়ার কোথায়? সত্য বা শম্ভু জানেনই তো কেমন খেলে। স্বপনকে হাফ থেকে নামিয়ে আনতে পারি, কিন্তু ফরোয়ার্ড লাইনকে ফিড করাবে কে? রুদ্রকে দিয়ে আর যাই হোক, বল ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ চলে না।"

"তা হলে?" কমল চিন্তিত হয়ে সরোজের মুখের দিকে তাকাল এবং ম্লান হেসে বলল, "অগত্যা আমি?"

সরোজ মাথা হেলাল।

"কিন্তু এ সিজনে দু-তিনদিন মাত্র বলে পা দিয়েছি। ভাল মতো ট্রেনিং করিনি।"

"তাতে কিছু এসে যায় না।" সরোজ উৎসাহভরে বলল। "এক্সপিরিয়েন্সের কাছে বাধা ভেসে যাবে। আমার ডিফেন্সে সব থেকে বড় অভাব অভিজ্ঞতার। মোহনবাগানের দিন দেখেছেন তো, চারটে ব্যাক এক লাইনে দাঁড়িয়ে, এক-একটা থ্রু পাশে চারজনই কেটে যাচ্ছে। ওরা প্রচণ্ড পেসে খেলা শুরু করল আর এরাও তার সঙ্গে তাল দিয়ে মাঠময় ছোটাছুটি করে আধ ঘণ্টাতেই বে-দম হয়ে গেল। গেমটাকে যে স্লো ডাউন করবে, বল হোল্ড করে করে খেলবে—কেউ তা জানে না।"

"জানবে, খেলতে খেলতেই জানবে! আচ্ছা, আমি কাল খেলব। কাল সকালে ছেলেদের আসতে বলে দিয়ো মাঠে। একটু প্র্যাকটিস করাব।"

"খেলার দিনে?"

"সামান্য। দু-চারটে মুভ প্র্যাকটিস করাব। ভয় নেই, তোমার প্লেয়ারদের এক ঘণ্টার বেশি মাঠে রাখব না।"

সরোজের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কমল বুঝল, ব্যাপারটা ও পছন্দ করছে না।

কোচের আত্মমর্যাদায় লেগেছে। কমল সুর বদল করে মৃদু স্বরে এবং বন্ধুর মতো বলল, "আমাদের মতো ছোট ক্লাব, সঙ্গতি কিছুই নেই। প্লেয়াররা অত্যন্ত কাঁচা, অমার্জিত, সিজনের শেষ দিকে ম্যাচ গট-আপ করে ফার্স্ট ডিভিশনে টিকে থাকতে হয়—এদের নিয়ে আর্টিস্টিক ফুটবল খেলতে গেলে পরিণাম কী হবে তা কি ভেবেছ? এই বছর প্রথম গড়ের মাঠে কোচিং করছ, তুমি কি চাও এটাই তোমার শেষ বছর হোক?"

সরোজের মুখ ক্ষণিকের জন্য পাণ্ডুর হয়েই কঠিন হয়ে উঠল। "আমি ফুটবল খেলাতে চাই, কমলদা। ফুটবল খেলে শোভাবাজার নেমে যাক আমার দুঃখ নেই, আমিও যদি সেই সঙ্গে ডুবে যাই, আফসোস করব না। কিন্তু শুরুতেই আত্মসমর্পণ করব না।"

"তোমার এই মনোভাব শোভাবাজারের অফিসিয়ালরা জানে? কেষ্টদা জানে?"

"জানলে এই মুহূর্তে ক্লাবে ঢোকা বন্ধ করে দেবে।" সরোজ হাসিটা লুকোল না।

"সরোজ, তোমায় বলাই বাহুল্য, তবু দু-চারটে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। তোমার থেকে বোধ হয় আমি বেশি খেলেছি, বড় বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতাও বেশি। সেই সূত্রে, বরং বলা ভাল, আলোচনা করতে চাই।"

"কমলদা, এ সব বলছেন কেন, আপনার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। আপনার কাছে আমার অনেক কিছু শেখার আছে।" সরোজ বিনীতভাবে বলল।

"তুমি যেভাবে খেলাতে চাও, সেইভাবে খেলার মতো প্লেয়ার আমাদের আছে কি?"

"নেই।" সরোজ চটপট জবাব দিল।

"তা হলে আমরা একটার পর একটা ম্যাচ হারব। শেষে পয়েন্ট ম্যানেজ করার নোংরা ব্যাপারে ক্লাব জড়াবেই, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। লাভ নেই সরোজ আর্টিস্টিক ফুটবলে। যতদিন না উপযুক্ত ছেলেদের পাচ্ছ ততদিন তোমার চিন্তা শিকেয় তুলে রাখো। আগে ক্লাবকে বাঁচাও, তারপর খেলা। আগে ছেলে জোগাড় করো, তাদের তৈরি করো। আগে ডিফেন্ড করো, তারপর কাউন্টার অ্যাটাক। সর্বক্ষেত্রে এটাই সেরা পদ্ধতি, জীবনের ক্ষেত্রেও।"

"তার মানে যেমন চলছে চলুক!"

"হ্যাঁ, তবু এর মধ্যেই ডিফেন্সটাকে আরও শক্ত করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তোমার যা কিছু ট্যাকটিক্স, সত্তর মিনিটের পুরো খেলাটায়, সব কিছুর মূলেই জমি দখলের, স্পেস কভার করার চেষ্টা। ফাঁকা জমিতে বল পেলে বল কন্ট্রোল করার সময় পাওয়া যায়। স্পেসই হচ্ছে সময়। অপোনেন্টকে জমির সুবিধা না দেওয়া মানে সময় না দেওয়া। তাই এখন ম্যান টু ম্যান টাইট মার্কিং খেলা হয়। আমি তিন ব্যাকে খেলেছি, অনেক গলদ তখন ডিফেন্সে ছিল। চার ব্যাকে সেটা বন্ধ হয়েছে। আগে উইঙ্গাররা পঁচিশ গজ পর্যন্ত ছাড়া জমি পেত, চার ব্যাকে সেটা পাঁচ গজ পর্যন্ত কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু চার ব্যাকেও লক্ষ করেছ, শোভাবাজার সামলাতে পারে না।"

"আপনি কি পাঁচ ব্যাকে খেলাতে চান।"

"প্রায় তাই। চার ব্যাকের পিছনে একজন ফ্রি ব্যাক রেখে খেলে দেখলে কেমন হয়। ফরোয়ার্ড থেকে একজনকে হাফে আনা যায়, দু'জনকেও আনা যায়। ফরমেশানটা ১—৪—৩—২ হবে।"

"আপনি কাতানাচ্চিও ডিফেন্স চাইছেন অর্থাৎ ফুটবলকে খুন করতে চাইছেন?"

সরোজ হঠাৎ গোঁয়ারের মতো রেগে উঠল। কমল এই রকম একটা কিছু হবে আশা করেছিল। সে বলল, "মোহনবাগানের কাছে আমরা পাঁচ গোল খেয়ে দুটো পয়েন্ট হারাতুম না এই ফরমেশনে খেললে। একটা পয়েন্ট পেতুমই। সেটা কি মন্দ ব্যাপার হত? তুমি মিড ফিল্ড খেলার ওপর বড় বেশি জোর দাও, কিন্তু এখন ওটার আর কোনও গুরুত্বই নেই। এখন লড়াই পেনাল্টি এরিয়ার মাথায়—অ্যাটাকিং অ্যাঙ্গেলকে সরু করে গোলে শট নেওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে। তুমি এটা বুঝছ না কেন, গোল করাই হচ্ছে খেলার একমাত্র উদ্দেশ্য, খেলা জেতা যায় গোল করেই। শোভাবাজারের ক্ষমতা নেই গোল দেওয়ার কিন্তু গোল খাওয়া তো বন্ধ করতে পারে।"

"কমলদা, আপনার আর আমার চিন্তাধারা এক খাতে বোধ হয় বইছে না। শোভাবাজার টিম যতদিন আমার হাতে থাকবে, আমি আমার চিন্তা অনুসারেই খেলাতে চাই।"

সরোজ কঠিন এবং দৃঢ়স্বরে যেভাবে কথাগুলি বলল তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না, আর তর্ক করতে সে রাজি নয়। কমল মুখটা ঘুরিয়ে আলতো স্বরে বলল, "বেশ।"

"কাল তা হলে খেলছেন?"

কমল মাথা হেলিয়ে হাসল।

॥ সাত ॥

দু'দিন কামাই করে কমল অফিসে এল। রণেন দাসকে চেয়ারে দেখতে পেল না। খাটো চেহারার ঘোষদা অর্থাৎ বিপুল ঘোষকে অবশ্য প্রতিদিনের মতো কাঁটায় কাঁটায় দশটায় চেয়ারে বসে কাগজে লাল কালিতে 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়' লিখতে দেখা যাচ্ছে। প্রায় সাড়ে চারশো লোকের বিরাট পাঁচতলা অফিস বাড়িটা হট্টগোলে মুখর। সাড়ে দশটার আগে কেউ কলম ধরে না। কমলদের ডেসপ্যাচ বিভাগে তারা মাত্র তিনজন।

বিপুল তার নিত্যকর্ম সেরে কমলকে বলল, "দু'দিন আসেননি, অসুখবিসুখ করেছিল?"

"এক আত্মীয় মারা গেলেন তাতেই ব্যস্ত ছিলাম। ঘোষদা, আপনার কাছে লিভ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে?"

বিপুল ড্রয়ার থেকে ছুটির দরখাস্তের ফর্ম বার করে দিল। কমল তাতে যা লেখার লিখে সেটা নিয়ে নিজেই গেল চারতলায় লিভ সেকশনে জমা দিতে। সেখানে অনুপম ঘোষালকে ঘিরে অল্পবয়সীরা জটলা করছে। অনুপম যুগের যাত্রীর উঠতি রাইট উইঙ্গার। রথীনই চাকরি করে দিয়েছে। কাল অনুপম হ্যাটট্রিক করেছে

কুমারটুলির বিরুদ্ধে।

"আর একটা গোল কি অনুপমের হত না! সেকেন্ড হাফের শুরুতেই প্রসূন তিনজনকে কাটিয়ে যখন সেলফিসের মতো একাই গোলটা করতে গেল, তখন অনুপম তো ফাঁকায় গোল থেকে পাঁচ হাত দূরে। প্রসূন ওকে বলটা যদি দিত, তা হলে কি অনুপমের আর একটা গোল হত না? কী অনুপম, হত কি না?"

মৃদু হেসে অনুপম বলল, "ফুটবল খেলায় কিছুই বলা যায় না।"

"প্রসূনকে তুই দোষ দিচ্ছিস কেন? অনুপমকে বল দেবে কি, ও তো তখন ক্লিয়ার অফ সাইডে!"

"বাজে কথা। অনুপম, তুই তখন অফ সাইডে ছিলিস কি?"

অনুপম গম্ভীর হয়ে মুখটা পাশে ফিরিয়ে বলল, "লেফট ব্যাক আর আমি এক লাইনেই ছিলুম।"

"তবে, তবে! আমি কতদিন বলেছি প্রসূনটা নাম্বার ওয়ান সেলফিস। বল পেলে আর ছাড়ে না, একাই গোল দেবে। ওর জন্য যাত্রীর অনেক গোল কমেছে। বালী প্রতিভার দিন পাঁচটা গোল হল বটে, কিন্তু প্রসূন ঠিক ঠিক যদি বল দিত অনুপমকে, অন্তত আরও পাঁচটা গোল হত। অনুপম হার্ডলি চারটে বলও প্রসূনের কাছ থেকে পেয়েছে কি না সন্দেহ। কী অনুপম, ঠিক বলেছি কি না?"

অনুপম উদাসীনের মতো হেসে বলল, "যাকগে ওসব কথা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বাদ দে তো ফালতু কথা। প্রসূন বল দিল কি না দিল তাতে অনুপমের কিছু আসে যায় না। এর পরের ম্যাচ ইস্টার্ন রেল। অনুপম, আগেই কিন্তু বলে রাখছি, আমার ভাগ্নেটা ধরেছে খেলা দেখার জন্য।"

"সত্যদা, আজকাল ঢোকানো বড্ড শক্ত হয়ে পড়েছে। ডে-স্লিপ দেওয়ার ব্যাপারেও গোনাগুনতি।"

"ওসব কোনও কথা শুনব না। তোমায় ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।"

অনুপম সেকশনাল ইন-চার্জ নির্মল দত্তর টেবিলের দিকে এগোবার উদ্যোগ করে বলল, "আচ্ছা দেখি।"

দত্তর কাছে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে অনুপম রোজই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে।

"অনুপম, ইস্টবেঙ্গলের দিন কিন্তু এই রকম খেলা চাই।"

অনুপম এগিয়ে যেতে যেতে হাসল মাত্র।

এবার ওদের চোখ পড়ল কমলের ওপর। দরখাস্তটা হাতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছে।

"কী ব্যাপার কমলবাবু, ক্যাজুয়াল? এই টেবিলে রেখে যান।"

কমল রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, একজন ডেকে বলল, "আচ্ছা, আপনার কী মনে হয় অনুপমের খেলা সম্পর্কে? দারুণ খেলে, তাই নয়?"

"হ্যাঁ, দারুণ খেলে।"

"আপনি ওর এ বছরের সব ক'টা খেলাই দেখেছেন?"

"একটাও না।"

"তা হলে যে বললেন দারুণ খেলে!"

"আপনারা বলছেন তাই আমিও বললাম।"

"না না, ঠাট্টা নয়, সত্যি বলুন, ছেলেটার মধ্যে পার্টস আছে কি না। আপনার চোখ আর আমাদের চোখ তো এক নয়।"

কমল কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর কঠিন স্বরে বলল, "শুধু খেলা দেখেই প্লেয়ার বিচার করবেন না। খেলা সম্পর্কে তার অ্যাটিচিউড, চিন্তা, সাধনা কেমন সেটাও দেখবেন। হয়তো ভাল খেলে। কিন্তু গোল থেকে পাঁচ হাত দূরে ফাঁকায় যে দাঁড়িয়ে, সে যদি বলে যে, গোল করতে পারতুম কি না কিছুই বলা যায় না, তা হলে আমি তাকে প্লেয়ার বলে মনে করব না।"

"পৃথিবীর বহু বড় প্লেয়ার এক হাত দূর থেকেও তো গোল মিস করেছে।"

"করেছে কি না জানি না, কিন্তু তারা কখনওই বলবে না—পাঁচ হাত দূরের থেকে গোল করতে পারব কি না! এই 'কি না' অর্থাৎ অনিশ্চয়তা, নিজের উপর অনাস্থা, কখনওই তাদের মুখ থেকে বেরোবে না। দুইকে দুই দিয়ে গুণ দিতে বললে, আপনার কি সন্দেহ থাকতে পারে, উত্তরটা চারের বদলে আর কিছু হবে?"

ঝোঁকের মাথায় কথাগুলো বলে কমল লক্ষ করল, শ্রোতাদের মুখে অসুখী ছায়া পড়েছে।

"আপনার কথাগুলো একদিক দিয়ে ঠিক, তবে কী জানেন, যোগ-বিয়োগটা শিশুকাল থেকে করে করে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো হয়ে যায়, আজীবন দুই দুগুণে চারই বলব। কিন্তু ফুটবল খেলাটা তো তা নয়, একটা বয়সে রপ্ত করে আর একটা বয়সে ছেড়ে দিতেই হয়। যত বড় প্লেয়ারই হোক, একই ভাবে সে খেলতে পারে না চিরকাল। আপনি যেভাবে একদিন চুনী কি প্রদীপ কি বলরামকে রুখতেন, পারবেন কি আজ সেই ভাবে অনুপমকে আটকাতে?"

বক্তার বলার ভঙ্গিতে তেরছা বিদ্রূপ ছিল। কমলের রগ দুটো দপদপ করে উঠল। পিছন দিক থেকে কে মন্তব্য করল, "নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহ!"

কমলের ইচ্ছে হল ঘুরে একবার দেখে, কথাটা কে বলল! কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলল, "শিক্ষায় যদি ফাঁকি না থাকে, তা হলে যে স্কিল মানুষ পরিশ্রম করে অর্জন করে তা কখনও সে হারায় না, বয়স বাড়লেও।"

"তার মানে, আপনি আগের মতোই এখনও খেলতে পারেন?"

"না। কিন্তু অনুপমদের আটকাবার মতো খেলা বোধ হয় এখনও খেলতে পারি।"

প্রত্যেকের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠে তারপর সেটি অবিশ্বাস্যতা থেকে মজা পাওয়ায় রূপান্তরিত হল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। কমলের মনে হল সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

"বুড়োবয়সে ল্যাজেগোবরে করে ছেড়ে দেবে।"

দাঁতে দাঁত চেপে কমল বলল, "যাত্রীর সঙ্গে লিগে শোভাবাজারের তো দেখা হবেই, তখন দেখা যাবে'খন।"

কমল যখন চারতলার হলঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে, শুনতে পেল কে

চেঁচিয়ে বলছে, "ওরে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল। অনুপমকে জানিয়ে দিতে হবে।"

কমল নিজের সেকশনে আসামাত্রই রণেন দাস তাকে ডাকল, "এই যে, ছিলেন কোথায় এই দু'দিন? ডুব মারবেন তো আগেভাগে বলে যেতে পারেন না? লোক তো তিনজন অথচ কাজ থাকে বারোজনের। তার মধ্যে একজন কামাই করলে কী অবস্থাটা হয়? এর উপর তিনটে বাজতে না বাজতেই তো প্লেয়ার হয়ে যাবেন।"

যে বিশ্রি মেজাজ নিয়ে কমল চারতলা থেকে নেমে এসেছে সেটা এখনও অটুট। তিক্ত স্বরে সে বলল, "দরকার হয়েছিল বলেই ছুটি নিয়েছি। ছুটি নেবার অধিকারও আমার আছে।"

"অ। অধিকার আছে? রোজ তিনটের সময় বেরিয়ে যাওয়াটাও বুঝি অধিকারের মধ্যে!"

কমল জবাব দিল না। রণেন দাসকে সে একদমই পছন্দ করে না। লোকটা অর্ধেক সময় সিটে থাকে না। ক্যান্টিন অথবা ইউনিয়ন অফিসঘরে কিংবা চারতলা বা পাঁচতলায় গিয়ে পরচর্চায় সময় কাটায়, চুকলি কাটে আর ওভারটাইম রোজগারের তালে থাকে। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে, তিরিশ বছর প্রায় চাকরি করছে, এগারোশো টাকা মাইনে পায়, কিন্তু সিগারেটটা পর্যন্ত চেয়ে খায়। রণেন দাস ডেসপ্যাচের কর্তা।

দুপুর দুটো নাগাদ গেমস্ সেক্রেটারি নতু সাহা খাতা হাতে কমলের কাছে হাজির হল।

"কাল আপনাকে খুঁজে গেছি, আপনি আসেননি। আজ খেলা আছে বেঙ্গল টিউবের সঙ্গে ভবানীপুর মাঠে।" বলতে বলতে নতু সাহা খাতাটা খুলে এগিয়ে দিল। খাতায় টিমের খেলোয়াড়দের নাম লেখা। কমলের নামটি দু'জনের পরেই। সকলেরই সই আছে নামের পাশে।

প্রথমেই কমলের মনে পড়ল, আজ শোভাবাজারের খেলা আছে, তাকে খেলতেই হবে। কিন্তু সেকথা বললে নতু সাহা রেহাই দেবে না। রথীনের কথাগুলো মনে পড়ল—অফিসের দুটো খেলায় তুই খেলিসনি—এই নিয়ে কথা উঠেছে...তোকে চাকরি দেওয়ায় ইউনিয়ন থেকে পর্যন্ত অপোজিশন এসেছিল...তোর জন্য এ জি এম পর্যন্ত ধরাধরি করেছি।

কমল খাতায় নিজের নামটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ভাবল, কী করি এখন! শোভাবাজারে আজ তাকে দরকার। সেখানকার টিমেও তার নাম আছে। ওই খেলারই গুরুত্বটা বেশি, কিন্তু এই খেলাটা চাকরির জন্য। অবশ্য খেলব না বলে দেওয়া যায় নতু সাহাকে। তা হলে তিনটে-চারটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুবিধেটা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে।

"কী হল, সইটা করে দিন। একটু পরেই তো বেরোতে হবে।" অধৈর্য হয়ে নতু সাহা বলল।

"আমাকে আজ বাদ দেওয়া যায় না কি?"

"না না, আমাদের ডিফেন্সে আজ কেউ নেই। ফরোয়ার্ডে শুধু অনুপম। গোবিন্দ

তো এক হপ্তার ছুটিতে গেছে, জহরের পায়ে চোট, আজ তো টিমই হচ্ছিল না।"

কমল আর কথা না বলে নিজের নামের পাশে সই করে দিল। সেই মুহূর্তে একবার সরোজের মুখটা সে দেখতে পেল—অসহায় এবং রাগে থমথমে।

॥ আট ॥

প্রগ্রেসিভ ব্যাঙ্কের ভ্যান ওদের চারটের সময় মাঠে পৌঁছে দিল। কমল লক্ষ করে, ভ্যানের এককোণে অনুপম বসে মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছিল, তাইতে ওর মনে হয়, নিশ্চয় কথাটা কানে গেছে! কমল অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। ড্রেস করে মাঠে নামতে গিয়ে সে দেখল, অনুপম ড্রেস করেনি। নতু সাহাকে কমল জিজ্ঞাসা করল, "অনুপম নামবে না?"

"বলছে, দরকার হলে নামব। বড় প্লেয়ার, বুঝলেন না!" তির্যক স্বরে নতু সাহা বিরক্তি চাপতে চাপতে বলল, "কিছু বলাও যাবে না, সারা অফিস জুড়ে অমনি ভক্তরা হইহই করে উঠবে।"

কমল হাসল। তার মনে পড়ল, এমন মেজাজ একদিন সে-ও দেখিয়েছে।

হাফটাইমে প্রগ্রেসিভ ব্যাঙ্ক তিন গোলে হারছে। বেঙ্গল টিউব চারবার মাত্র বল এনেছিল, আর তাতেই তিনটি গোল! একমাত্র রাইট আউট আর সেন্টার ফরোয়ার্ডটিই যা কিছু খেলছে এবং তাদের গোলের দিকে এগোনোর পথ কমল অনায়াসেই বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু তা সে করল না ইচ্ছে করেই। দু'বার সে ট্যাক্‌ল করতে গিয়ে কাঁচা খেলোয়াড়ের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আর একবার হেড করতে উঠল দু'সেকেন্ড দেরি করে। তাতেই গোল তিনটি হয়ে যায়।

হাফটাইমে মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেই কমলের চোখে পড়ল, অনুপম ড্রেস করে তার জনাচারেক ভক্তর সঙ্গে কথা বলছে। কমল মনে মনে হাসল। নতু সাহা বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে ছুটে এসে কমলকে বলল, "এভাবে গোল খাওয়ার মানে হয়? অ্যালেন লিগের প্লেয়ারও অমন করে চার্জ করে না, আপনি যা করলেন।"

কমল কথা না বলে ঘাসের উপর বসে পড়ে লিমনেডের একটা বোতল তুলে নিল।

"লোকে যে কেন আপনাকে বড় প্লেয়ার বলত বুঝি না!"

মুখ থেকে বোতলটা নামিয়ে কমল হেসে নিচু গলায় বলল, "আর গোল হবে না। আপনারা যাকে বড় প্লেয়ার বলেন, তাকে এবার গোল শোধ করতে বলুন।"

"সেজন্য ভাবছি না। অনুপম খানপাঁচেক অনায়াসেই চাপিয়ে দেবে। কিন্তু দোহাই আর গোল খাওয়াবেন না।"

কমল খালি বোতলটা রেখে উঠে দাঁড়াল। একটু দূরে বেঙ্গল টিউবের খেলোয়াড়রা বসে জিরোচ্ছে। কমল লক্ষ করেছে, ওদের লেফট হাফ বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা ছেলেটি এলোপাথাড়ি পা চালায়, পাস দিতে গিয়ে কেমন গোলমাল করে ফেলে, বিন্দুমাত্র কন্ট্রোল নেই বলের উপর কিন্তু প্রচণ্ড দম আর বেপরোয়া

গোঁয়ার্তুমিটা আছে। যার ফলে যেখানে বল সেইখানেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো গুঁতোতে ছুটছে। বল ধরতে গিয়েও ওকে দেখে অনেকেই বল ছেড়ে সরে যাচ্ছে।

কমল ওর কাছে গিয়ে বলল, "দারুণ খেলছো তো। প্রগ্রেসিভকে তো দেখছি তুমি একাই রুখে দিয়েছ।"

আনন্দে এবং লজ্জায় ছেলেটি মাথা চুলকোতে লাগল। কমল গুহর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়।

"তবে এবার তোমার কপালে দুঃখ্যু আছে।"

সচকিত হয়ে ছেলেটি বলল, "কেন, কেন?"

"এবার অনুপম নামছে। ও বলেছে—পাঁচখানা চাপাব, বেঙ্গল টিউব আবার টিম নাকি?"

কমল লক্ষ করল, ছেলেটির মুখ রাগে থমথমে হয়ে উঠল।

"দেখি তুমি কত ভাল প্লেয়ার, এইবার বুঝব।" এই বলে কমল সরে এল।

খেলা আবার শুরু হয়ে বল মাঝ-মাঠেই রইল মিনিট পাঁচেক। অনুপম কোমরে হাত দিয়ে ডান টাচ লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিরক্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে এল বলের আশায়।

বল পেল অনুপম। কাটাল একজনকে, পরের লোকটাকেও। কমল দেখল টিউবের লেফট হাফ প্রায় চল্লিশ গজ থেকে ছুটে আসছে। সামনে তিন ডিফেন্ডার। অনুপম বল থামিয়ে দেখছে কাকে দেওয়া যায়। চোখে পড়ল বুলডোজারের মতো আসছে লেফট হাফ। অনুপম তাড়াতাড়ি বলটা নিজেদের সেন্টার ফরোয়ার্ডকে ঠেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। লেফট হাফ ব্রেক করতে পনেরো গজ এগিয়ে গেল এবং তারপরই ঘুরে আবার বলের দিকে তাড়া করল।

অনুপমের দেওয়া বল সেন্টার ফরোয়ার্ড রাখতে পারেনি। বল এল কমলের পায়ে। অবহেলায় সে ছোট্ট জায়গার মধ্যে পাঁচ-ছয়বার কাটিয়ে নিতে নিতে দেখে নিল অনুপম ও তার প্রহরী লেফট হাফটি কোথায়। তারপর অনবদ্য ভাবে ঠিক দু'জনের মাঝ বরাবর বলটা ঠেলে দিল, যাতে ছুটে গিয়ে অনুপমকে পাসটা ধরতে হয়।

অনুপম ছুটে গিয়ে বলে পা দিতে যাবে, তখন আর একটি পা সেখানে পৌঁছে গেছে। টায়ার ফাটার মতো চার্জের শব্দ হল। বলটা ছিটকে এল প্রগ্রেসিভের হাফ লাইনে। পর পর তিনবার কমল থ্রু দিল অনুপমকে, অবশ্যই লেফট হাফের দিকে ঘেঁষে। সবাই দেখল, অনুপম বল ধরতে পারল না বা ছুটেও থমকে পড়ল। রাইট উইং থেকে সে লেফট উইংয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে লেফট হাফও ডানদিকে চলে এল। মাঠের বাইরে মুখ টিপে অনেকে হাসল। কমল দেখল, অনুপমের মুখে রাগ, বিরক্তি ও হতাশা।

আবার অনুপমকে বল বাড়াল কমল। টিউব যেন জেনে গেছে সব বল অনুপমকেই দেওয়া হবে। তিনজন ওর উপর নজর রেখে ওর কাছাকাছি ঘুরছে। অনুপম বলটা ধরার জন্য এক হাতও এগোল না। বরং দু'হাত নেড়ে চিৎকার করতে করতে সে

কমলের কাছে এসে বলল, "আমাকে কেন, আমাকে কেন। বল দেবার জন্য আর কি মাঠে লোক নেই?"

অবাক হয়ে কমল বলল, "সে কী, অফিসে শুনলুম, কাল প্রসূন বল দেয়নি বলে তুমি তিনটের বেশি গোল পাওনি!"

অনুপম আর কথা বলেনি। মাঠের মধ্যে সে ছোটাছুটি শুরু করল, লেফট হাফের পাহারা থেকে মুক্তি পাবার জন্য। তার তখন একমাত্র চিন্তা—চোট যেন না লাগে। এর পরই কমল বল নিয়ে উঠল। এগোতে এগোতে টিউবের পেনাল্টি এরিয়ার কাছে পৌঁছে অনুপমকে বল দেবার জন্য তার দিকে ফিরে হঠাৎ ঘুরে গিয়ে একজনকে কাটিয়েই প্রায় ষোলো গজ থেকে গোলে শট নিল। টিউবের কেউ ভাবতে পারেনি, অনুপমকে বল না দিয়ে কমল নিজেই আচমকা গোলে মারবে। বল যখন ডান পোস্টের গা ঘেঁষে গোলে ঢুকছে, গোলকিপার তখনও অনুপমের দিকে তাকিয়ে বাঁ পোস্টের কাছে দাঁড়ানো।

তিন মিনিট পরে ঠিক একই ভাবে কমল আবার গোল দিল। টিউব এবার অনুপমকে ছেড়ে কমল সম্পর্কে সজাগ হয়ে পড়ল। খেলা শেষ হতে চার মিনিট বাকি, রেজাল্ট তখন ৩—২। প্রগ্রেসিভ হারছে। কমল বল নিয়ে আবার উঠতে শুরু করল, তিন জনকে কাটিয়ে সে বল দিল রাইট ইনকে। সে আবার ফিরিয়ে দিল কমলকে। অনুপমের প্রহরী তেড়ে আসছে। কমল বলটা রেখে অপেক্ষা করল এবং শেষ মুহূর্তে নিমেষে বল নিয়ে সরে দাঁড়াল। লেফট হাফ ফিরে দাঁড়িয়ে আবার তেড়ে এল। কমল আবার একই ভাবে এগিয়ে এল। কমল ডান পায়ে বল মারার ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে উঠল, "অনুপম!"

অনুপম বাঁ দিক দিয়ে এগিয়ে গেল বলের আশায়। তার সঙ্গে গেল টিউবের তিনজন। কমল বাঁ পায়ে বলটা ঠেলে দিল দুজন ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে পেনাল্টি বক্সের মাঝখানে। আর রাইট ইন, যে বল সে একশোটার মধ্যে আটানব্বুইটা গোলের বাইরে মারবে, সে-ই বল গোলে পাঠিয়ে দিল।

খেলা শেষে নতু সাহা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল কমলের দিকে। কমল থমকে দাঁড়িয়ে অনুপমকে বলল, "পাস কখন দেবে, কেন দেবে এবং দেবে না, সেটা প্রসূন জানে। বল পেয়ে খেলা যেমন, না পেয়েও তেমন একটা খেলা আছে। সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

অনুপমের কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে নতু সাহার হাতটা সরিয়ে কমল টেন্টের দিকে এগিয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পথে সে ট্রামে শুনল, শোভাবাজার তিন গোলে রাজস্থানের কাছে হেরেছে।

॥ নয় ॥

পরদিন অফিসে পৌঁছোনো মাত্র কমল শুনল, রথীন তাকে দেখা করতে বলেছে। ওর চেম্বারে ঢুকতেই রথীন টেলিফোনে কথা বলতে বলতে ইশারায় কমলকে

বসতে বলল।

"তারপর," রথীন টেলিফোন রেখে বলল, "কাল নাকি দারুণ খেলেছিস!"

"কে বলল!" কমল ভাবতে শুরু করল, রথীনকে এর মধ্যেই কে খবর দিতে পারে!

"যেই বলুক না। তিন গোল খাইয়ে অনুপমকে মাঠে নামিয়েছিস, এমন থুবাড়িয়েছিস যাতে না ও ধরতে পারে, তারপর গোল দিয়ে মান বাঁচিয়েছিস। সাবাস, অসাধারণ! এক ঢিলে তিন পাখি—একেই বলে।"

কমল কথা না বলে ফিকে হাসল। রথীনের মুখ থমথম করছে।

"একজন সিনিয়ার প্লেয়ার জুনিয়ারকে মাঠের মাঝে অপদস্থ করবে ভাবা যায় না। আনস্পোর্টিং।"

কমল শক্ খেয়ে সিধে হয়ে বসল। রাগটা কয়েকবার দপদপ করে উঠল চোখের চাউনিতে।

"ব্যাপারটা কী? অনুপম তোর ক্লাবের প্লেয়ার বলেই কি আমি আনস্পোর্টিং?"

"আমার ক্লাব বলে কোনও কথা নয়। একটা উঠতি প্রমিসিং ছেলে, তাকে হাস্যকর করে তুললে সাইকোলজিক্যালি তার একটা সেটব্যাক হয়। এবছর যাত্রীর ফরোয়ার্ড লাইনে অনুপম অত্যন্ত ইম্পর্টান্ট রোল প্লে করছে। যাত্রী শিল্ড পেয়েছে কিন্তু লিগ পায়নি কখনও। আমার আমলে যাত্রীকে আমি লিগ এনে দেব। এ বছর নিখুঁত যন্ত্রের মতো যাত্রী খেলছে। আমি চাই না এর সামান্য একটা পার্টসও বিগড়ে যাক। আমি তা হতে দেব না।" রথীনের মুঠো করা হাতটার দিকে কমল তাকাল। হিংস্র আঘাতের জন্য মুঠোটা তৈরি। কমল নির্লিপ্ত স্বরে বলল, "আমি কি এবার উঠতে পারি?"

কঠিন চোখে রথীন তাকাল। কমলও।

"আমার কথাটা আশা করি বুঝিয়ে দিতে পেরেছি।"

কমল ঘাড় নাড়ল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "একশো টাকাটা এখনও শোধ দিতে পারিনি, হাতে একদমই টাকা নেই। সামনের মাসে মাইনে পেলেই দিয়ে দেব।"

"না দিলেও চলবে। একশো টাকার জন্য যাত্রী মরে যাবে না।"

"কত টাকার জন্য তা হলে মরতে পারে?"

"মানে!"

"পাঁচ হাজার?"

রথীনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। কমল সেটা লক্ষ করে বলল, "আমার মনে হয় না যুগের যাত্রী খুব একটা স্পোর্টিং ক্লাব।"

"এখন তুমি যেতে পারো।" রথীন দরজার দিকে আঙুল তুলল।

কমল নিজের চেয়ারে এসে বসা মাত্র বিপুল ঘোষ ফিসফিস করে বলল, "কাল কী রকম খেলেছেন মশাই, অফিসের ছোকরারা খাপ্পা হয়ে গেছে। আপনি নাকি খুব বড় একজন প্লেয়ারকে খেলতে না দিয়ে একাই খেলেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কত বড় প্লেয়ার সে!"

"মস্ত বড়। আট হাজার টাকা নাকি পায়।"

"আ—ট! বলেন কী মশাই, সাত ঘণ্টা চোদ্দো বছর ধরে কলম পিষে আজ পাচ্ছি বছরে আট হাজার। আর এরা একটা বলকে লাথি মেরে পাচ্ছে আট হাজার টাকা! তার সঙ্গে চাকরির টাকাটাও ধরুন।"

"পাক না টাকা। ভালই তো। কলম পেষার থেকে ফুটবল খেলা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।"

কমল আলোচনা বন্ধের জন্য চিঠির গোছা সাজাতে শুরু করল। এগুলোর কুষ্ঠি-ঠিকুজি এখন খাতায় এন্ট্রি করতে হবে। তারপর খামে ভরে দপ্তরির কাছে পাঠানো স্ট্যাম্প দিয়ে ডাকে পাঠাবার জন্য। ভুল হয়ে গেলে একের চিঠি অন্যের কাছে চলে যাবে। চাকরি নিয়ে তখন টানাটানি পড়বে।

রণেন সাহা এতক্ষণ একমনে কাজ করছিল। মাথা না তুলে এবার বলল, "আজও তিনটের সময় চলে যাবেন নাকি?"

"কেন!" কমল বলল।

"কাল যে দুটো গোল করেছেন।"

কমল হেসে উঠল।

ছুটির কিছু আগে ফোন এল কমলের। অরুণার গলা: "কমলদা, একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। বেলেঘাটায় একটা স্কুলে টিচার নেওয়া হচ্ছে। তোমাদের ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দেবে? উনি ওই স্কুলের কমিটিতে আছেন। যদি চাকরিটা পাই, তা হলে এখন যেটা করি সেটা বরুণাকে দিয়ে দেব।"

কমল ওকে জানাল, ক্লাবে গিয়ে কেষ্টদার সঙ্গে সে আজকেই কথা বলবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে কমল হেঁটেই ময়দানে যায়। আজ যাবার পথে সারাক্ষণ রথীনের কথাগুলো, তার আচরণের পরিবর্তন এবং সব থেকে বেশি 'আনস্পোর্টিং' শব্দটি কমলের মাথার মধ্যে ঠকঠক করে আঘাত করতে লাগল।

"এই যে। আপনার কাছেই যাব ভাবছিলুম। দেখা হয়ে ভালই হল।"

চমকে উঠে কমল দেখল, সাংবাদিকটি সামনে দাঁড়িয়ে। হেসে বলল, "কেন?"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি, আপনি কি রিটায়ার করেছেন?"

"সে কী! কোথায় শুনলেন?"

"কাল যুগের যাত্রীর টেন্টে গেছলুম। সেখানে প্রতাপ ভাদুড়ি বলল আপনি নাকি রিটায়ার করেছেন।"

চলতে চলতে কমল বলল, "আচ্ছা, তাই নাকি! আর কী শুনলেন?"

"যাত্রীর কে যেন কাল অফিস লিগে আপনার খেলা দেখতে গিয়েছিল। তার সঙ্গেই আলোচনা করছিল প্রতাপ ভাদুড়ি। আপনি অনুপমকে নাজেহাল করেছেন শুনে বলল, কমল তো শুনছি রিটায়ার করে গেছে। ওকে কিছু টাকা বেনিফিট হিসাবে দেব ভাবছি, অনেক বছর যাত্রীতে খেলে গেছে তো।"

"কত টাকা দেবে কিছু বলেছে?"

"না।"

"শোভাবাজারের পরের ম্যাচেই আমি খেলছি।"

"তা হলে রিটায়ার করেননি!"

কমল জবাব না দিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল বিস্মিত সাংবাদিককে ভিড়ের মধ্যে ফেলে রেখে।

শোভাবাজার টেন্টে ঢোকার মুখেই কমলের সঙ্গে দেখা হল সত্য আর বলাইয়ের।

"কাল আপনি এলেন না কমলদা? খেলা আরম্ভ হবার পাঁচ মিনিট আগে পর্যন্ত সরোজদা আপনার জন্য অপেক্ষা করেছে।"

"অফিস আটকে দিল।" কমল অপ্রতিভ হয়ে বলল। "খেললি কেমন তোরা?"

বলাই হেসে বলল, "আর খেলা! আপনার জায়গায় স্বপনকে নামানো হয়েছিল। তিনটে গোল ওই খাওয়াল।"

"লাস্ট গোলটা, বুঝলেন কমলদা, যদি দেখতেন তো হাসতে হাসতে মরে যেতেন। ওদের শ্যামল বোস দুটো গোল করেছে। রাইট আউট বল নিয়ে এগোচ্ছে। স্বপন ট্যাকল করতে কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে এগিয়ে হঠাৎ ঘুরে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে শ্যামল বোসের কাছে দৌড়ে এসে দাঁড়াল। ওদিকে রাইট আউট ফাঁকায় এগিয়ে এসে গোল করে দিল। আমরা তো অবাক। বললুম—স্বপন, তুই ওভাবে ছেড়ে দিয়ে এদিকে দৌড়ে এলি কেন? কী বলল জানেন! যদি শ্যামল বোসকে বল দিত আর যদি শ্যামল বোস গোল করত তা হলে ওর হ্যাটট্রিক হয়ে যেত না?"

বলতে বলতে সত্য হো হো করে হেসে উঠল। বলাইও। "বুঝলেন কমলদা, উফ্‌ফ, স্বপন হ্যাটট্রিক করতে দেয়নি। ওহঃ, গোল খাও, পরোয়া নেই, হ্যাটট্রিক হোনে নেহি দেগা।"

কমলও হাসল। তারপর চোখে পড়ল, ভরত টেন্টের মধ্যে চেয়ারে বসে তাদের দিকেই তাকিয়ে। কমল এগিয়ে এসে বলল, "সরি ভরত।"

"আপনি থাকলে কাল গোল খেতুম না।"

"কী করব, অফিসের খেলা ফেলে আসতে পারলাম না।"

"কমলদা, শোভাবাজারে ন'বছর আছি। ফার্স্ট গোলি সাত বছর ধরে। এমন জঘন্য টিম কোনও বার দেখিনি। থার্ড ডিভিশনেও এরা খেলার যোগ্য নয়। না আছে স্কিল না আছে ফুটবল সেন্স। পারে শুধু গালাগালি আর লাথি চালাতে। বলাই, সত্য, শ্রীধর তিনজনকেই রেফারি ওয়ার্ন করেছে। স্বপন যতই বোকামি করুক, প্রাণ দিয়ে খেলেছে ওর সাধ্য মতো।"

"নেক্স্ট ম্যাচ কার সঙ্গে? বাটা?"

"হ্যাঁ।"

সেক্রেটারির ঘর থেকে এই সময় সরোজ বেরোল। কমলকে দেখেই গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ।

"আসতে পারলাম না সরোজ।"

"জানি, অফিসের হয়ে খেলেছেন।"

"পরের ম্যাচে অবশ্যই খেলব। তাতে চাকরি যায় যাবে।"

"সরি কমলদা, টিম হয়ে গেছে। স্বপনই খেলবে।"

"সরোজ, আমি রিটায়ার করেছি বলে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। ওটা মিথ্যা রটনা প্রমাণ করতে আমাকে নামতেই হবে মাঠে।"

"টিম আর বদলানো যাবে না।" সরোজ স্বরে কাঠিন্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "অন্য ম্যাচে খেলবেন।"

শোভাবাজারের মতো নগণ্য টিমের অতি নবীন কোচ যে এভাবে তার সঙ্গে কথা বলবে, কমলের তা কল্পনার বাইরে। কথা না বাড়িয়ে সে সেক্রেটারির ঘরে ঢুকল।

কৃষ্ণ মাইতি বাড়িতে তিন-চার টাকার বেশি বাজার করেন না। বাইরে লুকিয়ে রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য উদরস্থ করাই তাঁর জীবনের একমাত্র শখ। আস্ত চিকেন রোস্ট নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিলেন। যখন কমল সামনে এসে বসল, কথা না বলে একবার তাকালেন শুধু তিনি।

"সামনের ম্যাচ বাটায় সঙ্গে। কেষ্টদা, আমি খেলতে চাই।"

"বেশ তো, নিশ্চয়ই খেলবি।"

"সরোজ টিমে আমার নাম রাখেনি।"

"সে কী!" কৃষ্ণ মাইতি চিৎকার করে উঠলেন, "সরোজ, সরোজ!"

সরোজ ঘরে ঢোকা মাত্র বললেন, "কমল বাটা ম্যাচ খেলবে।"

"কিন্তু—" সরোজ কড়া চোখে কমলের দিকে তাকাল।

"কিন্তুটিন্তু নয়। কমল কলকাতা মাঠের সব থেকে সিনিয়ার প্লেয়ার। বড় বড় টিম এখনও মাঠে ওকে দেখলে ভয়ে কাঁপে। ও খেলতে চেয়েছে, খেলবে।"

"কিন্তু কেষ্টদা, আমি টিমটা অনেক ভেবেই করেছি একটা বিশেষ প্যাটার্নে খেলাব বলে। তা ছাড়া কমলদা তো একদিনও প্র্যাকটিস করলেন না ছেলেদের সঙ্গে!"

"প্র্যাকটিস!" কেষ্টদা দারুণ বিষম খেলেন। কয়েকবার ব্রহ্মতালু থাবড়ে নিয়ে ধাতস্থ হয়ে বললেন, "প্যাটার্ন, প্র্যাকটিস সব হবে, সব হবে। যা বললুম তাই করো। কমল খেলবে।"

"আচ্ছা।"

সরোজ বেরিয়ে যাবার সময় কঠিন দৃষ্টি হেনে গেল কমলের দিকে।

"বুঝলে কমল, বাবুরা কোচিং করে ক্লাবকে উদ্ধার করবে। শেষ দিকে পয়েন্ট ম্যানেজ করে তো রেলিগেশন থেকে বাঁচতে হবে। ওঠা-নামা যদ্দিন বন্ধ ছিল, বুঝলে, শান্তিতে ছিলুম।"

"কেষ্টদা, আপনি যে মেয়েদের স্কুলের কমিটি মেম্বার, সেখানে টিচার নেওয়া হচ্ছে। আমার একজন পরিচিত অ্যাপ্লাই করেছে। আপনি একটু দেখবেন?"

"কে হয় তোর?"

"পল্টু মুখার্জির বড় মেয়ে।"

ভ্রূ কুঁচকে কৃষ্ণ মাইতি আঙুলে লেগে থাকা ঝোল চাটতে চাটতে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা দেখব'খন। কিন্তু তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

যুগের যাত্রীর সঙ্গে লিগের প্রথম খেলা সতেরোই। পয়েন্ট নিতে হবে। যদি নিতে পারিস, তা হলে চাকরিটা হবে।"

কমল অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। চাকরি দেবার এরকম অদ্ভুত শর্তের কারণ সে বুঝতে পারছে না।

"কেষ্টদা, তা কী করে হয়!"

"হতেই হবে। পয়েন্ট দে, আমিও তা হলে চেষ্টা করব। গুলোকে আমি একবার দেখে নেব। গত বছর কথা ছিল, ম্যাচ ছেড়ে দিলে আর গভর্নিং বডির মিটিংয়ে কালীঘাটের সঙ্গে গণ্ডগোল বন্ধ হয়ে যাওয়া খেলাটা রি-প্লে হওয়ার পক্ষে ভোট দিলে সাতশো টাকা দেবে টেন্ট সারাতে। ম্যাচ ছাড়ার আর দরকার হয়নি, এমনিতেই যাত্রী চার গোল দিয়েছে। ভোট দিয়েছিলুম কিন্তু যাত্রী জিততে পারেনি। ব্যাস, ব্যাটা আর টাকা ঠেকাল না। যদি পারিস ফার্স্ট ম্যাচে পয়েন্ট নিতে তা হলে ভয় খাবে, রিটার্ন লিগ ম্যাচে সুদে-আসলে তখন কান মলে আদায় করে নেব। পল্টু মুখুজ্যের মেয়ের চাকরি, কমল এখন তোর হাতে।"

কমল কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না, শুধু তাকিয়ে রইল চশমার পিছনে পিটপিটে দুটো চোখের দিকে। যাত্রীকে পয়েন্ট থেকে বঞ্চিত করার ইচ্ছাটা তারও প্রবল। কিন্তু কৃষ্ণ মাইতির ইচ্ছাটার সঙ্গে তারটির কিন্তু ভীষণ অমিল। সব থেকে অস্বস্তিকর ও ভয়ের ব্যাপার এই শর্তটা। যাত্রীর কাছ থেকে পয়েন্ট নেওয়া একার সাধ্যে সম্ভব নয়। বয়স হয়েছে, দমে কুলোয় না। এজিলিটি কমে গেছে, স্পিডও। শুধু অভিজ্ঞতা সম্বল করে একটা তাজা দলের সঙ্গে একা লড়াই করা যায় না। তার থেকেও বড় কথা, অরুণার চাকরি পাওয়া যদি যাত্রীর সঙ্গে খেলার ফলের উপর নির্ভর করে, তবে সেটা একটা বাড়তি চাপ হবে মনের উপর।

কমলের মনের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল এক বৃদ্ধের ছবি। কী যেন বলছেন, কমল মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, "ব্যালান্স! হ্যাঁ পল্টুদা, ব্যালান্স রাখতে হবে।"

"ব্যালান্স কী রে, পয়েন্ট চাই।"

কমল উঠে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল, "আমি চেষ্টা করব।"

॥ দশ ॥

কিক্ অফের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে কমলের শরীরে হালকা একটা কাঁপন লাগল। গত বছর আই এফ এ শিল্ডের প্রথম রাউন্ডে এই মহমেডান মাঠেই শেষবার খেলেছে। তারপর ঘেরা মাঠে আজ প্রথম। প্রত্যেকবার, গত কুড়ি বছরই, কিক্ অফের বাঁশি শুনলেই তার শরীর মুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠে। স্নায়ুগুলো নাড়াচাড়া খেয়ে আবার ঠিক হয়ে যায়। তারপর প্রত্যেকটা কোষ ফেটে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে উঠতে শুরু করে।

কমল অনুভব করল আজকেও সে তৈরি। বাটা আলস্যভরে খেলা শুরু করেছে।

বল নিয়ে ওরা মাঝখান দিয়ে ঢুকছিল, রাইট হাফ সত্য চার্জ করে বলটা লম্বা শটে ডান কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে পাঠিয়ে দিল। কমল বিরক্ত হল। অযথা বোকার মতো বলটা নষ্ট করল। উইং রুদ্র তখন সেন্টার ফ্ল্যাগের কাছে, তার পক্ষে ওই বল ধরা সম্ভব নয়। তবু রুদ্র দৌড়িয়ে খানিকটা দম খরচ করল।

পেনাল্টি এরিয়ার ১৮ × ৪৪ গজ জায়গা নিয়ে কমল খেলতে থাকে। দু'বার তাকে বল নিয়ে আগুয়ান ফরোয়ার্ডকে চ্যালেঞ্জ করতে হয়েছে এবং দু'বারই বল দখল করেছে। নির্ভুল বল দিয়েছে ফরোয়ার্ডদের, কাঁচা ছেলে স্বপন নিজের জায়গা ছেড়ে বলের পিছনে যত্রতত্র ছুটছে, তাকে কোথায় পজিশন নিতে হবে বার বার চেঁচিয়ে বলছে, বল নিয়ে ওঠার মতো ফাঁকা জমি পেয়েও সে প্রলোভন সামলেছে। খেলা পনেরো মিনিটে গড়াবার আগেই কমল নিজের সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে উঠল।

সবুজ গ্যালারিতে দুটি মাত্র লোক। হাওড়া ইউনিয়নের মেম্বার-গ্যালারিতে জনা পনেরো লোক। ওরা রোজই আসে, খেলার পরও সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে। মহমেডান মেম্বার-গ্যালারিতেও কিছু লোক। খেলা চলছে উদ্দেশ্যবিহীন, মাঝ মাঠে। কিন্তু এরই মধ্যে কমল লক্ষ করল, শোভাবাজারের তিন-চারজনের যেন খেলার ইচ্ছাটা একদমই নেই। বিপক্ষের পায়ে বল থাকলে চ্যালেঞ্জ করতে এগোয় না, ট্যাক্‌ল করতে পা বাড়ায় না, বল নিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলে তাড়া করে না। কমল ক্রমশ অনুভব করতে লাগল যে, তার ওপর চাপ পড়ছে। মাঝমাঠে যে বাঁধটা রয়েছে তাতে একটার পর একটা ছিদ্র দেখা দিচ্ছে আর অবিরাম বল নিয়ে বাটা এগিয়ে আসছে।

কিন্তু অবাক হল কমল, রাইট ব্যাকে স্বপনের খেলা দেখে। যেখানেই বল সেখানেই স্বপন। এলোপাথাড়ি পা চালিয়ে, ঝাঁপিয়ে, লাফিয়ে সে নিজেকে হাস্যকর করে তুললেও, কমল বুঝতে পারছে, ওর এই ভাবে খেলাটা ফল দিচ্ছে। নিজের জায়গা ছেড়ে ছোটাছুটি করলেও কমল ওকে আর নিষেধ করল না। তবে ডান দিকের বিরাট ফাঁকা জায়গাটা বিপজ্জনক হয়ে রইল।

হাফটাইমের পর প্রথম মিনিটেই শোভাবাজার গোলকিক্ পেয়েছে। ভরত বলটা গোল এরিয়ার মাথায় বসাবার সময় কমলকে বলল, "সত্য, শম্ভু, বলাই মনে হচ্ছে বেগোড়বাই শুরু করেছে। কমলদা, আপনি রুদ্রকে নেমে এসে ডানদিকটা দেখতে বলুন।"

কমল কিক্ করার আগে শুধু বলল, "আর একটু দেখি।"

কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই বাটা পেনাল্টি কিক্ পেল। লেফট ব্যাক বলাই অযথা দু'হাতে বলটা ধরল, যেটা না ধরলে ভরত অনায়াসেই ধরে নিত। ভরত তাজ্জব হয়ে বলল, "এটা তুই কী করলি?"

বলাই মাথায় হাত দিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "একদম বুঝতে পারিনি। ভাবলুম তুই বোধ হয় পজিশনে নেই, বলটা গোলে ঢুকে যাবে।"

ভরত বিড়বিড় করে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে গোলে দাঁড়াল এবং পেনাল্টি কিক্ হবার পর গোলের মধ্য থেকে বলটা বার করে প্রবল বিরক্তিতে মাটিতে আছাড় মারল।

"বলাই!" গম্ভীর স্বরে কমল বলল, "তুমি রাইট উইংয়ে যাও। আর রুদ্র, তুমি নেমে এসে খেলো।"

বলাই উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করল, "কেন? আমি পজিশান ছেড়ে খেলব কেন?"

"আমি বলছি খেলবে।"

"আপনি অর্ডার দেবার কে? ক্যাপ্টেন দেবীদাস কিংবা কোচ সরোজদা ছাড়া হুকুম দেবার অধিকার কারোর নেই।"

কমল চুপ করে সরে গেল। সত্য চেঁচিয়ে বলাইকে জিজ্ঞাসা করল, "কী বলছে রে?"

রাগে অপমানে ঝাঁঝিয়ে উঠল কমলের মাথা। শুধুমাত্র স্বপন আর প্রাণবন্ধুকে দু'পাশে নিয়ে সে লড়াই শুরু করল। রুদ্র নেমে এসে খেলছে। এখন বাটাকে গোল দেবার কোনও কথাই ওঠে না। শোভাবাজার গোল না খাওয়ার জন্য লড়ছে সাত-আটজনকে সম্বল করে।

পঞ্চাশ মিনিটের পর থেকেই শোভাবাজার ডিফেন্স ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে শুরু করল। সত্য, শম্ভু, বলাই অযথা ফাউল করছে। তিনটে ফ্রি কিকের দুটি ভরত দুর্দান্তভাবে আটকেছে, অন্যটি ফিস্ট করে কর্নার করেছে। কমল দাঁতে-দাঁত চেপে পেনাল্টি এরিয়ার ফোকরগুলো ভরাট করে চলেছে আর চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে স্বপন আর প্রাণবন্ধুকে। বাটার ছয়জন, কখনও আটজন আক্রমণে উঠে আসছে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আরও তিনটি গোল তারা দিল।

"কমলদা, আর আমি পারছি না।" হাঁফাতে হাঁফাতে স্বপন বলল। ছেলেটার জন্য কষ্ট হচ্ছে কমলের। কিন্তু সেটা প্রকাশ করার বা ওকে ঢিলে দিতে বলার সময় এখন নয়। চার গোল খেয়েছে শোভাবাজার। বাটার দুজনের জন্য তাদের একজন। সংখ্যার অসমত্ব নিয়ে লড়াই অসম্ভব। খেলাটা এখন এলোপাথাড়ি পর্যায়ে নেমে এসেছে। বাটা গোল না দিয়ে শোভাবাজারকে নিয়ে এখন ছেলেখেলা করছে।

"তোর থেকে আমার ডবল বয়েস। আমি পারছি, তুই পারবি না কেন?"

স্বপন ঘোলাটে চোখে কমলের দিকে তাকিয়ে মাথাটা দু'বার ঝাঁকিয়ে আবার বলের দিকে ছুটে গেল। কমলের মনে হল, যদি এখন সলিলটাও পাশে থাকত। প্রাণবন্ধু, স্বপন এবং রুদ্রও এখন পেনাল্টি এরিয়ায় নেমে এসে খেলছে। ফরোয়ার্ডরা—দেবীদাস, গোপাল, শ্রীধর হাফ লাইনে নেমে এসেছে। বাটার গোলকিপার পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। কমল কখনও যা করতে চায় না, যা করতে সে ঘৃণা বোধ করে, তাই শুরু করল। সময় নষ্ট করে কাটাবার জন্য, বল পাওয়া মাত্র গ্যালারিতে পাঠাতে লাগল। গ্যালারিতে লোক নেই, বল কুড়িয়ে আনতে সময় লাগে।

চার গোলেই শোভাবাজার হারল। খেলার শেষে মাঠের বাইরে এসেই স্বপন আছড়ে পড়ল। কমল এক গ্লাস জল মাথায় ঢেলে শুধু একবার সরোজের দিকে তাকাল। সরোজ মুখ ঘুরিয়ে নিল। বলাই হাসতে হাসতে সরোজকে বলল, "শুধু চিকেন চৌমিনে হবে না বলে রাখছি, এক প্লেট করে চিলি চিকেনও।"

কমল ঝুঁকে স্বপনের হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল। গতি অসম্ভব দ্রুত। মনে হল মিনিটে দেড়শোর উপর। ওর পাশে উবু হয়ে বসা রুদ্র আর প্রাণবন্ধুর দিকে তাকিয়ে কমল ম্লান হেসে বলল, "রেস্ট নিক আর একটু। পরশু থেকে তোদের নিয়ে প্র্যাকটিসে নামব।"

টেন্টে এসে স্নান করে কমল যখন ড্রেসিং রুমে পোশাক পরছে, তখন শুনতে পেল বাইরে ক্লাবের দুই এক্‌জিকিউটিভ মেম্বার বলাবলি করছে:

"সরোজ তো তখনই বলেছিল, চলে না, বুড়ো ঘোড়া দিয়ে আর চলে না। মর্ডান ফুটবল খেলতে হলে খাটুনি কত!"

"কেষ্টদার যে কী দুর্বলতা ওর উপরে, বুঝি না। ইয়াং ছেলেরা চান্স না পেলে টিম তৈরি হবে কী করে, কোচ রাখারই বা মানে কী? পাওয়ার ফুটবল এখন পৃথিবীর সব জায়গায় আর আমরা—"

"সরোজ বলছে, এভাবে তার উপরে হস্তক্ষেপ করলে সে আর দায়িত্ব নিতে পারবে না।"

"কেষ্টদার উপর তো আর এখানে কথা চলে না, ডুবল, ক্লাবটা ডুবল।"

কমল ঘর থেকে বেরোতেই ওরা চুপ করে ভ্যাবাচাকার মতো তাকিয়ে রইল। তারপর একজন তাড়াতাড়ি বলল, "অ্যাঁ, তা হলে চার গোল হল!"

"হ্যাঁ, চার গোল।" কমল গম্ভীরভাবে জবাব দিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। টেন্টের বাইরে এসে দেখল, ক্যান্টিনের কাউন্টারে সরোজ চা খাচ্ছে। ওকে ডাকতে গিয়ে কমল ইতস্তত করল, কয়েকটা কথা এখন তার সরোজকে বলতে ইচ্ছে করছে। তারপর ভাবল, থাক, তর্কাতর্কি করে ভিড় জমিয়ে লাভ নেই। কমল বেরিয়ে এল ক্লাব থেকে।

বাসে দমবন্ধ ভিড়ে কমল মাথার উপরের হাতল ধরে দাঁড়িয়েছিল। সামনেই মাঝবয়সী একটি লোক বার বার তার দিকে তাকাতে তাকাতে অবশেষে বলল, "আজ খেলা ছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কী রেজাল্ট হল?"

বুকের মধ্যে ডজনখানেক ছুঁচ ফোটার ব্যথা কমল অনুভব করল। ভাবল, না শোনার ভান করে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু লোকটির প্রত্যাশাভরা মুখটি অগ্রাহ্য করতে পারল না। আস্তে বলল, "ফোর নীল।" তারপর বলল, "হেরে গেছি।"

লক্ষ করল, সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখ বেদনায় কালো হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। কমলের দিকে আর মুখ ফেরাল না। মুঠোর মধ্যে হাতলটা দুমড়েমুচড়ে ভেঙে ফেলতে চাইল কমল। হয়তো এই লোকটি তার দশ কি বারো বছর আগের খেলা দেখেছে। তারপর নানান কাজে জড়িয়ে পড়ে আর মাঠে যায় না। কিন্তু মনে করে রেখেছে কমল গুহর খেলা। হয়তো একদিন এই লোকটিও তাকে কাঁধে তুলে মাঠ থেকে টেন্টে বয়ে নিয়ে গেছে খেলার পর।

ভাবতে ভাবতে কমল নিজের উপরই রাগে ক্ষোভে আর অদ্ভুত এক অপমানের

জ্বালায় ছটফট করে বাস থেকে নেমে হেঁটে বাড়ি ফিরল।

পরদিন অফিসে নিজের চেয়ারে বসতেই চোখে পড়ল, খড়ি দিয়ে তার টেবলে বড় বড় অক্ষরে লেখা: "৪—০। এবং যুগের যাত্রীর সঙ্গেও এই রেজাল্ট হবে।"

কমল কিছুক্ষণ টেবলের দিকে তাকিয়ে রইল। লেখাটা মুছল না।

"চ্যাংড়াদের কাজ। মুছে ফেলুন কমলবাবু।" বিপুল তার টেবল থেকে ঝুঁকে বলল!

"না থাক।" কমল ম্লান হাসল।

"আপনি বরং যুগের যাত্রীর দিন খেলবেন না।"

কমল শোনা মাত্র আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিপুল তার শুভার্থী। বিপুল চায় না সে আর অপমানিত হোক। বিপুল ধরেই নিয়েছে, সে পারবে না যুগের যাত্রীকে আটকাতে, তাই বন্ধুর মতোই পরামর্শ দিয়েছে। কমল মুখ নামিয়ে বলল, "আমার ওপর কনফিডেন্স নেই আপনার?"

"না না, সে কী কথা। আমি তো খেলাটেলা দেখি না, বুঝিও না। তবে আজকালকার ছেলেপুলেরা, বোঝেনই তো, মানীদের মান রাখতে জানে না।"

"কিন্তু আমি যাত্রীর সঙ্গে খেলব।" কমল দৃঢ়স্বরে বলল। "আমাকে অন্য কারণেও খেলতে হবে।"

এক ঘণ্টা পরেই বেয়ারা একটা খাম রেখে গেল কমলের টেবলে। খুলে দেখল, মেমোরান্ডাম। গতকাল অফিস ছুটির নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কমল বিভাগীয় ইনচার্জের বিনা অনুমতিতে অফিস ত্যাগ করার জন্য এই চিঠিতে তাকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এ রকম আবার ঘটলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমল দেখল, চিঠির নীচে রথীনের সই। চিঠিটা ভাঁজ করে খামে রাখার সময় লক্ষ করল, রণেন দাস মুচকি মুচকি হাসছে। কমল মনে মনে বলল, "ব্যালান্স, এখন আমার ব্যালান্স রাখতে হবে যে।

॥ এগারো ॥

অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই কমল শুয়ে পড়ে। শরীর গরম, জ্বরজ্বর ভাব। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। অমিতাভর ডাকে চোখ মেলল।

"খাবেন না, রাত হয়েছে!"

কমল উঠে বসার সময় অনুভব করল, তার সারা গায়ে ব্যথা। অমিতাভ দেখল, কমলের চোখ দুটি লাল।

"তোমার খাওয়া হয়েছে?"

ইতস্তত করে অমিতাভ বলল, "না, একসঙ্গেই খাব।"

"আমার বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, আমি কিছুই খাব না।"

অমিতাভ চলে যাচ্ছে, কমল তাকে ডাকল।

"তোমার অ্যালার্ম ঘড়িটা আমায় একটু দেবে? কাল খুব ভোরে উঠতে হবে।

প্র্যাকটিসে যাব।"

"প্র্যাকটিসে!" অমিতাভর চোখ বড় হয়ে গেল। "আপনার তো জ্বর হয়েছে!"

এই বলে অমিতাভ এগিয়ে এসে কমলের কপালে হাত রাখল। "প্রায় একশো।"

কমল চোখ দুটি বন্ধ করে অমিতাভর শীর্ণ আঙুলের স্পর্শ অনুভব করতে করতে বলল, "আমাকে খেলতে হবে।"

"এই শরীরে?"

"হ্যাঁ? প্র্যাকটিস না করলে খেলা যায় না। আমি আর সময় নষ্ট করতে পারি না।"

"কিন্তু—" অমিতাভ চুপ করে গিয়ে একরাশ প্রশ্ন তুলে ধরল।

কমল একটু হাসল। "সারা জীবন পারফেক্শন খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। যে যার নিজের ক্ষেত্রে পারফেক্ট হতে চায়; আমার ক্ষেত্রটা ফুটবল। আমি মানুষ হতে পারব না জেনে ফুটবলার হতে চেয়েছি। কিন্তু দুঃখের কথা কী জানো, ফুটবলারের সময়টা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তার শরীর, তার যৌবনই তার সময়, কিন্তু বড্ড ছোট্ট সময়টা। আমার মতো তৃতীয় শ্রেণীর ফুটবলার অল্প সময়ের মধ্যে কী করতে পারে যদি না খাটে, যদি না পরিশ্রম করে?"

"কিন্তু আপনি অসুস্থ।"

"হোক। চ্যালেঞ্জ এসেছে, আমি তা নেবই। বহু অপমান সহ্য করেছি, তার জবাব না দিতে পারলে বাকি জীবন আমি কী করে কাটাব?"

কমল উঠে দাঁড়াল। কুঁজো হয়ে খাটের তলা থেকে ধুলোয় ভরা নীল রঙের কেডস্ জুতোজোড়া বার করে বুরুশ দিয়ে ঘষতে শুরু করল। হঠাৎ অমিতাভ বলল, "আপনি ফুটবলকে এত ভালবাসেন!"

মাথা হেলিয়ে কমল কয়েক সেকেন্ড থেমে বলল, "হ্যাঁ, এজন্য আমার দাম দিতে হয়েছে। অনেক কিছুই হারিয়েছি, তার বদলে এমন কিছুই পেলাম না যা দিয়ে আমার লোকসান পূরণ করতে পারি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ খেলার জীবনে অনেক শুনেছি, কিন্তু মূর্খ, বোকা, বদমাস, অহঙ্কারীদের অপমানের জবাব না দিয়ে আমি রিটায়ার করব না। আমি খেলব, যেমন করেই হোক, যদি মরতে হয় তবুও।"

"যদি না পারেন? সময় তো ফুরিয়ে এসেছে বললেন।"

"আমি ভয় পাই এ কথা ভাবতে। আমাকে পারতেই হবে, একাই আমায় চেষ্টা করতে হবে। আমি জানি, ঠিক সময়ে বল এগিয়ে দেব কিন্তু তখন বল ধরার লোক থাকবে না। নিখুঁত পাস দেব কিন্তু কন্ট্রোলে আনতে পারবে না, বল পাব কিন্তু এত বিশ্রী ভাবে আসবে যে কাজে লাগাবার উপায় তখন থাকবে না। নানান অসুবিধা নিয়ে আমার চারপাশের প্লেয়ারদের সঙ্গে মানিয়ে খেলতে হবে। কেউ কারোর খেলা বোঝে না, ওরা এক একজন এক এক রকমের। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এজন্য প্র্যাকটিস চাই একসঙ্গে।"

"তা হলেই আপনি সফল হবেন?"

কমল তীব্র কৌতূহল দেখতে পেল অমিতাভর চোখে। এতক্ষণ ধরে এত কথা তারা আগে কখনও বলেনি। কমলের মনে হল, তার কথা শুনতে অমিতাভর যেন

ভাল লাগছে। যে ভয়ঙ্কর ঔদাসীন্য এবং চাপা ঘৃণা নিয়ে সে বাবার সঙ্গে কথা বলত, সেটা সরে গিয়ে একটা কৌতূহলী ছেলেমানুষ বেরিয়ে এসেছে। আর একটা ব্যাপার কমল বুঝতে পারল, তার জ্বরজ্বর ভাব এবং গায়ের ব্যথা এখন আর নেই।

স্কিপিং-এর দড়িটা টেনে পরীক্ষা করতে করতে কমল বলল, "সফল? তোমার কী মনে হয়?"

অমিতাভ গম্ভীর হয়ে গেল।

কমল উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে রইল।

"আমি ফুটবলের কিছু বুঝি না।"

"কিন্তু এটা ফুটবল হিসাবে দেখছ কেন, জীবনের যে কোনও ব্যাপারেই তো এরকম পরিস্থিতি আসে। যে মানুষ একা, যার কেউ নেই, সে তখন সফল হবার জন্য কী করতে পারে?"

অমিতাভ চুপ করে রইল।

কমল উত্তেজিত হয়ে বলল, "সে তখন পারে শুধু লড়তে। তুমি কি নিজেকে একা বোধ করো অমিতাভ?"

অমিতাভ জবাব দিল না।

কমলের উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে এল। আস্তে আস্তে সে বলল, "যোগাযোগ করো। মাঠে আমি খেলার সময় তাই করি। কিন্তু বাড়িতে ফিরে আর তা পারি না। বড় একা লাগে।"

খাটের উপর বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে কমল বলল, "অনেক কথা বললাম, হয়তো এর মানে আমরা কেউই জানি না। তুমি আমাকে ভালবাস না, আমাকে ঘৃণা করো, এটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি।"

কমলের চোখ জলে চিকচিক করছে। স্বর ভারী। অমিতাভ পাথরের মূর্তির মতো একই ভাবে দাঁড়িয়ে। কমল মুখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল।

"ফুটবল খেলা একদিন আমায় শেষ করতেই হবে, তারপর আমি কী নিয়ে, কাকে নিয়ে থাকব?"

এ কথা শুনে অমিতাভর মুখে কোন ভাব ফুটে ওঠে দেখার জন্য মুখ তুলে কমল দেখল, ঘরে অমিতাভ নেই। নিঃসাড়ে সে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় কমল কিটব্যাগ হাতে বাড়ি থেকে বেরোল। বাগবাজার থেকে ময়দান সে ধীর গতিতে জগ্ করে পৌঁছল যখন, শোভাবাজারের টেন্টে তখন তিনটি ছেলে সদ্য এসে পৌঁছেছে। ওরা—স্বপন, রুদ্র আর শিবশম্ভু চটপট তৈরি হয়ে নিল।

"এখান থেকে চৌরঙ্গি রোড ধরে ভিক্টোরিয়া, তারপর পশ্চিমে বেঁকে রেস কোর্সের দক্ষিণ দিয়ে ট্রামলাইন পেরিয়ে প্রিনসেপ ঘাট। সেখান থেকে গঙ্গা ধরে উত্তরে, তারপর বেঁকে মোহনবাগান মাঠের পাশ দিয়ে নেতাজি স্ট্যাচু ঘুরে আবার এখানে।" কমল দৌড়ের পথ ছকে দিল রওনা হবার আগে। ওরা ঘাড় নাড়ল।

চৌরঙ্গি দিয়ে দৌড়বার সময় একটা বাস থেকে লাফিয়ে নামল ভরত। ওরা থমকে দাঁড়াল।

"কমলদা, আপনারা বেরিয়ে পড়েছেন, আমিও তো প্র্যাকটিস করব বলে এলুম।"

"ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আসছি। তুই রেডি হয়ে থাক।"

ওরা চারজন আবার ছুটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ ছোটার পর কমল পাশে তাকিয়ে স্বপনকে বলল, "সাত-বারো কত হয় রে?"

বিস্ময় ফুটে উঠল স্বপনের মুখে। ছুটতে ছুটতে এ কী বেয়াড়া প্রশ্ন! ক্লাস এইটে ফেল করার পর স্বপন আর স্কুল-মুখো হয়নি এবং মাথা খাটানোর মতো কোনও ঝঞ্ঝাটে ব্যাপারে ব্যস্ত হয়নি। কমলের প্রশ্নের জবাব দিতে সে বিড়বিড় করে সাতের ঘরের নামতা শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর স্বপন বলল, "চুরোআশি।"

"দেশ কোথায় ছিল, যশোরে?"

স্বপন একগাল হাসল।

ওরা ছুটতে ছুটতে রবীন্দ্রসদন পার হয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পিছন দিয়ে পশ্চিমে চলেছে। কমল এবার রুদ্রকে বলল, "পাখি সব করে রব—পদ্যটা মুখস্থ আছে?"

"না, পড়িনি।"

"পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে?"

"মুখস্থ নেই।"

"এগারোর উপপাদ্য কিংবা ভারতের জলবায়ু মনে আছে? তুই তো গত বছর বিকম পরীক্ষা দিয়েছিস, বল তো।"

ছুটতে ছুটতে রুদ্রর ভুরু কুঁচকে গেল। প্রাণপণে সে মনে করার চেষ্টা শুরু করল। কমল তখন শিবশম্ভুকে কর্মধারায় ও দ্বিগু সমাসের ধাঁধায় ফেলে স্বপনকে একটি সহজ মানসাঙ্কের জট ছাড়াতে দিল। কমল ট্রেনিংয়ের অঙ্গ হিসাবে মাথার কাজ শরীরের খাটুনি একসঙ্গে করার এই পদ্ধতিটা শিখেছে পল্টুদার কাছে। তাকে দিয়ে তিনি এই ভাবে কাজ করাতেন। কমল নিষ্ঠার সঙ্গে বরাবর তা পালন করে এসেছে। পল্টুদা বলতেন, শরীর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন মাথাও আর কাজ করতে পারে না। ফুটবলে মাথা খাটাতে হয় ক্লান্তির মধ্যেও। সেইজন্যে ব্রেনটাকে তৈরি করতে হয়, তারও ট্রেনিং লাগে। যখন দৌড়বি তখন মাথাকে অলস রাখবি না কখনও।

গঙ্গার ধার দিয়ে ছোটার সময় মালভর্তি লরি যেতে দেখে কমল বলল, "তাড়া কর লরিটাকে, দেখি কে ধরতে পারে।"

চারজনে একসঙ্গে স্প্রিন্ট শুরু করল। প্রায় সত্তর মিটার দৌড়ে লরিটাকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে ওরা দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। একটা বাস ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কমল হঠাৎ বলল, "স্বপন, এটাকে ধর।"

হকচকিয়ে স্বপন বলল, "আবার?"

"কুইক।"

স্বপন প্রাণপণে ছুটে পঁচিশ মিটার যেতেই কমল চেঁচিয়ে তাকে দাঁড়াতে বলল। এই ভাবে রুদ্র ও শিবশম্ভুকেও আচমকা সে ছুটতে বলল বাস বা লরির পিছনে পালা করে। এরপর ওরা আবার ছুটতে শুরু করল। কমল তিনজনের আগে দৌড়চ্ছে। ইডেনের কাছে এসে কমল বলল, "চল, গাছে চড়ি।"

একটা জামরুল গাছ বেছে নিয়ে কমল বলল, "কে আগে চড়ে ওই ছড়ানো ডালটা ধরে ঝুলে নীচে লাফিয়ে পড়তে পারে!"

চারজন একসঙ্গে গাছটাকে আক্রমণ করল। স্বপন ধাক্কা দিয়ে কমলকে ফেলে দিয়ে সবার আগে গাছে উঠল, তারপর রুদ্র। শিবশম্ভুর পর কমল যখন গাছে উঠে ডালের প্রান্তে পৌঁছে প্রায় বারো ফুট উঁচু থেকে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন স্বপন কাঁচুমাচু মুখে কমলকে কিছু বলার জন্য এগোতেই সে হেসে বলল, "ঠিক আছে, খেলার সময়ও ওই রকম শ্যোলডার চার্জ করবি।"

শোভাবাজারের মাঠে ওরা যখন পৌঁছল, ভরত তখন শূন্যে উঁচু করে বল মেরে দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে মাথার উপর থেকে বল ধরা প্র্যাকটিস করছিল একা একাই। ওদের দেখে সে চেঁচিয়ে বলল, "আমাকে কেউ একটু প্র্যাকটিস দিয়ে যাও।"

"হবে হবে, আগে একটু জিরোতে দে।" কমল এই বলে ঘাসের উপরে শুয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই পর্যন্ত সে প্রায় দশ-বারো মাইল ছুটেছে। ফুটবল মরশুমের মাঝামাঝি এমন পরিশ্রমী ট্রেনিং কেউ করে না।

ঘণ্টা দেড়েক বল দেওয়া, বল ধরা, দুজনের বিরুদ্ধে একজনের ট্যাক্‌লিং হেডিং এবং শুটিং-এর পর কমলের খেয়াল হল, অফিস যেতে হবে। অফিস থেকে শুধু বেরিয়ে যাওয়ারই নয়, এখন থেকে অফিসে হাজিরা দেওয়ার সময় সম্পর্কেও তাকে সাবধান হতে হবে। তা ছাড়া ছেলেগুলো পরশু খেলবে মহমেডানের সঙ্গে। এখন আর খাটানো ঠিক হবে না। কমল টেন্টেই স্নান করে, ক্যান্টিনে ভাত খেয়ে হেঁটেই অফিস রওনা হয়ে গেল।

দুপুরে নতু সাহা তাকে জানাল, কাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে খেলা আছে। কমল বলল, "শরীর খারাপ, খেলব না।"

গম্ভীর হয়ে নতু সাহা চলে গেল।

॥ বারো ॥

যুগের যাত্রীর পনেরোটা ম্যাচ খেলে আঠারো পয়েন্ট। মোহনবাগানের চৌদ্দটি খেলায় চব্বিশ, ইস্টবেঙ্গলের চৌদ্দটি খেলায় ছাব্বিশ, মহমেডানের পনেরোটি খেলায় পঁচিশ পয়েন্ট। আর শোভাবাজারের ষোলোটি খেলায় ছয় পয়েন্ট। লিগের প্রথমার্ধ শেষ হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে ময়দানে গুলতানি শুরু হয়ে গেছে—দ্বিতীয় ডিভিশনে শোভাবাজার অবধারিত নামছে। বালী প্রতিভা, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, জর্জ টেলিগ্রাফ, কালীঘাট দু-তিন পয়েন্টে শোভাবাজারের উপরে।

যুগের যাত্রীর সঙ্গে লিগের প্রথম খেলার আগের দিন, অফিসের লিফ্‌টে ওঠার

জন্য কমল যখন দাঁড়িয়ে, পিছন থেকে একজন বলল, "কমলবাবু, কাল খেলছেন তো?"

গলার স্বরে চাপা বিদ্রূপ বিচ্ছুরিত হল। কমল জবাব দিল না। প্রশ্নকারী তাতে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এবার রেগে বলল, "আরে মশাই, যেটুকু নাম এখনও লোকে করে সেটা ডুবিয়ে কোনও লাভ আছে? অনেক তো খেললেন সারা জীবনে।"

লিফ্টের দরজা খুলে গেল। লাইন দেওয়া লোকেরা ঢুকল, তাদের সঙ্গে কমলও। দরজা বন্ধ হবার সময় সে শুনতে পেল, লাইনে দাঁড়ানো প্রশ্নকারী সকলকে শুনিয়ে বলছে, "বুঝলেন, এরাই ফুটবলের ইজ্জৎ নষ্ট করে।"

টিফিনের সময় কমল নিজের চেয়ার থেকে উঠল না। আবার কে তাকে শুনিয়ে বিদ্রূপাত্মক কথা বলবে কে জানে। একমনে মাথা নিচু করে সে কাজ করে চলেছে। চমকে উঠল যখন তার সামনে একটা লোক হাজির হয়ে বলল, "কমল, আছ কেমন?"

মুখ তুলে কমল দেখল, যুগের যাত্রীর তপেন রায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল, একশো টাকা ধার নেওয়ার কথাটা—মুখটা পাংশু হয়ে গেল।

"খেলাটেলা কেমন চলছে, শুনলুম, দারুণ প্র্যাকটিস করছ?" চেয়ার টেনে বসতে বসতে তপেন রায় বলল।

"তপেনদা, আপনার টাকাটা এখনও দিতে পারিনি, এবার মাইনে পেলেই দিয়ে দেব।"

"টাকা! কীসের টাকা?" তপেন রায় আকাশ থেকে পড়ল।

কমল আরও কুণ্ঠিত স্বরে বলল, "মনে আমার ঠিকই আছে, তবে একবারে একশোটা টাকা দেওয়ার সামর্থ তো নেই।"

তপেন রায় কিছুক্ষণ কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যেন অতি কষ্টে মনে করতে পারল। তারপর বলল, "ও হো, সেই টাকাটা! আমি তো ভুলেই গেছলুম। আরে দূর, ওটা তোমার ফেরত দিতে হবে না।" তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "যাত্রীর কাছে কত টাকা তুমি পাও, সেটা তো আমি ভাল করেই জানি। তোমায় ঠকিয়েছে কী ভাবে তার সাক্ষী আমি ছাড়া আর কে! এ টাকা তো আর মামলা করে যাত্রী আদায় করতে পারবে না। যা পেয়েছ তাই নিয়ে নাও।"

মুহূর্তে কমল সাবধান হয়ে গেল। এতদিন ফুটবল খেলে সে মাঠের লোকেদের চিনেছে। হঠাৎ তপেন রায়ের আবির্ভাব এবং খুবই বন্ধুর মতো কথাবার্তা তার ভাল লাগল না। সে সতর্ক স্বরে বলল, "তারপর, কী মনে করে হঠাৎ...।"

"বলছি।" তপেন রায় সিগারেট বার করল, ধরাল এবং প্রথম ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "যুগের যাত্রীকে কমল গুহ যে সার্ভিস দিয়েছে তা ভোলার নয়। কিন্তু যাত্রী তার বিনিময়ে তাকে কী দিয়েছে? কিছুই নয়। এই নিয়ে ক্লাবে অনেকে অনেক কথা বলেছে। কমিটি মিটিং ডাকা হয়েছিল। ঠিক হয়েছে, তোমাকে এবারের লিগের শেষ খেলার দিন মাঠেই পাঁচ হাজার টাকার চেক দেওয়া হবে।"

"যাত্রীর সঙ্গে লিগের শেষ খেলা কিন্তু শোভাবাজারের।"

"তাই না কি! তা হলে তো ভালই। কিন্তু সবার আগে তোমার অনুমতি চাই, তুমি গ্রহণ করবে কি না। অবশ্য বলে রাখছি, পরশু দিনই কমিটির একটা মিটিং আছে, ব্যাপারটা তখনই পাকাপাকি ঠিক করা হবে।"

কমল একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল তপেন রায়ের চোখ দুটি। অতি সরল। ভিতর থেকে আন্তরিকতা ঠিকরে বেরোচ্ছে। কমল মনে মনে হেসে বলল, "কাল যাত্রীর সঙ্গে খেলার পর আপনাকে জানাব।"

"কাল তুমি খেলছ না কি?"

"হ্যাঁ।"

তপেন রায় ঘন ঘন সিগারেটে টান দিয়ে কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল, "এই বাজারে পাঁচ হাজার টাকার দাম কম নয়। বলতে গেলে এক রকম পড়েই পাওয়া। মাথা গরম করে হারিয়ো না এটা। যাত্রী তো নাও দিতে পারে, তবু দেবে বলে মনস্থ করেছে। এতে তোমাকে যেমন সম্মান দেওয়া হবে, তেমনি যাত্রীর উপরও প্লেয়ারদের কন্‌ফিডেন্স আসবে, তাই নয় কি?"

কমল ঘাড় নাড়ল।

"এখনকার ক্লাবগুলো যা হয়েছে, বুঝলে কমল, একেবারে নেমকহারাম। প্লেয়াররাও সেই রকম। পয়সা ছাড়া মুখে কোনও কথা নেই। কিন্তু যাত্রী তো সেরকম ক্লাব নয়। প্লেয়ারদের সঙ্গে আত্মার সম্পর্কে না থাকলে ক্লাব চলে না।" তপেন রায় আবেগ চাপতে গিয়ে চুপ করল! কমল কথা বলল না।

"তা হলে তুমি এখন বলবে না টাকা নিতে রাজি কি না?"

"না। কাল খেলার পর এ নিয়ে ভাবব।"

তপেন রায় চলে যাবার পর বিপুল ঘোষ গলা বাড়িয়ে বলল, "পাঁচ হাজার টাকা! ব্যাপার কী?"

"পরীক্ষা দিলাম। স্টপার খেলি, নানান দিক থেকে আক্রমণ আসে। এটাও একটা।"

"তার মানে?"

"আমরা সবাই তো স্টপার ঘোষদা, কেউ মাঠের মধ্যে, কেউ মাঠের বাইরে। ঠেকাচ্ছি আর ঠেকাচ্ছি। এটাও ঠেকালাম—লোভকে। ঘুষ দেবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল লোকটা। কাল ওদের টিমের সঙ্গে খেলা। আমাদের মজুমদার সাহেবের টিম। এবছর লিগ চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য খেলছে, ভালই খেলছে। হয়তো হয়েও যাবে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হবার পথে যাতে একটিও কাঁটা না থাকে সেই ব্যবস্থা করতে এসেছিল। আমাকে ওরা একটা কাঁটা ভাবে।"

"ঘুষ দিয়ে? না না মশাই, কাল আপনি ভাল করে খেলুন। দারুণ খেলুন। আচ্ছা করে জব্দ করে দিন।"

কমল দেখল, বিপুল ঘোষের সারা মুখ আন্তরিকতায় কোমল ও উজ্জ্বল।

"কাল অফিসে আসছেন তো?" দূর থেকে রণেন দাস প্রশ্ন করল।

"কেন?" কমল সচকিত হয়ে বলল।

"সেটা আপনি ভালই জানেন। তবে বলে রাখছি, পাঁচটার আগে আপনাকে আমি ছাড়তে পারব না।"

"জানি আমি। তবে কাল আমি ক্যাজুয়াল নিচ্ছি।"

অফিস ছুটির পর শোভাবাজার টেন্টে আসা মাত্র কৃষ্ণ মাইতি হাত ধরে বলল, "গুলোকে শিক্ষা দিতে হবে কমল। ব্যাটা টাকা মেরেছে কাজ হাসিল করে নিয়ে। পয়েন্ট চাই-ই চাই। তুই কিন্তু প্রধান ভরসা। ক্লাবের সবাই তোকে খেলানোর এগেন্স্টে, আমি জোর করে বলেছি, কমলকে খেলাতেই হবে।"

নার্ভাস বোধ করল কমল। বিব্রত স্বরে বলল, "কিন্তু কেষ্টদা, একা আমার ওপর এতটা ভরসা করবেন না, করা উচিত নয়। ফুটবল একজনের খেলা নয়।"

"তুই একাই এগারোজন হয়ে খেলতে পারিস, যদি মনে করিস খেলব। তা ছাড়া—মনে আছে সেই চাকরির কথাটা, পল্টু মুখুজ্যের মেয়ের চাকরি। যদি কাল একটা পয়েন্ট আনতে পারিস, গ্যারান্টি দিচ্ছি চাকরিটা হবে।"

কমল তর্ক করে কথা বাড়াল না। হঠাৎ সে ক্লান্ত বোধ করতে শুরু করল। অনেক কিছু নির্ভর করছে কালকের খেলার উপর। এখন যার সঙ্গেই দেখা হবে, সে মনের উপর একটা দায়িত্বের পাথর চাপিয়ে দেবে। কমল চেয়ার নিয়ে টেন্টের বাইরে বেড়ার ধার ঘেঁষে বসল।

ভরত এসে বলল, "কমলদা, একটা কথা বলার ছিল। খুবই জরুরি, কিন্তু এখানে বলব না। আপনি বাইরে আসুন, মিনিট পাঁচেক পর আমি টাউন ক্লাব টেন্টের সামনে থাকব।"

এই বলেই ভরত হনহন করে বেরিয়ে গেল। অবাক হয়ে কমল চারপাশে তাকাল। ক্যান্টিনের কাছে সত্য আর দেবীদাস হাসাহাসি করছে। স্বপন একটু আলাদা দাঁড়িয়ে ঘুগনি খাচ্ছে। টেন্টের মধ্যে যথারীতি টেবিল ঘিরে গুলতানি। ভরতের কী এমন কথা থাকতে পারে যা একান্তে বলা দরকার!

কমল টাউন টেন্টের কাছে পৌঁছতেই অপেক্ষমাণ ভরত বলল, "কমলদা, আমাদের দুজন কাল গট আপ হয়েছে।"

শোনামাত্র কমল জমে গেল। "গট আপ! কারা?"

"আজ সকালে যাত্রীর লোক এসেছিল আমার বাড়িতে। সঙ্গে ছিল শম্ভু। টেরিলিন স্যুট করে দেবে যাত্রী। শম্ভু আর সত্য গোলাম আলিতে মাপ দিয়ে এসেছে।"

"তুই গেলি না?"

ভরত শুধু হাসল। কমলও হাসল। তারপর ভরতের পিঠ চাপড়ে বলল, "এখন কাউকে বলিসনি এসব কথা। আগে খেলাটা হোক।"

"সলিলের কিছু খবর জানেন, আসে না কেন? ও থাকলে খানিকটা সামলানো যেত।"

"সলিল একটা কাজ পেয়েছে, খেলার জন্য আর সময় পায় না। হয়তো আর কোনও দিনই পাবে না। কিন্তু ভরত, বাটার সঙ্গে খেলার মতো অবস্থা কাল যেন হবে

মনে হচ্ছে।"

"কী জানি!" অনিশ্চিত স্বরে ভরত বলল, "আমাদের আর একটা ছেলেও নেই যাকে নামানো যায়। নইলে কেষ্টদাকে বলে সত্য আর শম্ভুকে বসিয়ে দেওয়া যেত।"

ম্লান হেসে কমল বলল, "তা হলে কাল ভাগ্যের উপরই ভরসা করতে হবে।"

"হ্যাঁ, ভাগ্যের উপরেই।"

॥ তেরো ॥

যুগের যাত্রী ৫—০ গোলে শোভাবাজারকে হারাল।

অন্ধকার ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে কমল শুয়ে। অ্যালার্ম ঘড়ির টিকটিক শব্দ একটানা তার মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘা মেরে চলেছে। কমল হাত দিয়ে দু'কান চেপে অস্ফুটে কাতরাল। এখনও কানে বাজছে ভয়ঙ্কর চিৎকারগুলো। ঘড়িটা আছড়ে ভেঙে ফেলা যায়, কিন্তু পাঁচটা গোলের চিৎকার।

গ্যালারির মাঝখানের সরু পথ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় উপর থেকে তার মাথায় থুথু পড়ে, ইটের টুকরো লাগে পিঠে। একটা চিৎকারও শুনেছিল, "কী রে কমল, অনুপমকে আটকাতে পারিস বলেছিলি না!"

আজ অনুপম তিনটি গোল দিয়েছে। তবে হ্যাটট্রিক হয়নি। কমল বিছানায় বার কয়েক কপাল ঠুকল। অজান্তে একটা গোঙানি মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"কী গো কমল, যাত্রীর জার্সিকে ভয়ে কাঁপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা এবার ছাড়ো।"

গুলোদার হাসিখুশি মুখ আর চিবিয়ে চিবিয়ে বলা কথাগুলো যেন বিছানার মধ্যে থেকে উঠে আসছে। বিছানাটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে একশা করা যায়, কিন্তু কথাগুলোকে।

"আমি কী করব, যিনি টিম করেছেন তাঁকে গিয়ে বলুন। বুড়ো প্লেয়ার দিয়ে যদি ফুটবল খেলাতে চান তা হলে খেলান। বলিহারি শখ! নিজেরও তো একটা আক্কেল-বিবেচনা থাকে।" সরোজ খেলা শেষে মাঠের উপর দাঁড়িয়ে একজনকে যখন কথাগুলো বলছিল, কমল মুহূর্তের জন্য দেখেছিল চাপা তৃপ্তির আমেজ তার চোখে মুখে ছড়িয়ে রয়েছে।

খেলার শেষ বাঁশি বাজতেই ভরত ছুটে গিয়ে মাঠের মধ্যেই শম্ভুকে চড় কষায়। শম্ভু লাথি মারে ভরতকে। দু'জনকে যখন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন চিৎকার করে শম্ভু বলে, "গোল কি আমার দোষে হয়েছে? ওই লোকটা, ওই লোকটার জন্য।"

শম্ভুর আঙুল একটা ছোরার মতো উঠে কমলকে শিকার করে। কোনও দিকে না তাকিয়ে কমল মাঠ থেকে বেরিয়ে আসে।

"এত ভরসা করেছিলুম তোর ওপর। আমায় একেবারে ডুবিয়ে দিলি।" কেষ্টদার হতাশ এবং বিরক্ত কণ্ঠস্বরে কমলের চকিতে মনে পড়েছিল, অরুণার চাকরিটা বোধ হয় হল না!

মুখ দেখাবার উপায় কোথাও আর রইল না। বাটার সঙ্গে খেলাটাই আবার অনুষ্ঠিত হল। তবে যাত্রী আরও দক্ষ, আরও কঠিন এবং উদ্দেশ্যপরায়ণ। কমল চোখ

বুজে এখনও দেখতে পাচ্ছে, অনুপম আর প্রসূন তার দু'পাশ দিয়ে ঢুকছে আর ফাঁকা মাঝ মাঠ দিয়ে বল নিয়ে উঠে আসছে যাত্রীর রাইট ব্যাক। স্বপন আর রুদ্র কোন দিকে কাকে আটকাবে ভেবে পাচ্ছে না। কমল স্থির করেছিল আজ সে অনুপমকে রুখবে। কিন্তু অনুপমের পাশাপাশি প্রসূন সব সময় ছিল তাকে ধাঁধায় ফেলার জন্য। যেখানেই বল প্রসূন সেখানে তার দলের খেলোয়াড়ের পাশে গিয়ে হাজির হয়েছে। শোভাবাজারের একজনের সামনে যাত্রীর দু'জন ফরোয়ার্ড সব সময়ই। লোক পাহারা দেবে না জমি আগলাবে কমল এই সমস্যা সমাধান করতে পারেনি লোকের অভাবে। এবং কেন এই অভাব ঘটল এক মাত্র সে আর ভরত তা জানে।

কিন্তু সেকথা এখন বললে লোকে বলবে সাফাই গাইছে। উপায়ও নেই, মুখ দেখাবার কোনও উপায় আর রইল না। বিদ্রূপ আর ইতর মন্তব্য শুনতে হবে বহুদিন। কমল বিছানায় মুখটা চেপে ধরে থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করল।

হঠাৎ ঘরের আলোটা কে জ্বালল। কমল ছিটকে উঠে বসল।

"কমলদা, আমি এসেছি।" ঘরের মধ্যে সলিল দাঁড়িয়ে। মুখে লাজুক বিব্রত হাসি।

"কেন?"

"শুনলুম আজ পাঁচ গোলে শোভাবাজার হেরেছে।"

কথা না বলে কমল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

"আমি খেলব কমলদা। আমি আর বাড়িতে ফিরব না। কাজ আমি করতে চাই না, আমি খেলতে চাই। আমাকে শুধু দু'মুঠো খেতে দেবেন আর একটু ঘুমোবার জায়গা।"

উঠে দাঁড়াল কমল।

"আমি বাড়ির জন্য আর ভাবব না। ওদের বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি—"

এরপরই সলিল পেটটা চেপে ধরে ছিটকে দেয়ালে আছড়ে পড়ল কমলের লাথি খেয়ে।

"কী জন্য এসেছিল এখানে! রাসকেল, করুণা দেখাতে এসেছিস? পাঁচ গোল খেয়েছি বলে সাহায্য করতে এসেছিস? ফুটবল খেলে আমায় উদ্ধার করতে এসেছিস?" বলতে বলতে কমল আবার লাথি কষাল। সলিল কাত হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। তার পিঠে কোমরে মাথায় কমল পাগলের মতো এলোপাথাড়ি লাথি মারতে শুরু করল। চুল ধরে টেনে তুলে মুখে ঘুষি মারল।

"আমার মারবেন না কমলদা, আমি চলে যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি।" সলিল উঠে বসতেই কমল ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল।

"কেন এসেছিস, বল কেন এসেছিস?"

সলিল হাঁ করে মুখটা তুলে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে, নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে আর চোখ বেয়ে জল। ও বলার আগেই দরজার কাছে অমিতাভ বলে উঠল, "ছাড়ুন, ওকে ছাড়ুন।"

দ্রুত ঘরে ঢুকে সে সলিলের চুল-ধরা কমলের হাতে ধাক্কা দিল।

"তোমার কী দরকার এখানে?"

"আপনি এভাবে মারছেন কেন ওকে?"

"আমি যা করছি তাতে তোমার নাক গলাতে হবে না।"

"একজনকে এভাবে মারবেন আর তাই দেখে বাধা দেব না? দেখুন তো কী অবস্থা হয়েছে ওর! জানোয়ারকেও এভাবে মারে না।"

"না না, কমলদা আমায় মারেননি।" সলিল দু'হাত তুলে অমিতাভর কাছে আবেদন জানাল ঘড়ঘড়ে স্বরে। "কমলদা আমায় কখনও মারেন না, শুধু আমায় শাস্তি দেন।"

"চুপ করো তুমি।" অমিতাভ ধমক দিল সলিলকে। তারপর ঝুঁকে তার শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে সলিলের কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল। "এসো আমার ঘরে, মুখ ধুইয়ে মলম লাগাতে হবে।"

অমিতাভ বেরিয়ে যাবার সময় থমকে একবার কমলের দিকে তাকাল। অদ্ভুত একটা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে কমলের মুখে ফুটে উঠেছে দীনতার ছাপ। বয়সটা যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। কমল কুঁজো হয়ে ধীর গতিতে এসে খাটের উপর বসল। শূন্য দৃষ্টিতে সলিলের দিকে তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্কের মতো চুলে আঙুল চালাতে লাগল।

সলিল ওঠবার চেষ্টা করে যন্ত্রণায় কাতরে উঠে পেট চেপে বসে পড়ল। আবার চেষ্টা করল ওঠবার। আবার বসে পড়ল। অসহায়ভাবে কমলের দিকে তাকাল। একদৃষ্টে কমল তার দিকে তাকিয়ে, চোখে কোনও অভিব্যক্তি নেই।

"আপনার মাথায় দাগটা এখান থেকেও আমি দেখতে পাচ্ছি কমলদা।"

কমল নিরুত্তর রইল। সলিল হাসবার চেষ্টা করল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কমল চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর অমিতাভ ঘরে ঢুকে মৃদু স্বরে বলল, "আপনি শুয়ে পড়ুন।"

কমল মুখ তুলে কিছুক্ষণ ধরে অমিতাভর মুখের উপর চোখ রাখল। ক্রমশ সংবিৎ ফিরে এল তার চাহনিতে। মুখ দুমড়ে গেল বেদনায়। ফিসফিস করে সে বলল, "আমি শেষ হয়ে গেলাম!"

অমিতাভ আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

॥ চৌদ্দ ॥

পরদিন থেকে কমল যেন বদলে গেল। চেহারায় এবং মনেও। অফিসে সারাক্ষণ নিজের চেয়ারে থাকে। কথা বলে না প্রয়োজন না হলে। ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে আসে। গড়ের মাঠের পথ আর মাড়ায় না। অফিসে অরুণা ফোন করেছিল। কমল কথা বলেনি। বিপুল ঘোষকে সে বলতে বলে, 'অফিসে আসেনি, জানিয়ে দিন।'

কমল যতটা ভেবেছিল তেমন কোনও বিদ্রূপ অফিসে বা অন্য কোথাও তাকে শুনতে হয়নি। সবাই যেন ধরেই নিয়েছে এমনটিই হবে। ওর মনে হয়, এই রকম

ঔদাসীন্যের থেকে বরং বিদ্রূপই ভাল ছিল। মাসের মাইনে পেয়েই সে রথীনের ঘরে গিয়ে একশো টাকার নোট টেবিলে রেখে বলে, "ধার নিয়েছিলাম, সেই টাকাটা।"

"ধার! আমি তো দিইনি। যে দিয়েছে তাকে দিয়ে এসো।" রথীন কমলের দিকে আর না তাকিয়ে কাজে মন দেয়।

কমল দ্বিধায় পড়ে। অফিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভেবে সে স্থির করে, তপেন রায়ের হাতেই টাকাটা দিয়ে আসবে। ছুটির পর সে যাত্রীর টেন্টের দিকে রওনা হয়। যখন পৌঁছল, যাত্রীর প্লেয়াররাও ঠিক তখনই এরিয়ান মাঠ থেকে ফিরল বি এন আর-কে ২—০ গোলে হারিয়ে। প্রায় শ'খানেক লোক হইচই করছে টেন্টের মধ্যে ও বাইরে। কমল একধারে দাঁড়িয়ে খুঁজতে লাগল তপেন রায়কে।

"আরে কমলবাবু, ইখানে দাঁড়িয়ে!" ক্লাবের বুড়ো মালী দয়ানিধি কমলকে দেখে নমস্কার করে এগিয়ে এল।

"তপেনবাবুকে খুঁজছি, কোথায় বলতে পারো?"

"ভিতরে আছে বোধ হয়, যান না।"

ইতস্তত করে কমল ভিতরে গেল।

তপেন রায় কয়েকটি ছেলের পথ আটকে প্লেয়ারদের ড্রেসিংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছে, "না না, এখন নয়। ওরা এখন টায়ার্ড। এখন কোনও কথাবার্তা নয়।"

কমল এগিয়ে গেল। তাকে দেখে তপেন রায় অবাক হয়েও স্বাভাবিক স্বরে বলল, "কী খবর কমল?"

"একটু দরকার ছিল।"

"দেখছ তো কী অবস্থা, এখান থেকে নড়ার উপায় নেই, যা বলার বরং এখানেই বলো।"

কমল নোটটা পকেট থেকে বার করে এগিয়ে ধরে বলল, "টাকাটা দিতে এসেছি।"

তপেন রায় কী ভেবে নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বলল, "ও টাকা তুমিই রাখো। এত বছর যাত্রীতে খেলে গেলে—ট্রফিফ্রফি তো কিছুই ক্লাবকে দিতে পারোনি, টাকা ফেরত দিয়ে ক্লাবের কী আর এমন উপকার করবে? এবছর যাত্রী লিগ পাচ্ছেই, শুধু বড় টিম দুটোর সঙ্গেই আসল যা খেলা বাকি; তারপর শুধু বাজিই পুড়বে দশ হাজার টাকার। একশো টাকার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।"

শুনতে শুনতে কমলের পা দুটো কেঁপে উঠল। মাথার মধ্যে লক্ষ গোলের চিৎকার। তবু ঠাণ্ডা গলায় বলল, "বাজি পোড়ানো দেখতে আমি আসব। কিন্তু টাকা আপনাকে ফেরত নিতে হবে। যাত্রীর কাছে আমি ঋণী থাকব না, থাকতে চাই না।"

ওদের ঘিরে বহু লোকের ভিড় জমে গেছে। গুলোদা এই সময় টেন্টে ঢুকল। ভিড় দেখেই কৌতূহলভরে এগিয়ে এল।

"ব্যাপার কী? আরে কমল যে!"

"এক সময় দরকারে টাকা নিয়েছিলুম। ফেরত দিতে এসেছি, কিন্তু তপেনদা

নিচ্ছেন না।"

"সেই টাকাটা গুলোদা, আপনিই তো বলেছিলেন দরকার নেই ফেরত নেবার।" তপেন রায় মনে করিয়ে দিল ব্যস্ত ভঙ্গিতে।

"অ। দিতে চায় যখন নিয়ে নাও তবে," গুলোদা অতি মিহি স্বরে বলল, "যাত্রীর শেষ খেলা শোভাবাজারের সঙ্গে, যদি কমল কথা দেয় সেদিন খেলবে না, তা হলেই ফেরত নেব।"

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলল, "খেললেই বা কমল গুহ, যাত্রী এবার দশ গোল ভরে দেবে শোভাবাজারকে।"

স্মিত মুখে গুলোদা বলল, "সেইজন্যই তো বলছি, কমলের মতো এতবড় প্লেয়ারের টিম দশ গোল খাচ্ছে, এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না। এটা যাত্রীর পক্ষেও বেদনাদায়ক হবে। হাজার হোক এক সময় কমল তো যাত্রীর-ই ছিল।"

"ঠিক ঠিক, গুলোদা ঠিক বলেছেন।" ভিড়ের মধ্যে একজন মাথা নেড়ে বলল, "কমলদা, আপনি কিন্তু সেদিন খেলতে পারবেন না। আপনার ইজ্জতের সঙ্গে যাত্রীর ইজ্জতও জড়িয়ে আছে।"

পাংশু কালো মুখ নিয়ে কমল হাসল। এরা আজ অপমান করার জন্য পন্থা নিয়েছে করুণা দেখাবার। ওর ইচ্ছে করল নোটটা টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠতে—আমি এখনও শেষ হয়ে যাইনি, যাইনি। ঠিক তখনই কমলের বুকের মধ্যে এক বৃদ্ধের কণ্ঠ ফিসফিস করে উঠল—ব্যালান্স, কমল, ব্যালান্স কখনও হারাসনি।

ম্লান চোখে কমল সকলের মুখের উপর দিয়ে চাহনি বুলিয়ে ধীর স্বরে বলল, "টাকাটা ফেরত নিন। আমার আর খেলার ইচ্ছে নেই।"

নোটটা তপেন রায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে কমল বেরিয়ে এল যাত্রীর টেন্ট থেকে। মাথার মধ্যেটা অসাড় হয়ে গেছে। হাঁটু দুটো মনে হচ্ছে মাখনে তৈরি, এখনি গলে গিয়ে তাকে ফেলে দেবে। বুকের মধ্যে দপদপ করে জ্বলে উঠতে চাইছে শোধ নেবার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা। যে বিমর্ষতা, হতাশা তাকে এই ক'দিন দমিয়ে রেখেছে, সেটা কেটে গিয়ে এখন সে অপমানের জ্বালায় ছটফট করে উঠল। উদ্দেশ্যহীনের মতো ময়দানের মধ্য দিয়ে এলোপাথাড়ি হাঁটতে হাঁটতে কমল কখন যে শোভাবাজার টেন্টে পৌঁছে গেছে খেয়াল করেনি। ডাক শুনে তাকিয়ে দেখল, ভরত আর সলিল ক্যান্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে। ভরত এগিয়ে এল, সলিল এল না।

"আপনার কি অসুখ করেছে কমলদা? কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে। অনেক দিন আসেন না, ভেবেছিলুম আপনার বাড়িতে যাব।"

প্রশ্নটা এড়িয়ে কমল বলল, "ক্লাবের খবর কী, বল।"

"খবর আর কী, যা হয়ে থাকে প্রতি বছর তাই হচ্ছে। তিনটে ড্র করে তিন পয়েন্ট ম্যানেজ হয়েছে, তবু এখনও ভয় কাটেনি।" ভরত বিপন্ন হয়ে বলল, "ভাল লাগে না কমলদা। এইভাবে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার কোনও মানে হয় না।"

"সলিল কি খেলছে?"

"কেন, আপনি জানেন না! ও তো লাস্ট চারটে ম্যাচে খেলেছে, বেশ ভাল খেলছে। ইস্টবেঙ্গলের দিন হাবিবকে নড়াচড়া করতে দেয়নি। সব কাগজে ওর কথা লিখেছে।"

"তাই নাকি, আমি কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি। আর কী খবর আছে?"

"আর যা আছে সেটা খুব মজার। সত্য আর শম্ভু তো গোলাম আলিতে স্যুটের মাপ দিয়ে এসেছিল। সাত দিন পর ট্রায়াল দিতে গিয়ে শোনে, গুলোদা টেলিফোন করে আগেই জানিয়ে রেখেছিল, তার অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত কাঁচি ধরবে না, শুধু মাপটা নিয়ে রেখে দেবে। গুলোদা আর ফোন করেনি। শুনে সত্য আর শম্ভু তো ফুঁসছে, এভাবে বোকা বনে যাবে ওরা কল্পনাও করতে পারেনি। কথাটা কাউকে বলতেও পারছে না, কিল খেয়ে কিল চুরি করা ছাড়া ওদের আর উপায় নেই। এখন বলছে, রিটার্ন ম্যাচটায় যাত্রীকে দেখে নেবে।"

কমল ফিকে হাসল মাত্র কথাগুলো শুনে। বলল, "সরোজ কোথায়, প্র্যাকটিস কেমন চলছে?"

"কোথায় প্র্যাকটিস! সরোজদা তো প্রায় দশ দিন হল টেন্টই মাড়ায় না। শুনছি জামশেদপুর না দুর্গাপুরে চাকরি পেয়েছে। সলিল, স্বপন, রুদ্র, এরাই যা বল নিয়ে সকালে নাড়াচাড়া করে। সকালে এখন এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট ছাড়া আর সব বন্ধ করে দিয়েছে কেষ্টদা।"

"সলিল চাকরিটা করছে কি এখনও?"

"একদিন ওর বাবা এসেছিল খুঁজতে। সলিল কাজ ছেড়ে দিয়েছে, বাড়িতেও থাকে না। কোথায় থাকে কেউ জানে না। ওকে জিজ্ঞেস করেছি, ঠিকানা দেয়নি।"

"সলিলকে বলিস আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

কমল বাড়ি ফেরার জন্য রওনা হতেই ভরত মাথা চুলকে বলল, "সেদিনের পর থেকে আর আপনি মাঠে আসেন না।"

"হ্যাঁ, আর ভাল লাগে না। মাঠ থেকে এবার চলে যাওয়াই উচিত। আমার কোনও ফোন এসেছিল কি?"

"জানি না তো।"

॥ পনেরো ॥

বাড়ি ফিরেই কমল শুনল যে, কালোর মা গজগজ করে চলেছে, "বাইরের লোকের প্যান্ট আমি কেন কাচব? বাইরের লোকের খাওয়া এঁটো বাসন মাজতে হবে, এমন কথা তো বাপু ছিল না। মাইনে না বাড়ালে আমি আর বাড়তি কাজ করতে পারব না।" ইত্যাদি ইত্যাদি?

বাইরের লোকটা আবার কে?" কমল কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করে।

"কেন, দাদাবাবুর যে বন্ধুটি থাকে!"

"থাকে! দাদাবাবুর বন্ধু?"

"কেন, আপনি জানেন না?" কালোর মা বিস্ময়ে চোখ কপালে তোলার উপক্রম করতে কমল আর কথা বাড়াল না।

রাত্রে কমলের মনে হল, অমিতাভর ঘরে চাপা স্বরে কারা কথা বলছে। সকালে অমিতাভর ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করবার সময় খুঁটিয়ে ঘরের মধ্যে লক্ষ করে সে কিছুই বুঝতে পারল না। ভাবল, অমিতাভকে জিজ্ঞাসা করবে।

অফিসে বেরোবার সময় অমিতাভ তার কাছে কুড়িটা টাকা চাইল। এক সপ্তাহে চল্লিশ টাকা দিয়েছে, তাই কমল অস্বস্তিভরে বলল, "হঠাৎ এত ঘন ঘন টাকার দরকার হচ্ছে যে? আমি যা মাইনে পাই তাতে এভাবে চললে কুলিয়ে ওঠা তো সম্ভব হবে না।"

"এক বন্ধুর অসুখ, তাকে ওষুধ কিনে দেবার জন্য—" অমিতাভ ঢোঁক গিলে বলল।

"কালোর মা বলছিল তোমার এক বন্ধু নাকি এখানে খায়?"

"তিন-চার দিন খেয়েছে। আর খাবে না।"

টাকা দেবার সময় কমল বলল, "খাওয়ার জন্য আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।"

এরপর কমল লক্ষ করল, অমিতাভ যেন ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। গম্ভীর ভারিক্কি ভাবটা আর নেই, চলাফেরায় চঞ্চলতা দেখা যাচ্ছে, চেঁচিয়ে হঠাৎ গানও গেয়ে ওঠে, এমনকী একদিন সকালে উঠে চা তৈরি করে সে কমলকে ডেকে তুলেছে। কমল লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, "খেলা ছেড়ে দিয়ে দেখছি অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সকালের এক্সারসাইজটা আবার শুরু করতে হবে কাল থেকে।"

"আপনি খেলা ছেড়ে দিয়েছেন?" অবাক হয়ে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

কমল জবাব না দিয়ে বাজার রওনা হয়। সেইদিন শোভাবাজার টেন্টে গিয়ে সে শোনে, মহমেডানের সঙ্গে খেলায় বলাই ও অ্যামব্রোজ মারপিট করায় রেফারি দু'জনকেই মাঠ থেকে বার করে দিয়েছে, আর শ্রীধরের হাঁটুর পুরনো চোটটায় আবার লেগেছে, যার ফলে তার দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। টেন্টে সকলেরই মুখ শুকনো, দুশ্চিন্তায় কপালে কুঞ্চন। খেলার মতো এগারো জন প্লেয়ার এখন শোভাবাজারের নেই। সহসম্পাদক অবনী মণ্ডল ওকে দেখে ছুটে এসে বলে, "কমলবাবু, আপনার কাছেই যাব ভাবছিলুম! আপনাকে বাকি ম্যাচ তিনটে খেলতে হবে।"

"না।" কমল গম্ভীর স্বরে বলে, "আমি আর খেলব না।" তারপর সে টেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ে হতভম্ব অবনী মণ্ডলকে ফেলে রেখে।

অস্বস্তিপূর্ণ মন নিয়ে কমল বাড়ি ফিরল। শোভাবাজার এখন সত্যিই দুরবস্থায়। অথচ সে বলে এল খেলবে না। এই ক্লাব থেকেই সে গড়ের মাঠে খেলা শুরু করেছিল। ব্যাপারটা নেমকহারামির মতো লাগছে। ইচ্ছে করলে তিনটে ম্যাচ এখন সে অনায়াসে খেলে দিতে পারে। শেষ ম্যাচটা যাত্রীর সঙ্গে। গুলোদার বিদ্রূপভরা

কথাগুলো কমলের কানে বেজে উঠল। তপেন রায়ের হাতে একশো টাকার নোটটা দেবার আগে সে বলেছিল, আর খেলব না। তখন দাউদাউ আগুন জ্বলছিল মাথার মধ্যে। আর এখন শুধু ছাই হয়ে পড়ে আছে তার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাটা।

অমিতাভর ঘর অন্ধকার। কমল নিজের ঘরে ঢুকে জামাপ্যান্ট বদলে ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দিল আলো নিভিয়ে। কুড়ি বছরের খেলার জীবনের অজস্র কথা আর দৃশ্য মনের মধ্যে ভিড় করে ঠেলাঠেলি করছে। তার মধ্যে বার বার দেখতে পাচ্ছে পল্টুদাকে, শুনতে পাচ্ছে তাঁর গলার স্বর—"প্র্যাকটিসটা আরও ভাল কর। হতাশা আসবে, তাকে জয় করতেও হবে...তুই খেলা ছেড়ে দিবি বলছিস, তার মানে তুই বড় খেলোয়াড় হতে পারিসনি।"

না, পারিনি। কমল বার বার নিজেকে শোনাতে থাকে, পারিনি, পারিনি, আমি হতে পারিনি। আমার মধ্যে প্রশান্তি আসেনি। অনেক কিছুই অপূর্ণ রয়ে গেছে।

অমিতাভর ঘরের দরজা খোলার এবং আলো জ্বালানোর শব্দ হল। কমলের মনে পড়ল আজ সকালে সে স্কিপিং দড়িটা খুঁজে পায়নি। অমিতাভ কি কোনও কাজে নিয়ে গেছে তার ঘরে! জিজ্ঞাসা করার জন্য সে উঠল। আলো জ্বালল। চটি পরে 'অমিত' বলে ডেকে ঘর থেকে বেরোবার সময় তার মনে হল, পাশের ঘরে দ্রুত একটা ঘষড়ানির শব্দ হল। দ্রুত অমিতাভর ঘরের দরজায় পৌঁছে সে দেখল, খাটের নীচে কেউ ঢুকে যাচ্ছে, পলকের জন্য দুটি পা শুধু দেখতে পেল।

চোর! কমল থমকে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও চেঁচাল না। পা দুটো তার চেনা মনে হল। প্যান্টের যতটুকু দেখতে পেয়েছে, সেটাও খুব পরিচিত! সলিল!

দু'হাতে পাঁউরুটি নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে অমিতাভ থমকে তারপর আড়ষ্ট হয়ে গেল কমলকে খাটে বসে একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে দেখে।

"পাঁউরুটি! কেন, ভাত রান্না হয়নি?"

"আজ শরীরটা ভাল নয়, তাই—"

"এতগুলো? এ তো প্রায় দু'জনের মতো দেখছি!"

"কালকের জন্যও এনে রাখলুম।"

কমল গম্ভীর মুখে আবার কয়েকটা পাতা উলটিয়ে গেল। অমিতাভ সন্তর্পণে ঘরের চারধারে চোখ বুলিয়ে নিল।

"ফুটবল যারা খেলে তাদের তুমি ঘৃণা করো। যেমন আমায় করো।" কমল অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে, কিন্তু প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট ভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, "তোমার মা'র মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী ভেবে তুমি কখনও আমায় সহজভাবে নিতে পারেনি, বাপ-ছেলের স্বাভাবিক সম্পর্ক আমাদের যেন হয়নি। হ্যাঁ, স্বীকার করি, তাকে অবহেলা করে আমি ফুটবলকেই বড় করে দেখেছি। আমি শুধু জানতে চাই, আমার প্রতি ঘৃণাটা তোমার আছে কি এখনও?"

অমিতাভ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না, হঠাৎ এসব কথা বলছেন কেন?"

"কৌতূহলে। তোমার কি কখনও কৌতূহল হয় না, খেলার জন্য তোমার মাকে

অগ্রাহ্য করেছে যে লোক, তার খেলা একবারও দেখার?"

"হয়, কিন্তু ওই কারণে নয়। ফুটবলকে এত ভালবেসে শেষে অপমান ও তাচ্ছিল্য নিয়ে খেলা থেকে সরে যাচ্ছে যে লোকটি, তার খেলা একবার দেখতে ইচ্ছে করে।"

কমল তীব্র চোখে তাকাল ছেলের দিকে। অমিতাভ অচঞ্চল।

"শুধু এই জন্য ইচ্ছে করে?"

"না। খেলাকে ভালবাসলে মানুষ কী পরিমাণ পাগল হয়, সেটা দেখতে দেখতেই আমার কৌতূহল জেগেছে।"

"কাকে দেখে, সলিলকে?"

অমিতাভ চমকে উঠে কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময় তার সারা মুখে।

"তুমি ওকে আশ্রয় দিয়েছ কেন?" কমল কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল।

"ও আমাকে অবাক করেছে। সেদিন অমানুষিক মার খাবার পর বলেছিল, কমলদার মতো আমার মাথায় দাগ তৈরি হবে না, আমার মাথা ফাটেনি। এই বলে ও কেঁদেছিল। ও আশ্রয় চেয়েছিল, আমি আশ্রয় দিয়েছি। এই ঘরে। ভোরে বেরিয়ে যায়, দুপুরে আসে, বিকেলে বেরিয়ে রাত্রে আসে। ও নিজের বাপ-মা ভাই-বোনদের ত্যাগ করেছে। ওর মধ্যে আমি অনেক কিছু না বোঝা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি।"

"কী বুঝেছ, কী বুঝেছ?" কমল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠল। "আমার কোনও দোষ ছিল না। খেলা শুধু শারীরিকই নয়, একটা মানসিক ব্যাপারও—সেটা বুঝেছ কি?"

"আপনার খেলা দেখার পর সেটা বুঝব।"

"তুমি আমার খেলা দেখবে!" কমল হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে হাতটা নামিয়ে নিল। অমিতাভ মাথাটা কাত করল।

কমল পরদিন অফিস থেকে শোভাবাজার টেন্টে ফোন করল, "আমি খেলব, যাত্রীর সঙ্গে খেলাটায়।"

॥ ষোলো ॥

কাঁসর, শাঁখ, পটকা নিয়ে যাত্রীর সমর্থকরা ইস্টবেঙ্গল মাঠের সবুজ গ্যালারি ছেয়ে রয়েছে। দশ গজ পর পর হাতে উড়ছে যাত্রীর পতাকা। যুগের যাত্রী আজ লিগ চ্যামপিয়ন হবে। যাত্রীর ইতিহাসে প্রথম। আর দু'টি পয়েন্ট তাদের দরকার। যাত্রীর সমান খেলে ইস্টবেঙ্গল এক পয়েন্টে পিছিয়ে, মোহনবাগান তিন পয়েন্ট, মহমেডান ছয় পয়েন্ট। প্রত্যেকেরই একটি করে খেলা বাকি। যাত্রীকে আর ধরা যাবে না। যদি আজ যাত্রী ড্র করে এক পয়েন্ট খোয়ায়, তা হলে ইস্টবেঙ্গল সমান সমান হবার সুযোগ পাবে, কেননা তাদের শেষ ম্যাচ জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে। প্রথম খেলায় টেলিগ্রাফকে চার গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

গ্যালারিতে একজন দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল, "যাত্রী আজ যদি হেরে যায়! খেলার কথা তো কিছুই বলা যায় না।"

অবশ্য লোকটি কয়েক মুহূর্ত পরেই বুদ্ধিমান হয়ে গেল এবং সবাইকে শুনিয়ে বলল, "পি সি সরকার কিংবা পেলে ছাড়া যাত্রীকে আজ হারাবার ক্ষমতা কার আছে! আগের ম্যাচে কী ভাবে শোভাবাজার পাঁচ গোল খেয়েছিল মনে পড়ে?"

"শোভাবাজারের সেই টিমই খেলবে।" খুব বোদ্ধার মতো আর একজন বলল, "সিজ্‌ন যত শেষ হয়ে আসে, বর্ষা নামে, ছোট টিম ততই টায়ার্ড হয়, খারাপ খেলে। আমার তো মনে হয়, রেকর্ড গোল দিয়ে যাত্রীর লিগ চ্যামপিয়ন হওয়ার আজই সুযোগ।"

"দাদা, আগের ম্যাচে তো কমল গুহ খেলেছিল, আজও খেলবে কি?"

"কে জানে? অনেকদিন তো কাগজে নামটাম চোখে পড়েনি? আর খেললেই বা কী আসে যায়?"

"জানেন তো যাত্রী ছেড়ে যাবার সময় কমল গুহ কী বলেছিল?"

"আরে রাখুন ওসব বলাবলি। অনুপম আর প্রসূন আজ ওর পিণ্ডি চটকে ছাড়বে। দম্ভ নিয়ে মশাই ক'জন তা রাখতে পেরেছে? রাবণ পারেনি, দুর্যোধন পারেনি, হিটলার পারেনি, আর কমল গুহ পারবে?"

আজ শোভাবাজারের সমর্থক শুধু ইস্টবেঙ্গল মেম্বার-গ্যালারিতে। তাদের মনে একটা ক্ষীণ আশা—যদি যাত্রী হারে। হারলে, ইস্টবেঙ্গলের চ্যামপিয়ন হওয়া ওই পেলে বা পি সি সরকারও বন্ধ করতে পারবে না।

"অসম্ভব, হতি পারে না। যাত্রীর হার হতি পারে না। শোভাবাজারের আছেডা কে? লিগটা লইয়াই গেল শ্যাস পর্যন্ত।" কপালে করাঘাত হল।

"চ্যাঁচাইয়া যদি জেতান যায় তো আজ কলজে ফাটাইয়া দিমু। কী কস্?"

"তাই দে।"

"নিচ্চয়, আজ যেমন কইরা হোক জেতাইতে হইবই। ক্যান, স্পোর্টিং ইউনিয়নের দিন জেতাই নাই ইস্টবেঙ্গলেরে।"

"আরে মশাই, চেঁচিয়ে জেতাবেন শ'বাজার সে টিম নয়। পহাকড়ি দিয়ে দু-চারটে প্লেয়ারকে যাত্রী ঠিক ম্যানেজ করে রেখেছে। ষোল বচ্চর তো খেলা দেখচি।"

"ছারপোকা! আমাগো গ্যালারিতে?"

"ছাইড়া দে। অগো আর আমাগো আজ কমন্ ইন্টারেস্ট। ইংরাজি বোঝোস তো?"

"চার বছ্ছর আই এছ্ছি পড়ছি। ইন্টারেস্ট মানে সুদ তা আর জানি না?"

পাশেই এরিয়ানের গ্যালারির অংশে রয়েছে যুগের যাত্রীর মেম্বাররা। সেখানে হইহই পড়ে গেছে বিপুল কলেবর 'ফিল্ডমার্শাল'কে দেখে। বিরাট গোঁফওলা লোকটি, চারটি সিগারেট মুঠো করে রাখা পাঁচ আঙুলের ফাঁকে। এক একটি টান দিচ্ছে আর মুখ থেকে পাটকলের চিমনির মতো ধোঁয়া বার করছে। যাত্রী ম্যাচ জেতার পর 'ফিল্ডমার্শাল' এই ভাবে সিগারেট খায়। আজ খেলা শুরুর আগেই খাচ্ছে।

'ফিল্ডমার্শালে'র পিছন পিছন দু'টি চাকর বিরাট এক হাণ্ডা নিয়ে গ্যালারিতে

এসেছে। ওতে আছে পনেরো কিলো রান্না করা মাংস। খেলা শেষে ভাঁড়ে বিতরণ করা হবে। হুটোপুটি পড়ে গেল হাণ্ডার কাছাকাছি থাকার জন্য।

"বড় খিদে পেয়েছে দাদা, ব্যাপারটা অ্যাডভান্সই চুকিয়ে ফেলুন না। রেজাল্ট তো জানাই আছে, তবে আর আমাদের কষ্ট দেওয়া কেন?"

"নৌ নৌ। এখন নয়।" ফিল্ডমার্শাল দু'হাত তুলল। "অফিসিয়াল ভিকট্রির পর।"

মাঠের এক কোনায় গ্যালারিতে রয়েছে শোভাবাজার স্পোর্টিংয়ের ডে-স্লিপ নিয়ে যারা এসেছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই অবশ্য মনে মনে যাত্রীর সমর্থক। বিপুল ঘোষ আজ প্রথম মাঠে এসেছে কমলের কাছ থেকে স্লিপ নিয়ে। তার পাশেই বসেছে অমিতাভ। চুপচাপ একা। সলিল তাকে স্লিপ দিয়েছে। ফুটবল মাঠে আজই প্রথম আসা। ওদের পিছনে বসে অরুণা আর পিণ্টু। গতকাল কমল গেছল ওদের বাড়িতে; পল্টু মুখার্জির ছবির সামনে চোখ বুজে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, ছবিতে মাথা ঠেকিয়ে সে বিড়বিড় করে কিছু বলে। পিণ্টুও তার দেখাদেখি প্রণাম জানায়। পিণ্টুই বায়না ধরে, কমলমামার খেলা সে দেখবে।

গ্যালারিতে পিণ্টু অধৈর্য হয়ে ছটফট করে, কখন টিম নামবে। অরুণা ছোটবেলায়, পিণ্টুরই বয়সে, বাবার সঙ্গে মাঠে এসে দেখেছে কমলের খেলা, শুধু মনে আছে, সারা মাঠ উচ্ছ্বসিত হয়েছিল কমলকে নিয়ে। আজ তারও প্রচণ্ড কৌতূহল। বিপুল ঘোষ ঘড়ি দেখে পাশের অমিতাভকে বলল, "খেলা ক'টায় আরম্ভ বলতে পারেন?"

অমিতাভ মাথা নাড়ল। শোভাবাজারকে কতকটা বিদ্রূপ জানাতেই প্রচণ্ড শব্দে মাঠের মধ্যে পটকা পড়ল, তারপর পিণ্টু প্রবল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "ওই যে কমলমামা।"

কয়েক দিন ধরে কমল বারোটি ছেলেকে নিয়ে রীতিমতো ক্লাস করেছে তার শোবার ঘরে। মেঝেয় খড়ি দিয়ে মাঠ এঁকে, তার মধ্যে ঢিল সাজিয়ে (ঢিলগুলি প্লেয়ার) সে যাত্রীর এক একটা মুভ দেখিয়ে কী ভাবে সেগুলো প্রতিহত করতে হবে বুঝিয়েছে। ওরা গোল হয়ে ঘিরে বসে গভীর মনোযোগে শুনেছে। যাত্রীর অ্যাটাক প্রধানত কাকে ঘিরে, কোথা থেকে বল আসে, কী কী ফন্দি এঁটে ওরা স্যুটিং স্পেস তৈরি করে, পাহারা দেওয়া ডিফেন্ডারকে সরাবার জন্য কী ভাবে ওরা বল-ছাড়া দৌড়োদৌড়ি করে, ওভারল্যাপ করে ওদের ব্যাক কী ভাবে ওঠে, কমল ওদের দেখিয়েছে ঢিলগুলি নাড়াচাড়া করে। তারপর বুঝিয়েছে কার কী কর্তব্য। যাত্রীর প্রতিটি প্লেয়ারের গুণ এবং ত্রুটি এবং শোভাবাজারের কোন প্লেয়ারকে কী কাজ করতে হবে বার বার বলেছে। খেলার দিন সকালেও সে সকলকে ডেকে এনে শেষবারের মতো বলে, "চারজন ব্যাকের পিছনে থাকব আমি। যখনই দরকার তখনই প্রত্যেক ডিফেন্ডারকে কভার দেব। ডিফেন্ডাররা নিজের নিজের লোককে ধরে রাখবে। মুহূর্ত দেরি না করে ট্যাকল করবে। বল ওরা কন্ট্রোলে আনার আগেই চ্যালেঞ্জ করবে। বিশেষ করে প্রসূনকে। যেখানে ও যাবে সলিল ছায়ার মতো সঙ্গে থাকবে। অনুপমকে দেখবে স্বপন। চারজন ব্যাকের সামনে থাকবে শম্ভু। প্রত্যেকটা

পাস মাঝপথে ধরার চেষ্টা করবে, যেন যাত্রীর কোনও ফরোয়ার্ডের কাছে বল পৌঁছতে না পারে। অ্যাটাক কোথাও থেকে শুরু হচ্ছে দেখা মাত্র গিয়ে চ্যালেঞ্জ করবে। শম্ভুর সামনে তিনজন হাফ ব্যাক থাকবে। যাত্রীর অ্যাটাক শুরু হবার মুখেই ঝাঁপিয়ে পড়বে, আবার দরকার হলে নেমে এসে হেলপ্ করবে, আবার কাউন্টার-অ্যাটাকে বল নিয়ে এগিয়ে যাবে। আর যাত্রীর পেনাল্টি বক্সের কাছে থাকবে গোপাল। মোট কথা, আমাদের ছকটা হবে ১—৪—১—৩—১।"

"কমলদা, আমি কিন্তু ওদের দু-একটাকে বার করবই।" শম্ভু গোঁয়ারের মতো বলেছিল।

কমল কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে, "ওদের একজনকে বার করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও বেরিয়ে যেতে হবে। তাতে ক্ষতি হবে শোভাবাজারেরই। শম্ভু, আজ সব থেকে দায়িত্বের কাজ তোমার উপর। তুমি কি দায়িত্বের ভয়ে পালিয়ে যেতে চাও?"

"কে বলল?" শম্ভু লাফিয়ে উঠল। চোখ দিয়ে রাগ ঠিকরে পড়ল। দেয়ালে ঘুষি মেরে সে বলল, "আমি পালাব, আমি পালিয়ে যেতে চাই? আমার বাপ দেশ ভাগ হতে পালিয়ে এসেছিল। শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে আমি জন্মেছি কমলদা, আমার মা মরেছে উপোস দিয়ে, বড় ভাই মরেছে খাদ্য আন্দোলনে গুলি খেয়ে। আমি চুরিচামারি অনেক করেছি। আজ ছিঁড়ে খাব সবাইকে।"

কমল পর পর সকলের মুখের দিকে তাকায়, তারপর ফিসফিসে গলায় বলে, "আজ শোভাবাজার লড়বে।"

ওরা চুপ করে শুধু কমলের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল।

॥ সতেরো ॥

তারপর শোভাবাজার লড়াই শুরু করল।

কিক্ অফের সঙ্গে সঙ্গে অনুপম ছুটতে শুরু করল আর প্রসূন ডান টাচ লাইনে লম্বা শটে বল পাঠাল, ছোটবার মাথায় অনুপম বলে পা দেওয়া মাত্র স্বপন বুলডোজারের মতো এগিয়ে এসে ধাক্কা মারল। ফাউল। গ্যালারিতে বিশ্রী কথাবার্তা আর চিৎকার শুরু হয়ে গেল। যাত্রীর রাইট ব্যাক ফ্রি কিক্ করে পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে বল ফেলা মাত্র প্রাণবন্ধু হেড দিয়ে ক্লিয়ার করার জন্য উঠল, আর প্রায় পনেরো গজ ছুটে এসে ভরত তার মাথার উপর থেকে বলটা তুলে নিয়ে একগাল হাসল।

"ভরত, হচ্ছে কী, গোলে দাঁড়া।" কমল ধমক দিল।

কিক্ করে বলটা মাঝমাঠে পাঠিয়ে ভরত বলল, "কমলদা, পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে কাউকে আজ মাথায় বল লাগাতে দেব না।"

যাত্রী শুরুতেই ধাক্কা দিয়ে তারপর ক্রমশ এগিয়ে এসে শোভাবাজারের পেনাল্টি এরিয়াকে ছয়জনে ঘিরে ধরল এবং দুই উইং ব্যাকও উঠে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। শোভাবাজারের গোপাল ছাড়া আর সবাই গোলের মুখে নেমে এসেছে। কমল

বিপদের গন্ধ পেল। আঠারো জন লোক একটা ছোট জায়গার মধ্যে গুঁতোগুঁতি করতে করতে হঠাৎ কখন কে ফাঁক পেয়ে গোলে বল মেরে দেবে এবং এই রকম অবস্থায় সাধারণত ভিড়ের জন্য গোলকিপারের দৃষ্টিপথ আড়াল থাকে। তা ছাড়া ট্যাকল করার আগে কোনও রকম বিচারবোধ ব্যবহার না করায় এবং যথেষ্ট স্কিল না থাকায় শোভাবাজারের ডিফেন্ডাররাও বেসামাল হতে শুরু করেছে।

এতটা ডিফেন্সিভ হওয়া উচিত হয়নি। কমল দ্রুত চিন্তা করে যেতে লাগল। শুধু গোঁয়ার্তুমি সাহস বা দমের জোরে একটা স্কিল্ড অ্যাটাককে ঠেকানো যায় না। কাউন্টার-অ্যাটাক চাই। বল নিয়ে উঠতে হবে। গোপাল উঠে আছে কিন্তু ওকে বল দিয়ে কাজ হবে না। একা বল নিয়ে দুটো স্টপারকে কাটিয়ে বেরোবার ক্ষমতা ওর নেই। বল আবার ফিরে আসবে।

প্রাণবন্ধুর একটা মিসকিক্ কমল ধরে ফেলল। সামনেই যাত্রীর আব্রাহাম। কোমর থেকে একটা ঝাঁকুনির দোলা কমলের শরীরের উপর দিয়ে উঠে যেতেই আব্রাহাম টলে পড়ল। বল নিয়ে কমল পেনাল্টি এরিয়া পার হল।

"ওঠ সলিল।"

কমলের পিছনে প্রসূন, অনুসরণ করছে সলিল। কমলের ডাকে সে এগিয়ে এল। যাত্রীর হাফ ব্যাক অমিয় এগিয়ে আসতেই কমল বলটা ঠেলে দিল সলিলকে। দ্রুত শোভাবাজারের চারজন উঠছে। বল ডান থেকে বাঁ দিকে, আবার ঘুরে ডান দিকে এল। শেষ পর্যন্ত যাত্রীর কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে রুদ্রর কাছ থেকে বল কেড়ে নিল আনোয়ার।

কমল এগিয়ে এসেছে। প্রায় দশ মিনিট যাত্রীর চাপ তারা ধরে রেখেছিল। খেলাটাকে মাঝমাঠে আটকে রেখে যাত্রীর গতি মন্থর করাতে হবে। কমল বল ধরে পায়ে রাখতে শুরু করল। রুদ্র, সত্য আর দেবীদাস মাঠের মাঝখানে, শম্ভু ঠিক ওদের পিছনে। তার কাছে বল পাঠিয়ে কমল চার ব্যাকের পিছনে পেনাল্টি এরিয়া লাইনের উপর দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগল যাত্রীর কে কোথায় কী ভাবে নড়াচড়া করছে।

আঠার মতো লেগে আছে শোভাবাজারের চারটি ব্যাক যাত্রীর চার ফরোয়ার্ডের সঙ্গে। অনুপমের কাছে চার বার বল এসেছে এবং প্রতিবার সে বলে পা লাগাবার আগেই স্বপন ছিনিয়ে নিয়েছে। বল যখন যাত্রীর বাম কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে, অনুপম তখন শোভাবাজারের রাইট হাফের কাছাকাছি ডান টাচ লাইন ঘেঁষে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওর পাঁচ হাত দূরে স্বপন। অনুপম হাঁটতে লাগল সেন্টার লাইনের দিকে, ওর পাশাপাশি চলল স্বপনও। অনুপম হঠাৎ ঘুরে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল, স্বপনও ওর সঙ্গে ফিরে এল। গ্যালারিতে যাত্রীর সমর্থকরা পর্যন্ত ব্যাপারটা দেখে হেসে উঠল। অনুপম ডান দিক থেকে বাঁ দিকে নিমাইয়ের জায়গায় ছুটে গেল, স্বপনও। যতবার বল তার দিকে আসে, স্বপন হয় টাচ লাইনের বাইরে ঠেলে দেয়, নয়তো মাঠের যেখানে খুশি কিক্ করে পাঠায়। অনুপম দু'বার স্বপনকে কাটিয়েই দেখে, কমল স্বপনকে কভার করে এগিয়ে এসে তার পথ জুড়ে আছে। কী করবে ভেবে ঠিক করার আগে স্বপনই ঘুরে এসে ছোঁ মেরে বলটা নিয়ে গেল।

শম্ভু পাগলের মতো মাঝমাঠটাকে ফালা ফালা করে দিচ্ছে যাত্রীর ফরোয়ার্ডদের উদ্দেশ্যে পিছন থেকে পাঠানো বল ধরার জন্য, ডাইনে-বামে যেখান থেকেই আক্রমণ তৈরি হয়ে ওঠার গন্ধ পেয়েছে, ছুটে যাচ্ছে বুলডগের মতো। সব সময়ই যে সফল হচ্ছে তা নয়, কিন্তু ওর জন্য বল নিয়ে যাত্রীর কেউ সহজে উঠে আসতে পারছে না। যদিও বা ওয়াল-পাস করে উঠে আসে, প্রাণবন্ধু নয় তো সলিল এগিয়ে আসে চ্যালেঞ্জ করতে।

প্রসূন পিছিয়ে নেমে এসেছে। সলিলও তার সঙ্গে যাচ্ছিল, কমল বারণ করল।

"মাঝমাঠে যত ইচ্ছে প্রসূন খেলুক, তুই এখানে থাক! যখনই উঠে আসবে আবার লেগে থাকবি।"

তারপরই যাত্রীর দুই উইং ব্যাক দু'দিক থেকে উঠতে শুরু করল। কমল বিপদ দেখতে পেল। নিমাই, আব্রাহাম আর অনুপম ছোটাছুটি করে ছড়িয়ে যাচ্ছে বলাই, প্রাণবন্ধু আর স্বপনকে নিয়ে। প্রসূন বল নিয়ে উঠছে, দু'পাশ থেকে উইং ব্যাক দু'জন। কমল দু'দিকে নজর রাখতে লাগল কোন দিকে প্রসূন বল বাড়িয়ে দেয়।

চার ব্যাকের পিছনে মাঝামাঝি জায়গায় কমল দাঁড়াল। প্রসূন দেবীদাসকে কাটাল, শম্ভুর স্লাইডিং ট্যাক্‌ল ব্যর্থ হল। সলিল এগোচ্ছে। প্রসূনের বাঁ কাঁধ সামান্য ঘুরেছে গোলের দিকে, এবার ডানদিকে বল বাড়াবে। কমল তার বাঁ দিক চেপে সরে গিয়ে উঠে আসা রাইট ব্যাকের দিকে নজর দিল আর প্রসূন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় শরীর মুচড়ে তার বাঁ দিকে বল পাঠাল, যেখানে লেফট ব্যাক বাঁ দিক থেকে ফাঁকায় উঠে এসেছে।

প্রায় পঁচিশ হাজার কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল—গো-ও-ল গো-ও-ল। সেই প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে জ্বালা ধরানো কোনও খবর ছিল যা কমলের স্নায়ুকেন্দ্রে মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটাল। বাঁ দিকে ঝোঁকা দেহভারকে সে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় ডান দিকে ঘুরিয়ে ছুটে এল লেফট ব্যাকের সামনে। প্রায় ১২ গজ দূরত্ব গোল থেকে। শট নিলে নিশ্চিত গোল। হঠাৎ সামনে কমলকে দেখে সে শট নিতে গিয়েও নিতে পারল না। পলকের মধ্যে কমল বলটা কেড়ে নিয়ে যখন রুদ্রর কাছে পাঠাল তখন গ্যালারির চিৎকার চাপা হতাশায় কাতরে উঠেছে। প্রায় ত্রিশ মিনিট খেলা হয়ে গেল, এখনও গোল হল না। শোভাবাজার একবারও যাত্রীর গোলের দিকে যায়নি।

কিন্তু হাফ টাইমের কয়েক সেকেন্ড আগে শম্ভুর পা থেকে ছিটকে যাওয়া বল পেয়ে গোপাল অভাবিত যাত্রীর গোলের দিকে উ.. ধাসে ছুটে যায় আনোয়ার ও অমিয়কে পিছনে ফেলে। গোলকিপার শ্যাম এগিয়ে এসেছে। গোপাল প্রায় চোখ বুজেই শট নেয়। শ্যামের ঝাঁপানো হাতের নাগাল পেরিয়ে বল ক্রসবারে লেগে মাঠে ফিরে এল।

সারা মাঠ বিস্ময়ে নির্বাক। অকল্পনীয় ব্যাপার, শোভাবাজার গোল দিয়ে ফেলেছিল প্রায়। বিস্ময়ের ঘোর কাটল রেফারির হাফ টাইমের বাঁশিতে। মাঠের সীমানার বাইরে এসে শোভাবাজারের ছেলেরা একে একে বসে পড়ল। কৃষ্ণ মাইতি জলের গ্লাস আর তোয়ালে নিয়ে ব্যস্ত। প্লেয়াররা কেউ কথা বলছে না। পরিশ্রান্ত দেহগুলো ধুঁকছে। অবসন্নতায় পিঠগুলো বেঁকে গেছে।

কৃষ্ণ মাইতি হাত নেড়ে বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে বলল, "এবার লং পাসে খেলে যা, শর্ট পাস বন্ধ কর! সত্য, তুই অত নেমে খেলছিস কেন, উঠে খেল। সলিল, আরও রোবাস্টলি খেলতে হবে, বার কয়েক পা চালা, আব্রাহমটা দারুণ ভিতু।"

কমল হাত তুলে কৃষ্ণ মাইতিকে চুপ করতে ইশারা করল, "এখন ওদের কিছু বলবেন না।"

সলিল বলল, "কমলদা, ওটা আমারই দোষ ছিল। প্রসূন পাসটা অত আগেই দেবে বুঝতে পারিনি, নয়তো আগেই ট্যাক্‌ল করতুম। আপনি না থাকলে গোল হয়ে যেত।"

কমল কথাগুলো না শোনার ভান করে গ্যালারির শেষ প্রান্তে তাকাল। চেষ্টা করল একটা মুখ খুঁজে বার করতে। ব্যর্থ হয়ে বলল, "অমিতাভ এসেছে কি?"

সলিল বলল, "হ্যাঁ, ওই তো। ওই যে একজন মেয়েছেলে বসে আছে—ঠিক তার সামনে। বল আনতে গিয়ে আমি দেখেছি।"

কমল আবার তাকাল।

যাত্রীর মেম্বারদের মধ্যে থমথমে ভাব। কেউ কেউ উত্তেজিত। 'অনুপমের এ কী খেলা!' 'ডিফেন্স যখন ক্রাউডেড করেছে তা হলে ওদের টেনে বার করে ফাঁকা করুক!' 'প্রসূন নিজে গোলে না মেরে পাস দিতে গেল কেন?'

'শম্ভুর ট্যাক্‌লিং প্রত্যেকটা ফাউল, রেফারি দেখেও দেখছে না। আব্রাহামকে যে অফসাইডটা দিল দেখেছেন তো?' 'একবার বল এনেছে তাতেই গোল হয়ে যাচ্ছিল; চলে না, আনোয়ার ফানোয়ার আর চলে না।"

কমল উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল। কানে এল কচি গলায় পিন্টু ডাকছে, "কমলমামা, কমলমামা, এই যে আমরা এখানে।"

॥ আঠারো ॥

রেফারি বাঁশি বাজাল।

"মনে আছে তো, শোভাবাজার আজ লড়বে!" মাঠে নামার সময় কমল মনে করিয়ে দিল। ওরা কথা বলল না।

কমল আশা করেছিল যাত্রী ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সাবধানে ওরা মাঝমাঠে বল রেখে খেলছে। মিনিট পাঁচেক কেটে যাবার পর অনুপম বল পেয়ে কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে ছুটে থমকে স্বপনকে কাটিয়ে নিয়ে ঢুকতে গিয়ে কমলের কাছে বাধা পেল। সেন্টার করল সে। ভরত সহজেই আব্রাহামের মাথা থেকে বল তুলে নিল।

"স্বপন, কী ব্যাপার! অনুপম বিট করে গেল?" কমল কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে গেল। আবার অনুপম এগোচ্ছে বল নিয়ে।

স্বপন এবারও পিছনে পড়ে ঘুরে এসে আর চ্যালেঞ্জ করল না। কমল বুঝে গেল স্বপন আর পারছে না। এবং লক্ষ করল, বলাই এবং প্রাণবন্ধুও মন্থর হয়ে এসেছে। সলিলের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ এখনও দেখা দেয়নি। শম্ভু মাঝমাঠে দোর্দণ্ড হয়ে

রয়েছে। যেখানে বল সেখানেই ছুটে যাচ্ছে। দেবীদাস আর সত্য বল দেওয়া-নেওয়া করে যাত্রীর হাফ লাইন পর্যন্ত বার কয়েক পৌঁছতে পেরেছে।

ফাউল করেছে শম্ভু। যাত্রীর রাইট ব্যাকের বুকে পা তুলে দিয়েছে। সে কলার ধরেছে শম্ভুর। গ্যালারি থেকে কাঠের টুকরো আর ইট পড়ছে মাঠে শম্ভুকে লক্ষ্য করে। এর এক মিনিট পরেই শম্ভুকে মাঠের বাইরে যেতে হল। আব্রাহাম, অমিয় আর শম্ভু এক সঙ্গে বলের উদ্দেশ্যে ছুটে গিয়ে এক সঙ্গেই মাটিতে পড়ে গেল। দু'জন উঠে দাঁড়াল, শম্ভুকে ধরাধরি করে বাইরে আনা হল। এবং মিনিট তিনেক পর যখন সে মাঠে এল তখন খোঁড়াচ্ছে।

মাঝমাঠে এখন যাত্রীর রাজত্ব। শম্ভু ছুটতে যায় আর যন্ত্রণায় কাতরে ওঠে।

"কমলদা, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমাকে শেষ করে দিয়েছে। ওদের একটাকে নিয়ে বরং আমি বেরিয়ে যাই।"

"না। তুই বোস। রতনকে নামতে বল।"

"আমি বরং প্রসূনকে নিয়ে—ও ভাল খেলছে।"

"খেলুক। খেলতে হবে ওকে।" কমলের রগের শিরা দপদপ করে উঠল। "না খেললে কমল গুহকে টপকানো যাবে না।"

শম্ভু বসল এবং তৃতীয় ডিভিশন থেকে এই বছরেই আসা নতুন ছেলে রতন নামল। তখন গ্যালারিতে পটকা ফাটল। যাত্রীর আক্রমণে আট জন উঠে এল এবং ক্লান্ত শোভাবাজার সময় গুনতে লাগল কখন গোল হয়। এবং—

একটা প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের মতো কমল গুহ তখন শোভাবাজারের পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে শাখা বিস্তার করে দিল। কখনও সে বন্য মহিষ কখনও বনবিড়াল, কখনও গোখরো সাপ। শোভাবাজার পেনাল্টি এলাকাটা ভয়ংকর করে তুলল কমল তার ক্রুদ্ধ চতুর হিংস্র বিচরণে। একটার পর একটা আক্রমণ আসছে, প্রধানত সলিলকে নিয়ে কমল সেগুলো রুখে যাচ্ছে। আর গ্যালারিতে অশ্রান্ত গর্জন ক্রুদ্ধ-হতাশায় আর্তনাদে পরিণত হচ্ছে।

এইবার, এইবার যাত্রী, আমি শোধ নেব। কমল নিজের সঙ্গে কথা বলে চলে। আমার মাথা নোয়াতে পারোনি, আজও উঁচু করে বেরোব মাঠ থেকে। গুলোদা, রথীন, এদের সব ব্যঙ্গ সব বিদ্রূপ আজ ফিরিয়ে দেব। বল আনছে প্রসূন, এগোক, এগোক, সলিল আছে। ওর পিছনে আমি। আহ্ লেফট উইং নিমাইকে দিল, বলাই চেজ করছে, ওর পিছনে আমি আছি।

কমলের সামনে বল নিয়ে নিমাই থমকে দাঁড়াল। ডাইনে ঝুঁকল, বাঁয়ে হেলল। কমল নিস্পন্দের মতো, চোখ দু'টি বলের দিকে স্থির। নিমাই কাকে বলটা দেওয়া যায় দেখার জন্য মুহূর্তের জন্য চোখ সরাতেই ছোবল দেবার মতো কমলের ডান পা নিমাইয়ের হেফাজত থেকে বলটা সরিয়ে নিল।

কমল বল নিয়ে উঠছে। আয়, আয় কে আসবি, গুলোদা, সরোজ, রথীন, রণেন দাস—কোথায় অনুপমের ভক্তরা—আয় কমল গুহর পায়ে বল, আয় দেখি কেড়ে নে।

রাইট হাফকে কাটিয়ে কমল দাঁড়িয়ে পড়ল। সাইড লাইনের ধারের বেঞ্চে রথীন। ওর সুশ্রী মুখটা যন্ত্রণায় মুচড়ে রয়েছে। কমল একবার মুখ ফিরিয়ে রথীনের দিকে তাকিয়ে হাসল। আজও জ্বালাচ্ছি তোদের। বছরের পর বছর আমি জ্বলেছি রে। আমাকে বঞ্চিত করে যাত্রী তোকে ইন্ডিয়ার জার্সি পরিয়েছে, আমাকে প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত করেছে যাত্রী, আমাকে সাধারণ প্লেয়ারের মতো বসিয়ে রেখে অপমান করেছিল...কমল মাঠের মধ্যে সরে আসতেই, দু'জন এগিয়ে এল চ্যালেঞ্জ করতে। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে কমল দু'জনের মধ্যে দিয়ে পিছলে এগিয়ে গেল, বলটা আঠার মতো পায়ে লেগে রয়েছে—অমিতাভর মায়ের মৃত্যুর খবরটা যাত্রী আমাকে দেয়নি রে রথীন। ট্রফি জিততে কমল গুহকে দরকার, তাই খবরটা চেপে গেছল।...আর একজন সামনে এগিয়ে এল কমলের। ডান দিকে সরে যেতে লাগল কমল। বল নিয়ে দাঁড়াল। গোল প্রায় তিরিশ গজ। বলটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে কমল শট নিল। নিখুঁত মাপা শট। বার ও পোস্টের জোড় লক্ষ্য করে বলটা জমি থেকে উঠে যাচ্ছে। গ্যালারিতে হাজার হাজার হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ মুহূর্তের জন্য তখন বন্ধ হয়ে গেল। শ্যাম লাফিয়ে উঠে চমৎকার ভাবে আঙুলের ডগা দিয়ে বলটা বারের উপর তুলে দিতেই মাঠের চারধারে আবার নিশ্বাস পড়ল।

কর্নার। শোভাবাজারের আজ প্রথম। যাত্রী পেয়েছে আটটা। তার মধ্যে সাতটাই ভরত লুফে নিয়েছে। বল বসাচ্ছিল দেবীদাস। সত্য ছুটে এসে তাকে সরিয়ে দিল। যাত্রীর ছ'জন গোলের মুখে। শোভাবাজারের পাঁচজনকে তারা আগলে রেখে দাঁড়াল।

সত্য কিক্ নিল। মসৃণ গতিতে বলটা রামধনুর মতো বক্রতায় গোলমুখে পড়ছিল। গোপাল লাফাল। তার মাথার উপর থেকে পাঞ্চ করল শ্যাম। প্রায় পনেরো গজ দূরে গিয়ে বল পড়ছে। সেখানে দেবীদাস। দু'জন তার দিকে ছিটকে এগোল।

"দেবী!"

বাঁ পাশ থেকে ডাকটা শুনেই দেবীদাস বলটা বাঁ দিকে ঠেলে সরে গেল। পিছন থেকে ঝলসে বেরিয়ে এল একটা চেহারা। তার বাঁ পা-টা উঠল এবং বলে আঘাত করল। বাম পোস্ট ঘেঁষে বলটা যাত্রীর গোলের মধ্যে ঢুকল। এমন অতর্কিত ব্যাপারটা ঘটে গেল যে খেলোয়াড়রা শুধু অবিশ্বাসভরে আঘাতকারীর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কয়েক সেকেন্ড চোখ সরাতে পারল না।

যাত্রীর মেম্বারদের মধ্যে কথা নেই। শুধু একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল মাত্র, "অত মাংস খাবে কে এবার!"

বিপুল ঘোষ হতভম্ব হয়ে অমিতাভকে বলল, "য়্যাঁ, যুগের যাত্রী গোল খেয়ে গেল! কে গোলটা দিল?"

অমিতাভ গলার কাছে জমে ওঠা বাষ্প ভেদ করে অস্ফুটে শব্দগুলো বার করে আনল, "কমল গুহ।" তারপর লাজুক স্বরে যোগ করল, "আমার বাবা।"

ঝাঁপিয়ে পড়ল যাত্রী শোভাবাজারের গোলে। চার মিনিট বাকি। পর পর তিনটি কর্নার, দু'টি ফ্রি কিক্ যাত্রী পেল। আব্রাহামের চোরা ঘুষিতে বলাইয়ের ঠোঁট ফাটল। কিন্তু সেই বৃহৎ প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটি সব ঝড়ঝাপটা থেকে আড়াল করে রাখল তার

পিছনের গোলটিকে।

শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে মাঠের মধ্যে দৌড়ে এল শম্ভু। "আমি সেরে গেছি, আমি সেরে গেছি কমলদা। আমার আর ব্যথা নেই।"

প্রথম কমলের দুই হাঁটু জড়িয়ে তাকে উপরে তুলল সত্য। তারপর কী ভাবে যেন চারটে কাঁধ চেয়ার হয়ে কমলকে বসিয়ে নিল। ইস্টবেঙ্গল মেম্বার-গ্যালারি উত্তেজনায় বিস্ময়ে টগবগ করছে।

কাঁধের উপর কমলকে তুলে ওরা মাঠের বাইরে এল। কৃষ্ণ মাইতির গলা ধরে গেছে চিৎকার করে। "কমল, বল বল, আমি প্লেয়ার চিনি কি না বল। নিজের রিস্‌কে সব অপোজিশন অগ্রাহ্য করে তোকে খেলিয়েছিলুম আগের ম্যাচে, বল ঠিক বলছি কি না।"

কমলের মস্তিষ্ক ঘিরে এখন যেন একটা কালো পরদা টাঙানো। কী ঘটছে, কে কী বলছে তার মাথার মধ্যে ঢুকছে না, কোনও আবেগ বেরোতেও পারছে না। ক্লান্তিতে দু'চোখ ঝাপসা। তার শুধু মনে হচ্ছে, কিছু অর্থহীন শব্দ আর কিছু মানুষ তার চারপাশে কিলবিল করছে। কমল ভারবাহী একটা ক্রেনের মতো নিজের শরীরটা নামিয়ে দিল ভূমিতে। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর টপটপ করে তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল ঘাসের উপর। কেন পড়ছে তা সে জানে না।

অতি যত্নে তার পা থেকে বুট খুলে দিচ্ছে কে! কমল মাথা ফিরিয়ে দেখল, সলিল। গ্যালারির দিকে কমল তাকাল। একটা পটকাও ফাটেনি। পতাকা ওড়েনি। উৎসব করতে আসা মানুষগুলো নিঃশব্দে বিবর্ণ অপমানিত মুখগুলোয় শ্মশানের বিষণ্ণতা নিয়ে মাঠ থেকে চলে যাচ্ছে। গ্যালারি ক্রমশ শূন্য হয়ে এল। বেদনায় মুচড়ে উঠল কমলের বুক। আর কখনও সে মাঠের মধ্যে থেকে ভরা-গ্যালারি দেখতে পাবে না। কমল গুহ আজ জীবনের শেষ খেলা খেলেছে।

কমল উঠে দাঁড়াল। কোনও দিকে না তাকিয়ে মুখ নিচু করে সে মাঠের মাঝে সেন্টার সার্কেলের মধ্যে এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে মুখ তুলল। অস্ফুটে বলল, "আমি যেন কখনও ব্যালান্স না হারাই। আমার ফুটবল যেন সারা জীবন আমাকে নিয়ে খেলা করে।"

কমল নিচু হয়ে মাটি তুলল। কপালে সেই মাটি লাগিয়ে মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলল, "অনেক দিয়েছ, অনেক নিয়েছও। আজ আমি বরাবরের জন্য তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। জ্ঞানত তোমার অসম্মান করিনি। নতুন নতুন ছেলেরা আসবে তোমাকে গৌরব দিতে। দয়া করে আমাকে একটু মনে রেখো।"

"কমলদা, চলুন এবার।" মাঠের বাইরে থেকে ভরত চেঁচিয়ে ডাকল। ওরা অপেক্ষা করছে তার জন্য।

মাঠ থেকে বেরিয়ে আসার সময় কমল দেখল, সেই সাংবাদিকটিকে খুব উত্তেজিত স্বরে কৃষ্ণ মাইতি বলছে, "আমিই তো কমলকে, বলতে গেলে, আবিষ্কার

করি; ফুটবলের অ আ ক খ প্রথম শেখে আমার কাছেই।"

শুনে কমল হাসল। তারপরই চোখে পড়ল অমিতাভ দূরে দাঁড়িয়ে। কমল অবাক হল, বুকটা উৎকণ্ঠা আর প্রত্যাশায় দুলে উঠল।

এগিয়ে এসে প্রায় চুপিচুপিই বলল, "আজ জীবনের শেষ খেলা খেললাম, কেমন লাগল তোমার?"

অমিতাভ উত্তেজনায় থরথর স্বরে বলল, "তোমার জন্য আমার গর্ব হচ্ছিল বাবা।"

"সত্যি!" কমলের বিস্ময় হাউয়ের মতো ফেটে পড়ল চোখেমুখে। তার মনে হল গ্যালারিগুলো আবার ভরে গেল।

"সত্যিই।"

"যদি আমার দশ বছর আগের খেলা তুই দেখতিস!" কমল হাসতে শুরু করল।

অপরাজিত আনন্দ



॥ এক ॥

"হ্যাল...লো অ্যান্ডি রবার্টস, হোয়াটস দ্য ম্যাটার উইথ য়ু! দাঁড়িয়ে কেন? যাও যাও বল করো।"

বলতে বলতেই প্রৌঢ় কোচ নেটের দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "পিচের কাছে পা, বলের পিচের কাছে পা এনে ফরোয়ার্ড। মুখ উঠছে কেন? নির্ভয়ে খেলো। ইয়েস অ্যান্ডি—"

নিচু হয়ে গড়িয়ে আসা বলটা তুলে নিয়ে কোচ ছেলেটির দিকে ছুড়ে দিলেন।

"মাত্র দু ওভার করেই কোমরে হাত! ব্র্যাডম্যান টানা কুড়ি ওভার বল করিয়েছিল মিলারকে দিয়ে ফরটি এইট নটিংহাম টেস্টে। সেকেন্ড ইনিংসে টোটাল চুয়াল্লিশ ওভার বল করেছিল মিলার। আর তুমি...কী করে খেলবে এই স্ট্যামিনা নিয়ে? প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস, যে ভুলগুলো দেখিয়ে দিলাম শুধরে নাও। যাও যাও—।"

কোচ এগিয়ে এলেন নেটের ধার ঘেঁষে ব্যাটসম্যানের দিকে।

কলকাতার পুব-শহরতলির নেতাজি পার্কে প্রায় পঁচিশটি ছেলেকে নিয়ে সাতদিন হল চলছে এই ক্রিকেট কোচিং। ব্যবস্থা করেছে পার্কেরই নেতাজি ব্যায়ামগার সি এ বি-র সহযোগিতায়। ছেলেদের বয়স চোদ্দো থেকে কুড়ির মধ্যে। অধিকাংশই স্কুল ছাত্র। কোচ করছেন যিনি, একদা রঞ্জি ট্রফিতে ছটি ম্যাচ খেলেছেন। প্রচুর বই পড়ে তিনি খেলা শিখেছেন কিন্তু একবার ৩৯ ছাড়া কখনও দশের বেশি রান করেননি।

"আন্দ, দাঁড়িয়ে থাকিসনি, কোচ তোর দিকে তাকাচ্ছে।"

পাশ দিয়ে যাবার সময় ফিসফিসিয়ে বলে গেল আর একটি ছেলে।

আনন্দ মুখ তুলতেই কোচের সঙ্গে চোখাচোখি হল। বল হাতে সে মন্থরগতিতে বোলিং মার্কের দিকে এগোল। সতেরো কদম দূরত্ব থেকে ছুটে এসে বল করে সে। দূরত্বটা এখন তার কাছে সতেরো মাইল মনে হচ্ছে। কাউকে সে বলতে পারছে না আজ সকাল থেকে গা গরম, হাতে পায়ে গাঁটে গাঁটে ব্যথা, একটু ছুটলেই হাঁফ ধরছে। বল করার পরই বুকে ব্যথা উঠছে। এসব কথা কাউকে বলাটা তার কাছে লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু সে বুঝতে পারছে আর এখন বল করতে পারবে না। করলে বুকের যন্ত্রণাটা বাড়বে।

ডেলিভারিটা সে একটু আস্তেই করল। ইনসুইং গ্রিপে বলটা ধরেছিল। অফ স্ট্যাম্পের ইঞ্চি চারেক বাইরে জমিতে পড়ে ছিটকে এসে অফ স্টাম্পে লাগল। পা দুটো নাড়াতে পারেনি, শুধু কুঁজো হয়ে ব্যাটটা এগিয়ে ধরে ব্যাটসম্যান বোকার মতো হেসে চোখের দিকে তাকাল। কোচ হাসিমুখে মাথা নাড়ছে। আনন্দ ভাবেনি বলটা

অতখানি ছিটকে ঢুকে যাবে। কী করে এটা হল? ভাবতে ভাবতে ঘাড় ফিরিয়ে শুয়ে পড়া অফ স্টাম্পের দিকে তাকিয়েই, বুকে হাত রাখল। আবার সেই শ্বাসকষ্ট।

সময় নেবার জন্য আনন্দ আরও মন্থর পায়ে বোলিং মার্কে ফিরে এল। তিনজন স্পিনার ও একজন পেসার বল করছে। তাদের বল হয়ে যাবার পরেও আনন্দ ইতস্তত করল। ইশারায় সে বল করে যেতে বলল তাদের। কোচ সেটা লক্ষ করে, এগিয়ে এল।

"ব্যাপার কী?"

"কীরকম যেন হাঁপ ধরছে।"

"এই ক'টা বল করেই! দেখে তো তোমাকে দুর্বল মনে হয় না। ...আইডিয়াল ফিগার ফর এ ফাস্ট বোলার, হাঁপ ধরলে তো চলবে না; রান-আপটা এখনও জার্কি রয়েছে, স্মুদ করতে হবে। তা ছাড়া ডেলিভারির সময় বাঁ-কাঁধটা ব্যাটসম্যানের দিকে যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, বাঁ-পায়ের উপর ভর দিয়ে পাছা থেকে শরীরের উপর দিকটা হাত থেকে বল ছাড়ার আগের মুহূর্তে যেভাবে ঘুরবে...হচ্ছে না তো। নিখুঁত হতে হলে অনবরত বল করে করে তৈরি হয়ে উঠতে হবে। আস্তে বল করো, এখনই গ্রেগ চ্যাপেলকে বল করতে হচ্ছে না তো...আস্তে দৌড়ে এসো, আস্তে ডেলিভারি দাও। বয়স কত?"

"ষোলো।"

"ক্লাস?"

"টেন।"

"ফেল করেছিলে কখনও?"

"না।"

কোচ নেটের দিকে তাকিয়ে ঘড়ি দেখলেন। প্যাড পরে অপেক্ষমাণ শিবনাথকে আঙুল তুলে বললেন: "ইউ সোবার্স, গো।" তারপর চেঁচিয়ে—"গাভাসকার লিভ দ্য নেট, ইওর টাইম ইজ আপ।"

গোবিন্দপ্রসাদ বেরিয়ে এল নেট থেকে।

আরও দুটো বল করল আনন্দ। প্রতিটি ডেলিভারির পর শ্বাস নিতে গিয়ে তার মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে বাতাস ঢুকছে না। বুকটা খালি। হাঁটু, কনুই যন্ত্রণায় খুলে পড়বে যেন। কাল রাতে জ্বর হয়েছিল। আজও হয়তো হবে। সে ভাবল, আর বল করা উচিত নয়। চুপচাপ এক ফাঁকে কেটে পড়তে হবে নয়তো জোর করে বল করাবে। ব্যায়ামাগারের দেয়ালটা পাশেই, সেটা শেষ হয়েছে পলাশ গাছটার লাগোয়া। ওই পর্যন্ত গিয়ে ডানদিকে ঘুরলেই কেউ দেখতে পাবে না। পার্কের পিচের রাস্তাটা ধরে টেনিস ক্লাবে ঢুকে বসে থাকলে কেউ এখন আর খুঁজে পাবে না তাকে। টেনিস তার ভাল লাগে। একসময় তার ইচ্ছা করত কৃষ্ণন হবে কিংবা রোজওয়াল। কিন্তু ক্রিকেটের টান সে আরও বেশি অনুভব করে টেনিসের থেকে।

কোচ বলল, "ফলো থ্রু না-করেই অমন দাঁড়িয়ে যাচ্ছ কেন?"

আনন্দ বলতে পারল না—কষ্ট হচ্ছে, সেটা আপনাকে আমি দেখাতে চাই না।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা গেমস টিচার বিনয়বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন কোচের পাশে। তাঁর দিকে তাকিয়ে কোচ বললেন, "পুরো ঝাঁকটার মধ্যে এই একটিই ছেলে...হবে, এরই হবে। ক্লাস আছে, রীতিমতো পেস আছে। কুইকলি ত্রুটিগুলো শুধরেও নিচ্ছে।"

বিনয়বাবু খুবই বিজ্ঞোচিত ভঙ্গিতে বললেন, "ইন্ডিয়ার তো এখন পেস বোলার দরকার।"

কোচ অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। যেন, বেঁচে থাকার জন্য বাতাসের দরকার এই রকম একটা আবিষ্কারের কথা তাঁকে শোনানো হল। "এখন দরকার, মানে! বরাবরই দরকার। নিসার-অমর সিং জুড়ির পর খাঁটি ওপেনিং অ্যাটাক কোনওদিনই আমাদের ছিল না, খাঁটি ফাস্ট বোলার নিসারের পর আজও হয়নি। বোধহয় এবার হবে।"

"আনন্দ?"

কোচ অস্ফুটে কী বলে মাথা হেলালেন।

"দেখছেন, বল করেই বুক চেপে ধরছে।"

"বোধহয় মাস্‌লে টান ধরেছে।...ওয়েল অ্যান্ডি, স্টপ নাউ।"

কোচ হাত তুলে আনন্দকে নিষেধ করলেন। "রেস্ট নাও, মাসাজ করো আস্তে আস্তে।"

আনন্দ হাঁপ ছেড়ে কৃতজ্ঞ এবং বাধ্য ভঙ্গিতে বোলারদের দল থেকে সরে দাঁড়াল।

"পড়াশুনোয় মোটামুটি তবে ইম্যাজিনেটিভ রচনা লিখতে পারে। ওর দাদাও যেন কোন এক ক্লাবে খেলে, শুনেছি।"

"কী নাম?"

"নাম টাম তেমন নেই।"

"অ।"

বিনয়বাবু 'অ'টিকে গ্রাহ্য না করে বলে চললেন, "গুড বনেদি ফ্যামিলি, সবাই শিক্ষিত। দুই দাদা, বড়টি কানাডায় আছে আট বছর, ডাক্তার। অন্যটি মার্কেন্টাইল ফার্মে জুনিয়ার অফিসার আর ক্রিকেটও খেলে। বাবা উকিল, ভাল প্র্যাকটিস। তিনজনের ছোট্ট ফ্যামিলি।"

"তিনজন কেন, মা?"

"নেই। ওর ছোটবেলাতেই মারা গেছেন।"

"পুওর বয়।"

কোচ মুখ ফিরিয়ে আনন্দকে দেখতে চাইলেন। আনন্দ নেই। প্রায় একশো বিঘের বিরাট নেতাজি পার্কের উপর দিয়ে চোখ বোলালেন। এক প্রান্তে টেনিস ক্লাব। লোহার উঁচু জালে এবং পর্দায় ঘেরা দুটি হার্ড কোর্ট ও একটি গ্রাস কোর্ট, সঙ্গে তাঁবু। তার পাশে একটি পুকুর। চিলড্রেনস পার্ক। অন্যদিকে ফুটবল মাঠ। ক্রিকেট ম্যাচও এখানে হয়। তিন-চারটি টালির চালাঘর পার্কের গেটের পাশে। কোনওটি ক্লাবঘর, কোনওটি ব্যায়ামের আখড়া। গেটের সামনেই নেতাজির ব্রোঞ্জ মূর্তি।

কোচ খুঁজে পেলেন না আনন্দকে।

"গেল কোথায় ছেলেটা? বাড়ি কি কাছাকাছি?"

"অন্তত দু কিলোমিটার।" বিনয়বাবুও পার্কের প্রান্তগুলিতে চোখ পাঠাচ্ছেন। এখন সব স্কুলেই গ্রীষ্মের ছুটি। সময়টা দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। গুটি তিরিশ ছেলে এবং কয়েকটি ফুটবল মাঠে নেমে পড়েছে। পুকুরেও ঝাঁপাঝাঁপি শুরু হয়ে গেছে। আনন্দকে তিনিও দেখতে পেলেন না।

"আনন্দ ফাস্ট বোলার হবার মতো মেটিরিয়াল। এই বয়সেই এত পেস, এত কন্ট্রোল, ভাবাই যায় না।"

"দারুণ ব্যাটও করে। এবারই ইডেনে সামার ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চল্লিশ বলে সেঞ্চুরি করেছে। ভীষণ পিটিয়ে খেলে।"

কোচ ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ খবরটা জানেন। এরপর চেঁচিয়ে উঠলেন, "আহ্ সোবার্স, তুমিও গাভাসকারের মতো ভুল করছ... ফরোয়ার্ড খেলার বল বেছে নাও, সব বলেই কি খেলে? কোন বল ছাড়বে সেটা বিচার করা অনেক শক্ত ব্যাপার। তা ছাড়া শরীর আর ব্যাটের মধ্যে অত ফাঁক থাকছে কেন?"

বিনয়বাবু সেই ফাঁকে একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে, আনন্দ কোথায় গেছে রে?"

"বোধহয় টেনিস দেখছে। কাল তো ফেরার সময় ওখানেই ঢুকে পড়েছিল। আমাদের সঙ্গে আর ফেরেনি।"

সুরকির দুটি হার্ডকোর্ট তার পাশে আর একটি ঘাসের। আটটি ছেলে ও দুটি মেয়ে কেউ ফোরহ্যান্ডে কেউ ব্যাকহ্যান্ডে ক্রমান্বয়ে বল মেরে যাচ্ছে বেসলাইন থেকে। নাগাড়ে সার্ভিস করে চলেছে দুজন পাশের কোর্টে। বছর দশেকের দুটি ছেলে ঠোঁট কামড়ে নেটের এপার-ওপার করাচ্ছে বলটিকে অসম্ভব মনোযোগে। সাইডলাইনের ধারে কোচ দাঁড়িয়ে।

আনন্দ ইতস্তত করে, তারপর কোর্টের একটু দূরে নীলপর্দা ঘেঁষে পাতা তিনটি বেঞ্চের একটিতে গিয়ে বসে। কেউ কিছু বলল না, তাকালও না। সে নিজের ক্রিকেট বুট ও সাদা ট্রাউজার্সটার দিকে তাকিয়ে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করল। তার মতো এরাও প্লেয়ার, সুতরাং, আনন্দ ভাবল, প্লেয়ার হিসাবে এরা আর এক প্লেয়ারকে নিশ্চয়ই বেরিয়ে যেতে বলবে না। খুব ছোট থেকেই সে নেতাজি পার্কে আসছে। তখন আসত মেজদার সঙ্গে। মেজদা ক্রিকেট খেলত মিলন পল্লিতে। আনন্দ ক্রিকেট ফেলে টেনিস কোর্টের পাশে গিয়ে দাঁড়াত। টেনিস কেন যে তাকে টানে সে জানে না, বুঝতেও পারে না। হয়তো একা একা খেলতে হয়, লড়তে হয়, একাই জিততে হয়। ক্রিকেটও তাই। ব্যাটসম্যানকে একাই ব্যাট করতে হয়, ফিল্ডারকে একাই ক্যাচ লুফতে হয়। বোলারকেই শুধু অন্যের সাহায্য নিতে হয় কখনও কখনও। এটা তার কাছে অপমানকর মনে হয়। তাই সে চেষ্টা করে প্রতি বলে বোল্ড আউট করতে। ভিড়ের থেকে নির্জনতা তার ভাল লাগে, অন্যের সাহায্য নেওয়ার থেকে নিজের চেষ্টায় কাজ করা, দল বেঁধে চিৎকার করে খেলার থেকে মুখবুজে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাওয়ায়

তার আনন্দ বেশি।

টেনিস কোর্টের ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে বাঘের মতো—কখনও ওত পেতে থাকা, কখনও থাবা মারা, কখনও ঝাঁপিয়ে পড়া। একই সঙ্গে স্লিপ ফিল্ডিং, ব্যাটিং আর ফাস্ট বোলিং! আনন্দ একদৃষ্টে লক্ষ করে সার্ভিসে ব্যস্ত দুজনের দিকে। হুবহু ফাস্ট বোলিং। ছুটে এসে বাঁ কাঁধ ব্যাটসম্যানের দিকে হতে হতে জমি থেকে শরীরটাকে একটু উঠিয়ে নিয়ে ডান পায়ের ভরে একটু পিছনে হেলে...তারপরই সার্ভিস আর বোলিং একই ব্যাপার। বাঁ হাত থেকে উঁচুতে ছুড়ে দেওয়া বলটা নামছে, ডান হাতের র‍্যাকেট আর ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো শরীরটা একই সঙ্গে সামনের দিকে ছিটকে যাচ্ছে বাঁ পায়ে ভর রেখে।

চশমাপরা ছেলেটির সার্ভিসে জোর নেই। লক্ষ করতে করতে আনন্দর মনে হল, এই ভুলটা তারও হত এবং অনেকটা কমাতে পেরেছে গত চার-পাঁচ দিনে। বল ছাড়ার সময় তার শরীরের ওজন বলের সঙ্গে না দিয়ে, পিছনে হেলিয়ে রাখত। এই ছেলেটিও বলে র‍্যাকেটের ঘা দেবার সময় পিছনে শরীরটা হেলিয়ে রাখছে। খুবই সাধারণ ভুল। এই ভুলটার কথা, তার ইচ্ছা করতে লাগল, ছেলেটিকে জানিয়ে দিতে।

টেনিস কোচ, অন্য কোর্টে ফোরহ্যান্ডে ব্যস্ত ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। উচিত হবে না, আনন্দ নিজেকে ধমক দিল, নিশ্চয় কোচের নজরে পড়বে, শুধরেও দেবে। তবু অস্বস্তি হচ্ছে। চমৎকার স্বাস্থ্য, প্রায় তার সমানই লম্বা, অথচ কী মিনমিনে সার্ভিস!

আনন্দ বেঞ্চে বসে ডান দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখে পড়েনি বাঁ দিকের কোর্ট থেকে একটা বল বেঞ্চের দিকে ছিটকে এল। একজন চেঁচিয়ে বলটা ছুড়ে দেবার জন্য বলতেই সে মুখ ফিরিয়ে দেখল তার পিছনে হাত পাঁচেক দূরে পর্দার নীচেই বলটা। শিথিল দেহটাকে বেঞ্চ থেকে তুলে দাঁড় করাবার আগেই আনন্দ দেখল, বেঞ্চের পিছন থেকে শিম্পাজির মতো দুলতে দুলতে ছুটে গেল বলের দিকে এবং বলটা কুড়িয়ে কোর্টে ছুড়ে দিল সেই ছেলেটি, যাকে সে তাদের পাড়ার রাস্তায় মাঝে মাঝে দেখে।

নিঃশব্দে কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল আনন্দ টের পায়নি। মাথা ভরা রুক্ষ চুল, জ্বলজ্বলে চোখ, গায়ে আধময়লা লাল-কালো চিজ কটনের শার্ট। গায়ের চামড়া খসখসে, পালিশচটা কাঠের মতো বিবর্ণ। ওর কাঁধ থেকে দেহটি কোমর পর্যন্ত ঝোঁকানো থাকে সর্বদা, যেহেতু ডান-পা পোলিওয় শীর্ণ সেহেতু বাম উরুতে হাত রেখে বাঁ দিকে ওকে ঝুঁকে থাকতে হয়। পা টেনে দুলে দুলে হাঁটে। বাঁ পা-টি ডান পায়ের থেকে একটু পুষ্ট। দুটি পা-কে মনে হয়, একটি তল্লা বাঁশ আর একটি কঞ্চি যেন মাটি থেকে উঠে নীল হাফ প্যান্টের মধ্যে ঢুকে গেছে। পায়ে নীল রঙের ধুলোভরা কেডস। ঠোঁট চেপে, শুধু দুটো চোখের মধ্য দিয়ে হাসছে কোর্টের দিকে তাকিয়ে। বয়স হয়েছে, অন্তত আনন্দের থেকে চার-পাঁচ বছরের বড়ই হবে। চোখের কোণে, ঠোঁটের কোলে বয়স লুকিয়ে আছে।

মস্ত বড় কাজ করেছে। বিরক্ত অপ্রতিভ আনন্দ আবার বেঞ্চে বসল। বলটা

আমারই ছুড়ে দেওয়ার কথা, ওস্তাদি দেখাল আর কী। যেন ও ছাড়া আর কেউ কাজটা পারত না।

আনন্দ আবার তাকাল ওর দিকে, ওর পায়ের দিকে। অদ্ভুত অমানবিক ভঙ্গিতে দাঁড়ানো এবং দৌড়নোর দৃশ্যটা তার মনে কয়েকবার ভেসে উঠল। যে দেখবে তারই করুণা হবে। এই করুণা নিয়ে ওকে আজীবন কাটাতে হবে। হয়তো ও দারুণ গাইয়ে হবে, পণ্ডিত হবে, কবি হবে বা দারুণ ছবি-আঁকিয়ে হবে, কিন্তু আজীবন ওকে দেখেই সম্ভ্রম বা ভালবাসার আগে লোকের মনে প্রথমেই জাগবে করুণা। কী বিশ্রী ব্যাপারটা, আনন্দ ভাবল, মানুষের শরীর নিয়ে কী জঘন্য আমাদের ধারণা। এটাই যেন জীবনের একমাত্র জিনিস। শরীরের আড়ালেই তো আসলে জিনিসটা—মন, বুদ্ধি। তবু চেহারাটাই লোকে আগে চায়। চোখ সবার আগে যা দেখে তাই দিয়ে প্রথমেই ধারণা তৈরি করে দেয়। মন দিয়ে কি প্রথমেই দেখা যায় না? এবার মায়া হল তার। খেলা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। কোনও খেলাই নয়। বেচারা! ক্ষমতা নেই, অথচ দেখে মনে হচ্ছে, খেলার খুব ইচ্ছে। কী ভীষণ ওর কষ্ট হয়, যখন অন্যদের খেলতে দেখে! আর-একটা টেনিস বল কোর্ট থেকে বেরিয়ে এল সোজা তার দিকেই। আনন্দ একটু ঝুঁকে ফিল্ড করতে পারত, করল না। বলটা বেঞ্চের তলায় গিয়ে পর্দায় লাগল।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অপেক্ষা করছে আনন্দ। ছুটে আসুক। বলটা কুড়িয়ে ছুড়ে দিক কোর্টে।

আসছে না। তাকাল সে। বাম উরুতে হাত রেখে কোমরটা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হল। আনন্দর মনে হল ও যেন চোখ দিয়ে জিজ্ঞেস করছে: তুমি নিজে ছুড়ে দেবে? যদি না দাও, তাহলে আমি ছুড়ব। দেবে ছুড়তে?

আনন্দ মাথা হেলাল।

চোখ দুটি উজ্জ্বল করে তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে ও হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আনন্দ লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে ওকে মাটি থেকে তুলল। কী হালকা, জিরজিরে শরীর। লজ্জা ঢাকতে আনন্দর মুঠো থেকে বাহু দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে, "লাগেনি, আমার লাগেনি" বলতে বলতে তাড়াতাড়ি বলটা কুড়োবার জন্য এগিয়ে গেল।

"আন্দ, তুই এখানে! যা ভেবেছি। বাড়ি যাবি না কি?"

আনন্দ টেনিস ক্লাবের গেটের দিকে হাত তুলে বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে, কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি খুব খেলতে ইচ্ছে করে?"

ও প্রথমে না শোনার ভান করল। আনন্দ আবার জিজ্ঞাসা করতে চাপা ঝাঁঝ নিয়ে বলল, "আমি খেলি।"

মুখটা এত কঠিন করে ও কোর্টের দিকে তাকিয়ে থাকল যে, আনন্দ ভরসা পেল না জিজ্ঞাসা করতে, কী খেলা খেলো? অভিজ্ঞ পোড়-খাওয়া বয়স্ক লোকের মতো এখন ওর মুখটাকে দেখাচ্ছে। আনন্দর মনে হল, ও অনেক কিছু জানে বোঝে ভাবে।

নেতাজি পার্ক থেকে বাড়ি হেঁটে কুড়ি মিনিটের পথ। ফেরার পথে আনন্দ বন্ধুদের জানাল, টেনিস সার্ভিস এবং ফাস্ট বোলিং ব্যাপার দুটো একই জিনিস। শুধু তাই নয়,

সেটা বোঝাবার জন্য হাতের কিটব্যাগটা নামিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একটা ঢিল কুড়িয়ে খানিকটা ছুটে ডেলিভারি দিল।

"এবার সার্ভিসটা দেখা।"

আনন্দর মনে হচ্ছে, আবার শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে ধকল দিলে আবার সে শ্বাসকষ্টে পড়বে। বন্ধুরা কৌতূহলে তাকিয়ে। আনন্দ ভাবল, একটা সার্ভিস তো। কতটুকুই বা কষ্ট হবে।

আনন্দ সার্ভিস করল কাল্পনিক র‍্যাকেট ও বল নিয়ে। বন্ধুরা গভীরভাবে লক্ষ করল। একজন বলল, "তফাত আছে। একটা ছুটে এসে ডেলিভারি, অন্যটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।"

"তা হলেও", আনন্দ তর্ক শুরু করল। "মূল ব্যাপারটা একই। বল ডেলিভারি আর সার্ভিসের একটা সময়ে শরীরের সবকিছু একই নিয়মে চলে।"

"মোটেই না। কোন সময়টায় এক হয়?"

আনন্দ সেটা বোঝাবার জন্য পরপর বার তিনেক বল করার ও সার্ভিস করার মহড়া দিয়ে হাঁফাতে লাগল।

দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে একজন বলল, "অনেকটা মিল অবশ্য আছে বটে।"

আর একজন কিছুটা হালকা বিদ্রূপ নিয়ে বলল, "বিজয় অমৃতরাজের সার্ভিস তো দারুণ, ওকেই তাহলে ফাস্ট বোলার করে নিলে কেমন হয়?"

"টেনিসে নাকি বলে স্পিন টিন করানো হয়, সত্যি নাকি রে আন্দ?... কী হয়েছে রে তোর, নেটেও দেখলুম হাঁপাচ্ছিস!"

"কিছু না, মাস্‌লে কেমন একটা টান ধরছে বল করলেই। একটু আস্তে হাঁট।"

আনন্দ বলতে পারল না, মাসলে টান ধরাটা বাজে কথা। শুধু জ্বর হয়েছে বললে ওরা ভাববে ছেলেটা ননীর পুতুল। বরং 'মাসল পুল' শব্দটার মধ্যে যেন গায়ের জোরের ব্যাপারটা রয়েছে। কিন্তু ফাস্ট বোলারদের কি বুকের মাসল পুল করে? কাগজে তো লিলি বা রবার্টসের উরুর পেশিতে টান ধরার কথাই শুধু লেখে! ওদের কি এমন হাঁপ ধরার মতো ব্যাপার হয় না? ওদের ফুসফুস কি কখনও গোলমাল করে না? করলে, টানা দশ-বারো ওভার বল করতে পারত না। তা হলে আমার ফুসফুসটাই কি বিগড়েছে?

মনে হওয়া মাত্র চুল থেকে একটা তরাস আনন্দর পায়ের আঙুল পর্যন্ত নেমে গেল। তা হলে বিপজ্জনক কিছু কি একটা আমার হবে? কিংবা হয়তো হয়েছে। সে ঘাবড়ে গিয়ে চারপাশে একবার তাকাল। প্রতিদিনের মতোই লোকেরা হাঁটছে, বাস মোটর রিকশা চলেছে, শব্দ হচ্ছে, অন্য দিনের থেকে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু এখন তার চোখে পড়ল তিন তলার পাঁচিল থেকে একটি বাচ্চা মেয়ে প্রায় কোমর পর্যন্ত শরীরটা বার করে ঝুঁকে আছে, রাস্তার কল থেকে অযথা জল পড়ে যাচ্ছে, রেস্টুরেন্ট থেকে ওমলেট ভাজার গন্ধ নাকে এল, রেডিয়োতে কেউ আবৃত্তি করছে কবিতা। হঠাৎ যেন তার চারপাশের পৃথিবী তাকে স্পর্শ করতে শুরু করল। আনন্দ আশ্বস্ত হয়ে নিজেকে বলল, নাহ্, কিছু হয়নি।

॥ দুই ॥

হাতির চারটে পা জড়ো করলে যতটা ঘের হয়, এমন মোটা এক একটা থাম। এইরকম চারটে থাম আনন্দদের বাড়ির ফটকে। তার পাশে দুটো পাম গাছ। বাড়ির মতো ওদেরও বয়স একশো বছরের উপর। আনন্দর বাবা অনাদিপ্রসাদ কথায় কথায় একদিন, তাঁর কাছে শিক্ষানবীশ সদ্য ওকালতি পাশ দেবব্রতকে বলছিলেন, "কলকাতার এই দিকের ওয়ান-থার্ড জমি ছিল বাঁড়ুজ্যেদের। সিপাই-মিউটিনির আগের কথা। তখন রামমোহন, দেবেন ঠাকুরদের আমল। দত্তরা তখন কোথায় হে, সব জমিজমা ছিল আমাদের। এই শিবা দত্তর ঠাকুদ্দা এইট্টিন সেভেনটি সিক্সে, আমাদের কাছ থেকেই পাঁচ বিঘে জমি পেয়ে বসত করে। সে এক মজার ব্যাপার।

"চোরবাগানের ঘোষেদের বেড়ালের সঙ্গে আমাদের বেড়ালের বিয়ে; আমার ঠাকুদ্দার মা বিয়ের দিন সকালে বায়না ধরল বরযাত্রী যাবে একশো বেড়াল। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে তিনি শয্যা নিলেন। রইরই পড়ে গেল—বেড়াল চাই, একবেলার মধ্যে একশো বেড়াল। বীরা দত্তর তেজারতি কারবার, কী একটা কাজে এসেছিল। বলল, আমি জোগাড় করে দোব, তবে বেড়ালপিছু এককাঠা জমি। করে দিল জোগাড়। সেই দত্তদের এখন অবস্থা দেখো। কপাল, কপাল। বীরা দত্তর ছেলে হীরা দত্ত কলকাতায় এগারোটা বাড়ির মালিক হয়। পরে এ বাড়িতে আর থাকত না। পালোয়ান ছিল। ক্ষ্যাপা মোষের শিং ধরে মাটিতে ফেলে দিতে আমিই দেখেছি ছোটবেলায়। এই যে সামনের ছোট মাঠটা, শিবা দত্তর কারখানার পিছনে হে, যেটায় লরি রাখে, ড্রাম ট্রাম পড়ে থাকে, ওটা তো এখানকার ছেলেদের খেলার জন্য দান করে গেছে হীরা দত্ত। পুরো জমিটা দশ কাঠার। বটতলা ইন্সটিট্যুট, লাইব্রেরি, একসারসাইজ ক্লাব সবই তো ওরই করে দেওয়া।"

অনাদিপ্রসাদের গল্প বলা বন্ধ হয় আনন্দর দিকে চোখ পড়তে। জিরান্ডিয়াল আর সিম্পল ইনফিনিটিভের মধ্যে তফাতটা দেবব্রতর কাছে বুঝে নেবার জন্য গ্রামার হাতে আনন্দ দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ সে অবাক হয়ে শুনছিল। সাধারণত সারাদিনে তার বাবা দু-চারটের বেশি কথা তার সঙ্গে বলেন না, মেজদা অরুণের সঙ্গেও নয়। সাংসারিক যাবতীয় কথা হয় হাবুর মা আর বিপিনের সঙ্গে। হাবুর মা ছাব্বিশ বছর এ বাড়ির রান্নাঘরের দায়িত্বে, চোখে কম দেখে; বিপিনকে একত্রিশ বছর আগে নিযুক্ত করেছিলেন আনন্দর ঠাকুর্দা। জুতো না পরে বাড়ির বাইরে যায় না। হুকুম দেবার তালিকায় এ বাড়িতে তার স্থান দ্বিতীয়।

আনন্দকে প্রায়শই পড়া বুঝে নিতে সাহায্যপ্রার্থী হতে হয় দেবব্রত অর্থাৎ দেবুদার। অনাদিপ্রসাদ প্রাইভেট টিউটর রাখার ঘোরতর বিরোধী। তাঁর ধারণা, ফাঁকিবাজ ছাত্রদের জন্যই বাড়িতে মাস্টার দরকার এবং তাই সেটা বাজে খরচ। আসলে অনাদিপ্রসাদ একটু কঞ্জুস, দেবব্রতকে দিয়ে পড়ানোর কাজটা করিয়ে নেবার জন্যই এই অজুহাত। দেবব্রত পাশের পাড়ার ছেলে, একটু ঘুমকাতুরে। আনন্দর বড়দা অমলের সঙ্গে স্কুলে এক ক্লাসে পড়ত। অমল যায় ডাক্তারিতে, দেবু

ওকালতিতে। ছোট্টখাট্ট রোগা শরীর। চশমার দুটো কাচের পাওয়ার মাইনাস এইট এবং টেন। খুঁতখুঁতে এবং মানুষের সঙ্গে মিশতে অনিচ্ছুক। যেখানে সেখানে, যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ে। ওকালতি খুব একটা তার ভাল লাগে না। ভাল লাগে ঘুমোতে, ডিটেকটিভ বই পড়তে। ভীষণ ভক্ত ডিটেকটিভ মেইগ্রের।

মেইগ্রের মতোই, দেবু সব ব্যাপার একটু তলিয়ে বুঝতে চায়। "সত্যসন্ধানী হওয়া উচিত মানুষ মাত্রেরই", দেবু প্রায়ই বলে। "যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে তার পিছনে কারণ থাকবেই। সেটাই হল সত্য। সেটা খুঁজে বার না করলে শুধু আইন টাইন দিয়ে সমাধান হয় না।" আনন্দ বলেছিল, "তা হলে একটা সমস্যার সমাধান করে দিন দেখি—আপনি যেখানে সেখানে কেন ঘুমিয়ে পড়েন?" দেবু থতমত হয়ে তারপর বলেছিল, "ঠিক আছে, রিসার্চ করে তোকে জানিয়ে দোব।" চার দিন পরই দেবু একটা কাগজে তার গবেষণার ফল লিখে এনে আনন্দকে পড়ে শোনায়—"ভাতই হল মূল কারণ। তারপরই চিনি দিয়ে তৈরি খাদ্য, আলু প্রভৃতি যাবতীয় কার্বোহাইড্রেট। মানুষের অন্ত্রনালিতে এগুলো গেঁজে উঠে ইথেনল তৈরি করে। এই জিনিসটার কেমিক্যাল নাম ইথেইল অ্যালকহল। বেশি পরিমাণে ভাত, মিষ্টি ইত্যাদি খেলে অন্ত্রে বেশি পরিমাণ ইথেনল তৈরি হয় যার ফলে শরীর ভার লাগে, চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।" তারপর দেবু বলে, "এই ভাত খাওয়ার জন্যই বাঙালিরা কুঁড়ে। বুঝলি আনন্দ, আমি আজ থেকে ভাত খাওয়া ছেড়ে দিলুম। দুবেলা রুটি খাব।" আনন্দ খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, তিন দিন পর্যন্ত সে ভাতের বদলে রুটি খেয়ে থেকেছিল। দেবুর আর এক অভ্যাস মাঝে মাঝে বলে ওঠা, "আঃ, যদি লটারির একটা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যাই!"

মাস দুয়েক হল দেবু আর তাদের বাড়িতে আসে না। তার কারণটা এইরকম—কোর্টে সওয়াল করতে করতে অনাদিপ্রসাদ হাত বাড়ালেন দেবব্রতর দিকে। টেবলে লাল মলাটের বাঁধানো তিনখানা একই আকারের হৃষ্টপুষ্ট বই দেবব্রতর সামনে। হাত বাড়ালেই সে জানে পরের পর কোন বই অনাদিপ্রসাদের হাতে গছিয়ে দিতে হবে। দুরাত্রি জেগে তিনি বার করেছেন, ছত্রিশ বছর আগে মাদ্রাজ হাইকোর্টে ঠিক এইরকম মামলায় যে রায়টি দেওয়া হয়েছিল। বইয়ের সেই পাতায় ফ্ল্যাপ দেওয়া আছে। মামলায় সেই পুরনো রায়টা তাঁর পাশুপত অস্ত্র।

হাত বাড়িয়েও বইটা হাতে না আসায় অনাদিপ্রসাদ তাকালেন, এবং দেখলেন, দেবব্রতর চোখ বন্ধ, চিবুক নেমে এসেছে বুকের কাছে। চাপা গর্জন হল একটা। ধড়মড়িয়ে উঠে দেবব্রত চোখ খুলে দেখল প্রসারিত একটি হাত এবং তখনি টেবিল থেকে একটা লাল বই তুলে হাতে ধরিয়ে দিল।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ফ্ল্যাপ দেওয়া পাতাটি খুলে পড়তে গিয়ে অনাদিপ্রসাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। এটা পরের মামলার জন্য দরকার। তিনি আবার হাত বাড়ালেন। দেবব্রত ব্যস্ত হয়ে আর একটা লাল বই দিল। হ্যাঁ, এইটাই, কিন্তু হায়, বইয়ে যে ফ্ল্যাপের টিকিও দেখা যাচ্ছে না। কীভাবে এখনি বার করবেন রায়টা! অনাদিপ্রসাদ ফ্যালফ্যাল চোখে জজের দিকে আর জ্বলন্ত চোখে দেবব্রতর দিকে তাকান। মাথা চুলকে দেবব্রত

বলল, "ফ্ল্যাপ তো স্যার দেওয়াই ছিল! কোথাও পড়ে টড়ে গেছে বোধহয়, আমি খুঁজে দেখছি।"

ফ্ল্যাপ খুঁজতে, কোর্ট রুম থেকে দেবব্রত দুমাস আগে সেই যে দ্রুতবেগে বেরিয়েছিল তারপর আজও প্রত্যাবর্তন ঘটেনি। আনন্দের বাড়ির ত্রিসীমানায় সে আর আসে না। কিছু বুঝে নেবার দরকার হলে আনন্দই যায় ওর বাড়িতে।

এখন নেতাজি পার্ক থেকে ফেরার পথে তার দেখা হল দেবব্রতর সঙ্গে। কালো কোট, সাদা টাউজার্স এবং হাতে একটা পেপারব্যাক ডিটেকটিভ বই। কোর্ট থেকে ফিরছে।

"দারুণ মুশকিলে পড়ে গেছে রে মেইগ্রে।"

দেবুদা বইটা মাথার উপর তুলে নাড়তে লাগল। "খুনি ওকে অফিসে ফোন করেছে, চিঠিও লিখেছে।"

"মুশকিলটা কোথায়!"

"খুনিটা মানসিক রোগে ভুগছে। বুঝলি না, এসব ক্ষেত্রে হয়তো আত্মহত্যা করে ফেলতে পারে।"

"যদি করেই, তাতে ক্ষতিটা কী? ধরা পড়লে তো ফাঁসিই হবে!"

"আহ্হা, বুঝছিস না। যদি আত্মহত্যা করে বসে, তা হলে তো কেউই জানতে পারবে না যে খুনিটাই মরেছে। প্যারিসে অমন কত লোকই তো রোজ মরছে। সুতরাং ওকে হাতেনাতে ধরতেই হবে। পাবলিককে দেখাতে হবে খুনি ধরা পড়েছে, নয়তো তারা নিশ্চিন্ত হবে কী করে? এদিকে মেইগ্রেকে দুদিন মাত্র সময় দিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট।"

"কীসের সময়?"

"খুনিদের একটা সায়কোলজি আছে।" দেবুদা এধার-ওধার তাকাল, "চল, হাঁটতে হাঁটতে বলছি। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খুন নিয়ে আলোচনা করাটা ঠিক নয়। ভাল উকিল হতে হলে ডিটেকটিভের বুদ্ধি রাখতে হয়। তোর বাবা তো এসব বোঝেন না। শিবা দত্তর উকিল হয়ে সারাজীবন শুধু ভাড়াটেদের সঙ্গেই মামলা করে গেল। ব্রেইন...মেইগ্রের মতো ব্রেইন চাই উকিল হতে হলে।"

"কী যেন সায়কোলজির কথা বলছিলেন?"

"সায়কোলজি এমন ব্যাপার যা বই আর থিওরি দিয়ে বোঝা যায় না। জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু ভাল স্কুলমাস্টার কি ঔপন্যাসিক কি একজন ডিটেকটিভ যতটা ভালভাবে মানুষকে বোঝে তেমন ভাবে বুঝতে পারা চাই।"

"উকিলদেরও তো তা হলে..."

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" দেবু হঠাৎ চুপ করে গেল একজন পথিককে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখে। একটু দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গিয়ে বলল, "তোর বাবার জুনিয়ার হয়ে থাকলে কোনও অভিজ্ঞতাই হবে না।"

"বাবা তো খুনের কেস করে না।"

"সেই জন্যই তো ছেড়েছি তোর বাবাকে।"

"কী যেন সায়কোলজি সম্পর্কে বলছিলেন?"

"খুনিদের মনস্তত্ত্ব! যেখানে খুন হবে সেখানে ওরা আসবেই। যাকে খুন করেছে তার ফিউনারালে নিশ্চয় যাবে এটা ধরে নিয়ে মেইগ্রে এক ফটোগ্রাফারকে বলল সেখানে উপস্থিত যাবতীয় লোকের এলোপাথাড়ি ছবি তুলে যাও। যদি একটা লোককে বেশির ভাগ ছবিতে পাওয়া যায় তা হলে তার পিছনে লোক লাগাবে। পাওয়া গেল একটা মুখ। কিন্তু অতবড় শহরে ওই মুখের লোকটাকে কী করে খুঁজে বার করা যায়!"

"কাগজে ছাপিয়ে দিক। কেউ না কেউ চিনে ফেলে পুলিশকে জানিয়ে দেবে।"

"তুই যে ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই কথা বললি। সে তো মেইগ্রেকে দুদিন সময় দিয়েছে। খুনিকে হয় এর মধ্যে ধরে দাও, নয়তো ওই মুখটা কাগজে ছাপাতে পাঠাব। মেইগ্রে পড়েছে মুশকিলে। তার দৃঢ় ধারণা কাগজে নিজের ছবি দেখলেই খুনি নির্ঘাত আত্মহত্যা করে বসবে।"

"তা হলে? মেইগ্রে কী করল?"

"জানব কী করে, ট্রামে যা ভিড়, বইটা খোলার একটু চান্স পর্যন্ত পেলুম না।"

দেবুদার হাঁটার গতি হঠাৎ বেড়ে গেল। আনন্দকে ফেলে রেখেই সে হনহনিয়ে তার বাড়ির পথ ধরল বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে। মেইগ্রে কীভাবে মুশকিল থেকে বেরিয়ে এল সেটা তাড়াতাড়ি জানা যাবে, তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে বইটা শেষ করতে পারলে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে আনন্দ। বীরা দত্ত রোড শেষ হয়েছে যেখানে, তার পুবে দত্তদের রাধাগোবিন্দ মন্দির। পশ্চিমে বটতলা ইনস্টিটিউটের একতলা বাড়ি আর খেলার মাঠ। মাঠের তিনদিকে—আনন্দদের বাড়ি, শিবা দত্তর কারখানার পিছন দিক এবং মহিম ব্যানার্জি লেন। কতকগুলো জীর্ণ একতলা কোঠাবাড়ি এবং টিনের চালার বাড়ি নিয়ে মহিম বাঁড়ুজ্যের গলিতে বটতলা নামে একটা পাড়া আছে। সন্ধে নামছে! আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই রাস্তার আলো জ্বালতে হুক লাগানো লাঠি হাতে করপোরেশনের লোক সুইচ টিপে টিপে চলে যাবে বীরা দত্ত রোড দিয়ে। রাধাগোবিন্দ মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠবে। ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি খুলবে ডগুদা। কারখানা গেটের পাশে দয়ানিধির চায়ের দোকানের বেঞ্চে একটা-দুটো লোক হয়তো দেখা যাবে—ওভারটাইমের লোক।

মন্দিরের বাগান থেকে হাসনুহানার গন্ধটা আনন্দর ভাল লাগল। ভিতরে এল সে। ব্যাডমিন্টন কোর্টের আকারের শ্বেত পাথরের ঠাকুরদালান। শঙ্খের কাজ করা খিলেন ও থাম, টানা পাঁচ সারি কালো পাথরের সিঁড়ি, ঝাড়বাতি। হাতে কিটব্যাগ, পায়ে চটি, তাই সিঁড়ির থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে আনন্দ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বিগ্রহের দিকে। বুকের ব্যথাটা এখন বোধ হচ্ছে না। ফুলের মিষ্টি গন্ধ বুকভরে টানল। শ্বাসকষ্ট হল না। ঠাকুর দালানটার পুব দিক উন্মুক্ত। সকালের রোদে শ্বেত পাথর ঠিকরে ওঠে। বিকেলে জল দিয়ে ধোয়ার পর শীতল হয়ে যায়। আনন্দর ইচ্ছা হল খালি গায়ে শুয়ে পড়তে। চটি খুলে সে ঠাকুরদালানে উঠে এসে বসল। আর তখুনি মনে পড়ল মাকে।

সন্ধ্যার শ্বেত পাথরের মতো ঠাণ্ডা ছিল মায়ের মেজাজ। প্রতি সন্ধ্যায় এসে আরতি

না দেখলে ছটফট করত। ঠাকুরদালানে মা বসত চোখ বন্ধ করে, দুটি হাত কোলে রেখে, গলায় আঁচল, তার প্রান্তে চাবির থোকা। লালপাড় শাড়ির ঘোমটায় ঘেরা যেন কুমোরের হাতে গড়া মুখ। আনন্দ একদৃষ্টে তখন মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকত। হঠাৎ চোখ খুলে মা তাকাত। তারপর মুচকি হেসে আবার চোখ বন্ধ করত। ফিসফিস করে আনন্দ এক দিন বলেছিল, "চোখ বুজে থাক কেন?"

"চোখ বন্ধ করলে যে ভাল দেখা যায়।"

"কী দেখো?"

"আমার আনন্দকে।"

চাপা বাষ্প বুক থেকে গলা পর্যন্ত উঠে আনন্দর দুটি চোখকে ভিজিয়ে দিল। ধীর পায়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল রাস্তায়। কয়েকটা লরি, রিকশা ছাড়া বীরা দত্ত রোড দিয়ে সন্ধ্যার পর কোনও যানবাহন যায় না। রাস্তাটা ফাঁকা। সামনে ইনস্টিটিউটের জীর্ণ পলেস্তরা খসা ঘরের জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ডগুদা এসে গেছে। খেলার মাঠে লরি দাঁড়িয়ে। তা থেকে লোহা নামাচ্ছে মজুররা। শিবা দত্তর কারখানায় তৈরি হয় সিলিং ফ্যান, সাইকেল, ওজন মেসিনের পার্টস এবং আরও কী সব যন্ত্রপাতি।

নিজেদের বাড়িটাকে প্রতিবারই দূর থেকে আনন্দের মনে হয় ছবিতে দেখা অতিকায় এক প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসোর। দোতলাটা অন্ধকার। মেজদা আসে দশটা-এগারোটায়। দালানের আলোটা জ্বললেও বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সিং-দরজা দিয়ে একচিলতে আলো বাইরে পড়েছে। বাবা এখন হয়তো চেম্বারে, বিপিনদা বলে সেরেস্তায় বসেছে। রাত্রে শোবার জন্য ছাড়া বাবাকে দোতলায় দেখা যায় না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই এবং কোর্ট থেকে ফিরেই একতলার ঘরে ঢুকে পড়ে।

ফটকের পর প্রায় দশ মিটার মাটির পথ। বাড়িটার তিনদিকে অনেকটা জমি। একমানুষ উঁচু পাঁচিলে সেটা ঘেরা। দেউড়ির দশ ফুট উঁচু সিং-দরজাটার ডান দিকে রেলিং দেওয়া অন্ধকার রক। আনন্দ পৌঁছল রকের প্রান্তে ছোট্ট একটা দরজায়। সেটা দিয়ে ঢুকেই বেলেপাথরের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে দরজাটার পাশ দিয়ে। সিঁড়ির ঘুলঘুলি থেকে আনন্দ স্কেল দিয়ে মেপে দেখেছে দেয়ালটা ঠিক দু ফুট আট ইঞ্চি চওড়া।

সিঁড়িতেও আলো নেই। দোতলায় দালানের আলোটাই কাজ চালিয়ে দেয় যখন, তা হলে আর দরকার কী? অনাদিপ্রসাদের এই যুক্তিটার প্রতিবাদ করে মেজ ছেলে অরুণ বলেছিল, ইলেকট্রিক বিল আমিই দেব।

"আমার মরার পর।"

অরুণ আর কথা বলেনি। শুধু গজগজ করে আনন্দকে শুনিয়ে বলেছিল, "মধ্যযুগীয়, ডিক্টেটরি, ফিউডাল মনোবৃত্তি। এই করেই সব সম্পত্তি গেছে। আমরা গরিব হয়েছি।"

আনন্দ জানে, এই বিরাট প্রাচীন বাড়িটা তাদের বনেদিয়ানা জাহির করলেও, আসলে তারা মধ্যবিত্ত। বাবার ওকালতির রোজগারে সংসারটা মোটামুটি স্বচ্ছন্দে

চলে যায়, এই পর্যন্তই। মেজদার এক টাকাও বাবা নেয় না। মেজদা স্কুটার কিনেছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে বুকে টান বোধ করল। দোতলায় পৌঁছে সে ভাবল, কী হল আমার! এটা কি ফুসফুসের অসুখ? তা হলে কি মার মতো মরে যাব! দেয়ালে সার দেওয়া অয়েল পেইনটিং। সবাই পূর্বপুরুষ। ছবিগুলোর ক্যানভাসের রঙ চটা; কালো হয়ে গেছে। কারুর মুখ কারুর হাত বোঝা যায় শুধু হলুদ রঙের জন্য। ছবির সোনালি ফ্রেমের খাঁজে খাঁজে ধুলো। নির্জন দালানের বিবর্ণ আলোয় মৃত মানুষগুলোকে দেখাচ্ছে যেন আর একবার মৃত্যুমুখীন। আনন্দর মনে হল, ওদের থেকেও সে এই মুহূর্তে বেশি নিঃসঙ্গ, বিপন্ন এবং ভীত। সারা বাড়িতে প্রাণের স্পন্দন আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

মোটা মোটা দেয়াল, ছাদ ভেদ করে শব্দ যাতায়াত করে না এ বাড়িতে। স্যাঁতস্যাতে ঠাণ্ডা মেঝে, কোণে কোণে ভ্যাপসা গন্ধ। ছবির মানুষগুলোর কেউ খালি গায়ে মোটা পৈতে ঝুলিয়ে, কেউ জোব্বা গায়ে পাগড়ি পরে বছরের পর বছর গোমড়া মুখে, বসে বা দাঁড়িয়ে। আনন্দ করুণ চোখে ওদের সকলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে শোবার ঘরে এল।

দোতলায় শোবার ঘর দুটি। বাড়ির দুই-তৃতীয়াংশ, পিছন দিকের প্রায় সবটাই আনন্দর ঠাকুর্দা বিক্রি করে দিয়েছিলেন হীরা দত্তকে। সেই অংশটা এখন শিবা দত্তর কারখানার গুদাম। সামনের দিকটায় আনন্দরা থাকে। হলঘরের মতো লম্বা একটা ঘর, তার দুই প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে দুটি খাট। আনন্দ ও অরুণের। পাশের ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট, অনাদিপ্রসাদ থাকেন। চার দেয়ালে চারটে দেয়াল-আলমারি এবং পাঁচ ফুট দীর্ঘ একটা আয়না ছাড়া ঘরের বাকি সবই আধুনিক।

আলো না জ্বেলে, আনন্দ শুয়ে থাকে খাটে। খিদে পাচ্ছে। অপেক্ষা করতে লাগল হাবুর মা-র জন্য। এই সময় সে দিয়ে যায় দুধ আর সেঁকা পাঁউরুটি। হয়তো জানে না আনন্দ ফিরেছে। স্নান করতে নীচে তো যেতেই হবে, তখন বরং খেয়ে নেবে।

ক্লান্ত আনন্দ কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙাল বিপিন। ঘরে আলো জ্বলছে। মেজদা বাইরের বারান্দায় ট্রানজিস্টারে বি বি সি-তে কান পেতে রিলে শুনছে।

"ওঠো ওঠো, না খেয়ে শুয়ে কেন? দুবার ডাকতে এসে ঘুরে গেছি।"

আনন্দ বিছানায় উঠে বসে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "বিপিনদা আমার বুকে কেমন একটা কষ্ট হয়। গাঁটে গাঁটে ব্যথা, শ্বাস নিতে পারি না ছোটাছুটি করলে।"

"হবে না? দিনরাত লাফানি-ঝাঁপানি, চোট তো লাগবেই। মালিশ করে দোবখন। এখন খেতে চলো।"

ঘরে ঢুকল অরুণ। বিব্রত থমথমে মুখ। ট্রানজিস্টারটা কানে চেপে ধরে খাটে বসল।

"দুদিন বাকি, ম্যাচ বাঁচাতে পারবে?"

উত্তর পাবে এমন আশা আনন্দ করেনি তাই জবাব না পেয়েও সে আবার বলল,

"ছশো উনত্রিশ আর ভারতের তিনশো দুই, তার মানে দুশো সাতাশ রানে পিছিয়ে, ইনিংস ডিফিট না হয়।"

অরুণ হাত তুলে ওকে চুপ করতে বলে আরও কুঁজো হয়ে চোখ মুখ কুঁচকে রেডিয়োটা কানে চেপে ধরল।

"টু ফর নান ছিল, এখন কত?...গাভাসকর আছে তো?"

আনন্দ উঠে এসে অরুণের গা ঘেঁষে বসল। ঘর্ঘর আজেবাজে শব্দের মধ্য দিয়ে একটা গলা উঠছে-নামছে। সাহেবদের বলা ইংরেজি আনন্দ ঠিকমতো বুঝতে পারে না।

"হানড্রেড ফরটি টু না টু হানড্রেড ফরটি টু ঠিক বুঝতে পারছি না। এত ডিসটার্বেন্স হয়।"

আনন্দ কী একটা বলতে যাচ্ছিল, অরুণ হাত তুলে চুপ করতে বলে আবার বারান্দায় গেল। আনন্দ তোয়ালে নিয়ে ভাবল, স্নান করতে যাবে কি যাবে না। দেয়াল-ঘড়িতে রাত সাড়ে সাতটা। বারান্দায় অরুণ কুঁজো হয়ে, রেডিয়োর অ্যান্টেনাটা তার কান ঘেঁষে থরথরিয়ে কাঁপছে লাউডগার মতো।

স্নান করে, খেয়ে, উপরে এসে দেখল অরুণ খাটে দুহাতে চোখ ঢেকে শুয়ে। আনন্দর পায়ের শব্দে তাকাল। আনন্দ স্কোর জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, তার আগেই অরুণ বলে উঠল, "শ্যেম, শ্যেম। ওনলি ফরটি টু—বিশ্বাস করতে পারা যাচ্ছে না, মাত্র বিয়াল্লিশ!"

"অল আউট বিয়াল্লিশে!" আনন্দও বিশ্বাস করতে পারছে না।

"মাত্র সতেরো ওভারে, পঁচাত্তর মিনিটে ইনিংস খতম! কী লজ্জা!"

আনন্দর মনে হল, তার বুকের মধ্যে একটা ব্যস্ততা ভীষণ উত্তেজনায় ছটফট করছে। ধড়ফড় করছে একটা কিছু। ধীরে ধীরে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

"একজনও পেস খেলতে পারে না। পারবে কী করে, খেলেছে কখনও? দেশে কি ফাস্ট বোলার আছে?"

আনন্দ মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। মেজদাটা আপনমনেই গজগজ করে যাচ্ছে। চোখ বুজল সে। সারা গায়ে যেন বেদনা চারিয়ে পড়ছে। হাঁটু কনুই কব্জি টনটন করছে। কপালে হাত রাখল। বোধহয় জ্বর আসবে।

"এত বছর ধরে শুধু কথা আর কথা। তৈরি করা উচিত, তৈরি করতে হবে, অথচ কাজের কাজ কিন্তু একদমই হল না। এতবড় একটা দেশে কেউ জোর বল করতে পারে না, জোর বলে ব্যাট করতে পারে না! কী এমন বোলার ইংল্যান্ডের! আর্নল্ড আর ওল্ড। এই সেদিনই তো ওদের খেলল এখানে আমাদের এই ব্যাটসম্যানরাই, সিরিজও জিতল আর চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই এই অধঃপতন, বিয়াল্লিশ! ছি ছি ছি।"

আনন্দর চোখ ভারী হয়ে জড়িয়ে আসছে। রেডিয়োর ঘরঘর শব্দ যেন সে শুনতে পাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের চিৎকার আর উচ্ছ্বাস একসঙ্গে জট পাকিয়ে যাওয়ার মতো শব্দটা। আনন্দর মনে হচ্ছে, তাকে ঘিরেই পাক দিচ্ছে বিরাট এই উচ্ছ্বাস। এখন আর সে শোবার ঘরের বিছানায় নয়, লর্ডসে। ইংল্যান্ড ব্যাট করছে। বল হাতে সে

ছুটে যাচ্ছে প্যাভিলিয়নের দিক থেকে। চিৎকার উঠছে: "ফরটি টু... ফরটি টু। রিভেনজ, রিভেনজ।" ছিটকে পড়ল অ্যামিসের অফ স্টাম্প প্রথম বলেই। পরের বলে এডরিচের মিডল স্টাম্প। দুটো বলই অফ স্টাম্পের বাইরে পড়ে ছিটকে ঢুকে এসেছে। ডেভিড লয়েড ইয়র্কড হল তৃতীয় বলে। হ্যাটট্রিক! ইন্ডিয়ার নতুন ফাস্ট বোলারটি ক্ষেপে উঠেছে, ইংল্যান্ডকে চুরমার করতে তাণ্ডব শুরু করেছে বল নিয়ে। এরপর গ্রীগ, ফ্লেচার, ডেনেস, নট—আসছে আর যাচ্ছে। ইংল্যান্ড অল আউট ফরটি...না, থার্টি ফাইভ? ওয়ার্লড টেস্ট রেকর্ড নিউজিল্যান্ডের টোয়েন্টি সিক্স। তা হলে ইংল্যান্ডের টোয়েন্টি ফাইভ, পঁচিশ। নতুন রেকর্ড...রেকর্ড। লর্ডসে আগুন ছোটাব, আমি, ইন্ডিয়ার আনন্দ। সব লজ্জা অপমানের প্রতিশোধ নেব। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে বিড়বিড় করল। অরুণ শুনতে পেল না।

"মেজদা, আমি ফাস্টবোলার হব। কাল থেকে দারুণ প্র্যাকটিস করব। শুধু এই বুকের কষ্টটার জন্যই যা..."

সকালে ঘুম ভাঙার পর আনন্দ সর্বাঙ্গে বেদনা এবং জ্বর জ্বর বোধ করল। বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে হল না তার। উপুড় হয়ে বালিশে মুখ চেপে সে শুয়ে রইল।

খবরের কাগজের প্রথম পাঠক বাবা। সেটি বিপিনদা দোতলায় নিয়ে আসে সাড়ে সাতটায়। মেজদা কাগজটা পড়বে বিছানায় শুয়েই। তারপর পাবে আনন্দ। কাগজ পড়ার ইচ্ছা তার হচ্ছে না। মাথার মধ্যে যেন অনবরত বাষ্পার চলেছে। চিড়িক দিয়ে লাফিয়ে উঠছে যন্ত্রণা। গাঁটে গাঁটে ব্যথা।

"মেজদা, দ্যাখো তো আমার জ্বর হয়েছে কি না।"

অরুণ মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, "গা গরম লাগছে? মাথা ভার ভার?"

'হ্যাঁ, গায়েও ব্যথা।"

"ইনফ্লুয়েঞ্জা।"

অরুণ ওকে একগ্লাস জল ও একটা সাদা ট্যাবলেট দিয়ে, কপালে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, "এখন খুব হচ্ছে। চান করবি না, ভাত খাবি না, দুপুরে ঘুম, দেখবি সেরে গেছে। আর একটা ট্যাবলেট রেখে দিচ্ছি, দরকার বুঝলে খাবি।"

ট্যাবলেট খেয়ে আনন্দ দুটো বালিশ মাথায় রেখে চিত হয়ে চোখ বন্ধ করল এবং ক্রমশ তার মনে হতে লাগল জ্বর কমছে, ব্যথাও কমছে। মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখতে লাগল জুলপি বাঁচিয়ে দাড়ি কামানোয় ব্যস্ত মেজদাকে। গত তিন মাসে তিন রকম জুলপি রেখেছে। প্রথমে ছিল বাজারের মাংসওলাদের দা-এর মতো যা দিয়ে টেংরির হাড় টুকরো করে। তারপর রেখেছিল নেপালিদের কুকরির মতো। এখন রয়েছে ক্রিকেট ব্যাটের মতো।

"মেজদা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবার আসছে?"

"হুঁ।"

"অ্যান্ডি রবার্টস আসবে?"

সেফটি রেজার গাল থেকে তুলে অরুণ আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুই জুলপির মাপ

পরীক্ষা করতে করতে বলল, "আসবে না আবার! না এলে উইকেটগুলো নেবে কে?"

"আমায় একদিন খেলা দেখাবে, যেদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফিল্ড করবে?"

"দেখাব!"

"আমি শুধু অ্যান্ডির বোলিং দেখব।"

"কেন? কালিচরণ, রো, লয়েড—এদের ব্যাটিং?"

"আমি ফাস্ট বোলারের অ্যাকশন দেখব। কখনও দেখিনি। তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি, ওয়েস হল।"

"লিন্ডওয়ালকে?"

"নাহ।" তোয়ালে-সাবান হাতে একতলার কলঘরে যাবার জন্য অরুণ দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল, "তুই নাকি জোরে বল করিস শুনলুম! আমাদের ক্লাবের শুভেন্দু দেখেছে নেতাজি পার্কে তোকে বল করতে। বলল, খুব পেস আর উইকেট থেকেও অনেকটা ওঠে নাকি!"

আনন্দর কান দুটো গরম হয়ে গেল। লজ্জিত স্বরে বলল, "জোরে বল না হাতি। এখনও এন্তার শর্ট পিচ পড়ে। স্টাম্পের সাত হাত বাইরে দিয়ে যায়।"

"প্রথম প্রথম ওইরকমই হয়। প্র্যাকটিস আর ধৈর্য—ওরেব্বাবা, আটটা বেজে গেছে!"

অরুণ চলে যাবার পর আনন্দর মুখ হালকা হাসিতে ছেয়ে গেল। কত জোরে বল করি মেজদাটা জানে না। প্যান্ট চাইলে, বুট চাইলে কিনে দিয়েছে, কিন্তু একদিনও আমার খেলা দেখেনি। এবারে সামার ক্রিকেটের সেঞ্চুরিটার পর কাগজে এ ব্যানার্জি নামটা দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই নাকি? হ্যাঁ বলতে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল। ওই রকম অবাক আবার করে দেব যেদিন কাগজে দেখবে ইন্ডিয়া টিমে ওয়াড়েকর, এঞ্জিনিয়ার, তারপরই আনন্দ বানার্জি...। ওর চিন্তাটা একটু থমকে গেল। আমি যখন টেস্ট খেলব ততদিনে ওয়াড়েকর এঞ্জিনিয়াররা তো রিটায়ার করে যাবে! অন্তত সাত-আট বছর তো লাগবেই টেস্টম্যাচ পর্যন্ত পৌঁছতে। হয়তো তিন বছরেই এসে যেতে পারি। কিংবা এমন যদি হয়, এই বছরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের এগেনস্টে! নেতাজি পার্কের ধার দিয়ে যাচ্ছিল পঙ্কজ রায়। নেট প্র্যাকটিস হচ্ছে দেখে, ক্রিকেটার তো, তাই মুখ ফিরিয়ে দেখতে দেখতে একটুখানি দাঁড়াল। তখন আমি বল করছি। তারপর আর চোখ ফেরাতে পারল না। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখে এগিয়ে এসে আমাকে হয়তো জিজ্ঞাসা করবে, তোমার নাম কী? কোন স্কুলে পড়ো? একটা কাগজে লিখে নেবে যাতে ভুলে না যায়। তারপর একদিন হঠাৎ টেলিগ্রাম আসবে স্কুলে—জয়েন টেস্ট ট্রায়াল ক্যাম্প ইমিডিয়েটলি। মাদ্রাজ কি বোম্বাই কি বাঙ্গালোর, কোথাও হবে ক্যাম্পটা। একটা ভাল স্যুটকেশ দরকার, তাছাড়া নিজস্ব ব্যাট প্যাড, গ্লাভস, ভাল বুট, দু-তিনজোড়া শার্ট-প্যান্টও চাই। আনন্দ আপন মনে হাসল। মেজদার অনেক টাকা খসবে। তাতে ওর আপত্তি হবে না! মেজদাটা ক্রিকেট পাগল।

খেলার মাঠে লরির শব্দ এবং মজুরদের চিৎকার শুনে আনন্দ জানলা দিকে

তাকাল। মাঠটা যেন কারখানারই মাল তোলা নামানোর জায়গা। খেলার মাঝেই লরি ঢুকে পড়ে। তখন খেলা বন্ধ করে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। আধঘণ্টা পর্যন্ত ছেলেদের দাঁড়াতে হয়েছে। তিন বছর আগে ফুটবল খেলার মধ্যে লরি ঢুকে পড়ায় ওরা কারখানার হেড দারোয়ানকে বলেছিল, তাড়াতাড়ি মাল খালাস করে লরি সরিয়ে দিতে। লোকটা তাচ্ছিল্যভরে জবাবে বলে, এ জমি তো দত্তবাবুদের। তাদের লরি যতক্ষণ খুশি দাঁড়িয়ে থাকবে। একটি ছেলে বলেছিল, এ মাঠ তো ক্লাবের জমি। তাই শুনে দারোয়ান বলে, ক্লাব তো উঠে গেছে। এ-জমি এখন শিবা দত্তবাবুর। বেশি কথা বললে, খেলা বন্ধ করে দেব।

ছেলেরা বুঝতে পারছিল না, ব্যাপারটা নিয়ে কার কাছে নালিশ জানাবে। পাড়ার ছেলেরা চাঁদা তুলে বল কিনে নিজেরাই মাঠে নেমে পড়েছে। তাদের কোনও ক্লাবও নেই। তবে অন্য দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলার সময় নাম নেয় বটতলা ইনস্টিটিউট। কিন্তু ইনস্টিটিউটের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। না থাকার কারণ, ফুটো ছাদের জীর্ণ একতলা বাড়ি, টিমটিমে একটা লাইব্রেরি, মরচেধরা আধভাঙা কিছু ডাম্বেল, মুগুর ইত্যাদি ছাড়া এখন ইনস্টিটিউটের কোনও অস্তিত্ব নেই। লাইব্রেরির কয়েকজন মেম্বার ছাড়া আর কোনও লোকের যাতায়াত নেই। বছর বারো আগে আনন্দর বড়দা অমলের উদ্যোগে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবই ছিল শেষ অনুষ্ঠান। একটা কমিটি আছে। বহু বছর তার নির্বাচন হয়নি। কমিটির প্রেসিডেন্ট শিবা দত্ত, সম্পাদক অনাদিপ্রসাদ।

কিছু ছেলে আনন্দকে বলেছিল, চল তোর বাবাকে গিয়ে বলি। কয়েকজন বলে, আগে প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়াই উচিত। কিছুক্ষণ বিতর্কের পর স্থির হয়, সবার আগে ডগুদার কাছে যাওয়াই ভাল। বাড়ি ছিল না ডগুদা। পরদিন সকালে ওরা ডগুদার সঙ্গে দেখা করে। আনন্দ যেতে পারেনি।

কী কথা হয়েছিল শিবা দত্তর সঙ্গে, ডগুদা তা আর বলেনি। তাদের শুধু বলেছিল, "বিকেলে লরি ঢুকবে না, মাঠের মধ্যে মাল রাখাও হবে না—কথা দিয়েছে শিবা দত্ত। মুশকিল কী জানিস! এ মাঠটার তো কোনও বাপ-মা নেই। যদি নিয়মিত সারাবছর জমজমাট করে খেলার ব্যবস্থা হয়, লোকজন খেলা দেখতে আসে, তা হলে কি আর লরি ঢুকতে সাহস পাবে? তোরা তো দু-চারদিন ফুটবল কিংবা ক্রিকেট পিটিয়ে বন্ধ করে দিবি, বাকি সময় তো পোড়ো জমি হয়েই থাকে মাঠটা।"

কথাটা ঠিক। এই ছোট্ট জমিতে ছোটবেলাটা কাটিয়ে ছেলেরা বড় মাঠে চলে যায় বড় হওয়া মাত্র। আনন্দ ফুটবল খেলে না আর। ভাল লাগে না। টেনিস বলে ক্রিকেট খেলার স্তরও পেরিয়ে গেছে। বটতলার মাঠ থেকে গতবছরই সে নেতাজি পার্কে চলে এসেছে। মাঠে এখন যারা খেলে তাদের অনেকেই আনন্দর অচেনা। মাঠটাতে ঘাস নেই। বর্ষায় লরির চাকা যে গর্তগুলো করে, সেগুলো রোদে শুকিয়ে স্থায়ী হয়ে রয়েই যায়। যত্ন করার কেউ নেই। ডগুদার কথাটাই ঠিক, এ-মাঠের বাপ-মা নেই। আসলে, মাঠটার মা নেই।

ঘুমটা ভাঙল দুপুরে। সকাল থেকে সে কিছু খায়নি। প্রচণ্ড খিদে পেটের মধ্যে দাউদাউ করছে। হাবুর মা ঘরের দরজার বাইরে ঠাণ্ডা মেঝেয় ঘুমোচ্ছে। ওকে

জাগিয়ে কিছু খেতে দেবার কথা বললেই বিপদ। জ্বর হয়েছে শোনার পরই বার্লি এনে দেবার জন্য বিপিনদাকে বার দুয়েক বলেছে। আনন্দ ধরেই নিল, তার জন্য বার্লি তৈরি হয়ে আছে। পা টিপে টিপে হাবুর মার পাশ দিয়ে সে নীচে রান্নাঘরে এল। রাত্রের খাবার রান্না করাই থাকে। লাউ-চিংড়ি, ঘন মুগের ডাল, বেগুন ভাজা আর পেঁপের চাটনি ঢাকা দেওয়া রয়েছে। রাত্রে শুধু রুটি তৈরি হবে। প্রত্যেকটি থেকে কিছু কিছু নিয়ে খেয়ে আনন্দ ঝরঝরে বোধ করল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সে রওনা হয়ে গেল নেতাজি পার্কের উদ্দেশে কিটব্যাগ হাতে।

॥ তিন ॥

"অ্যান্ডি, দেরি হল যে, বুকের ব্যথাটা কেমন?"

"ঠিক হয়ে গেছে।" নেটের পিছনে মাটিতে বসে বুট পরতে পরতে আনন্দ বলল। কোচ কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়ালেন।

"নতুন বল রেখেছি তোমার জন্য। জোরে করবে না। আগে বলের সুইং কন্ট্রোলে রেখে লেংথ আর ডাইরেকশ্যনে মাস্টারি আনা, তারপর পেসের কথা ভাবা যাবে। ফাস্ট বোলিং মানেই শুধু জোরে বল করা নয়। চকচকে বলের সঙ্গে আঙুলের ভাব জমাও।"

কোচ পকেট থেকে একটি বল বার করলেন। পাকা আপেলের রঙ। দেখেই লোভীর মতো চিকচিক করল আনন্দর চোখ।

"কাউকে দিইনি এতক্ষণ। তরুণ ব্যাট করবে, টেকনিক ভাল, মাথাটা ঠাণ্ডা। ওকে মন দিয়ে বল করবে। মার খেলেও মাথা গরম করবে না। জোরে বল দেবার চেষ্টা করবে না। সুইংয়ে বিট করাই হবে তোমার উদ্দেশ্য।"

আনন্দর ভয় ছিল, বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানিটা হয়তো শুরু হবে। ইনসুইং গ্রিপে চার পাঁচ কদম ছুটে এসে পুরনো বলে কয়েকটা বল করল। শ্বাসকষ্ট হল না।

"ঠিক আছে", নতুন বল আনন্দর হাতে তুলে দিয়ে কোচ চেঁচিয়ে বললেন, "ডেনেস, হয়ে গেছে সময়, এবার টার্নার যাবে।"

দেবেশ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই বেরিয়ে এল। এইমাত্র সে পরপর তিনটে স্কোয়ার-কাটে নেট ঝাঁকিয়েছে। তরুণ নেটে ঢুকে বিজ্ঞের মতো লেগ স্টাম্পের সামনে ব্যাট খাড়া করে 'ওয়ান লেগ' গার্ড চাইল একজন বোলারের কাছে।

নতুন বল নিয়ে আনন্দ এই যে প্রথম বল করছে, তা নয়। কিন্তু তিন আঙুলে ধরে, হাত থেকে ছাড়ার সময় কান-ঘেঁষা হাতটাকে অনেক উঁচু থেকে চাবুক মারার মতো নামিয়ে আনা, তালুটাকে লেগ সাইডের দিকে ফিরিয়ে রাখা—এভাবে কোনওদিন বল করতে সে বাধ্য হয়নি। ভয়ে ভয়ে আস্তে বল করতে লাগল। মাথার মধ্যে আছে শুধু একটা কথা—লেংথ এবং শুধুই লেংথ।

দুটো বল ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলে ও গোটাচারেক ছেড়ে দেবার পর তরুণ একটা ফুলটসকে অফ ড্রাইভ করল চমৎকার স্টাইলে। কান দুটো গরম হয়ে উঠল

আনন্দর। বিড়-বিড় করল: মাথা ঠাণ্ডা, অ্যান্ডি, মাথা ঠাণ্ডা রাখো। শ্বাস নিতে সামান্য অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু গ্রাহ্যে আনল না। এবার বলে একটু জোর আনল।

পিছিয়ে ব্যাকফুটে তরুণ গ্লান্স করল লেগ স্টাম্প থেকে। কোচ তারিফ জানিয়ে মাথা নাড়তেই আনন্দর মনের মধ্যে ঈর্ষা চুলকে উঠল। নেটে আরও তিনজন বল করছে। তাদের বল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বলটা নেটের মধ্যে পড়ে রয়েছে। সে নেটের দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

"কী লাভলি, আলতো করে ঘুরিয়ে দিল দেখলি। নিখুঁত টাইমিং!"

"তরুণের লেটকাটও দেখার মতো। সূক্ষ্ম মারগুলো ওর হাতে দারুণ খোলে। অফ স্টাম্পের বাইরে একবার বল পাক, দেখবি কী চমৎকার কাট্ করবে।"

"এই আন্দ, দে তো একটা অফ স্টাম্পের বাইরে একটু শর্ট পিচ।"

ওরা তরুণের বন্ধু। আনন্দ ছেলে দুটির দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলল, "কেন?"

"তরুণের লেটকাট দেখব।"

"দেখার আরও জিনিস আছে ব্যাটিং ছাড়াও।"

ব্যাটের ঠোক্কর দিয়ে মেরে তরুণ বলগুলোকে বার করে দিচ্ছে নেটের ভিতর থেকে। নিজের বলটি কুড়িয়ে আনন্দ বলল, "ফাস্ট বোলিংও দেখার মতো একটা জিনিস।"

"যেমন তুই এখন করছিস। এর থেকে মেয়েরাও তো জোরে বল করে।"

ঝাঁ করে রক্ত ছুটে এল আনন্দর মাথায়। বটে! চোয়াল চেপে সে বোলিং মার্কে ফিরে এল। কোচ যা বলে বলুক, একটা বল অন্তত সুইং টুইং সিকেয় তুলে জোরে, ভীষণ জোরে দেবে।

বলটা এত জোরে আসবে এবং গুডলেংথ থেকে আচমকা লাফিয়ে উঠবে, তরুণ কল্পনা করেনি। ফরোয়ার্ড খেলতে গিয়ে থমকে যায় আর ব্যাট তুলে মুখ আড়াল করার আগেই বলটা কপাল ঘষড়ে নেটের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আনন্দ তা দেখেনি। ডেলিভারি দিয়েই তার চোখ থেকে সব দৃশ্য মুছে অন্ধকার হয়ে যায়। ফুসফুসে সেই মুহূর্তে যেন একটা ছুরি গেঁথে গেল। ফলো-থ্রুর সঙ্গেই সে বুক চেপে বসে পড়ে। তার সারা বুকটা থেকে যেন দৈত্যাকার একটা মুঠো এখন কচলে কচলে বাতাস বার করছে। যখন সে মুখ তুলল, তখন নেট থেকে তরুণকে ওরা ধরে বার করে আনছে। সাদা জামায় টপটপ রক্ত পড়ছে।

চোখ বন্ধ করল আনন্দ। একী হল? রক্ত কেন তরুণের মুখে? খুন করলাম নাকি, তরুণ কি মরে যাবে? কেঁপে উঠল ওর বুক। অতি ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সে বোবাচোখে তাকিয়ে রইল তরুণকে ঘিরে ধরা জটলার দিকে। ফাস্ট-এইড বক্স দেখা যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে।

"খুব বেঁচে গেছে। যদি সোজা মুখে লাগত তা হলে—"

"কপাল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বলেই আর কিছু হল না। বলটা গুড লেংথ থেকে লাফিয়ে উঠেছিল। বড্ড বাজে পিচ।"

"এই পিচে এত জোরে বল করতে দেওয়া উচিত হয়নি কোচের।"

"কোচ তো ওকে আস্তেই বল করতে বলেছিল, আমি নিজে শুনেছি।"

"কিছু হয়নি, সামান্যই কেটেছে।" কোচ উবু হয়ে পিচ দেখছিলেন, এবার এগিয়ে এসে আনন্দর কাঁধে হাত রাখলেন। ফিকে হাসল আনন্দ।

"পিচটা ভাল করে রোল করা নেই। এই সব পার্কে শুধু জল দিয়ে যা হোক করে রোলার টেনে কি পিচ তৈরি হয়? কত তরিবত, মেহনত, সময় লাগে পিচ তৈরিতে।"

"বলটা আমি জোরে দিয়েছিলাম।"

"আস্তে বলও কি লাফায় না?" কোচ প্রায় ধমকে উঠলেন। "তুমি কি ভেবেছ তোমার জন্যই তরুণের লেগেছে? মোটেই না। বোলারের কাজ বল করা, ব্যাটসম্যানের কাজ বলটা খেলা। খেলতে পারেনি ও। বল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়াও খেলার একটা অংশ। ওর লাগার জন্য দায়ী তারাই যারা পিচ তৈরি করেছে। বলটা না লাফিয়ে গড়িয়েও তো যেতে পারত! তখনও কি তুমি এতটা দুঃখ পেতে? লেগেছে তো লেগেছে, খেলতে গেলে অমন একটু-আধটু লাগেই—তুমি মনখারাপ করছ কেন?"

"যদি মারাত্মক কিছু হয়?"

"হতে পারে। সব খেলাতেই ভয় আছে, ঝুঁকি আছে। তাই বলে কি পৃথিবীতে খেলা বন্ধ হয়ে গেছে? তবে এই ইনজুরিটা কোচিংয়ের ক্ষতি করল। মনে ভয় ঢুকে গেলে—কী ব্যাপার?"

ছেলেটি ইতস্তত করে বলল, "প্র্যাকটিস কি আর হবে?"

"নিশ্চয় হবে। চলো, সবাই মিলে রোলারটা টেনে আনি। পিচটা রোল করে আবার শুরু হবে।"

কোচ যাবার জন্য এগিয়েও ফিরে এলেন। "ফাস্টবোলারের একমাত্র দুঃখ, স্টাম্প ওড়াতে না পারলে। এই দুঃখ যে দেবে তাকেই মেরে হটিয়ে দেবে ক্রিজ থেকে।"

রোলারটা থাকে পার্কের এককোণে। কয়েকজন সেটা আনতে গেল। আনন্দ কিছুটা ভয় এবং সংকোচ নিয়ে এগিয়ে এল কপালে-ব্যান্ডেজ-বাঁধা তরুণের কাছে। কিছু বলার আগেই তরুণ ওর দিকে কটমটে চোখে তাকিয়ে বলল, "নেক্সট টাইম, তোর ওই বলকে টেনিস ক্লাবের কোর্টে হুক করে পাঠাব।"

শোনামাত্র আনন্দর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। ওর ভয় হচ্ছিল, তরুণ হয়তো ভাববে, তার কপাল ইচ্ছে করেই ফাটিয়েছে। হয়তো চিরকাল একটা রাগ বিদ্বেষ মনে পুষে রাখবে। কিন্তু এখন সে বুঝল ভয় করার কিছু নেই। হুক করতে না পারার অক্ষমতায় তরুণ নিজের উপর ক্ষেপে গেছে। মাথা কাত করে কথাটা মেনে নিয়ে সে হাত বাড়িয়ে দিল তরুণের দিকে। এতক্ষণ যে অস্বস্তিটা তাকে কুরে খাচ্ছিল সেটা বন্ধ হল।

"আমার কোনও দোষ নেই।"

"ঠিক আছে।"

তারপর আনন্দ ছুটে গেল রোলার টানায় হাত লাগাতে। তরুণ তার উপর রাগ করেনি, এটা জানার পর, মন থেকে ভার নেমে গেছে। সে সর্বশক্তি রোলারে প্রয়োগ

করেই বুঝল ভুল করেছে। বুকে চাপ পড়ে এমন কাজ কিছুতেই নয়। সে হাত নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটি ছেলে বলল, "হল কী তোর? আজ অনেকবার দেখেছি বল করার পর হাঁপানি রুগির মতো নিশ্বাস নিচ্ছিলি।"

"কদিন ধরেই বল করলে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়!"

"ডাক্তার দেখা।"

ছেলেটি চলে যাবার পর, আনন্দ বিষণ্ণ বোধ করল। ডাক্তার দেখানোই উচিত। হয়তো এমন কোনও গোলমাল যেজন্য আমার আর খেলা উচিত নয়। নিশ্চয় কোনও অসুখ হয়েছে। মেজদা ছাড়া আর কাউকে বলা যাবে না ডাক্তার দেখাবার কথাটা। আনন্দ বার বার ভাবল এবং বিষণ্ণ হতে লাগল। হয়তো আর সে খেলতে পারবে না। ডাক্তার নিশ্চয় তাকে খেলা ছেড়ে দিতে বলবে। শ্বাসকষ্ট যখন, নিশ্চয় তা হলে ফুসফুস কিংবা হার্টের ব্যাপার। খেলা তো এই দুটো জিনিসের উপর ভর করেই। ফাস্ট বোলিং গায়ের জোর আর দম ছাড়া সম্ভব নয়। তা হলে কি আমি আর খেলতে পারব না? কিংবা হয়তো সেরে যাব কিছুদিন চিকিৎসার পর। কিংবা ডাক্তার যদি বলে, খেলতে পারো কিন্তু ছোটাছুটির খেলা নয়। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন খেলা আছে যাতে ছুটোছুটি করতে না হয়। লুডো, ক্যারম, তাস। ননসেন্স, তার থেকে মরে যাওয়াও ভাল। হ্যাঁ, মরে যাওয়া অনেক ভাল এই বুকের যন্ত্রণার থেকে।

আনন্দ বিষণ্ণ চোখে চারধারে তাকাল। সবাই কিছু না কিছু করছে। মানুষ চলছে রাস্তায়, গাড়ি চলছে রাস্তায়, মাঠে ফুটবল খেলছে ক'টা ছেলে, ক্রিকেট বল লোফালুফি করছে নেটের পাশে তিনজন। আকাশে উড়ছে চিল। কেউ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। চলছে, উড়ছে, নড়ছে। কেউ লক্ষ করল না কিটব্যাগ হাতে তার চলে যাওয়াটা। সবাই ব্যস্ত রোলার টানায়।

টেনিস ক্লাবের পাশ দিয়ে যাবার সময় আনন্দ সামান্য ইতস্তত করল। প্র্যাকটিস চলছে তিনটে কোর্টেই। আজ যেন ছেলেমেয়েদের সংখ্যাটা বেশি। ঢুকে পড়ল এবং বেঞ্চে বসল এক মহিলার পাশে। আনন্দর মনে হল, ওঁর ছেলে বা মেয়ে ট্রেনিংয়ে রয়েছে।

গতকাল আনন্দ যাকে কোচ ভেবেছিল, সেই লোকটি হলুদ বুশশার্ট ও কালো ট্রাউজার্স পরে ক্লাবের অফিসঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। এবার কোর্টের কাছে এল। আনন্দর পাশের মহিলাটিকে দেখে হেসে বলল, "ভালই করছে, খুব তাড়াতাড়ি পিক-আপ করছে ফাইনার পয়েন্টগুলো। ইনটেলিজেন্ট গার্ল।"

"বাড়িতে তো দিনরাত শুধু বিলি, ইভন, মার্গারেট, ক্রিস এইসব নামই জপছে। কী করি বলুন তো?"

"করুক না।"

"ওর বাবা টেবল টেনিসের ভক্ত। এককালে খেলতেন তো। তিনি আবার ওয়াই-এম-সি-এতেও বুলুকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। বাপের সঙ্গে কী সব চিনে-জাপানি বলাবলি হয়, আমার আবার মনে থাকে না। কী যে করি, বুলুকে যে

কোন খেলাটা ধরাব ভেবে পাচ্ছি না।"

লোকটি হেসে কোর্টের ওধারে চলে গেল। আনন্দ বেঞ্চে হেলান দিয়ে ভাবল, এর মেয়ে নিজেই জানে না কী খেলা ভালবাসে। বাবা-মা জোর করে প্লেয়ার বানাচ্ছে। হয়তো মেয়েটার ইচ্ছে নাচ শেখার। সে পা ছড়িয়ে অলসভাবে তাকিয়ে দেখতে লাগল প্র্যাকটিস। একবার সে এদিক-ওদিক কাকে যেন খুঁজলও। মুচকি হাসি ঠোঁটে এসে মিলিয়ে গেল।

"র‍্যাকেটের মাথাটাকে মনে করবে তোমারই হাতের অংশ—হাতটা যেন লম্বা হয়ে গেছে। যখন এটা অনুভব করবে, র‍্যাকেট কন্ট্রোল অনেক সহজ হয়ে আসবে।"

আনন্দ একটু ঝুঁকে একাগ্র হয়ে লোকটির কথা শুনতে শুনতে ঘাড় নাড়ল। ঠিক। শরীর আর খেলার জিনিসটা এক করে ফেলতে হবে। মেজদা মাঝে মাঝে ক্রিকেট ব্যাটটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। কিন্তু লিগের খেলায় ওর স্কোর বাষট্টির বেশি ওঠেনি। কীসের যেন অভাব আছে মেজদার মধ্যে। পঞ্চাশ পেরোলেই নার্ভাস হয়ে যায়। অথচ সবাই বলে ওর টেকনিক নাকি সাউন্ড। শুধুই টেকনিক নয় আরও কিছু দরকার হয়। নার্ভ, সাহস।

"স্ট্রোক তিনরকমের, সার্ভিস, গ্রাউন্ড স্ট্রোক আর ভলি। সব স্ট্রোকেই তিনটি জিনিস রয়েছে, বল মারার জন্য র‍্যাকেটটা শরীরের একধারে টেনে আনা, তারপর র‍্যাকেটটা সামনে চালানো, সবশেষে বল মারার পর বলের পথ ধরে শরীরের ঝোঁকে র‍্যাকেটটার এগিয়ে যাওয়া।"

"ঠিক ক্রিকেটের মতো, ব্যাকলিফট, মারের পর ফলো থ্রু।"

চমকে পিছনে তাকাল আনন্দ। ভ্রূকুটি করল। ছ্যাঁত করে উঠেছিল বুকটা, কখন যে চুপিসাড়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা পায়ের উপর ভর দিয়েই হাঁটা, অন্তত ঘষড়ানির শব্দও তো হবে! আশ্চর্য, কী নিঃশব্দ ভূতের মতো।

আনন্দ অস্ফুটে বলল, "সব খেলাতেই তাই।"

"ক্রিকেট, হকি, টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, সব খেলাতেই এক নিয়ম।"

আনন্দর ইচ্ছা হল বলে, তুমি কি সব খেলা খেলে দেখেছ? একটা পা-এর তো ওই অবস্থা।

কিন্তু কিচ্ছু না বলে যথেষ্ট রকমের তাচ্ছিল্য দেখাতে ভ্রূ তুলে সে মুখটা ফিরিয়ে নিল। বাঁ ধারের কোর্টে ফোরহ্যান্ডে বল পেটাপেটি শুরু হয়েছে বেসলাইন থেকে।

"আমি অবশ্য খেলিনি, তবে লক্ষ করেছি।"

মনের কথা বুঝে নিতে পারে দেখছি! কান দুটো একটু গরম হয়ে উঠল আনন্দর। ও যা ভেবেছে আমি তা ভাবিনি, এটা এখনি বুঝিয়ে দিতে হবে।

"এসব বোঝার জন্য খেলার দরকার হয় নাকি?"

"খেললে আরও ভাল বোঝা যায়। তবে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করালেও বোঝা যায়।"

ওরে বাব্বা, এ যে দেখছি মন টন নিয়ে খেলার কথা বলে।

আনন্দ মুখ ফিরিয়ে পিটপিট চোখে তাকাল ওর দিকে। সোজা তাকিয়ে আছে

বেঞ্চের পিঠটা দুহাতে আঁকড়ে। আনন্দ আজ ভাল করে লক্ষ করল ওকে। চাহনিতে কোনও ভাব নেই। চাপা গাল দুটোর মাঝখানে খাড়া নাক, ডগাটা পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা। ঈষৎ বাদামি চুল, মনে হয় মাস ছয়েক ছাঁটেনি, বছর দুয়েক তেল দেয়নি, দিন দশেক চিরুনি। কনুই থেকে শিরাগুলো কবজি পর্যন্ত রুগ্ন হাত দুটোকে বেঁধে রেখেছে।

ওর চোখে বিব্রত ভাব ফুটে উঠছে। আনন্দর মনে হল, ওকে এভাবে লক্ষ করাটা যেন পছন্দ করছে না। তাই সে ওর পায়ের দিকে তাকাল ইচ্ছে করেই।

"পোলিওয়।"

মুখ ঘুরিয়ে আনন্দ এবার অন্যদিক থেকে আসা কথায় কান দিল।

"ফোরহ্যান্ডটাকে মনে করবে যেন এক বালতি জল ছুড়ছ। বাঁ হাতে হাতল ধরে ডান হাতটা বালতির নীচে। বাঁ পা আর বাঁ কাঁধটা এগিয়ে দিয়ে পাশে ঘুরে দাঁড়িয়ে বালতিটা পিছনে নিয়ে তারপর হুশ করে ছুড়ে দেবে। বালতিটা এগিয়ে যাবে শরীর থেকে। ঠিক সেইভাবেই ফোরহ্যান্ড মারবে। বালতির তলার হাতটাই তোমার র‍্যাকেট-ধরা হাত।

"কখনও ড্রাইভ করেছ?" আনন্দ পালটা প্রশ্ন করল।

"বইয়ে ছবি দেখেছি।"

"কার ছবি?"

"আর্ট অব ক্রিকেটে, ব্র্যাডম্যানের।"

আনন্দ ঘুরে বসল। মেজদা গত বছর তার বন্ধুর কাছ থেকে বইটা দুদিনের জন্য চেয়ে এনেছিল। যতক্ষণ বাড়িতে থাকত বইটায় ডুবে যেত। অফিসেও নিয়ে যেত। আনন্দ একবার শুধু পাতা ওলটাবার সুযোগ পায় মেজদা যখন সকালে কলঘরে গেছল, তার মুশকিল ইংরেজি অক্ষরগুলোকে নিয়ে, অধিকাংশেরই মানে সে জানে না।

এই ল্যাংড়া ছেলেটা কোথা থেকে বইটা পেল?

"তোমার বই?"

কোর্ট থেকে একটা বল ছিটকে উড়ে আসছে আনন্দর পাশের মহিলাটির দিকে। "উউ বাবারে" বলে তিনি দুহাতে মুখ ঢাকলেন। আনন্দ এক হাতে টেনিস বলটা লুফে নিল। ছুড়ে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে থমকাল। পিছনে তাকিয়ে হাসল। বলটা ওর দিকে এগিয়ে দিল।

ও হাসল। আনন্দর হাত থেকে বলটা নিয়ে ছুড়ে দিল কোর্টে।

"না, এখানে বসাটা ঠিক নয়।"

ব্যস্ত হয়ে মহিলাটি ক্লাবঘরের সামনে পাতা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। ওরা দুজনে একসঙ্গে হাসল।

"ওর মেয়ে এখানে ট্রেনিংয়ে আছে, আবার টেবল টেনিসও শিখছে।"

"জানি। ওই তো ফোরহ্যান্ড মারছে, চশমাপরা।"

"সবাইকে চেনো?"

"অনেকের নাম জানি?"

"বইটা তোমার?"

ও ইতস্তত করে বলল, "না, ঠিক আমার নয়, ডগুদা আমায় দিয়েছে। লাইব্রেরিতে উইয়ে ধরেছিল, বলেছে ফেরত না দিলেও চলবে। কেউ তো পড়ে না।"

আনন্দ অবাক হয়ে গেল। বাড়ির সামনেই লাইব্রেরিটা, অথচ সে জানত না। আক্ষেপে মন ছেয়ে গেল, কেন মেম্বার হয়নি। মেজদা বলেছিল, যারা ক্রিকেট শিখতে চায়, বইটা তাদের গীতার মতো পড়া উচিত। আর সেই গীতাটাকে উইয়ে কেটে দিল লাইব্রেরির তাকে! একবার যদি কেউ বলত, তা হলে মেম্বার হয়ে যেত। লাইব্রেরিতে গিয়ে কোনওদিন সে ইংরেজি বইয়ের ক্যাটালগটাও যদি দেখত। মেজদাটাও কখনও লাইব্রেরির মেম্বার হয়নি। ওখানে নাকি মান্ধাতার আমলের বই আর মাসিক পত্রিকা ছাড়া কিছু নেই। অথচ 'আর্ট অফ ক্রিকেট' ছিল। এরকম হয়তো আরও অনেক বই পড়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করার জন্য মুখ ফিরিয়ে আনন্দ ওকে দেখতে পেল না। আসার মতোই নিঃসাড়ে চলে গেছে। গলা লম্বা করে আনন্দ চারধারে খুঁজল। কয়েক পা গেলেই পর্দার আড়ালে চলে যাওয়া যায়। ওকে দেখা গেল না। উঠে খুঁজতে ইচ্ছে হল না তার। একা বসে তাকিয়ে রইল কোর্টের দিকে। এবং ক্রমশ ভারবোধ করতে লাগল সারা দেহে। সামান্য ঝিমুনি আসছে।

আনন্দ নিজের কপালে হাত রাখল, বোধহয় আবার জ্বর আসছে। অনেকটা হেঁটে বাড়ি, কিছু পয়সা থাকলে রিকশায় যেত। মেজদাকে আজই বলতে হবে। ও হয়তো বাবাকে বলবে। জ্বর টর হলে বাবা বিরক্ত হয়। জ্বরের জন্য ডাক্তার দেখানো, ওষুধ কেনাটা বাজে খরচ মনে করে। মেজদা যেন বাবাকে না বলে। কিন্তু ডাক্তার যদি বলে, খেলা বন্ধ করতে হবে! যদি বলে তোমার দারুণ একটা অসুখ করেছে, খেলা একদম বন্ধ! চিরকালের মতো বন্ধ!

ভয়ে কেঁপে উঠল আনন্দর বুক। সন্ধ্যা নামছে। পার্কের গাছগুলোয় একটানা কিচিরমিচির করে চলেছে পাখিগুলো, আনন্দ ভেবে পায় না কী জন্য রোজ সন্ধ্যায় গাছে ফিরেই সবাই কথা বলে। এত কী কথা ওদের! সে নিজে একদম কথা বলে না বাড়ি ফিরে। কার সঙ্গেই বা বলবে। তরুণের কপাল ফেটেছে তার বলে, এ-কথাটা বাড়িতে কাকে জানাবে? মেজদা তো আসবে অনেক রাতে।

যদি মা থাকত।

আকাশের গাঢ় কমলা রঙের অংশটার উপর একসার কালো ফুটকি ভেসে উঠে সন্ধ্যার ধূসরতার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখল আনন্দ। ওরা পাখি। কোনও বিল বা দীঘির দিকে চলেছে। কিংবা ওরা হয়তো সাইবেরিয়া থেকে আসা এখন আবার ফিরে যাচ্ছে। হাজারেরও বেশি মাইল উড়ে যাবে। কী জোর ওদের ডানায়, ওদের হার্টে! অবসাদে ক্লান্ত লাগছে তার। এইবার তার নিজেকে একা মনে হচ্ছে। শীতকালের ভোরে ঘন কুয়াশার আড়ালে দূরের রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া মানুষের মতো এখন সে একা আবছা এবং বিষণ্ণ। মিলারকে দিয়ে টানা কুড়ি ওভার বল করিয়েছিল ব্র্যাডম্যান।

স্ট্যামিনা, স্ট্রেংথ...স্ট্যামিনা, স্ট্রেংথ...কোথায় স্ট্যামিনা? বুকের মধ্যে কলকবজা একটা বিগড়েছে।

কোর্ট থেকে ওরা চলে গেছে। আনন্দ একা বসে, উঠতে ইচ্ছে করছে না। নেট অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তরুণ কি আজ আবার ব্যাট করেছে? পরপর দুদিন চোরের মতো সে পালিয়ে এল। কী লজ্জা, আনন্দ ব্যানার্জি কিনা দু ওভার বল করেই টায়ার্ড! হাসবে, ওরা হাসবে।

বেঞ্চ থেকে উঠে, মন্থর পায়ে আনন্দ বেরিয়ে এল। ঘুম পাচ্ছে তার। হাঁটুতে ব্যথা, কনুইয়ে, কবজিতে ব্যথা।

পালিয়ে যাচ্ছে আনন্দ!

আনন্দ মাথা নাড়ল। কিছু করার নেই, কিছুই করার নেই। বিয়াল্লিশ অল আউট। তার থেকেও লজ্জার এই ক্লান্তি। এই ব্যথা, হাঁপ ধরা। পরপর দুদিন পালিয়ে আসা। আমি জানি না আমি কী করব। জানি না, জানি না, জানি না।

রাতে আবার জ্বর এল। অরুণ তার কাছে এসে কপালে হাত রাখতেই চোখ খুলে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আনন্দ হাতটা চেপে ধরল।

"মেজদা, আমি পালিয়ে এসেছি। আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, হাত পায়ে ব্যথা করে। আমায় ডাক্তার দেখাও। আমায় ভাল করে দাও। দু ওভারও বল করতে পারি না।"

ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল আনন্দর কণ্ঠস্বর। দু চোখ বন্ধ করতে করতে ফিসফিসিয়ে বলল, "তরুণ বলেছে হুক করে টেনিস ক্লাবে পাঠাবে। আমি ঠুকে দিয়েছিলাম বলটা, কিন্তু ওরা ভেবেছে পিচটা খারাপ তাই লাফিয়েছে। কেন আমার বল মারবে? আমি অপমান সহ্য করব না।...চ্যালেঞ্জ নোব, মেরে সরাব...সোবার্স, চ্যাপেল, বয়কট, লয়েড সবাই সবাইকে...আমাকে শুধু ভাল করে দাও, ভাল করে দাও, ভাল করে দাও।"

॥ চার ॥

"ডাক্তারবাবু, ভাল হয়ে যাবে তো?"

চশমাটা টেবিল থেকে তুলে চোখে লাগিয়ে ডাক্তার তাকালেন অরুণের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে। টাক ঢাকতে পিছনের চুল দিয়ে সযত্ন প্রয়াস রয়েছে ডাক্তারবাবুর মাথায়। বেঁটেখাটো মানুষটি এরকম আকুল কণ্ঠস্বর প্রতিদিন বহুবারই শুনে থাকেন বাড়িতে চেম্বারে বা হাসপাতালে। ব্যস্ত না হয়ে তিনি আড়চোখে একবার বাইরের দরজার পর্দাটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। পর্দার ওপারে, রাস্তায় নেমে যাওয়া সিঁড়ির ধাপে একজোড়া পা। আনন্দ দাঁড়িয়ে। রাস্তায় রবারের বল খেলছে পাড়ার ছেলেরা তাই দেখছে।

খেলা যত না হচ্ছে তার থেকেও বেশি চিৎকার করছে ছেলেরা। আনন্দ চেষ্টা করছে ঘরের মধ্যে মেজদা আর ডাক্তারের কথাগুলো শুনতে, কিন্তু পারছে না।

ঘরের মধ্যে যাবে কি না ভাবল। বুক টিপটিপ করছে। ডাক্তারবাবু কী বলবেন, কে জানে! যতক্ষণ পরীক্ষা করছিলেন বলের ফ্লাইট লক্ষ করার মতো সে সারাক্ষণ গম্ভীর নিরাসক্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছুই সে বুঝতে পারেনি, বা তিনি তাকে বুঝতে দেননি।

প্রশ্ন হয়েছিল: "কদ্দিন থেকে এই রকম শ্বাসকষ্ট হচ্ছে?"

"দিন পাঁচেক আগে নেটে বল করার সময়।"

"তার আগে কখনও হয়নি?"

আনন্দ আড়চোখে অরুণের উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "হত, খুব সামান্য।"

"কতদিন আগে থেকে? দুবছর? তিন বছর?"

আনন্দ মনে করার চেষ্টা করল।

"জ্বর হত? সর্দি কাশি? গাঁটে গাঁটে ব্যথা?"

ডাক্তারের কাছে মিথ্যা বলতে নেই, লুকোতে নেই। আনন্দ ঘাড় নাড়ল।

"কাউকে জানাওনি?"

আনন্দ কয়েক সেকেন্ড অরুণের মুখ লক্ষ করে বলল, "না, আপনা থেকেই সেরে যেত তাই কাউকে বলতাম না।"

"মাকেও বলোনি?"

গলা খাঁকারি দিয়ে অরুণ বলল, "আমাদের মা নেই। আনন্দ যখন আট বছরের তখন মারা যান, নিউমোনিয়ায়। অত্যন্ত চাপা ছিলেন, কাউকে কিছু প্রথমে বলেননি। আনন্দও মায়ের মতো চাপা স্বভাবের হয়েছে।"

এক ঝলক হাসি আনন্দর মুখের ওপর খেলে গেল। ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

"ক্রিকেট ছাড়া আর কিছু খেলো?"

"ফুটবল খেলতাম, এখন আর খেলি না।"

"কোন পজিশনে?"

"লেফট উইং।"

"ছুটতে গেলেই শ্বাসকষ্ট হত, তাই ফুটবল ছেড়েছ।"

প্রশ্ন নয়, কথাগুলো যেন ঘোষণার মতো। ডাক্তারবাবু যেন জানেনই কেন আনন্দ ফুটবল খেলা ছেড়েছে। মরিয়া হয়ে সে বলল, "পরে ব্যাকে খেলতাম। গত বছরও খেলেছি।"

"এ বছর?"

"আমি ক্রিকেটটাই শুধু খেলতে চাই। চোট লাগলে বোলিংয়ে অসুবিধে হবে ভেবে ফুটবল বন্ধ করেছি।" আনন্দ একটু বেশি জোর দিল 'ভেবেই'-র উপর।

ডাক্তারবাবুর মুচকি হাসিটায় বিব্রত হয়ে, আবার সে বলল, "পঙ্কজ রায় তো ক্রিকেটের জন্যই ফুটবল খেলা ছেড়েছিলেন।"

উত্তর না দিয়ে ডাক্তারবাবু আর একবার স্টেথস্কোপ দিয়ে আনন্দর শ্বাস-প্রশ্বাস

পরীক্ষা করে অরুণকে বললেন, "ব্যাপারটা যে এই প্রথম, তা নয়। বছর কয়েক আগেই রিউম্যাটিক ফিভার শুরু হয়েছে। তখন গ্রাহ্য করেনি। চিকিৎসা না করে চেপে যাওয়ায়, ডাক্তারি পরিভাষায় এটা রিউম্যাটিক মাইট্রাল ইনকমপিটেন্সে দাঁড়ায়। সাধারণ সর্দি-জ্বর ভেবে চিকিৎসা না হওয়া আর অবহেলা, দুটো মিলে মনে হচ্ছে এখন অ্যাডভানসড স্টেজের দিকে এগিয়েছে। এক্স-রে করা দরকার, দেখতে হবে এট্রিয়েল ফাইব্রিলেশন হয়ে গেছে কি না।"

"খুব সিরিয়াস ধরনের কিছু কি?" অরুণ কোনওরকমে প্রশ্নটি করল। তার চোখে অজানা ভয় এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"হার্টের ব্যাপার। সেটা চলার একটা ছন্দ আছে। ছন্দটা বদলে গেছে। সুতরাং সিরিয়াস তো বটেই।"

আনন্দ দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "সারতে কতদিন লাগবে? আমাদের কোচিং এখনও দিনদশেক চলবে। তার আগেই—"

ডাক্তারবাবু গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ছেন দেখে আনন্দ থেমে গেল।

"বন্ধ। একদম বন্ধ। কোনওরকম পরিশ্রম নয়, সিঁড়ি ভাঙা পর্যন্ত বন্ধ। খুব আস্তে হাঁটাচলা করলেও করতে পারো। উত্তেজনা আসতে পারে এমন কোনও ব্যাপারে যাবে না, চিন্তাও করবে না। নুন খুব কম খাবে। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ যা লিখে দিচ্ছি তাই নিয়মিত খাবে, বৃষ্টিতে ভেজা একদম বারণ, মাটিতেও শোবে না।"

"খেলা একদম বারণ?" আনন্দ বিশ্বাস করতে পারছে না।

"হ্যাঁ, বারণ," তারপর অরুণকে প্রশ্ন, "বাথরুম কি দোতলায়?"

"না, একতলায়।"

"তা হলে ওকে একতলায় রাখার ব্যবস্থা করুন, যাতে সিঁড়ি ভাঙতে না হয়।"

অরুণ মাথা নাড়ল, কয়েক মুহূর্ত ভেবে আনন্দকে চাপা গলায় বলল, "তুই একটু ঘরের বাইরে যা, দু-একটা কথা ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করব।"

বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আনন্দ কান পেতে রেখেছিল ঘরে। দু-একটা টুকরো শুনতে পেয়েছে:

"দেখাশোনার কেউ নেই...নিশ্চয়, ওকে গুরুত্বটা বুঝিয়ে দেব।"

"এর থেকে সেরিব্রাল এমবলিজম হতে পারে...পারমানেন্ট প্যারালিসিস...সাবধান না হলে...জোর করে করতে হবে। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা...মা থাকলে ভাল হত।"

রাস্তায় একটা গোল হল। চিৎকারের মধ্যেও আনন্দ বুকের ধকধক শব্দটা শুনতে পাচ্ছে। প্যারালিসিস মানে পক্ষাঘাত। শুধু বিছানায় শুয়ে থাকা। 'হবে, হতে পারে অর্থাৎ আমি সারাজীবন বিছানায় শুয়ে থাকব! কী অদ্ভুত।'

"চল, যাই এবার।"

চমকে উঠল। চিন্তায় ডুবে ছিল, বুঝতে পারেনি অরুণ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, "ওই ছেলেটা ড্রিবল করছিল দারুণ, দেখবে?"

স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে শুকনো গলায় অরুণ শুধু বলল, "তাই নাকি।"

গম্ভীরমুখে সে সারা পথ স্কুটার চালিয়ে এল। ট্র্যাফিকের লাল আলোয় একবার থামতে হয়। তখন অরুণ পিছনে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, "একতলায় আমাদের একটা ঘর পড়ে আছে না? কী আছে ওটায়?"

"ভাঙা সোফা, ঝাড়বাতি আরও কীসব আছে। খুব আরশুলা ঘরটায়। প্রায়ই বিছে বেরোয়।"

আনন্দ আঁচ করতে পারছে মেজদার মাথায় এখন কী চিন্তা। একতলার ঘরটায় তার থাকার ব্যবস্থার কথা ভাবছে। কিন্তু ওঘরে বাস করার কোনও ইচ্ছেই তার নেই। সে আর একবার যখন আরশুলা-বিছের কথা বলতে যাচ্ছে তখনই স্কুটারটা ছেড়ে দিল। মেজদার চোয়াল অযথা শক্ত হয়ে গেছে দেখে সে বুঝল কোনও অনুনয়েই কাজ হবে না।

আনন্দর থাকার জন্য সেইদিনই ঘর নির্দিষ্ট হল একতলায়।

বাড়ির পিছনদিকে ছোট্ট এই ঘরটা বহু বছর পড়ে ছিল। বাড়ির লোকে ভুলেই গেছল ঘরটার কথা। উত্তরের জানলা খুললেই ঝোপঝাড় ছোটখাটো জঙ্গল। তারপরে একটা জলা জমি। জানলা ঘেঁষে বাড়ির পাঁচিল শুরু হয়েছে। দত্তদের কারখানার টিনের শেড আর চিমনিটা দেখা যায়। জানলার নীচেই পায়েচলা পথের দাগটা সাপের খোলসের মতো পাঁচিল ঘেঁষে কারখানার পিছনের দরজার পৌঁছেছে। আনন্দদের বাড়ির অর্ধেকটায় যে গুদাম, তার সঙ্গে কারখানার যোগাযোগ এই পথ দিয়েও হয়। তবে লরি আসে সামনের দরজায়।

মিস্ত্রি আনিয়ে সারিয়ে, চুণকাম করে আনন্দর খাট বিছানা বই থেকে শুরু করে ব্যবহারের যাবতীয় জিনিস নীচের ঘরে আনা হল। ছোট্ট ঘরটা তাতেই যেন ভরে গেল। উত্তরে ছাড়াও পুবে একটা জানলা। সেটা খুললে বাড়ির বাগান তারপর পাঁচিল। বাগান বলতে কাগজিলেবুর গাছ, নিম গাছ, স্তূপাকার পোড়ো ইট, জংধরা টিন, সিমেন্টের ভাঙা রক আর এক হাঁটু ঘাস।

ঘরের ভিতর দিকেও একটা জানলা। অনেক টানাটানি করে অরুণ সেটা খোলে। অনাদিপ্রসাদের চেম্বারের দরজার মুখোমুখি জানলাটা। অরুণ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয়।

"দু-একদিন লাগবে ঘরের গন্ধটা কাটতে। তারপরই ঠিক হয়ে যাবে। একটা পাখা লাগবে, কাল পরশুই কিনে আনব। একটা ঘড়ি হলেও ভাল হয়। আলনাও দরকার।"

আনন্দ খাটে বসে দেখছিল কথা বলতে বলতে অরুণের পায়চারি। একা একটা ঘরে এবার থেকে দিন-রাত কাটাতে হবে ভাবতেই তার গা ছমছম করে উঠছে। কৌতূহলও হচ্ছে। ব্যাপারটা কেমন লাগবে কে জানে। অনেক রাত পর্যন্ত গল্পের বই পড়া যাবে, আলো নিভিয়ে দিতে বলবে না কেউ। এই সুবিধেটা ছাড়া আর কী লাভ হচ্ছে!

"মেজদা, আমার কী অসুখ করেছে?"

"কিছু না, সামান্যই", অরুণ হাসবার চেষ্টা করে বলল। "অসুখ অনেক রকমের

হয়, কোনওটায় সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন করতে হয়, কোনওটায় দীর্ঘদিন ওষুধ আর খাওয়াদাওয়ার রেস্ট্রিকশনে থাকতে হয়, কোনওটায় শুধু ডিসিপ্লিনড হতে হয়। আন্দ, তোমায় ডিসিপ্লিনড হতে হবে।"

বিপিন দোতলার কুঁজোটা এনে রাখল। হাবুর মা তার নিজের বিছানা বালিশ এনে খাটের নীচে গুছিয়ে রাখছিল, বিপিন ধমকে উঠল: "ওসব এখানে কেন?"

"আন্দ কি রাতে একা শোবে নাকি? ভয় করবে না?"

"তোর তো নাক ডাকে, ও ঘুমোবে কী করে?"

একটা ধুন্দুমার ঝগড়াকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে অরুণ বলল, "হাবুর মা রাতে এঘরে থাকুক। একজনের থাকা দরকার। আনন্দর চলাফেরা একদম বারণ। ঝগড়াঝাঁটি শুনলে উত্তেজনা হবে, তাতে ক্ষতি হতে পারে।"

অরুণের কথা শেষ হতে ওরা আনন্দর দিকেই তাকিয়ে ছিল। সে দেখল দু জোড়া চোখে ভীষণ মমতা, স্নেহ আর উৎকণ্ঠা। দেখে সে হাসল।

অরুণ তার পাশে খাটে বসল। জানলা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে আছে। কিছু একটা ভাবছে। আনন্দও চুপ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে। সে কিছুই ভাবছে না। ঘরে আর কেউ নেই। জলার দিক থেকে ঘুঘুর ডাক ভেসে আসছে।

"আন্দ, তুই যথেষ্ট বড় হয়েছিস, নিজের ভালমন্দ বোঝার মতো বয়স হয়েছে।"

অরুণ জানলার বাইরে চোখ রেখেই কথা বলে যাচ্ছে। ভারী থমথমে গলার স্বর। কারুর মৃত্যু সংবাদ বা গুরুতর দুর্ঘটনার খবর বলার সময় রেডিয়োর খবরপড়ুয়ার স্বর যেরকম হয়। মেজদা ওদের সকলের থেকে ভাল খবর পড়ে দেবে।

"তোর অসুখটা খুব সিরিয়াস ধরনের।"

"কী অসুখ?"

"তোকে দারুণভাবে নিয়ম মেনে চলতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টাই শুয়ে থাকা দরকার। শুধু বাথরুমে যাওয়া ছাড়া। শুয়েই খাওয়াদাওয়া করতে পারলে ভাল হয়।"

"আমি তো চলাফেরা দিব্যিই করতে পারছি, তা হলে?"

"এ ঘর থেকে একদম বেরোবে না।"

"ডাক্তারবাবু তো বললেন আস্তে আস্তে চলাফেরা করা যায়, শুধু সিঁড়ি ভাঙাই বারণ।"

"নিয়মিত ট্যাবলেট খেতেই হবে।"

আনন্দ চুপ করে রইল। অরুণের স্বর অধৈর্য বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ভিতরে ভিতরে যেন আবেগের সঙ্গে সে যুদ্ধ করছে। চেপে নামিয়ে দিচ্ছে কিন্তু পারছে না। চোখ বড় হয়ে গেছে, মুখ লাল হচ্ছে। মেজদার ভিতরে একটা বেলুন ফুলে উঠছে। ফেটে যায় যদি!

"ঠাণ্ডা লাগাবে না। সারাক্ষণ জামা পরে থাকতে হবে। এঘরে বোধহয় পাখা দেওয়াটা ঠিক হবে না। সর্দি-কাশি কোনওরকমেই যেন না হয়।"

অরুণ উঠে গিয়ে জানলাগুলো বন্ধ করে আবার খুলে কয়েকবার পরীক্ষা করল।

"বৃষ্টিতে ভেজা একদম বারণ। চটি আছে? আচ্ছা কিনে আনব। খালি পায়ে হাঁটবে

না কখনও। মেঝেয় ভুলেও শোবে না। বসবেও না।"

"না না না, কী হয়েছে আমার যে এত বারণ? এই তো আমি হাঁটছি।"

আনন্দ পায়চারি শুরু করল।

"এই তো লাফাচ্ছি।"

"আন্দ!"

চাপা চিৎকার করে অরুণ হাত বাড়িয়ে আনন্দর হাত চেপে ধরল।

"ক্লাস টেন-এ যে পড়ছে, নিজের ভালমন্দ তার বোঝা উচিত।"

"কী আমার ভাল আর মন্দ? এইভাবে ঘরের মধ্যে সারাদিন নিয়ম মেনে, কী আমার ভাল হবে? আমি তো ঠিকই আছি। শুধু এই ব্যথাটা, এ তো সেরে যাবে। বল করার সময় বুকের মধ্যে যে ধড়ফড়ানি—"

"কোনওদিন সারবে না।"

বলেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল অরুণের মুখ। আনন্দ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে।

"কোনওদিনই না?"

"নিশ্চয়ই সারবে, ডাক্তারবাবু যা বলেছেন যদি সেইভাবে চলো। আন্দ...আন্দ তোর নিজের জীবন এখন তোর নিজেরই হাতে। সারাক্ষণ তোকে চোখে চোখে রাখবার কেউ নেই। নিজেকেই নিজে দেখবি।"

"যদি না দেখি?"

অরুণ চুপ করে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। বেলুনটা ফেটে চুপসে গেছে।

"আমার প্যারালিসিস হবে। আজীবন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।"

আনন্দ চেয়ারে বসল অরুণের মুখোমুখি। বিকেলের ফিকে সোনালি রোদ দূরে একটা নারকেল গাছের পাতার ভাঁজে ভাঁজে ধুলোর মতো জমে। পুবের জানলা দিয়ে অরুণ দেখছে আষাঢ়ের মেঘ। আকাশের একটা কোণ থেকে গুঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে পিঠে একরাশ বৃষ্টি নিয়ে। দুজনেই ক্রমশ ধূসর ঝাপসা হতে লাগল ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে।

"আন্দ, আন্দ।"

ফিসফিস করল অরুণ। হঠাৎ আনন্দর মনে পড়ল তার মাকে।

"ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। আমি ঘুমোচ্ছিলুম। হাবুর মা ঘুম ভাঙিয়ে বলল, চল মা তোকে দেখতে চাইছে।"

"আন্দ তুই ফাস্টবোলার হতে চাস, তাই না?"

"বড়দা, বাবা, বিপিনদা, ডাক্তারবাবু, তুমি—সবাই তখন ঘরে ছিলে। হাবুর মা আমাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল মার কাছে। আমি চোখ মেলতে পারছিলাম না, এত ঘুম তখনও চোখে। মা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাসল, ডান হাতটা কাঁধের ঠিক এইখানে রেখে আমায় টানল। আমি মার বুকে মাথা রাখলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা শুধু বলল, আন্দ আন্দ, লক্ষ্মী হয়ে থাকিস। তারপর বৃষ্টির একটানা শব্দটা আমাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিল।"

"আন্দ, লর্ডস মেলবোর্ন ব্রিজটাউন ইডেনে আগুন ছোটাবি। ইন্ডিয়া রাবার আনবে

ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে।"

"বৃষ্টিতে আমি ভিজতুম। বৃষ্টি আমাকে মার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বৃষ্টি মায়ের মতো সারা গায়ে হাত বুলোয়। আমার জ্বর হত, তবু ভিজতুম। মেজদা, আর কি ভিজতে পারব না?"

"আন্দ, সারা দেশ গর্বে তোর দিকে তাকাবে। বলবে, হারা ম্যাচ, জেতা অসম্ভব, তবু জিতিয়ে দিল আনন্দ ব্যানার্জি। একা জিতিয়ে দিল। এমন ফাস্ট বোলিং পৃথিবীতে আগে হয়নি।"

"কিন্তু আমি জানি, আমি জানি।"

আনন্দ ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে মুখ রাখল অরুণের কোলে।

"কিচ্ছু জানিস না। কী জানিস...য়্যাঁ, কী জানিস এইটুকু ছেলে? সব অসুখই সারে। লক্ষ্মীছেলের মতো কথা শুনলে সব অসুখই সারে।"

॥ পাঁচ ॥

জানলার ধারে ভোরবেলায় চেয়ারে বসে আনন্দ কৌতূহলে তাকিয়ে রইল মাঠের দিকে।

চেয়ারে বসলেই শুধু মাঠটার এক-তৃতীয়াংশ পুবদিকের জানলা দিয়ে দেখা যায়। বাকিটা ঢাকা পড়েছে কাগজিলেবু গাছটায়। বটতলা ইনস্টিটিউটের খানিকটা দেয়াল আর লাইব্রেরির একটা জানলাও আনন্দ দেখতে পায়। এখন জানলাটা বন্ধ অর্থাৎ ডগুদা এখনও আসেনি। সাতটায় লাইব্রেরি খোলার কথা।

এই নিয়ে চারদিন ওরা মাঠে আসছে। গুটি সাতেক বাচ্চা মেয়ে এবং আর একজন, যাকে প্রায়ই আনন্দ রাস্তায় দেখেছে। কাঁধে রঙিন ঝোলা, কালোপাড় সাদা শাড়ি, গায়ের রঙ কার্বন পেপারের ঝকঝকে দিকটার মতো, মুখটি লম্বাটে, সামনের দুটি দাঁতকে ঠোঁট কোনওমতেই আড়ালে রাখতে পারে না। শুধু হাঁটার জন্যই ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। এমন মেরুদণ্ড সিধে রেখে, চওড়া কবজির হাত দুটো না দুলিয়ে, মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে, গ্যারি সোবার্সের চলনে কোনও মেয়েকে আনন্দ হাঁটতে দেখেনি। সে আরও লক্ষ করেছে, প্রায় পুরুষদের মতো বাইসেপসের গড়ন, আঙুলগুলো মোটা। পায়ে সাদা কেডস। বয়স, আন্দাজ করা শক্ত। তার মনে হয়েছে, তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে কোনও একটা জায়গায়। আনন্দ ওকে লটারির টিকিট বিক্রি করতে দেখেছে। থাকে বোধহয় বটতলার পিছনের কোনও গলিতে। তার বেশি সে ওর সম্পর্কে কিছু জানে না। মেয়েগুলির বেশির ভাগই বটতলা পাড়ার।

মাঠটাকে পাক দিয়ে ওরা দৌড়চ্ছে। কাগজিলেবু গাছটার পাশ দিয়ে সেকেন্ড দশেকের জন্য আনন্দ ওদের দেখতে পাচ্ছে। ধীরে, যেন লেফট-রাইট করতে করতে দৌড়চ্ছে। পা ফেলা শিখছে। একটি মেয়ের হচ্ছে না, আনন্দ এত দূর থেকেই সেটা বুঝতে পারছে।

মেয়েটি থেমে বাঁ দিকে তাকাল। লেবু গাছের আড়াল থেকে এগিয়ে এল—মনে

মনে আনন্দ নামটা ঠিক করে ফেলে—'লেডি সোবার্স'। মেয়েটিকে কী বোঝাচ্ছে হাত নেড়ে, তারপর ঝুঁকে পা দুটো ধরে পর পর তোলা-নামা করিয়ে। এতদূর থেকে আনন্দ শুনতে পাচ্ছে না। স্টেপিংটা দেখাবার জন্য লেডি সোবার্স নিজেই ছুটতে গিয়ে হাঁটুতে শাড়ি আটকে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল।

আনন্দ চোখ বুজল সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় কুড়ি সেকেন্ড পর চোখ খুলল। মাঠের ওইখানটা ফাঁকা, কেউ নেই! এবার এল দুটি মেয়ে। ওদের পিছনে, লেডি সোবার্স। অ্যাথলিটরা যেমন খাটো প্যান্ট পরে তাই পরনে। রংটা আকাশি নীল। আনন্দ অবাক হয়ে গেল ওকে প্যান্ট পরা দেখে। এত বয়সী কেউ, অত খাটো প্যান্ট পরে এমন খোলা মাঠে! লোকজন যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয় ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে বা দাঁড়িয়ে পড়ছে। আনন্দর কান দুটো গরম হয়ে উঠল। প্যান্টটা নিশ্চয় পরেই এসেছিল, ব্লাউজের মতো শার্টটাও। নিশ্চয় একসময় দৌড়টোড় করত, ধরনধারণ দেখে তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এইরকম রক্ষণশীল এলাকায় প্রকাশ্যে এমন পোশাক পরতে পারে এত বয়সে—এ কে?

আনন্দ এরপর অনেকক্ষণ আর ওদের দেখতে পেল না। কিছু একটা করছে ওরা লেবু গাছটার ওধারে। দোতলার বারান্দায় গেলে দেখা যাবে, কিন্তু এঘর থেকে তার বেরোনো নিষেধ। শিকারি নেকড়ের মতো বিপিনদা ঘুরে বেড়ায় ঘরটার কাছাকাছি, দোতলায় মেজদা এখনও নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে। নতুন টেবল-ঘড়িটায় সময় দেখল আনন্দ। ছ'টা বেজে পঞ্চাশ। সূর্য এখনও মন্দিরের আড়ালে, তবে কারখানার চালার ওপর রোদ পড়েছে।

ঘর থেকে সন্তর্পণে আনন্দ বেরোল। দোতলার বারান্দার তলায়, সিং-দরজার পাশের রকটা থেকে মাঠের অপরদিক দেখা যায়। মেয়েরা এখন কী করছে সেটা জানার জন্য কৌতূহলে সে মারা যাচ্ছে।

বিপিনদা বোধহয় দোতলায়। রান্নাঘর থেকে শব্দ আসছে, হাবুর মা এখন ব্যস্ত। প্রায় ছুটেই সে বাইরের রকে এল। একমাস পর এই প্রথম।

লেডি সোবার্স স্টার্ট নেওয়া দেখাচ্ছে। মাটিতে দুহাত, একটা হাঁটু ভেঙে মাটিতে ছুঁইয়ে রাখা। ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বেড়ালের মতো শরীরটা কুঁকড়ে, তারপরই ছিটকে যাওয়া। এত দূর থেকে আনন্দ দেখতে পাচ্ছে স্টার্ট নেবার সেকেন্ড চারেক আগে ওর সারা শরীরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। হাতির শুঁড়ের মতো কাঁধ থেকে নেমে আসা হাত দুটোর পেশিগুলো তীক্ষ্ণ হল, উরু থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত পাকানো রয়েছে ইস্পাতের স্প্রিং। মুখটা তুলে সামনে তাকিয়ে। গলার দুপাশে কান পর্যন্ত দড়ির মতো পাকিয়ে উঠেছে মাংস, চোয়াল শক্ত আর চোখদুটো ঝকঝক করছে সকালের রোদে। কালো পাথরে কয়েক মুহূর্তের জন্য খোদাই করা একটা অদ্ভুত কাঠিন্য যা বেগবান হবার প্রতীক্ষায়। বিপুল প্রাণশক্তি বেঁধে রাখা আছে লেডি সোবার্সের এই ভঙ্গিতে, ছাড়া পেলেই সকালের এই নরম রোদকে জ্বালিয়ে উৎখাত করে দেবে যেন। আনন্দর বুকের মধ্যে তিরতির করে উঠল ভয়।

কিন্তু ও কে? আনন্দ বিশ্বাস করতে পারছে না। কোমরে হাত রেখে। সরু কঞ্চির

মতো ডান পা। শরীরটা ডানদিকে হেলে রয়েছে। মেয়েদের থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে লেডি সোবার্সের স্টার্ট শেখানো দেখছে। বীরা দত্ত রোড ধরে ডগুদা তখন হনহনিয়ে আসছে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে।

ডগুদাকে দেখে ও বাঁ দিকে ঝুঁকে পা টানতে টানতে এগিয়ে গেল। লাইব্রেরির দরজায় তালা খুলে ডগুদা ভিতরে ঢুকল। বেরিয়ে এল হাতে একটা বেলের আকারের লোহার গোলা নিয়ে, একে ওরা বলে শট! ইনস্টিটিউটের টিকে থাকা যে ক'টি লোহার সম্পত্তি এখনও রয়েছে এটি তারই অন্যতম।

শটটা দুহাতে ধরে, ও দুলে দুলে ফিরে এল। ধপ করে মাটিতে ফেলে, তালু ঝাড়ল। অবাক হয়ে আনন্দ ভাবল, লোহার বল কে ছুড়বে? ওই মেয়েরা না লেডি সোবার্স?

উত্তরটা একটু পরেই সে জেনে গেল। মেয়েরা একে একে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। সাতটার পর ওরা থাকে না। হয়তো পড়াশুনো করতে হয়। লেডি সোবার্স শট নিয়ে ছুড়তে শুরু করল। তিনটে ইট সাজিয়ে সার্কল করেছে। সার্কলের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। ডান হাতে ধরা শট ডান গালে ঠেকিয়ে কুঁজো হয়ে। বাঁ পা জমি থেকে তোলা। স্ট্যাচুর মতো কয়েক সেকেন্ড নিথর, তারপরই ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠল। ডান পায়ের ওপর ভর করে তিনটে ছোট্ট লাফে সার্কলের কাছে পৌঁছেই শরীরটা ঘুরিয়ে নিয়ে বাঁ পা মাটিতে ফেলল। ডেলিভারি দেবার ঠিক আগে যেন—তারপর সারা শরীরের মাসল টানটান। সব জোর গুটিয়ে এসে কাঁধে, সেখান থেকে ডান বাহু বেয়ে উঠে এল শট ধরা মুঠোয়। "আ আ আহ্" চাপা একটা গোঙানির মতো আওয়াজ এতদূর থেকেও আনন্দ শুনতে পেল। তারপরই লোহার গোলাটা হাত থেকে উড়ে বেরিয়ে এল। মাটিতে পড়তেই ধপ শব্দ হল একটা।

ও প্রায় পনেরো হাত ছুটে গেল, দুলতে দুলতে। একটা ভাঙা ইটের ছুচলো টুকরো দিয়ে আঁচড় কাটল যেখানে গোলাটা পড়েছে। তারপর সেটা দুহাতে ধরে ফিরে এল লেডি সোবার্সের কাছে। আনন্দ হেসে ফেলল। সর্বত্র এই ওর কাজ, ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু সারাজীবন কি ওর এইভাবেই চলবে! খাওয়া-পরার জন্য তো ওকে কাজকম্মো করতে হবে, চেষ্টা না করলে কি কাজ পাওয়া যায়? তা ছাড়া কে ওকে কাজ দেবে? খোঁড়া লোকেরাও চাকরি করে কিন্তু তারা লেখাপড়া জানে। ও তো স্কুলে পড়ে বলে মনে হয় না।

পিছনে গলা খাঁকরি হতেই আনন্দ চমকে কুঁকড়ে গেল। তাকিয়ে দেখল, বাবা।

"এখানে?"

"এই দেখছি, কেমন প্র্যাকটিস করছে শট পাট।"

অনাদিপ্রসাদ এগিয়ে এসে মাঠের দিকে তাকালেন, ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

"অসভ্যের মতো পোশাক, এসব কী! মেয়েছেলের এ কী বেশ!"

আনন্দ একপা একপা পিছোচ্ছে।

"তুমি দেখছিলে?"

"এইমাত্র আমি এলাম।"

"হুম্।"

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। ডান দিকে ঘুরেই আনন্দ ছুটে ঘরে এল। অনাদিপ্রসাদের গলা শোনা গেল, বিপিনদাকে ধমকাচ্ছেন আনন্দর উপর নজর রাখায় অবহেলার জন্য।

সারাদিন কিছু করার নেই। মেজদার এনে দেওয়া গল্পের বই পড়া আর বিলিতি খেলার ম্যাগাজিন দেখা ছাড়া। ছবিগুলো দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। ইংরেজি অক্ষরগুলোর অধিকাংশেরই মানে বুঝতে পারে না। আর বুঝতে না পারলে শুধু ছবি দেখে কী লাভ। বাড়ির কয়েকটি লোকের মুখ আর গলার শব্দ, এছাড়া আর কোনও মানুষের মুখ সে দেখতে পায় না। পুবের জানলা দিয়ে দূরে, কয়েক হাত বীরা দত্ত রোড আর মাঠে লরি দাঁড়ালে কয়েকটা লোক দেখা যায়। শুধু একদিন দুপুরে খুব কাছ থেকে একটা লোককে দেখেছিল।

উত্তরের জানলা দিয়ে সে দূরে তাকিয়ে শুয়েছিল। বহু দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়। ঘন ঝোপগুলোর ওপাশে জলা। মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক ট্রেনের ভেঁপু বেজে উঠছে। আনন্দ কিছুই ভাবছিল না। শুধুই তাকিয়ে রয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ জানলার গায়ের পথটা দিয়ে একটা লোক চলে গেল। পাঁচ-ছ সেকেন্ড পরে লোকটা, যার একমুখ দাড়ি আর একরাশ পাকাচুল, পিছিয়ে এসে অবাক হয়ে জানলা দিয়ে ভেতরে তাকাল। কারখানার কেউ, হয়তো গুদামে যাচ্ছে। আগে কখনও সে এই জানলাটা খোলা দেখেনি।

আনন্দ চমকে উঠেছিল। প্রায় তিন হাত দূরে এমন বিদঘুটে একটা মুখ আচমকা হাজির হলে ভয় তো করবেই। হাত বাড়িয়ে জানলার পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। বহুক্ষণ পরে পাল্লা খুলে এধার ওধার তাকায়। লোকটাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। বহুদিন সে বাইরের মানুষ দেখেনি। তারপর সে একটু একটু করে বিষণ্ণ হয়ে পড়তে শুরু করে। খুব স্বাভাবিক, সাধারণ বিষণ্ণতা। দীর্ঘদিন মানুষ না দেখলে, বাইরে বেরোতে না পারলে, এরকম সকলেরই হয়। এই নিয়ে নালিশ করা যায় না। করবেই বা কার কাছে। প্রতিদিন সকালে আর রাতে মেজদা আসে। তাকে কিছু বলা যাবে না এই নিয়ে। বেরোনোর কথায় একদমই কান দেবে না।

আনন্দ আপনমনে মাথা নাড়ল। মনটা ভার লাগছে। সকালে মেয়েদের ছোটা দেখে তার নিজেরও ইচ্ছা করেছিল, মাঠে গিয়ে ছুটতে। ওদের মতো স্টেপিং ফেলে দৌড়তে। হঠাৎ সে উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করল। যেভাবে ওরা পা ফেলছিল সেই ভঙ্গিতে পা ফেলে ছোট্ট ঘরটায় আনন্দ পাক দিতে শুরু করল।

মাথাটা ঘুরছে, আনি-মানি-জানিনা'র পর যেভাবে ঘোরে। হাঁপ ধরছে। কারণ, যে-কোনও পরিশ্রমই একদম বারণ। আনন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখটা রাগে গনগনে হয়ে উঠল। দ্বিগুণ জোরে সে হাঁটু তুলে তুলে ঘরের মধ্যে গোল হয়ে ছুটতে শুরু করল। আর বিড়বিড় করে বলতে থাকল:

"বেশ করব। বেশ করব। বারণ বারণ বারণ। মানি না মানি না। এভাবে বেঁচে থাকার দরকার নেই, মানে হয় না।"

বিছানার উপর দড়াম করে পড়ল সে। বালিশে মুখ ডুবিয়ে হাঁপাচ্ছে। হাঁপানিটা ধীরে ধীরে কান্নায় রূপান্তরিত হল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কিছুক্ষণ কেঁদে সে শূন্য চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন সে একটা পাখির ডাক শুনতে পেল। প্রথমে ভেবেছিল বাঁশি। দ্বিতীয়বার সে মুখ তুলে উত্তরের জানলা দিয়ে তাকাল। ক্ল্যারিওনেটে প্রথম ফুঁ দেওয়ার মতো করুণ একটানা। সেকেন্ড চারেক পরই স্বরটা ছটফটিয়ে লাফালাফি করল ছোট্ট বাছুরের মতো।

বার তিনেক ডাকার পর পাখিটার আর সাড়া নেই। কী পাখি? কোথায় ছিল এতদিন? ঝোপ-জঙ্গলের দিকে চোখ রাখল আনন্দ। অদ্ভুত ডাকটা তো। ময়না, কোকিল আর টিয়ে, কাক, চড়াই আর পায়রা ছাড়া ক'টা পাখির ডাকই বা শুনেছি। ক'টা গাছই বা চিনি। গ্রামের ছেলেরা অনেক বেশি জানে। এ পাখিটা আগেও হয়তো ডেকেছে, শুনিনি। কী মিষ্টি, অদ্ভুত কী যেন একটা রয়েছে শিসটায়।

আনন্দ বুঝতে পারছে না, কিন্তু শরীরে অনুভব করতে পারছে। হাতের রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। তিরতির করে কাঁপুনি দিয়েছিল যেভাবে আজ সকালে তার বুকের মধ্যে হয়েছিল। নিঃসঙ্গ দিন ও রাতের মধ্যে ঢুকে পড়েছে অজানা এক সঙ্গী, এই শিসটা।

আবার শিস।

পুবের জানলায় সরে এসে আনন্দ নিম গাছের ডালে ডালে চোখ ফেলতে লাগল। কত বড়? চড়ুইয়ের মতো ছোট্ট? কাকাতুয়ার মতো বড়? শালিক পাখির মতো রঙ? কী নাম?

আনন্দ একবার উত্তরের, একবার পুবের জানলায় আসা-যাওয়া শুরু করল। আর ডাকছে না, হয়তো উড়ে গেছে। কিংবা ও সারাদিন তিন-চারবারের বেশি ডাকে না। কত পাখির কতরকমের স্বভাবই যে থাকে। কিংবা এখনি হয়তো কোনও বেড়াল কি চিল কি সাপ ওকে...!

হতাশ হয়ে আনন্দ বিছানায় শুয়ে বাইরে তাকাল। আকাশ ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আকাশে মেঘ, উঁচু থেকে তোলা হিমালয় পর্বতমালার ছবির মতো। কী নিঃসঙ্গ, ধূধূ, বিরাট! বহুদিন আগে একটা রূপকথায় সে পড়েছিল, মানুষ মারা গেলে মেঘ হয়। সে বিশ্বাস করত এবং এখনও করে তার মা মেঘ হয়ে আকাশে কোথাও আছে। কিংবা হয়তো নেই। গনগনে রোদের তাপে সমুদ্র নদী খাল বিলের জল বাষ্প হয়ে মেঘ হয়। এসব প্রকৃতির তৈরি মেঘ। তার মা এভাবে মেঘ হবে না। কীভাবে হবে, কেমন দেখতে হবে তাই নিয়ে সে ভাবতে থাকল।

ঘুমিয়ে পড়েছিল আনন্দ। বন্ধ দরজায় ধাক্কার শব্দে ঘুম ভাঙল। হাবুর মা দুধ এনেছে। সে তাকাল লেবুগাছের পাশ দিয়ে মাঠের দিকে। ম্লান হয়ে এসেছে বিকেল। সন্ধ্যা নামছে। কয়েকটি মেয়ে মাঠের উপর দৌড়ে গেল। তারপর ও এল দুলতে দুলতে। ভাঙা ইটের টুকরো কুড়িয়ে একধারে ছুড়ে ফেলতে ফেলতে এগোচ্ছে। খালি পায়ে মেয়েদের পা কাটে, ব্যথা লাগে বলে তাই কাজে নেমে পড়েছে। সেই কুড়োনোরই কাজ। আনন্দ হাসতে গিয়েও হাসল না। ও যা কিছু করে সবই অন্যকে

সাহায্য দিতে যেটা ওরই দরকার। লেডি সোবার্স বিকেলে আসে না। এধার ওধার ঘুরে এই সময়টায় হয়তো লটারির টিকিট বিক্রিতে ব্যস্ত থাকে। নিশ্চয় খুব গরিব। অনেকগুলো লোক আছে বাড়িতে, তাদের খাওয়াতে পরাতে হয়। ওর কাছ থেকে একটা টিকিট কিনলে কেমন হয়?

সন্ধ্যায় হাবুর মা আফিংয়ের মৌতাতে বুঁদ হয়ে থাকে। বাবা চেম্বারে, মেজদা তো কোনওদিনই ফেরে না। বিপিনদা এইমাত্র কাচা জামা-প্যান্টের পুঁটলি নিয়ে বেরোল ধোপার কাছে ইস্ত্রি করিয়ে আনতে।

সন্তর্পণে ফটক থেকে বেরিয়েই আনন্দ প্রায় ছুটে অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে ইনস্টিটিউটের দিকে এগোল। ডগুদা লাইব্রেরি খুলেছে অনেকক্ষণ।

ডগুদা নিজেই একদিন বলেছিল, তার নাম ডগু কেন।

"ডগ থেকে ডগু। ডগ মানে কুকুর। পতৌদির নাম টাইগার কেন জানিস? ছোটবেলায় ও বাঘাহামা দিত। তাই আদর করে টাইগার বলে ডাকা হত। আমিও ওই রকম হামা দিতুম, কিন্তু আমাকে বাবা আদর করে বলত ডগ। পতৌদির বাবা ছিল নবাব, আমার বাবা ছিল স্যাকরার দোকানের কারিগর। জীবনে হালুম হালুম করার চানস আর এল না, শুধু ঘেউ ঘেউই করে গেলুম। তাই সবাই বলে রগচটা ডগু।"

ডগুদার বয়স বোঝা যায় না। চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে যে কোনও একটা বয়স ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিয়ে করেনি। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে কি না বোঝা যায় না কথাবার্তায়। মাথায় টাক, ছোটখাটো রোগাটে চেহারা। ভাইদের সংসারের এককোণে পড়ে আছে। বাড়ির বাইরের দিকের ঘরটায় থাকে। ময়দানে ঘেরা মাঠের গেট-কিপার। দৈনিক সাতটাকা মাইনে। বছরে পাঁচমাস মাত্র এই চাকরি। বাকি সাতমাস চলে টিউশনি করে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলেকে পড়িয়ে মাসে আশি টাকা পায়। আর আছে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের জন্য বেগারখাটা। তারই অন্যতম, এই অবৈতনিক লাইব্রেরিয়ানের কাজ।

পঁয়ত্রিশ বছরের এই লাইব্রেরিতে গত বছর দশেক বই কেনা হয়নি। তার আগে কেনা আর চেয়েচিন্তে আনা হাজার খানেক পুরনো বই নিয়েই ডগুদা চালিয়ে যাচ্ছে। মেম্বারদের চাঁদা থেকে মাসে গোটা পঁচিশ টাকা পাওয়া যায়। ইলেকট্রিক বিলের বাকি টাকা জমে গেলে ডগুদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে সেক্রেটারি অনাদিপ্রসাদের কাছে। কিছুক্ষণ ধরে চড়াগলায় বলে যায়—"পাড়াটা মরে গেল, এলাকাটা মরে গেল। কী ছিল আর কী হয়েছে! ছেলেরা বই পড়ে না, খেলাধূলো ব্যায়াম করে না। আপনারাও এসব দেখবেন না। নতুন বই কেনা দরকার, খেলার জিনিস টিনিস কিনে ছেলেদের সংগঠিত (ডগুদা ঘেরামাঠ কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্য) করে একটা খেলার ক্লাব দরকার। প্রেসিডেন্ট তো মাঠটাকে নিজের কায়েমি স্বার্থে ব্যবহার করছে, তার তো উদ্দেশ্য মাঠটায় যাতে খেলাধুলো না হয়। বুঝি না ভেবেছেন? আমি ঠোঁটকাটা মানুষ, যা বুঝি তাই বলেছি। এসব আমি হতে দেব না, আপনি মেম্বারদের ডেকে সভা করুন, আমি বক্তব্য রাখব, আবেদন জানাব।"

কোনওবারই সভা ডাকা হয়নি, সুতরাং আবেদনও জানান হয়নি। তবে লাইব্রেরির

ইলেকট্রিক বাতি জ্বলা বন্ধ হয়নি। অনাদিপ্রসাদ বিল মিটিয়ে দেন।

ডগুদা মাথা নিচু করে ইস্যু করা বইয়ের নাম খাতায় লিখছে। অপেক্ষমাণ মেম্বারের হাতে বইটা দেবার সময় মুখ তুলেই দেখল আনন্দকে।

"কী রে, তোর নাকি অসুখ? স্কুলে যাওয়া বন্ধ?"

"কে বলল?"

"তোদের ক্লাসের শিবনাথ। হয়েছে কী?"

"বুকে একটা ব্যথা, রেস্ট নিলেই সেরে যাবে।" ইতস্তত করে আনন্দ বলল, "ডগুদা, খেলার বই কিছু আছে আর?"

"আর! মানে? ছিল নাকি কোনওকালে যে আর থাকবে?"

আনন্দ চোখ বোলাল ডগুদার পিছনে পর পর দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বইয়ের র‍্যাকগুলোর দিকে। ছাদ থেকে শিকে ঝোলানো তক্তায় রয়েছে পুরনো বাঁধানো পত্রিকা। মেঝেয় পড়ে আছে উইয়ে খাওয়া কিছু বই। ওগুলো ওজনদরে বিক্রি হবে।

"একটা বই তো ছিল, ব্র্যাডম্যানের আর্ট অফ ক্রিকেট। উইয়ে খেয়েছে বলে—"

আনন্দ থেমে গেল। বই পালটাতে এসেছে বটতলার মাইতিদের বাড়ির চাকর।

"মা জিজ্ঞাসা করতে বলল, নেতাজিকে নিয়ে কী একটা বই বেরিয়েছে, সেটা দিতে।"

"এখনও কেনা হয়নি।"

"তা হলে নিমাই—"

"ইস্যু হয়ে গেছে।"

"তা হলে মোটা একটা বই দিন। একটা গপ্পো থাকবে।"

ডগুদা মুখ পিছনে ফিরিয়ে কাকে যেন বলল, "একটা মোটা উপন্যাস দে তো রে। তিন নম্বর র‍্যাকটা দ্যাখ।"

ডগুদা এরপর আনন্দকে উদ্দেশ করে বলল, "লাইব্রেরি বলবি এটাকে? ওই যে বাঁধানো লেখাটা, পড় তো।"

আনন্দ এগিয়ে গেল দরজার পাশে ঝোলানো লেখাটা পড়তে। ধুলো আর বৃষ্টির জলে, বহুবছর আগে তুলি দিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে।

"এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে...পড়তে পারছি না ডগুদা, জেবড়ে গেছে..."

"দেবতাত্মা হবে।"

"দেবতাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের...পড়তে পারছি না।"

"কাগজের হাহাকারে।"

"বাঁধা পড়িয়া আছে।"

"তারপরের প্যারা?"

"শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনই এই লাইব্রেরির মধ্যে

কি...ধুয়ে গেছে।"

"সমুদ্রের।"

"সমুদ্রের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ?"

"এবার বল এখানে কী শুনতে, কী দেখতে পাচ্ছিস? সমুদ্রের শব্দ? দেবতা আর অমর আলোক?"

"কথাটা দেবতাত্মা নয়, মানবাত্মা।"

চমকে আনন্দ ঘুরে দাঁড়াল। সামান্য বাদামি ঝাঁকড়া চুল, পাখির ঠোঁটের মতো নাকের ডগাটা বাঁকা। হাতে একটা বই। সেইরকম চুপিসাড়ে র‍্যাকগুলোর পিছন থেকে এসে দাঁড়িয়েছে ডগুদার পাশে।

"কথাটা হচ্ছে—এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের...হাহাকারে নয় কারাগারে, বাঁধা পড়িয়া আছে। শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনই এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের...সমুদ্রের নয়, উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ?"

আনন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে শুনছিল ওর কণ্ঠস্বর। যেন সরোদ বাজাচ্ছে গলা দিয়ে। ক্ষীণ শ্রদ্ধা জমে উঠল তার মনে। ডগুদা বিব্রত মুখে খাতায় বইয়ের নাম লিখতে লিখতে বলল, "সময় হয়ে গেছে, এবার কিন্তু বন্ধ করব।"

দুলতে দুলতে ও বেরিয়ে গেল। হাতে একটা পাতলা বই। দরজার কাছে গিয়ে একবার ফিরে তাকিয়েছিল আনন্দর দিকে। চোখাচোখি হতেই হেসেছিল, আনন্দও।

"ও কে ডগুদা?"

"অমল। ওকে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান করেছি। ভীষণ পড়ে। দেখলি তো কী রকম ভুলটা ধরিয়ে দিল।"

"অমল, পদবি কী?"

"গীতার ছেলে, মানে সতাতো ছেলে, ওর স্বামীর আগের পক্ষের। গীতা যখন বিধবা হয়ে ভাইদের কাছে এল তখন ওকেও সঙ্গে আনে। কেউ দেখার নেই, খাওয়াবার নেই। ওকে ফেলে আসতে পারেনি গীতা, বড় ভাল মেয়ে। ভাইরা অবশ্য মোটেই খুশি নয়। অমলকে, গীতাকেও ওরা উৎপাত বলে মনে করে। বেচারার পা-টা, ওইরকমই আজীবন থেকে যাবে।"

"গীতা কে?"

"দেখিসনি? সকালে এই মাঠে মেয়েদের ট্রেনিং করায়, নিজেও করে।"

"লেডি সোবার্স।"

"কী বললি?"

"কিছু নয়। আপনাদের পাড়ায় থাকে?"

"পাশের বাড়িতে। অ্যাত্তোটুকু থেকে দেখছি গীতাকে। বিয়ের আগে দারুণ অ্যাথলিট ছিল। বেঙ্গল রিপ্রেজেন্ট করেছে ন্যাশনাল গেমসে। এশিয়ান গেমসের জন্য ট্রায়াল ক্যাম্পেও একবার গেছল। বিয়ে হল, তারপর বাঙালি-ঘরে যা হয়, বউয়ের অ্যাথলেটিকস চালিয়ে যাওয়াতে শ্বশুরবাড়ি রাজি হল না। স্বামী অ্যাকসিডেন্টে মারা

যেতে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসেও বছরখানেক প্রায় কিছু করেনি। হঠাৎ মাঠে কানে এল, স্টেট ব্যাঙ্ক নাকি অ্যাথলিট রিক্রুট করবে। তাই ওকে বললুম, প্র্যাকটিস শুরু কর, চাকরি হয়ে যেতে পারে। টোটো করে লটারির টিকিট বেচে কদ্দিন চালাবি। চিরকাল তো ভাইয়েরা বসিয়ে রেখে খাওয়াবে না, আর অন্যের হাততোলা হয়ে থাকতে হলে দাসীবাঁদির মতো থাকতে হবে। তার থেকে বরং বয়স থাকতে থাকতে যদি কাজটাজ জোগাড় করে নিতে পারে, লেখাপড়াও শেখেনি তেমন, স্কুল-ফাইনাল ফেল। দৌড়ের বয়স পেরিয়ে গেছে, আর হবে না, তবে গায়ের জোরের ব্যাপারগুলো তো হতে পারে। তা ছাড়া, পাড়ার বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোকে নিয়ে যদি ওকে দিয়ে একটা ক্লাব হয়। ইচ্ছে আছে ভলি আর কবাডিও শুরু করব।"

কথা বলতে বলতে টেবিল গুছিয়ে, জানলা বন্ধ করে ডগুদা আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়াল।

আনন্দ বেরিয়ে এসে বাড়ির দিকে হাঁটছে। ইতিমধ্যে কেউ তার খোঁজ করলে, তুমুল কাণ্ডের মুখে পড়তে হবে। একটু জোরেই সে পা চালাল।

"আনন্দ শোনো।"

ফটক ঘেঁষে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। আনন্দ প্রথমে ভয় পেয়ে গেছল আচমকা ডাক শুনে।

"কী বলল ডগুদা আমার সম্পর্কে?"

"তোমার সম্পর্কে কোনও কথা তো হয়নি।"

"হয়েছে, আমি জানি। সবাই কৌতূহলী হয়। আমার পা, আমার হাঁটা দেখে হয়। তুমিও হয়েছ।"

আনন্দ চুপ করে রইল। বাড়ির মধ্য থেকে হাঁকডাক আসছে না। বিপিনদা এখনও হয়তো ফেরেনি।

"না, ওসবে আমার কৌতূহল নেই। তবে যতবারই দেখেছি, তুমি একটা না একটা কিছু দিচ্ছ—হয় বল ফিরিয়ে দিচ্ছ, মাঠ থেকে ইট তুলে ফেলে দিচ্ছ, বই এনে দিচ্ছ, কেন?"

"ভাল লাগে।"

"ব্যস, এই!"

"হ্যাঁ। আমার পক্ষে এর বেশি কিছু করা কি সম্ভব?"

"কেন, সেদিন যে বললে, খেলি! কী খেল, কোথায় খেল? এসো না আমার ঘরে, গল্প করব। একতলার একদম পিছন দিকে নিরিবিলি ঘরটা।"

আনন্দ হাত ধরল অমলের। আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিল ও।

"আমি কারুর বাড়ি যাই না।"

"এলে কিন্তু ভাল লাগত। দিনরাত একা একটা ঘরে বন্দির মতো বাস করছি। হার্টের অসুখ, আমার হাঁটা পর্যন্ত বারণ। এখন লুকিয়ে বেরিয়েছি, জানতে পারলে ভীষণ বকুনি খেতে হবে।"

"কে বকবে, মা?"

আনন্দ হেসে উঠল।

"মা নেই।"

"ওহ্। আমারও নিজেরও মা নেই। তার জন্য আমার অবশ্য কোনও দুঃখ নেই। এই মা আমাকে ছোট থেকে নিজের ছেলের মতো ভালবেসেছে। আমার জন্য আজও কষ্ট করছে।"

"শুনলুম ডগুদার কাছে।"

"তা হলে আমাকে নিয়ে কথা হয়েছে।"

"শুধু এইটুকুই।"

"আমার খুব অস্বস্তি হয় যখন কেউ আড়ালে আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করে। কেন যে হয় জানি না। লোকে আমাকে দেখে আড়ালে হাসে। একা থাকতেই ভালবাসি।"

"আর আমি সঙ্গ পাবার জন্য ছটফট করছি।"

"দুজনের ব্যাপারটা দুরকম। আমার চেহারা, এই খোঁড়া পা, আর তোমার হার্ট। তুমি বল করো, আর আমি কুড়োই।"

"আমার খেলা চিরতরে বারণ হয়ে গেছে। আমার যা অসুখ তা সেরে ওঠার নয়। কিন্তু তুমি তো খেল। কী খেলা বললে না তো।"

উত্তর শোনার আগেই আনন্দ দেখল বীরা দত্ত রোড থেকে বিপিনদা মাঠের দিকে এগোচ্ছে। হাতে ইস্ত্রি-করানো কাপড়ের পাঁজা।

"আমি পালাই।"

আনন্দ ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

গভীর রাতে একবার তার ঘুম ভেঙেছিল। তখন হঠাৎ আপনা থেকেই তার মনে হয়, পাখিটা এইবার হয়তো ডাকবে। সে অপেক্ষা করে। দোতলা থেকে ক্ষীণভাবে সেতারে আলাপের শব্দ আসছে। মেজদা টেপরেকর্ডার চালাচ্ছে। নিখিল ব্যানার্জির বেহাগ। বড়দা কানাডা থেকে পাঠিয়েছে রেকর্ডারটা। নিজের নিশ্বাস ছাড়া আনন্দ আর কিছু এখন শুনতে চায় না। হৃৎপিণ্ডটা ধকধক করে যাচ্ছে আর ক্রমশ একটা ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। এই ধকধকানিটা বন্ধ হয়ে গেলেই সে মরে যাবে। ওটা বন্ধ হবার নোটিশ জারি হয়ে গেছে। কেউ না বললেও সে সকলের হাবভাব থেকে বুঝতে পারছে, গুরুতর কিছু একটা হয়েছে। এই শব্দটা সচল রাখার জন্য তাকে সাবধানে, কম নড়াচড়া করে বন্দি জীবন কাটাতে হচ্ছে। কী দারুণ, ভয়ঙ্কর আর মিষ্টি এই হার্টের শব্দ। প্রাণভরে এমন করে সে আগে কখনও শোনেনি। মেঝেয় শোয়া হাবুর মা'র নাকডাকার শব্দ শুনতে শুনতে তারপর কখন যেন সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে জানলা থেকেই আনন্দ দেখল মেয়েদের দৌড় শেখা। ওদের সঙ্গে হাফপ্যান্ট পরে লেডি সোবার্সও দৌড়চ্ছে। শট ছোড়া দেখতে পেল না। সেজন্য বাইরের রকে যাওয়া দরকার।

অরুণ প্রতিদিনের মতো দেখতে এল আনন্দকে।

"মেজদা, আর এভাবে থাকতে পারব না। আমি ভাল হয়ে গেছি।"

"কী করে বুঝলি?"

"কেন, এই তো দিব্যি চলাফেরা করছি, বুকে কোনও কষ্ট হচ্ছে না।"

"দিব্যি আছিস বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। ঘোরাঘুরি করলে দিব্যি থাকতিস না। আচ্ছা, দিনে একবার ফটকের কাছে যাবার পারমিশান দিলাম।"

আনন্দর সন্দেহ হল এত সহজে চট করে মেজদার উদার হয়ে যাওয়ায়। ডাক্তারবাবু নিশ্চয় আরও বেশি অনুমতি দিয়েছে, অনেক আগেই। মেজদা সাবধান হবার জন্য চেপে রেখেছিল, এখন টিপে টিপে ছাড়ছে।

"ফটক নয়, লাইব্রেরি পর্যন্ত, আর একবার মন্দিরেও।"

"ওরে বাবা, মন্দির! রাস্তা পার হওয়া চলবে না। গাড়ি এসে পড়লেই তো ছুটবি। না, না, শুধু লাইব্রেরি পর্যন্ত।"

"দিনে দুবার, সকালে আর বিকেলে।"

"উহুঁ, একবার।"

"তা হলে, ঘরে কিন্তু স্কিপিং শুরু করব।"

আনন্দ মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছে না। এটা অরুণ বুঝতে পারল ওর চোখের দিকে তাকিয়ে। অনুমতি দিয়ে ঘর থেকে বেরোচ্ছে, আনন্দ ডাকল। "তোমার টেপরেকর্ডারটা আমাকে দাও না, দেবে?"

"কী করবি? ট্র্যানজিস্টার তো রয়েছে।"

"ভাল লাগে না রেডিয়ো। আমি তোমার টেপগুলো চাই না, শুধু রেকর্ডার আর নতুন একটা ক্যাসেট। টেপ করব আমি।"

"নিজের গান?"

"গান কি জানি। যখন যা আমার মনে আসবে বলব, অন্যের কথা, হাবুর মা— বিপিনদার ঝগড়া, ডগুদার গলা, গাছের পাতার শব্দ আর একটা পাখির ডাক। খুব মিষ্টি সুন্দর ডাক।"

"নষ্ট করবি না, ভাঙবি না?"

আনন্দ জোরে মাথা নাড়ল।

"আচ্ছা, কাল কি পরশু টেপ কিনে এনে দেব।"

বিকেলে শিবা দত্তর কারখানার দুটি লরি মাঠের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাল খালাস করছে। মাঠের উপর লোহার চাদর স্তূপ করে রেখে একটা লরি চলে গেল। মেয়েরা দৌড়তে এসেছে। অপেক্ষা করে করে ওরা চলে যাচ্ছিল। আনন্দ রক থেকে লক্ষ করছিল, এবার এগিয়ে এল।

"তোমরা চলে যাচ্ছ কেন, দাঁড়াও।"

মেয়েরা দাঁড়িয়ে গেল। আনন্দ লরি সরিয়ে নেবার জন্য ড্রাইভারকে বলল। কর্ণপাত করল না লোকটি।

"এটা কারখানার জমি নয়, খেলার মাঠ। এ-জমির মালিক বটতলা ইনস্টিটিউট।"

"হবে।" ড্রাইভার নিরাসক্ত স্বরে বলল।

রেগে উঠল আনন্দ। প্রায় চিৎকার করে সে বলল, "লরি হটাও।"

লোকটি বিড়ি ধরাল। জবাব দিল না।

"এটা খেলার জায়গা, লরি হটাও এখান থেকে।"

রাগে হাত কাঁপছে, সেই সঙ্গে আনন্দ অনুভব করল, বুকের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা কিছু জমছে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, উত্তেজনা আসতে পারে এমন কোনও ব্যাপারে যাবে না, চিন্তাও করবে না। উচিত হয়নি, এ-ভাবে রেগে যাওয়ার মতো ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক হয়নি। কিন্তু সরে আসি কী করে। মেয়েরা যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"আমাকে বলে কী হবে, ম্যানেজারবাবুকে বলোগে যাও।"

লোকটা বিড়িতে টান দিয়ে কারখানার গেটে দয়ানিধির দোকানের দিকে চলে গেল। আনন্দ ভেবে পেল না এইবার তার কী করা উচিত। মেয়েরা কোনও কথা না বলে চলে যাচ্ছে। অসহায়ের মতো সে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "টায়ার ফাঁসিয়ে দোব। লরি কী করে চলে দেখব।"

মাল খালাস-করা মজুররা কৌতূহলভরে তার দিকে তাকাল। দপ দপ করে উঠল আনন্দর রগটা। কিছু করার নেই তার। লরিটাকে টান মেরে লোহাগুলোকে ছুড়ে ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে। মেয়ে ক'টি জেনে গেল, সে একটা অপদার্থ, হামবাগ। ডগুদাকে বলতে হবে, শিবা দত্ত নাকি কথা দিয়েছিল বিকেলে লরি ঢুকবে না, মাঠেও মাল রাখা হবে না! কী হল সে কথার?

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আনন্দ ফিরে এল। অনেকদিন পর আবার বুকে সেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। নিজের ঘরে এসে সে শুয়ে পড়ল। আর তখনই জলার দিক থেকে ভেসে এল মিষ্টি শিস। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গিয়েই সে বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা দেওয়া যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে চাপা আর্তনাদ করল। পলকের জন্য তার মনে হল, এইবার সে মারা যাবে। টপটপ করে চোখ থেকে জল পড়তে শুরু করল তার। সে ভাবল, আমি আর কখনও সেরে উঠব না। এই ঘরটায় চিরজীবন একা পড়ে থাকব। ভগবান, কেন আমায় অন্য কোনও অসুখ দিলে না?

গভীর রাত্রে বৃষ্টি নামল। হাবুর মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হাত বাড়িয়ে উত্তরের জানলাটা বন্ধ করতে পারে আনন্দ। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি হবে। ডাক্তারবাবুর বারণ, বলেছিলেন ব্রংকাইটিস যেন না হয়। তা হলে কিন্তু আর কখনও সারবে না।

জানলাটা বন্ধ করার জন্য আনন্দ হাত বাড়াল। তখনই তার মনে হল শিসটা যেন আবার ভেসে এল। বৃষ্টির ছাট মুখে লাগছে। গলা-বুক ভিজে গেছে। একটা অস্ফুট স্বর তার বুকের মধ্যে বলছে, 'আন্দ, আন্দ, লক্ষ্মী হয়ে থাকিস।'

হাতটা টেনে নিয়ে আনন্দ ফিসফিস করে অভিমানী গলায় বলল, "থাকব না।"

"আমার আনন্দ খুব লক্ষ্মী, খুব ভাল ছেলে।"

"আমি ভাল ছেলে হতে চাই না। আমি বেরোতে চাই, খেলতে চাই, এই ঘর থেকে মুক্তি চাই।"

"না আনন্দ, মেজদা যা চায় তাই করিস। তোর ভালর জন্যই ও শক্ত হয়েছে।"

"আমি একা থাকতে পারছি না। এভাবে একা থাকলে আমি মরে যাব। তুমি এসে থাকো না আমার সঙ্গে?"

"আমার আনন্দটা একদম পাগল, থাকব কী করে, আমি যে মরে গেছি।"

"আমিও মরে তোমার কাছে যাব।"

"না আন্দ, না। তোর কথা শুনে আমার কষ্ট হচ্ছে। তোর দুঃখ দেখে আমার চোখে জল আসছে।"

হাতের উপর বৃষ্টির ফোঁটা। আনন্দ চাটতে শুরু করল। মায়ের চোখের জল। মা মেঘ হয়েছে দুঃখটা যখন বাষ্পে রূপান্তরিত হল। আনন্দ বৃষ্টির ছাটের দিকে মাথাটা এগিয়ে আনল।

॥ ছয় ॥

সকালে চোখ খুলেই আনন্দ বুঝল তার গা-গরম, চোখ জ্বালা করছে, মাথা ভার। জ্বর আসবে নয়, এসে গেছে। বিছানা থেকে নামল। জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। দৌড় শেষ করে মেয়েরা বোধহয় চলে গেছে। লেডি সোবার্স হয়তো এখনও প্র্যাকটিস করে চলেছে। হাবুর মার গলার স্বর আসছে রান্নাঘর থেকে। মেজদার নিশ্চয় ঘুম ভাঙেনি। বাবা এতক্ষণে সেরেস্তায় বসে পড়েছে। আনন্দর মনে হল এখনি কাল বিকেলের কথাটা ডগুদাকে বলতে হবে।

ব্লাউজের মতো জামা আর হাফপ্যান্ট পরে কোমরে হাত দিয়ে গীতা হাঁফাচ্ছে। সকালের রোদে চিকচিক করছে ঘামে ভেজা শরীর। জমিতে আঁচড় কেটেই অমল চেঁচিয়ে উঠল।

"এক বিঘৎ বেশি!"

গীতা হাসল। চোখে অবিশ্বাস।

"সত্যি বলছি, তুমি এসে দেখে যাও।"

এগিয়ে এসে গীতা ঝুঁকে দেখল। অবিশ্বাস বদলে হল বিস্ময়।

"তুমি তো আমায় বিশ্বাসই করো না।"

"কেন করব? কাল তুই তো কমিয়ে দাগ কেটেছিলি। এক বিঘৎ না আর-কিছু, ইঞ্চি চারেক হবে।"

"আমার বিঘতের মাপে বলেছি।"

অমল হাসতে হাসতে কাছে এসে দাঁড়ানো আনন্দকে বলল, "মায়ের আঙুলগুলো কত লম্বা দেখেছ?"

গীতার হাতটা সে তুলে ধরল আনন্দর দিকে। ছাড়িয়ে নিয়ে গীতা লোহার শটটা কুড়িয়ে সার্কলে ফিরে গেল।

"কাল বিকেলে তুমি চেঁচামেচি করেছিলে লরি দাঁড়ানোর জন্য?"

মাথা নেড়ে আনন্দ তাকাল লাইব্রেরির দিকে। দরজা বন্ধ।

"ডগুদা আজ সকালে শুনেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে শিবা দত্তর বাড়িতে যাবার

জন্য। আমাকে দেখতে বলে গেছে লাইব্রেরি। দারুণ রেগেছে।"

একটি লোক বই হাতে আসছে। দেখেই অমল তার নিজস্ব ভঙ্গিতে ছুটল লাইব্রেরির দিকে।

লেডি সোবার্স শট গালে ঠেকিয়ে কুঁজো হয়ে তৈরি। আনন্দ পিছিয়ে এল। মাথাটা আরও ভার লাগছে। শরীরটা দুর্বল, কনুই আর হাঁটুতে ব্যথা। অন্তত একশো জ্বর।

"আ আ আহ্...অঁক্।"

ধপ শব্দ করে লোহার গোলাটা ভিজে মাটিতে বসে গেল। আনন্দ আপনা থেকেই দু-তিন পা এগিয়ে থেমে পড়ল। হাতে করে গোলাটা ওর কাছে পৌঁছে দেবে কি না ইতস্তত করে ভাবছে। ততক্ষণে গীতা এগিয়ে এল। ভ্রূ কুঁচকে মাটির দিকে ঝুঁকে ইটের টুকরোটা দিয়ে দাগ কেটে, গোলাটা তুলে নিয়ে ফিরে গেল। আনন্দকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনল না। আনন্দ কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করল।

আবার গোলাটা পড়ল। ইটে সাজানো সার্কলের কিনারে দেহের টলমলে ভারসাম্য সোজা করে রাখতে রাখতে গীতা তীক্ষ্ণচোখে তাকাল যেখানে গোলাটা পড়েছে। আনন্দ হাত তুলে ওকে অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করল।

এগিয়ে এসে গোলাটা তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দর মনে হল, এখান থেকে সার্কলটা মাত্র পনেরো-ষোলো হাত তো দূরত্ব! বোলার অ্যান্ডি কি হাতে করে পৌঁছে দিয়ে আসবে? একজন মেয়ে যদি ছুড়তে পারে এতটা তাহলে আমিই বা পারব না কেন, অমল কি সবাই? ভারী জিনিস তোলা বারণ, কিন্তু একবার তুললে এমন কী আর হবে! কিছু হয় কি না দেখাই যাক না।

ডান গালের কাছে গোলাটা ধরে আনন্দ ঠিক গীতার নকল করে কুঁজো হল। কনুইয়ে যন্ত্রণা, কবজি বেঁকে যাচ্ছে। গীতার মুখে হাসি খেলে গেল, তাই দেখে আনন্দর মুখেও হাসি ফুটল, শরীরে কী রকম একটা রোখ ঝাঁঝিয়ে উঠল। শরীরটা দোলাতে দোলাতে হাঁ করে নিশ্বাস নিয়ে ডান পায়ে ভর দিয়ে গীতার মতো ছোট ছোট দ্রুত লাফে গোলাটা ছোঁড়ার জন্য একধাপ লাফিয়েই হঠাৎ তার মনে হল সে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চাপা চিৎকার করে সে পড়ে গেল মাটিতে। গোলাটা পড়ল তার ডান পায়ের পাতা ঘেঁষে।

যখন সংবিৎ ফিরল, আনন্দর মনে হল, সে যেন ঢেউয়ের উপর ভাসছে। চোখ খুলেই লজ্জায় চোখ বন্ধ করল। লেডি সোবার্স তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলেছে বাড়ির দিকে। পাশে হাঁটছে অমল!

"আমায় নামিয়ে দিন, এভাবে আমায় নিয়ে যাবেন না বাড়িতে।"

আনন্দর করুণ ক্ষীণ স্বর অগ্রাহ্য করেই ওরা ফটকের কাছে পৌঁছল।

"আর যাবেন না, নামিয়ে দিন এখানে।"

ওকে নামিয়ে দিল গীতা। এইরকম পোশাকে অচেনা বাড়িতে যেতে তারও সঙ্কোচবোধ হচ্ছে।

"পারবে হেঁটে যেতে? আর কখনও কিন্তু এমন কাণ্ড করবে না, অল্পের জন্য পা-টা বেঁচে গেছে। অমল, তুই ওকে ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আয়। গা-টা বেশ গরম

লাগছিল। বোধহয় জ্বর হয়েছে।"

গীতা তালুটা আনন্দর কপালে রাখল। তাড়াতাড়ি আনন্দ ফটক পেরিয়ে বাড়ির দিকে এগোল। হাঁটু কাঁপছে, হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

"তুমি আমার কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে চলো। মা জানে না তোমার হার্টের অসুখ।"

পিছন থেকে এগিয়ে এল অমল। আনন্দর ডান হাতটা ধরে নিজের কাঁধে রেখে বলল, "চলো।"

আনন্দ ভয় পেল। অবশেষে এক বিকলাঙ্গের উপর ভর করতে হচ্ছে! অসম্ভব একটা রাগে ঝাঁঝরা হতে হতে অমলের কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, "আমার মরে যাওয়া উচিত, যাবও।"

"কেন?"

আনন্দ জবাব দিল না।

"রাগ করছ কেন? মানুষ মানুষের সাহায্য কি নেয় না বিপদে পড়লে? এতে লজ্জার কী আছে?"

"সে তুমি বুঝবে না।"

অমল হাসল। হাসিটা ম্লান দুঃখভরা। আনন্দ ইতস্তত করে বলল, "তোমাকে সাহায্য নিয়ে চলতে হয়—"

"নিশ্চয়। তাই তো আমি ভাল করে জানি মানুষের কাছে মানুষ কত দরকারি।"

"কিন্তু আমারও মানুষকে দরকার। একা একা হাঁপিয়ে গেছি।"

"ঠিক আছে, মাঝে মাঝে আসব।"

বিপিনদার গলার শব্দ এগিয়ে আসছে। আনন্দ ভিতরে ঢুকে গেল।

"আজ কেমন আছ?"

আনন্দ বিছানার উপর গড়িয়ে জানলার ধারে সরে এসে মাথা হেলিয়ে হাসল, "ভাল।"

উত্তরের জানলার শিক ধরে অমল কনুই দুটো জানলার পাটায় রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল।

"কী করছিলে?"

আনন্দ টেপরেকর্ডারটা দেখাল।

"ভীষণ মজার জিনিস। কাল বিকেলে ডগুদার মাঠের ঝগড়ার ঘর থেকে যা শুনতে পাচ্ছিলাম, টেপ করেছি।"

আনন্দ 'প্লে' লেখা বোতামটা টিপল। প্রথমে খরখর শব্দ হয়ে দূরে মোটরগাড়ি চলার, উঠোনে বাসনের, দোতলায় বিপিনদার গলার, ট্রেনের ভেঁপুর আওয়াজের মধ্য দিয়ে প্রকট হতে লাগল ডগুদার সঙ্গে কারখানার ম্যানেজারের ঝগড়া।

"আমি বলছি সরাতে হবে...জানতেই পারবেন কে আমি।... আমি একজন পাবলিক, আমার বলার অধিকার আছে।"

"যান যান মশাই, পারেন তো কোর্টে গিয়ে প্রমাণ করুন যে এ-জমি ইনস্টিটিউটের।"

"কোর্ট ফোর্ট কী দেখাচ্ছেন, রীতিমতো লেখাপড়া করে দান করা জমি। সবাই জানে..."

"দলিল আছে?"

"আলবাত আছে। সেক্রেটারি অনাদিবাবুর কাছে আছে।"

"মালিককে গিয়ে ওসব কথা..."

"সে-ব্যাটার দেখা পেলে তো..."

"মুখ সামলে...লরি রোজ দাঁড়াবে...অ্যাই দরোয়ান, ড্রাইভারকে বলবে এখানে..."

"তুলে দোব কারখানা, আগুন জ্বালিয়ে দোব। এটা খেলার মাঠ, শিবা দত্তর কারখানার জমি নয়। দরকার হলে কোর্টেই যাব। অ্যাজিটেশন করব, আন্দোলন হবে।"

আনন্দ বোতাম টিপে বন্ধ করে দিল।

"ডগুদার ফেভারিট হবি আন্দোলন করা।" দুজনেই হাসল।

"প্রত্যেক মানুষেরই একটা না একটা হবি থাকেই। দেবুদার হল ডিটেকটিভ মেইগ্রে। তোমার কোনও হবি আছে?"

"না।"

অমল মুখ ফিরিয়ে রাখল অন্যমনস্কের মতো। আনন্দ মুখ নামিয়ে টেপরেকর্ডারে হাত বুলোতে লাগল।

"মা আর প্র্যাকটিস করতে আসবে না। এখানকার অনেকেই পছন্দ করছে না ওর হাফপ্যান্ট—"

"আমার বাবা?"

"তাছাড়া কারখানার তিন-চারটে লোক রাস্তায় কাল টিপ্পুনী কেটেছিল। বোধহয় ম্যানেজার কি মালিক পিছনে লাগতে বলে দিয়েছে। মা একজনকে চড় কষায়, আর একজনের কলার ধরে ঝাঁকিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। ওরা শাসিয়েছে।"

"ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।"

"হ্যাঁ। পারবে না কেন, মা-তো রোজ রাত্রে ঘরে ওয়েট-ট্রেনিং করে। ওজন তোলে, ওজন টানে, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর।"

"ওজন?"

"লোহা। ইনস্টিটিউটে বারবেল, ডাম্বেল, পুলি পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। ডগুদা সেগুলো দিয়েছে। দিনের বেলায় কাজকর্ম ফেলে একসারসাইজ করতে দেখলে বাড়িতে রাগারাগি করবে তাই রাতে করে।"

"অদ্ভুত তো!"

"কেন? এই কি পৃথিবীতে প্রথম নাকি! মা প্রথমে রাজি হয়নি, বলেছিল এই বয়সে এসব করে তার কিছু হবে না। আমি বলেছিলুম হবে, আগে তো দৌড়ঝাঁপ করতে, আবার তুমি শুরু করো। তারপর শুনিয়েছিলাম রোমানিয়ার লিয়া

মানোলিউয়ের কথা। মেকসিকো ওলিম্পিকে মেয়েদের ডিসকাস-এ সোনা জিতেছিল।"

"তুমি অনেক পড়েছ, অনেক খবর রাখো।"

"সামান্য সামান্য। কাগজে যা বেরোয় তাই একটু আধটু জানি। তা মানোলিউয়ের কথাটা শোনো, খুব ইন্টারেস্টিং। ওকে ট্রেনিং ক্যাম্পে আসতেই বারণ করেছিল ওদের ফেডারেশন, বয়স হয়ে যাওয়ার জন্য। বলেছিল, তোমার দ্বারা আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং মিছিমিছি কেন আর ট্রেনিংয়ে আসা। এর ন' মাস পরেই সে সোনা জেতে মেকসিকোয়। তখন বয়স কত জান? সাঁইত্রিশ! আমার মা-র বয়সও তাই। মাকে তো আর ওলিম্পিকে সোনা জিততে হবে না, পেতে হবে একটা চাকরি। ঘরের মধ্যে রাতের পর রাত মানোলিউ ওজন তুলেছে, তিন ঘণ্টা করে। সবাইকে ভুল প্রতিপন্ন করবেই করবে। ইচ্ছা থাকলে মানুষ কী না পারে? স্বামী, সন্তান সব ঘুমোচ্ছে, আর সে একা ট্রেনিং করে গেছে, সঙ্গী শুধু রেডিয়োটা, আর বিড়বিড় করে কবিতা আবৃত্তি করেছে যাতে শরীরের কষ্ট ভুলে থাকতে পারে। দৃশ্যটা ভাবতে পারো আনন্দ? কী ভয়ঙ্কর কষ্ট স্বীকার করে সোনা পেয়েছে! কী তেজ, কী রোখ।"

"তুমি ভাবতে পারো এমন দৃশ্য?"

একটুও ইতস্তত না করে অমল বলল, "পারি। মানুষ যখন বার বার হেরে যায় তখন হাল ছেড়ে ভেঙে পড়ে। কিন্তু অনেকে পড়ে না। তারাই শেষ পর্যন্ত জেতে। মানোলিউ হেলসিঙ্কি থেকেই ওলিম্পিকে নামছে। সেখানে সিকসথ, মেলবোর্নে নাইনথ, রোমে ব্রোঞ্জ, টোকিয়োতে ব্রোঞ্জ। চারবার চেষ্টা করছে, সোনা পায়নি, তবু সে ভেঙে পড়েনি। ষোলো বছর পর মেকসিকোয় যখন ফাইনালে ছুড়তে এল, তখন ডান হাতে চোট। ডাক্তার ইনজেকশান দিয়ে বলেছে, একবার ছোড়ার পরই কিন্তু হাতের জোর কমে যাবে। শুধু একবারই জোরে ছুড়তে পারবে।"

অমলের চোখদুটো স্থিরভাবে তাকিয়ে রয়েছে। আনন্দ বিছানায় উঠে বসল। চোখদুটো তাকে যেন চুম্বকের মতো টেনে নিচ্ছে।

"জিতল তো?"

"নিশ্চয়, প্রথমবারেই যা ছুড়েছিল তাতেই। কিন্তু তখন তার মনের অবস্থাটা কল্পনা করতে পার?"

"আমি কখনও এরকম অবস্থায় পড়িনি।

"কল্পনা করো, একটা এইরকম অবস্থা তৈরি করো মনে মনে। ভাবো, তুমি জীবনের শেষ সুযোগের সামনে দাঁড়িয়েছ। সারা জীবন ধরে যে স্বপ্ন দেখেছ তা পূর্ণ হবে কি হবে না, সেটা তুমিই এই মুহূর্তে একমাত্র জানো। এইটাই শেষ, আর সুযোগ কখনও আসবে না তোমার কাছে। কল্পনা করো।"

"তুমি করতে পারো?"

অমল মাথা হেলাল।

"আমি ওলিম্পিকে একশো, দুশো, চারশো মিটারের সোনা জিতি।"

আনন্দ হেসে ফেলল।

"দেবুদা যেমন দারুণ জটিল খুনের মামলার আসামিকে নির্দোষ প্রমাণ করে জেতার স্বপ্ন দেখে।"

"হ্যাঁ। সবাই স্বপ্ন দেখে, ঘুমিয়ে নয় জেগে। আমার মতো সব মানুষের ভিতরেই কোনও না কোনও অঙ্গ পোলিয়োয় পঙ্গু হয়ে আছে মনে হয়। তাই আস্ত গোটা হবার জন্য স্বপ্ন দ্যাখে।"

"যাঃ কী বাজে কথা বলছ।"

"আমার যা মনে হয় তাই বললুম। সব মানুষই জিততে চায় কিন্তু পারে না এই পোলিয়োর জন্য। তুমি নিখুঁত মানুষ দেখেছ?"

আনন্দ একটু ভেবে মাথা নাড়ল।

"নিখুঁত হওয়া আর জেতা একই ব্যাপার। আসলে সবাই নিখুঁত হতে চায়।"

"তা হলে স্বপ্ন দেখে কী হবে?"

"ওইভাবেই ইচ্ছাটা পূরণ করে। স্বপ্নে তুমি যা খুশি হতে পারো। স্বপ্ন দেখে তারাই যাদের মন আছে, ইচ্ছে আছে। দুর্বল লোকে স্বপ্ন দেখতে পারে না, আমার অনেক ইচ্ছে আছে, জানি সেগুলো পূরণ হওয়া সম্ভব নয় তাই স্বপ্নে পূরণ করি, সেখানে আর একটা পৃথিবী আর এক অমল, সে সব জেতে—সব সব। ইচ্ছে করলে হারতেও পারি, এত ক্ষমতা আমার। নিজেকে বিরাট মনে হয় সেই পৃথিবীতে, তাই সারাক্ষণ সেখানেই থাকি।"

"সারাক্ষণ স্বপ্ন দেখো!"

"চমৎকার সময় কাটে। একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাকেও আমি দৌড়ে হারাতে পারব না। কিন্তু আমি সাড়ে ন' সেকেন্ডে ওয়ার্লড রেকর্ড করে বোরজভকে হারিয়েছি মিউনিখে। বিকিলাকে হারিয়েছি ম্যারাথনে।"

"আকি-বুয়াকে?"

"চেষ্টা করিনি।"

"মার্ক স্পিজকে?"

"সাঁতার ভাল লাগে না।"

"কী ভাল লাগে তোমার?"

অমল কাঁধে গাল ঘষল। ওর চোখে আর চুম্বক নেই। একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টটা চোখে ধরা পড়ছে। আনন্দ ভাবল ওকে বলে ভিতরে এসে বিছানায় তুমি শোও। কিন্তু ও আসবে না। প্রথমদিন ভিতরে আসতে বলেছিল, তখনও বলে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকলেই নাকি ওর মাথার মধ্যে কেমন করে। সব কিছু মনে হয় তার পায়ের মতো সরু দোমড়ানো এমন কী মানুষের মুখ চোখও ভাঙাচোরা বাঁকানো মনে হয়। তাই বাড়ির বাইরেই সারাক্ষণ কাটায়। আনন্দর কাছে এটা অদ্ভুত লেগেছিল। সে চেষ্টা করেও মানুষকে সরু যা দোমড়ানো চেহারা করতে পারে না। এজন্য মনের মধ্যে তা হলে দয়ানিধির দোকানের অদ্ভুত আয়নাটার মতো একটা আয়না দরকার যেখানে তাকালেই মুখটা লম্বা চ্যাপ্টা তোবড়ানো দেখাবে।

"কাল রাতে আমি ডাক্তার হয়েছিলাম। বিরাট কেউ নয় খুব অখ্যাত সার্জন। কেউ সাহস পাচ্ছে না...একটা হার্টবদল করার অপারেশন, পি জি হাসপাতালে। আমি গিয়ে বললাম, আমি করে দেব। ওরা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না। যাই হোক শেষকালে রাজি হল, কেননা..."

"কেননা, ছেলেটা এমনিই তো মারা যাবে।"

"ছেলেটা! কে বলল?"

"আমি জানি। তারপর?"

"আটঘণ্টা ধরে করলাম।"

"সাকসেসফুল?"

"নিশ্চয়। এখন আবার সে নেটে প্র্যাকটিস শুরু করেছে। আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, সে কাছে এসে বলল..."

"জানি। সে বলল অমল তোমার জন্য আমিও স্বপ্ন দেখব। তোমার পোলিও সেরে গেছে, তুমি ছুটছ, ভীষণ জোরে ছুটছ, সবাইকে হারিয়ে দিচ্ছ, ট্রফি জিতছ। তোমার জন্য ওলিম্পিকে ভারতের পতাকা উঠছে, জনগণমন সুর বাজছে।"

নীলচে আকাশে যেন সোনালি রোদের আভা ছড়িয়ে পড়েছে। গভীর ঝকঝকে চাহনি আনন্দর মুখের উপর বোলাতে বোলাতে অমল ঠোঁট টিপে মাথা নাড়তে লাগল।

"না না না, তার থেকে বরং তুমি এক কাজ করো, রোজওয়ালকে উইম্বলডন জেতাও। মানোলিউ তবু ষোলো বছর পর জিতেছিল, কিন্তু রোজওয়াল সেই কবে একুশ বছর আগে প্রথম উইম্বলডনে খেলেছে কিন্তু এবারও হেরে গেল। ভাবলে কষ্ট হয় না? বছরের পর বছর চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু আর জিততে পারবে মনে হয় না, বয়স তো হয়েছে। চারবার ফাইনালে উঠে হেরেছে, বুড়ো হয়ে গেছে, আর কবে জিতবে বলতে পারো?"

হালকা বিষণ্ণ মেঘে অমলের চোখ ঢেকে গেল। আনন্দ ফিসফিস করে বলল, "জিতবে। কোনর্সকেই হারাবে।"

"বলছ কী? সিক্স-ওয়ান, সিক্স-ওয়ান, সিক্স-ফোর, বিশ্রীভাবে কোনর্স এবার জিতেছে। ওকে হারানো রোজওয়ালের পক্ষে আর সম্ভব?"

"ইন্ডিয়ার আনন্দ ওকে হারাবে।" তারপরই নিজেকে শুধরে বলল, "আনন্দ মানে কিন্তু অমৃতরাজ নয়।"

"জানি। এ আনন্দ আমাদের।"

পিছনে শব্দ হতেই আনন্দ ফিরে তাকাল। বিপিনদা বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে।

"দুপুরে তোমার ঘুমোবার কথা, আর তুমি গপ্পো করে যাচ্ছ? ডাক্তারবাবু কী বলে গেলেন সেদিন মনে নেই? কার সঙ্গে গপ্পো করছিলে?"

আনন্দ জানলার দিকে তাকাল। অমল নেই।

"কার সঙ্গে আবার গল্প করব। টেপ রেকর্ডার চালাচ্ছিলাম তো। শুনবে?"

আনন্দ বোতাম টিপল টেপ উলটোদিকে গোটাবার জন্য। থামিয়ে এবার 'প্লে'

বোতাম টিপল।

"উকিলবাবু, আপনার কাছেই আছে হীরা দত্তর দানপত্রটা। আপনি সেক্রেটারি, আপনার উচিত নয় কি ইনস্টিটিউটের স্বার্থ দেখা?"

আনন্দ তাকাল বিপিনদার দিকে। ডগুদার সঙ্গে অনাদিপ্রসাদের কথার টেপ। চেম্বার থেকে ডগুদার গলার শব্দ পেয়েই রেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরের জানলাটার উপর রেখেছিল। বিপিনদা অবাক হয়ে শুনছে।

"দানপত্র আমার কাছে আছে, কে বলল? তাছাড়া জমিটা দানই করে দিয়েছে, এটাই বা তোমার মাথায় এল কী করে? ওটায় খেলতে দিয়েছিল শিবার বাবা, দান করে দেয়নি।"

"বাজে কথা, আপনি ওর উকিল, ওর কাছ থেকে টাকা পান, তাই শিবা দত্তর হয়ে বলছেন।"

"ডগু, ভদ্রভাবে কথা বলো।"

"আমরা সবাই জানি, এ জমির মালিক ইনস্টিটিউট। কারখানার সুবিধে হয় বলে জমিটা গাপ করতে চাইছে। আপনি তাকে সাহায্য করছেন।"

"তুমি বেরিয়ে যাও, নয়তো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব, আর মাঠে যদি ওইরকম অসভ্যর মতো পোশাক পরা মেয়েছেলে দেখি, তোমাকে—"

"কী আমাকে? মারবেন! কাটবেন!"

"যাতে ভালমতো শিক্ষা পাও, সেই ব্যবস্থাই করব।"

আনন্দ বন্ধ করে দিল রেকর্ডার।

"কারোর সঙ্গে গল্প করিনি, এবার বুঝলে?"

"সেইদিন রাতে ডগুবাবু যে ঝামেলা করে গেল, সেই সব কথা! কী আশ্চর্য, অদ্ভুত যন্তোর বার করেছে তো!"

"তোমার কথাবার্তাও এবার যন্তোরে ধরে রাখব যখন হাবুর মার সঙ্গে ঝগড়া করবে।"

"ভয় দেখাচ্ছ?"

আনন্দ জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শুল। অমলের সঙ্গে কথা বলার সময় মাঝে মাঝে খেলাচ্ছলে বোতাম টিপে টিপে রেকর্ড করেছে। রেকর্ডার চালিয়ে তাদের দুজনের সেই কথাগুলো শুনতে শুনতে সে জানলার বাইরে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একসময় তার কানে এল অমলের গলা।

"ভাবো তুমি জীবনের শেষ সুযোগের সামনে দাঁড়িয়েছ। সারা জীবন ধরে যে স্বপ্ন দেখেছ—"

আনন্দ বন্ধ করে দিল। মনে মনে বলল:

কোনওদিনই শেষ সুযোগের সামনে আমার দাঁড়ানো হবে না।... কিন্তু ইচ্ছা থাকলে মানুষ কী না পারে। সে এই পৃথিবীর মধ্যেই আর একটা পৃথিবী বানিয়ে সেখানে জিততে পারে হারতেও পারে।

॥ সাত ॥

"প্লে।"

প্রায় পনেরো হাজার লোক মুহূর্তে কথা বন্ধ করল। নিশ্বাস নেওয়া ও ছাড়া হচ্ছে চুপিচুপি। উইম্বলডন সেন্টার কোর্টে সেমিফাইনাল ম্যাচ—কোর্নসের সঙ্গে ব্যানার্জির।

আনন্দর সার্ভিস।

শান্ত চাহনিতে দেখে নিল, বেসলাইনের মাঝামাঝি কুঁজো হয়ে শিকারি চিতাবাঘের মতো জিমি। সার্ভিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ডাইনে-বাঁয়ে দুলছে। বাঁ হাতে ধরা র‍্যাকেট তীক্ষ্ণ নখের মতো। এখনও কানে বাজছে জিমির কথাগুলো। ছোট্ট ড্রেসিংরুমে তারা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আয়নায় চুল আঁচড়াচ্ছে। জিমি তার লম্বা চুলগুলো সমান ভাবে কান ঢেকে দুপাশ দিয়ে নামিয়ে দিতে দিতে মহম্মদ আলির ঢঙে বলেছিল: 'আই অ্যাম দ্য চ্যাম্পিয়ন—জাস্ট ট্রাই অ্যান্ড টেক মাই টাইটল অ্যাওয়ে।'

ঘাসের ওপর বল ড্রপ দিল আনন্দ। সার্ভিসের আগে তিনবার বল ড্রপ দেওয়াটা তার অভ্যাস। জিমি সেমি ফাইনাল পর্যন্ত সেট হারায়নি এখনও। কোয়ার্টার ফাইনালে দেখেছে ট্যানারের ঘণ্টায় একশো চল্লিশ মাইলের সারভ্‌কে জিমি কী অবহেলায় তাচ্ছিল্যে পালটা মার দিয়ে খুন করেছে। যত জোরে সারভ্ আসে ততই যেন জিমির সুবিধে হয়।

আনন্দ আপন মনে হাসল। জিম্বো, তোমার নাকি ছোটাছুটির স্পিড অকল্পনীয়, তোমার রিফ্লেক্স নাকি তুলনাহীন। দেখা যাক।

বলটা শূন্যে ছুড়ে র‍্যাকেটের ঘা দিল আনন্দ। সাইড লাইন আর সার্ভিস লাইনের কোনায় পড়ে কোর্নসের ব্যাকহ্যান্ডের নাগালের বাইরে দিয়ে বল বেরিয়ে গেল।

"ফিফটিন-লাভ।"

বাঁ দিকের কোর্টে সরে এল আনন্দ। ধীর মন্থর অলস তার হাঁটার ভঙ্গি। যেন ক্লাব টুর্নামেন্টে প্রথম রাউন্ড ম্যাচ খেলছে কোনও শিক্ষার্থীর সঙ্গে।

সার্ভ করল আনন্দ।

সেই একই জায়গায় বল পড়ল। মসৃণ অথচ তীব্রবেগে। জিমি ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ব্যাক হ্যান্ডে কোনওরকমে র‍্যাকেট ছোঁয়াল। উঁচু হয়ে বলটা উঠল। হঠাৎ গুডলেংথ থেকে লাফিয়ে ওঠা বলে ব্যাট পাতলে সিলি মিড অনের মাথার ওপর যেরকম ক্যাচ ওঠে। সার্ভিস করেই আনন্দ ছুটে এসেছিল নেটের দিকে। জিমি বেস লাইনের ওপর অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দেখছে বলটা নেটের ওপর আলতোভাবে নামছে। বাঁ হাত কোমরে রেখে অতি অবহেলায় আনন্দ ফাঁকা কোর্টের আর একপ্রান্তে ভলি মারল। খুব আস্তে টুং করে। ফিরে তাকালও না আর। যেন, এ তো জানা কথাই পয়েন্ট পাব! তারপর আবার সারভ করার জন্য আলস্যভরে বেস লাইনের দিকে যেতে যেতে বলবয়ের ছুড়ে দেওয়া বল থেকে একটা লুফে নিল।

মাইক্রোফোনে আম্পায়ারের গলা: "থার্টি-লাভ।"

আবার প্রচণ্ড সার্ভিস। সেন্টার লাইনে খড়ির দাগ একটা জায়গায় হালকা ধোঁয়ার মতো উড়তে দেখা গেল। 'এস'! দাগের ওপর বল পড়েছে। চারদিকের স্ট্যান্ডে গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল। জিমি লাইনের দিকে তাকিয়ে দুহাত মুঠো করে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করল। সয়্যার করছে। গালাগাল দিচ্ছে। দিক। দিতেই হবে। জবাব দেবে কী করে এইরকম সার্ভিসের!"

"ফর্টি-লাভ।"

কী যেন বলেছিল জিমি রিপোর্টারের কাছে?—আই অ্যাম গেটিং বেটার। আই নাউ হ্যাভ মোর শটস। দেয়ার ইজ নো প্রেশার অন মি। আত্মম্ভরিতা। ঠাণ্ডা মেজাজে, আনন্দ, ঠাণ্ডা মেজাজে খেলে যাও। পৃথিবীর একনম্বর তোমার সামনে। কাল রাত্রে যেমনই ছকে রেখেছ, ঠিক সেইভাবে বরফের মতো মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলে যাও। মন্থর করো খেলাটাকে। জিমিকে নেটে আসতে দিয়ো না, তা হলে তোমায় খুন করে ফেলবে। বেস লাইনে ঠেলে রাখো ওকে। তুমি যত মারবে, ততই ওর সুবিধা, যে ব্যাটসম্যানের হাতে স্ট্রোক আছে, ফাস্ট পিচ তাকে খুশি করে। কোনর্সের হাতে সবরকম মার আছে। মনে আছে উইম্বলডন-বিজয়ীদের নাম লেখা বিরাট বোর্ডটার ওপরে কিপলিংয়ের লাইনটা? যখন সবাই তোমার সম্পর্কে সন্দিহান তখন যদি নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে পারো...

বিশ্বাস রাখো, আনন্দ। তুমি পারবে। পারবে। পারতেই হবে, কেননা—

সার্ভ করল আনন্দ।

বলটাকে ফোরহ্যান্ডে কোনর্স পেয়ে গেছে। আনন্দর ডানদিকে রিটার্নটা এল। সাইড লাইন বরাবর সে ফোরহ্যান্ডে মারল। কী অবিশ্বাস্য কোনর্সের ছোটা। নিমেষে বলের কাছে পৌঁছেছে। বিদ্যুৎগতি ক্রসকোর্ট শট এল আনন্দর ব্যাকহ্যান্ডে। বলটা সে কোনর্সের কোর্টের মাঝামাঝি মারল। এইবার দু-হাতে র‍্যাকেট ধরে ভয়ঙ্কর ব্যাকহ্যান্ড মারবে ও।

কোনর্স মারল, এবং আনন্দ ঠিক সেইখানেই, যেখানে বল এল। যেন ও আগে থেকে জানত। স্টপ-ভলি করল আনন্দ সামান্য ঝুঁকে। কোনর্স ছুটে এসে চেষ্টা করল পাসিং শট। আনন্দর লম্বা হাতে বাড়ানো র‍্যাকেট বিদ্যুৎগতিতে বলটাকে মাঝপথে আটকে দিয়ে ফেরত পাঠাল কোনর্সের কোর্টে। নেটের কাছে দাঁড়ানো কোনর্স অসহায় ভাবে পিছনে তাকিয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো মাটিতে পা ঠুকল।

"ফার্স্ট গেম টু ব্যানার্জি।"

এবার কোনর্সের সারভিস। বিনীত মৃদু ভঙ্গিতে আনন্দ অতিরিক্ত বলগুলো যেভাবে নেট থেকে ব্যাট দিয়ে মেরে বোলারের কাছে ফেরত দেয় সেই ভঙ্গিতে এক এক করে র‍্যাকেটে মেরে ধীরে ধীরে পাঠিয়ে দিল কোনর্সের কোর্টে। কোনর্সের বন্ধু নাসতাসে হাত মুঠো করে ঝাঁকাচ্ছে। ন্যাস্টি উৎসাহ দিচ্ছে।

আনন্দ তাকাল আম্পায়ারের পিছনে স্ট্যান্ডের দিকে। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির ছোট্টখাট্ট একটা মানুষ, সঙ্গে স্ত্রী আর দুই ছেলে। বাইশ বছর আগে, আনন্দর জন্মেরও

আগে প্রথম এখানে খেলেছে। আজও জিততে পারেনি। এবারের ফাইনালে কোনর্সের মুখোমুখি হলে কোনর্স ওকে খেয়ে ফেলবে। হয়তো কোনওদিনই আর জেতা হবে না।

চোখাচোখি হল। আনন্দ মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানাল। রোজওয়াল মাথাটা সামান্য পাশে হেলাল। চোখে চাপা হাসি। অন্যদিক থেকে রোজওয়াল এবারেও ফাইনালে উঠেছে সেমি ফাইনালে নিউকোমবকে হারিয়ে। আনন্দর মনে হল, সে ওর ছেলের বয়সী।

কোনর্স সারভিস শুরু করতে যাচ্ছে—

"আগুন, আগুন, আগুন।"

খাটের ওপর উঠে বসল আনন্দ। পুবের জানলা দিয়ে যতটা সম্ভব দেখার চেষ্টা করল। মাঠের ওপর দিয়ে কারখানার কয়েকটা লোক ছুটে গেল। হইচইয়ের আওয়াজে মনে হচ্ছে আগুন কারখানাতেই লেগেছে।

দেখার জন্য আনন্দ ফটকের কাছে আসতেই বিপিনদার ধমক খেল।

"দেখতে হবে না। যাও, ঘরে যাও। সামান্য আগুন, নিভিয়ে ফেলেছে।"

খেলার মধ্যে হঠাৎ বাধা পড়ায়, আনন্দ আর মেজাজ পাচ্ছে না। বিছানায় শুয়ে ঘড়ি দেখল। দুপুর দেড়টা। প্রথম সেটটা সে পর পর কোনর্সের তিনটে সার্ভিস ভেঙে নিয়ে নিল ৬—০ গেমে। আধমিনিটের মধ্যেই ব্যাপারটা চুকে গেল।

এবার দ্বিতীয় সেট।

সময় নষ্ট করে লাভ কী! এবারে ৬—১। তিনবার ডিউস হয়েছে। একটা গেম নিশ্চয়ই কোনর্স নেবে। অতবড় প্লেয়ার...৬-২ হতে পারে। দুটো গেম নিলে কী এসে যায় তার। লন্ডনে নিশ্চয়ই প্রচুর ইন্ডিয়ান আছে। বাঙালিও আছে। যারা লর্ডসে গিয়ে অপমানে খেপে, লজ্জায় মাথা নামিয়েছিল ৪২ রানের ইনিংস দেখে, তারা নিশ্চয় উইম্বলডনে এসেছে।

থার্ড সেট।

১—১; ২—২; ৩—৩; ৪—৪; ৪—৫। আনন্দ পিছিয়ে গেছে।

কোনর্সের সার্ভিস এবার। আগের গেমে প্রচণ্ড খেলে আনন্দর সার্ভিস ভেঙে সে এগিয়ে এসেছে ৫—৪ হয়ে। আনন্দ চারদিকে তাকাল। মুখগুলো উত্তেজনায় টসটস করছে। ঠাসাঠাসি ভিড়ে লোক উপচে পড়ছে স্ট্যান্ড থেকে।

"লড়ে যা বাঙালি।"

একটা তীক্ষ্ণস্বর বাংলা শব্দগুলোকে সেন্টার কোর্টের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আনন্দ একবার তাকাল স্ট্যান্ডের দিকে।

কোনর্স সার্ভ করছে। বলটা জমিতে ছোবল দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"ফিফটিন—লাভ।"

মাথা ঠাণ্ডা রাখো, আনন্দ। জয় মুঠোয় আসতে এখনও অনেক পয়েন্ট বাকি।

কোনর্স দারুণ লড়তে পারে। আলগা দিয়ো না।

বাঁ হাত কোমরে রেখে র‍্যাকেট ধরা ডান হাতটা ঝুলিয়ে আনন্দ, যেন ম্যাচ খেলছে না, খেলা দেখছে এমন উদাসীন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ক্লাব-টুর্নামেন্টের মতো যেন ব্যাপারটা। কোনর্স দুই আঙুলে 'ভি' দেখাল। ভিকট্রি? আনন্দর ঠোঁট তাচ্ছিল্যে মুচড়ে গেল।

সার্ভিস করেছে কোনর্স, প্রচণ্ড জোরালো। আনন্দ র‍্যাকেট ঠেকাতেই, থার্ডম্যানের দিকে ক্যাচ ওঠার মতো বল ছিটকে স্ট্যান্ডের দিকে চলে গেল।

"কাম অন্ ব্যানার্জি।"

"থার্টি-লাভ টু কোনর্স।"

"বাঙালি জা-গ-ও।"

আনন্দ হেসে ফেলল।

"হচ্ছে কী আনন্দ! স্টেডি স্টেডি।"

"প্লিজ রিফ্রেন ফ্রম এনি রিমার্কস।"

নাসতাসে ডান হাতের ঘুঁষি বাঁ হাতের তালুতে মারছে। কোনর্স 'ভি' দেখাল মুখ ভেঙচে। আনন্দ আড়চোখে লক্ষ করল, রোজওয়াল তার দিকে তাকিয়ে। কী বিষণ্ণ দুঃখী চাহনি। বুকটা মুচড়ে উঠল আনন্দর। ঘাবড়াচ্ছ কেন! তুমি নিশ্চিত থাকো, আমিই ফাইনালে যাব। সেখানে তুমি আমাকে হারাবে।

কোনর্সের সার্ভ। আনন্দ প্রচণ্ড ফোরহ্যান্ড মারল। নেট ঘেঁষে সাইড লাইন ছুঁয়ে বল বেরিয়ে গেল।

"থার্টি-ফিফটিন।"

কোনর্স সার্ভ করল। দুর্দান্ত ব্যাকহ্যান্ড রিটার্ন তার বাঁ দিকে।

"থার্টি—অল।"

এবারের সার্ভিসটাও দারুণ রিটার্ন করল আনন্দ। ডাউন দ্য লাইন বেরিয়ে গেল পনেরো হাজার লোককে চমকে দিয়ে। তারপর উচ্ছ্বাসের বিরাট একটা শব্দে সেন্টার কোর্ট কেঁপে উঠল। আনন্দ গেমটা জিতেছে। এখন ৫—৫।

সেটটা জিতলেই ম্যাচটাও জেতা হয়ে যাবে। ক্লান্ত বোধ করল আনন্দ। এখনি জিতে কী লাভ! আকাশ জুড়ে গনগনে কারখানার ফার্নেসের মতো তাপ ছড়িয়ে। ফার্নেসের খোলা দরজাটার মতো সূর্য। গরমে ঘামে এক ধরনের আলস্য আনন্দের চোখে জড়িয়ে এল।

ফাইনালে রোজওয়ালের কাছে কি হেরে যাব? ইন্ডিয়াকে এত বড় সম্মান থেকে বঞ্চিত করব? কৃষ্ণণ দুবার সেমিফাইনালে উঠেছে। ব্যস, তারপর এই আনন্দ ব্যানার্জি। টেনিসের সব থেকে বড় সম্মান মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেব? ভারতের ষাট কোটি লোক কী দারুণ আশা নিয়ে অপেক্ষা করবে রেডিয়োয় কান পেতে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিড়। পটকা-বোমা নিয়ে নেতাজি পার্কে আড্ডা দেওয়া ছেলেগুলো চেঁচাচ্ছে—"আন্দো রে আন্দো, ওই যে ফাস্ট বল করত, নেটে একদিন মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল একটা ছেলের। শান্ত চুপচাপ থাকত। ও যে এমন টেনিস খেলে! হোক না

বটতলার ছেলে, আমাদেরই পাড়ার।" পটকা ফাটাবার জন্য ওরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করবে। মেজদা তো অফিসই যাবে না। বাবা অবশ্য ঠিকই বেরোবে, চেম্বারেও বসবে। হাবুর মা বার বার হয়তো বিপিনদাকে জ্বালাবে—"হ্যাঁ গা, আমাদের আন্দো সাহেবের সঙ্গে কীসের লড়াই করতে গেছে? ছেলেটা বড় দুবলা, পারবে তো?" আর অমল কী করবে!

জানে, একমাত্র অমলই জানে কেন আমি ফাইনালে উঠতে চেয়েছিলাম। ফাইনালে কী রেজাল্ট হবে তাও জানে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর খেলতে খেলতে রোজওয়ালের মুখে ছাপ পড়ে গেছে চিন্তার, উদ্বেগের। চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেছে। মুখের চামড়া খসখসে মোটা আলগা হয়ে এসেছে! শরীর আর কুড়ি বছর বয়সের মতো ধকল নিতে পারে না। কী কষ্ট করে একটা লোককে সারা পৃথিবীর 'সেরা'দের চ্যালেঞ্জ ঠেলে বাইশ বছর টিঁকে থাকতে হয়েছে। টেনিসের সব সম্মানই পেয়েছে শুধু সেরা সম্মানটি ছাড়া। একেই বলে বরাত! সেই বরাতকে কি হারানো যায় না?

একদিকে ষাট কোটি আর একদিকে মাত্র একজন। শ্রীকৃষ্ণ হলে কী করতেন? রোজওয়াল কি অর্জুন! যদি হেরে যাই তাহলে পরের বছর কিংবা তার পরের বছর জিততে পারি। কিন্তু রোজওয়াল আর পারবে না।

ষাট কোটি লোকের এত আশা, এত আকাঙ্ক্ষা চুরমার করে দেব, একজনের জন্য? অমল কি এই বিদঘুটে সমস্যাটার কথা ভেবেছে কখনও? একটা এত বড় দেশ, মানসম্মান কখনও পায়নি, শুধুই পিছনে, সকলের পিছনে। সারা পৃথিবী ভুলেই গেছে এত বড় একটা দেশ স্পোর্টস জগতে আছে; দেশটার মানুষও ভুলে গেছে খেলাধুলোয় তারা কিছু করতে পারে। হারের পর হার দেখতে দেখতে নুয়ে পড়েছে, বিশ্বাস করছে তারা অপদার্থ তাদের, দ্বারা ফাস্ট বোলিং হবে না, টেনিস চ্যাম্পিয়ন সম্ভব নয়। এই দেশটা চমকে জেগে উঠে শিরদাঁড়া সোজা করে তাকাবে যদি আনন্দ উইম্বলডন জেতে। ষাট কোটি মানুষ, ভাবা যায়! আর তার বদলে একজনের, মাত্র একজনের সাধ কিংবা বলা যায় শখ, মেটাবার জন্য এত মানুষকে ডুবিয়ে দেওয়া! কী করব এখন? দেশের জন্য না নিজের জন্য? বেচারা রোজওয়াল, কী সাধনা, মনের জোর—এসব কি ব্যর্থ হবে শেষ পর্যন্ত? দেশ বড় না একটা লোক বড়?

আনন্দ ছটফট করে বিছানার এধার থেকে ওধার গড়াগড়ি দিল।

'কিছু একটা ইন্ডিয়াকে দোব। একটা, একবার, শেষ সুযোগের সামনে একবার...'

ছটফট করতে করতে আনন্দ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘণ্টা দুয়েক গভীর ঘুমের পর আপনা থেকেই সে জেগে উঠল। উত্তরের জানলা দিয়ে আকাশে চোখ মেলে দেখল, ঘন মেঘে ছেয়ে রয়েছে। ঘুমোবার আগে ছিল গনগনে রোদ। বহু দূরে দমদমে নামার জন্য একটা জেট প্লেন নিচু হচ্ছে। তার হঠাৎ মনে পড়ল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিম এবার আসবে। ইংল্যান্ডে সদ্য থেঁতলে যাওয়া ভারতকে এবার ওরা মাড়িয়ে যাবে—কারা কারা আসবে টিমে?

এখনও টিমের নাম অ্যানাউন্স করেনি। শুধু করেছে ক্যাপ্টেনের নাম, লয়েড।

সোবার্স বলেছে, আমি রিটায়ার করিনি, তার মানে আসতেও পারে। কানহাইও। কালীচরণ, রো, ফ্রেডেরিকস, বয়েস, মারে, হোল্ডার, গিবস, এরা তো আসবেই। আর অ্যান্ডি রবার্টস। উফ্‌ফ্‌, কী টিম! এদের এগেনস্টে বোলিং!

চকচক করে উঠল আনন্দর চোখ। তছনছ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ভারতকে। মুহ্যমান লোকেরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে রিলে শুনছে আর হতাশায় মাথা নাড়ছে—এমন একটা দৃশ্য চোখের ওপর ভেসে উঠতেই টেপরেকর্ডারটা চালিয়ে, সেটা বুকের কাছে ধরে সে ফিসফিস বলতে লাগল: "আকাশবাণী, এখন খবর পড়ছি ইভা নাগ। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল, বোম্বাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলার জন্য ভারতীয় দলের নাম ঘোষিত হয়েছে। বাংলার ফাস্ট বোলার আনন্দ ব্যানার্জি চোদ্দোজনের মধ্যে স্থান পেয়েছেন।"

সারা বিকেল সে এই কথাগুলো বাজিয়ে বাজিয়ে শুনল।

॥ আট ॥

"ব্যানার্জি তুমি খেলছ!"

এতক্ষণ কাঠ হয়ে বসে ছিল আনন্দ, ড্রেসিংরুমের কোণের চেয়ারটায়। পাশের ঘরে তখন সিলেকশন কমিটির মিটিং চলছিল। পাণ্ডুরং সালগাঁওকর না আনন্দ ব্যানার্জি, কে খেলবে? ঘরের আর এক কোণে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে পাণ্ডু একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে। দুজনের মনে একই চিন্তা, কে বাদ যাবে। পতৌদির নিথর ডান চোখ কিছুক্ষণ গেঁথে রইল আনন্দর মুখে, তারপর পিঠে চাপড় দিয়েই তাকাল সালগাঁওকরের দিকে।

"সরি পাণ্ডু।"

সালগাঁওকরের মুখটা কিছুক্ষণের জন্য ফ্যাকাশে হয়ে রইল। বহুদিন ধরেই তার নাম আলোচিত হচ্ছে ভারতের সম্ভাব্য ওপেনিং বোলার হিসাবে। আজকের টাইমস অফ ইন্ডিয়ায়, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে, স্টেটসম্যানেও তাকে দলে নেবার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সব কাগজই বলেছে, ব্যানার্জি বড্ড কাঁচা, এখনই বিশ্বের সেরা মারকুটে ব্যাটসম্যানদের সামনে ওকে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না। যদি বেধড়ক মার খায় তা হলে কেরিয়ার শেষ হয়ে যেতে পারে। সকালে কাগজে এইসব পড়তে পড়তে আনন্দ নিশ্চিত হয়ে গেছল এগারোজনের মধ্যে তার জায়গা হবে না। তাই পতৌদির বাড়ানো হাতটা ধরতে ভুলে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে রইল। সেই সময় সালগাঁওকরই এগিয়ে এসে তার বিরাট মুঠোয় আনন্দর ডান হাতটা ধরে বলল, "আমি কিছু মনে করছি না। কেউ একজন তো বাদ যেতই। তোমার বদলে আমি হলাম। তুমি সাকসেসফুল হও এটাই চাই।"

অনেকেই কনগ্র্যাচুলেট করে গেল। আনন্দ শুধু "থ্যাংক ইউ" বলা ছাড়া আর কোনও কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারল না। অবশ্য বলার আছেই বা কী। সকলেই

বয়সে বড়। ওরা পরস্পরকে ডাকে অদ্ভুত সব ডাকনামে—ভেঙ্কটরাঘবন 'ভেঙ্কি', বিশ্বনাথ 'ভিশ্', সুনীল গাভাসকর 'সানি', একনাথ সোলকর 'একি', প্রসন্ন 'প্রাস' এইরকম আর কী। মেজদা বলে দিয়েছে, ওরা তোমার থেকে অনেক বড়। ছোট ছোটর মতোই থাকবে।

আর ঠিক আধঘণ্টা বাকি ফিফথ টেস্ট ম্যাচ শুরু হতে। আনন্দ ড্রেসিংরুম থেকে নেমে এল মাঠে। নতুন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। ইডেনের মতো অত বড় নয়। নেট-প্র্যাকটিস করছে দুটো টিমই। গিবস, বয়েস, সোবার্স বল করছে। কালীচরণ নেটের মধ্যে।

ইন্ডিয়ান নেটে ফারুক। একটা বল নিয়ে মিডিয়াম-পেসে আনন্দ বল করল কয়েকটা। ব্রিজেশ, মাঁকড় আর সোলকর অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে, ক্যাচিং প্র্যাকটিস করাচ্ছে প্রসন্ন। আনন্দ গিয়ে দাঁড়াল ব্রিজেশের পাশে। মালীরা এসেছে নেট তোলবার জন্য। পতৌদি আর লয়েড টস করতে নামছে। গেস্ট ব্লকে মেজদা বসে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বোম্বাই এসেছে। কাল রাত্রে হোটেলে দেখা করে শুধু বলেছিল, "আনন্দ, ঘাবড়াচ্ছিস?"

"ঘাবড়াব কেন, তবে বুকের মধ্যে—"

মেজদা হাসিমুখে বলেছিল, "সব অসুখই সারে। তুইও সেরে উঠবি।"

পতৌদি টসে জিতেছে। কিন্তু ইন্ডিয়া ব্যাট করছে না। রবার্টস, সোবার্স, বয়েসের কথা ভেবে, তাজা পিচ ওদের হাতে তুলে না দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকেই ছেড়ে দিয়েছে আনন্দর বলের সামনে।

আনন্দর হাতে বল। জীবনের প্রথম টেস্টের প্রথম ওভার। ফ্রেডেরিকস গার্ড নিয়ে ক্রিজে আঁচড় কাটছে। পতৌদি ফিল্ড সাজাচ্ছে।

"গালিকে ফোর্থ স্লিপ করে দেব?"

আনন্দ বোকার মতো মাথা নাড়ল।

"থার্ডম্যান রাখার দরকার আছে?"

আনন্দ আবার মাথা নাড়ল।

পতৌদি আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে ফিল্ড সাজাল। গাড়েওয়ার প্যাভিলিয়নের দিকে চব্বিশ স্টেপ নিয়ে বুটের স্পাইক দিয়ে ঘাসে আঁচড় কাটার পর আনন্দ মুখ তুলেই দেখল গ্যালারিতে দুটো টি ভি ক্যামেরা—এখন হয়তো তাকেই তাক করে আছে। আনন্দর বুক ঢিবঢিব করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ঘুরে গিয়ে ব্যাটসম্যানের দিকে তাকাল। তখন ফ্রেডেরিকস পিছনটা একবার দেখে নিয়ে স্টান্স নিল।

"প্লে।"

আম্পায়ার রুবেন্স পাশে তুলে রাখা বাঁ হাতটা নামিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

আনন্দ একবুক নিশ্বাস টেনে চোখ বন্ধ করল। তারপর ছুটতে শুরু করল বল হাতে। পঞ্চাশ হাজার লোকে ভরা স্টেডিয়াম শ্বাসরুদ্ধ কৌতূহলের চাপে বোবা হয়ে গেল মুহূর্তে। এই সেই বোলার, যে একটাও ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ না খেলেই টেস্ট খেলছে। সিলেক্টাররা ওর মধ্যে কী দেখে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে নামিয়েছে?

অবশ্য প্রথম চারটি টেস্টেই হেভি ইনিংস ডিফিটের পর আর একটা ডিফিটে কিছু এসে যায় না। তা হলেও সালগাঁওকর ছিল, মহীন্দর অমরনাথ ছিল, ঘাউড়ি ছিল। তা নয়, কোথাকার এক বোলার, বেঙ্গলেও যাকে কেউ চেনে না, একে টেস্ট খেলাবার কোনও মানে হয়?

ওরা উদগ্রীব হয়। কে এই ব্যানার্জি! কেমন বল করে, কত জোরে করে!

ব্যাটের ঠিক মাঝখানে বল মারার মিষ্টি একটা শব্দ। লেগ স্টাম্পে ফুলটস। ল্যাটা ফ্রেডেরিকস এক জায়গায় দাঁড়িয়েই অন-ড্রাইভ করেছে। স্কোয়ার-লেগ থেকে ব্রিজেশ প্যাটেল নিয়মরক্ষার জন্য কয়েক পা ছুটে থেমে গেল। একটা পুলিশ বাউন্ডারি থেকে বলটা ছুড়ে দিল।

প্রথম বলে চার। আনন্দর কান দুটো গরম হয়ে উঠল। রাতে একবার ভেবেছিল, প্রথম বলেই স্টাম্প ছিটকে দিয়ে মাঠে হইচই ফেলে দেবে। এঞ্জিনিয়ার ফার্স্ট স্লিপ বিশ্বনাথকে কী যেন বলল। বিশ্বনাথ মাথা নাড়তে নাড়তে পাশের গাভাসকরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

দ্বিতীয় বল। বলটা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দর বুক হিম হয়ে গেল। ইন সুইংটা এত বড় হয়ে যাবে ভাবেনি। তাও শর্ট পিচ। মাঁকড় ভয়ে মাথা নিচু করল। স্কোয়ার-কাটের শব্দটা চাবুকের মতো আনন্দর মুখে আছড়ে পড়ল। কভার থেকে পতৌদি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল পয়েন্ট বাউন্ডারির দিকে, মাঠের মধ্যে ছুড়ে দেওয়া বলটা আনতে। বলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আনন্দর দিকে ছুড়ে দিল।

তৃতীয় বল।

হাঁটুটা কাঁপছে। কাঁধে যেন একশো কেজির চালের বস্তা চাপানো। লেংথ আর ডিরেকশ্যন এবার এ দুটো যেন ঠিক থাকে। স্রেফ সোজা বল। সুইং টুইংয়ে ওস্তাদি নয়। একটু শুধু ঠুকে দেওয়া।

সপাটে পুল। চার। এতটা শর্টপিচ হয়ে যাবে আনন্দ ভাবেনি।

বলটা পতৌদি কাছে এসে হাতে দেবার সময় বলল, "ঘাবড়ো মাৎ।"

মাথা নিচু করে বোলিং মার্কে ফিরে এল আনন্দ। পিছন থেকে একটা চিৎকার এল—"গুড বোলিং ফর লেডিজ ক্রিকেট।"

দরদর ঘামছে আনন্দ। প্যান্টে হাত মুছল। একটা বাউনসার দিলে কেমন হয়? যদি ব্রিজেশের কাছে ক্যাচ ওঠে।

না হুক, না পুল ধরনের একটা শট। ফাঁকা মিড উইকেট দিয়ে বলটা বাউন্ডারিতে গেল। চার বলে ষোলো রান। চারদিকে বেশ শোরগোল। আনন্দ কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না। কিছু বুঝতে পাচ্ছে না। লজ্জায় অন্ধ হয়ে গেছে, কালা হয়ে গেছে। এখন কোনওরকমে মাঠ থেকে পালানো যায় যদি।

"কিপ দ্য বল ওয়েল আউটসাইড দ্য লেগ স্টাম্প।"

পতৌদির গলাটা কেমন কঠিন। আনন্দ মাথা নাড়ল।

ফিফথ বল। রুবেন্স দুহাত মেলে ধরল। ওয়াইড-বল।

সবাই বুঝে গেছে ব্যানার্জি নার্ভাস হয়ে পড়েছে। পালাবার একমাত্র উপায় ইনজিওর্ড হয়ে যাওয়া। পা মুচকে? টেরিফিক শট আটকাতে গিয়ে আঙুল ভেঙে? বল ধরতে ঝাঁপিয়ে কাঁধের হাড়ের ডিসলোকেশন?

পরেরটা হল নো-বল, ফ্রেডেরিকস হাঁকড়েছে। আনন্দর মাথার উপর দিয়ে ছয় হতে হতেও হল না। বাউন্ডারির হাত খানেক ভিতরে পড়েছে।

আরও দুটো বল করতে হবে। ছ বলে একুশ রান হয়েছে। ফ্রেডেরিকসের কুড়ি, একটা ওয়াইড, এবার পালাতে হবে। মাসল পুল তো হতে পারে! ফার্স্ট ওভারেই কি হওয়াটা উচিত হবে? লোকে ঠিক ধরে ফেলবে—ব্যাটা মার খেয়ে পালাচ্ছে।

এবার লেংথে সোজা বল, একটু স্লো। ফ্রেডেরিকস এবারও মারের বল পাবে ভেবেছিল। পা বাড়িয়ে ড্রাইভ করার জন্য ব্যাট তুলে যখন বুঝল বলটা মারলে উঠে যাবে তখন ব্যস্ত হয়ে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলতেই বলটা সামনে একটু উঠে গেল। আনন্দ হাত বাড়িয়ে ঝাঁপাল।

আর উঠছে না সে। ছুটে এল সবাই। বলটা মাটিতে পড়েছে, তার উপর পড়েছে ওর বুক। শরীরের চাপে বলটা পাঁজরে, ঠিক যেখানে হার্ট—সঙ্গে সঙ্গে সেন্সলেস।

"আনন্দ, আনন্দ।"

চোখ বুজে আনন্দ হাঁপাচ্ছে। বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানিটা কী রকম অদ্ভুত একটা ব্যথা তৈরি করেছে। একগোছা তীক্ষ্ণ ছুঁচ যেন পর পর বিঁধিয়ে যাচ্ছে। নিশ্বাস নিতে গেলে লাগছে।

"আনন্দ?"

চোখ খুলে তাকাল। জানলার বাইরে অমল।

"শুনেছ, ডগুদাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।"

"কেন, কবে, কী করেছে?"

"কারখানায় সেদিন যে আগুন লেগেছিল, ওটা নাকি ডগুদার কাজ। পুলিশের কাছে ওরা নালিশ করেছিল তাই ওকে ধরে নিয়ে গেছে, কোর্টে কেসও উঠেছে।"

"এত ব্যাপার হয়ে গেল, আর আমি কিছুই জানি না! ডগুদা কোথায়?"

"জেলে।"

"জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আনা হয়নি?"

"কে জামিন দাঁড়াবে? ওর ভাইয়েরা বলেছে, আমরা কিছু পারব টারব না। মা চেয়েছিল জামিন হতে, কিন্তু আমাদের তো টাকা বা বিষয়-সম্পত্তি কিছুই নেই।"

"ডগুদা আগুন লাগিয়েছে, হতেই পারে না। মিথ্যে কথা। কে দেখেছে?"

"দু-তিনজন ডগুদাকে নাকি কারখানার পিছনে যেদিকে আগুন লাগে, সেদিক থেকে আসতে দেখেছে। কালকেই মামলা উঠবে। এছাড়াও ডগুদা নিজেই তো একদিন চিৎকার করে বলেছিল আগুন লাগিয়ে দোব।"

"রাগের মাথায় ওরকম কথা সবাই বলে। তার মানে এই নয় যে, সত্যি সত্যিই

আগুন দেবে। মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। আমি শ্যিওর। এই মাঠটাই হচ্ছে সবকিছুর মূলে, শিবা দত্ত এটাকে গ্রাস করতে চায়। ডগুদাই হচ্ছে কাঁটা।"

"তোমার বাবা ওদের উকিল দাঁড়িয়েছে।"

আনন্দর মুখ মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হল। চোখে ফুটল অসহায়তা।

"আমি কী করতে পারি।"

"না না, এমনিই বললাম, আমি এখন চলি।"

আনন্দ কিছু বলার আগেই জানলা থেকে অমল অদৃশ্য।

বিপিনদা ঘরে ঢুকল। তাকে ট্যাবলেট খাইয়ে চলে গেল।

আমি কী করতে পারি! আনন্দ ভাবতে শুরু করল ঘরে পায়চারি করতে করতে। ডগুদা পরের উপকার করার জন্য সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। একটা আদর্শ আছে, আদর্শবাদী লোক। তাই বিয়ে পর্যন্ত করেনি। সেকালে বিপ্লবীরাও নাকি এইরকম ছিলেন, দেবুদাই বলেছিলেন বিপ্লবীরা সংসারী হতেন না দেশের সেবা করার জন্য। ডগুদা সম্পর্কে বলেছিলেন, ইডিয়ট, লেখাপড়া করেনি, বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, আছে শুধু গোঁয়ার্তুমি আর সারল্য। জীবনে এরাই পস্তায়। ডগুদা পরোপকার করতে গিয়ে এখন পস্তাচ্ছে। দেবুদা শুনে নিশ্চয় খুশি হবে। হঠাৎ আনন্দর মনে ভেসে উঠল একটি মুখ। পুরুলেন্সের চশমা, লম্বাটে চোয়াল, বিরাট একটা মাথা—দেবুদার মুখ। আশ্চর্য! আনন্দ মনে মনে বলল পায়চারি থামিয়ে, আশ্চর্য এতক্ষণ এটা কেন মনে আসেনি! দেবুদা তো উকিল, সেই তো ডগুদার জন্য মামলা লড়তে পারে। ছাড়িয়ে আনার জন্য প্যাঁচালো যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বড় উকিল হবার এই তো সুযোগ দেবুদার সামনে। ফি নিশ্চয়ই চাইবে না, ব্রিফলেস উকিলকে সেধে মামলা দিলে বর্তে যাবে। মামলায় জিতলে বেকসুর ডগুদাকে খালাস করতে পারলে দেবুদার নাম হবে। তখন লাইন পড়ে যাবে ওর বাড়িতে। এটা ওর মাথায় ঢোকাতে যদি পারা যায়।

॥ নয় ॥

"তোর বাবা তো শুধু বোঝে আইন। আর, শুধু আইন মুখস্থ থাকলেই কি উকিল হওয়া যায়?"

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে দেবুদা কপালে তিনটে টোকা দিল।

"নিশ্চয়, ব্রেনই তো আসল জিনিস। স্কুলমাস্টার কি ঔপন্যাসিক কি ডিটেকটিভের মতো উকিলেরও দরকার ব্রেন। মেইগ্রের ব্রেন আছে বলেই তো—"

আনন্দ ইচ্ছে করেই শেষ করল না। তক্তপোশে আধশোওয়া দেবুদা মুচকি মুচকি হাসছে। মেজাজটা মনে হচ্ছে ভালই রয়েছে।

"তা হলে ডগুদার কেসটা কী হবে?"

"আরে দূর, এসব ছোটখাটো ব্যাপারে আমাকে টানাটানি কেন।"

"ছোটখাটো! একটা লোক বিনা দোষে জেল খাটবে, ষড়যন্ত্রের শিকার হবে, আর একে ছোটখাটো বলছেন? ধরুন একটা লোককে মিছিমিছি খুনের সঙ্গে জড়িয়ে

অকাট্য সব প্রমাণ রেখে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া হল। ধরুন না মেইগ্রের সেই কেসটা যেটা একদিন বলেছিলেন আমাকে।"

দেবুদা ভ্রু কুঁচকে বলল, "কোনটা?"

"সেই যে গ্রামের খিটখিটে ঝগড়ুটে বুড়িটাকে একদিন তার ঘরে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। এয়ার রাইফেলের গুলিতে মরেছে। সবাই সন্দেহ করল গ্রামের পাঠশালার মাস্টারকে। তার সঙ্গে বুড়ির প্রায়ই ঝগড়া হত। মাস্টার বাইরে থেকে এসেছে, গ্রামের লোকেরা তার শহুরে হাবভাব ভাল চোখে দেখত না, তাই তাকে ভীষণ অপছন্দ করত। গ্রামের পুলিশও মাস্টারকে সন্দেহ করছে। মাস্টারের ছেলের এয়ার রাইফেল আছে, অবশ্য অন্য বাড়িতেও আছে। তা ছাড়া মাস্টারের বাড়ি থেকে বুড়ির ঘরটা দেখা যায়। মাস্টার ভয়ে ছুটে এল প্যারিসে মেইগ্রের কাছে আকুল আবেদন নিয়ে—আমাকে বাঁচান। মেইগ্রে তখন কী করল?"

"জানি।"

"বলতে পারত তো আমাকে আবার টানাটানি কেন? আমি শহরের পুলিশ, গ্রামের পুলিশের এলাকায় নাক গলাবার অধিকার নেই। কিন্তু গ্রামে গেল তো সে মাস্টারের সঙ্গে! লোকটার উপর কি শুধু মায়াই পড়ে গেছল? মানবিকতা বলে একটা ব্যাপারও তো আছে।"

"তুই তো বেশ গালভরা পাকাপাকা কথা শিখেছিস। উকিল হবি নাকি বাবার মতো!"

"দেবুদা, আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস, ডগুদার কেসটা পেলে মেইগ্রে ঠিক নিয়ে নিত। বুদ্ধির ব্যাপার আছে যে!"

উঠে বসল দেবুদা। চশমাটা পাঞ্জাবির খোঁটায় মুছে চোখে লাগিয়ে পিটপিট করে তাকাল।

"কী বুদ্ধির ব্যাপার?"

"তা আমি কী করে জানব! একটা নিরপরাধ লোককে প্যাঁচে ফেলা হয়েছে, তাকে ছাড়িয়ে আনতে নিশ্চয় বুদ্ধি লাগবে। সাক্ষীদের জেরা করে, কি তাদের প্রমাণগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, কি ডগুদা তখন অন্য জায়গায় ছিল এইরকম কিছু প্রমাণ দিয়ে প্যাঁচটাকে খুলে ফেলতে হবে। মেইগ্রে হলে ঠিক পারত।"

দেবুদা ডান তালু দাড়িতে ঘষতে ঘষতে আড়চোখে কয়েকবার আনন্দর মুখের দিকে তাকাল।

"তবে মুশকিল কী জানেন দেবুদা, বাবার সঙ্গে আপনি পারবেন কি না তাই নিয়ে আমার বেশ—"

আনন্দ টেবলে টাইমপিসটার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। দেবুদার গাল ঘষা বন্ধ হয়ে গেছে।

"কালকেই কেস আছে বললি। খরচ-টরচ দেবে কে?"

"মেইগ্রে তো নিজের খরচেই মাস্টারের সঙ্গে গ্রামে গিয়েছিল। নিজের খরচেই হোটেলে ছিল।"

"তাই বলে আমাকেও কি পকেট থেকে টাকা বার করতে হবে? একটা পয়সাও আমি খরচ করতে পারব না।"

দমে গেল আনন্দ। দেবুদা রাজি হয়েও পিছিয়ে যাচ্ছে। বেচারা ডগুদা, বিনা দোষে জেল খাটবে। মিথ্যে মামলার ফাঁস থেকে ওকে বার করে আর কে আনতে পারে। শুকনো মুখে আনন্দ বলল, "ডগুদা ওই মাঠটাকে পাড়ার ছেলেদের খেলার জন্য বুক দিয়ে আগলে রাখে, শিবা দত্তর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে, মাঠটার দলিলে কী লেখা আছে ডগুদা তা জানে, ওর জন্যই মাঠটাকে ওরা গ্রাস করতে পারছে না। একটা ভাল লোক অযথা জেলে যাবে আর আমরা কিছু করব না?"

"করতে গেলে টাকা লাগে।"

"কোথায় পাব? ডগুদার বাড়ির কেউ একটা পয়সাও দিতে রাজি নয়।"

"তাহলেই বোঝ কী রকম লোক। জেল খাটুক অভিজ্ঞতা হবে।"

আনন্দ যাবার আগে শুধু বলল, "মেইগ্রে পড়ে আপনি কিচ্ছু বোঝেননি?"

সন্ধ্যা উতরে রাত শুরু হয়ে গেছে। এতক্ষণ বাইরে থাকার অনুমতি তার নেই। দেবুদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আনন্দ জোরে হাঁটতে শুরু করল। পর পর কদিন রাতে বৃষ্টি হয়েছে। বাতাস জোলো। দেবুদা কাল তাহলে অ্যাপিয়ার হবে না। অন্ধকার খেলার মাঠটার মধ্য দিয়ে যাবার সময় একটা ইট পায়ে লাগতেই অভ্যাসবশত কুড়িয়ে নিল। সাইজটা ক্রিকেট বলের। নিশপিশ করে উঠল ওর ভিতরের রাগ আর দুঃখের মতোই কাঁধের পেশিগুলো। তিন আঙুলে ইটটাকে ধরে সে ছুটতে ছুটতে লাফিয়ে উঠে বল করার মতো ছুড়ল কারখানার দেয়ালে।

দেয়ালে ইট লাগার শব্দটা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতে সে বুক চেপে ধরল। মনে পড়ল তার বুকে চোট। এট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন নয়, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ফ্রেডেরিকসের ক্যাচ ধরতে গিয়ে বলের উপর বুক দিয়ে পড়েছে। এখন সে বোম্বাইয়ে।

বুকে হেভি ব্যান্ডেজ। ডাক্তার বলেছে শুয়ে থাকতে। পুরো রেস্ট। কাল মাঠ থেকেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এক্স-রে হয়েছে। পাঁজরার হাড়ে ক্র্যাক দেখা গেছে। কেবিনে রাখা হয়েছে।

ট্রানজিস্টারে কান পেতে আনন্দ শুয়ে। সেকেন্ড-ডে লাঞ্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজ—টু ফর ফোর হানড্রেড সেভেনটি। দু' উইকেটে চারশো সত্তর। কালীচরণ ব্যাটিং দুশো চার, কানহাই ব্যাটিং হানড্রেড ফিফটি। ফ্রেডেরিকস সত্তর, আর একজন পনেরো, বাকিটা এক্সট্রা।

আউট!

লাঞ্চের পর প্রসন্নর প্রথম বলেই কালীচরণ শর্টলেগে সোলকারের হাতে!

কে আসছে? লরেন্স রো! রিলেওলারা কী যে বলে। আনন্দ কানের কাছে সেটটা ধরল ঠিক মেজদার মতো। (ওহ, কাল মেজদাও হাসপাতালে এসেছিল, আজ সকালেও। ইন্ডিয়া টিমেরও সবাই এসেছিল।)

সোবার্স। আশ্চর্য, সোবার্সকে দেখে চিনতে পারে না? পতৌদি অ্যাটাকিং ফিল্ড

সাজিয়েছে। নিউ ব্যাটসম্যান!

কানহাই-সোবার্স। তিন উইকেটে চারশো সত্তর। আর কতক্ষণ ব্যাট করবে? টি-এ ডিক্লেয়ার করা উচিত। সোবার্স পনেরো মিনিটে মারল প্রথম চার, বেদিকে। নেক্সট পনেরো মিনিটে তিরিশ। আশি মিনিটে একশো এক। কানহাই ততক্ষণে মাত্র বারো।

লয়েড ডিক্লেয়ার করল। লাঞ্চের পর একশো মিনিট ব্যাট করেই। সাড়ে পাঁচশো মিনিটে থ্রি ফর সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি। টি-এর আগে দশমিনিট ইন্ডিয়াকে ব্যাট করতে দিয়ে কী এমন লাভ হবে!

অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে কয়েকটা লোক কথা বলতে বলতে চলেছে আনন্দদের বাড়ির দিকে। মাঠের উপর বিকেলে কয়েকটা ড্রাম নামিয়ে রেখে গেছে কারখানার লরি। আনন্দ এতক্ষণ তারই একটার উপর বসে। লোকেদের কথার শব্দে বোম্বাই টেস্টম্যাচ থেকে সে মুহূর্তে ফিরে এল বাস্তবে।

আনন্দ ওদের পিছু পিছু বাড়ির দিকে এগোল। মাথা ভার ভার লাগছে, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা।

"উকিলবাবু যা যা শিখিয়ে দেবে, মুখস্থ করে ফেলবি। ঠিক সেইভাবে বলবি।"

কথা বলতে বলতে ফটক পেরিয়ে ওরা ঢুকছে। আনন্দ দেখল দুটি অল্পবয়সী ছেলে আর শিবা দত্তর ম্যানেজার।

বিপিনদা সিং-দরজার কাছে উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে; আনন্দকে দেখা মাত্র ফেটে পড়তে গিয়েও পড়ল না।

"এ কী চোখমুখের অবস্থা হয়েছে। গা পুড়ে যাচ্ছে যে!"

"বিপিনদা, আমাকে ঘরে নিয়ে চলো।"

এইটুকু বলেই আনন্দ বিপিনদার বাহু আঁকড়ে হাঁপাতে লাগল।

"কী যে এক অসুখ, চিকিচ্ছেও কিছু নেই। সন্ধে থেকে আমি খোঁজাখুঁজি করছি। মেজবাবু জানতে পারলে আমাকে আস্ত রাখবে না।"

আনন্দ সারারাত জ্বরের ঘোরের মধ্যে কাটাল। এক একবার চমকে উঠে কান পেতেছে কিছু একটা শোনার জন্য। আবার আচ্ছন্ন হয়েছে। একবার তার মনে হল, কে যেন মাথায় হাত বুলোচ্ছে।

"কে?"

"রোজওয়াল।"

"উইম্বলডন পেয়েছ?"

"এখনও তো কোনর্সের সঙ্গে তোমার সেমি ফাইনাল খেলা শেষ হয়নি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। বাকি আছে বটে।"

"তুমি সেরে উঠলে হবে?"

আনন্দ মাথা কাত করল।

সকালে অরুণ গম্ভীর হয়ে গেল ওকে দেখার পর।

"ডাক্তারবাবু যা বারণ করেছিলেন, তুমি তা-ই কিন্তু করেছ। এই অসুখে

সাবধানতাই কিন্তু একমাত্র চিকিৎসা, তোমায় তা বার বার বলা হয়েছিল।"

আর কিছু সে বলেনি। দুপুরে আনন্দ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে একবার ঘুরে এল।

ইন্ডিয়া অল আউট একশো পঁয়ত্রিশ তৃতীয় দিন লাঞ্চে। ফলোঅন। চারশো পঁচাশি রান পিছনে। খেলা এখনও আড়াই দিন বাকি। হার হার, আবার ইনিংস ডিফিট। উইকেটে লাইফ নেই, অ্যান্ডি একটাও উইকেট পায়নি। সোবার্স গুগলিতে দুটো, গিবস ছ'টা, দুটো রান আউট।

হাসপাতালের কেবিনে আনন্দর কানে রেডিয়ো। স্টেডিয়ামের হট্টগোলের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। যেন শ্মশানে খেলা হচ্ছে।

বিকেলে আনন্দর জ্বর কমে সন্ধ্যায় আবার বাড়ল, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কবজিতে, কনুইয়ে, হাঁটুতে, পায়ের গোছে কেউ যেন হাড়গুলো চিবোচ্ছে। যন্ত্রণায় ঝনঝন করছে শরীর। কিন্তু বকুনির ভয়ে বলল না। সে যে খুব বেশি কাহিল নয়, এটা প্রমাণ করার জন্য বিপিনদা যা দিল, তা-ই খেয়ে ফেলল। বার বার উত্তরের জানলায় তাকাল অমলের জন্য। ডগুদার মামলার খবর তাকে জানতেই হবে।

পরদিন দুপুরে অমল এল।

"কী হল?"

"মা গেছল কোর্টে। শিবা দত্তর হয়ে সাক্ষী দিল। চাওলা দয়ানিধি, মন্দিরে কাজ করে নেপেন নামে লোকটা, কারখানার লরি ড্রাইভার আর দুটো মজুর। সবাই বলল একই কথা। ডগুদা কারখানায় আগুন লাগাবে বলে শাসিয়েছিল, ওরা শুনেছে। আর আগুন লাগার কিছু আগে ওরা ডগুদাকে কারখানার কাছাকাছি দেখেছে।"

"ওরা সবাই শিবা দত্তর অনুগ্রহ নিয়ে চলে।"

"কিন্তু সে কথাটা তো জজকে বলে দেবার মতো কেউ নেই।"

"ডগুদা বলতে পারে।"

"মা বলল, ডগুদা নাকি সারাক্ষণ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

ইতস্তত করে অমল আরও কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। আনন্দ তা লক্ষ করে খাট থেকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"তোমার বাবা আমার মাকে ডেকে নিয়ে বলেছে, ডগুদা যদি জমিটা নিয়ে চেঁচামেচি আর না করে তা হলে কেস তুলে নেবে আর কারখানায় একটা চাকরিও হবে। মাকে বলেছে ডগুদাকে বুঝিয়ে বলার জন্য।"

আনন্দ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে অবশেষে হেসে উঠল।

"পাগল, ডগুদা এতে রাজি হবে ভেবেছ? এভাবে ওকে কেনা যাবে না।"

"তোমার কি শরীর ভাল নেই আনন্দ? হাঁপিয়ে কথা বলছ কেন? চোখ মুখ ফুলো ফুলো!"

আবার হাসল আনন্দ।

"কোনর্সের সঙ্গে থার্ড সেটের খেলা চলছে ফাইভ গেম অল, ভীষণ টায়ার্ড এখন। রোজওয়াল ফাইনালে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। এদিকে ইন্ডিয়া ফলোঅন খেয়েছে।"

"তুমি বেশি কথা বোলো না।"

"শুনবে আমি প্রথম ওভারে কী কাণ্ড করেছি?"

"না। তুমি শুয়ে পড়ো।"

"ফ্রেডেরিকস আমাকে পিটিয়ে ছাতু করে দিয়েছে। সারা স্টেডিয়াম শুধু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে আমাকে। আমি তখন লজ্জায় ভয়ে পালাবার ছুতো খুঁজছি। ওভারের শেষ বলে অসম্ভব একটা ক্যাচ ধরতে গিয়ে বলের ওপর বুক দিয়ে পড়েই দারুণ চোট। হাসপাতালে কেবিনে আছি এখন। বুঝলে অমল, এখন আমি সেই ভেতরের পৃথিবীতে।"

আনন্দ চোখ বুজল। নিঃশব্দে জানলা থেকে অমল যে সরে গেল সেটা জানতে পারল না সে। আনন্দ দেখতে পাচ্ছে সে এখন হাসপাতালে। পা টিপে টিপে বেরোচ্ছে কেবিন থেকে। হাতে তোয়ালে মোড়া বুট-জোড়া। লম্বা বারান্দার শেষে সিঁড়ি একতলায় নেমে গেছে। জনমানব নেই কোথাও।

ইন্ডিয়া টি-এ চার উইকেটে পঁয়তাল্লিশ। রেডিয়োটা বন্ধ করেই সাদা জামা আর প্যান্টটা দ্রুত পরে নেয় আনন্দ। নার্স এখন ঘরে নেই। যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে। বুট পরে হাঁটলে শব্দ হবে। ওটা লুকিয়ে নিতে হবে। আনন্দ ব্যানার্জি খেলছে, অথচ ইন্ডিয়া হারবে, কী করে তা সম্ভব? বুকে চিড়িক করে উঠল একটা ব্যথা।

সে সিঁড়িতে পৌঁছে লাফিয়ে লাফিয়ে একতলায় এল। বুকের ব্যথাটা জোরে লাগছে। ব্যান্ডেজটা ভাগ্যিস দেখা যাচ্ছে না। বিশ্বনাথ কি ব্রিজেশের প্যাড, ব্যাট, গ্লাভস চেয়ে নিলেই হবে। আউট হয়ে গেছে ওরা।

"ট্যাক্সি, অ্যাই ট্যাক্সি। স্টেডিয়াম চলো, হয়্যার দি টেস্ট ম্যাচ ইজ নাউ বিইং প্লেড। জলদি, কুইক।"

ইন্ডিয়া সিক্স ফর ফিফটিওয়ান। তিনদিনেই খেলা শেষ হয়ে যাবে। পতৌদি ফিরে আসছে। ক্লিন বোল্ড বাই রবার্টস। ওর উইকেট এই একটাই। দারুণ স্লো পিচ। রবার্টসের মতো ফাস্ট বোলারও এর থেকে লাইফ পাচ্ছে না। অথচ ইন্ডিয়া কোল্যাপস করে যাচ্ছে। আর রইল কে? ব্যানার্জি তো ব্যাট করবে না। প্রসন্ন, বেদি, চন্দ্র। টি-এর পর ঝপাঝপ গেল আবিদ আর পতৌদি। গাভাসকর চব্বিশ নট আউট।

আর বড়জোর আধঘণ্টা। তারপরই ম্যাচ শেষ। তখন বাসে ওঠা, কি ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত হবে। স্টেডিয়াম থেকে এখনই লোক বেরোতে শুরু করেছে।

পতৌদি মাথাটা বাঁ দিকে হেলিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে ফিরছে গ্লাভস খুলতে খুলতে। প্রসন্ন ব্যাট করতে নামবে। তাকে কী বলার জন্য মুখ তুলেই পতৌদি থমকে গেল। বাঁ চোখটা বিস্ময়ে প্রায় কপালে উঠল।

"ব্যানার্জি!"

"ব্যাড লাক, প্যাট।"

ওর পাশ দিয়ে আনন্দ এগিয়ে গেল উইকেটের দিকে।

ইনজিওর্ড, তার উপর বোলার, তাই রবার্টস প্রথম বলটা অফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে মিডিয়াম-পেসে দিল। সাড়ে চারশো রান হাতে নিয়ে এমন দয়া সবাই দেখাতে

পারে।

শব্দ হল টকাস।

স্কোয়্যার কাট। গালিতে গিবস ভয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল। বলটা দেখা গেল না বাউন্ডারিতে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত।

সোবার্স হাসল হাততালি দিতে দিতে। কালীচরণও দিল। ওরা জানে, হারের মুখে ব্যাট করতে এসে এ-রকম দু-চারটে বেপরোয়া মার সবাই মারে।

নেক্সট বলটা সোজা। টক। বোলারের ওপর দিয়ে ছয়। ওভার শেষ। গাভাসকার এগিয়ে এল কথা বলতে।

"ইউ জাস্ট স্টে দেয়্যার সানি। ওনলি স্টে অ্যান্ড গিভ মি সাপোর্ট। ডোন্ট টেক শর্ট রানস বিকজ—"

আনন্দ বুকে হাত দিয়ে, ইংরেজিতে কথাগুলো অনুবাদ করতে না পেরে শুধু বলল, "পেন।"

অবাক চোখে তাকাতে তাকাতে গাভাসকার ক্রিজে ফিরে গেল।

পনেরো মিনিটের মধ্যে লয়েডকে ফিল্ড ছড়িয়ে দিতে হল। রবার্টসের এক ওভারে কুড়ি রান। একটা সিঙ্গল নিতে পারত, নিল না। বুকে যন্ত্রণা। গিবসের এক ওভারে ছাব্বিশ, তিনটে ছয়ই স্ক্রিনের ওপর। সোবার্স এক ওভারে দিল ষোলো। কভারে জলপোকার মতো ছোটাছুটি করছে বয়েস। গোয়েন্দাদের মতো থার্ডম্যানে লরেন্স রো পায়চারি করছে। নেমন্তন্ন-বাড়িতে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকা বরযাত্রীর মতো উশখুশ করছে কানহাই, স্লিপে।

বন্যার মতো রানের স্রোত চলেছে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ডুবে গেল কালীচরণের ইনিংস। সোবার্সের ইনিংস, কানহাইয়ের ইনিংস। বোম্বাইয়ের হাজার হাজার বাঙালি থাকে। নিশ্চয় তারা খেলা দেখতে এসেছে।

"লড়ে যা বাঙালি।"

আনন্দ স্ট্যান্ডের দিকে তাকিয়ে ব্যাট তুলল একবার।

"বেঙ্গল টাইগার, কিল দেম।"

দিনের লাস্ট ওভারের লাস্ট বলে আনন্দ ঠিক একশোয় পৌঁছল বয়েসকে লেটকাট করে। সোবার্সের মতো ঠিক আশি মিনিট লাগল। লাগত না, দারুণ ফিল্ডিং আর সানির ঠুকঠাক সময় নষ্ট করা। দুবার ফ্ল্যাশ করেছিল অফ স্ট্যাম্পের বাইরে। আনন্দ "স্টেডি সানি, স্টেডি" বলার পর গাভাসকার আর করেনি।

ইন্ডিয়া সিক্স ফর হান্ড্রেড সিক্সটি। এখনও বাকি দুটো দিন। পুলিশ কর্ডন করে রেখেছে বাউন্ডারি তাই— নয়তো আনন্দ উচ্ছ্বাসের চাপে মারা যেত। হাজার হাজার লোক ঠেলাঠেলি করছে তাকে কিছু বলার জন্য। সব মিলিয়ে একটা বিরাট চিৎকার। লয়েড দাঁড়িয়ে গিয়ে ওকে আগে যেতে দিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমের সবাই হাততালি দিচ্ছে। আনন্দ চট করে গেস্ট ব্লকের দিকে তাকাল। মেজদার মুখ গম্ভীর।

বুকের ব্যথার জন্য কেউ জড়িয়ে ধরতে পারল না। সোলকার, বেদি, আবিদ গালে চুমু খেল। ডাক্তারবাবু রাগবে কি না বুঝতে পারছে না।

"জানো, পুলিশে খবর দিয়েছে হাসপাতাল থেকে। না বলে তুমি চলে এসেছ।"

"পুলিশে খবর দেওয়া কেন? হাসপাতালে কি কেউ রিলে শোনে না?"

"জানো, মারাত্মক কিছু একটা হয়ে যেতে পারে তোমার। তোমার এখন নড়াচড়া পর্যন্ত বারণ।"

"ইন্ডিয়া হারছে আর আমি শুয়ে থাকব? ব্যানার্জিকে তা হলে চেনেন না। কালও আমি ব্যাট করব।"

॥ দশ ॥

রাত্রে পাখিটা শিস দিচ্ছিল। বিছানায় উঠে টেবল থেকে টেপরেকর্ডারটা আনার মতো জোর আনন্দর ছিল না। একটু পরেই মেঘ ডেকে ওঠে। বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। দোতলা থেকে অরুণ নেমে এসেছিল। জানলা বন্ধ করে, থার্মোমিটারে জ্বর দ্যাখে।

"বাড়িতে তোর ঠিকমতো দেখাশোনা হচ্ছে না। ডাক্তারবাবু বলেছেন হাসপাতালে রাখতে।"

"কেন?"

"সেখানে কড়া পাহারায় থাকবি। সেইটাই তোর দরকার।"

"হাসপাতাল থেকেও তো পালিয়ে বেরোনো যায়। থার্টি টু ব্রিসবেনে এডি পেন্টার হাসপাতাল থেকে এসে ব্যাট করে ইংল্যান্ডকে ছ' উইকেটে জিতিয়েছিল। তিরাশি রান করেছিল পেন্টার। গল্পটা তো তুমিই বলেছিল।"

অরুণ চলে যাবার পর আনন্দ হেসেছিল। সারাদিনটা সে বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কাটিয়েছে। একবার তার মনে হয়েছিল, এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। এই পৃথিবীতে এমন কী সুন্দর ভাল জিনিস আছে যেজন্য বেঁচে থাকা যায়? আবার তার মনে হয় সারা পৃথিবী সুন্দর আর ভাল জিনিসে ভরে আছে, এই বাড়ির বাইরে বেরোলেই সেই জিনিসগুলোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে সে মনমরা হয়ে শুয়ে থাকে। বিকেলে ইচ্ছে হয়েছিল দোতলায় যেতে। এতদিনে একবারও ওঠেনি। জানলায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল দুটো ঘুড়ির লড়ালড়ি। ঘুগনিওলার ডাক শুনে লোভ হয়েছিল, কিন্তু কাছে একটা পয়সা নেই।

সন্ধ্যায় আনন্দ বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়ে ধরা পড়ল বিপিনদার হাতে।

"না, একদম বারণ।"

কোনও ওজর, কাকুতিমিনতি বিপিনদার কানে গেল না।

"ফটকে সারাক্ষণ তালা দিয়ে রাখতে বলে গেছে মেজবাবু, তা জানো? বাবুর লোকজন সেরেস্তায় আসবে বলে এখন তালা খুলে ফটক পাহারা দিচ্ছি।"

আধ ঘণ্টা পর আনন্দ নিঃসাড়ে বাগানের পুব পাঁচিলের ভাঙা নিচু দিকটা টপকাল। মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে বীরা দত্ত রোডে। সেখান থেকে জোরে হেঁটে দেবুদার বাড়িতে। তখন ওর সারা শরীর থরথর কাঁপছে। চিত হয়ে শুয়ে দেবুদা একটা পেপারব্যাক পড়ছিল। বইটা মুখ থেকে ধীরে ধীরে নামিয়ে কয়েক সেকেন্ড

স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"কী হয়েছে তোর?"

"কিছু না। হাঁপিয়ে গেছি।"

দেবুদা আবার বইটা মুখের উপর তুলে ধরল।

"তোর ডগুদা ছাড়া পেয়ে গেছে।"

"কী করে?"

"শিবা দত্ত মামলা তুলে নিয়েছে।"

"সে কী! ডগুদা রাজি হল?"

আনন্দর চোখের সামনে দেবুদা ঘোলাটে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিরাট একটা হাতুড়ি দিয়ে কেউ যেন তার মাথায় এইমাত্র মারল।

"কেন রাজি হবে না?" দেবুদা বলল।

"শুনেছি ওরা বলেছিল জমির মালিকানার ব্যাপারটা যদি চেপে যায়, যদি ডগুদা আর চ্যাঁচামেচি করে ব্যাগড়া না দেয় তা হলে মামলা তুলে নেবে, একটা চাকরিও দেবে। ঠিকই করেছে ডগুদা।"

আনন্দর মাথার মধ্যে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তার দেখা শোনা বোঝা ধারণাগুলো। যা সত্যি, খাঁটি তার জন্য মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করবে কষ্ট স্বীকার করবে, এটাই সে এতদিন জেনে এসেছে।

"আপনিও এই কথা বলছেন?"

"কেন বলব না? পাড়ার ছেলেরা খেলবে বলে জমি নিয়ে ঝগড়া করা, জেল খাটা, শেষ পর্যন্ত এতে কী লাভ? কই, পাড়ার কোনও লোক তো ওর পাশে এসে দাঁড়াল না? আনন্দ, একটা কথা সবার আগে—নিজে বাঁচো তারপর অন্যকে বাঁচাও। ডগুদা তাই করল, বুদ্ধিমান লোক। চিরকাল লোকের উপকার করে বেড়িয়ে এখন বুঝতে পেরেছে এতে কোনও লাভ নেই। আগে নিজের উপকার তারপর অন্যের।"

কথা না বলে আনন্দ শুধু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলেছিল। দেবুদা বইটা আবার মুখের উপর তুলে ধরতেই সে নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে এল। ডগুদার বাড়িতে গিয়ে এখন একবার শুধু জিজ্ঞাসা করবে, কেন সে হার মেনে নিল।

বাড়ির সদর দরজার পাশে খুপরি একটা ঘরে ডগুদা থাকে। রাস্তার উপরেই ঘরের দরজা। বাড়ির ভিতরের সঙ্গে সম্পর্ক একদা ছিল একটা দরজা মারফত। এখন দরজাটা নেই তার জায়গায় দেয়াল উঠেছে। আনন্দ দূর থেকেই দেখল ডগুদার ঘরে হারিকেনের আলো জ্বলছে, দরজাটা আধ ভেজানো।

ডগুদা তক্তপোশে পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। থুতনিটা মুঠোয় ধরা। গভীরভাবে একটা কিছু চিন্তা করছে। তার পায়ের দিকে বসে আছে গীতা মাথা নিচু করে। সেও কিছু একটা চিন্তা করছে। আনন্দ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই থতমত হল। লেডি সোবার্সকে এখানে দেখতে পাবে সে ভাবেনি। ওরা দুজনে চমকে উঠে তার দিকে তাকাল।

"কী চাই?" ডগুদা একটু রুক্ষস্বরেই বলল।

"শুনলাম, আপনি নাকি চাকরি নিচ্ছেন শিবা দত্তর, এটা কি সত্যি!"

ওরা দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ডগুদা সিধে হয়ে বসে বলল, "হ্যাঁ। তাতে তোর কী?"

"তা হলে মাঠটার কী হবে?"

ডগুদা চুপ করে রইল।

"লাইব্রেরিটাও উঠে যাবে?"

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল ডগুদা।

"মাঠে মেয়েদের ট্রেনিং বন্ধ হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ সব যাবে, সব বন্ধ হয়ে যাবে, তাতে আমার কী? আমি আর কোনও ঝামেলায় জড়াব না। এখান থেকে আমি চলে যাব। আমার বয়েস হচ্ছে, আর ক'টা দিনই বা বাঁচব।"

ডগুদার গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে হঠাৎ থেমে গেল। আনন্দর মনে হল এই ঘরটা যেন মাটির নীচে, তার চারদিক চাপা। এখানে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। যেমনভাবে দেবুদার কাছ থেকে উঠে এসেছিল, সেইভাবেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এল। আধ অন্ধকার রাস্তা দিয়ে সে মাঠের কাছাকাছি আসতেই পিছন থেকে অমল ডাকল।

"কী বলল ওরা?"

"ওরা?"

"ডগুদা আর মা?"

"জানো অমল এখন আমার ইচ্ছে করছে প্রচুর আলো প্রচুর হাওয়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে। চারিদিক এত দমবন্ধ করা লাগছে। ডগুদাকে খুব স্পিরিটেড, সৎ বলে জানতাম, কিন্তু শিবা দত্তর কাছে যে নিজেকে এত সহজে বিক্রি করে দেবে আমি ভাবিনি।"

"ওরা বিয়ে করবে তা হলে?"

"কী করবে?" আনন্দ প্রায় চিৎকার করে উঠল।

"ডগুদা আর তোমার লেডি সোবার্স। অন্য জায়গায় বাসা নিয়ে থাকবে, সেই কথাই ওরা আলোচনা করছিল।"

"তোমার মা...লেডি সোবার্স! কেন, কেন?" থরথর কাঁপতে লাগল আনন্দ।

"সকলের মতো ওরাও বাঁচতে চায় যে।"

"আমিও তো চাই। অমল অমল আমার কী হবে—" আর্তনাদে চিরে গেল আনন্দর গলা।

"তুমিও বাঁচবে, চিরকাল খেলা করে বাঁচবে।"

হঠাৎ যেন বিরাট ঘুঁষির মতো কথাটা আনন্দর বুকে লাগল। যন্ত্রণায় সে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ার আগে হেসে উঠল সারামুখ উজ্জ্বল করে। ও তো জানত না, জমাট বেঁধে যাওয়া রক্তের একটা দানা সেই মুহূর্তে তার ব্রেনের দিকেই ছিটকে যাচ্ছে। ও তখন জানত না, সারা জীবনের জন্য ওর শরীরের বাঁ দিকটা অসাড় হয়ে যাবে। ও জানত না, ডাক্তারবাবু এই ভয়টাই অরুণকে বলেছিলেন।

দোতলার ঘরে নিজের খাটে শুয়ে আছে আনন্দ। বিপিনদা এইমাত্র তাকে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। জানলা দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে আকাশটা গাঢ় নীল, সাদা টুকরো মেঘ ইতস্তত ছড়িয়ে অপেক্ষা করছে হাওয়ার। পেলেই ওরা ভেসে বেড়াতে শুরু করবে। আনন্দ অপেক্ষা করছে ওদের ভেসে বেড়ানো দেখার জন্য। বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে সে আকাশ, মন্দিরের ধ্বজা আর একটা নারকেল গাছের হঠাৎ বাতাসে দোলা মাথা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। আর শুনতে পায় শব্দ—কর্কশ রুক্ষ ধপাধপ দুমদাম মাল ফেলা আর মাল তোলার শব্দ মাঠটা থেকে। মাঠে ছেলেমেয়েরা আর খেলে না। ডগুদা, লেডি সোবার্স আর অমল কোথায় যেন চলে গেছে এই অঞ্চল ছেড়ে।

দিন চারেক আগে সেই পাখির ডাকটা সে অনেকদিন পর শুনতে পেয়েছিল। গভীর রাতে শিসটা লণ্ঠনের মতো দুলতে দুলতে জানলার বাইরে দিয়ে চলে যায়। ভাগ্যিস টেপরেকর্ডারে ধরে রাখেনি? রাখলে, এমন করে অবাক হওয়ার মজাটা ফুরিয়ে যেত।

তন্দ্রা আসছে আনন্দর। চোখের পাতা জুড়ে আসছে ঘুমে। এমন সময় একটা স্বর ফিসফিস করল:

"ব্যানার্জি আমি তোমার সঙ্গে ফাইনালে খেলার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"কিন্তু আমি যে কোনর্সের সঙ্গে খেলাটা শেষ করতে পারছি না। ওকে হারাবার পরই তোমার কাছে আমায় তো হার মানতেই হবে, তখন যে আমার খেলাও ফুরিয়ে যাবে। আমি যে অনেকদিন খেলতে চাই।"

"ব্যানার্জি তুমি আমাকেও হারিয়ো।"

"না না, তোমাকে আমি হারাতে পারব না।"

"তুমি হেরে গেলে তোমার দেশের লোক দুঃখ পাবে।"

"পাক পাক। আমার ইচ্ছেয় আমি হারব আমার ইচ্ছেয় আমি জিতব। আমি একটা দারুণ পৃথিবীতে চলে যাব যেখানে আমায় কেউ হারাতে পারবে না। কিন্তু মুশকিল কী জানো, জিতে ফেললেই সেই পৃথিবীটা থেকে আমায় বেরিয়ে আসতে হবে তাই কোনর্সের কাছে আমি জিতছি না। তুমি কি অধৈর্য হয়ে পড়ছ?"

"আমি ভয় পাচ্ছি ব্যানার্জি। কোনর্সের সঙ্গে খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন তুমি যে ম্যাচ ছেড়ে দেবে।"

"না, মোটেই না। উইম্বলডন থেকে চলে যাবার পর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ইন্ডিয়াকে ইনিংস ডিফিট থেকে বাঁচাবার জন্য আমি ব্যাট করব। এখন আমি একশো নট আউট, দুটো দিন ব্যাট করতে হবে। রেকগনাইজড ব্যাটসম্যান বলতে আছে শুধু গাভাসকার। আমি একটার পর একটা রেকর্ড ভাঙতে ভাঙতে যাব। পঞ্চাশ রানে ইন্ডিয়াকে এগিয়ে দিয়ে আউট হব। শেষদিন টি-এর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাট করতে নামবে আধঘণ্টায় ওই রানটা তুলে নিয়ে ম্যাচ জিততে। কিন্তু ফাস্ট বোলার ব্যানার্জি যে কী জিনিস এইবার ওরা তা দেখতে পাবে, কখনও দেখেনি এমন বোলিং করব।"

"সেই ম্যাচও তো শেষ হবে একদিন।"

"হোক। সারা পৃথিবী জুড়ে খেলা চলেছে রোজওয়াল, তুমি কি কাগজ পড়ো না? দ্যাখো না রোজ কত জায়গায় কত খেলা? অফুরন্ত অগুন্তি। আমি এই বিছানায় শুয়ে একটার পর একটা খেলা খেলে যাব। শেষ সুযোগ সব সময় আমার সামনে থাকবে—চিরকাল। সারা পৃথিবী গ্যালারিতে বসে অপেক্ষা করে থাকবে আমাদের ফাইনাল খেলাটার জন্য।"

দোতলার ঘরে, দুপুরে, জানলা দিয়ে তাকিয়ে মেঘেদের ভেসে বেড়ানো দেখার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আনন্দর মুখের ওপর হালকা মেঘের মতো একটা হাসি ভেসে বেড়াতে লাগল। চোখদুটো জলে ভরে আসছে। তার উপরই ঝলমল করে উঠল নরম আভা নিয়ে বুকের মধ্য থেকে ফুটে ওঠা মিষ্টি রোদ। মনে মনে সে তখন বলল: এত খেলা, চারদিকে এত খেলা!

নারান



চোখের জলের ঝাপটা দিতে দিতেই নারান সিঁড়ির মাথায় দেয়াল ঘড়িটার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

ইস্‌স চারটে বেজে গেছে!

চার লাফে বারোটা সিঁড়ি টপকে উঠে সে হলঘরে এল। ইতস্তত ছড়িয়ে-থাকা টেবিলগুলোয় এক একজন ঘুমোচ্ছে। কেউ লুঙ্গি, কেউ পাজামা, কেউ ধুতি পরে। টেবিলের কাগজপত্র, লেখার প্যাড, দোয়াত-কলম, টেলিপ্রিন্টারের কপিগাঁথা স্পাইক সবই চেয়ারের উপর নামিয়ে রাখা। পাখার হাওয়ায় টেলিপ্রিন্টার রোল থেকে মেঝেয় লতিয়ে নেমে আসা কাগজ উড়ছে। নারান কাগজ ডিঙিয়ে হলঘরের কোণের দিকে গেল। ওখানে কাঠের আলমারির মাথায় তার টিফিন ক্যারিয়ার রাখা থলিটা রয়েছে।

টেবিলে টোলুবাবু বাঁ কাত হয়ে ঘুমোচ্ছেন। এই সপ্তাহে রাতে স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে ওঁরই ডিউটি। রাত দুটোয় এক তলার প্রেস থেকে স্পোর্টস পাতা সাজিয়ে দিয়ে উঠে এসে শুয়েছেন। প্রতি রাতে শোবার আগে টোলুবাবু এক গ্লাস জল আর একটা ওষুধের বড়ি খান। নারান জলভরা গ্লাস তৈরিই রাখে। সেটা হাতে নিয়ে মুখে তোলার আগে প্রতি রাতের মতো আজও আক্ষেপ করেছেন, "কত ভাল ভাল খবর যে ধরানো গেল না।

"কেন, ধরাবার মতো জায়গা কি পাতায়...?"

"আরে না। ওলিম্পিক হচ্ছে হেলসিঙ্কিতে, ইউরোপের একটা দেশে। ওখানকার সঙ্গে কলকাতার সময়ের কত তফাত হয় জানিস?"

"অনাদিবাবু সেদিন বললেন পাঁচঘণ্টারও বেশি।"

"তবেই বোঝ। ইভেন্টগুলো শেষ হবে, রিপোর্ট লিখবে, তারপর পাঠাবে। কলকাতায় সেটা এসে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত বারোটা-একটা। কপিগুলো তর্জমা করবে কে? এগারোটা বাজলেই তো সবাই ট্রাম ধরতে ছুটবে। তারপর অ্যাত অ্যাত কপি আমি...।"

এক চুমুকে গ্লাস খালি করে টোলুবাবু শুয়ে পড়েন। হেলসিঙ্কিটা যে পৃথিবীর কোন দিকে, কোন জায়গায় নারান তা জানে না। তার ধারণা টোলুবাবুও জানেন না। কিন্তু সিনিয়ার সাব-এডিটারকে আভাসে-ইঙ্গিতেও একজন বেয়ারার পক্ষে সেটা জানানো যায় না!

নারান ঘুমন্ত টোলুবাবুর পাশ দিয়ে আলমারির কাছে গেল। হাত তুলে আমলারির মাথা থেকে থলিটা নামাবার সময়, সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো "হ-অ-অ-অ"

একটা শব্দ শুনল। মুখ ঘুরিয়ে দেখল টোলুবাবু পিট পিট করে তাকে দেখছেন।

"নারান, তোদের ধান্যকুড়িয়ায় চালতা হয়?"

"ঠিক জানি না। নিশ্চয় কারও বাড়িতে গাছ আছে। কেন, আপনার দরকার?"

"না-হ-হ। ধানের সঙ্গে চালের সম্পর্কটা খুব কাছাকাছি তো তাই ভাবলুম..."

"আপনি ভাবছিলেন! এতক্ষণ তা হলে ঘুমোননি?"

"এল না। মনটা খচখচ করছে। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে খেলা...কী যে হবে। তোর কি মনে হয় বল তো?"

নারান এক-পা পিছিয়ে মাথা কাত করে ঘড়ি দেখল। চারটে-দশ! বনগাঁ লোকাল শেয়ালদা থেকে ছাড়বে চারটে-চল্লিশে। স্টেশনে কাগজ নিয়ে যাওয়ার ভ্যানটা অফিস গেট থেকে রওনা হওয়ার সময় হয়ে গেছে।

"আমার কিছু মনে হয় না। আমি এখন চলি, নইলে ভ্যানটা পাব না।"

"আরে দাঁড়া দাঁড়া। সারা রাত আমার ঘুম হল না এই চিন্তায়...প্রথম খেলায় তো ওয়ান নিলে তোরা হারিয়েছিলি, এবারও কি তাই করবি?" টোলুবাবু উঠে বসলেন।

নারান বিভ্রান্ত। অবাক হয়ে বলল, "আজ্ঞে, ওলিম্পিকে তো আমার ইয়ে...আমাদের তো কোনও দল নেই!"

"ওলিম্পিক নিয়ে ভাবার জন্য আমার জেগে থাকার কোনও কারণ থাকতে পারে কি? সারা ভারতের লোক জানে, তুই জানিস হকিতে একটা গোল্ড আমরা পাব। আর কিছু নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ আছে কি?"

"আপনি ফুটবল টিমের জন্য ভাবছিলেন না? এই যে বললেন যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে..."

"রাখ যুগোশ্লাভিয়া। সুইডেনের এক ক্লাব-টিমের কাছে স্টকহোমে দুই-তিনে, ডেনমার্কের এক ক্লাব-টিমের কাছে কোপেনহেগেনে দুই-পাঁচে, হেলসিঙ্কিতে আমেরিকার ওলিম্পিক টিমের কাছে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে এক-তিনে হেরেছে। ভাব একবার, শেষে কি না আমেরিকার কাছে, যারা ফুটবল কী বস্তু জানে না!"

"টোলুবাবু কাগজের ভ্যান ছেড়ে দিলে আমার..."

"তোর কী আবার? ভ্যান চলে গেলে পা তো আছে! আমার ঘুম যে জন্য এল না...হ্যাঁ রে নারান...তোদের এখন সতেরোটা খেলে সাতাশ, আমাদের ষোলোটা খেলে বাইশ। লিগ, ধর পেয়েই গেছিস। এখন তো তোরা একটা ম্যাচ হেরেও যেতে পারিস, কী রে পারিস না?"

এতক্ষণে নারান বুঝতে পারল টোলুবাবুর ঘুম হচ্ছে না কেন। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মোহবাগানের রিটার্ন লিগ খেলাটা আর সাত দিন পরেই। আজই মোহনবাগান দ্বিতীয়বার এবছর জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট হারিয়েছে। টোলুবাবুর ঘুম ছুটে যাবারই তো কথা।

নারান হালদার যশোরের লোক। আট বছর বয়সে স্কুল মাঠে ফুটবলে পা ছোঁয়াবার দিন থেকেই সে ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টার। খবরের কাগজ অফিসে তাকে চাকরি করতে হচ্ছে খেলার বিভাগে। মাত্র ছ'মাস হল সে এই বিভাগের বেয়ারার

কাজ পেয়েছে। প্রথম দুদিনেই সে বুঝে গিয়েছিল বিভাগের হর্তাকর্তারা প্রায় সবাই মোহনবাগান সাপোর্টার। ওঁরা যদি জানতে পারেন সে ইস্টবেঙ্গল ভক্ত তা হলে হয়তো অন্য কোনও ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এটা ধরে নিয়েই সে মুখে চাবি দিয়ে কাজ করে। রিপোর্টার, সাব এডিটররা খেলা নিয়ে যখন তর্ক বা আলোচনা করেন সে মন দিয়ে শুধু শোনে। শুনতে তার ভাল লাগে। অনেক কিছু শিখতে, বুঝতে, জানতে পারে খেলা সম্পর্কে। খেলাকে সে ভালবাসে এবং এই বিভাগটিকেও।

"হ্যাঁ রে নারান, কী মনে হচ্ছে তোর?"

"কী আবার মনে হবে, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন তো। এখনও ইস্টবেঙ্গলের অনেক খেলা বাকি, দু'চারটে হেরেও তো যেতে পারে।...ভেঙ্কটেশ, আমেদ, সালে, চন্দন সিং নেই—"

"সে তো আমাদেরও মান্না, সাত্তার, রুনু নেই। তোদের আপ্পারাও, ধনরাজ, রমন আর ওই পাকিস্তানি ফকরি তো রয়েছে। উহ্হ্, ওলিম্পিকগুলো এমন সময়ে হয় না! কেন যে পুজোর পর করে না! মান্নার জায়গায় এখন শরৎ দাসকে খেলাবার কথা হচ্ছে। চারবছর কোনও ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ খেলেনি শরৎ, কী যে অবস্থা!"

"টোলুবাবু চারটে-চল্লিশে..."

"কী বললি? চারটে চল্লিশে?" এক ঝটকায় তাঁর শীর্ণ লম্বা-কাঠামো টেবলে খাড়া হয়ে গেল। "চল্লিশে চার?...চার দিয়ে চল্লিশ ভাগ...ভাগফল দশ,...তার মানে দশ গোল!" টোলুবাবুর চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার মতো অবস্থা।

"চারটে-চল্লিশে বনগাঁ লোকাল ছাড়বে।"

"নারান, ওটা বনগাঁ নয়, বনগাঁ নয়, ইস্টেবেঙ্গল লোকাল!"

টোলুবাবুর মুখ দেখে নারানের কষ্ট হল। তার থেকে কম করেও পনেরো বছরের বড়, এই সহজ, প্রাণখোলা সাতে-পাঁচে না থাকা মানুষটিকে তার খুব ভাল লাগে। শান্ত টোলুবাবু শুধু অশান্ত হয়ে ওঠেন মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হবার দিন যখন এগিয়ে আসে। ওঁর ব্লাডপ্রেসার নাকি খুবই উঁচুর দিকে। এই সময় অফিসের কেউ, ওঁর কানে যাওয়ার দূরত্বে থাকলে মুখ দিয়ে ফুটবল শব্দটি বার করেন না।

"আমি তা হলে এবার যাই টোলুবাবু। জানেনই তো, আমাকে আবার কাগজ বিক্রি করতে বেরোতে হবে। এই ট্রেনটা ফেল করলে..."

"তা হলে দশ ভাগফল?...রেজাল্টটা যখন তোর মুখ থেকেই...।"

নারান দু-তিন পা এগিয়ে গিয়েছিল। হতাশ, ভেঙে পড়া স্বর শুনে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার মুখ থেকে আবার কখন রেজাল্ট বেরোল! আমি তো ট্রেনের টাইম বললুম।"

"দৈববাণী রে, নারায়ণের দৈববাণী! যা তুই, তোর ট্রেন ছেড়ে দেবে। ধান্যকুড়িয়া, আমি টাইমটেবিলে দেখেছি, দশটা স্টেশন।...এক একটা স্টেশন আর এক একটা গোল।"

"কী আপনি বলছেন? ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচে দশ গোল হয় কখনও? হয়েছে কখনও, না হবে কখনও? আপনি বরং এখন ওলিম্পিকের কথা চিন্তা করুন। সেখানে আমরা দশ গোল খাই কি না।" বলতে বলতে নারান বেরিয়ে গেল।

নীচে এসে দেখল ভ্যানে কাগজ তোলা হচ্ছে। গোবিন্দবাবু দাঁড়িয়ে। নারান তাকে বলল, "টোলুবাবু দেরি করিয়ে দিলেন...উঠব?"

"আজ আর জায়গা হবে না। কাগজ বেশি ছাপা হয়েছে। হেঁটেই স্টেশন যাও।"

"হেঁটে যাব! ট্রেন পাব কি?"

"তা হলে দৌড়ে যাও।"

নারান গ্যাসের আলো-জ্বলা রাস্তার দু'ধারে তাকাল। বাড়িগুলো আবছা। সরু ফুটপাথে সার দিয়ে ঘুমন্ত মানুষ। তাদের সঙ্গে কুকুরও ঘুমোচ্ছে। দূরের সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে মাঝে মাঝে ছুটন্ত লরির শব্দ ভেসে আসছে। গোবিন্দবাবু না বলেছেন যখন তখন আর সেটা হ্যাঁ হবে না। এই ভ্যান থেকেই শেয়ালদায় হকারদের কাছে কাগজ বিলি হবে আর মফস্বলের এজেন্টদের জন্য কাগজের প্যাকেট ট্রেনে উঠবে। ধান্যকুড়িয়ার এজেন্ট হরিহর ভট্টাচার্যের জন্য বরাদ্দ একশো কাগজ নিয়ে সেও ট্রেনে উঠবে। যদি এই ট্রেনটা না ধরতে পারে তা হলে এক ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে কাগজ বিলি করতে। ভোরের প্রথম ট্রেন ঘড়ি ঘরে প্ল্যাটফর্ম ছাড়ে।

নারান মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতিটা হাঁটু পর্যন্ত টেনে তুলে কোমরে গুঁজল। জুতো নেই তার পায়ে। চটি ছিঁড়ে যাবার পর, সেটা মুচির কাছে দিতেই সে একবার মাত্র তাকিয়ে বলেছিল, 'এটা গঙ্গায় দিয়ে এসে একজোড়া নতুন কিনুন। সারাবার মতো জায়গা এতে আর নেই।'

ছুটতে শুরু করল নারান। প্রায় এক মাইল পথ। খোয়ার টুকরো পায়ের তলায় ফুটছে, ছোট গর্তে পড়ে আঙুল আর গোছ ব্যথা পাচ্ছে। সেদিকে নারানের মন দেওয়ার সময় নেই। প্রায় অন্ধকার ট্রামরাস্তা ধরে সে ছুটে চলেছে। ভোরবেলা ব্যায়ামের জন্য যেভাবে দৌড়োনো হয়, নারান সেই বেগে দৌড়চ্ছে না। তারও সাত-আটগুণ জোরে, দেড় হাজার মিটার রেসের প্রতিযোগীদের মতো তার ছোটা। গঙ্গাস্নানের জন্য কিছু মহিলা ও পুরুষকে সে পশ্চিম দিকে হেঁটে যেতে দেখল। তার শুধু একটাই তখন দুশ্চিন্তা —পুলিশ আর কুকুর। কিন্তু এদের কারও সঙ্গে সারাপথে তার একবারও দেখা হল না। যখন সে আমর্হাস্ট স্ট্রিটের মোড়ে তখন সে দেখল কাগজের ভ্যানটা তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই সময়ই একটা পেরেক গোড়ালিতে ঢুকে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল। পেরেকটা টেনে বার করে সে আবার ছোটা শুরু করল।

নারান হালদারের বয়স বত্রিশ। ছিপছিপে, প্রায় ছ'ফুট। দূরপাল্লার অ্যাথলিটদের মতো পায়ের আঙুল থেকে কপাল পর্যন্ত তার দেহের গড়ন। গায়ের রং বালিমাটির মতো। মুখটি লম্বাটে, গালের হাড় সামান্য উঁচু, চোখ দু'টি তীক্ষ্ণ জ্বলজ্বলে। চাহনিতে এমন একটা কাঠিন্য আছে যা থেকে মনে হয় লোকটি জেদি, একগুঁয়ে। হাঁটার ধরনে ব্যস্ততা প্রকাশ পায়। নারান ধৈর্যধারী নয়। চট করে রেগে ওঠে যেমন, জল হয়ে

যেতেও বেশি সময় সে নেয় না। পরিশ্রমে কখনও সে কাতর হয় না। এই গুণটি তার জন্মগত।

হাতঘড়ি থাকলে নারান জানতে পারত, সে একমাইল পথ পাঁচ মিনিটেই দৌড়ে এসেছে। অবশ্য সময়টা নিয়ে সে অবাক হত না। এই রকম বেগে সে যখন-তখনই দৌড়তে পারে। স্টেশনে কাগজের ভ্যানটিকে ঘিরে তখন প্রচণ্ড ব্যস্ততা। থাক দিয়ে মাটিতে নামানো রয়েছে কাগজের স্তূপ। কলকাতার এজেন্টরা এখান থেকেই বিলি করে দিচ্ছে হকারদের। তারা হেঁটে বা সাইকেলে কাগজ নিয়ে ছুটছে চিৎকার করতে করতে। আর বান্ডিল বান্ডিল কাগজ তোলা হয়েছে ট্রেনে। স্টেশনে স্টেশনে স্থানীয় এজেন্টদের লোকের হাতে সেগুলো দেওয়া হবে।

নারান তার এজেন্টের জন্য নির্দিষ্ট কাগজের বান্ডিল ঘাড়ে নিয়ে ট্রেনে উঠল। এঞ্জিনের পিছনের কামরাটা প্রথম থেকেই বেছে নিয়েছে যেহেতু কয়লার গুঁড়ো কম ভিতরে ঢোকে। কিছু লোকও, যারা রোজই এই ট্রেনে যায়, এই কামরায় ওঠে, তারা সবাই পরস্পরকে চেনে। এদের কেউ ফড়িয়া, কেউ ব্যাপারি, দোকানি, কুলি, কম্পাউন্ডার বা সকালের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকও। কিন্তু নারানের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা হয়নি শুধু একটা কারণেই। ট্রেনে উঠেই সে ব্যাঙ্কে কাগজ রেখে, তাতে মাথা দিয়ে, লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আজও সে তাই করল। তবে শোবার আগে কম্পাউন্ডারকে গোড়ালি দেখিয়ে বলল, " কিছুক্ষণ আগে পেরেক ঢুকে গেছল, এখন একটু ব্যথা ব্যথা লাগছে। রাস্তার পেরেক, কিছু হবে না তো?"

"হতে পারে। পেকে পুঁজ হয়ে গ্রাংগ্রিন হতে পারে। হয়তো পা-টা কেটে বাদও দিতে হতে পারে। কিংবা ধনুষ্টঙ্কার হতে পারে। তাতে আপনি আজই মারা যেতে পারেন।" কম্পাউন্ডার পান মুখে দিয়ে হাতের তেলোয় গুণ্ডি ঢালতে লাগল।

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল নারানের মুখ। সে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে বলল, "মরে যেতে পারি?"

"পারেন। রাস্তার পেরেকে মরচে আছে। ওটা মারাত্মক জিনিস। অ্যান্টি-টিটেনাস ইঞ্জেকশন নেওয়া উচিত।"

"কত খরচ পড়বে?"

"টাকা চারেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

আর কথা না বলে নারান শুয়ে পড়ল। চার টাকা তার কাছে অনেক টাকা। বউ, দু'টি ছেলেমেয়ে, চারটে গোরু, অথচ মাইনে ষাট টাকা! কাগজ বিলি করার জন্য হরিহর ভটচাজ দেয় তিরিশ টাকা। এই আয়ে চার টাকা দিয়ে ইঞ্জেকশন নেওয়া যায় না।

দমদম থেকে সিঙ্গল লাইন। এক একটা স্টেশনে ডাউন ট্রেনের সঙ্গে ক্রশিংয়ের জন্য কিছুক্ষণ ধরে আপ ট্রেনকে অপেক্ষা করতে হয়। নারান ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছিল। কাঁধে নাড়া খেয়ে চোখ মেলতেই দেখল মাথায় গামছা বাঁধা ভজনরামের মুখ।

"এ্যা নারান, উঠ উঠ...বারাসাত আ গিয়া।"

ভজনরাম নেমে গেল। কম্পাউন্ডারও নামতে নামতে বলে গেল, "সঙ্গে সঙ্গে চুন লাগানো উচিত ছিল। স্টেশনে নেমেই লাগিয়ে নেবেন।"

এখনও আধঘণ্টা বাকি ধান্যকুড়িয়ায় পৌঁছতে। নারান বাঙ্ক থেকে নেমে বেঞ্চে বসল। ট্রেনের শব্দ আর দুলুনিতে আবার তন্দ্রা আসছে। এইরকম সময়ে তার দেশের কথা মনে পড়ে। তার দাদাদের কথা, কাকার কথা; গাছ, দিঘি, খেত চোখে ভেসে উঠে।

নারানের তিন বছর বয়সে বাবা মারা যান। চৈত্রমাসে পাওনা আদায়ে বেরিয়ে, কুড়ি বিঘে জমি বায়না করে দুপুরে তিন ক্রোশ হেঁটে বাড়ি ফিরেই মাথা ঘুরে পড়েন। আর জ্ঞান ফেরেনি। ভীষণ রাগী মানুষ ছিলেন। খাটতেন দৈত্যের মতো। এক সময় তাঁর এক ছটাকও জমি ছিল না, বাড়ি ছিল না। মারা যাবার সময় সত্তর বিঘে জমি, দশটা বলদ, ছ'টা গাই, দই আর দুধের ব্যবসা, পাঁচ বিঘে জমিতে বাড়ি রেখে যান মাত্র চল্লিশ বছর বয়সেই। নারান মায়ের মুখে শুনেছে, বাবা নাকি তেইশ ঘণ্টা খাটতেন, একঘণ্টা ঘুমোতেন! স্বচ্ছলতার মধ্যে সে বড় হয়েছে। ক্লাস টেন-এ পড়ার সময় তার মা মারা গেলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি।

দেশভাগের পরই তাদের শিবপোতা গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে নারানও গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসে বসবাসের জন্য জমির খোঁজে। বনগাঁ থেকে ঠাকুরনগর তারপর ধান্যকুড়িয়ায় এসে এক চেনা লোকের সঙ্গে তাদের হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তাদের পাশের গ্রামেরই রতন ঘোষ। এখানে সে রেলের কেবিনম্যানের কাজ করে। রতনের মাধ্যমেই শিবপোতার বারোটি পরিবার ধান্যকুড়িয়ায় আট বিঘা জমি কিনল সাড়ে তিনশো টাকা বিঘেয়। তারপর আবার তারা গোপনে দেশে ফিরে গিয়ে পরিবারের লোকদের নিয়ে আসে। এই আসার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করেছিল গ্রামের কয়েকজন মুসলমান।

নারান কিনেছিল দেড় বিঘে। কিছু টাকা, গহনা, তিন বছরের মেয়ে নয়ন আর বউ মহামায়াকে নিয়ে পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে পাঁচ বছর আগে নারান পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে চিরকালের জন্য। থাকার জন্য টালির চালের একটা মাটির ঘর, গোয়াল ঘর আর চারটে গাই কেনার পর হাতে আর টাকা ছিল না। শূন্য হাতে নারান দুধের ব্যবসা শুরু করে। কিন্তু ধান্যকুড়িয়া সাধারণ একটা গ্রাম, লোকসংখ্যা কয়েকশো। দুধ বেচে দিনে এক টাকাও লাভ হয় না। নারানকে তাই চাকরির খোঁজ করতে হয় এবং খবরের কাগজের অফিসে কাজ পেয়ে যায়।

নারান তার ফেলে আসা গ্রাম শিবপোতার কথা যখনই ভাবে বুক ভারী হয়ে যায়। আর এই ভাবনাটা ভোরের ট্রেনেই তার মনে জেগে ওঠে। কিছুক্ষণের জন্য সে পারিপার্শ্বিক ভুলে চলে যায় সীমান্তের ওপারে, আবার এপারে ফিরে আসে ধান্যকুড়িয়ায় ট্রেন থামলে।

ট্রেন থেকে নামার সময় অন্য দিনের মতো আজও সে মনে মনে বলল—পুরনো দিনের কথা ভেবে লাভ নেই। যা ফিরে আসবে না তার জন্য হায় হায় করা বৃথা। বরং আবার কীভাবে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায় সেটাই দেখা উচিত। এজন্য খাটতে

হবে। সবাই মিলে, তাকে আর মহামায়াকে, খাটতে হবে।

হরিহর ভট্টাচার্যের বইয়ের দোকানের মধ্যে থাকে সাইকেলটা। খবরের কাগজ অফিস থেকেই এটা কিনে দেওয়া। স্কুলের পাঠ্য বই, খাতা, কাগজ, পেনসিল ইত্যাদি ছাড়াও ছোটখাটো ওষুধ, পাউডার, সাবান, লজেন্স এমন কী পোলট্রির ডিমও দোকানে বিক্রি হয়। একটা পাল্লা খুলে রেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হরিহর দাঁতন করছিলেন। নারানকে দেখে বললেন, "পেছনের চাকায় হাওয়া কম মনে হচ্ছে, একটু হাওয়া দিয়ে নাও। আর ঝাউডাঙার বাদল নস্করের কাগজের ও মাসের দামটা বাকি পড়ে আছে, তাগিদ দিয়ো।"

নারান দোকানে ঢুকে হাতের ছোট থলিটা কাউন্টারের নীচের তাকে রাখল। তারপর দেয়ালে হেলানো সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে পিছনের চাকায় দু'আঙুলে টিপতেই সামান্য বসে গেল। পাম্পার দিয়ে চাকায় হাওয়া ঢুকিয়ে সে সাইকেলটা বার করে আনল। হ্যান্ডেলের উপর অর্ধেক আর পিছনের ক্যারিয়ারে অর্ধেক কাগজ সাজিয়ে রাখতে রাখতেই সে রাস্তার ওপারের চায়ের দোকানের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, "হাবু, চা দে।"

গ্লাসে চা আর এক আনা দামের একটা সুজির বিস্কুট হাবু দিয়ে গেল। দোকানের পাল্লা বন্ধ করে তালা দিয়ে হরিহর বললেন, "কলকাতা যাব এগারোটার ট্রেনে, টাকাপয়সা ঝন্টুকে বুঝিয়ে দিয়ো।"

নারান ধীরে ধীরে চিবিয়ে বিস্কুটটা খেল। যতক্ষণ না মুখের মধ্যে গলে যাচ্ছে ততক্ষণ সে কোদাল দিয়ে কাদা ছানার মতো বিস্কুটের টুকরো জিভে নাড়ল। মহামায়ার করে দেওয়া চারখানা মোটা রুটি আর লাউপাতা দিয়ে আলুর ছেঁচকি রাতে অফিসে খেয়েছে। এখন পাঁচটা গ্রামে—শালকোনা, আন্দুলিয়া, ঝাউডাঙা, রঘুরামপুর, তুবড়িয়া—সাইকেল চালিয়ে যেতে হবে। একশো কাগজ দিতে একশোবার নামা আর ওঠা। মোট রাস্তা প্রায় আঠাশ মাইল।

ধান্যকুড়িয়ায় ফেরার সময় সাইকেল চালাতে চালাতে নারানের তখন মনে হয়, একটা রাক্ষস তার পেটটা মুঠোয় ধরে টিপছে আর ছাড়ছে। এক আনার বিস্কুট তখন গলায় উঠে এসে আটকে থাকে। তখন রাস্তার ধারের টিউবওয়েল থেকে সে পেট ভরে জল খেয়ে নেয়। ঝাঁ ঝাঁ রোদে দূরের গাছ আর বাড়ি চোখে তিরতির করে কাঁপে। রাস্তার ভাঙা ইটগুলো মাটি থেকে মাথা তুলে সারাক্ষণই সাইকেলটাকে ঝাঁকি দেয়। লরি আসে, বাস আসে সামনে-পিছন থেকে। গোরুর গাড়ির চাকার গর্ত সামলে রাস্তার ধারে বারবার সরে যাওয়া। ঘণ্টা-পাঁচেক পর, দুপুর দুটো নাগাদ বাড়ি ফেরা। তখন তার পেটভর্তি শুধু টিউবওয়েলের জল!

নারান চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাচের বোয়েমে থাক দিয়ে সাজানো বিস্কুটগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। গুনতে শুরু করল। এক, দুই, তিন...এগারো, বারো...গোনা বন্ধ করল। বিস্কুটগুলো খাওয়ার দুটো উপায় আছে—পয়সা দিয়ে কিনে নেওয়া, নয়তো ঝপ করে বোয়েমটা তুলে সাইকেল চালিয়ে সরে পড়া।

মাথা নেড়ে নারান হেসে ফেলল, নিজের উদ্ভট চিন্তায়। তার পকেটে একটা সিকি

আছে বটে, কিন্তু এটা নিরুপায়। কোনও অবস্থায় পড়লে তবেই খরচ করার জন্য। মরে গেলেও সে এটা দিয়ে বিস্কুট কিনে খাবে না। আর বোয়েম লুঠ করার মতো কাজের প্রবৃত্তি তার রক্তে নেই।

"হ্যাঁ রে হাবু, একটু চুন পাওয়া যাবে?"

হাবু চালার নীচে থেকে গলা বাড়িয়ে ডান দিকে তাকাল। "রসময়ের দোকান এখনও খোলেনি। কী হবে চুন দিয়ে?"

"পায়ে একটা পেরেক ফুটেছিল সকালে, সামান্য টাটাচ্ছে জায়গাটা।"

"ও অমন একটু-আধটু টাটাবে, কিছু হবে না। রাস্তায় পানের দোকান পাবে, লাগিয়ে নিয়ো।"

কাগজ বিলি করতে করতে নারানের আর মনে ছিল না চুন লাগাবার কথা। ঝাউডাঙায় বাদল নস্করের বাড়ির দরজার সামনে সাইকেল থেকে নামার সময় গোড়ালিটা পড়ল একটা ইটের উপর। ব্যথা লাগতেই তার মনে পড়ল, চুন লাগাতে হবে।

বাদল নস্কর চাষের কাজ দেখতে ক্ষেতে গেছে। কাগজের পাওনা টাকা না নিয়ে নারান আজ আর ফিরে যাবে না ঠিক করেছে।

"ক্ষেত কত দূর?" নারান জিজ্ঞেস করল নস্করের ক্লাস এইটে পড়া নাতিকে।

"আধ-মাইলটাক হবে।"

"আমার পায়ে পেরেক ফুটেছে, হাঁটতে পারব না। তুমি গিয়ে বরং খবর দাও কাগজওয়ালা ওমাসের দাম নেবার জন্য বসে আছে। এমাসের আজ একুশ, টাকা না পেলে কাল থেকে আর কাগজ দিতে পারব না।"

"কাগজ দেবেন না? ওলিম্পিক চলছে যে!" ছেলেটির মুখে অসহায় ভাব ফুটে উঠল।

"ওলিম্পিক বলে কি কাগজ ফ্রি হয়ে গেছে? কাগজ তো পয়সা দিয়ে আমাদের কিনে আনতে হয়! দশ পয়সা করে হলে তিরিশ দিনে কত হয়?"

ছেলেটি মনে মনে গুণ-ভাগ-বিয়োগ করে বলল, "চার টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা।"

"যদি ওলিম্পিকের খবর পেতে চাও তা হলে এক্ষুনি গিয়ে দাদুর কাছ থেকে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করো।" হাতের কাগজ খুলে সে খেলার পাতাটা ছেলেটির সামনে মেলে ধরল। এতেই কাজ হল। ছুটে চলে যাচ্ছিল তখন নারান আবার ডাকল।

"বাড়িতে পান খায়?"

"হ্যাঁ।"

"একটু চুন এনে দাও তো, গোড়ালিতে লাগাব।"

নারান দরজার সিঁড়ির চওড়া ধাপে বসল। হাতের কাগজটা খুলে চোখ বোলাচ্ছে তখন ছেলেটি ফিরে এল বাড়ির মধ্যে থেকে। আঙুলে কুড়িটা পানে দেবার মতো চুন।

"অত কী হবে।" বলতে বলতে নারান ওর আঙুল থেকে নিজের আঙুলে চুন তুলে নিল। ছেলেটি দৌড়ে চলে গেল। চুন লাগানো গোড়ালি হাঁটুতে তুলে নারান আবার কাগজে চোখ দিল।

একটা খবরে তার চোখ আটকে গেল:

"এমিল জ্যাটোপেকের স্বর্ণ জয়।" ওলিম্পিকের দশ হাজার মিটার দৌড়ে তিনি নতুন রেকর্ড গড়েছেন ২৯ মিঃ ৫৯.৬ সেকেন্ড সময় করে। এর আগে ১৯৪৮-এর লন্ডন ওলিম্পিকেও তিনি স্বর্ণপদক জয় করেছিলেন নতুন ওলিম্পিক রেকর্ড করে। লন্ডনে তিনি পাঁচ হাজার মিটার দৌড়েও রৌপ্যপদক অর্জন করেছিলেন। ওঁর স্ত্রী ডানা জ্যাটোপেকও এই ওলিম্পিকে জ্যাভেলিন নিক্ষেপ বিভাগে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছেন। এমিল জ্যাটোপেকের ১০০ গজ পিছনে থেকে ফ্রান্সের মিমুঁ ১০ হাজার মিটারের রৌপ্যপদক লাভ করেছেন।

খবরটা অসাধারণ বা চমকপ্রদ নয়।

নারান চোখ সরাতে যাচ্ছে পাশের ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচের খবরে! তখন জ্যাটোপেকের একটা কথা তার নজরে এল: "জয়ের পর এক সাংবাদিক তাঁর কাছে জানতে চান—চার দিন পর পাঁচ হাজার মিটার দৌড়েও তিনি অংশগ্রহণ করবেন, এ কথা কি সত্যি? জবাবে জ্যাটোপেক বলেন, 'ম্যারাথন প্রতিযোগিতার তো অনেক সময় বাকি। তাই ততক্ষণ বসে না থেকে কিছু একটা তো করতে হবে।'

তারপর আর একটা বাক্য—"জ্যাটোপেক দম্পতির জন্ম একই বছরে একই দিনে, ১৯২২-এর ১৯ সেপ্টেম্বর।

হঠাৎই নারানের শরীরে হালকা শিহরন জাগল। তারও তো জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর! তবে জ্যাটোপেকের দু বছর আগে। হোক না দু বছর আগে কি পরে, তারা তো প্রায় সমবয়সিই! নারানের শরীরে একটা সতেজ ভাব নাড়াচাড়া করে উঠল। কেন যে সে প্রফুল্লতা বোধ করছে তার কোনও কারণ সে বলতে পারবে না। শুধু তার মনে হচ্ছে, তারই সময়বয়সি একজন পৃথিবীতে তার বিভাগে সেরা।

আর তার ভাল লেগেছে ওই কথাটাও—"ততক্ষণ বসে না থেকে কিছু একটা তো করতে হবে।" রসিকতা করেই জ্যাটোপেক বলেছেন, কিন্তু নারান এর মধ্যে তার নিজের মনের ছবিটাই যেন ফুটে উঠতে দেখছে। সেও তো কখনও বসে থাকে না। তার বউ মহামায়াও কখনও অলস হয়ে সময় কাটায় না। তারা দুজনেই কিছু না কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই জ্যাটোপেক লোকটাও তাই করে।

নারান এই মুহূর্তেই দৌড়কে ভালবেসে ফেলল। সাইকেলটার দিকে সে তাকাল। ভাবল, এটাকে বাতিল করে দৌড়ে দৌড়ে পাঁচটা গ্রামে কাগজ বিলি করলে কেমন হয়? তারপরই মনে হল, এক একটা আট পাতার একশো কাগজ বগলে কি মাথায় নিয়ে দৌড়লে কাজটা বোকার মতোই হবে। বিলি করতে করতে একটা একটা করে কাগজ কমে যাবে ঠিকই, কিন্তু সময়ও তো বেশি লাগবে! দেরি হলে খদ্দেররা চটবেই, আর তার কাছ থেকে কাগজ নেওয়াও বন্ধ করে দেবে।

থাক, দৌড়ে আর দরকার নেই, সাইকেলই ভাল! নারান জ্যাটোপেককে মন থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য ইংল্যান্ডে ভারতের সঙ্গে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের খবরে চোখ রাখল। এই একটা খেলা যার মাথামুণ্ডু সে একদমই বোঝে না, অবশ্য বোঝার কোনও চেষ্টাও করে না। কাজকর্ম ফেলে পাঁচ দিন ধরে মাঠে বসে যারা খেলা দেখে, তারা

যে কী ধরনের লোক সেটাও সে বুঝতে পারে না!

অফিসের রবিবাবু তো ক্রিকেটের উপর ভীষণ খাপ্পা। একদিন টেবল চাপড়ে চিৎকার করে বলছিলেন, "পৃথিবীতে যেসব দেশ উন্নতি করেছে, শক্তিশালী হয়েছে, যেমন আমেরিকা, রাশিয়া, এরা কেউ ক্রিকেট খেলে না। এটা হচ্ছে রাজারাজড়াদের রোদ পোয়াবার একটা ফিকির। আরে বাবা, আমাদের হল গরিব দেশ। স্বাধীনতা পেয়েছি, এবার দিন-রাত পরিশ্রম করে দেশটাকে দাঁড় করাতে হবে। এখন কি আমাদের সময় নষ্ট করার খেলায় মেতে ওঠা উচিত? আর খেলিও তো আমরা তেমনি! এই দ্যাখো না, টুম্যান নামে নতুন এক ছোকরা অ্যায়সা জোরে বল করল যে আমাদের ব্যাটসম্যান ভয়ে পিছু হটে আম্পায়ারের কাছাকাছি চলে গেল।"

রবিবাবু অসহযোগ আন্দোলনে জেল খেটেছেন। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া অন্য কিছু পরেন না। কুস্তি, বকসিং, সাঁতার, জিমন্যাসটিক্‌সের ভক্ত। ওঁর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কীসের যেন জ্বালা আর রাগ বেরিয়ে আসে। টাক মাথাটায় হাত বুলোতে বুলোতে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হ্যাঁ রে নারান, যদি দেশটা ভাগ না করা হত, তা হলে তুই এখানকার থেকে ভাল থাকতিস না মন্দ থাকতিস?" নারান কয়েক মুহূর্ত ভেবে জবাব দিয়েছিল, "ভাল থাকতুম ঠিকই, তবে সেখানে জীবনটা সাজানো ছিল তো...এখন নতুন করে আবার গড়ে তুলতে হচ্ছে। গড়ার একটা আলাদা সুখ, আলাদা আনন্দ আছে। রবিবাবু সেটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। আমার বউ এটা বোঝে।"

স্টিলফ্রেমের গোল কাচের চশমাটা কপালের উপর তুলে দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সি রবিবাবু কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, "তুই দেখছি, আলাদা ধরনের মানুষ! ওপার থেকে যত উদ্বাস্তু এসেছে সবাই বলে কষ্টের কথা, দুঃখের কথা, আর তুই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কিনা আনন্দ খুঁজে পাস?...আলাদা মানুষ তুই।"

নারান অন্যমনস্ক হয়ে একদৃষ্টে কাগজের দিকে তাকিয়ে থেকে ভেবে যাচ্ছিল রবিবাবুর কথাগুলো। লক্ষ করেনি ছেলেটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"দাদু বললেন, ফিরতে ঘণ্টাখানেক দেরি হবে। আপনি কি ততক্ষণ থাকবেন?"

"থাকলে আমার চলবে না। তেরো-চোদ্দো মাইল...আমাকে ফিরতে হবে।"

"কাগজ দেবেন না?" ছেলেটির গলায় হতাশা, মিনতি। নারানের মায়া হল। কাগজটা এগিয়ে ধরে বলল, "কাল অবশ্যই যেন টাকা পাই।" কাগজটা ব্যগ্র হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে আবার বলল, "খেলার খবর পড়তে চাও, কিন্তু কী আছে আমাদের পড়ার জন্য? শুধু তো হকির একটা মেডেল।"

"কেন ফুটবল আছে!"

নারান আর কথা না বলে সাইকেল নিয়ে রাস্তায় উঠে এল। প্যাডেলে পা রেখে সিটে বসার উদ্যোগ করছে, তখন সে ছেলেটিকে আহত স্বরে বলতে শুনল, "এ কী! দ-অ-শ গোল!...ওম্মা! এক দিনেই দুটো ইনিংস শেষ!"

নারান বুঝতে পারল না, কেন ছেলেটির মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে

গেল। মনে হচ্ছে যেন কলেরার রোগী।

"কী হল?" চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে, নারান সাইকেল হাতে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে রইল।

"দশ গোল খেয়েছে ইন্ডিয়া, একটা গোল শুধু শোধ করেছে...যুগোশ্লাভিয়ার কাছে! আর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে খেলার থার্ড দিনে ভারত দু'বার আউট হয়েছে, আটান্ন আর বিরাশি রানে...ইনিংস আর দুশো সাত রানে হেরে গেছে।"

"রাখো ক্রিকেট, বলো ফুটবলের খবরটা।"

"ম্যানেজার এম দত্তরায় খেলার এক ঘণ্টা আগে স্পষ্টই স্বীকার করেন ভারতের পক্ষে জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই...সাতজন খালি পায়ে খেলেছে...ওলিম্পিক স্টেডিয়ামের পাশের এক মাঠে খেলা হয়...আর, খেলা শেষের কয়েক সেকেন্ড আগে কুড়ি গজের শটে আমেদ খাঁ গোল দেয়।"

"দশটা গোল হল কখন?"

"প্রথম মিনিটেই, তারপর তেরো, আঠারো, তেইশ, চুয়াল্লিশ। ফাইভ নিল। তার পর পঞ্চাশ, একষট্টি, তেষট্টি, আটষট্টি, অষ্টআশি!"

"ওরে বাবা, তুমি তো নামতা পড়লে দেখছি! অষ্টাশি মিনিটেও ছাড়েনি! আমাদের টিমে খেলেছে কারা? টিম দিয়েছে?"

"দিয়েছে—বি অ্যান্টনি, আজিজ, মান্না, লতিফ, চন্দন সিং, সম্মুগম, ভেঙ্কটেশ, সাত্তার, মৈনুদ্দিন, আমেদ, জে অ্যান্টনি।"

"কলকাতার প্লেয়ারই তো বেশি।"

এই বলেই নারান সাইকেলে উঠে পড়ল। একটা কথা মনে পড়ায় তার অবাক লাগছে—টোলুবাবু তাকে ভোর রাতে এই খেলার রেজাল্ট সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও জানাননি। নিশ্চয়ই বেশি রাতে, খেলার বিভাগের সবাই বাড়ি চলে যাবার পরই, খবরটা এসেছিল। আগে এলে তো টেবিলে হইচই পড়ে যেত, সেও জেনে যেত। বেশি রাতে খবর এসেছে, খবরটা টোলুবাবুই তর্জমা করেছেন, তিনিই প্রেসে গিয়ে কাগজের পাতায় খবর বসিয়েছেন। আর আশ্চর্য এটা নিয়ে সামান্য উচ্চবাচ্যও করলেন না! শুধু মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে কী হবে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারছেন না! খেলা পাগল কি একেই বলে? শুধুই মোহনবাগান, তার বাইরে পৃথিবীতে আর কিছু নেই! বয়স্ক লোকেরা খেলা নিয়ে কত যে ছেলেমানুষি করেন! হেলসিঙ্কির দশটা গোল হয়তো ওঁর মাথায় ঘুরছে আর আঁতকে উঠছেন। সব কিছুর মধ্যেই উনি দশ গোল দেখতে পাচ্ছেন।

পাগল, দশ গোল বড় ম্যাচে হয় নাকি! নারান চাকরিতে ঢোকার আগে একবার মাত্র ধান্যকুড়িয়া থেকে কলকাতায় এসে ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখেছে। তারপর নাইট ডিউটি করে, কাগজ বেচে, বাড়ি ফিরেই কাস্তে নিয়ে গোরুর জন্য ঘাস কাটতে বসা। তারপর আবার ট্রেন ধরে অফিসে ডিউটি করতে যাওয়া—সময় কোথায় তার মাঠে যাওয়ার? সাইকেলে প্যাডেল করতে করতে নারান শূন্য চোখে সামনে তাকিয়ে। তারও ফুটবলার হবার সাধ ছিল। পনেরো বছর আগেও স্বপ্ন দেখত ইস্টবেঙ্গল টিমে খেলার, কিন্তু এখন তার এ সবের জন্য সময় নেই। সংসারটাকে আগে দাঁড় করাতে

হবে তারপর খেলাধুলোর কথা ভাবা যাবে।

কিন্তু কবে? বয়স তো আর থমকে থাকবে না, বেড়েই যাবে। বুড়ো বয়সে দাবা আর লুডো ছাড়া আর কী-ই বা খেলবে? অথর্ব শরীরে দৌড়োদৌড়ি করা তো যাবে না! অথর্ব শব্দটা মনের মধ্যে ঢুকে পড়তেই নারানের মাথা গরম হয়ে গেল। সে কী! আমি অথর্ব হব? অসম্ভব...অসম্ভব।

প্রচণ্ড গতিতে তার দুটো পা ওঠা-নামা করতে শুরু করল প্যাডেলে চাপ দিয়ে। চোয়াল শক্ত, হ্যান্ডেল ধরা হাতের পেশি ফুলে উঠেছে। মাথার মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা সাইকেলের চাকার মতো বনবন ঘুরছে—বুড়ো হব না...বুড়ো হব না...বুড়ো হব না।

ধান্যকুড়িয়া রেল স্টেশনের পুব দিকে নারানের বাড়ি। সাইকেলটা হরিহর ভটচাযের দোকানে রেখে, নগদ বিক্রির টাকা ওর ছেলে ঝণ্টুকে বুঝিয়ে দিয়ে সে হেঁটে বাড়ি ফেরে। রেললাইন পার হয়ে একটু পা চালিয়ে হাঁটলে মিনিট দশেকের পথ। লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে তার সঙ্গে দেখা হল বিভূতি মুখুজ্জের। হাবড়ায় বাড়ি। এখানে ওঁর জমি জায়গা আছে। ভাগে চাষ করান।

ইনি নারানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, "অন্যের হয়ে কাগজ না বেচে, নিজেই কিনে এনে বেচ না!" নারান বলেছিল, "কাগজ কিনে আনব যে, তার টাকা কোথায়?" কাগজ পিছু তিন টাকা করে সিকিউরিটি-মানি জমা রাখতে হবে। যদি দেড়শো কাগজ আনি তা হলে সাড়ে চারশো টাকা! বাপস! সাড়ে চার টাকা দেবারই ক্ষমতা আমার নেই, আর কিনা...।' বিভূতি মুখুজ্জে বলেছিলেন, "ফিফটি ফিফটি শেয়ারে ব্যবসা করো। সিকিউরিটি-মানিটা আমি দেব, তুমি কাগজের দামটা দিয়ো।"

কয়েক দিন প্রস্তাবটা নিয়ে সে ভেবেছিল। অফিসের ষাট টাকা আর হরিহর ভটচাযের তিরিশ টাকা, এই নব্বুই টাকা আর দুধ বেচে যে ক'টা টাকা পাওয়া যায়। এই টাকায় তো আর বছরের পর বছর চলা যায় না! খরচ তো বাড়বেই। মহামায়াকে বলা মাত্র সে বলেছিল, "ভালই তো, আয় বাড়াবার জন্য নিজেই ব্যবসাটা ধরো। আমার কাছে এখনও ভরি-দেড়েক সোনা তো রয়েছে।" নারান তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, "ভারতে এসে চার বছর বেকার ছিলাম। হাতের টাকা সবই গেল ভিটেটা কিনতে আর দু'বেলা খেতে। তোমার সাত ভরি গয়না তিনশো টাকায় বন্ধক রয়েছে। সুদে আসলে কত যে হয়েছে আজও তার হিসেব করিনি। ওই গয়না ছাড়িয়ে না আনা পর্যন্ত আমি আর কিছু নেব না তোমার কাছ থেকে। তাতে যদি ব্যবসা করা না হয় তো হবে না!"

লেভেল ক্রসিংয়ে সে বিভূতি মুখুজ্জেকে বলল, "টাকা দিয়ে ব্যবসা করার মতো অবস্থা হলে করব। আগে কিছু জমাই তারপর আপনাকে বলব।" দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো অবস্থা তার এখন নয়। শ্রান্তিতে আর খিদেয় শরীর অবসন্ন। এখন বাড়ি ফিরে আবার ঘাস কাটতে বেরোতে হবে।

"নারান, তিরিশ টাকার জন্য এই অমানুষিক পরিশ্রম কত দিন করবে?"

"যত দিন না বেশি টাকার কাজ পাচ্ছি। এই তিরিশ টাকাই বা কে দেয় বলুন? যা পাওয়া যায় তা আর ছাড়ব কেন? আমার মূলধন তো এই শরীরটা, দেদার খরচ

করতে পারি!"

নারান বাড়ির দিকে রওনা হল। পিছন থেকে চেঁচিয়ে বিভূতি মুখুজ্জে বললেন, "মূলধনটা সামলে খরচ কোরো, অসুখ-বিসুখ বলে একটা কথা আছে।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে নারান বলল, "অসুখ তো একটাই...ক্যানসার। হলে কিছুই করার নেই। তা ছাড়া আর কোনও অসুখ আমায় কাবু করতে পারবে না।"

অহঙ্কার দেখানো হয়ে গেল নাকি? বাড়ি ফিরতে ফিরতে নারান ভাবল, শরীরটা কি ভগবানের দেওয়া জিনিস, না কি মানুষ নিজেই গড়ে তোলে? নিজের ভাবনার জালে নিজেই আটকে পড়ল সে। চিন্তা-ভাবনা করার মতো লোক সে নয়। তবে বেঁচে থাকার জন্য পরিশ্রম আর নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসে তার মনে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব প্রশ্ন জেগে ওঠে। অন্যদের ধরাবাঁধা গতানুগতিক নজরের মতো নয়, জীবনটাকে একটু আলাদা ভাবেই সে দেখতে পায়। নারান কখনও দিবাস্বপ্ন দেখে না, তবে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে কিছু একটা ঝিলিক দেয়।

বাড়ি ফিরে সে ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘাস কাটতে। আট বছরের মেয়ে নয়ন তার সঙ্গ নিল ছাতা হাতে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে, উবু হয়ে বসে যখন নারান দক্ষ হাতে দ্রুত কাস্তে চালায়, নয়ন তখন ছাতা ধরে থাকে তার মাথার উপর। এই কাজ করার জন্য কেউ তাকে বলে দেয়নি। বিঘৎ খানেক লম্বা ঘাস। মুঠোয় ধরে সে কাস্তে চালায় আর ঝুড়িতে ছুড়ে দেয়। উবু হয়ে কাটতে কাটতে এগোয় হাঁসের মতো দুলে দুলে আর নয়ন ঝুড়িটা তার পাশে পাশে এগিয়ে দেয়। একটা-দুটো কথা তাদের মধ্যে হয়। যেমন আজ নারান বলল, "সাতের ঘরের নামতাটা মুখস্থ হয়েছে?"

নয়ন বলল, "না। গড় গড় করে পারব না।"

নারান বলল, "কাল মুখস্থ ধরব।...প্রথম ভাগ?"

নয়ন বলল, "দিঘ্‌ঘইকার ধরেছি।"

পাড়ায় একটা মাত্র টিউবওয়েল। সেটা নারানেরই দূরসম্পর্কের এক দাদা শচীন হালদারের বাড়ির সামনে। শচীন তখন খেয়ে উঠে মুখ ধুচ্ছিল। বালতি হাতে নারান অপেক্ষা করছে। মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হল, শচীন যেন ইচ্ছে করেই অযথা সময় নিয়ে হাত ধুচ্ছে, পা ধুচ্ছে, মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে, কুলকুচি করছে। লোকটির সঙ্গে তার সদ্ভাব নেই। তার মাথা গরম হয়ে উঠল।

"কতক্ষণ লাগে হাত মুখ ধুতে? তাড়াতাড়ি করো।" নারান বিরক্ত স্বরে বলল।

"কেন, অত ধমকে কথা বলছিস কেন? ধুতে যতক্ষণ লাগবে ততক্ষণ ধোব। টিউকল কি তোর একার সম্পত্তি?"

"পাবলিকের সম্পত্তি। তাই বলে লোক দাঁড় করিয়ে রেখে..." নারান বালতিটা কলের তলায় বসিয়ে হ্যান্ডেল ধরল। "অনেক মুখ ধোয়া হয়েছে। এবার আমায় চান করতে দাও।"

"তুই আমাকে জোর করে সরিয়ে দিলি?" আচমকা শচীন চিৎকার করে উঠল। সামনের বাড়ির দাওয়ায় বেরিয়ে এল এক প্রৌঢ়। জানলায় উঁকি দিল মেয়েদের মুখ।

এখানে সব বাড়িই একতলা, খড়ের বা টালির চালের। বাড়ির সঙ্গে মাটির উঠোন। ওর চিৎকারে আরও অনেকে বেরিয়ে এল।

নারান কথা না বাড়িয়ে পাম্প করে বালতিতে জল ভরতে লাগল। শচীনের বাড়ি থেকে তখন বেরিয়ে এল তার সেজো ছেলে ভরত।

"কী ভেবেছ কী, য়্যাঁ? তুমি একাই কল দখল করে চান করবে?" ভরত রুক্ষ ভঙ্গিতে বলল।

বাবু হয়ে বসে নারান বালতি থেকে মগে জল তুলে মাথায় ঢালছিল। বলল, "যা জানিস না, দেখিসনি, তাই নিয়ে ঝগড়া করতে আসিস না। বাড়ি যা।"

"নারানকাকা, তোমার গা-জোয়ারি কিন্তু..."

"এক চড়ে তোর দাঁতের পাটি ফেলে দেব যদি আর একটাও কথা বলিস। পায়ে পা বাধিয়ে তোর বাপই ঝগড়া শুরু করে। বাড়ি যা।"

ভরত আরও কিছু কথা বলল অবশ্য গলা নামিয়ে। নারান তাতে কান না দিয়ে বালতিতে জল ভরে বাড়ি ফিরে এল। উঁচু স্বরে গলার আওয়াজ মহামায়া শুনেছে। তাই সে নারানের কাছে কারণ জানতে চাইল।

"কী আবার হবে, শচীনদার যা স্বভাব। আমায় খোঁচা দেবার চেষ্টা করল। অনেক কষ্টে রাগ সামলেছি।"

মহামায়া এই বিষয়ে আর কথা না বলে নারানকে ভাত বেড়ে দিল। সে জানে তার স্বামীর প্রকৃতি। মোটা চালের ভাত, পুকুরের কলমি শাক, ঘরের পিছনে ছাইগাদায় হওয়া মানকচু, বাড়ির উঠোনে মাচায় হওয়া লাউ। এই সব দিয়েই তৈরি হয়েছে রান্না। নারান পেট ভরে খেয়ে, চাটাইয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করল। শিবপোতা থেকে আসার সময় সে অ্যালার্ম দেওয়া জাপানি টেবল ঘড়িটা এনেছিল। বেশ জোরেই সেটা টিক টিক, টিক টিক শব্দ করে। নারান চোখ বুজে শব্দ শোনে, আর অপেক্ষায় থাকে কখন অ্যালার্ম বেজে ওঠে।

আধ ঘণ্টা পরই, চারটের সময় অ্যালার্ম বেজে উঠল, আর নারানও উঠে বসল। তার ছোটখাটো ঘরের কাজ রয়েছে। মহামায়া চার বাড়ি গোরু দুয়ে পাঁচ টাকা মাসে পায়। সে এইবার বেরোবে। গতকাল নারান বাঁশ কেটে রেখেছিল নতুন একটা মাচা তৈরি করবে বলে। কয়েকটা বাঁশ চিরে হাত চারেক লম্বা বাখারি করা। উঠোনের যেখানে মাচা হবে সেইদিকে বাখারিগুলো ছুড়ে দিতে দিতে, হঠাৎ কী যেন মনে পড়ায় মহামায়াকে উদ্দেশ করে নারান বলল, "স্পোর্টসে বর্শা নিক্ষেপ বলে একটা ব্যাপার আছে। লম্বা সরু লাঠির মতো, বোধহয় লোহা টোহা দিয়ে তৈরি কিংবা অ্যালুমিনির, মুখটা ছুঁচলো। এর একটা কী যেন ইংরিজি নামও আছে। ওলিম্পিকে একটা বউ এই বর্শা ছোড়ার কম্পিটিশনে নাম দিয়েছে। তার বরের নাম জ্যাটোপেক, সে নাম দিয়েছে দৌড়ে। তিন রকম পাল্লার দৌড়ে নামবে। প্রথমটায় কাল জিতে গিয়ে সোনার মেডেল পেয়েছে। এবার দ্বিতীয়টায় দৌড়বে।"

"বউ!" মহামায়া হাঁ করে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে। "বউ বর্শা ছুড়বে কী গো? বয়স কত? লজ্জা করবে না?"

"এতে লজ্জা করার কী আছে? কলকাতাতেও তো কত মেয়ে হাফ প্যান্ট পরে দৌড়চ্ছে! জ্যাটোপেক স্বামী-স্ত্রীর জন্ম একই বছরে, একই দিনে। অদ্ভুত না? আরও অদ্ভুত হল, ওরা আমার থেকে ঠিক দু বছরের ছোট, ঠিক দু বছরের...আমাদের তিনজনেরই জন্ম একই তারিখে, উনিশে সেপ্টেম্বর!"

'আমাদের তিনজন' বলে নিজেকে ওঁদের সঙ্গে জড়াতে পেরে নারানের চোখে-মুখে চাপা গর্ব যেন ফুটে উঠল। ঠাট্টার সুরেই সে বলল, "তোমার জন্ম তারিখটাও যদি উনিশে সেপ্টেম্বর হত!"

"তা হলে কী হত? আমি কি তা হলে বর্শা ছুড়তাম ওই বউটার মতো?"

"যদি এ দেশের না হয়ে ও দেশের বউ হতে, আর দুধ দোয়া, ঘুঁটে দেয়ার কাজ যদি না করতে হত তা হলে হয়তো বর্শা ছুড়তে কি হাইজাম্প, লংজাম্প দিতে!"

"সে আবার কী?"

"দেখবে?" বলেই নারান লুঙ্গিটা গুটিয়ে তুলে মালকোচার মতো কোমরের পিছনে গুঁজে, উঠোনের বাইরে রাস্তার কাছাকাছি চলে গেল। তারপর ছুটে এসে একটা লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে প্রায় পনেরো ফুট দূরে উঠোনের উপর জোড় পায়ে নামল।

মাটির উঠোন হলেও জমি সানের মতো শক্ত। নারান কোনওরকমে 'উইহ' শব্দটা মুখে চেপে রেখে উঠে দাঁড়াল। পেরেক ফোটার জায়গাটা ঝন ঝন করে উঠেছে তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণায়। কিন্তু সে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "দেখলে তো? এটা হল লংজাম্প। হনুমান এই লাফ দিয়েই লঙ্কায় গেছল।"

"হাফ প্যান্ট পরে মেয়েমানুষ এইভাবে লাফায়?"

"নিশ্চয়। তুমিও রোজ প্র্যাকটিস করো, পারবে। কত আর বয়স তোমার, পঁচিশ? আর জ্যাটোপেকের বউয়ের বয়স এখন দু মাস কম তিরিশ, তোমার থেকে পাঁচ বছরের বড়! সন্ধের পর, অন্ধকারে তুমি যদি..."

"থামো তো।" মহামায়া ধমক দিয়ে উঠল। "লোকের সামনে হনুমান হওয়ার জন্য আমি এখন অন্ধকারে লাফ দেওয়া শিখব? ওই সময়টায় ঠোঙা বানালে আমার অনেক লাভ হবে।"

"ঠোঙা?" নারান কৌতূহলী চোখে তাকাল। "কে ঠোঙা বানাবে?"

"ঘোষেদের বাড়িতে মেয়েরা রাত্তিরে রান্নাবান্না সেরে ঠোঙা বানায়। গোবরডাঙা থেকে পুরনো কাগজ কিনে আনে। একসেরি ঠোঙা বিক্রি করে এক টাকায় পনেরো দিস্তে।"

"দিস্তে মানে কত?"

"বাইশটা।"

নারান মনে মনে অঙ্ক কষে বলল, "তার মানে এক টাকায় তিনশো তিরিশটা। তা এক টাকার ঠোঙা বানাতে একজনের কত সময় লাগবে জানো? তিনশো তিরিশটা বানাতেই তো সারাদিন লেগে যাবে!"

"তোমার মাথা! কাল রাত্তিরে গিয়ে কিছুক্ষণ তো দেখলাম। কাগজ কেটে, আঠা

বানিয়ে, তৈরি হয়ে বসে এক ঘণ্টাতেই একজন প্রায় আট-দশ দিস্তে তৈরি করে ফেলল। হাত চলছিল যেন যন্ত্রের মতো।"

"প্র্যাকটিস করে করে হয়েছে।" নারান অন্যমনস্কের মতো বলল। তার চিন্তা এখন গোড়ালিটা নিয়ে। কম্পাউন্ডার যা বলল তাতে তো এখন তার ভয় ধরে যাচ্ছে। পা ফেললেই খোঁচা লাগার মতো একটা ব্যথা হচ্ছে।

"তা তুমি এবার লাফানোর প্র্যাকটিস করো না! ভালই তো লাফালে। ওই জ্যাটো...কী যেন...পেক না ফেক, ওর মতো সোনার মেডেল পেলে তো কোঠাবাড়ি তোলা যাবে।"

কথাগুলো বলেই মহামায়া দুমদুমিয়ে পা ফেলে দুধ দুইতে চলে গেল। ও ফিরে এলে নারান অফিসে যাবে সাড়ে ছ'টার ট্রেন ধরে। মহামায়া যে কথাটা রাগ করে বলে গেল সেটা কিন্তু নারানের মনের কোণে আটকে রইল। "তুমি এবার প্র্যাকটিস করো না!"

দিন-রাত মিলিয়ে মাত্র চার ঘণ্টার জন্য বাড়িতে থাকা। রবিবার তার ছুটির দিন। এই দিনটাতেই সে রাত্রে ঘুমোবার সুযোগ পায়। নয়তো যাতায়াতে ট্রেনেই মোট ঘণ্টা দুই-আড়াই শুধু সে ঘুমোয়।

সাড়ে ছ'টার ট্রেনে, ধান্যকুড়িয়া থেকে উঠেই সে বাঙ্কে শুয়ে পড়ে। শোয়া মাত্রই ঘুম এসে যায়। কিন্তু আজ সে চিত হয়ে শুয়ে জ্যাটোপেকের কথাটা প্রথমে মনে করল। সোনার মেডেল আনার চিন্তা সে কোনওদিনই করবে না। ওসব পনেরো-ষোলো বছর বয়সের ব্যাপার। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মতো বোকা সে নয়।

বিভূতি মুখুজ্জের কথা—'মূলধনটা সামলে খরচ কোরো'—তাকে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে গোড়ালির ব্যথাটার মতো। কিন্তু বিভূতিবাবু ঠিকই তো বলেছেন, শরীরটাকে সে বেশিই খাটাচ্ছে। তবে সংসার চালানো যে কী শক্ত ব্যাপার, এক আনা রোজগার করতে কতটা রক্ত যে জল করতে হয় এটা কি বিভূতিবাবু বোঝেন? মহামায়া বোঝে, এমনকী আট বছরের নয়নও বুঝতে শিখছে। ওরা দু'জনও যথাসাধ্য খাটে। ওরা তার কষ্টটা অনুভব করে। নারান ভরসা পায় তার সংসারের মানুষদের কথা ভেবে।

ট্রেনের দুলুনিতে ধীরে ধীরে ঘুম নেমে আসে নারানের চোখে। বড় আরাম লাগছে তার। এই ঘণ্টা দেড়েকের ঘুমটুকুই তার বিলাসিতা। সকালে ট্রেনের ঘুমটা ঠিক এমন জুতসই হয় না। ঘুমের মধ্যেও চিন্তা থাকে, স্টেশন ফেলে যেন চলে না যায়। কিন্তু এখন সে চিন্তাটা নেই। শেয়ালদায় পৌঁছেও ঘুমিয়ে থাকলে কেউ না কেউ তাকে তুলে দেবে।

আজও একজন তাকে ঠেলে তুলে দিল। "আরে মশাই, আর কত ঘুমোবেন, শ্যালদা থেকে ট্রেন যে ছাড়ার সময় হয়ে গেল!"

ধড়মড়িয়ে উঠে নারান দেখল ট্রেন ভরে গেছে যাত্রীতে। ভিড় ঠেলে সে নামল। প্ল্যাটফর্মের ঘড়িতে দেখল, আটটা-কুড়ি। অনেক সময় আছে এখনও। ডিউটি তো ন'টায় শুরু।

নারান ধীরে ধীরে হাঁটতে পারে না। তাই কুড়ি মিনিটেই অফিসে পৌঁছে গেল। দোতলায় উঠে আসতেই বার্তা বিভাগের বেয়ারা অনিল বলল, "নারান তাড়াতাড়ি যা, ফুরিয়ে গেল বোধ হয়।"

"কী ফুরোবে?"

"রসগোল্লা! ভারত কুস্তিতে একটা ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছে, রবিবাবু কুড়ি টাকার রসগোল্লা আনিয়ে সারা অফিসকে খাওয়াচ্ছেন। দ্যাখ গিয়ে কিছু আর আছে কি না।"

খেলার বিভাগের টেবলের মাঝে দুটো হাঁড়ি বসানো। রবিবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে। আর বসে আছেন, অনাদিবাবু, মাণ্টাবাবু, শৈলেনবাবু। টোলুবাবুর নাইট ডিউটি, এখনও এসে পৌঁছননি। নারানকে দেখে মাণ্টাবাবু হাঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "দুটো তুলে নে।"

নারান ইতস্তত করে বলল, "ভারত নাকি কুস্তিতে মেডেল পেয়েছে?"

"পেয়েছে...কম্পোজেও চলে গেছে। প্রথম পাতায় বেরোবে।" মাণ্টাবাবু ঘাড় বেঁকিয়ে কপি অনুবাদ করতে করতে বললেন। "সিঙ্গল কলাম ছবিও সঙ্গে যাবে।"

নারান তাকাল রবিবাবুর দিকে। টাকে হাত বুলোচ্ছেন, মুখে সাফল্যের চাপা হাসি। যেন ব্রোঞ্জটা উনিই জিতেছেন।

"কী বলেছিলুম রে নারান? গরিব দেশের এটাই হল আসল খেলা! ফুটবল, ক্রিকেট তো কত ঝুড়ি ঝুড়ি সম্মান এনে গর্বে বুক ফুলিয়ে দিচ্ছে, আর দ্যাখ গরিবের খেলাই কিনা শেষ পর্যন্ত মেডে'ল এনে দিল।"

"সোনারটা যদি হত।"

"রাখ তোর সোনা। মেডেল ইজ মেডেল। যাদব এখন পৃথিবীতে তিন নম্বর লোক। পৃথিবীর জনসংখ্যা কত জানিস?"

"না। কত এখন?"

রবিবাবু অপ্রতিভ হয়ে মাণ্টাবাবুর দিকে তাকালেন, "মাণ্টা, এখন কত?"

মাণ্টাবাবু মাথা নাড়লেন। আঙুল দিয়ে অনাদিবাবুকে দেখালেন।

"অনাদি, পৃথিবীর জনসংখ্যা কত এখন?"

অনাদি মাস দুয়েক আগে চাকরিতে যোগ দিয়েছে। ইংরেজি থেকে বাংলা অভিধান খুলে গাল চুলকোচ্ছিল। প্রশ্ন শুনে বলল, "পৃথিবীর জনসংখ্যা?...এখন?...তা ধরুন গিয়ে, আড়াইশো কোটির একটু বেশিই হবে।"

"বোঝ তা হলে? যাদবের পজিশানটা কী!"

"রবিদা, আড়াইশো কোটির মধ্যে মেয়েরা আছে, বাচ্চারা আছে, ওরা কুস্তি করে না, ওদের বাদ দেওয়া উচিত।" মাণ্টাবাবু কপিতে হেডিংয়ের পাশে কত কলমে আর কত পয়েন্টের টাইপে হবে সেটা লিখে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে টেবলে রাখলেন। তা ছাড়া যাদব ব্যান্টমওয়েট, মানে একশো সাড়ে পঁচিশ পাউন্ডের ক্যাটাগরিতে লড়েছে। আপনি শুধু ব্যান্টামদের সংখ্যাটাই ধরে বলুন ওদের মধ্যে তৃতীয়।"

রবিবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে টেবলে কিল মেরে বলে উঠলেন, "এই তোমাদের এক দোষ। কলোনিয়াল শ্লেভারির হ্যাংওভারটা এখনও কাটল না। সবসময়

নিজেদের ছোট করে দ্যাখো! আড়াইশো কোটিতে তোমার আপত্তি কেন?"

"না না, আপত্তি করব কেন?" মাণ্টাবাবু কুণ্ঠিত স্বরে কাঁচুমাচু মুখে বললেন। "কোটি কোটি লোক কুস্তি করে, তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্যান্টাম..."

"থামো, বাজে কথা বলো না। কোটি কোটি লোক কুস্তি করলে পৃথিবীর স্বাস্থ্য অন্য রকম হত। গ্যাসট্রিক, ব্লাডপ্রেসার, হার্টের ব্যামো-ট্যামো বলে কিছু থাকতে না।...নারান দুটো তুলে নে।"

"এখন নয়, রাতে রুটির সঙ্গে খাব।"

হাঁড়িতে এখনও কয়েকটা রসগোল্লা ডুবে আছে রসের নীচে। বেশ বড় সাইজই, বোধ হয় দু'আনাওলা। টোলুবাবুর জন্য রেখে দিতে হবে। দুটো হাঁড়িতেও রয়েছে প্রচুর রস।

"এত রস কী হবে, আমি বাড়ি নিয়ে যাব?" নারান কিন্তু কিন্তু করে বলল রবিবাবুকে।

"নিয়ে যা। চিনির রস, খাবি আর ডায়াবিটিসের খপ্পরে পড়বি। তবে তোর হবে না। যারা খাটাখাটনি করে না, গাড়ি চড়ে বেড়ায় এ রোগ তাদের হয়। বুঝলি নারান, পরিশ্রম করবি। এই দ্যাখ, যাদবের বিভাগে সোনা জিতেছে যে জাপানিটা, শোহাচি ইশি তার নাম। এ জুডো লড়ত, ...জুডোকা বলে এদের। যুদ্ধে জাপান হেরে গেল। আমেরিকানরা দখল করল দেশটা আর বন্ধ করে দিল জুডো। ইশি তখন জুডো ছেড়ে শুরু করল কুস্তি। ভাবতে পারিস, একটা খেলা থেকে আর একটা খেলায় যাওয়া কি সোজা ব্যাপার? কী পরিশ্রম, কী মনের জোর থাকলে তবেই এভাবে বদল করে যাওয়া সম্ভব। আর শুধুই কি যাওয়া!...রাশিয়া, ইরান, টার্কি, হাঙ্গারি, জার্মানি, এইরকম কুড়িটা দেশের কুড়িজন ওয়ালর্ড ক্লাস কম্পিটিটরের মধ্যে একেবারে সোনা জিতে নেবার মতো যাওয়া! যুদ্ধের পর জাপানের এটাই প্রথম ওলিম্পিক সোনা...কী নিষ্ঠা, কী চেষ্টা...কপিতে অবশ্য আমি এসবও জুড়ে দিয়েছি।"

"তা হলে যাদবের থার্ড হওয়াটাও খুব বড় ব্যাপার!" নারান অন্তরের গভীর থেকে বলল। শিবপোতার জীবন থেকে ধান্যকুড়িয়ার জীবনে আসার মতোই তার মনে হল, ইশির জুডো থেকে কুস্তিতে আসাটা। এক জমি থেকে গাছ তুলে অন্য ধরনের জমিতে পুঁতে ফল ধরানোর জন্য গাছকেও তো কম চেষ্টা করতে হয় না! শরীরে কষ্ট, মনের কষ্ট ইশিকে যে কতটা সইতে হয়েছে মর্মে মর্মে সে তা অনুভব করতে পারছে।

"নারান কপি জমে গেছে, প্রেসে দিয়ে এসো।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মাণ্টাবাবু বললেন। "টোলুদা এখনও এলেন না, এ দিকে এত কপি জমি গেছে!...ও অনাদি, একটু হাত চালাও।"

নারান এসে প্রেসে কপি দিয়ে ফিরে আসার সময় সুপারভাইজার সরল ঘোষ বললেন, "ওপরে যাচ্ছ তো, রিডিংয়ে এই প্রুফটা দিয়ে দিয়ো। আর বলো তাড়াতাড়ি দেখে যেন প্রেসে পাঠিয়ে দেয়।"

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় নারান প্রুফটা একবার চোখের সামনে ধরেই থমকে গেল।

"মল্লবীর কে ডি যাদবের কৃতিত্ব

ব্যগ্র দৃষ্টিতে সে বিড় বিড় করে পড়ে গেল খবরটা: "ভারতীয় ব্যান্টমওয়েট মল্লবীর কে ডি যাদব ফ্রিস্টাইল কুস্তি যুদ্ধে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ব ওলিম্পিকের ব্রোঞ্জ পদক লাভ করিয়াছেন। কে ডি যাদব সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি বিশ্ব অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হইলেন। যাদব শেষ লড়াইতে পরাজিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সারা সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন রাউন্ডের লড়াইতে তিনি ত্রুটিহীন মল্লযুদ্ধের অবতারণা করায় পদক লাভ করিয়াছেন।—পি টি আই"

"এই নারান, রবিবাবু ডাকছেন তোকে।" সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অনিল বলে গেল।

রিডিং বিভাগে প্রুফটা দিয়ে সে রবিবাবুর কাছে হাজির হল।

"মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল চ্যারিটি ম্যাচটা দেখতে যাবি? আমার কাছে একটা টিকিট আছে। আমি তো সব খেলা দেখি না।"

"আমি বিকেলে সময় পাব না।" নারান লক্ষ করল টোলুবাবু আসছেন। "আপনি বরং টোলুবাবুকে দিতে পারেন।"

নারানের কথাটা টোলুবাবুর কানে গেল। তিনি হাত নেড়ে বললেন, "না না না, টিকিটে আমার দরকার নেই।"

মাণ্টাবাবু ফোড়ন কাটলেন, "রবিদার দেওয়া টিকিট নিয়ে প্রেসের কম্পোজিটার রতন এবারের প্রথম ম্যাচটা দেখেছিল। মোহনবাগান সেজন্যই এক গোলে হেরেছিল। তাই রবিদা ইস্টবেঙ্গলের পয়া লোক। টোলু ও টিকিট নেবে না।"

"দ্যাখো মণ্টা, তুমি বড্ড বাজে কথা বলো। রবিদা মোহনবাগানের অপয়া, এমন কথা কোনওদিন আমি বলিনি। গত তিন বছর ইস্টবেঙ্গল শিল্ড ঘরে তুলল, দু'বার মোহনবাগানকে হারিয়ে। সে তো, ভাল খেলেছে বলেই! তিনবারই রবিদার কাছ থেকে টিকিট নিয়ে ভাগনেকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেজন্যই যে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে...এমন কুসংস্কার আমার নেই। এবার লিগে পাঁচটা ম্যাচে মোহনবাগান এখন পর্যন্ত হেরেছে, তার মধ্যে লাস্ট ছ'টা ম্যাচে তিনটেতে। এই ছ'টা ম্যাচে একটা গোলও করতে পারেনি। ভাবতে পারো মণ্টা?...আরও হারবে, আমি বলছি দেখে নিয়ো ক্যালকাটা গ্যারিসনের কাছেও হারবে, শেষকালে রেলিগেশন ফাইট করতে হবে...তুমি এর পর আর আমাকে বিদ্রূপ কোরো না।"

গলা ধরে এল টোলুবাবুর। ঝপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। চোখ ছল ছল করছে। মাণ্টাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "কপি ধরো টোলুদা, অনেক খবর জমে রয়েছে। এই দ্যাখো, ইন্ডিয়ান ওয়াটারপোলো টিম ষোলো-এক গোলে ইতালির কাছে হেরেছে। ধরো, ধরো।"

"ধরছি। কিন্তু তুমি রবিদা সম্পর্কে আমার যে মিথ্যে ধারণা...রবিদা, রবিদা। দিন আপনার টিকিটটা। আমার যে কুসংস্কার নেই এটা অন্তত প্রমাণ হোক। ওই ভাগনেকেই টিকিটটা দেব।"

রবিবাবু মুখ নামিয়ে কপি লিখছিলেন। মুখ না তুলেই পকেট থেকে টিকিট বার করে এগিয়ে দিলেন। টোলুবাবু সেটা একবার দেখে নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে

বললেন, "টাকাটা কাল দিয়ে দেব।"

"তা দিয়ো। কিন্তু আজ বোধহয় হকি ফাইনালের রেজাল্ট আসবে। টেলিপ্রিন্টারের দিকে নজর রেখো।...আর হাঁড়ি থেকে দুটো রসগোল্লা তুলে নাও। যদি বেশি থাকে তা হলে তিনটেও খেতে পারো।"

টোলুবাবু নারানের দিকে তাকালেন। নারান বলল, "কুস্তিতে ভারত মেডেল জেতার জন্য রসগোল্লা খাওয়াচ্ছেন।"

"রবিদা, হকি ফাইনাল আজ নয় তরশু, ওইদিন জ্যাটোপেকেরও পাঁচ হাজার মিটার আছে।" অনাদি অভিধান সরিয়ে রেখে খবরটা দিয়ে বলল, "নারান রসগোল্লা একস্ট্রা থাকলে বোলো।"

ফাইনাল আজ হচ্ছে না শুনে টোলুবাবুর মুখে স্বস্তি ফুটে উঠল। রাত্রে প্যাঁচালো ইংরেজি নিয়ে কুস্তি করার ধকল, আজ আর অন্তত নিতে হবে না।

"নারান, একটা রসগোল্লাও আর অনাদিকে দেবে না।" মাণ্টাবাবু নির্দেশ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। থাকেন ব্যান্ডেল, ট্রেন ধরতে হবে। "কালীঘাট-রাজস্থান ম্যাচ লিখতে দশবার অভিধান কেন যে খুলতে হয়, এটা বুঝিয়ে না বললে ওকে আর রসগোল্লা নয়।"

বিব্রত এবং লজ্জিত মুখে অনাদি বলল, "গ্রাস কাটিং শট-এর বাংলাটা ঠিক মতো করতে পারছিলুম না বলে একটু খুলে দেখছিলুম।"

"তা ওটার মধ্যে ঘাস টাস কিছু পেলে?" রবিবাবু প্রশ্ন করলেন।

"না।"

"তা হলে বইটা মুড়ে রাখো। এটা ইংরেজদের খেলা। তার রিপোর্টে দু-চারটে ইংরিজি থাকলে লোকের বুঝতে অসুবিধে হবে না। গোলপোস্টের কি কোনও বাংলা তুমি করবে? তেমনি ঘাস ছাঁটাই শট লিখলে জিনিসটা হাস্যকর হবে।"

নারান, দাঁড়িয়ে শুনছিল। ভাবল, ঘাস নিড়নো শট বললেই তো হয়! কিন্তু সাহস করে সে বলতে পারল না। এখানকার বাবুরা লেখাপড়া জানা লোক, যদি চটে যান?

"নারান এবার অনাদিবাবুকে রসগোল্লা, যদি একস্ট্রা থাকে তো দাও।'" বলতে বলতে মাণ্টাবাবু রওনা দিলেন।

রাত্রে পাতা সাজিয়ে দিয়ে প্রেস থেকে উপরে উঠে এসে টোলুবাবু পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢোকালেন ওষুধের বড়ির জন্য। হাতে উঠে এল চ্যারিটি ম্যাচের টিকিটটা। সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি এক টানে মাঝখান থেকে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর কুচি কুচি করে টেবলের নীচে ছুড়ে ফেলে পিছন দিকে তাকাতেই দেখলেন নারান ব্যাপারটা অবাক চোখে দেখছে।

"ছিঁড়ে ফেলে দিলেন?"

'দিলুম। রবিদার দেওয়া টিকিট নিয়ে মাঠে যেই যাক, মোহনবাগান হারবেই।...এবার আর কেউ যেতে পারবে না। সে পথ মেরে দিলুম। তিনটে টাকা গচ্চা গেল তো বয়ে গেল! তুই যেন বলে দিসনি। জল দে, ওষুধ খাব।"

"আপনার রসগোল্লা আগে খেয়ে নিন।"

"না না, রবিদার দেওয়া কোনও জিনিস শনিবারের আগে নেওয়া যাবে না। আমার ভাগেরটা তুই খেয়ে নে।...ব্যাপারটা কী জানিস, পয়া-অপয়া বলে একটা কথা আছে। খুব খাঁটি কথা। আমি এটা মানি।...জল দে।"

নারান জলের গ্লাস এনে দিয়ে বলল, "ইন্ডিয়া দশ গোলে হেরেছে, আপনি সেটা কাল নিজের হাতেই লিখেছেন। অথচ আমায় বললেন, কী যে হবে, যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে খেলা! রেজাল্টটা জেনেও কিন্তু আপনি না-জানার ভান করলেন।"

"আহ্ নারান, তোকে কী করে যে বোঝাই। টেন টু ওয়ান,...ওয়ানটা হল আমেদের গোল, তার মানে ইস্টবেঙ্গলের গোল, তোর টিমের লোকের দেওয়া গোল!...আমার কী এমন মাথাব্যথা তোকে ওই খেলার রেজাল্ট জানাবার? দশ গোল একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার, ওলিম্পিক রেকর্ডও হতে পারে। কেন জানি মনে হল, মোহনবাগানও যদি গোল খাওয়ার রেকর্ড শনিবার করে ফেলে!...আর এক গ্লাস দে।"

নারান জল নিয়ে ফিরতেই টোলুবাবু উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন, "পায়ে কী হয়েছে? খোঁড়াচ্ছিস কেন?"

"কাল ছুটতে ছুটতে শেয়ালদা যাবার সময় একটা পেরেক ফুটেছিল। ব্যথা হয়ে এখন টাটাচ্ছে।"

"গরম জলে কম্প্রেস কর আর বোরিক পাউডার লাগা। অবহেলা করিসনি।"

টোলুবাবু শুয়ে পড়লেন। নারান ঘড়ি দেখল। আর দেড় ঘণ্টা পর অফিস থেকে ভ্যান রওনা হবে কাগজ নিয়ে। আটটা রসগোল্লা রয়ে গেছে। হাঁড়ি থেকে তুলে খেতে গিয়ে নয়ন আর মহামায়ার মুখ তার চোখে ভেসে উঠেছিল। নয়ন কোনওদিনই রসগোল্লা খায়নি। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সবাই মিলে খাবে ঠিক করে সে আবার রেখে দেয়।

চোখে মুখে জল দিয়ে হাঁড়ি হাতে যখন সে নেমে এল তখন ভ্যানে কাগজ তোলা হচ্ছে। গোবিন্দবাবু তাকে দেখে বললেন, "একটু দাঁড়াও, আগে কাগজ তোলা হোক।"

নারান অপেক্ষা করতে লাগল। তার জীবনের চব্বিশ ঘণ্টার একটা পরিচ্ছেদ এইভাবেই শেষ হল। এরমধ্যে সে উদ্বেগ, ভয়, খিদে, ক্লান্তি, যন্ত্রণা, রাগ সবকিছুই আস্বাদন করেছে। কিন্তু কোনওটিই তাকে হতাশ করেনি। দমিয়ে দেয়নি। হাঁসের গায়ে লাগা জলের মতো সবই ঝরে গেছে তার মন থেকে, দেহ থেকে। জোলো দুধের থেকে হাঁস যেমন জলটুকু বাদ দিয়ে দুধটুকুই খায়, সেও তেমনই দুঃখ বাদ দিয়ে সুখের কথাটুকুই মনে রাখে। যাদবের কথা, জ্যাটোপেকের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে এখন তার মনে পড়ছে। জাপানি ইশি তাকে বিস্মিত করেছে। টোলুবাবু, রবিবাবুকে তার আরও ভাল লাগছে।

ভ্যানে চড়ে শেয়ালদার দিকে যেতে যেতে খুব যত্নে কোলের উপর রাখা হাঁড়িটা সে মমতা ভরে আঁকড়ে ধরল।

॥ ২ ॥

"ভারত উপর্যুপরি পঞ্চমবার বিশ্ব হকি চ্যাম্পিয়ান
দীর্ঘ চব্বিশ বছর একাদিক্রমে গৌরব অক্ষুণ্ণ
হল্যান্ড ৬-১ গোলো শোচনীয়ভাবে পরাজিত"

নারান প্রথম পাতায় চার কলাম হেডিংয়ের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। হালকা গর্ব ছুঁয়ে যাচ্ছে মনকে। কাগজ উলটে খেলার পাতায় খুঁজল আর একটা খবর।

"চেকোশ্লাভাকিয়ার জ্যাটোপেক-দম্পতির রেকর্ড প্রতিষ্ঠা"

সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে নারান হাসল। ওরা তার থেকে মাত্র দু'বছরের ছোট কিন্তু একই দিনে তাদের তিনজনের জন্ম! একই দিনে দু'জনের দুটো সোনার মেডেল! কী অদ্ভুত ভাগ্য ওদের।

সাইকেলে উঠেই সে কাতর একটা শব্দ করল। পেরেক ফোটা গোড়ালি পেকে পুঁজ জমেছে। টোলুবাবু সেদিন বলেছিলেন বটে গরম জলের সেঁক দিয়ে বোরিক পাউডার দিতে। কিন্তু বোরিক আর কেনা হয়নি। মহামায়া গরম জল দিয়ে ধুয়ে, টিপে টিপে পুঁজ বার করে গাঁদাপাতার রস লাগিয়ে, শাড়ির পাড় বেঁধে দিয়েছে।

চাপ পড়লেই যন্ত্রণা হচ্ছে, তাই পায়ের পুরো পাতা প্যাডেলে রাখতে পারছে না। ওই ভাবেই সাইকেল চালিয়ে কাগজ বিলি করতে করতে সে ঝাউডাঙায় বাদল নস্করের বাড়ি পৌঁছল।

ছেলেটি অপেক্ষা করছে রাস্তায় কাগজের জন্য। সাইকেল থেকে নেমে শেষ কাগজটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে নারান বলল, "আজ খুব ভাল খবর আছে।"

"জানি, ভারত হকিতে সোনা পেয়েছে। কাল রেডিয়োতেই শুনেছি।"

নারান একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল। খবরটা প্রথম তার কাছ থেকে শুনে, ছেলেটির মুখে ফুটে-ওঠা খুশির আলো সে দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু সে দমল না। হকি ছাড়া অন্য খবরও তো আছে।

"জ্যাটোপেক আর তার বউ, দু'জনেই সোনা জিতেছে!"

ছেলেটি হকির খবরের মধ্যে ডুবে গেছে। নারানের কথা তার কানে ঢুকল না।

"ভারত হকির সোনার মেডেল জিতবে এটা তো জানা কথাই। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর জেতাটার মতো ঘটনা ক'টা ঘটেছে?"

ছেলেটি মুখ তুলে বলল, "কে জ্যাটোপেক?"

নারান এবার হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল। ছেলেটা বলে কী!

"এই তো চার দিন আগেই কাগজে নাম বেরোল, দশ হাজার মিটারে রেকর্ড করে আবার ওলিম্পিকের মতোই সোনা জিতেছে! তুমি লক্ষ করোনি?"

"রেকর্ড তো রোজ কতই হচ্ছে, কে মনে করে রাখে।"

ছেলেটি বাড়ির ভিতরে চলে গেল। নারান আবার সাইকেলে উঠল। আবার চোদ্দো মাইল চালিয়ে তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। গোড়ালির এই যন্ত্রণাটা...একজোড়া

চটি কিনতেই হবে। তিন-চার টাকার ধাক্কা। নারান ঠিক করল, সামনের মাসে মাইনে পেলেই কিনে নেবে।

শনিবার শেয়ালদা স্টেশনে নেমেই নারান কয়েকটি ছেলের কথা থেকে বুঝে গেল ইস্টবেঙ্গল জিতেছে।

"কয় গোলে?"

"এক...ফকরি...।"

নারান প্রশ্ন করেনি। অফিসে খেলার বিভাগে থমথমে ভাব। মাণ্টাবাবু একমনে ম্যাচ লিখে যাচ্ছেন। রবিবাবু ওলিম্পিক নিয়ে ব্যস্ত। অনাদি অভিধান আর কপির মধ্যে অবিরত যাতায়াত করছে। রাত ন'টায় এলেন টোলুবাবু। এসেই বললেন, "মাণ্টা, এটা লিখেছ কি সিজনে এটা সিক্সথ ডিফিট, লাস্ট সাতটা খেলায় একটাও গোল করতে পারেনি।"

"লিখব?"

"অবশ্যই। আর এটাও লিখো, সামনের বছর সেকেন্ড ডিভিশনে খেলতে হবে।"

রবিবাবু মুখ তুলে বললেন, "টোলু তোমার ব্লাড প্রেসার আছে, একটু ঠাণ্ডা হও।"

"আমি মোটেই গরম হইনি। থার্মোমিটার থাকলে দেখিয়ে দিতাম, টোলু কখনও উত্তেজিত হয় না...নারান জল।"

নারান দ্রুত জল এনে দিল। এক চুমুকে শেষ করে টোলুবাবু বললেন, "রবিদা যদি সন্দেশ খাওয়ান তাও খেয়ে নেব।"

"নারান, যা তো..." পকেটে হাত ঢোকালেন রবিবাবু।

"আমায় ভয় দেখাচ্ছেন?" টোলুবাবু বেপরোয়া ভাব দেখালেন। "আমি সাংবাদিক...নিরপেক্ষ। আমার কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। অ্যাই নারান, আমি সন্দেশ আনাব। আমি সবাইকে খাওয়াব...ইস্টবেঙ্গল জিতেছে, লিগ চ্যাম্পিয়ান হয়েই গেছে ধরে নাও।"

"টোলু, আমার পেটটা আজ সুবিধের নয়।" মাণ্টাবাবু বললেন। "আমি উপোস দিয়েছি।"

"আমি তো মিষ্টি খাই-ই না।" রবিবাবু বললেন।

অনাদি আমতা আমতা করে বলল, "টোলুদা, মাঠ থেকে ফেরার সময় আমার শ্যালক এগারোটা রাজভোগ খাইয়েছে, আমি আর...।" ঢোঁক গিলে কথা শেষ করল, "খেলে বমি করে ফেলব।"

"নারান তুই?...নিশ্চয় তোরও পেট খারাপ।"

"আজ্ঞে," মাথা চুলকে নারান বলল, "আমারই তো খাওয়াবার কথা...তাই, আমি আর কোন মুখে খাব বলুন?"

টোলুবাবু গুম হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর রবিবাবু বললেন, "টোলু, আজ আর তুমি কোনও কপি ধরো না। ভুলটুল হয়ে যেতে পারে।"

শোনামাত্র টেবলের উপর হামলে পড়ে, মাণ্টাবাবুর সামনে রাখা কপিগুলো টেনে আনতে আনতে টোলুবাবু বললেন, "অনেক হয়েছে, এবার বাড়ি যান...দয়া করে।"

"যাচ্ছি। কাল ম্যারাথন, আমার অফ ডে...জ্যাটোপেক নামবে। যদি জেতে তা হলে একটা হিস্টরিকাল অ্যাচিভমেন্ট হবে।...মোহনবাগানের টানা সাতটা ম্যাচে গোল না করতে পারার মতোই। একটু ভাল করে লিখো।" কথাগুলো মাণ্টাবাবু বলে আর উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করলেন না।

মাঝ রাতে টোলুবাবু যখন প্রেস থেকে উঠে এলেন তখন নারান জিজ্ঞেস করল, "রবিবাবুর দেওয়া টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলে কিছুই তো হল না।"

"কে বলল হল না? মাঠে একটা লোক তো কম হল! হাজার পনেরোর বেশি আজ লোক হয়নি।...এ কী তোর পায়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া বাঁধা কেন?"

'পুঁজ বেরোচ্ছে।"

"সেপটিক হয়ে গেছে তা হলে। কাল অবশ্যই ডাক্তার দেখাবি।"

নারানের মুখ শুকিয়ে গেল। ডাক্তার দেখানো মানে তো চারটে টাকা, তারপর ওষুধের দাম। অন্য কেউ হলে নারান বলত, নিশ্চয় কাল দেখাব। কিন্তু টোলুবাবুকে সে যত দূর বুঝেছে তাতে আসল কথা ওঁকে খুলে বলা যায়। তাই সে বলল, "ডাক্তার দেখাবার পয়সা কোথায় যে দেখাব? একজোড়া চটিও আমার কাছে বিলাসিতা।"

টোলুবাবু কয়েক সেকেন্ড নারানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধীরে-ধীরে তাঁর চোখ থেকে হতাশা, ক্ষোভ, বিরক্তি সরে গিয়ে ফুটে উঠল মমতা। নরম গলায় বললেন, "কাল তো তোর ছুটি, তা হলেও বিকেলবেলা চলে আয়। আমি ক্যাম্বেল হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকব। আমার এক বন্ধুর চেম্বার ওর সামনেই।...না না, পয়সা টয়সার কথা তোকে ভাবতে হবে না।"

পরদিন তিনটে পঞ্চাশের ট্রেনে নারান শেয়ালদায় নেমে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাসপাতালের সামনে এসে দেখল টোলুবাবু দাঁড়িয়ে। তাকে দেখেই ঘড়িবাঁধা হাত চোখের সামনে থেকে নামিয়ে একগাল হেসে বললেন, "এসেছিস! বাঁচালি।"

"কী বাঁচালাম?"

"মনে মনে ধরে নিয়েছিলাম, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি এসে যাস তা হলে সামনের বছর লিগটা পাব। তুই চার মিনিট আঠাশ সেকেন্ডের মাথায় এসেছিস। চল।"

ডাক্তারের ঘরের বাইরে নেমপ্লেটে ডিগ্রির বহর দেখে নারান একটু অস্বস্তিতে পড়ল। এত বড় ডাক্তারের কাছে সামান্য একটা পেরেক-ফোটা দেখাতে আসা, তার মনে হল যেন একশো কাগজের একটা বান্ডিল নিয়ে যাওয়ার জন্য গোটা বনগাঁ লোকাল ভাড়া নেওয়ার মতোই।

সাত-আটজন রোগী অপেক্ষা করছে। তাকে বসিয়ে রেখে টোলুদা ডাক্তারের ঘরে ঢুকে গেলেন। মিনিট-তিনেক পর বেরিয়ে এসে বললেন, "আয়।"

ডাক্তার টোলুবাবুর বয়সিই। গৌরবর্ণ, সৌম্যকান্তি, লম্বা চওড়া। কাগজে কিছু লিখছেন, পাশে কম্পাউন্ডার দাঁড়িয়ে।

"হাঁদু, এই হচ্ছে আমার কলিগ নারান হালদার। চট করে ওর গোড়ালিটা একটু দেখে দে।"

ডাক্তার দু-তিনটে প্রশ্ন করলেন, গোড়ালির ক্ষতটা ভ্রূ কুঁচকে কুড়ি-পঁচিশ সেকেন্ড দেখলেন। একটা স্লিপে ঘস ঘস করে লিখে সেটা নারানের হাতে দিয়ে বললেন, "ইঞ্জেকশনটা আনুন, এক্ষুনি দিতে হবে।" তারপর কম্পাউন্ডারকে বললেন, "ইঞ্জেকশনটা দিয়ে, ড্রেস করে দাও।"

"সিরিয়াস কিছু কি?" টোলুবাবু উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন। ডাক্তারবাবু উত্তর না দিয়ে তাঁর নাম ছাপা প্যাডে লিখতে শুরু করলেন।

"নাম? বয়স?"

নারান বলল।

"আর একদিন দেরি করলে, ব্যাপারটা সিরিয়াসই হয়ে পড়ত। খাবার জন্য আর লাগাবার জন্য ওষুধ দিচ্ছি।"

টোলুবাবু নারানের হাত থেকে স্লিপটা প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে বললেন, "আমি কিনে আনছি।"

কম্পাউন্ডার বলল, "আপনি পাশের ঘরে আসুন।"

মিনিট-কুড়ি পর ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। নারান গোড়ালি তুলে হাঁটছে। ইঞ্জেকশন কেনার টাকা আর কম্পাউন্ডারের ফি টোলুবাবুই দিয়েছেন, তাই সে কৃতজ্ঞতার ভারে বিব্রত।

"ওভাবে হাঁটছিস কেন, পায়ের পাতা ফেলে হাঁট।"

"একটু লাগছে...ব্যান্ডেজটাও নোংরা হবে না।"

"দাঁড়া এখানে।"

টোলুবাবু ওষুধের দোকানটায় ঢুকে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলেন হাতে ওষুধ, ব্যান্ডেজ আর তুলো নিয়ে।

"ধর এগুলো। ডাক্তারবাবু যেভাবে খেতে, লাগাতে বলে দিলেন, ঠিক ঠিক সেগুলো করবি।"

নারান শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

"দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ট্রেন ধরবি তো?"

ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল। বউবাজার স্ট্রিট যেখানে শেয়ালদায় পড়েছে সেখানে পৌঁছে টোলুবাবু বললেন, "বাঁ দিকে চল, দরকার আছে।"

কোলেবাজারের পরই একটা জুতোর দোকান। নারানকে ইশারায় দোকানে ঢুকতে বলে টোলুবাবু ভিতরে ঢুকে গেলেন।

"কেড্‌স দিন তো, আমার নয় ওর পায়ের।"

নতুন সাদা কেড্‌স পায়ে নারান যখন দোকান থেকে বেরিয়ে এল তখন তার আর গুছিয়ে কথা বলার মতো অবস্থা নয়। টোলুবাবুর দুটো হাত ধরে সে কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলে ফেলল, "আমি মন থেকে বলছি মোহনবাগান সামনের বছর লিগ পাবে, আপনি দেখবেন আমার কথা মিথ্যে হবে না।"

"আরে পাগল ছাড় ওসব কথা, এখন পায়ের কথা ভাব। এই দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে তুই দাঁড়িয়ে তোর সংসার, বউ-মেয়ে দাঁড়িয়ে। এখন কি লিগ-শিল্ডের

মতো সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো যায়?...তুই এত পরিশ্রমী, তোকে দেখেও যে আনন্দ হয়!...এখন আমি লিগ জেতার মতোই সুখ পাচ্ছি রে। এবার যা, টুক টুক করে হেঁটে স্টেশনে চলে যা।"

বিভ্রান্ত নারানকে দাঁড় করিয়ে রেখে টোলুবাবু চলে গেলেন। ট্রেনে কয়েকবাব সে ভাবল, পরিশ্রম কী এমন জিনিস যে দেখে আনন্দ হয়? তার মাথায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না। তবে মহামায়াকে সে সবসময় সংসারের কাজ করতে দেখে, দেখে কেমন যেন এক ধরনের তৃপ্তি সে পায়। টোলুবাবু কি এটার কথাই বললেন? নিজেকে অপচয় না করে ব্যবহার করা এটা তো একটা গুণই! সবারই ইচ্ছে হয় নিজের গুণপনা দেখাতে। নারানের মনে হল, সে যা করে সেটা লোককে দেখাবার মতো কিছু নয়। এমন কিছু একটা করা দরকার যা দেখে সবাই বলবে—হ্যাঁ নারান হালদার একটা লোক বটে!

কিন্তু তার মতো গরিব মানুষ কী আর করে দেখাতে পারে? নারান নিজেকে প্রশ্নটা করে কোনও উত্তর পেল না।

পরদিন সকালে সে ধান্যকুড়িয়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া কাগজের বান্ডিলটা নিল। কৌতূহল ভরে খেলার পাতাটা খুলে তিন কলাম হেডিংয়ের দিকে তাকিয়েই তার হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

এমিল জ্যাটোপেকের ওলিম্পিক ইতিহাস নতুন অধ্যায় রচনা ৫০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার ও ম্যারাথন দৌড়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ

তার হাতের কাগজটা থরথর কেঁপে উঠল। গোগ্রাসে খবরের বাকিটা তার চোখ গিলতে শুরু করল। একবার, দুবার, তিনবার সে পড়ল। তারপর সে কাগজের বান্ডিল নিয়ে হরিহর ভট্টাচার্যের দোকানের দিকে ব্যস্ত পায়ে এগোল। পায়ের ব্যথাটা এখন সে একদম টেরই পাচ্ছে না।

ম্যারাথন যে ছাব্বিশ মাইল তিনশো পঁচাশি গজ এটা সে জানে। মাণ্টাবাবুই তাকে বলেছিলেন। সে রোজ সাইকেল চালায় আটাশ মাইল। থেমে থেমে, কিন্তু নাইট ডিউটি দিয়ে রাত জাগার পর, খালি পেটে। তা হলেও, নারানের মনে হল, কষ্টটা যে কী ধরনের সেটা সে বোঝে, তবে দুজনের পরিশ্রমের মধ্যে তুলনা করাটা ঠিক হবে না।

বত্রিশটা দেশের ছেষট্টি জন দৌড়েছে। সোজা কথা! এতগুলো লোকের সঙ্গে লড়ে প্রথম হওয়ার জন্য জ্যাটোপেকের একটা লক্ষ্য ছিল। তার কী লক্ষ্য? সাইকেলে প্যাডেল করতে করতে নারান দু-তিনবার ভাবল—বড় কোনও লক্ষ্য নিয়ে কি সে সাইকেলটা চালাচ্ছে? কাগজ বিলি করাটাকে বড় ধরনের একটা লক্ষ্য হিসাবে কি ধরা যায়?

সাত দিনের মধ্যে তিনটে দূরপাল্লার কম্পিটিশন জেতা, তিনটেতেই ওলিম্পিক রেকর্ড করে! নারানের মনে হল, লোকটা অসুর। একাজ করাটা কোনও দেবতার কর্ম নয়। ভবিষ্যতে আর কেউ সাত দিনের মধ্যে এই তিনটে সোনা জিততে যে পারবে না, নারান এটা সম্পর্কে নিশ্চিত। মানুষের শরীরের ক্ষমতার সীমা যে কত দূর পর্যন্ত

ঠেলে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, তার তো কোনও ঠিক-ঠিকানাই আর রইল না! তবুও তার মনে হচ্ছে, জ্যাটোপেক যে সীমায় নিজেকে টেনে নিয়ে গেছে, সেটাই বোধ হয় শেষ সীমা। লোকটা ম্যারাথন দৌড়ল কিনা এই প্রথমবার! কেউ বিশ্বাস করবে? নারান অবাক হয়ে থেকেই রঘুরামপুর, তুবুড়িয়া হয়ে ঝাউডাঙায় পৌঁছল।

ছেলেটা প্রতিদিনের মতোই রাস্তায় অপেক্ষা করছে।

"কে জ্যাটোপেক বলেছিলে না?...রোজই তো কত রেকর্ড হচ্ছে?...দ্যাখো, পড়ো!"

ছেলেটির হাতে কাগজটা দিয়ে নারান দাঁড়িয়ে রইল। লক্ষ করতে লাগল ওর মুখভাব। মনে কোনওরকম দাগ কাটছে কি না সে বুঝতে পারছে না।

"এসব রেকর্ড ভেঙে যাবে।" ছেলেটি সাদামাটা স্বরে বলল।

"ভাঙবেই তো। ভাঙার জন্যই তো রেকর্ড! কিন্তু সাত দিনের মধ্যে এই রকম তিনটে কম্পিটিশন জেতা?...এ রেকর্ড কি ভাঙতে পারবে কেউ?"

ছেলেটির উত্তর শোনার জন্য সে আর অপেক্ষা করল না। বাড়িতে ফিরে প্রতিদিনের কাজ, ঘাস কাটা, গোরুদের খেতে দেওয়া ইত্যাদি সেরে সে ভাত খেতে বসল। ল্যাঠা মাছের ঝোল পাতে পড়তেই সে অবাক হয়ে মহামায়ার দিকে তাকাল।

"নয়ন সাঁতরাদের পুকুর থেকে ধরেছে।" মহামায়ার স্বরে চাপা গর্ব।

"নয়ন! ওইটুকু মেয়ে ধরতে পারল?"

"ওইটুকু কী? এই শ্রাবণেই তো সাত পেরোল। টিউকল থেকে কত কলসি জল আনে জানো? উঠোনের ওদিকে জঙ্গলটা তো ওই পরিষ্কার করেছে।"

শুনে ভাল লাগল নারানের। মেয়েটা কাজের হয়েছে। নামতাটা চটপট মুখস্থ করতে পারে। হাতের লেখাটা খুব পরিষ্কার নয়, তবে হয়ে যাবে।

"গরমেন নাকি রেশন দোকান থেকে পনেরো টাকা মণে চাল দেবে?" মহামায়া জিজ্ঞেস করল।

"অফিসে তাই তো শুনলাম, কিন্তু এই গ্রামে রেশন দোকান কোথায় যে চাল দেবে?"

"দোকান হলে বাঁচা যায়, চালের যা দাম বাড়ছে দিন দিন।"

"বাড়বে, আরও বাড়বে। লোক বাড়ছে আর চালের দাম বাড়াবে না?" শেয়ালদা স্টেশনের অবস্থাটা যদি দেখতে। রোজ রিফিউজি আসছে। প্ল্যাটফর্মে, স্টেশনের ভিতরে, বাইরে আর হাঁটা যায় না। কী দুর্গন্ধ! দু'হাজার, আড়াই হাজার লোক। আমরা তো সেই তুলনায় স্বর্গে বাস করছি।"

খাওয়ার পর সে চাটাইয়ে শরীর এলিয়ে দিল। তারপরই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ায় মুখটা পাশে ফিরিয়ে বলল, "তোমায় সেদিন লোকটার কথা যে বললাম না, সেই জ্যাটোপেক গো!"

মহামায়া খেতে বসছে। ভাতের গ্রাস মুখে ঢুকিয়ে বলল, " হুঁ, ওর বউ বর্শা ছোড়ে।"

"জ্যাটোপেক ম্যারাথনেও জিতেছে।" নারান কনুইয়ে ভর রেখে শরীরটা তুলল।

"অ।...গরম জলে পা ধোবে কখন, বেরোবার আগে?...জিতেছে তো কী হয়েছে...রাতে খাবার ওষুধটা রুটির সঙ্গেই রেখে দোব না পকেটে আলাদা নেবে?"

জবাব না দিয়ে নারান শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগল অ্যালার্ম কখন বাজবে।

॥ ৩ ॥

নারানের দিন কাটতে লাগল একই ভাবে। অফিসে নাইট ডিউটি দিয়েই চলেছে। সকালেও কাগজ বিলি করে বাড়ি ফেরে আঠাশ মাইল সাইকেল চালিয়ে। এই কাজে তার ছুটি নেই। হরিহর ভট্টাচার্য তার মাইনে তিরিশ টাকা থেকে পরের বছরই ষাট টাকা করে দিয়েছে। দুটো গোরু মরে গেছে। সে আর নতুন গোরু কেনেনি। দুধের ব্যবসা আর করবে না, এতে লোকসানই হচ্ছে। নতুন একটা ঘর তোলার জন্য মাটি কোপানো হচ্ছে। আর তাদের একটি ছেলে হয়েছে। এখন তার বয়স তিন। নাম রেখেছে অবনী। মহামায়া আবার সন্তানসম্ভবা।

টোলুবাবুকে নারান বলেছিল, 'সামনের বছর মোহনবাগান লিগ পাবে।' কিন্তু পায়নি। তিপান্ন সালে লিগ পরিত্যক্ত হয়। তারপরের বছর লিগ-গোল্ড জিতে মোহনবাগান প্রথম 'ডাবল' লাভ করে। নারান গভীর শান্তি পেয়েছিল।

হেলসিঙ্কি অলিম্পিকসের পর ইতিমধ্যে প্রায় চার বছর কেটে গেছে। ১৯৫৬, জানুয়ারির মাঝমাঝি, খেলার বিভাগে রবিবাবু, মাণ্টাবাবুর মধ্যে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ তার কানে এল জ্যাটাপেক নামটা। টেলিপ্রিন্টার রোল থেকে ছিঁড়ে রাখা খেলার খবরগুলো চিফ সাব-এডিটরের টেবলে আলাদা একটা স্পাইকে গাঁথা থাকে। স্পাইক থেকে কপিগুলো তুলে নিয়ে সে খেলার টেবলে এনে রাখল।

"অ্যালেনবরা কোর্সে দৌড়বে কি না বলতে পারব না, তবে মোহনবাগান স্পোর্টসে যে নামবে, এটা পাক্কা।"

"মাণ্টা খোঁজ নাও তা হলে! আর কোথাও দৌড়বে কি না, সেটা তো পাবলিককে জানানো উচিত! খবরের জন্য একটু হাঁটাহাটি করো।"

নারান আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "রবিবাবু, কে দৌড়বে?"

"জ্যাটোপেক।...এমিল জ্যাটোপেক। সেই যে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে।..."

"তা জানি, কিন্তু কলকাতায়?" নারান অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"হ্যাঁ কলকাতায়," মাণ্টাবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। "কেন কলকাতা কি দৌড়বার মতো একটা জায়গা নয়?"

"তা নয়, তবে কিনা অতবড় একটা মানুষ,...কার সঙ্গে দৌড়বে?"

"হাতি, ঘোড়া, উটের সঙ্গে...আবার কার সঙ্গে!" বিরক্ত মাণ্টাবাবু কপি টেনে নিলেন। হাঁটাহাটি করতে বলায় উনি চটেছে।

"হেলথ মিনিস্টার রাজকুমারী অমৃত কাউর খেলাধুলোর উন্নতির জন্য যে স্কিম

করেছেন, তাতে পৃথিবীর নামী নামী অ্যাথলিটদের আনা হবে। ভারতের নানান জায়গায় গিয়ে তারা, দৌড় দেখাবে, বক্তৃতা দেবে, ট্রেনিং দেবে। জাটোপেক এসেছে সেইজন্যই। ওর বউও এসেছে।" রবিবাবু অল্পকথায় নারানকে বুঝিয়ে দিলেন।

"আমি ওকে দেখব।" তার মুখ থেকে প্রথমেই এই কথাটা বেরিয়ে এল। তারপর বলল, "কবে, কোথায় দৌড়বে আমাকে একদিন আগে বলে দেবেন? আমাকে বাড়ি থেকে আসতে হবে তো, সেইমতো ট্রেনে উঠব। আমাদের সিঙ্গেল লাইন, ট্রেন বড় লেট করে। কখন দৌড়বে জানা থাকলে সুবিধে হয়।"

"বলে দেব। তা ছাড়া কাগজেও তো খবর থাকবে।"

শনিবার ২১ জানুয়ারি সারা পশ্চিম বাংলায় হরতাল ডাকা হয়েছে। ভাষার ভিত্তিতে সীমানা পুনর্গঠনের দাবি উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি মানছে না। তাই ভোর ছ'টা থেকে বিকলে চারটে পর্যন্ত হরতাল। নারানের ভয় হল। ওইদিনই তো জব্বলপুর থেকে ট্রেনে জ্যাটোপেকদের কলকাতায় আসার কথা!

"অনাদিবাবু, ট্রেন তো বন্ধ থাকবে, তা হলে ওরা তো পথেই আটকে থাকবে!"

"শনিবার সেইজন্যই ওরা কলকাতায় আসছে না, রবিবার আসবে। এই তো মাণ্টাদা খবর লিখে রেখে গেছেন। কপিটা প্রেসে দিয়ে এসো।"

প্রেসে দিতে যাবার সময় নারান সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে লেখাটা পড়ে নিল। মোহনবাগান স্পোর্টসের খবরের মাঝখানে রয়েছে: আগামী ২৩ জানুয়ারি দ্বিতীয় ও শেষ দিবসে বিশ্ববিখ্যাত দূরপাল্লার দৌড়বীর এমিল জ্যাটোপেক ও মহিলা স্পোর্টসে ডানা জ্যাটোপেক অংশ গ্রহণ করিবেন।

২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন। নারান ক্যালেন্ডারে দেখল দিনটা সোমবার। শনিবার হরতালের দিন কাগজ ছেপে বেরোবে বটে, কিন্তু ট্রেন বন্ধ থাকায় সে কাগজ নিয়ে যেতে পারবে না। কাগজের ভ্যান দমদম পর্যন্ত যাবে। কিন্তু তাতে তার কোনও সুবিধে নেই। ওখান থেকে ধান্যকুড়িয়া ৩০ মাইল। শুক্রবার রাতে ডিউটি করে অফিসেই থেকে গিয়ে একদম শনিবার রাতের ডিউটি সেরে সে বাড়ি ফিরবে।

"সোমবার বিকেল চারটেয়, তাই তো?" এই নিয়ে নারান শনিবার অন্তত চারবার জিজ্ঞেস করল, অনাদি আর টোলুবাবুকে।

"হ্যাঁ, বাবা হ্যাঁ, চারটেয় মোহনবাগান মাঠে। মাঠটা চিনিস তো?" টোলুবাবু পিটপিট করে তাকালেন।

"তা চিনি, একবার ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে গেছলাম। দু'জনের একই মাঠ তো?"

"হুঁ।" টোলুবাবু বিরক্ত ভঙ্গিতে বললেন, "জ্যাটোপেক মোহনবাগান মাঠে দৌড়বে।"

সোমবার সকালে কাগজ বিলি করে নারান, অন্যদিনের থেকে আজ বেশি ব্যস্ত হয়ে বাড়ির পথ ধরেছে। ধান্যকুড়িয়া থেকে যখন মাইল চারেক দূরে তখন একটা গোরুর গাড়িকে পাশ কাটিয়ে এগোতে গিয়ে সাইকেলের চাকা গর্তে পড়ে গেল। সাইকেলটা টালমাটাল হয়ে গোরুর গাড়িতে ধাক্কা মারল, আর নারান ছিটকে রাস্তার

ধারে পড়ল। চটপট সে উঠে দাঁড়াল আর শিউরে উঠে দেখল, সাইকেলের পিছনের চাকার উপর গোরুর গাড়ির চাকা উঠে গেছে।

নারান চোখ বুজল। একটা চল্লিশের ট্রেন ধরে শেয়ালদায়, তারপর মোহনবাগান মাঠে যাওয়া। এটাই সে ঠিক করে রেখেছে। সব ভেস্তে গেল! এই দুর্ঘটনার জন্য গোরুর গাড়ির কোনও দোষ নেই। গর্তটা গাড়োয়ান তৈরি করে রাখেনি যে ঝগড়া করবে।

"সাইকেলের চাকার যা অবস্থা, তাতে তো আর চালাতে পারবেন না! যাবেন কোথায়?" মাঝবয়সী গাড়োয়ান সহানুভূতি ভরে জানতে চাইল।

"ধান্যকুড়িয়া...তুমি যাবে কোথায়?"

"জবরগঞ্জ। ধান্যকুড়িয়া পথেই পড়বে, উঠে পড়েন।"

সাইকেলের চাকা আর মাডগার্ড দুমড়ে গেছে। কয়েকটা স্পোক ভেঙেছে। সেটাকে গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে নারানও উঠে বসল। গাড়িতে আটটা চালের বস্তা।

"আমার কিন্তু কোনও দোষ নেই। আপনিই পড়লেন চাকার সামনে।"

"আরে আমি কি বলেছি তুমি দোষী? বরাতে ছিল তাই ঘটে গেল।...একটু জোরে চালাও, ট্রেন ধরতে হবে।"

রুগ্‌ণ দুটো বলদ, পাচনের বাড়ি খেয়ে আর গাড়োয়ানের গালি শুনে দৌড়বার চেষ্টা করল। আধমাইল দৌড় দিয়েই হাঁফিয়ে আবার মন্থর হয়ে গেল, গাড়োয়ান আবার নির্দয়ভাবে পাচনটা দিয়ে এমন পেটাতে শুরু করল যে দেখে নারানের মায়া হল।

"থাক আর মেরো না। তুমি হরিহর ভটচাযের বইয়ের দোকান চেনো?"

"না।"

"যাকে বলবে দেখিয়ে দেবে। সেখানে এই সাইকেলটা নামিয়ে দিয়ো। বোলো নারান হালদার এটা পাঠিয়ে দিয়েছে, আজই যেন সারিয়ে রাখা হয়। কী করে এমনটা হল সেটা তুমিই বলে দিয়ো...গাড়ি এভাবে চললে ট্রেনটা পাব না। আমি এই মাঠের মধ্য দিয়ে হিজলতলা হয়ে শটকাটে স্টেশনে যাব।"

চলন্ত গোরুর গাড়ি থেকে নারান লাফ দিয়ে রাস্তায়, তারপর রাস্তা থেকে মাঠে নামল।

"যা বললাম পারবে তো?" ছুটতে শুরু করে নারান চেঁচিয়ে বলল, "হরিহর ভটচাজের দোকান...সারিয়ে রাখতে বলো...আমার নাম নারান।"

এর পরই তার মনপ্রাণ নিবদ্ধ হল একটা চল্লিশের ট্রেনে। এখন ক'টা বাজে? ঠিক সময়ে স্টেশনে সে পৌঁছতে পারবে তো! একটা, না পৌনে একটা? এখান থেকে কতক্ষণ লাগবে স্টেশনে পৌঁছতে? সময় সম্পর্কে কোনও ধারণা করতে না পেরে নারান, নিরাপদ হবার জন্য সেরা পন্থাটিই বেছে নিল। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল।

মসৃণ ঘাসের ট্র্যাকে জ্যাটোপেকের পাঁচ হাজার মিটার দৌড় দেখার জন্য নারান

আলের উপর দিয়ে, চষা জমি মাড়িয়ে, ভাঙাচোরা রাস্তায় ঠোক্কর খেয়ে প্রায় হাজার মিটার পথ অতিক্রম করে যখন স্টেশনে পৌঁছল শেয়ালদা লোকালের গার্ড তখন হুইসল বাজিয়ে সবুজ পতাকা নাড়ছে।

ট্রেনে উঠে নারান বিজয়ীর মতো হাসল বেঞ্চে বসে থাকা একটি বাচ্চা ছেলের দিকে তাকিয়ে। ছেলেটিও হাসল কিছু না বুঝেই। পাশের লোকের হাতে ঘড়ি দেখে নারান জানতে চাইল, "ক'টা বাজে?"

"পৌনে দুটো।"

"ট্রেন পাঁচ মিনিট লেট!"

মনে মনে সে হিসেব করতে শুরু করল, তিনটে পনেরোয় যদি শেয়ালদা পৌঁছয় তা হলে ট্রামে উঠে ধর্মতলা যেতে দশ মিনিট। আচ্ছা ধরা যাক, বারো মিনিট। তা হলে তিনটে সাতাশ...ধরা যাক, সাড়ে তিনটে! ওখান থেকে হেঁটে মাঠে পৌঁছতে পনেরো মিনিট...ধরা যাক বিশ মিনিটই। তা হলেও হাতে থাকবে দশ মিনিট।

নিশ্চিন্ত হয়ে নারান পিছনের কাঠের দেয়ালে হেলান দিল। এতক্ষণ যে উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা তাকে টানটান করে রেখেছিল সেটা ঝপ করে আলগা হয়ে গেল। সে ক্লান্ত বোধ করতে লাগল। এইবার সে বুঝতে পারল তার খিদে পেয়েছে। পেটটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠছে, আর সেই সঙ্গে বমির ইচ্ছে গলার দিকে উঠে আসছে।

সে ঢোঁক গিলল। গলা শুকিয়ে কাঠ। ঠোঁট চাটল। একদম শুকনো। জলতেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু ট্রেনে জল কোথায়? লোকাল ট্রেনে এসব থাকে না। কারও কাছে কি একটু জল পাওয়া যাবে? সে এধার-ওধার তাকাল। দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রীরা জল নিয়ে ওঠে, লোকালে কে জল বয়ে নিয়ে যাবে!

এখন তার মনে হচ্ছে, বোধ হয় সে মরে যাবে। চোখের উপর ভেসে উঠল মোহনবাগান মাঠ। গ্যালারি উপচে পড়া ভিড়। "জ্যাটোপেক... জ্যাটোপেক...জ্যাটোপেক" চিৎকার গ্যালারি থেকে গড়িয়ে নামছে। আর জ্যাটোপেক দৌড়ে চলেছে, হাত তুলে মাঝে মাঝে দর্শকদের উদ্দেশে নাড়ছে।...মরে গেলে সে আর ওকে দেখতে পাবে না।

নারানের চোখে জল এসে গেল। আর তখনই কর্কশ শব্দ করে ট্রেনটা, দু'-তিনটে ঝাঁকুনি দিল।

"কী ব্যাপার?" সামনের লোকটিকে সে প্রশ্ন করল ভীত চোখে তাকিয়ে।

"কী জানি! এর আগেও একবার ওরকম করেছিল।"

লোকটার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেই ট্রেনও দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই কারণ জানার জন্য জানলা আর দরজা থেকে মুখ বাড়াল। হঠাৎ মাঝপথে থেমে যাওয়ায় কেউ কেউ ভয় পেল। ডাকাত পড়বে না তো?

"দিনের বেলায় ডাকাত কোথায়?" একজন বলল। "দেখুন এঞ্জিনের হয়তো কয়লা ফুরিয়ে গেছে!"

অনেকে ট্রেন থেকে নেমে কারণ জানতে গেল ড্রাইভারের কাছে। নারান পাশের

লোকের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, "সাত মিনিট গেল।"

হাতুড়ি মারার শব্দ হচ্ছে। বাইরে থেকে একটা গলা ভেসে এল, "ব্রেক আটকে গেছে। হাতুড়ি মেরে খোলার চেষ্টা করছে।"

এত দিন ধরে সে ট্রেনে যাতায়াত করছে, এক দিনও ব্রেক আটকাবার ঘটনা ঘটেনি। আর ঠিক আজকেই! নারান ঘড়ির দিকে তাকাল। এগারো মিনিট নষ্ট হল এখানে দাঁড়িয়ে, সে চোখ বন্ধ করল। খিদে আর তেষ্টা ধীরে ধীরে মরে আসছে। শরীরটা অসাড় লাগছে।

ট্রেনের সিটি দেবার শব্দে সে চোখ খুলল। যারা ট্রেন থেকে নেমেছিল, তাড়াহুড়ো করে তারা উঠছে। একটু পরেই ট্রেন চলতে শুরু করল। মন্থর গতিতে, এমন সাবধানে চলেছে যেন সামনেই কোথাও লাইনের ফিশপ্লেট খোলা রয়েছে! এভাবে চললে কতক্ষণে শেয়ালদায় পৌঁছবে? কতক্ষণে সে মাঠের গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে চিৎকার করবে—"জ্যাটোপেক...জ্যাটোপেক...।"

শেয়ালদা পর্যন্ত ট্রেনটা ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে এল। নারান প্ল্যাটফর্মের ঘড়িতে দেখল, পৌনে চারটে। আর পনেরো মিনিট পর শুরু হবে দৌড়। ভিড় ঠেলে, ধাক্কা দিয়ে লোক সরিয়ে সে ছুটল ট্রাম স্টপের দিকে।

নেতাজির জন্মদিন। রাস্তায় আজ লোক বেশি! জাতীয় পতাকা, নেতাজির ছবি আর ব্যান্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে, গন্তব্য বোধ হয় শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। দু' দিকেই সার সার সবুজ রঙের ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়েছে, সেই সঙ্গে বাসও। ট্রামে বসে নারান স্টেশনের মাথায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের কিল বসিয়ে হতাশ স্বরে নিজেকেই বলল, "ভাগ্য!...কেন যে ভূতে তাড়া করল!"

থেমে থেমে ট্রাম মৌলালি পৌঁছল, ধর্মতলা স্ট্রিট দিয়ে যদিও বা জোরে চলল, আবার আটকে গেল ওয়েলিংটন পার্কের মোড়ে। সভা হবে, তাই শোভাযাত্রা আসছে। হঠাৎ নারানের রোখ চেপে গেল! জ্যাটোপেকের দৌড় সে দেখবেই। এখান থেকে মোহনবাগান মাঠটা কতদূরই বা, সে ছুটেই যাবে।

ট্রাম থেকে নেমে সে ভিড়ের মধ্যে কখনও হনহনিয়ে হেঁটে, কখনও রাস্তায় নেমে দৌড়ে ছুটে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে থমকে দোকানের ঘড়িতে সময় দেখে নিচ্ছে।

...চারটে...চারটে তিন...চারটে সাত...চারটে দশ। এসপ্লানেড, কার্জন পার্ক, তারপর ভবানীপুর মাঠ। নারানের ফুসফুস আর বাতাস টানতে পারছে না। রেড রোড পার হয়ে মহামেডান তাঁবুর কাছে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে চোখে অন্ধকার দেখল। শরীর টলছে। সেই সময় সে শুনল প্রবল এক সমবেত হর্ষধ্বনি আর হাততালি।

নারান ধীরে ধীরে বসে পড়ল, নিশ্চয় দৌড় শেষ হয়ে গেল। দেখা হল না...দেখা হল না...। মাথা নাড়তে নাড়তে সে ঘাসে শুয়ে পড়ল।

"বিশ্ববিখ্যাত অ্যাথলিট, ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এমিল জ্যাটোপেক, আপনারা দেখলেন, তিনি প্রথম হলেন। তাঁর সময় হয়েছে পনেরো মিনিট আঠারো সেকেন্ড। দ্বিতীয় হয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সুনীল বসু। তাঁর সময় হয়েছে: সতেরো মিনিট

সতেরো দশমিক...” লাউডস্পিকারে ভেসে আসছে ঘোষকের গলা। নারানের চোখের পাতা বুজে এল।

তার চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে নামল।

॥ ৪ ॥

তারপর দশটা বছর কেটে গেছে।

নারানের এখন আর পাকাপোক্ত নাইটি ডিউটি নেই। নাইট ডিউটি করলে একটাকা পাওয়া যাবে, এই নৈশ ভাতা চালু হতেই দাবি ওঠে, নারান একাই কেন ডিউটি করবে? সবাই যাতে ভাতার টাকা পায় সেজন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য বেয়ারাদেরও এই সুযোগ দিতে হবে। এর ফলে নারানকে টানা আট বছর নাইট ডিউটি করার পর সকালের বা বিকেলের ডিউটি শুরু করতে হল, আর সেই জন্য কাগজ বিলি করার কাজটা তাকে ছাড়তে হয়।

ইতিমধ্যে সংসারে মানুষও বেড়েছে। এখন তার এক মেয়ে নয়ন আর চার ছেলে—অবনী, নবনী, রজনী এবং গৌতম। নয়নের বয়স একুশ, অবুর তেরো, নবুর নয়, রাজুর সাত আর গৌতমের এক বছর। ঘরও একটা বাড়িয়েছে। মাটির দেয়ালে টালির ছাদ। গোরু বিক্রি করে গোয়ালটা ভেঙে দিয়েছে। নয়ন ক্লাস সেভেন পর্যন্ত স্কুলে পড়ার পর, সংসারের আর ভাইদের দেখাশোনার জন্য স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কেননা মহামায়া তখন উলটোডাঙায় একটা কাঠের খেলনা তৈরির কারখানায় কাজ পেয়েছিল। হপ্তায় আঠারো টাকা মাইনে। মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য মহামায়া টাকা জমাতে শুরু করেছে। সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাত আটটায় ফিরত। অবুর টাইফয়েড হওয়ায় সে কাজটা ছেড়ে দিয়ে ঠোঙা তৈরিতে সময়টা দেয়।

এই দশ বছরে নারানের শারীরিক কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। একই রকম ছিপছিপে রয়েছে, চোদ্দো বছর আগে চাকরিতে ঢোকার সময় যেমনটি ছিল, শরীরে বাড়তি মেদ নেই, চুল একটিও পাকেনি, বয়স ছেচল্লিশ। রাতে স্বামী-স্ত্রী, নয়ন আর অবু, পুরো পরিবারই, ঠোঙা তৈরি করতে বসত। রাত দেড়টা পর্যন্ত তারা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কাজ করত। ঠোঙা বিক্রি করত একটাকায় বারো দিস্তা।

অফিসে তার কাজের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। তবে রবিবাবু রিটায়ার করেছেন। নতুন দুজন খেলার বিভাগে এসেছেন, শ্যামল কুণ্ডু আর শৈলেন রায়। ওরা অল্পবয়সি, তাকে নারানদা বলে ডাকে। মাণ্টাবাবু টোলুবাবু, অনাদিবাবু একই রকম আছেন, শুধু চুল পাতলা হয়েছে, মুখের চামড়া আলগা হয়েছে, আর প্রত্যেকেই সামান্য মোটা হয়েছেন।

গত দশ বছরে নারানের জীবনে শুধু একটিই ঘটনা ঘটেছে, যেটা তার জীবনে একটা বড় ব্যাপার। ছয় বছর আগে, অফিসের বাৎসরিক স্পোর্টস দেখতে যাওয়া।

ময়দানে তালতলা মাঠে হত অফিসের স্পোর্টস। নারান শুনেছে, নানান বিভাগের

নানান বয়সিরা এতে অংশ নেয়। বেয়ারাদের মধ্যে শুধু অনিল আর দিকপতি এতে নামে— তিনপায়ের দৌড়ে আর আধ মাইল ভ্রমণে। কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে, বউদের জন্যও ইভেন্ট আছে।

তখন সবে নৈশ ভাতা চালু হয়ে নারানের নাইট ডিউটি বন্ধ হয়েছে। সেদিন রবিবার, ডিউটি ছিল সকাল দশটা-পাঁচটা। নারান স্পোর্টস দেখতে অফিস থেকে মাঠে চলে যায় দুপুরে। মাণ্টাবাবু স্পোর্টস সংগঠনের দায়িত্বে। এন্ট্রি নেওয়া থেকে শুরু করে, ইভেন্টের সূচী তৈরি করা, সভাপতি নির্বাচন থেকে প্রাইজ কেনাকাটার দায়িত্বটাও তাঁর।

শামিয়ানার নীচে বড় একটা টেবলে প্রাইজগুলো সাজানো। দেখেই নারানের মনে পড়ে গেল তার স্কুলের স্পোর্টসের কথা। ছোট ছোট কাপ আর মেডেলে সাজানো টেবলটা যেন দোকানের মতো হয়ে উঠত। দেখলেই লোভ হত, বাড়িতে এসে আলমারিতে সাজাবার। প্রতি বছর দু-তিনটে কাপ বা মেডেল সে জিতত। ক্লাস টেনে পড়ার সময় গো-অ্যাজ-ইউ-লাইকে জেতা কাপটাই ছিল তার জীবনের সব থেকে বড় কাপ। প্রায় এক হাত লম্বা। প্রথম প্রথম সে কাপ-মেডেলগুলো নিয়মিত ঝেড়েমুছে ঝকঝকে করে রাখত। তারপর আর যত্ন করত না। এক সময় রং চটে গিয়ে হলুদ হয়ে গেল। দেশভাগের পর, চলে আসার সময় ওগুলো ফেলে রেখে আসে।

এখন তালতলা মাঠে দাঁড়িয়ে প্রাইজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনের মধ্যে ছাত্রজীবনের চাঞ্চল্য জাগল। প্রাইজ জেতার ইচ্ছেটা আবার নতুন করে তাকে পেয়ে বসল। তবে অফিসের স্পোর্টসে কাপ-মেডেলের থেকে নিত্য ব্যবহারের জিনিসই বেশি। তা হোক, কাপ-মেডেল সাজাবার মতো কাচের আলমারি তার ঘরে নেই, বরং সংসারের প্রয়োজনে লাগার জিনিসই দরকার।

রিটায়ার করে গেলেও রবিবাবু স্পোর্টসের দিন মাঠে আসেন। শামিয়ানার ছায়ায় একটা চেয়ারে বসে অফিসের অ্যাকাউন্টস বিভাগের দুজন প্রবীণ লোকের সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। নারান তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"কী রে নারান, আছিস কেমন? তুই তো একটুও বদলাসনি দেখছি।...পরিশ্রম করাটা তা হলে চালিয়ে যাচ্ছিস?"

"কাগজ তো আর বেচি না, তাই খাটুনিটা কমে গেছে।" নারান চিন্তিত স্বরে বলল, "তাই ভাবলাম একটু দৌড়োদৌড়ি করা দরকার। আপনি একটু মাণ্টাবাবুকে বলে দেবেন?"

"কেন, কী জন্য?"

"ভাবছিলাম স্পোর্টসে নামব।"

"ভাল কথা। নাম। কোন ইভেন্টে, নামছিস?"

"এখন আর কী করে নামি। পরশু দিনই তো এন্ট্রি নেওয়ার লাস্ট ডে ছিল।"

"আরে এটা ওলিম্পিক না এশিয়ান গেমস যে দেরিতে নাম দেওয়া যাবে না? ডাক মাণ্টাকে...এই যে অ্যাই, মাণ্টা, এদিকে আয়।"

হাতে কাগজপত্র নিয়ে মাণ্টাবাবু তখন মাঠের মাঝ থেকে ফিরছিলেন, রবিবাবুর ডাক শুনে এগিয়ে এলেন।

"আর কী কী ইভেন্ট বাকি রয়েছে?"

"অনেক বাকি আছে। ছোটদের স্পুন রেস, সেলাই রেস, জিলিপি রেস, মহিলাদের ব্যালান্স রেস, ফিফটি মিটার, মিউজিক্যাল..."

"থাক থাক, তুই তো ধ্যারারারা রেকারিং ডেসিমিল চালিয়ে দিলি দেখছি। বড়দের কী কী বাকি?"

"এইট হানড্রেড, ফোর হান্ড্রেড, টু হান্ড্রেড, স্যাক রেস, ওয়াকিং, থ্রিলেগেড রেস, টাগ অব ওয়ার।"

"নারানের নামটা নিয়ে নে। ও নামবে।"

"সে কী! এই লাস্ট মোমেন্টে। আচ্ছা নারান, তুই তো কালকেও আমাকে বলতে পারতিস!" মাণ্টাবাবু বিরক্ত হয়ে হাতের কাগজ উলটে-পালটে দেখলেন। "একশো মিটার তো এইমাত্র হয়ে গেল, আচ্ছা তা হলে স্যাক রেস আর ওয়াকিংয়ে দিয়ে দিচ্ছি।"

"না না না।" নারান প্রায় আঁতকে উঠল। "থলের মধ্যে ঢুকে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে আমি যেতে পারব না। ওসব বাচ্চাদেরই সাজে।"

"তা হলে ওয়াকিংয়ে নাম।"

"না মাণ্টাবাবু, হাঁটাহাঁটি বুড়োদের মানায়।"

"তুই কি ছোকরা নাকি যে, হাঁটবি না শুধু দৌড়বি?" মাণ্টাবাবু তির্যক স্বরে বলেন।

"আমাকে বরং দৌড়ের ইভেন্টগুলোতে দিন।"

"দৌড়ের।" হাতের কাগজ দেখে চিন্তিতভাবে মাণ্টাবাবু বললেন, "তা হলে দুশো মিটারে...পারবি তো?"

"আমাকে তিনটেতেই দিন...আটশো, চারশো আর দুশো মিটারে।"

"কী বললি! তিনটেতে? তুই কি জ্যাটোপেক হয়ে গেছিস ভাবছিস?"

নারান মাথা চুলকে বলল, "একবার চেষ্টা করে দেখিই না।"

"তোর বয়স কত সেটা একবার ভেবে দেখেছিস? পর পর তিনটে রেস!"

"তিনটে রেস জুড়লে কত হবে?" নারান মনে মনে যোগ দিয়ে বলল, "চোদ্দো শো মিটার। এক মাইলটাক হবে, না তারও বেশি?"

"এক মাইলের একটু কম। না না, অত তুই পারবি না। দৌড়বার অভ্যেস নেই, শেষকালে..."

"মাণ্টা ওকে নামতে দাও।" রবিবাবু এতক্ষণ ওদের কথা শুনে যাচ্ছিলেন, এইবার মুখ খুললেন। "নারান এক সময় রোজ পঁচিশ-তিরিশ মাইল সাইকেল চালাত। ওর কলজে আর মাস্‌ল তৈরি আছে। নামিয়ে দ্যাখোই না!"

"নামাচ্ছি, কিন্তু কিছু হয়ে গেলে আপনি দায়ি হবেন।" মাণ্টাবাবু ব্যাজারমুখে আবার মাঠের ভিতর চলে গেলেন।

"কী রে নারান, তোর জ্যাটোপেক হবার শখটা এবার মিটিয়ে নে। পারবি তো?"

"রবিবাবু, আমি সাত জীবনেও জ্যাটোপেক হতে পারব না। উনি যে কাণ্ড করেছেন, পৃথিবীর সব থেকে বড় জায়গা ওলিম্পিকে করেছেন! কত বড় বড় পাল্লার কম্পিটিশন ছিল সেগুলো! আর তালতলা মাঠে আমি? তুলনা হয়?" নারান হেসে ফেলল। "তবে একটা মিল ওঁর সঙ্গে আমার আছে, আমাদের জন্ম একই তারিখে।"

"তা হলেই হবে।" রবিবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন। "কাগজ বিলি আর নাইটি ডিউটি করে তুই যা পরিশ্রম করেছিস আমার তো মনে হয় না জ্যাটোপেক প্র্যাকটিসে অত পরিশ্রম করেছে। ঘাবড়াসনি, দুগ্গা বলে নেমে পড়।"

নারান নেমে পড়ল, হাঁটু পর্যন্ত ধুতিটা তুলে কোমরে গুঁজে নিয়ে। প্রথমে চারশো মিটার দৌড়। দুশো মিটারের ট্র্যাক। দু'পাক দৌড়তে হবে। তাকে নিয়ে ছ'জন প্রতিযোগী। স্টার্টিং লাইনে মেশিন বিভাগের একজন আর সার্কুলেশন বিভাগের একজনকে দেখে নারানের মনে হল ওরা তার অর্ধেক বয়সি। এই দুজনকেই নজরে রাখতে হবে। এরা একেবারেই তার অজানা। বাকি তিনজনের মধ্যে রয়েছে দরোয়ান রামভরণ, পিওন রাধেশ্যাম আর রিপোর্টার মণিবাবু। এরাও তার থেকে কমপক্ষে দশ বছরের ছোট। এরা যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, এটা সে আন্দাজ করে নিল তাদের পেটের পরিধি থেকে।

স্টার্টার টোলুবাবু। নারানকে দেখে তো তিনি অবাক। "এত বছর অফিসে স্পোর্টস হচ্ছে, অথচ স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে এই প্রথম তুই চারশো মিটারে নামলি।"

"আমি তো বেয়ারা ডিপার্টমেন্ট থেকে নেমেছি!"

"রাখ তোর বেয়ারা ডিপার্টমেন্ট। তুই আমাদের ডিপার্টমেন্টের লোক। যদি জিততে পারিস, তা হলে..." টোলুবাবু তিন সেকেন্ডের জন্য থমকালেন আর সেই ফাঁকে নারান বলল, "ডুরান্ড ফাইনালে উঠে মোহনবাগান হারাবে ইস্টবেঙ্গলকে, তাই তো?"

"তোর ওই এক কথা, আগে ওরা উঠুক তো! তুই জিতলেই মোহনবাগান যেন জিতবে! আর তাই ভেবে নিয়ে নিজের টিমকে জেতাতে এখনই যেন হেরে বসিসনি। মনে রাখিস, ডুরান্ডের থেকেও বড় আমাদের ডিপার্টমেন্টের ইজ্জত। দু' পাক শেষ করতে হবে কিন্তু সবার আগে।"

সবার আগেই সে শেষ করল। তার অর্ধেক বয়সিদের একজন, মেশিন বিভাগের ছেলেটি দ্বিতীয় হল তার পঁচিশ গজ পিছনে থেকে। সার্কুলেশনের ছেলেটি দেড়পাকের পর পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ে। মণিবাবু তৃতীয় হলেন রামভরণ আর রাধেশ্যামের সঙ্গে, পরদিন কাগজে বেরিয়েছিল, 'তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া'।

সার্কুলেশনের ছেলেটি শুরু করেছিল যেভাবে তাতে নারান একটু ভয়ই পায়। পঞ্চাশ মিটার রেসে দৌড়ের মতো গতিতে সবাইকে পিছনে ফেলে ছেলেটি অন্তত কুড়ি মিটার এগিয়ে যায়। মেশিনের ছেলেটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গতি বাড়িয়ে দেয় ওর সঙ্গে থাকার জন্য। নারান একই গতিতে বাকি তিনজনের পাঁচ মিটার সামনে থেকে দৌড়ে চলে। প্রথম পাক শেষ হতেই সে গতি বাড়িয়ে দেয়। দেড় পাকের আগেই দুজনকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে আসে। তখন তার মনে হল, এতক্ষণ সে হেঁটেছে

এইবার দৌড়টা শুরু করা যাক। এবং তাই সে করল।

পশমের সুতো বুক দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেই সে ধাক্কা খেল টোলুবাবুর বুকে। নারানকে দু' হাতে জড়িয়ে, দশ মাইল দৌড় শেষ করার মতো হাঁফাতে হাঁফাতে টোলুবাবু বললেন, "আমার দমবন্ধ হয়ে আসছিল নারান তোর ছোটা দেখে। চারশো মিটারে এই প্রথম আমরা জিতলাম। আমার মনে হচ্ছে..."

"ডুরান্ড আপনারাই পাচ্ছেন।"

"না না, ওসব ভাবছি না...মনে হচ্ছে, দুশোটাও তুই জিতবি।"

নারান জিতল।

তাকে নিয়ে প্রতিযোগী আটজন। সবাই তার থেকে কমবয়সি। কিন্তু সে চিন্তিত নয়। চারশো মিটার তাকে গরম করে দিয়েছে। এখন সে দৌড়বার মজাটা পেয়ে গেছে। দূরত্বটা ছোট, তাই শুরু থেকেই সে এগিয়ে রইল আর একই গতি বজায় রেখে শেষ করতে তার অসুবিধা হল না। তার মনে হল, জ্যাটোপেককে দেখবে বলে ট্রেন ধরার জন্য যে গতিতে সে দশ বছর আগে দৌড়েছিল তার থেকে অনেক কম জোরেই দৌড়েছে।

"বড্ড ছোট মাপের দৌড়। বুঝলেন টোলুবাবু, খুব একটা আরাম হল না। আটশোটা চার পাকের, ওটা দৌড়লে বোধ হয় সুখ পাব, কী বলেন?"

"জিতলে তো তুই জ্যাটোপেক হয়ে যাবি রে...মানে, অফিসের জ্যাটোপেক!"

"আপনিও ওই নামটা করলেন! আমাকে লজ্জায় ফেলার জন্য দেখছি আপনারা সবাই ষড় করেছেন। নাহ্, আটশো মিটার হেরে গিয়ে আমাকে এখন লজ্জা থেকে বাঁচতে হবে।" ক্ষুব্ধ স্বরে নারান বলল।

"প্লিজ, নারান, প্লিজ, তুই হারিসনি, তা হলে ডুরান্ডে সব্বোনাশ হয়ে যাবে।" টোলুবাবু আঁকড়ে ধরলেন নারানের দুই মুঠো।

"তা হলে ওঁর সঙ্গে কখনও আমার নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করবেন না বলুন?...হিমালয়ের সঙ্গে উইটিপির কোনও তুলনা সম্ভব?"

টোলুবাবু জানালেন তিনি জ্যাটোপেক নাম আর উচ্চারণ করবেন না। এখন বাচ্চাদের আর মেয়েদের কয়েকটা ইভেন্ট, তারপর আটশো মিটার। বিশ্রাম দেবার জন্যই এইভাবে ইভেন্ট সাজানো। নারানকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন রবিবাবু।

"এই আটশো মিটারটা জিতলে তুই..."

"দোহাই রবিবাবু, আর আমাকে জ্যাটোপেক বলবেন না।" নারান জোড় হাতে অনুরোধ জানাল।

রবিবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, "তিনটে ইভেন্ট জিতলেই জ্যাটোপেক হওয়া যায় নাকি? মাথা খারাপ না হলে কেউ তা বলতে পারে? আরে, আমি বলছিলাম কী, এটা জিতলে তুই প্রমাণ করবি, মানুষের যৌবন শুরু হয় চল্লিশ বছর বয়স থেকে...অবশ্য যদি সে অন্য ধাতুতে গড়া হয়!"

"ধাতুটাতু তো বুঝি না...লোহা, অ্যালমুনি ছাড়া আর কোনও ধাতুই আমার ঘরে নেই।...আমি কখনও দিতে হবে, দিতে হবে' বলে ভিক্ষে করিনি। যতটুকু করেছি

নিজের ক্ষমতায় করেছি। সেজন্য পরিশ্রম করেছি...টুকে কি মানে বই মুখস্থ করে পাশ করা হয়তো যায়, কিন্তু রবিবাবু শিক্ষিত হওয়া যায় না।" বলতে বলতে নারান উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। গলার স্বর থর থর কেঁপে উঠল যখন সে বলল, "দশ বছর আগে জ্যাটোপেককে দেখার জন্য আমি দৌড়েছিলাম ট্রেন ধরতে, দৌড়েছিলাম ট্রেন থেকে নেমেও...দেখা হয়নি। তাইতে কিন্তু আমি ভেঙে পড়িনি!...জ্যাটোপেক আমাকে দৌড় শেখায়নি, আমাকে দৌড়বার জন্য বলেওনি। আমি নিজেই নিজের জন্য দৌড়চ্ছি।"

"বোস, বোস, এখন একটু ঠাণ্ডা হ।" রবিবাবু তাঁর পাশের খালি চেয়ারটা দেখালেন। নারান মাথা নেড়ে ঘাসের উপর বসল।

"একই তারিখে তোদের দুজনের জন্ম, এইটুকুই তো মিল।"

নারান সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়ল।

"কিন্তু একই রকম বউও কি? জানিস, ওরা দুজন, এমিল আর ডানা, পরস্পরকে প্রেরণা দিত! তা হলে সেই গল্পটা বলি, হেলসিঙ্কিরই ঘটনা। এমিল তাঁর দ্বিতীয় রেস, পাঁচ হাজার মিটারে সোনা জিতলেন। তার কিছু পরেই ডানারও ফাইনাল— জ্যাভেলিনে। স্বামী দ্বিতীয় সোনা জিতেছে শুনে বউ ছুটে এসে মেডেলটা দেখতে চাইল। এমিল ওর হাতে দিলেন। ডানা বলল, 'দারুণ ব্যাপার। এটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি' ডানা মেডেল নিয়ে চলে গেল। এর আগের লন্ডন ওলিম্পিকে, তখনও ওদের বিয়ে হয়নি, ডানার পদবি তখন ইনগ্রোভা, জ্যাভেলিনে সেভেন্থ হয়েছিল। ডানা প্রথমবারই যে থ্রো-টা করল তাতেই সোনা, আর ওলিম্পক রেকর্ড! লন্ডনে যতটা দূরে ছুড়েছিল এখানে তার থেকে সাড়ে পঁয়ত্রিশ ফুট দূরে ছোড়ে।"

"বলেন কী! চার বছরে এত উন্নতি? সা-ড়ে-পঁ-য়-ত্রি-শ ফুট!...খুব প্র্যাকটিস করেছিল।"

"শুধুই কি প্র্যাকটিস? স্বামীর ওই সোনা জেতাও কি শরীরে, মনে প্রেরণা জোগায়নি? মজার ব্যাপার হল, এমিল এটারই ইঙ্গিত দিয়ে ঠাট্টা করে বলল, বউয়ের সোনা জেতায় তারও হাত আছে। ব্যস, শুনেই তো ডানা রেগে উঠল। বলল, প্রেরণা জোগালেই বুঝি অতদূর পর্যন্ত জ্যাভেলিন ছোড়া যায়? কত তো মেয়ে রয়েছে, তাদের প্রেরণা জুগিয়ে দ্যাখো তো একবার, অতদূর পর্যন্ত ছুড়তে পারে কি না?' নারান বোঝ তা হলে, দু'জনের মধ্যে কতটা মনের মিল থাকলে তবেই এমন ঝগড়া করা যায়।...একজন এমিলকে বলল, 'দুটো সোনা তো জিতলেন, এবার ম্যারাথনটাও কি জিততে চান?' এমিল বলল, 'জ্যাটোপেক পরিবারে স্কোর এখন দুই-এক। ব্যবধানটা এত কাছাকাছি যে, বাড়িতে বোধ হয় খাতিরটা কমেই যাবে। ওটা আর একটু উঁচুতে তোলার জন্য এখন তো ম্যারাথন রেসে আমাকে চেষ্টা করতেই হবে!' বোঝ নারান!" বলেই রবিবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

আর তখনই আটশো মিটারের প্রতিযোগীদের স্টার্টিং লাইনে আসার জন্য লাউম্পিকারে অনুরোধ জানানো হল। নারান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বাড়িতে আমার খাতির নেই রবিবাবু। আমার বউ এক একরাতে ঠোঙা বানায় হাজারেরও বেশি আর

আমার হয় বড়জোর সাতশো!"

স্টার্টিং লাইনে টোলুবাবু একা দাঁড়িয়ে। নারান বিস্মিত হয়ে বলল, "আর সব কই?"

"আমিও তো খুঁজছি, গেল কোথায় সবাই?"

ঘোষণা হচ্ছে বার বার: "আটশো মিটার দৌড়ের প্রতিযোগীরা, আপনারা এক্ষুনি আরম্ভ-সীমায় চলে যান...দেরি করবেন না। পরের ইভেন্টগুলো শুরু করতে তা হলে দেরি হয়ে যাবে।...দিস ইজ লাস্ট কল ফর দ্য..."

মাণ্টাবাবু এলেন হন্তদন্ত হয়ে।

"কেউ নামতে চাইছে না। মণিবাবু বললেন, ওঁকে এখনই একটা প্রেস কনফারেন্সে যেতে হবে, পল্টু বলল, 'পেট ব্যথা করছে', সুজয় বলল, 'মাথা ধরেছে,' রামভরণ আর বাসুদেবকে খুঁজে পেলুম না, বলাই মিত্তির আর গজুকে হাতে পায়ে ধরে রাজি করিয়েছি তবে ওরা এক পাকের বেশি দৌড়বে না বলেছে...এখন কী করি? ইভেন্টটা ক্যানসেল করে দেব?"

"না, না, করবেন না।" নারান প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, "কেউ না দৌড়লে আমি একাই দৌড়ব।"

"ব্যাপার কী, নামতে চাইছে না কেন?" টোলুবাবু জানতে চাইলেন। নারানের দিকে আঙুল দেখালেন মাণ্টাবাবু।

"আগের দুটো রেসে যেভাবে এগিয়ে থেকে নারান সবাইকে হারাল, তাইতে সবাই মনে করছে তারা বেইজ্জত হয়েছে। একজন বয়স্ক লোকের কাছে এত পিছিয়ে থেকে হার...অফিসে আওয়াজ খাওয়ার কথা ভেবেই ওরা..."

"মাণ্টাবাবু তা হলে আমি নামব না। আপনি ওদের বলুন যে নারান..."

"চঅঅপ্।" টোলুবাবুর ধমকে নারান থতমত হল। "ওদের জন্য তোর হ্যাটট্রিক বন্ধ হবে আমি থাকতে? ফাঁকা মাঠে গোল দিলে সম্মান থাকে না,...অসম্মান নিয়ে জিতবি কেন?...চল, আমি তোর সঙ্গে নামব। স্পোর্টস রিপোর্টিং করি, বুঝলি, স্পোর্টসম্যানশিপ দেখাতে জানি।"

টোলুবাবুকে অনেক বুঝিয়েও নিরস্ত করা গেল না। হার্ট, গ্যাস্ট্রিক, ব্লাডপ্রেশার, স্পন্ডলাইসিসের ভয় দেখানো হল, কিন্তু কিছুই কানে নিলেন না। সাব-এডিটর বলাই মিত্তির আর টেলিফোন অপারেটর গজুর সঙ্গে তিনিও হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে দাঁড়ালেন স্টার্ট নিতে। মাণ্টাবাবু হুইস্‌ল দিয়ে শুরু করালেন। সবাই ধীর গতিতে একসঙ্গে ছুটতে লাগল। নারান হুঁশিয়ার হয়ে রয়েছে, বাকি তিনজনের থেকে যেন সে একহাতও এগিয়ে নিয়ে যায়।

চার পাকের দৌড়। দেড় পাকের পরই গজুর মুখ লাল। হাঁপাচ্ছে।

"গজুবাবু চলুন, চলুন।" নারান পিছিয়ে ওর পাশে দৌড়তে দৌড়তে বলল, "আদ্দেক তো প্রায় হয়ে গেছে, বাকিটাও হয়ে যাবে। আস্তে চলুন, আস্তে।"

টোলুবাবু ঠিক দু'পাকের মাথায় হাঁটতে শুরু করলেন। "নারান আমি ফিনিশ করবই...একটু মোটা হয়ে গেছি এই যা। বুঝলি, আমি ফিটই আছি...যা যা তুই এগিয়ে

যা, বুঝলি, সেই বায়ান্ন সালের মোহনবাগানের মতোই আমার অবস্থা।...জোরে ছোট।"

তৃতীয় পাক শেষ হবার আগেই গজু আর বলাই মিত্তির দাঁড়িয়ে গেলেন। নারান দৌড় শেষ করল রীতিমতো জোরে ছুটেই। টোলুবাবু তখন আড়াই পাকে। গম্ভীর মুখে তিনি, বাজার করে ফেরার গতিতে, ফিনিশিং লাইনের উদ্দেশে হেঁটে চলেছেন।

পরের ইভেন্ট শুরু হবার আগে শ্যামল কুণ্ডু অনুযোগের সুরে টোলুবাবুকে বলল, "এভাবে হেঁটে হেঁটে ফিনিশ না করলেই পারতেন। আমাদের ডিপার্টমেন্ট নিয়ে সবাই এবার হাসাহাসি করবে।"

"করুক। চ্যাম্পিয়ান হতে পারব না, সেজন্য লিগের বাকি ম্যাচগুলো তাই বলে খেলব না?...তেমন হলে আমি হামাগুড়ি দিয়েও ফিনিশ করতুম! বুঝলে শ্যামল, এককালে কুস্তি শিখেছি গোবরবাবুর আখড়ায়, আমরা হলুম ওল্ড স্কুলের লোক।"

"টোলুবাবু তা হলে কী হল?" নারান প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য তাড়াতাড়ি কথা পাড়ল। সে জানে গোবর গুহ আর গোষ্ঠ পালের কথা শুরু করলে টোলুবাবু থামতে পারেন না।

"কীসের কী হল?"

"ডুরান্ডের?"

"তোর ওই এক চিন্তা, কই আমার তো হচ্ছে না? আমি তো ধরেই রেখেছি, তুই তিনটেতে জিতলে ডুরান্ড নেবে...।" টোলুবাবু কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন।

বয়স্ক মহিলাদের মিউজিক্যাল চেয়ারের পর গো অ্যাজ ইউ লাইক। তারপর পুরস্কার বিতরণ। নারান পেল কেরোসিন স্টোভ, টেবলল্যাম্প, হাওয়া-বালিশ আর তিরিশ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হবার জন্য একটা ছোট কাপ। টোলুবাবু দ্বিতীয় হয়ে পেলেন একটা জলের ফ্লাস্ক। সেটা তিনি নারানকে দিয়ে দিলেন।

রবিবাবু পাঁচ টাকার একটা নোট নারানের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "বাড়ি যাবার সময় রসগোল্লা কিনে নিয়ে যাস।...আজ আমার খুব আনন্দ হল।"

ধান্যকুড়িয়ায় নারান ট্রেন থেকে নামল রাত ন'টায়। স্টেশন থেকে বেরিয়েই বাজার। রাস্তার দুধারে নতুন কয়েকটা পাকা দোকান ঘর। ওষুধের দোকান, ডাক্তারখানা, শর্টহ্যান্ড টাইপ শেখার স্কুল, বাড়ি তৈরির মালমশলার দোকানের পর, আশুতোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। দোকানের সামনে মুখোমুখি বেঞ্চে বসে পাড়ার কয়েক জন বয়স্ক লোক। ওদের মধ্যে রয়েছে তার জ্ঞাতিদাদা শচীন হালদার, চারু রায়, নন্দ ঘটক, শঙ্কর গারু এবং অপরিচিত একজন।

হাতের প্রাইজগুলো বেঞ্চে নামিয়ে রেখে নারান বলল, "আশু পাঁচ টাকার রসগোল্লা দাও তো।"

সবাই তাকাল নারানের দিকে। শঙ্কর গারু বলল, "বাড়িতে কুটুম টুটুম আসবে না কি?"

"না।"

"তবে, একেবারে পাঁচ টাকার রসগোল্লা?"

"পাঁচ টাকার না হলে বাড়ির অতগুলো লোকের মুখে কি আধখানা করে দেব?"

"ব্যাপার কী নারান, বাড়ির লোককে হঠাৎ যে রসগোল্লা খাওয়াচ্ছ?" চারু রায় কৌতূহল দেখাল।

নন্দ ঘটক বলল, "নারান তোর সঙ্গের ওগুলো কী? কিনলি নাকি?"

ওদের কথার সুরে নারান হালকা ব্যঙ্গের ছোঁয়া পেল। আর মাথাটাও গরম হয়ে উঠল। সে কি এতই গরিব যে রসগোল্লা কিনলে বা হাতে কিছু জিনিস থাকলেই লোকে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা শুরু করবে?

"অফিসে স্পোর্টস ছিল...নেমেছিলাম। জিতে এগুলো পেয়েছি।" তার স্বর ঈষৎ রুক্ষ।

"বাঃ বাঃ, কিন্তু স্পোর্টসে তো কাপ মেডেল দেয়, তুমি তা পাওনি?" চারু রায়ের প্রশ্ন।

"পেয়েছি।" নারান মুখ ফিরিয়ে কথাটা বলেই আশুর দিকে তাকাল। "চার আনাওলার দেবে। খানিকটা রসও দিয়ো।...তোমার ওই ভাঁড়ে কুলোবে না। একটা ছোট হাঁড়িতে করে দাও।"

"পেয়েছিস তো একবারটি দেখা। আমাদের এ তল্লাটে তো এখনও পর্যন্ত কলকাতা থেকে কেউ কাপ-মেডেল আনতে পারেনি। এই বয়সে তুই...দেখা দেখা।"

"দেখে চক্ষু সার্থক করি।" নারানের মনে হল, এটা শচীনদার গলা। সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু চিমটি কেটে টিপ্পনীটা ঠিকই দিয়ে যায়।

"আমার অত সময় নেই দেখাবার।...আশু ওইটুকু রস দিলে? একটা ফাউ দেবে না?"

"ওরে আশু, একটা নয় দুটো দে, আমরা বরং চাঁদা তুলে তোকে দামটা দিয়ে দোব। নারান ধান্যকুড়িয়ার মান বৃদ্ধি করেছে, সোজা ব্যাপার।...কাপ-মেডেল পেয়েছে, তা সেটা নয় নাই দেখাল...মুখে বলেছে তাই যথেষ্ট!"

স্টোভের বাক্সের মধ্যে কাপটা সে রেখেছে। শঙ্কর গারুর কথা শুনে বাক্সর দড়ি খুলে কাপটা নিয়ে এগিয়ে গেল।

"এই দ্যাখো। বিশ্বাস হল?"

সবাই একটু থতমত হল। চারু রায় কাপটা হাতে নিয়ে তালুতে নাচিয়ে ওজন পরীক্ষা করতে করতে বলল, "ছটাকখানেক হবে, রুপোর না কি রে?"

"ধ্যেত, রুপো না হাতি! কাঁসার ওপর রুপোর জল করা।"

"দাম কত হবে বল তো শচীন?"

"টাকাদেড়েক...সেকেন্ড হ্যান্ড হলে আরও কম।"

"আরে রুপো, কাঁসা, পেতল যাই হোক, একটা কাপ তো বটে! কচ্ছপের সঙ্গে দৌড়ে হোক আর শুঁয়োপোকার সঙ্গে দৌড়েই হোক, নারান জিতে এনেছে তো বটে।...একটা ফ্লাস্কও তো দেখছি, ওরে বাবা টেবিলল্যাম্পও যে! হাতে ওটা কী রে

নারান?"

নারানের মাথার মধ্যে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রাগে তার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। সেই সময়ই আশু ডাকল, "দড়ি বেঁধে দিয়েছি, নিয়ে যাও হাতে ঝুলিয়ে।"

কাপটা চারু রায়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে স্টোভের বাক্সের মধ্যে রেখে দড়ি বাঁধল, ফ্লাস্কটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাওয়া-বালিশ বাঁধা ল্যাম্প আর স্টোভের বাক্স একহাতে আর অন্য হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি ঝুলিয়ে সে পা বাড়াল।

ইতিমধ্যে আরও নানা রকম ফুট কাটা চলছিল।

"নারানকে তো একটা সম্বর্ধনা দিতে হয়!"

"অবশ্যই। এতগুলো প্রাইজ জিতে আনল! কত টাকার মাল হবে বল তো?"

"ওকেই জিজ্ঞেস করো না। শেয়ালদা বাজার থেকে গাঁটের পয়সা খরচ করে ওই তো কিনেছে।"

শেষের কথাটা নারানের কানে গেল। সে আর ধৈর্য রাখতে পারল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটে এসেই, হাতে ঝোলানো রসগোল্লার হাঁড়িটা আধাপাক ঘুরিয়ে, শচীন হালদারের মাথা লক্ষ্য করে বসাল। কিন্তু তার আগেই হাঁড়িটাকে দোলাতে দেখে বিপদের গন্ধ পেয়ে শচীন "অ্যাই অ্যাই" বলে সামনে বসা শঙ্কর গারুর উপর লাফ দিয়ে পড়েছিল। হাঁড়িটা বেঞ্চের ওপর পড়ে চৌচির হল, ছিটকে গেল রসগোল্লা আর রস।

"মেরেই ফেলব, আজ মেরেই ফেলব।" শচীনের চুলের মুঠি ধরে নারান ঝাঁকাচ্ছে আর চিৎকার করে যাচ্ছে, "অনেক সহ্য করেছি, এবার শেষ করব।"

আশুতোষ দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে। চারু, নন্দ এবং আরও কয়েকজন নারানকে ধরে টেনে সরিয়ে নিল। দেখতে দেখতে সারা বাজার ভেঙে পড়ল। সবারই মুখে এক কথা, "কী ব্যাপার?...কী হল নারান হালদারের?...খেপে গেল কেন?"

ডাক্তারখানার সিঁড়ির ধাপে নারানকে বসানো হয়েছে। ছড়ানো ছেটানো প্রাইজগুলো কুড়িয়ে এনে একজন তার পাশে রাখল। একটু দূরে একটা ভিড়ের মধ্য থেকে নন্দ ঘটকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

"পুলিশে দেওয়া দরকার, আমি এক্ষুনি থানায় যাব। খুন তো প্রায় করেই ফেলেছিল। ভাবো তো, অতবড় একটা হাঁড়ি যদি মাথায় পড়ত! আমি টেনে না নিলে শচীনদা তো মরেই যেত।"

নারানের সামনেও একটা ভিড়। মুখ নামিয়ে মাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে। একজন হাত ধরে বলল, "চলো নারানদা, বাড়ি চলো।...মাথা গরম আর কোরো না!"

"সরে যা সামনে থেকে, একটা হেস্ত না করে...।" বলতে বলতে নারান মুখ তুলেই ঢোঁক গিলল।

"তার আগে আমার মাথা ফাটিয়ে তোমায় হেস্তনেস্ত করার কাজে নামতে হবে।"

মহামায়া। খবর পেয়ে ছুটে এসেছে।

"বাড়ি চলো।"

ক্লান্ত, অবসন্ন পায়ে নারান বাড়ি ফিরল। সঙ্গে মহামায়া, নয়ন আর অবু। অন্ধকার উঠোনে গোঁজ হয়ে নারান বসে রইল। সারাদিনের কথা, টুকরো টুকরো ভাবে তার মনের মধ্যে আলোড়ন তুলে যাচ্ছে। আশুর দোকানের সামনে যা ঘটে গেল, সেটা ঘটতই না যদি সে স্পোর্টসে না নামত, যদি সে প্রাইজগুলো না পেত, যদি সে রবিবাবুর দেওয়া টাকায় রসগোল্লা কিনতে না যেত।

কেন যে মাঠে গিয়ে তার শরীর-মন আনচান করে উঠল এই চল্লিশ বছর বয়সেও? নারান খুঁজে পেল না এর উত্তর। প্রাইজ জেতার আনন্দ নষ্ট করে দিল তার চণ্ডালের মতো এই রাগ। নিজেকে সে বশে রাখতে পারে না কেন? তারও উত্তর সে পেল না। মহামায়া গিয়ে যদি তাকে টেনে না আনত, তা হলে সে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাতই। কৃতজ্ঞতায় তার মন আচ্ছন্ন হতে শুরু করল। মহামায়া না থাকলে তার পরিশ্রম কোনও কাজেই লাগত না, এই সংসার গড়ে তোলা, সন্তান পালন করা, এমন শৃঙ্খলার সঙ্গে কিছুই সম্ভব হত না, যদি...

"কে?" নারান উঠে দাঁড়াল। কে যেন অন্ধকার উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"আমি আশু।"

"কী ব্যাপার?"

"এইটে ধরো।" আশু তার হাতের হাঁড়িটা এগিয়ে দিল। হারিকেন নিয়ে মহামায়া ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

"কেন?" নারান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ফেলে এসেছিলে তাই দিয়ে গেলাম।"

"কোথায় ফেলে এসেছি?" আমি তো হাঁড়ি ভেঙে রসগোল্লা নষ্ট করে দিয়েছি!"

"তা দিয়েছ। এটা হল আমার দেওয়া প্রাইজ। তুমি কলকাতা থেকে কাপ জিতে এনেছ, এতে আমার আনন্দ হচ্ছে। এখানে কেউই তো কখনও কিছু জেতেনি, তুমিই প্রথম, নাও ধরো।"

আশু হাঁড়িটা এমন ভাবে বাড়িয়ে ধরল যে, নারান হাতে না নিয়ে পারল না। কুণ্ঠিত স্বরে সে বলল, "কিন্তু এমন কিছু তো বড় স্পোর্টস এটা নয়...অফিসের, সামান্যই ব্যাপার।"

"হোক সামান্য। সব জিনিসই সামান্য থেকে শুরু হয়, তারপর ধাপে ধাপে বড় হয়।"

"আরে, আমি চল্লিশ বছর বয়সে এখন আর কী বড় হব? এটা দৌড়োদৌড়ির কাজ বুঝলে আশু, বসে বসে সন্দেশ-রসগোল্লা বানানো নয়। ধাপে ধাপে বয়স বাড়বে যেমন, তেমনই ধাপে ধাপে দৌড়ের ক্ষমতাও কমে আসবে। জ্যাটোপেক বায়ান্নর ওলিম্পিক ম্যারাথন জিতল, চার বছর পরের ওলিম্পিকে সিক্সথ..."বলেই সে চুপ করে গেল।

আশু একগাল হেসে মহামায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "বউঠাকরুন, নারানের সঙ্গে তো কথায় পারব না, খবরের কাগজের অপিসে চাকরি করে, অনেক খবর রাখে। মিষ্টিগুলো খেয়ে বলবেন কেমন লাগল। আচ্ছা, এখন চলি।"

রাতে ছেলে মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ার পর, মহামায়া বলল, "ধানের ব্যবসা করব।"

"কীসের?...ধানের ব্যবসা? তুমি?"

"আমি একা কী করে করব? সবাই মিলে করব। উলটোডিঙিতে কাজে যাবার সময় ট্রেনে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, নাম রমা, গুমার দিকে ওর বাড়ি। আজ সকালে বাজারে দেখি ও চালের দোকানে বসে। কথায় কথায় রমা বলল, ধান কিনে এনে, সেদ্দ করে, ধানমিলে ভাঙিয়ে এখন চাল বিক্রি করে। দিনে ছ'সাত মণ চাল তৈরি করে। বাড়িতে চার-পাঁচ জন লোক, সবাই হাত লাগায়। আমার আর কাজ করার মতো লোক কোথায়। অল্প করেই শুরু করে একবার দেখি না।"

"মুখে মুখে ধানের ব্যবসা করা খুব সোজা। ধান কিনে আনা নয় হল; তারপর সেদ্দ করা, শুকোনো, নাড়া দেওয়া, দেশের বাড়িতে দেখেছি তো, মাঝ রাত থেকে উনুনের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে তুষের জ্বাল দেওয়া, তারপর সারাদিন ধানের কাছে বসে থাকা, নাড়া দেওয়া। কম খাটুনি? সে তুমি পারবে না।"

"পারি কি না পারি সেটা পরে দেখা যাবে, আগে কাজে নামি তো। রাম বলেছে, যদি রাজি থাকি তা হলে ও আমায় সব জানিয়ে বুঝিয়ে দেবে।"

মহামায়ার কথা শুনে নারানের মনে পড়ল, বউ সোনা জেতার পর জ্যাটোপেকের কথাটা: বাড়িতে বোধহয় খাতিরটা কমেই যাবে। ওটা আর একটু উঁচুতে তোলার জন্য এখন তো ম্যারাথন রেসে আমাকে চেষ্টা করতেই হবে!

রসিকতা করে বলল, কিন্তু সংসারে এই ধরনের রেষারেষি তো হয়ই। বাবা-ছেলে স্বামী-স্ত্রী সবার সঙ্গে সবার...সংসার গড়ে তুলতে, প্রতিপালনের আর বাড়বাড়ন্তের জন্য কে কতটা সাহায্য দিতে পারে, তাই নিয়ে কম্পিটিশন চলে। মহামায়া কি তাকে পিছনে ফেলে এগোতে চাইছে?

নারানের আর একটা কথা মনে এল। আশুকে সে জ্যাটোপেকের কথা তুলে তখন বলল, বায়ান্নয় ম্যারাথন জিতে কিনা চার বছর পর সিক্সথ! তারপরেই সে চুপ করে গেছল। কথাটা বলেই তখন তার হুঁশ হয়েছিল, আশুর কাছে জ্যাটোপেকও যা আর জিবেগজাও তাই। বলে কোনও লাভ নেই, ওর মাথায় জ্যাটোপেক ঢুকবে না। যদি ঢুকবে বুঝত, তা হলে সে বলত—ছাপান্নর ওলিম্পিক শুরুর দেড় মাস আগে এমিল ট্রেনিং করছিল ডানাকে কাঁধের উপর তুলে। তখনই হার্নিয়া শুরু হয়। অপারেশন হল। ডাক্তার বলল, দু' মাস দৌড় বন্ধ রাখতে হবে। রবিবাবু গল্পটা বলতে বলতে থেমে গিয়ে বলেছিলেন, 'নারান, ওই মানুষটা আলাদা ধরনের। ওকে দমানো যায় না। দু' মাস বন্ধ রাখার বদলে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে পরদিনই আবার ট্রেনিং শুরু করে দিল। ওর সিক্সথ হওয়াটাই তো একটা অলৌকিক ব্যাপার।'

এসব কথা মিষ্টিওলা আশুকে বলে কোনও লাভ হত না। সংসারটা ঘাড়ে নিয়ে সে এখনও শুধু হাঁটছে, দৌড় দিতে পারছে না। মহামায়া নিজের ঘাড়ে কিছুটা বোঝা তুলে নিতে চাইছে।

"কী হল, চুপ করে রইলে কেন? রমাকে বলেছি তাড়াতাড়িই ওকে জানাব। ও যদি পারে তা হলে আমিও পারব।"

"একটু ভেবে দেখি। পরে তোমায় বলব।"

সাতদিন পর ডুরান্ড ফাইনালে, খেলা দু'দিন ড্র রেখে যুগ্মবিজয়ী হল মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল। নারানের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে টোলুবাবু বলেছিলেন, "তুই এবার থেকে প্রত্যেক বছর স্পোর্টসে নামবি...উফ্‌ফ, যা ঝামেলার মধ্যে থাকতে হয়? আমি অবশ্য ধরেই নিয়েছিলুম তুই তিনটেতে জিতলে একটা নতুন কিছু ডুরান্ডে এবার হবে। এরা আগে কখনও তো জয়েন্ট উইনার হয়নি।"

রাতে বাড়ি ফিরে নারান বলল, " তুমি একা করবে কেন, দু'জনে জয়েন্টলিই কাজ করব, তাতে অনেক ঝামেলা কমে যাবে।"

॥ ৫ ॥

অফিসের স্পোর্টসে নারানের প্রথম নামা আর ধান কিনে এনে চাল তৈরির ব্যবসা একই বছরে শুরু হয়েছিল। তারপর ছ'টা বছর কেটে গেছে অর্থাৎ জ্যাটোপেককে দেখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে তার ব্যর্থ হওয়ার পর দশ বছর! এর মধ্যে মহামায়া বছর তিনেক উলটোডাঙায় এক কাঠের খেলনা তৈরির কারখানায় কাজ করেছে,বাড়িতে ঠোঙা তৈরি করেছে তারপর চাল তৈবির ব্যবসা, যেটা এখনও তারা চালাচ্ছে।

নারানের প্রতি দিনের জীবনযাপন ধারা এখন একটু অন্য রকম। তার অফিসের ডিউটি এখন স্টোর বিভাগে, দিনে দশটা-পাঁচটা। অফিস বাড়ির একদিকে এই স্টোর বিভাগ, খেলার বিভাগ অন্যদিকে, দোতলায়। টোলুবাবু বা মাণ্টাবাবুদের কারও সঙ্গেই আর তার দেখা হয় না। তবে প্রতি বছর স্পোর্টসে মাঠে দেখা হয়।

নারান একশো, দুশো বা চারশো মিটারে এখন প্রথম হতে পারে না। অফিসে অনেক অল্পবয়সি ছেলে এসে গেছে, তাদের সঙ্গে গতিতে তাকে হার মানতেই হয় কিন্তু আটশো মিটারে এবং হাজার মিটার ওয়াকিংয়ে সে অফিসে অপরাজেয়। কিন্তু বুঝতে পারছে আটশো মিটারের চুড়ো থেকে এবার তাকে নেমে আসতে হবে। বয়স এখন ছেচল্লিশ। আর পারা যাচ্ছে না। তবে ওয়াকিংয়ে হাঁটায় অনভ্যস্ত কলকাতার বাবুরা যে আগামী দশ বছর পর্যন্ত তার কাছা ধরতে পারবে না, এটা সে জানে।

রাত দুটোয় সে বিছানা থেকে ওঠে। ধানের কুঁড়ো আর তুষ নিয়ে উঠোনে উনুনটা ধরায়। ধান সেদ্ধ করার লোহার কড়াইটা বিরাট। ব্যাসই প্রায় তিন হাত, গভীরতা দু'হাত। কড়াইয়ে ভাপা হবে চার বস্তা ধান, প্রতি বস্তায় থাকে দেড় মণ।

উনুন ধরানো হলে নারানের সঙ্গে এসে বসে মহামায়া। উনুনে আঁচ দেওয়ার মুখ দুটি। ওরা দু'জন দু'ধারে দুই মুখে বসে প্রথমে সরু কুঁড়ো গর্ত দিয়ে আগুনে ছুড়ে ছুড়ে দিতে থাকে, তারপর মোটা তুষ। অন্ধকার নিস্তব্ধ মাঝ রাতে দু'জনে উনুনের আঁচের দিকে তাকিয়ে অবিরত তুষ ছুড়ে যায়। আগুনের চাপা আভায়, অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে থাকা দুটো মুখের মধ্যে শুধু দু' জোড়া চোখ মাঝে মাঝে ঝকঝক করে ওঠে যখন তারা মুখ তুলে পরস্পরের দিকে তাকায়। দু-চারটে মাত্র কথা তারা বলে।

কাজের কথা।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মহামায়া একবার ওঠে। অবু আর নয়নকে তুলে দেয় ঘুম থেকে। নয়ন সংসারের কাজ শুরু করে, অবু পড়তে বসে। পড়াশুনোয় ওর মাথা ভালই। নারান ওকে গ্র্যাজুয়েট করবেই। রাত দুটো থেকে সাতটা, পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে ভাপের কাজ, উনুনে তুষ ছুড়ে যাওয়া। নারান অফিসে যাওয়ার জন্য আটটার ট্রেন ধরে। এর পর মহামায়া একলা।

গর্তের মধ্যে মাটির ছ'টা নাদা। প্রতিটিতে তিরিশ কলসি জল ধরে। ভাপানো, একসেদ্ধ হওয়া ছ' মণ ধান কড়াই থেকে তুলে জলে ডুবিয়ে রাখার জন্য, সে আর নয়ন নাদায় ফেলে।

অবুর স্কুল প্রায় এক মাইল দূরে জোড়ানিমতলায়। সে খেয়ে বেরিয়ে যায় দশটায়। নবু, রাজু যায় প্রাথমিক স্কুলে। গৌতম হামা ছেড়ে হাঁটতে শিখেছে মাত্র।

নাদা থেকে সেদ্ধ ধান তুলে উঠোনে পাতা চটের ওপর শুকোতে দেওয়ার কাজ মহামায়া একাই করে। ধান ছড়িয়ে দিয়ে আধঘণ্টার মতো বিশ্রাম। তারপর চট করে নাড়া দিয়ে ধানগুলোকে ওলটপালট করা, যাতে রোদের তাপ সমানভাবে পায়। এই সময় সারা দুপুর ধানের সঙ্গে লেগে থেকে অন্তত চার-পাঁচ বার সেই ছ'মণ ধান তাকে চট ধরে উলটাতে হয়। তখন লক্ষ রাখতে হয়, বেশি শুকিয়ে ধানের ওজন যাতে কমে না যায়, তা হলে চালের রং খারাপ হবে, ভাঙাবার সময়ও আস্ত থাকবে না। চালের দাম তাতে নেমে যাবে। আবার কম শুকোলেও চাল ভাঙবে। তাই তীক্ষ্ণ নজর রেখে ধানের কাছে মহামায়াকে সারা দুপুর বসে থাকতে হয় ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে। মাঝে মাঝে গোড়ালির চাপে ধান ভেঙে সে দাঁতে কেটে বুঝে নেয় ঠিকমতো শুকোল কি না। ধান বস্তায় ভরার আগে, ঘণ্টা চারেক ছায়ায় ঠাণ্ডা জায়গায় ছড়িয়ে রাখতে হয়।

ততক্ষণে নারান অফিস থেকে ফিরে আসে। কিন্তু এই চার ঘণ্টাও বিশ্রাম পায় না মহামায়া। সকালে ধানভাঙা যে কুঁড়ো, তুষ মিল থেকে বাড়িতে আনা হয়েছিল, এই সময়টায় কুলো দিয়ে ঝেড়ে সে তাই থেকে খুদ বার করার কাজে ব্যস্ত থাকে। কাজ শেষ হতে হতে রাত আটটা বেজে যায়। তারপর আবার রাত দুটোয় ঘুম থেকে উঠে উঠোনে উনুনের ধারে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে বসা। এই ভাবে তার রাত আর দিন কেটেছে গত ছ' বছর। খাটুনি থেকে তার রেহাই নেই। কিন্তু সে কখনও মুখভার করেনি। শরীর আর বইছে না বলে অনুযোগ জানায়নি। সংসারের সুখদুঃখ ঘিরে আবর্তিত হয়ে চলেছে তার দিন আর রাত।

নাদার জল দুদিন পর পর পালটাতে হয়। ছ'টা নাদায় লাগে একশো আশি কলসি জল। নারান বাড়িতে টিউবওয়েল বসিয়েছে। রাত্রে সে পাম্প করে, মহামায়া কলসিতে জল ভরে, কুড়ি গজ বয়ে নিয়ে গিয়ে নাদায় ঢেলে দিয়ে আসে।

মায়ের কষ্ট দেখে নয়ন এগিয়ে এসেছিল। মহামায়া ধমক দিয়ে বলেছিল, "গা-হাত পুরুষ মানুষের মতো শক্ত হয়ে যাবে। এসব কাজ তোকে করতে হবে না।" নয়নের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

অবুও টিউবওয়েলের হাতল ধরেছিল। নারান তাকে টেনে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল,

"এখন পড়ার সময়, মন দিয়ে পড়া কর।"

সেদিন ছিল নাদার জল পালটাবার দিন। কলসিতে জল নিয়ে যাবার সময় ছলকে উঠোনের মাটিতে জল পড়ে। ক্রমশ উঠোনটা ভিজে ওঠে, কাদা হয়। তখন পিছল মাটিতে একটু হুঁশ রেখে হাঁটতে হয়।

মহামায়া অন্ধকার উঠোনে টিউবওয়েল থেকে নাদা, যাতায়াত করছিল। সে জানত মাটি পিছল হয়ে উঠেছে। বহুবার এমন পিছল উঠোনে সে জল বয়েছে সাবধানেই পা ফেলছিল। তবু, শ্রান্তিতে কীরকম যেন আলগা হয়ে তার দেহের পেশি কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছিল । সে টাল রাখতে না পেরে পিছলে পড়ে গেল। কলসিটা উঠোনে চৌচির হল আর তার মুখ থেকে "আহ্‌হ্‌"-র মতো একটা শব্দ বেরোল।

ছুটে এল সবাই। ধরাধরি করে তাকে বসানো হল। লজ্জা পেয়ে মহামায়া উঠে দাঁড়াতে গিয়ে, "উহ্‌" বলে কাতরে উঠেই আবার বসে পড়ল।

"কোথায়?" উদ্বিগ্ন নারান জানতে চাইল ব্যথার জায়গাটা।

"এই ডান হাঁটুতে।"

"ভেঙেছে নাকি?" অবু বলল।

"তুই থাম তো! এরকম অনেকবার পড়েছি...চুন-হলুদ দিলেই সেরে যাবে।" মহামায়া ব্যাপারটাকে সহজ করে তোলার জন্য বলল, "নয়ন, কলসিটা তো ভাঙল, তুই এবার বালতি করে..."

"না না, যা পিছল হয়ে রয়েছে, আমিই নাদায় জল ঢালছি। তার আগে, নয়ন তুই চুন-হলুদ গরম কর।"

পরদিন সকালেও মহামায়া বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। ধান সেদ্ধর কাজ বন্ধ রইল, কিন্তু শুধু সে দিনের মতোই নয়, বরাবরের জন্যই।

দিন দশেক পর মহামায়া উঠোনে এসে একটা টুলে বসল নয়নের কাঁধে ভর দিয়ে। নারানকে সে ডাক্তার এনে টাকা খরচ করতে দেয়নি। "এই সামান্য একটা ব্যাপারে আবার ডাক্তার দেখাব কী? ক'দিন গরম তেল মালিশ করলেই দেখবে দৌড়তে পারব।"

দৌড় তো দূরের কথা, একমাস পরও সে ডান হাঁটু পুরোপুরি মুড়তে ব্যথা বোধ করল। উবু হয়ে বা বাবু হয়ে কোনওক্রমে বসতে পারলেও, উঠতে গেলেই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হয়। উঠোনে টুলে বসে সে করুণ চোখে নেভা উনুন আর বিরাট কড়াটার দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু সাচ্ছল্য এসেছিল সংসারে, তাও চলে গেল। নয়নের বিয়ে দিলেই জমানো টাকা আর থাকবে না। আবার সেই টানাটানির সংসার। এজন্য মহামায়া নিজেকেই দোষ দেয়। কেন সে আছাড় খেল! এটা কি কপালের লিখন! তাকে কি চিরকালই কষ্ট করে যেতে হবে, সুদিনের মুখ কি কখনও দেখতে পাবে না?

ধানের ব্যবসাটা উঠে গেল। মহামায়া হাঁটতে পারছে তবে ধীরে ধীরে। হাঁটু মুড়তে পারছে কিন্তু খচখচ করে। ব্যথাটা ক্রমশ মিলিয়ে গেলেও মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নারান এই নিয়ে চিন্তিত। ভাল একজন ডাক্তার দিয়ে একবার হাঁটুটা দেখানো উচিত। রেললাইনের ওপারে বিজয় ডাক্তারের কাছে সে মহামায়াকে নিয়ে গেছল।

হাঁটু পরীক্ষা করে ডাক্তার এক্স-রে করাতে বলে।

বাড়ি ফেরার সময় মহামায়া আপত্তি জানাল।

"আবার গুচ্ছের টাকা খরচ। ষোলোটা টাকা কম নাকি? ছবি তোলাবার দরকার নেই। ব্যথাটা আগের থেকে অনেক কমে গেছে, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। অত ব্যস্ত হবার কী আছে!"

"এসব জয়েন্টর ব্যথা অত সহজে যায় না। একটা এক্স-রে করাতে এত আপত্তি কীসের? ট্রেনে বনগাঁ গিয়ে..." নারান তার স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

"ট্রেনে চেপে কেন, আমি হেঁটেই এখন বনগাঁ যেতে পারি। কথাটা তা নয়,...অযথা কেন খরচ করব?"

"এটা অযথা নয়, খুব দরকারি। অফিসে শুনেছি তো, হাঁটুতে, অ্যাঙ্কেলে চোট পেয়ে কত ভাল ফুটবলারের খেলা শেষ হয়ে গেছে।"

"আমি কি ফুটবল খেলতে মাঠে নামব?"

"কেপ্পনি করে চিকিৎসা না করালে হাঁটুতে জল জমবে, বাত হবে, অথর্ব হয়ে যাবে।" শেষের কথাটায় মহামায়া ভয় পেল। বাতের যন্ত্রণা ঠিক আছে, সহ্য করতে পারবে, কিন্তু অথর্ব হওয়াকে সে ঘেন্না করে, তাই ভয়ও পায়।

"ঠিক আছে, কবে যাব?"

বনগাঁ থেকে এক্স-রে করিয়ে এনে নারান খাম হাতেই স্টেশন থেকে বিজয় ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে দেখল তালা ঝুলছে। কী ব্যাপার! পাশের ওষুধের দোকানে শুনল, পাটনায় ডাক্তাবাবুর বড়দার হঠাৎ হার্ট-স্ট্রোক হয়েছে। খবর পেয়েই কাল পাটনা চলে গেছেন। অন্তত সাত দিনের আগে ফিরবেন না।

সোমবার ছিল অফিসের মাইনের তারিখ। সে দিন দুপুরে ক্যাশঘর থেকে মাইনে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় সে টোলুবাবুর মুখোমুখি হল।

"আরে নারান, খবর কী তোর? দেখে তো মনে হচ্ছে ভালই আছিস।"

"আপনি কেমন আছেন? একটু শুকনো শুকনো..."

"ভাল আছি, ভাল আছি।" টোলুবাবু মাঝপথে নারানকে থামিয়ে দিলেন। "শরীর টরির নিয়ে কথা বলে মন খারাপ করে দিসনি। হার্ট, লিভার, কিডনি, প্রেশার, এগুলোকে ভুলে থাকতে দে। আর ক'বছর পরই রিটায়ার করছি...মাঠে যাওয়া বন্ধ করব। খাব-দাব, ঘুমোব আর ছাদে ফুলের বাগান করব। দুটো ছেলে চাকরি করছে...তোর কয় ছেলে?"

"বড় ছেলে তেরো বছরের, বাকি তিনটে ছোট।"

"ওহ, তা হলে তো তোকে এখন অনেকদিন চাকরি করতে হবে। করে যা, করে যা। মাইনেটা নিয়ে আসি।" টোলুবাবু ক্যাশঘরে ঢুকে গেলেন।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নিয়ে টোলুবাবু একটা কথাও বললেন না। এমনটা তো কখনও হয় না! নারানের অবাক লাগল। অনিলকে দেখে নারান বলল, "টোলুবাবু কেমন যেন বদলে গেছেন মনে হচ্ছে!"

"তুই জানিস না? ওনার তো দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। নাইটডিউটি আর করেন না।

দুপুরে ডাকের কপি করে বাড়ি চলে যান।"

শুনে নারান অবাক হয়ে গেল। একই অফিসে তারা কাজ করে, অথচ এক তলা আর দোতলার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই! তিন তলার মানুষদের তো সে চেনেই না! খেলার বিভাগে অনেক দিন যায়নি, নারানের ইচ্ছে হল, আগের মতো টোলুবাবুর সঙ্গে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নিয়ে কথা বলতে।

"কী রে, এখানে কী মনে করে?" টোলুবাবু চোখ থেকে চশমা নামালেন।

"আপনি চশমা নিলেন কবে?"

"মাস ছয়। বয়স হলে অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু তুই তো একটুও বদলালি না? চোখের দৃষ্টি কেমন?"

"ভালই, তিন হাত দূরের খবরের কাগজ পড়তে পারি।" কথাটা বলেই নারানের মনে হল, এখন এই লোকটির কাছে দৈহিক সুস্থতার কথা না বলাই ভাল। তাই সে তাড়াতাড়ি যোগ করল, "আমি ভাল থাকলে কী হবে, বাড়িতে তো অসুখবিসুখ, নিশ্চিন্তে আর আছি কই...বউয়ের হাঁটুতে..."

"কী হল হাঁটুতে?" টোলুবাবু চশমাটা চোখে দিলেন। নারান তখন আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা বলল।

"তা ওকে নিয়ে আয়, আমি ভাল ডাক্তার দেখিয়ে দিচ্ছি। না না, দেরি করিসনি, কালকেই আন।...মনে আছে তোর, চোদ্দো-পনেরো বছর আগে..."

"চোদ্দো বছর আগে। আপনি দাঁড়িয়েছিলেন ক্যাম্বেল হাসপাতালের...ইয়ে নীলরতন হাসপাতালের সামনে। বলেছিলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি আমি এসে যাই, তা হলে ধরে নিয়েছিলেন আপনারাই লিগ পাবেন। আমি চার মিনিট আটাশ সেকেন্ডের মধ্যে এসে গেছলাম।"

"আর লিগটা কিনা পেলি তোরা।" টোলুবাবু চোখ পিটপিট করে বললেন। "পরের বছর হল অ্যাবান্ডন্ড।"

"কিন্তু তার পরের বছর তো আপনারা ডাবল করলেন।"

"তার দু'বছর পর জ্যাটোপেক এল কলকাতায়, কিন্তু তুই তাকে দেখতে পেলি না।"

"আমার জীবনে, টোলুবাবু, এতবড় একটা দুঃখ আর কখনও পাইনি। ওঁকে দেখার ওই প্রথম আর শেষ সুযোগ আমি হারিয়েছি।"

"তা হলে তুই কাল...না না কাল নয়, তোর অফ-ডে কবে? রবিবার?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে রবিবার বিকেলে ঠিক পাঁচটায় ওই জায়গায় বউকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়াবি। এক্স-রে প্লেটটাও আনবি। ওই ডাক্তারের কাছেই নিয়ে যাব। বেশিক্ষণ কিন্তু আমায় দাঁড় করিয়ে রাখিসনি। শরীরটা ক'দিন ধরে ভাল যাচ্ছে না, হার্টটা কেমন যেন ট্রাবল দিচ্ছে।"

নারান চলে আসছিল, টোলুবাবু ডাকলেন।

"নারান শোন, জীবনে কোনটে বড় দুঃখ আর কোনটে ছোট দুঃখ, সে সবের

হিসেব কষা ছেড়ে দে। ওতে শুধু সময় নষ্ট আর মন খারাপ করা। দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে, ডাক্তার বলেছে থার্ডটাই আমার ফুলটাইমের হুইস্‌ল হবে। আমি এখন আর লিগ, শিল্ড, রোভার্স, ডুরান্ড নিয়ে একদম ভাবি না। এসব এখন তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হয়। তোরও জীবনে এমন একদিন আসবে যখন জ্যাটোপেককে তোর আনইম্পর্ট্যান্ট বলে মনে হবে।"

"না না না, এ আপনি কী বলছেন টোলুবাবু।" নারান প্রায় শিউরে উঠল। "ওঁকে আনইম্পর্ট্যান্ট ভাবব? এমন অধঃপতন আমার যেন না হয়।"

টোলুবাবু ফিকে হাসলেন। নিচু গলায় বললেন, "না হলেই ভাল। তবে জীবনে বড় বড় সারপ্রাইজগুলো ঘাপটি মেরে থাকে। কখন, কোথায় যে লাফ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে কেউ তা জানে না!...তা হলে রোববার দেখা হচ্ছে।"

নারানও জানত না, রবিবারই তার সামনে এসে দাঁড়াবে একটা সারপ্রাইজ।

মহামায়াকে নিয়ে সে বিকেল চারটে-পঁয়ত্রিশে ট্রেন থেকে শেয়ালদায় নামল। হাসপাতালের সামনে পৌঁছতে লাগল চার মিনিট। তারপর অপেক্ষা করতে করতে বাজল পাঁচটা। টোলুবাবু তখনও আসেননি। সাড়ে পাঁচটা। টোলুবাবুর দেখা নেই।

"কী ব্যাপার, ঠিক বুঝতে পারছি না তো!" নারান হতাশ, উদভ্রান্তের মতো মৌলালি থেকে বউবাজার মোড় পর্যন্ত ঘনঘন তাকাতে লাগল।

"পাঁচটা বলেছিলেন না ছ'টা?" মহামায়া সন্দিগ্ধ স্বরে জানতে চাইল।

"পাঁচটা। আর একটু দেখি। না এলে ডাক্তারের কাছেই সোজা টোলুবাবুর নাম করে চলে যাব, এই তো সামনেই ওঁর চেম্বার।"

ছ'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নারান আর মহামায়া ডাক্তারের চেম্বারে এল। চোদ্দো বছরে জায়গাটার বিশেষ কিছু বদল ঘটেনি। অপেক্ষার জায়গাটায় রোগীর সংখ্যাটা বেশি। পুরনো দুটো চেয়ারকে নারান চিনতে পারল। নতুন একটা হাতলওলা বেঞ্চ আর ঘরের দরজার ধারে টেবল চেয়ার। একটি অল্পবয়সি রুগ্‌ণ মেয়ে সেখানে বসে।

"আপনার কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?" মেয়েটি জিজ্ঞেস করল। নারান ফাঁপরে পড়ল। ডাক্তারকে টোলুবাবু বলে রেখেছেন কি না সে জানে না। তবে আগেরবার তো ডাক্তারকে বলা-কওয়া ছিল বলে তার মনে হয়নি। হাঁদু বলে টোলুবাবু ডেকেছিলেন। ছোটবেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার দরকার হয় না।

"না করা নেই। ডাক্তারবাবুর বন্ধু আমাদের পাঠিয়েছেন।"

"এতে আপনার নাম আর যিনি পাঠিয়েছেন তার নাম লিখে দিন।" স্লিপের ছোট্ট প্যাডটা আর কলম মেয়েটি এগিয়ে দিল।

নিজের নাম লিখে নারান তার দলায় "টোলুবাবু পাঠাইয়াছেন" লিখে দিল। স্লিপটা নিয়ে পরদা সরিয়ে মেয়েটি ভিতরে গেল। পর্দার দিকে তাকিয়ে নারানের মনে হল, এটা তো আগে ছিল না! বেঞ্চে মহামায়ার পাশে বসা মাত্রই মেয়েটি পরদা সরিয়ে বলল, "নারানবাবু আসুন।"

মহামায়ার কানের কাছে মুখ এনে নারান ফিসফিস করে বলল, "টোলুবাবুর নাম

লিখে দিয়েছিলাম, তাই সঙ্গে সঙ্গে কল এল।"

মহামায়ার সামনে পরদার দিকে তাকিয়েই ছিলেন। তারা দু'জন ঘরে ঢোকা মাত্র বললেন, "টোলু কবে বলেছিল আপনাকে?"

ডাক্তারবাবুর চাহনিতে ও স্বরে এমন কিছু ছিল যেজন্য নারান নমস্কার করতেও ভুলে গেল।

"গত সোমবার, অফিসে কথা হয়েছিল। আমরা একই অফিসে কাজ করি। উনি বলেছিলেন, পাঁচটার সময় হাসপাতালের সামনে অপেক্ষা করবেন। আমাকে নিয়ে উনি আপনার কাছে এসেছিলেন একবার, চোদ্দো বছর আগে। সেদিনও তিনি ওইখানে আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। তবে এবার আর আমার জন্য নয়, আমার স্ত্রীর..."

"বসুন। টোলুর পাঠানো আপনিই বোধহয় শেষ রোগী।"

কথাটা বুঝতে না পেরে নারান হাসল, টোলুবাবু তা হলে এখানে রোগী সাপ্লাই দেন! কিন্তু শেষ রোগী কেন? আর কি কাউকে পাঠাবেন না?

তার চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠতে দেখে ডাক্তারবাবু চোখ নামিয়ে ধীর স্বরে বললেন, "কী জন্য এসেছেন বলুন।"

উঁচু বেঞ্চে শুইয়ে এবং হাঁটিয়ে মহামায়ার হাঁটু পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু কোনও ওষুধপত্র দিলেন না। শুধু প্রতিদিন কয়েকটা ব্যায়ামের আর টানা আধঘণ্টা হাঁটার নির্দেশ দিয়ে, কী ভাবে হাঁটতে হবে সেটাও দেখিয়ে দিলেন।

"আমরা ছ'টা পর্যন্ত ওঁর জন্য অপেক্ষা করেছি। যদি উনি এসে পড়েন তা হলে ওঁকে বলবেন যে"...নারান থেমে গেল ডাক্তারবাবুর তোলা হাত দেখে।

"টোলু আর আসবে না। এতক্ষণে ওর দাহ হয়ে গেছে।"

নারানের মাথার মধ্যে কথাগুলো অর্থবহ একটা পরিষ্কার আকার নিয়ে ফুটে ওঠা মাত্র সে টেবলের কোনা আঁকড়ে ধরে ঝুঁকে, মুখ থেকে একটা শব্দ বার করল।

"ভোররাতে ঘুমের মধ্যেই...আমিই ওর ডেথ সার্টিফিকেট লিখলাম।"

নারান থরথর কাঁপছে। মহামায়া ওর একটা হাত চেপে ধরল। ডাক্তারবাবু বেল বাজালেন। পরদা সরিয়ে মেয়েটির মুখ উঁকি দিল।

"পাঠিয়ে দাও।"

নারান সম্বিৎ ফিরে পাবার আগেই দু'জন পুরুষ ও মহিলা ঘরে ঢুকল।

"বসুন...বলুন।"

মহামায়াই হাত ধরে টেনে নারানকে বাইরে আনল। বেরিয়ে এসেই সে বলল, "এভাবে অবাক করে দেবেন ভাবিনি।"

এর পর আর সে একটিও কথা বলেনি। মহামায়া কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করে চুপ করে গেছে।

ট্রেনে বসে নারান জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিল। বাইরে ঘোর অন্ধকার, সিগন্যালের লাল-সবুজ, মাঝে মাঝে বাড়ির আলো, রাস্তার আলো, স্টেশনে থামা, যাত্রীদের ওঠা-নামা, মোটরের হেডলাইট, ব্রিজের উপর ট্রেনের ঝম ঝম শব্দ...তার মনের

মধ্যেও চলেছে রেলগাড়ি।...তাতে যাত্রী শুধু টোলুবাবু আর সে। টুকরো-টুকরো কথা, হাসি, রাগ, জল-খাওয়া, শোওয়া, নানানভাবে টোলুবাবুকে তার মনে পড়ছে। এক-একটা বছর যেন এক একটা স্টেশনের মতো। নারানের মনের রেলগাড়িও থামছে আর ছাড়ছে।

সোমবার শেষবারের মতো দেখা হল। "আমার জীবনে জ্যাটোপেককে না দেখতে পাওয়ার মতো এত বড় দুঃখ আর কখনও পাইনি।" কথাটা কি সত্যি? নারান মনে মনে প্রশ্ন করল টোলুবাবুকেই।

'নারান সারপ্রাইজগুলো ঘাপটি মেরে থাকে। কখন, কোথায় যে লাফ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে...।'

টোলুবাবু শেষে আপনিই কিনা এই কাজ করলেন! আপনিই আমার বড় দুঃখ? না কি আরও দুঃখ ঘাপটি দিয়ে রয়েছে? জীবনে তো অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ সইলাম, দেখলামও, কিন্তু এমন করে চমকে দেওয়ার মতো তো আগে কখনও পাইনি!

'নারান জীবনে কোনটে বড় দুঃখ আর কোনটে ছোট দুঃখ, সে সবের হিসেব কষা ছেড়ে দে। ওতে শুধু সময় নষ্ট আর মন খারাপ করা।'

ঠিক বলেছেন টোলুবাবু, আমি আর মন খারাপ করব না। আপনাকে আমি ভুলেই যাব, আপনাকে আমি মন থেকেই মুছে ফেলব। নারান ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করল। পশে বসা মহামায়া তার মুঠোয় চেপে ধরল নারানের বাহু।

"ঘুম পাচ্ছে?"

নারান চোখ তুলে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

ডাক্তারবাবুর দেখিয়ে দেওয়া ব্যায়াম শুরু করল মহামায়া আর উঠোনে এধার থেকে ওধার আধ ঘণ্টা হাঁটা। কিন্তু কয়েক দিন পরই তার বিরক্তি ধরল, একঘেয়ে লাগল ছোট জায়গায় এইভাবে হাঁটতে।

"উঠোনে আর পারছি না, এবার রাস্তায় হাঁটব।" মহামায়া একদিন নারানকে বলল।

"পাকা রাস্তা তো একটা, বাস আর লরি অবিরাম চলেছে। হাঁটবে কোথায়? ভাঙাচোরা কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাঁটলে তো চোট পাবে।"

"তুমি কাগজ বিক্রি করতে সাইকেলে যেতে যে রাস্তায়..."

"ওরে বাবা! সেটা তো আরও বিপজ্জনক! গত চোদ্দো বছরে তাতে দু'বার ইট আর খোয়া পড়েছিল। সেসব কবে উঠে গিয়ে আবার গত্ত বেরিয়ে পড়েছে। তবে পঁয়ত্রিশ নম্বর হাইওয়ের থেকে এক দিক দিয়ে ভাল, গাড়ি কম যায়। ঠিক আছে, কাল থেকে ভোরবেলায় দু'জনে বেরোব। তুমি হাঁটবে, আমি দৌড়ব। প্র্যাকটিসটা রাখা দরকার।"

পরদিন ভোর পাঁচটায় তারা দু'জন বাড়ি থেকে বেরোল। রেললাইন পার হয়ে হরিহর ভট্চার্যের বন্ধ দোকানের সামনে নারান দাঁড়াল। এখন একশো ষাটটা কাগজ

হরিহর নিচ্ছে। বিলি করার জন্য দু'টো ছেলেকে রেখেছে। সেই পাঁচটা গ্রাম—শালকোনা, আন্দুলিয়া, ঝাউডাঙা, রঘুরামপুর, তুবড়িয়ায় সে একাই কাগজ বিলি করত, আর এখন কিনা লাগছে দু'জন। নারান আত্মপ্রসাদ বোধ করল।

ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি। আবছা রাস্তাটার দিকে আঙুল তুলে সে মহামায়াকে বলল, "এই রাস্তা দিয়ে বছরের পর বছর কাগজ নিয়ে গেছি আর ফিরেছি, প্রায় আটাশ মাইল...রোজ, একদিনও কামাই করার জো ছিল না, তা হলেই লোকে কাগজ পাবে না। চলো, হাঁটো।"

হাঁটতে হাঁটতে নারান বলে যেতে লাগল, জায়গাটায় কী কী বদল ঘটেছে। কোন কোন দোকান আর বাড়িগুলো নতুন হয়েছে। কোথায় একটা সজনে গাছ ছিল, কোন নারকেল গাছটাকে এতটুকু দেখেছে, কোন পুকুরটা ইট-ভাটার জন্য মাটি কাটতে তৈরি হল। ভাগাড় ছিল, শকুনি বসে থাকত, এখন সেখানে ধান চাষ হচ্ছে।

কথা বলতে বলতে নারান তার স্বভাবগত জোরে হাঁটা শুরু করে দিল। মহামায়া বার বার পিছিয়ে পড়ে আর ছুটে নারানের পাশে আসে।

"তুমি ছুটবে বলেছিলে, যাও ছোটো। আমি তোমার সঙ্গে হাঁটতে পারব না।"

"সেই ভাল।"

নারান পা থেকে চটি খুলে দু'হাতে নিল। মহামায়া হাত বাড়িয়ে বলল, "চটি হাতে ছুটবে কী? আমায় দাও।"

"সেই ভাল।...তোমার তো আধ ঘণ্টা হাঁটার কথা? দশ মিনিট হাঁটা হয়ে গেছে! আরও দশ মিনিট হাঁটবে, তারপর ফিরে আসতে দশ মিনিট। ঠিক এইখানে অপেক্ষা করবে, আমি এখনি ঘুরে আসছি।"

বিবর্ণ, গোড়ালির রবার ক্ষয়ে যাওয়া চটিজোড়া মহামায়ার হাতে দিয়ে, ধুতিটা একটু টেনে তুলে নারান ধীর গতিতে ছুটতে শুরু করল।

মহামায়া সামনে তাকিয়েই হাঁটতে হাঁটতে দেখল নারান ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে ছোট থেকে ছোট হয়ে। গাছপালা বাড়ির আড়ালে এক একবার অদৃশ্য হয়ে আবার বেরিয়ে পড়ছে। রাস্তাটা ডান দিকে ঘুরে ধানখেতের মাঝ দিয়ে শালকোনা গ্রামের দিকে গেছে। নারানকে সে আবার দেখতে পেল একই গতিতে ছুটছে।

পিছনে আকাশটা আলোয় ভরে উঠছে। পাখি উড়ছে। আনাজ নিয়ে গোরুর গাড়ি আসছে ধান্যকুড়িয়ার বাজারে। বাতাসে ভেসে রয়েছে মাটির গন্ধ। চারদিকে থমথমে স্তব্ধতা। মাথার উপর গাছের ডালে শালিক ডেকে উঠতে মহামায়া মুখ তুলে তাকাল আর তখনই একটা ইটের ডগায় হোঁচট খেয়ে সে পড়ি পড়ি হয়ে কোনওক্রমে টাল সামলাল।

তার চটির ফিতে ছিঁড়ে গেছে। এটা পরে আর হাঁটা সম্ভব নয়। দু'হাতে দু'জোড়া চটি নিয়ে মহামায়া আবার হাঁটতে শুরু করেই বুঝল, তার শরীর কষ্ট সহ্য করার যত ক্ষমতাই রাখুক না কেন, পায়ের তলার চামড়া তত রাখে না। কাঁকর আর ভাঙা ইটের টুকরো মাড়িয়ে হাঁটতে তার কষ্টই হচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল নারানের ফিরে আসার জন্য।

মিনিট চল্লিশ পরে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল নারান। মুখে ক্লান্তির চিহ্নমাত্রও নেই। মহামায়া কিছু বলার আগেই সে বলে উঠল, "শালকোনার বটগাছটা ছুঁয়েই চলে এলাম, দেরি হয়ে গেল,...তাড়াতাড়ি চলো, অফিস যেতে হবে...ক'টা বাজল?"

"ঘড়ি কোথায় পাব এই রাস্তার মধ্যে?" বহু কষ্টে ধরে রাখা ধৈর্য মহামায়া আর ধরে রাখতে পারল না।

"টেবিল-ঘড়িটা নিয়ে কাল বেরোব।"

"কাল আর বেরোনো হবে না, এই দ্যাখো।" মহামায়া চটিগুলো হাত থেকে ফেলে দিল। নিজের চটি পায়ে গলিয়ে নারান বলল, "কী হয়েছে?'

"ছিঁড়ে গেছে। খালি পায়ে এই রাস্তায় আমি হাঁটতে পারব না।"

"কই, আমার তো খালি পায়ে অসুবিধে হল না? কত লোকই তো খালি পায়ে...!"

"যারা পারে পারুক।" মহামায়া ছেঁড়া চটি কুড়িয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল।

"হাঁটার জন্য কেড্‌সই পরা দরকার। অফিস থেকে ফিরে তোমাকে নিয়ে আজই জুতোর দোকানে যাব।"

"হাতের একটা ঘড়িও কেনা দরকার। তা হলে সময়ের হুঁশ রেখে দৌড়তে পারবে।"

"অফিসে কো-অপারেটিভের লোনটা স্যাংশন হলেই কিনব।"

রাতে মহামায়াকে নিয়ে বাজারের একমাত্র জুতোর দোকানটায় নারান যখন পৌঁছল, তখন দোকান বন্ধের জন্য দরজার পাটা লাগানো হচ্ছে। দোকানি খদ্দের হাতছাড়া করতে চায় না। ওদের দুজনকে ভিতরে এনে বসাল।

নারান চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসল। তার পাশে বসল মহামায়া, খালি পা কাপড়ে ঢেকে। দোকানি নারানের পায়ের দিকে তাকাল।

"কেড্‌স দিন তো...আমার নয় ওর পায়ের।"

কথাটা বলেই নারানের মাথার মধ্যে ঢং ঢং করে দমকলের গাড়ির মতো ঘণ্টা বেজে উঠল। তার সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। তার মুখ দিয়ে কার গলার স্বর, কার বলা কথা বেরোল!

টোলুবাবু!...চোদ্দো বছর আগে, কোলেবাজারের পাশে জুতোর দোকানে ঢুকেই ঠিক এই কথা বলে উঠেছিলেন।...টোলুবাবু আপনি এখনও বেঁচে আছেন? আমার বুকের মধ্যে আপনি!

....'তুই এত পরিশ্রমী, তোকে দেখেও যে আনন্দ হয়!"

...টোলুবাবু আপনাকে আমি আনন্দে রাখব, যতদিন বাঁচব আপনাকে...।

'লিগ জেতার মতোই সুখ পাচ্ছি রে।'

টোলুবাবু আপনার মোহনবাগান বছর বছর লিগ পাবে না, কিন্তু আমি আপনাকে সুখ দেব...।

টোলুবাবু, টোলুবাবু, বাস্তু ছেড়ে এসে নতুন বাস্তু বসিয়েছি, আমার পরিশ্রম করার ক্ষমতা আছে, আপনাকে আমি বাঁচিয়ে রাখব, আনন্দ দেব...আপনি দয়া করে আমাকে ছেড়ে যাবেন না, আমি ঠিক সময়েই আপনার কাছে পৌঁছব...চার মিনিট

আঠাশ সেকেন্ডেই...

"এ কী! তোমার চোখে জল, কাঁদছ কেন? কী হল? বিড় বিড় করে কীসব বলছ?"

মহামায়া হাত ধরে ঝাঁকাতেই নারান ফ্যালফ্যাল করে দোকানদারের মুখের দিকে তাকাল, তারপর মহামায়ার দিকে। সম্বিৎ ফিরে আসতে, কাঁধের জামায় চোখ ঘষে সে শান্ত স্বরে বলল, "চোখের জল মানেই কান্না নয়। ছেচল্লিশ বছর বয়সে পুরুষমানুষ কি কাঁদে?...নীল নয়, সাদা রঙের কেড্‌সই আপনি দেখান।"

॥ ৬ ॥

কুড়ি বছর তারপর কেটে গেছে।

উনিশশো ছিয়াশির ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে এক সন্ধ্যায় নারান খেলার বিভাগে এল। মাত্র এক মাস আগে রিটায়ার করে সে ছ' মাসের জন্য এক্সেটনশন পেয়েছে।

দোতলা থেকে তিনতলায় উঠে এসেছে সংবাদ বিভাগ, সেই সঙ্গে রিপোর্টিং, প্রুফ রিডিং, টেলেক্স, খেলার বিভাগও। লম্বা হলঘরের এক কোনায়, পুরনো টেবিলটার দু পাশে আগের মতোই চেয়ার পাতা, কিন্তু পুরনো লোকেরা আর কেউ নেই। শৈলেনবাবু আর শ্যামলবাবুর পর আরও তিনজন লোক এসেছে। খুব অল্পবয়সি, নারান তাদের চেনে না।

মাণ্টাবাবু রিটায়ার করেছেন। অফিসের স্পোর্টসের দিন তিনি মাঠে আসেন, তখন দেখা হয়। প্রতিবারই বলেন, 'তুই আমাকে খুব ঠকান ঠকিয়েছিলি নারান। আটশো, চারশো আর দুশো, পর পর তিনটে রেসে নামতে চাওয়ায় আমি তো ভেবড়ে গেছলুম। তখন তোর বয়সের কথা ভেবে আমি তো রাজিই হইনি তোর এন্ট্রি নিতে। মনে আছে?" নারান শুনে যায় আর মিটমিটি হাসে আর বলে, "সে বছর যে ওলিম্পিকে জ্যাটোপেক তিনটে সোনা জিতেছিল!...আমাদের যে একই তারিখে জন্ম।" মাণ্টাবাবু হেসে শ্যামলবাবুকে বলেছিলেন, " বুঝলে শ্যামল, আমি বিরক্ত হয়ে ওকে বলেছিলুম, তুই কি জ্যাটেপেক হয়ে গেছিস ভেবেছিস?"

নারান সেদিন খেলার বিভাগে এসে দেখল একজন বসে কপি অনুবাদ করছে। একে সে দেখেছে, কিন্তু নাম জানে না। এ-ও বোধহয় তাকে চেনে না। দেয়ালের ধারে টুলে বসে আছে অমিয়। নারান তাকে জিজ্ঞেস করল, "শৈলেনবাবু, শ্যামলবাবু কখন আসেন?"

"এবার তো মাঠ থেকে আসার সময় হল। আপনি বরং শশধরবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, ওই যে টেবিলে বসে।"

নারান কুণ্ঠিতভাবে শশধরের পাশে দাঁড়াল। নমস্কার করে বলল, "আমার নাম নারান হালদার, এখানে বেয়ারার কাজ করি। অনেক দিন খেলার বিভাগে ছিলাম, তারপর স্টোরে। অনেক বিভাগ ঘুরে এখন পোস্ট বক্সে আছি। রবিবাবু, টোলুবাবু, মাণ্টাবাবু আমায় খুব ভালবাসতেন। আপনি বোধহয় ওদের দেখেননি।"

শশধর ভ্রূ কোঁচকাল। "নাম শুনেছি, মাণ্টাবাবু ছাড়া কাউকে দেখিনি।"

সংক্ষেপে জবাব দিল শশধর, নিরাসক্ত স্বরে। সে ধরে নিয়েছে, এই কৃশকায়, কৃষ্ণবর্ণ, আধময়লা হাফ-হাতা পাঞ্জাবিপরা লোকটি এবার পকেট থেকে চার ভাঁজ করা ময়লা একটি কাগজ বার করে বলবে, "পাড়ার ফাইভ এ সাইড রবারের বল ফাইনাল, খবরটা যদি একটু..."

"একটা খবর..."

"কিন্তু এসব আর ছাপা হয় না।" বিব্রত স্বরে শুরুতেই নারানকে থামিয়ে দিল শশধর।

থতমত নারান লাজুক গলায় বলল, "আজ্ঞে ছাপাতে নয়, একটা খবর জানতে এসেছি।"

শশধর এবার লজ্জা পেল, অপ্রতিভও বোধ করল। গত বছর অফিসের স্পোর্টসে এই নারান হালদারকে সে দৌড়তে আর প্রাইজ নিতে দেখেছে।

"কী খবর?"

"কাগজে দেখলুম, এ মাসের সাতাশে ক্রীড়া দিবস হবে। তাতে নাকি এমিল জ্যাটোপেক আর তার বউ ডানা কলকাতায় আসবেন।...সত্যি নাকি?"

"হ্যাঁ, সেইরকমই তো আমাদের বলেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী।"

"কোথায়, কখন ওঁদের দেখা যাবে, জানেন নাকি?"

"এখনও কিছু আমাদের জানানো হয়নি। হলে কাগজে নিশ্চয় দেখতে পাবেন। আজ বেঙ্গল অ্যামেচার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের একটা প্রেস কনফারেন্স আছে, শ্যামলদা গেছে। হয়তো জ্যাটোপেকের প্রোগ্রাম সম্পর্কে কিছু জানা যাবে।"

নারানের যা জানার তা জানা হয়ে গেছে। জ্যাটোপেকের আসার কথাটা তা হলে সত্যিই। টোলুবাবুকে একদিন বলেছিল, জীবনে এত বড় দুঃখ সে আর কখনও পায়নি। ওঁকে দেখার ওই প্রথম আর শেষ সুযোগ সে হারিয়েছে। তখন টোলুবাবু বলেছিলেন কোনটে বড় আর কোনটে ছোট দুঃখ, সে সবের হিসেব কষে শুধু মন খারাপ আর সময় নষ্ট হয়।...জীবনে এমন একদিন আসবে যখন জ্যাটোপেককে তোর আনইম্পর্ট্যান্ট মনে হবে।

তিরিশ বছর আগের সেই প্রথম আর শেষ সুযোগটা আবার তার সামনে আসছে। এবার আর সে হাতছাড়া করবে না। ট্রেনকে আর বিশ্বাস করবে না। যদি একদিন আগেও কলকাতায় গিয়ে থাকতে হয় তা হলেও সে শেয়ালদার স্টেশনে কিংবা অফিসে রাত কাটাবে।

ইলেকট্রিক ট্রেনে বাড়ি ফেরার সময় গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিরিশ বছর আগের সেই দিনটার কথা তার মনে পড়তে লাগল। ময়দান থেকে অফিসে ফিরে গেছিল নাইট ডিউটি করতে। টেবিলে আলোচনা হচ্ছিল জ্যাটোপেকের দৌড় নিয়ে।

মাণ্টাবাবু বললেন, "বুঝলেন রবিদা, জ্যাটোপেক যখন দৌড়চ্ছিল কীরকম একটা কষ্টের ছাপ ওর মুখে ফুটে উঠছিল। কাঁধটা, দুটো হাত, শরীর যেন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আছে, মনে হচ্ছিল এই বুঝি মাটিতে লুটিয়ে পড়বে!"

"মাণ্টা, এটাই ওর দৌড়বার স্টাইল। আসলে এত কষ্ট আর অসুবিধের মধ্যে ট্রেনিং করেছে যে মুখে হাসি ফোটাবার মতো অবস্থা ছিল না। ভাবতে পারো, জ্যাটোপেক যখন দু' বছর মিলিটারিতে ছিল, তখন জঙ্গলের মধ্যে ওর ক্যাম্পের কাছে শুধু চারশো মিটারের একটা মাটির রাস্তা ছাড়া দৌড়বার মতো কোনও জায়গা ছিল না। বৃষ্টিতে কাদায়, শীতকালে বরফে ঢাকা। তাই ভেঙে ভারী মিলিটারি বুট পরে আর শরীরের ওজন বাড়াবার জন্য ভারী ভারী ওভারকোট গায়ে দিয়ে, রুকস্যাক পিঠে বেঁধে দৌড় প্র্যাকটিস করত। ওই চারশো মিটার যাটবার তার মধ্যে দু'শো মিটার স্প্রিন্ট অর্থাৎ, চব্বিশ হাজার মিটার, মানে চব্বিশ কিলোমিটার ওইভাবে প্রতিদিন!"

"তার মানে প্রায় পনেরো মাইল, প্রতিদিন!" টোলুবাবু হাঁ করে তাকিয়ে থেকে ছিলেন।

"প্রতিদিন, দু'বছর! কাদায় পা আটকে যেত বলে তাই উঁচু করে হাঁটু তুলে দৌড়ত। এটাই পরে নতুন এক টেকনিক হয়ে যায়। স্পিডের জন্য জোরে দৌড় আর এনডিওরেন্সের জন্য বারবার রিপিট করা। দৌড়ের মধ্যে হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে কিছুটা ছুটে যাওয়া, তারপরই আবার সহজ ছন্দে ছুটতে থাকা। এটা নতুন ব্যাপার—একে ইন্টারভ্যাল রানিং বলে।"

শুনতে শুনতে নারান রোমাঞ্চ বোধ করেছিল। এইভাবে ট্রেনিং! ওর তো পেটের দায়, সংসার চালাবার দায় ছিল না, তা হলে এমন পাগলের মতো একা একা পরিশ্রম কীসের জন্য? রাতে ডিউটি করার পর খালি পেটে, শুধু চা আর এক আনার বিস্কুট খেয়ে আটাশ মাইল সাইকেল চালানো, নারানের মনে হল, জ্যাটোপেকের ট্রেনিংয়ের কাছে কিছুই নয়।

"টোলু, একজন জিজ্ঞেস করেছিল জ্যাটোপেককে, দৌড়বার সময় আপনার মুখে কষ্টের ছাপ ফুটে ওঠে। হাসতে পারেন না? তাইতে উত্তর দিয়েছিল: একই সঙ্গে দৌড় আর হাসি, এই দুটো জিনিস করার মতো যথেষ্ট প্রতিভা আমার নেই।"

কথাটা শুনে সবার সঙ্গে নারানও তখন হেসে উঠেছিল। ট্রেনে যেতে যেতে তিরিশ বছর আগের স্মৃতি মনে পড়ায় তার মুখে হাসি ফুটল। রাতের বনগাঁ লোকালের ভিড়ের মধ্যেও হাসি? নারান নিজেকে নিয়ে অবাক হল। জীবনের পিছন দিকে তাকালে এখন তার হাসিই পায়। কত জিনিস তুচ্ছ, অকারণ, বাহুল্য মনে হয়। যেমন, শিবুর দোকানে রসগোল্লার হাঁড়িটা ভেঙে ফেলার কোনও দরকার ছিল কি? শঙ্কর, নারু, শচীন হালদাররা কেউই আজ বেঁচে নেই। প্রাইজ হাতে নিয়ে গত মাসেও ফিরেছে, কেউ তাকিয়েও আর দেখে না।

"এমন একদিন আসবে যখন জ্যাটোপেককে তোর আনইম্পর্ট্যান্ট মনে হবে"...না না, টোলুবাবু, এটা আপনি ঠিক বলেননি। কিছু কিছু লোক, কিছু কিছু ঘটনা চিরকাল আমার কাছে ইম্পর্ট্যান্ট থেকে যাবে।...আমাকে কেড্‌স কিনে দেওয়া...।

"বসে পড়ুন দাদু, সিট খালি হয়েছে।" পাঞ্জাবির কোণ ধরে টানল এক ছোকরা। নারান বসে পড়ল।

এখন তার পাকা একতলা বাড়ি। প্রভিডেন্ট ফান্ডের হাজার পঞ্চাশ টাকা পাবে।

তখন দোতলা তুলবে। তিন বছর আগে সে টিভি কিনেছে। অবনী ডবলু বি সি এস হয়ে এখন বীরভূমে আছে বউ আর তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে। নবনী জোড়া নিমতলা স্কুলে সায়েন্সের মাস্টার। রজনী বি এস সি পাশ করে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি করছে। দু'বার ক্লাস এইটে ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়ে গৌতম এখন প্রথম ডিভিসনে ফুটবল খেলছে। মহামায়া প্রবল আপত্তি তুলেছিল, নারান তা নাকচ করে বলেছিল, "খেলাটাও তো এক ধরনের শিক্ষার ব্যাপার। যদি টাকা রোজগার করতে পারে তা হলে খেলুক না!" নয়নের বিয়ে হয়েছেই শুধু নয়, তার বড় মেয়ে শর্মিষ্ঠা এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। হাবড়া বাজারে জামাইয়ের কাটা ছিট কাপড়ের দোকান।

পরদিন কাগজে খেলার পাতায় নারানের চোখ আটকে গেল একটা খবরে— রবিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, সারা ভারত আমন্ত্রণী ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা! সল্ট লেক স্টেডিয়াম থেকে সকাল সাতটায় শুরু হয়ে আবার স্টেডিয়ামেই শেষ। "সমাপ্তি-সীমায় প্রতিযোগীদের অভিনন্দন জানাতে উপস্থিত থাকবেন জ্যাটোপেক-দম্পতি।"

নারান অনেকক্ষণ খবরটার দিকে তাকিয়ে রইল। তা হলে সত্যিই ওঁরা আসছেন। গড়ের মাঠে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে শনিবার দুপুর একটায় মিছিল বেরিয়ে যাবে সল্টলেক স্টেডিয়ামে। জ্যাটোপেক-দম্পতি এগারোটায় দমদমে নামবেন। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে ব্রিগেড প্যারেড মাঠে। তাঁরা মিছিলের সূচনা করবেন।

খবরের আর কিছু জানার দরকার সে বোধ করল না। এমিলকে যদি কাছ থেকে দেখতে হয় তা হলে ব্রিগেড মাঠের বিরাট ভিড়ের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। পরে ওঁদের সল্ট লেক স্টেডিয়ামেও নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু সেখানেও ভিড় হবে। ধাক্কাধাক্কিতে কোথায় যে ছিটকে যাবে তার ঠিকঠিকানা নেই। সে কাছের থেকে ওঁদের দুজনকে দেখতে চায়।

ঠিক তিরিশ বছর আগে, মোহনবাগান মাঠে ওঁর দৌড়ের ছবি বেরিয়েছিল কাগজে। ছবিটা নারান কেটে রেখে দিয়েছে। জ্যাটোপেক সম্পর্কে একটা লেখাও তখন বেরিয়েছিল, টোলুবাবুর লেখা। সেটাও সে কেটে রেখে দিয়েছে।

নারান খাটের নীচে হামা দিয়ে ঢুকে কবজা-ভাঙা একটা টিনের তোরঙ্গ বার করে আনল। এর মধ্যে তার পুরনো জিনিস রাখা আছে। নানারকমের রেশমের, পশমের ছেঁড়া জামা-কাপড়, কাঠের ভাঙা খেলনা, সাইকেলের টিউব, স্পোর্টসের স্মারক পুস্তিকা ঘেঁটে সে একটা খাম বার করল।

খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া কয়েকটা টুকরো। লালচে হয়ে গেছে। তারই একটা জ্যাটোপেকের দৌড়ের ছবি। সন্তর্পণে সে ভাঁজ খুলল। হাতকাটা গেঞ্জি, পায়ে জুতো। ওঁর পিছনেই খালি পায়ে একজন অনুসরণ করছে। দেখা যাচ্ছে ট্র্যাকের দাগ, ওলটানো একটা মাটির গ্লাস। পিছনে গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে দর্শকরা, মাটিতেও বসে আছে অনেকে। জ্যাটোপেকের মাথার সামনের দিকের চুল উঠে গেছে। তখন ওঁর

বয়স ছিল ছত্রিশ। নারানের মনে হল, এত বছর কেটে গেছে, এখন বয়স ছেষট্টি, নিশ্চয় টাক পড়ে গেছে! ডান পায়ের হাঁটু উঠিয়েছেন, উরুর পেশিতে একটা ভাঁজ। নারান অনুমান করতে পারল, কী প্রচণ্ড শক্তি ওই ভাঁজটা থেকে কুঁচকি পর্যন্ত ফুলে-ওঠা অংশে জমা হয়ে আছে।

কিন্তু দৌড়ের সময় ওঁর মুখে নাকি কষ্টের ভাব ফুটে ওঠে, অথচ খুব খুঁটিয়ে দেখেও সে তেমন কিছু খুঁজে পেল না। হয়তো সহজ রেস, তাই সহজ ভাবে দৌড়চ্ছেন। উনি তো জানেনই পৃথিবীতে তাঁকে হারাবার মতো কেউ তখন নেই। অফিসের স্পোর্টসে অমন আলগা মেজাজে সেও তো দৌড়ত। মুগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ ছবিটা দেখে সে কাগজের আর-এক টুকরো তুলে নিল।

টোলুবাবুর লেখা। চার ভাঁজ করে রাখা। খোলা মাত্র ভাঁজ থেকে কেটে আলাদা হয়ে গেল কাগজটা। সযত্নে আবার তুলে রাখতে গিয়ে সে কী মনে করে একটা টুকরো তুলে পড়তে শুরু করল:

'তারপর ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে ৫০০০ মিটার, ১০০০০ মিটার এবং ম্যারাথন দৌড়ে বিজয়ীর মঞ্চে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন দৌড়ের বিস্ময়, নব-ইতিহাসের স্রষ্টা এবং রক্তমাংসের বাষ্পীয় যান নামে অভিহিত করল তাঁকে বিশ্বের অগণিত নরনারী। পঞ্চদশ ওলিম্পিকের নতুন নামকরণ করল জনসাধারণ ওই বিজয়ী বীরের নামে—হেলসিঙ্কি ওলিম্পিক—জ্যাটোপেকের ওলিম্পিক।'

নারান আর একটা কাগজের টুকরো তুলে নিল।

'কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। স্বামীর কৃতিত্বে উদ্বেলিত হৃদয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন ওই দৌড়বীরের সাধ্বী স্ত্রী। সহধর্মিণী শুধু নন, সহকর্মিণী হিসাবে স্বামীর গৌরবকে আরও গৌরবান্বিত আরও মহিমান্বিত করার জন্য এগিয়ে এলেন বর্শা হাতে বীর নারী। বর্শা ছুড়ে দিলেন প্রিয় স্বামীকে স্মরণ করে। ঝলসিয়ে উঠল সূর্যকিরণে সেই বর্শাফলক। তির বেগে এগিয়ে চলল সেই বর্শা। শ্যামল কোমল দূর্বাদলের মধ্যে যখন সেই শাণিত বর্শার মুখ গিয়ে বিঁধল মাটিতে তখন বিচারকেরা বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন সেই কম্পমান বিদ্ধ বর্শার দিকে। ঘোষণা করা হল বর্শা নিক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নূতন ওলিম্পিক রেকর্ড। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের গৌরবে আলিঙ্গন করলেন একে অপরকে।'

পড়তে পড়তে আচ্ছন্ন হয়ে গেল নারান। কী মিষ্টি ভাব, কী মিষ্টি ভাষা দিয়ে টোলুবাবু লিখেছেন। চোখের সামনে যেন ঘটনাটা দেখা যায়।

"কী দেখছ অমন করে ছেঁড়া কাগজে?" মহামায়া পিছন থেকে বলল।

"কিছু না, পুরনো একটা খবর।" নারান কাগজগুলো যত্ন করে খামে ভরে পিছনে তাকাল।

"আজকের কাগজ কি পড়া হয়েছে? নবু চাইছে একটা খবর দেখার জন্য।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যাও।" কাগজটা মহামায়ার হাতে দেবার আগে সে আর-একবার খেলার পাতাটায় চোখ বোলাল। আমন্ত্রণী ম্যারাথন প্রতিযোগিতার খবরটার নীচে ঘন গভীর কালো অক্ষরে লেখা। লাইনগুলোয় তার চোখ আটকে গেল। 'সোমবার

সন্ধ্যায় সিটি ক্লাব তাঁবুতে জ্যাটোপেক-দম্পতিকে বাংলার অ্যামেচার অ্যাথলেটিক সংস্থা সংবর্ধনা জানাবেন। তিনি আরও বলেন তখন ম্যারাথন বিজয়ীর হাতে ট্রফি তুলে দেবেন সেই কিংবদন্তির মানুষটিই যিনি বলেছিলেন, 'দৌড়তেই যদি চাও তা হলে দৌড়ও এক মাইল। যদি অন্য এক জীবনের অভিজ্ঞতা চাও তা হলে দৌড়ও ম্যারাথন।'

অন্য এক জীবন!

কী সেই জীবন? কেমন সেই জীবন?...তার হাত থেকে কাগজটা তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মহামায়া। নারান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আবার ভাবল, এখন আমার বয়স ছেষট্টি, আর কী অভিজ্ঞতা, আর কী জীবন বাকি আছে?

সন্ধ্যার সময় সে খেলার বিভাগে অনাদিবাবুর সামনে দাঁড়াল।

"কী ব্যাপার নারান, অফিস স্পোর্টস তো হয়ে গেছে, তা হলে আবার যে তুমি...এবারই তো ছিল শেষবারের মতো মাঠে নামা?" অনাদিবাবু প্রশ্নটা করার সময় স্বর নামিয়ে নিলেন। নারান লক্ষ করল, ওঁর মাথার চাঁদিতে টাক পড়েছে। অনাদিবাবুর চাকরিও প্রায় তিরিশ বছর হতে চলল।

"নারানদাকে একটা ফেয়ারওয়েল দিতে হবে যেদিন ফাইনালি রিটায়ার করবেন।" শ্যামল বলল।

"স্পোর্টস থেকে না চাকরি থেকে রিটায়ারমেন্টের ফেয়ারওয়েল, শ্যামল?" শৈলেন পকেট থেকে নোটবই বার করে টেবলে রাখল। "নারানদাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, আরও বছর দশেক প্রাইজগুলো নিতে পারেন।...শশধর মোহনবাগান টু ফিফটি টু অল আউট, অরুণলাল হাড্রেড টেন।...আমি ক্যান্টিন থেকে ঘুরে আসছি।"

"একটা কথা ছিল অনাদিবাবু।" নারান ঝুঁকে, লাজুক স্বরে বলল, "খবর দেখলাম, একটা আমন্ত্রণী ম্যারাথন প্রতিযোগিতা হবে, জ্যাটোপেক তার ফিনিশিংয়ে রানারদের অভিনন্দন জানাবেন।...সত্যি?"

"ও অ্যাথলেটিক্সের ব্যাপার, তুমি বরং শ্যামলকে জিজ্ঞেস করো। ওই খবরটবর করে।"

নারান টেবল ঘুরে শ্যামলের পাশে গেল।

সে জিজ্ঞেস করার আগেই শ্যামল বলল, "হ্যাঁ, জ্যাটোপেক থাকবেন ফিনিশিং পয়েন্টে।"

"অভিনন্দন জানাবেন...মানে হ্যান্ডশেক করবেন?"

"হ্যান্ডশেক করবেন কি আলিঙ্গন করবেন, তা আমি কী করে বলব? হয়তো গালে চুমুও খেতে পারেন...সাহেব তো!" শ্যামল গোছা করা কপি টেনে নিল।

"আমি ম্যারাথনে নামব...ব্যবস্থা করে দেবেন?"

এত মৃদু স্বরে নারান কথাটা বলল যে, টেবলের কেউই শুনতে পেল না। সে সেকেন্ড কুড়ি অপেক্ষা করে, একটু জোরে বলল, "যে ম্যারাথনটা হবে তাতে আমি দৌড়তে চাই...শ্যামলবাবু আপনার তো চেনাশোনা..."।

"কী বললেন?" সিধে হয়ে বসল শ্যামল। "আর একবার বলুন!"

"ম্যারাথনে আমি দৌড়ব।"

নারান এবার স্পষ্ট স্বরে বলল। তিনজনের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে, পাতলা হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে আবার বলল, "কোথায় কাদের কাছে নাম দিতে হবে জানি না। আমায় দেখলে হয়তো তারা নাম নিতে রাজি হবে না, তাই আপনাদের সাহায্য চাই।"

কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। তিনজনই তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। অবশেষে অনাদিবাবু একটু বিরক্ত স্বরেই বললেন, "নারান এটা অফিসের স্পোর্টস নয়...ম্যারাথন কী জিনিস জানো?"

"ছাব্বিশ মাইল তিনশো পঁচাশি গজ..."

"দূরত্বটা কতখানি সে সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে?" শ্যামল জানতে চাইল।

"প্রায় অতটাই আমি রোজ সাইকেল চালিয়ে কাগজ বিলি করেছি, আট বছর ধরে।"

"কবে?" শশধর তার জ্যেষ্ঠদের কথার মাঝে নিজের প্রশ্নটা গুঁজে দিল।

"তা প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে।"

"আর তারই জোরে আপনি এখন ম্যারাথন দৌড়তে চান?" শ্যামল ভ্রূ তুলে, কপালে ভাঁজ ফেলে তেরছা চোখে তাকাল।

"গত কুড়ি বছর ধরে রোজ সকালে আমি দৌড়ই। আমার বউ হাঁটে।...কুড়ি বছর ধরে, আমরা দু'জনে...বৃষ্টি হলে অবশ্য বেরোই না, মাটি পিছল হয়ে থাকে।"

"ক' মাইল দৌড়ন?"

"তা কি আমি মেপে দেখেছি? পাঁচটার সময় বেরোই, সাড়ে ছ'টার মধ্যে ফিরে আসি। বউকে রান্না করতে হবে, আমাকে অফিসের ট্রেন ধরতে হবে তো।"

"দেড় ঘণ্টা! তার মানে...।" শ্যামল জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অনাদিবাবুর দিকে। ওই সময়ের মধ্যে কতটা দৌড়োনো সম্ভব সেটারই আন্দাজ পাবার জন্য সে সাহায্য চাইছে।

"দেড় ঘণ্টায় কতটা দৌড়বে, শশধর?" অনাদিবাবু সাহায্য চাইলেন, বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকা শশধরের কাছে।

"দেড় ঘণ্টায়...তা ধরুন গিয়ে...এখন তো পুরুষদের ম্যারাথন দু'ঘণ্টা দশ মিনিটে দৌড়োনোটাই ইন্টারন্যাশনাল স্টান্ডার্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।" শশধর গাম্ভীর্য টেনে দিল মুখের উপর।

"তুমি কি বলতে চাও, নারান রোজ একটা থ্রি-ফোর্থ ম্যারাথন দৌড়য়? কী যে বলো!"

"না না তা বলছি না," শশধর কাঁচুমাচু হল। "নারানদের পক্ষে...আচ্ছা এখন আপনার বয়স ঠিক কত?"

"ছেষট্টি।"

"অ্যাঁ!" শুধু শশধরেরই নয়, আরও দু' জোড়া চোখ নারানের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

"পুরো ছেষট্টি নয়, এখনও সাতমাস বাকি। ওঁর আর আমার জন্ম তারিখ একই, উনিশে সেপ্টেম্বর।" নারানের স্বরে ঈষৎ গর্ব চাপা রইল না।

"ওঁর মানে? শ্যামলের প্রশ্ন।

"জ্যাটোপেকের।"

"কিন্তু নারান, এই বয়সে তুমি ম্যারাথনে নামবে! কেন? এখন তো বানপ্রস্থে যাবার কথাই তোমার ভাবা উচিত।"

"অনাদিবাবু, আজীবন সংসারের জন্য খেটে এসেছি। বানপ্রস্থ ফ্রস্থ নিয়ে মাথা ঘামাবার টাইম আর পেলাম কই? ম্যারাথন মানে তো অন্য এক জীবনের অভিজ্ঞতা পাওয়া! এইটে পাওয়া হলেই রিয়াটার করব সব জায়গা থেকে।...আমার জন্য যদি আপনারা একটু ব্যবস্থা করে দেন।" নারান হাত জোড় করল।

নারানের কণ্ঠস্বরে এমন এক মিনতি, উৎকণ্ঠা, অসহায়তা আর সারল্য মিলিয়ে রয়েছে যা প্রত্যেকের মন ছুঁয়ে গেল।

শ্যামল বলল, "ঠিক আছে, নারানদা কাল আপনি ঠিক ছ'টায় সিটি টেন্টের সামনে থাকবেন। ওখানেই অ্যাথলেটিক্সের কর্তাদের পাওয়া যাবে। আমি আপনাকে নিয়ে গিয়ে কথা বলব। তবে একটা কথা, ওরা যদি আপনার বয়সের জন্য রিস্ক নিতে না চায়, তা হলে কিন্তু আমি কিছু করতে পারব না।"

"নারানকে তো অনায়াসে পঞ্চাশ বলে চালানো যায়, যায় না শশধর? ওর মুখের চামড়া কোঁচকায়নি, ঝুলে পড়েনি। চুল তো সবই কালো শুধু কয়েকটা মাত্র সাদা হয়েছে।" অনাদিবাবু বললেন।

"কিন্তু ওরা পঞ্চাশ বছর বয়সিকেও কি দৌড়তে দেবে?" শশধর সন্দেহ প্রকাশ করল।

"দেখা যাক। নারানদা তা হলে কাল ছ'টায়, সিটি টেন্টের সামনে।"

নারান যখন চলে যাচ্ছে, ওরা তিনজনই মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখতে লাগল।

"রোজ দেড়ঘণ্টা দৌড়োনো কি সোজা ব্যাপার! অতক্ষণ হাঁটতে বললে তো পারব না।"

"এই বয়সে!"

"গাঁজা দিয়ে গেল না তো।"

পরদিন সাড়ে পাঁচটা থেকেই নারান দাঁড়িয়ে রইল সিটি টেন্টের সামনে। শ্যামল এল ছ'টায়।

"দেরি হয়ে গেল। চলুন ক্যান্টিনে চা খাওয়া যাক। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন তো...যা ট্র্যাফিকের অবস্থা!"

চা খেতে খেতে শ্যামল নিচু গলায় বলল, "বয়স টয়স যা বলার আমি বলব, আপনি শুধু সায় দিয়ে যাবেন।"

চা খাওয়ার পর শ্যামল তাকে টেন্টের বাইরে একটা চেয়ারে বসিয়ে রেখে ভিতরে গেল। নারান দুরু দুরু বুকে তাকিয়ে রইল। জনা চারেক লোক টেবলে, শ্যামল তাদের

সঙ্গে কথা বলছে। নোটবই বার করে কী সব টুকতে লাগল। নারানের মনে হল, শ্যামলের সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা যথেষ্টই ভাল, বন্ধুর মতোই।

মিনিট-পনেরো পর শ্যামল তার কাছে এসে বলল, "হয়ে যাবে। এন্ট্রি ফর্মটা নিন।"

ফর্মটা হাতে নিয়ে নারান অবিশ্বাসীর মতো দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল, "হবে? সত্যি!"

"হবে না? এত মিথ্যে কথা তা হলে কী জন্য বললুম! দিল্লিতে ম্যারাথনে ফিফটিন্থ, পুণে ম্যারাথনে এইটিন্থ, আপনি তো উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরের লোক, এখন বাংলায় থাকেন...সার্টিফিকেট দেখাবেন কী, আমার মুখের কথাই তো যথেষ্ট! আসলে কী জানেন—"নারানের কনুই ধরে শ্যামল তাকে টেনে আনল বাইরে ফুটপাথে। "আসলে যত এন্ট্রি পাবে ভেবেছিল তা আর পাচ্ছে না। বাংলার প্রথম সারিতে পড়ে যারা, তারা নামছে না। বলল, বাইরে থেকে বিরাশি জন আর বাংলার বাহান্ন জন, মোট একশো চৌত্রিশ জন নামবে। কিন্তু কথা শুনে মনে হল এর অর্ধেকও হবে না। প্রাইজ মানি নেই তো, তাই নামকরাদেরও কোনও উৎসাহ নেই।...আপনার বয়স সম্পর্কে আমি কোনও উচ্চবাচ্য করিনি। যা বলার এন্ট্রি ফর্মে লিখে দেবেন।"

"কিন্তু জ্যাটোপেকের সামনে ফিনিশ করবে, এর থেকে বড় প্রাইজ আর কী হতে পারে!" নারান অবাক হয়ে তাকাল শ্যামলের দিকে।

"আরে দূর! জ্যাটোপেকের নামই এরা শোনেনি। আপনাদের সময়ের হিরো ছিল বলে কি এখনও তাই থাকবে? খেলার দুনিয়ায় আজ যে ওয়ার্লড রেকর্ড করে হিরো, কালই আর একজন সেটা ভেঙে দিয়ে হিরোকে জিরো করে দিচ্ছে।"

"কিন্তু জ্যাটোপেকের তিনটে বড় দৌড় সাতদিনের মধ্যে জেতা...আজও তো পৃথিবীতে কেউ পারল না!"

"পারবে। স্পোর্টস টেকনোলজি তেমন অ্যাথলিট ঠিকই তৈরি করে দেবে। বাহান্ন সালে মানুষ মহাকাশে যাবার কথা ভাবতেই পারেনি আর এখন তো ডজন ডজন যাচ্ছে আর আসছে।"

নারান চুপ করে গেল । শ্যামলের কথাগুলো মিথ্যে নয়। তবু সে কেন জানি মন থেকে সায় দিতে পারল না। মানুষের শরীরের এতবড় একটা কৃতিত্ব বিজ্ঞান ভেঙে দেবে?

পরদিনই সে এন্ট্রি ফর্ম পূরণ করে শ্যামলের হাতে দিল জমা দেবার জন্য।

॥ ৭ ॥

রবিবার সকাল সাতটায় যখন তারা সল্ট লেক স্টেডিয়ামের ফটকের সামনে দাঁড়াল তখন অল্প কয়েকজন অফিসিয়াল ছাড়া আর ছিল বেলেঘাটার স্থানীয় কয়েকজন দর্শক। নারান গত রাত্রেই এসে স্টেডিয়ামের একতলায় একটা বড় ঘরে অন্যদের সঙ্গে ছিল।

নারান ছেলেদের কিছু বলেনি। সে ধরেই নিয়েছে, বললে অবশ্যই ওরা তাকে

ম্যারাথন দৌড়তে বাধা দেবে। শুধু মহামায়াকে সে বলেছিল, "একটা রোড রেস হবে কলকাতায়। অফিসের তিন-চারজন নাম দিয়েছে, আমিও দিয়ে দিলাম।"

"কতটা দৌড়তে হবে?" মহামায়া জানতে চায়।

"বেশি নয়, দু' মাইল। ভোরবেলায় শুরু হবে, তাই রাতে ওখানে গিয়ে থাকতে হবে। থাকার জায়গা ওরাই দেবে, খাওয়াও। আমাকে নিয়ে যেতে হবে বিছানা আর মশারি। তুমি হাওয়া-বালিশ, সুজনি আর আলোয়ানটা দাও। মশারি লাগবে না। একটা রাত তো, কত আর কামড়াবে!"

"কী প্রাইজ দেবে? রুপোর কাপ?"

"হ্যাঁ। তবে আমি পাচ্ছি না। এই বয়সে কি জেতা যায়!"

"মোটে দু' মাইল তো! একটু জোরেই শুরু থেকে ছুটবে।"

মহামায়ার অলক্ষে নারান হেসেছিল।

শনিবার সে অফিসে ছুটি নিল। দুপুরে ঘুমিয়ে ছ'টা চব্বিশের ট্রেন ধরল। বিধাননগর স্টেশনে নেমে উল্টোডাঙা—ভি আই পি রোডের মোড়ে এসে দেখল প্রচুর লোক। হেঁটে, লরিতে তারা ফিরছে। একজনের কাছে শুনল, এমন মিছিল হয়েছে যে সারা কলকাতায় ট্র্যাফিক জ্যাম! লোকেদের খুব অসুবিধা হয়েছে। ব্রিগেড প্যারেড মাঠ থেকে সল্ট লেক স্টেডিয়াম প্রায় আট মাইল পথ। স্কুলের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা হেঁটে আসতে পারছিল না। অনেকে কান্না জুড়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যার পরও মিছিলের শেষভাগ স্টেডিয়ামে পৌঁছতে পারেনি।

ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে স্টেডিয়ামের দিক থেকে যারা হেঁটে ফিরে আসছে তাদের একজনকে সে জিজ্ঞেস করল, "জ্যাটোপেক এসেছেন কি?"

"আরে দূর মশাই জ্যাটেপেক! ব্রিগেড গ্রাউন্ডে অপেক্ষা করে করে শুনলাম তাঁর প্লেন সাড়ে চারঘণ্টা লেট। এতটা পথ হেঁটে এসে আর মশাই পারছি না। স্টেডিয়ামের কাছে যা ভিড়, ধাক্কাধাক্কি, তাতে আর ভেতরে যেতে ইচ্ছে করল না। কাগজে কাল ছবিতেই ওঁকে দেখে নেব।"

লোকটিকে বিরক্ত, ক্লান্ত দেখাচ্ছে। নারান আর কোনও প্রশ্ন না করে ইস্টার্ন বাইপাস ধরে হাঁটতে শুরু করে। যত এগোচ্ছে ভিড় ততই বাড়ছে। বিছানার পোঁটলাটা বগলে নিয়ে চলতে অসুবিধা হচ্ছে। রাত বেশি হয়ে যাবার ভয়ে, ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা স্টেডিয়ামে না ঢুকেই ফিরে যাচ্ছেন। নারানের মনে হল, এত বিশৃঙ্খলা বোধহয় সে জীবনেও দেখেনি।

স্টেডিয়ামটা সে দেখতে পাচ্ছে। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। থোকা থোকা বেলুন, পতাকা। দেখে নারানের মন ভরে উঠল খুশিতে, শরীরে চনমনানি লাগল।

"ভাই, জ্যাটোপেক কি এসেছিলেন?" নারান মাঝবয়সি একজনকে জিজ্ঞেস করল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ, অল্প অল্প ঠাণ্ডা, কিন্তু লোকটি ঘামছে।

"হ্যাঁ। এই তো চলে গেলেন।"

"চলে গেলেন!" নারানের ভিতরটা চোপসানো বেলুন হয়ে গেল। দেখা হল না। "একটু দেরি হয়ে গেল।" আপনমনে সে বলল।

লোকটি অবাক হয়ে বলল, "একটু বলছেন কী, জ্যাটোপেকের প্লেন কত দেরি করে এসেছে জানেন?"

"সাড়ে চারঘণ্টা, শুনলাম।"

"তবে? তার ওপর এই মিসম্যানেজমেন্ট।"

"ওঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে তো?" উৎকণ্ঠিত দেখাল নারানকে।

"নিশ্চয় হয়েছে। আমি কিছুই দেখতে পাইনি। বক্তৃতার একটু একটু কানে এল, এই পর্যন্তই।" লোকটি পা বাড়াল যাবার জন্য, নারান তার হাত টেনে ধরল।

"কী বললেন?"

লোকটি হাত ছাড়িয়ে বিরক্তভাবে বলল, "শুধু টাকা রোজগারটাই খেলোয়াড়-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।" লোকটি চলে যেতে গিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়াল। "আর একটা কথা বলেছেন, "একজন অ্যাথলিট আসলে একজন ডাকপিওনের মতো। তার সামাজিক দায়িত্ব আছে। সেটা পালনের জন্য তাকে দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে। এখন আর খেলা শুধুই মজার জিনিস নয়।"

লোকটি ভিড়ে মিশে যাবার পরও নারান তাকিয়ে ছিল। কথাগুলোর অর্থ সে ধরতে পারছে না। অ্যাথলিট দরজায় দরজায় ঘুরে ডাকপিওনের মতো কড়া নেড়ে চিঠি পৌঁছে দেবে, মানে খবর পৌঁছে দেবে। কী খবর পৌঁছে দেবে? স্পোর্টসম্যান হও! জীবনের সর্বক্ষেত্রে খেলোয়াড়ি মনোভাব দেখাও! জীবনে হারজিতকে সমানভাবে হাসিমুখে মেনে নাও...এইসব খবর কি পৌঁছে দেওয়া খেলোয়াড়দের কাজ?

রাতে বড় হলঘরে সারি দিয়ে শোওয়া অ্যাথলিটদের সঙ্গে নারানও আলোয়ান মুড়ি দিয়ে শুয়ে ভেবে যাচ্ছিল। তার কানে এল একজনের নিচুগলার কথা: "আমি তো দশ-বারো মাইল দৌড়েই বসে যাব। কী লাভ বল এইসব আজেবাজে কম্পিটিশনে মিছিমিছি দৌড়ে? কী পাব? একটা সার্টিফিকেট আর কিছু স্যুভেনির! তার জন্য এই পরিশ্রম করব কেন?"

"ঠিক বলেছিস। ন্যাশানাল মিট হলেও নয় কথা ছিল, চাকরিতে কিছু সুবিধে করা যেত। স্টেট আমাকে কী দেয় যে বাংলার হয়ে নামব? ন্যাশনাল মিটে আমার সিলেকশন পাওয়ার জন্যই তো তুই এখানে নামছিস? আমার ওসব চিন্তা নেই, আমি অটোমেটিক সিলেকশন পাব আমার অফিস স্টিল অথরিটি থেকে।"

"বাংলা থেকে ক'জন কাল নামছে জানিস? মোটে বারোজন!"

"বলিস কী!"

"হ্যাঁ। এর মধ্যে আট জন জীবনে কখনও আগে ম্যারাথনই করেনি। বোঝ তা হলে?"

"বারোজনে আটজন নভিস?"

"শুধু তাই নয়, কাউকে বলিসনি, আমি খুব ভাল জায়গা থেকেই শুনেছি, তার মধ্যে একজনের বয়স নাকি ষাটের ওপরে!"

"সেরেছে। পথেই কোলাপ্স করে, মরে টরে না যায়!"

"ফিনিশ করার সময় বেঁধে দিয়েছে—দু' ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট। ওর মধ্যে পৌঁছতে না পারলে রাস্তা থেকেই কম্পিটিটারদের তুলে নেওয়া হবে। দেখা যাক, অতক্ষণ ক'জন দৌড়তে পারে।"

দাঁতে দাঁত চেপে নারান শুনল এই কথোপকথন। মুখ ঢাকা আলোয়ানটা আর একটু টেনে সে কাত হয়ে গেল। কাল তাকে শেষ করতেই হবে। কিছুতেই সে নিজেকে তুলে নিতে দেবে না। যেভাবেই হোক।...হেঁটে হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে...যেভাবেই হোক, সে দরজায় দরজায় যাবে...কড়া নাড়বে। খট্ খট্ খট্...খট্...খট্...খট্...। কড়া নাড়তে নাড়তে নারান ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল সাতটায় স্টেডিয়াম-ফটক থেকে রওনা হল সাতান্নজন। নারানের বুকে আঁটা নম্বর হল: ৫১। শ্যামলবাবু তা হলে ঠিকই বলেছিলেন, যা বলেছিল কর্তারা, তার অর্ধেকও হয়নি। নারান একটু দমে গেল। তার চারপাশে সবাই অচেনা। যে রাস্তা দিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে সেটা অবশ্য তার চেনা। বাসে কয়েকবার সে ধান্যকুড়িয়া থেকে কলকাতায় এসেছে।

দৌড়ের রুট খুব সহজ। প্রথমে দক্ষিণ মুখে রওনা। ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ডাইনে বেলেঘাটা মেইন রোড। তারপর আবার ডাইনে ফুলবাগান। এরপর সোজা উত্তরে দমদম এয়ারপোর্টের রাস্তা ধরে, সি আই টি রোড কাঁকুড়গাছি মোড়, উল্টোডাঙার মোড়, কেষ্টপুর মোড়, বাগুইআটি মোড়, কৈখালি পিছনে ফেলে যশোর রোড। ডান দিকে পুবে ঘুরে মধ্যমগ্রাম, বারাসত যাবার বাসরুট ধরে, এয়ারপোর্টের পাঁচিল ডানদিকে রেখে ছুটতে হবে। তারপর একসময় আসবে একটা মোড়। যশোর রোড বাঁ দিকে ঘুরে মধ্যমগ্রামের দিকে, আর একটা রাস্তা সোজা গিয়ে গঙ্গানগরের মধ্য দিয়ে কাটাখালের পোল পার হয়ে বাঁ দিকে ঘুরে আবার মিশেছে যশোর রোডে। এই কাটাখালের পোল পর্যন্ত গিয়ে ম্যারাথনারদের ফিরে আসতে হবে সল্ট লেক স্টেডিয়ামে।

মন্থরভাবে সবাই শুরু করল। নারান রয়েছে ঝাঁকের মাঝে। এত লম্বা রেসে আরম্ভ থেকেই কেউ জোরে দৌড়য় না। দম যাতে শেষ পর্যন্ত থাকে, সেটাই আগে দেখতে হবে। নারান ঠিকই করে রেখেছে, কোনওভাবেই জোরে ছোটার জন্য প্রলোভিত হবে না। কচ্ছপ আর খরগোশের গল্পটা আজ সকালেও তার মনে পড়েছে। তাকে স্লো আর স্টেডি থাকতে হবে।

নারান ফুলবাগানের মোড় থেকে দেখল সে সবার পিছনে। সবার আগে সাদা পতাকা বাঁধা একটা মোটর, তার আগে একটা পুলিশভ্যান। প্রথমে যাচ্ছে যে রানার সে তাকে দেখতে পেল না। দেখার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। তার সামনে শুধু অনেক মাথা আর কাঁধ, দুলছে, ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে উঠছে। যাক সবাই এগিয়ে, সে প্রাইজ জেতার জন্য দৌড়চ্ছে না।

ফুটপাথে লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, বারান্দায় বাচ্চা-বুড়ো, মেয়েরা। রবিবার সকালে ছুটির মেজাজ। এখন হালকা রোদ। নারানের কষ্ট হচ্ছে না। সে একই গতিতে দৌড়ে পৌঁছল উল্টোডাঙার মোড়ে। সামনেই একটা ব্রিজ। বোর্ডে লেখা রয়েছে: নজরুল

ইসলাম সরণি। লোকে এটাকেই ভি আই পি রোড বলে।

"দাদা, আরও জোরে ছুটুন। সবাই যে এতক্ষণে লেকটাউনে পৌঁছে গেছে।" একজন চেঁচিয়ে বলল।

"লেকটাউন কী বলছেন! প্রথম ঝাঁকটা কতক্ষণ আগে গেছে জানেন?" আর একজন বলল।

নারান মাথা নামিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। শুনতে চায় না সে। এগুলোই প্রলোভন। এই সব কথাবার্তাই ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়, তাতিয়ে দেয়। সে কোনও কথা শুনবে না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবে না। রোজ সকালে যেভাবে দৌড়য় সেইভাবেই দৌড়বে।

মাথাটা একটু বাঁকিয়ে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে নারান ছুটে চলল। পাশ দিয়ে বাস, মোটর, ট্রাম ছুটে যাচ্ছে। গাড়ির জানলা দিয়ে কৌতূহলী মুখ তাকে দেখছে। সে ভ্রূক্ষেপ করল না।

একটা মোটরবাইকে দু'জন অফিসিয়াল। তার পাশে এসে গতি মন্থর করে বলল, "শেষ করতে পারবেন তো?"

"হ্যাঁ।" নারান ওদের দিকে তাকাল না।

"দু'ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ফিনিশ করতে হবে, না হলে কিন্তু তুলে নেওয়া হবে গাড়িতে।" বলেই ওরা বিকট শব্দ করে মোটরবাইকটা চালিয়ে দিল। নারান একবার মুখ তুলে দেখল, সামনে কোনও রানার আর চোখে পড়ল না।

রাস্তার ধারে টেবল পেতে গ্লুকোজ মেশানো জল, বরফ নিয়ে ভলেন্টিয়াররা রয়েছে। তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু খাওয়াটা কি উচিত হবে? ঘাম দিচ্ছে শরীরে। গেঞ্জি সপসপ করছে। সে একটা গ্লাস তুলে নিল।

"খুব পিছিয়ে আছেন।"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না দাদা, যেমন যাচ্ছেন যান। ফিনিশটা করুন।"

"একটু হুঁশিয়ার থাকবেন। যশোর রোডে লরি আর বাস বড্ড বেপরোয়া চলে।"

গ্লাস রেখে মাথা হেলিয়ে হেসে নারান আবার ছুটতে শুরু করল। ফুসফুস সমান তালে কাজ করছে। উরু আর পায়ের গোছ ভারী লাগছে না। নারান নিরুদ্বিগ্ন বোধ করল। এয়ারপোর্ট হোটেল ছাড়িয়ে ডান দিকে ঘুরে সে আটকে গেল বাস আর সাইকেল রিকশর ভিড়ে। ট্র্যাফিক দেখার জন্য বিশেষ পুলিশ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আর কোনও রানার নেই ভেবে তারা ঢিলে দিয়েছে।

এইবার রাস্তা সত্যিই বিপজ্জনক। পিচবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে ছুটতে তার ভয় করল। পিছন থেকে যে কোনও সময় গাড়ির ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সে রাস্তার ধারের মাটির কাঁচা পথ ধরে ছুটতে শুরু করল। এখানেও পদে পদে বাধা। মানুষজন রিকশ, গোরুর গাড়ি, বাজার—ছোটা অসম্ভব।

এইবার তার বাঁ হাঁটুতে সামান্য একটা চিড়িক দিল। থমকে থমকে ছোটার জন্য তো বটেই, দু' বার গর্তে পা পড়েছিল। পতন সামলাতে গিয়ে হাঁটুতে ধাক্কা লাগে। কাঁচারাস্তা ছেড়ে সে এইবার পিচের রাস্তায় উঠল। এখানেও ভাঙাচোরা, পাথরকুচি

ছড়ানো। তবু কাঁচারাস্তার থেকে তো ভাল!

বিশাল একটা প্লেন নামছে তার মাথার উপর দিয়ে। এত কাছ থেকে নারান কখনও প্লেন দেখেনি। বড় একটা সাদা পাখির মতো ডানা ছড়িয়ে হালকাভাবে ভেসে এল। জানলায় মুখ দেখা যাচ্ছে। মেঘ গর্জনের বদলে একটা তীক্ষ্ণ শিশের মতো শব্দ করে রানওয়েতে চাকা ছুঁইয়েই ঝাঁকুনি খেল। নারান দেখতে দেখতে দৌড়চ্ছিল, এবার মুখ ফিরিয়ে সামনে তাকিয়েই অবাক হল।

পুলিশের জিপ তার পিছনে ছ-সাতজন রানার ফিরে আসছে গঙ্গানগর থেকে। তাকে দেখে সবাই তাকাল। দু-তিনজন হাত তুলল। সবাই অল্পবয়সি। মাথায় টুপি, রোদ থেকে চোখ বাঁচানোর জন্য। আঠারো, চব্বিশ, ছাব্বিশ...এই ক'টা নম্বর সে পড়তে পারল।

যাক। জোয়ান ছোকরারা আগে যাবে না তো কি ছেষট্টি বছরের বুড়ো প্রথমে যাবে!

আর একটু এগিয়ে সে আরও কয়েকজনকে ফিরতে দেখল। সেই মোটরবাইক আবার তার কাছে এল।

"এইভাবে চললে ফিনিশ করবেন কখন? তেইশ জন ইতিমধ্যেই গাড়িতে উঠে পড়েছে।"

"উঠুক...আমাকে নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না...আমি শেষ করবই।"

"কবে? আজকেই কি?" অধৈর্য, বিরক্ত প্রশ্ন।

নারান হাসল।

"আমরা কি সারাদিন স্টেডিয়ামে বসে থাকব ভেবেছেন?"

নারান জবাব দিল না। মোটরবাইক চলে গেল। আরও কয়েক জন রানার ফিরে চলেছে। ক্লান্ত পদক্ষেপ, চোখ মুখ বসা। দেখে মনে হল, আর একটু পরেই এরা বসে যাবে। একজন হুমড়ি খেয়ে রাস্তার উপর উপুড় হয়ে পড়ল। তাকে পাশ কাটিয়ে অন্যরা এগিয়ে গেল। কেউ ফিরে তাকালও না। একটা ভ্যান এসে দাঁড়াল। রানারটিকে দু'জন লোক ধরে তুলছে। নারানও আর তাকাল না। তাকে এখন অনেক পথ দৌড়তে হবে।

গঙ্গানগর কাটাখাল থেকে ফেরার সময় সে অনুভব করল, শরীরে গোলমাল ঘটছে। কোমরের পিছন দিকে একটা খচ-খচানি শুরু হয়েছে। আগে কখনও এখানে ব্যথা হয়নি। আজই প্রথম। বাঁ পায়ের ডিমের কাছে শিরাটা মাঝে মাঝে টেনে ধরছে। কেড্‌সটা গরম হয়ে পায়ের তলা জ্বালা করছে। ফোসকা পড়ার মতো অবস্থা। রোদ্দুরে চোখ-করকরানি শুরু হয়েছে।

এইবার ক্লান্ত লাগছে। উরু দুটো ভার ভার লাগছে। একটু দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নেবে কি? নারান মনে মনে ইতস্তত করল। এখন ক'টা বাজে?

না, ঘড়ি দেখবে না। আর সেজন্যই তো সে বাড়িতে হাতঘড়িটা রেখে এসেছে। সময় নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। তার দরকার দৌড়টা শেষ করা...জ্যাটোপেকের

সামনে।

"ছোটো...ছোটো...নারান হালদার, ছোটো।" বিড়বিড় করে সে নিজেকে বলল।

পায়ের জ্বালাটা এবার অসহ্য লাগছে। নারান উবু হয়ে বসে কেড্‌স জোড়া খুলে হাতে নিয়ে, খালি পায়েই আবার ছুটতে শুরু করল।

"সারা জীবন পরিশ্রম করেছ, আর এটুকু পরিশ্রম করতে পারবে না?...ছোটো, ছোটো...থামছ কেন...পায়ের শির টেনে ধরছে? তা হলে কি শেষ করতে পারবে না?"

নারান দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঝুঁকে বাঁ পায়ে হাত বোলাতে গিয়ে আবার সিধে হয়ে ছুটতে শুরু করল।

"টোলুবাবু, আপনি আমার সঙ্গে নেমেছিলেন। বলেছিলেন, ফাঁকা মাঠে গোল দিলে সম্মান থাকে না, অসম্মান নিয়ে জিতবে কেন? আমাকে সম্মান দিতে আপনি সে দিন নেমেছিলেন।...আর এই দেখুন এই রেসে এখন আমি সবার পিছনে একা ছুটছি। কেউ নেই সঙ্গ দেবার জন্য...বলেছিলেন স্পোর্টসম্যানশিপ দেখাতে জানি। টোলুবাবু, আপনি বলেছিলেন, নারান আমি ফিনিশ করবই।...আমি ফিনিশ করবই... স্পোর্টসম্যানশিপ...ডাকপিওনের মতো দরজায় দরজায় পৌঁছে দিতে হবে।"

নারান ছুটে যাচ্ছে একটা ঘোরের মধ্যে। সেই একই রাস্তা ধরে তার ফিরে-যাওয়া। যশোর রোড থেকে নজরুল ইসলাম সরণি। কৈখালি...রাস্তার ধারে টেবলে জল নিয়ে বসা লোকেরা আর নেই। পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়ে তারা চলে গেছে।

বাগুইআটি। মোড়ে জমাট ভিড়। অবাক চোখে সবাই দেখছে। নারান কিন্তু কিছুই দেখছে না । শূন্য দৃষ্টি সামনে রেখে সে ছুটছে। যতক্ষণ ফুসফুস কাজ করবে থামা চলবে না।

একের পর এক, কেষ্টপুর, বাঙুর, লেক টাউন, শ্রীভূমি আর বাঁদিকে সল্ট লেক উপনগরী পিছনে রেখে নারান উল্টোডাঙা মোড়ে পৌঁছল। এবার বাঁদিকে ইস্টার্ন বাইপাস ধরে সোজা স্টেডিয়াম। বলে দিয়েছে, পাঁচ নম্বর গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হবে। একটা চক্কর দিয়ে থামতে হবে মঞ্চের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এমিল আর ডানা।

"আরে দেখে, দেখে মশাই, মোটরের সামনে পড়তেন যে।"

মাথা নাড়ল নারান। এসব কথা গ্রাহ্য করার মতো অবস্থা তার এখন নেই। সে ছুটছে, না হাঁটছে তাও সে জানে না। শুধু অনুভব করছে সে এগোচ্ছে, ফিনিশিং লাইনের দিকে ক্রমাগত নিজেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।...পাঁচ নম্বর গেট তার চাই।

বাইপাসের ধারে টিনের ঘর। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। জুতো হাতে নারানকে ছুটে আসতে দেখে তারা এগিয়ে এল। মজা পাওয়ার জন্যই তারা ওর পাশে পাশে ছুটতে শুরু করল। কিছু দূর গিয়ে তারা থেমে পড়ল।

বাঁ দিকে কাদাপাড়ার মাটির পাহাড়ে জঙ্গল। এবার বাঁ দিকে স্টেডিয়ামের পাঁচিল ধরে এগোলে ঢোকার গেট। রাস্তাটা নির্জন! একটা মিনিবাস আসছে। নারান ধারে সরে গেল।

পাঁচ নম্বর গেট। খোলাই রয়েছে। ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকে চক্কর শুরু করতে হবে।

নারান ডান হাতটা তুলল। কী সুন্দর, হলুদ, নীল রঙের চেয়ার দিয়ে ফুলের মতো সাজানো। সে কি কখনও ভেবেছিল এমন একটা জায়গায় দৌড়বে।

কিন্তু লোকজন কই। নিস্তব্ধ। কয়েকজন মজুর ছাড়া একটা লোকও নেই। এ কী, মঞ্চটা খোলা হচ্ছে কেন? এমিল কই, ডানা কই? নারান সমাপ্তি-সীমায় দাঁড়িয়ে টলতে শুরু করল।

ধুতি-শার্ট পরা এক প্রৌঢ় নারানকে দেখে, মঞ্চ খোলায় ব্যস্ত মজুরদের কাছ থেকে এগিয়ে এল।

"আপনি কি ম্যারাথন রেসে ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

লোকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"সব গেল কোথায়?" নারান হাঁফাচ্ছে। চোখে মুখে হতাশা।

"সবাই তো চলে গেছে। ক'টা বাজে দেখেছেন?" লোকটি বাঁ হাত তুলে ঘড়ি দেখাল। "এগারোটা পঞ্চাশ! এতক্ষণ কি কেউ বসে থাকে?"

"জ্যাটোপেক কোথায়, তাঁর যে থাকার কথা।"

"তাঁর কি আর কাজকর্ম নেই! আপনি আসবেন পাঁচ-ঘণ্টা পর, আর সেজন্য বসে থাকবেন? শেষ তো করেছে মাত্র দশজন, আপনি হলেন এগারো। দু' ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছেছে মাত্র চারজন। আমি তখন ছিলাম না। শুনলাম ওদের কনগ্র্যাচুলেট করেই সস্ত্রীক তিনি চলে গেছেন। চাঁপাদানিতে ওদের রিসেপশন দেওয়া হবে?"

নারান শূন্য স্টেডিয়ামের চারধারে চোখ বোলাল। ধীরে ধীরে তার মুখে ফুটে উঠল অদ্ভুত এক হাসি। মাথা নাড়তে শুরু করল । সেই সঙ্গে তার হাসিটাও উজ্জ্বল হয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা মুখে।

সন্ধ্যাবেলায় পোঁটলা বগলে নারান বিধাননগর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল। তখন বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সি, কোট-প্যান্ট-টাই-পরা একটি লোক তাকে কয়েকবার লক্ষ করে এগিয়ে এসে বলল, "কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

"বলুন।"

"আচ্ছা আপনি কি এক সময় সাইকেলে ঝাউডাঙায় খবরের কাগজ বিক্রি করতেন?"

"হ্যাঁ।"

লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "ঠিক ধরেছি আমি। আপনাকে চিনতে পারলাম, কারণ আপনি এত বছরে...প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ তো হবেই, একটুও বদলাননি, একই রকম রয়ে গেছেন। আমি হলাম ঝাউডাঙার বাদল নস্করের নাতি। আপনার জন্য আমি রোজ তখন অপেক্ষা করতাম।"

নারান হাসিমুখে তাকাল। সেদিন এই লোকটি এক কিশোর ছিল। হ্যাঁ, মুখখানি

চেনা ঠেকছে।

"আপনাকে আরও মনে রেখেছি কেন জানেন?...বোকার মতো বলেছিলাম, কে জ্যাটোপেক?...রেকর্ড তো কতই হচ্ছে কে মনে করে রাখে?"

"হ্যাঁ আমার মনে আছে।"

"তখন কত বোকা ছিলাম।...আপনি এখানে কোথায় এসেছিলেন?"

"এসেছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। একটু দেরি করে ফেলায় তার সঙ্গে আর দেখা হল না। তাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।"

ম্লান, বিষণ্ণ হাসিতে নারান কথাগুলোকে মুড়ে দিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মোড়কটা খুলে বলল, "অবশ্য সেজন্য আমার কোনও দুঃখ নেই।"

"আগে খবর দিয়ে না এলে এইরকম হয়রান হতে হয়। আপনি বন্ধুকে বোধহয় আগে বলে রাখেননি?"

"না, বলে রাখিনি। ভেবেছিলাম হঠাৎ দেখা করে অবাক করে দেব।"

"এখন কি বাড়ি ফিরবেন?"

"হ্যাঁ, ধান্যকুড়িয়া। ওখানেই সাতচল্লিশ সাল থেকে আছি।"

"ওখান থেকে সাইকেলে ঝাউডাঙায় রোজ আসতেন কাগজ বিক্রি করতে!" ভদ্রলোকের বিস্ময় গলা আর চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল। নারান শুধু হাসল।

"আপনি কি এখনও ঝাউডাঙায় থাকেন?"

"দমদমে বাড়ি করেছি। ওখানেই আমার কারখানা, জানলা দরজার গ্রিল তৈরি করি। এখানে এসেছিলাম জ্যাটোপেককে দেখার জন্য।"

"দেখলেন?" নারান উত্তেজনা দমন করে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল।

"হ্যাঁ। বেশ মোটা হয়ে গেছে। মাথার চুল তো কম ছিলই, এখন একেবারেই টাক।"

"আর কী দেখলেন?"

"আর কী দেখার আছে। এখন তো উনি নিবে যাওয়া আগ্নেয়গিরি।"

"উনিশশো বাইশের উনিশে সেপ্টেম্বর।" অস্ফুটে নারান বলল, "দু বছরের ছোট।"

"য়্যাঁ?" লোকটি বুঝতে না পেরে জানতে চাইল।

"কিছু না, একটা জন্মসাল মনে পড়ল তাই। আমার বন্ধু যে আমার থেকে দু' বছরের ছোট এটা ভুলেই গেছলাম। তা হলে জ্যাটোপেককে দেখে আপনি খুবই নিরাশ হয়েছেন।"

ট্রেনের আলো এগিয়ে আসছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লোকেরা লাইনের ধার থেকে একটু পিছিয়ে এল। নারানের কথার জবাব না দিয়ে লোকটি তাকিয়ে রইল স্টেশনে প্রবেশরত ট্রেনের দিকে।

ট্রেনের দরজায় ওঠানামার একটা ধাক্কাধাক্কি প্রথমে হবেই। এই অনুমান করে নারান একটু বেশি পিছিয়ে এল। মুখ পাশে ফিরিয়ে তাকাল প্ল্যাটফর্মের ভিড় আর মন্থর হতে হতে থামা ট্রেনের দিকে। হঠাৎ তার মনে হল এই ট্রেনটাই যেন জ্যাটোপেক আর এই লোকগুলো যেন তার জীবনের পেরিয়ে আসা বছর। দুবার সে

চেষ্টা করে এই ট্রেনটা ধরতে পারেনি।

হুড়মুড়িয়ে কামরা থেকে লোক নামছে আর ট্রেন ছেড়ে দেবার ভয়ে মরিয়া লোকেরা ঠেলেঠুলে ঢোকার চেষ্টা করছে। নারান যার সঙ্গে কথা বলছিল সেই লোকটি কোনদিকে যেন ছিটকে গেছে। ধাক্কাধাক্কি শেষ হবার পর সে পুঁটলি বগলে শান্ত ভাবে সামনের কামরায় উঠে দাঁড়াবার মতো জায়গা পেল।

ট্রেন চলতে শুরু করার পর নারান কামরার মধ্যে চোখ বোলাল। নানা ধরনের মানুষ, ছোট বড়, লম্বা বেঁটে, নানারকমের মুখ, পোশাক কথাবার্তা। এতগুলো, এত রকমের বছর! এরই মধ্যে আমলকীর, বাদামের, মুসম্বি লেবুর ফেরিওয়ালা নিজেদের পসরা বিক্রি করে যাচ্ছে। নারানের মনে হল, কত বছর ধরে সে ট্রেনে যাতায়াত করেছে কিন্তু এমন করে কখনও তো সে মানুষজনের দিকে তাকায়নি!

ট্রেনটা দুলছে। নারান চোখ বন্ধ করে পিছনের দিকে যত দূর দৃষ্টি যায় দেখার চেষ্টা করল। চেষ্টা করতে করতে তার মনে হল, জীবন তাকে অনেক কিছুই তো দিয়েছে। তার কোনও অভিযোগ নেই, জ্যাটোপেককে দেখতে না পাওয়ার জন্য কোনও আফশোস নেই। মানুষের সব আকাঙ্ক্ষাই কি পূরণ হয়? পূরণ হলে সেটাকে আর জীবন বলা যায় না।

রাত্রে বাড়ি ফিরে মহামায়ার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে নারান বলল, "আমি তো বলেই ছিলাম, এই বয়সে কি জেতা যায়?"

"শেষ করেছিলে তো?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মহামায়া জানতে চাইল।

উদ্ভাসিত মুখে নারান বলল, "নিশ্চয়। এইটুকু পথ দৌড়তে পারব না! যতদিন পারি হুসহুস করে আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলব।"

ফেরারি



"আজ যা কিছু হল, সব তোরই জন্য।"

ধীর, ফিসফিস স্বরে মোটরচালক কথাগুলো বলল। তার পাশে বসা যুবকটি সামনে তাকিয়ে চুপ করে রইল। এই ভাবে সে গত আধ ঘণ্টারও বেশি বসে আছে।

"কী ভুল যে তুই করলি।"

সামনে থেকে হু হু করে ভারী ট্রাক আসছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। তার ধাঁধানো আলো থেকে চোখ বাঁচাবার জন্য মোটরটা বাঁ দিকে সরিয়ে মন্থর করে চালক বলল, "কোথায় নামাব?"

যুবকটি এতক্ষণ যেন গভীর কোনও ভাবনার মধ্যে ডুবে ছিল। চটকা ভেঙে জানলা দিয়ে বিভ্রান্তের মতো তাকাল। দু'পাশে বড় বড় গাছ। সরু শাখাপথ তৈরি করেছে ছোট ছোট মোড়। দোকান। বেড়া বা পাঁচিল দেওয়া একতলা পাকা বাড়ি, পুকুর, সবজি বাগান, ধানখেত। অন্ধকার পিচের রাস্তায় মাঝে মাঝে টিমটিমে বাতি। বাড়ির আলো দূরে দূরে।

"ঠিক বুঝতে পারছি না" যুবক আমতা আমতা করে বলল, "সামনের দোকানটায় একটু জিজ্ঞেস করে—"

"একদম নয়।" চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে মোটরচালক ধমকে উঠল। "তোর মুখ যেন কেউ না দেখতে পায়। কলকাতা থেকে মাত্র বারো-চোদ্দো মাইল, এখানকার সব লোকই নিশ্চয় ইতিমধ্যে ঘটনা জেনে গেছে। এসব অঞ্চল সারথির সাপোর্টারে ভরা। নিশ্চয় আজ অনেকেই মাঠে গেছল, এখন তোকে পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে, আমাকেও শেষ করে গাড়ি জ্বালিয়ে তার মধ্যে ফেলে দেবে।... মানুষ এখন ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছে, জানোয়ারও লজ্জা পাবে। সামান্য সামান্য কারণে দলবেঁধে পিটিয়ে মেরে ফেলছে।"

হঠাৎ ব্রেক কষে মোটর থামিয়ে চালক গম্ভীর স্বরে বলল, "এইখানেই নেমে যা।"

যুবক ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে যেন কথাটার অর্থ বুঝে উঠতে পারেনি! এই লাল স্পোর্টস শার্ট পরা, প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সি, ফরসা, সুদর্শন, কলকাতার অন্যতম বনেদি বাড়ির সন্তান দুলালচাঁদ শীল তাকেই কি 'নেমে যা' বলল?

অনুপম নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

অথচ এই দুলালচাঁদ—যাকে সারথি সঙ্ঘের মালি থেকে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত দুলোবাবু, দুলোদা বা দুলো বলে—আজ দুপুরেও প্রায় এক ঘণ্টা এই আকাশি রঙের মারুতি গাড়িটা নিয়ে অপেক্ষা করেছে তাকে নিয়ে সারথির টেন্টে পৌঁছে দেওয়ার

জন্য।

গত পাঁচ বছর দুলোদা তাকে নিয়মিত গাড়িতে করে মাঠে আনেন, আবার বেলেঘাটায় তার ফ্ল্যাটে নামিয়ে দিয়ে সল্ট লেকে নিজের বাড়িতে চলে যান।

যখনই কোনও দরকারে গাড়ি চেয়েছে, দুলোদা পেট্রল ট্যাঙ্ক ভর্তি করে মারুতি বা অ্যাম্বাসাডার ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজের গাড়ির মতোই সারাদিন সে ব্যবহার করেছে।

আর সেই দুলোদা এখন এই অপরিচিত, অন্ধকার রাস্তায় তাকে হুকুম করল—নেমে যা!

অনুপম ঢোঁক গিলল। একটা অভিমান বুকের থেকে ঠোঁটে এবং চোখে ধোঁয়ার মতো উঠে আসছে। ঠোঁট কামড়ে, চোখ বন্ধ করে সে নিজেকে সামলাল।

অনেক কথাই এখন সে শুনিয়ে দিতে পারে দুলোদাকে। কিন্তু না, এখন সে কোণঠাসা। এখন সে পলাতক, ফেরারি।

তাকে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে। ম্যাচটা শেষ হওয়ার দশ সেকেন্ডও আগে, টাই ব্রেকারের শেষ কিক্‌টার আগে পর্যন্ত যারা তার অন্ধ ভক্ত ছিল, তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাকে গা-ঢাকা দিতে হবে।

চোর বা জালিয়াত সে নয়, কিন্তু আজ প্ল্যাটিনাম জুবিলি কাপ সারথির হাতে উঠেও হাত থেকে পড়ে গেল শুধুমাত্র, হ্যাঁ একমাত্র সে-ই এজন্য দায়ী।

গত তিন বছর সারথি গর্ব করে বলার মতো একটাও মেজর ট্রফি জেতেনি। ক্লাব-সমর্থকরা বুভুক্ষের মতো সারি দিয়ে আজ মাঠে এসেছিল। গোয়ার ডেম্পোর জয় চেয়ে ক'জন সমর্থক গ্যালারিতে ছিল? ছিল তো সব সারথিরই।...পঁচিশ হাজার? তিরিশ হাজার? আর মাঠের বাইরে কত লক্ষ?... পাঁচ লাখ, দশ লাখ? রেডিয়ো রিলে হয়েছে, মাঠে টিভি-ক্যামেরাও ছিল। লাখ লাখ লোক শুনেছে, দেখেছে অনুপম বিশ্বাসের মুখ।

সে এই মুহূর্তে একটা ঘৃণ্য মানুষ। তাই বা কেন,...একটা আততায়ী। একটা খুনির থেকে এখন তাকে কেউ অন্য কিছু ভাববে না।

এই দুলোদাও বোধ হয় ভাবছে না। নয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লোকটা এভাবে বদলে গেল কেন?

"অনুপম, আর আমি তোকে বয়ে বেড়াত পারব না, নাম।"

"কিন্তু দুলোদা, এখানে..."

"কিন্তু ফিন্তু নয়, কোথায় তেঁতুলতলা, কোথায় তোর রবিদা, এবার তুই খুঁজে বের কর।"

"চারদিক বড্ড অন্ধকার, কী করে বের করব? মনে হচ্ছে ছাড়িয়ে এসেছি।"

সামনে থেকে একটা যাত্রীবাহী বাস এসে ওদের পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। রাস্তাটা গ্রামের মধ্য দিয়ে জেলার মহকুমা সদরে, অনেকগুলো গ্রামের মধ্য দিয়ে জেলার মহকুমা সদরে পৌঁছেছে। মিনিট দশেক হাঁটলে রেল স্টেশন। সেখান থেকে বাস ছাড়ে। এখানকার মানুষ ট্রেনে কলকাতা যাতায়াত করে। রাস্তার ধারে

একতলা-দোতলা পাকা বাড়ির সঙ্গে টিনের বা খড়ের চাল দেওয়া কাঁচা মাটির কিছু বাড়িও আছে। মাঝে মাঝে পৌরসভার ইলেকট্রিক বাতির কাঠের থাম, কিন্তু বেশির ভাগেরই বালব নেই বা জ্বলছে না।

"নেমে খুঁজে দ্যাখ। আগে তো এখানে এসেছিস।"

"বছর চারেক আগে। মনে আছে একটা বড় অশ্বত্থ গাছের পাশ দিয়ে রাস্তাটা নেমে গেছে। সাইকেল রিকশা যায়। গাছের গোড়াটা বাঁধানো, একটা শিবের পাথর আর একটা ত্রিশূল আছে। পুজো হয়।"

"কই, তেমন তো কিছু চোখে পড়ল না, বোধ হয় আরও এগিয়ে হবে। নাম এখন, হেঁটে গিয়ে দ্যাখ।"

দুলোদা ড্যাশ বোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, 'ইস্‌স, প্রায় দশটা বেজে গেল।"

অনুপম ইতস্তত করে বলল, "হাঁটুতে রড মেরেছে, ব্যথা বড্ড। গাড়িটা আর একটু..."

"আরে হাঁটুফাটু এখন রাখ। ওদিকে আমার বাড়িতে আবার হুজ্জুতি ফুজ্জতি হল কি না কে জানে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আমাকে।"

"দুলোদা আর একটু যদি সামনে..."

"আবার সামনে কী? অনেক সামনেই তো তোকে এনে দিয়েছি। তার কোনও প্রতিদান তুই দিয়েছিস?"

দুলোদা হঠাৎ গলা চড়িয়ে উত্তেজিত থাপ্পড়টা স্টিয়ারিঙের ওপর কষাল। তার চোখে হতাশা, ক্ষোভ, ঘৃণা মিশে অদ্ভুত এক চাহনি তৈরি করেছে। ঠোঁটের কোণ মুচড়ে সে বলল, "আজ অনেকগুলো প্রাণ তুই নিয়েছিস। নিরপরাধ মানুষ, তারা শুধু এসেছিল সারথির জিত দেখতে। তারা তোকে এতকাল মাথায় তুলে রেখেছিল, মনে মনে তোকে পুজো করত। যখনই ভাল খেলেছিস, ম্যাচ জিতিয়েছিস, ওরা তোকে কাঁধে তুলে নিত, যুগ যুগ জিয়ো বলত তোর নাম করে। আর তাদেরই তুই...।"

অনুপম একদৃষ্টে তার বাঁ হাতের আঙুলে চুনি বসানো আংটিটার দিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বলল, "ক'জন মারা গেছে, জানো?"

"টেন্টের সামনের লনে আটটা বডি এনে রেখেছিল। তা ছাড়া মরো মরো অবস্থায় কতজনকে যে হাসপাতালে নিয়ে গেছে তা বলতে পারব না।"

দরজা খুলে অনুপম বাঁ পা জমিতে রেখে বেরোবার জন্য শরীরের ভর পায়ের ওপর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেই কাতরে উঠল।

দুলোদা চোখটা কোঁচকাল মাত্র, কিন্তু সহানুভূতি জানাতে একটা শব্দও মুখ থেকে বের করল না।

দু'বারের চেষ্টায় অনুপম সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"একটা কথা বলে রাখি তোকে। এখন তোর জীবন তোর হাতে। ইউ আর ইন রিয়েল ডেঞ্জার। তিরিশ বছর মাঠ করছি, কিন্তু মানুষকে এমন ভাবে খেপে যেতে কখনও দেখিনি। তোকে পেলে পিটিয়ে আজ শেষ করে দিত। সারা জীবন মনে

রাখবি, এই দুলোদাকে, আজ তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আর এটাও মনে রাখবি, সারথির সাপোর্টার সর্বত্র রয়েছে, তাই সাবধান...খুব সাবধান, খুব সাবধান।"

দৈববাণীর মতো শেষের কথাগুলো বলতে বলতে দুলোদা স্টার্ট দিল এবং কোনও বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই মারুতিকে একটু এগিয়ে নিয়ে রাস্তার চওড়া জায়গায় ঘুরিয়ে নিল।

চোখ-ঝলসানো দুটো হেডলাইট জ্বলা মারুতির মধ্যে একটা আবছা মাথা সাঁ করে অনুপমের চোখের সামনে দিয়ে কলকাতার দিকে চলে গেল। দুলালচাঁদ একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালও না তার দিকে। রাস্তার দু'ধারের গাছগুলো আলোয় ভেসে উঠেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। মারুতির পেছনে লাল আলো দুটো অন্ধকারকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে আলোর পেছন পেছন।

অনুপমের বুকের মধ্যে অজানা একটা ভয় গুড় গুড় করে উঠল। এইবার কি ওই দুটো রক্তচক্ষুর নজরে থাকা অন্ধকারের মধ্যে তাকে ঢুকতে হবে? তার কি আলোর দিন শেষ!

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। সকালে মিনিট পনেরোর বৃষ্টিতে শীত বিদায় নিতে নিতেও আজকের মতো থমকে গেছে। রাস্তায় লোক চলাচল করছে না। গাছের ফাঁক দিয়ে বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। অনুপমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল।

এখন তাকে তেঁতুলতলা খুঁজে বের করতেই হবে। সারারাত অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলে চলবে না, রবিদার বাড়ি তাকে পৌঁছতেই হবে, সেই অশ্বত্থ গাছ আর শিবের চত্বরটার হদিস আগে চাই।

অনুপম সন্তর্পণে বাঁ পা ফেলল। লোহার রডটা পেছন থেকে চালিয়েছিল, বোধ হয় কোমর লক্ষ্য করে। ঠিক সেই সময় কে যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। রডটা হাঁটুর পেছনে লেগে পিছলে গেলেও চোটটা দিয়ে গেছে।

পায়ে ভর রেখেই সে 'আহ্হ্' বলে চোয়াল শক্ত করে ফেলল। সতেরো বছর বয়সে ময়দানে সেকেন্ড ডিভিশনে সে খেলতে এসেছিল। দুটো পা এগারো বছর ধরে কম চোট তো পায়নি! জখম হওয়ার অভ্যাস তার আছে। এক পা হেঁটেই সে বুঝতে পারল হাড়ে লেগেছে। এখন দরকার গরম জল ঠাণ্ডা বরফ জল আর বিশ্রাম। হাঁটাচলা একদম না করা। রবিদার বাড়িতে রেফ্রিজারেটার আছে, এত রাতে বরফও পাওয়া যাবে।

মা হলে বলতেন, "রাখ তোর ঠাণ্ডা-গরম জল, চুন-হলুদ করে দিচ্ছি, লাগা। এই লাগিয়েই তো এত বড়টা হলি।"

তাদের বিদ্যুৎপুরের বাড়িতে অনুপম গত বছর বাবা-মায়ের জন্য টিভি সেট কিনে দিয়ে এসেছে। বাবা ফুটবলের ভক্ত, মা নন। বড়দা দেবোপম স্কুল শিক্ষক। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্কুল ও কোচিং নিয়েই ব্যস্ত। টিভি দেখার সময়ই পায় না। ছেলে-মেয়েদের দেখতে দেয় না লেখাপড়ার ক্ষতি হবে বলে।

আজকের খেলা বাড়ির কেউ কি দেখেছে? বাবা নিশ্চয়, ভাইপোরাও, মা-ও হয়তো মাঝে মাঝে টিভির সামনে এসেছেন। খেলাশেষের ঘটনাগুলো কি দেখানো

হয়েছে? নির্মম, বীভৎস পাশবিক দৃশ্য কি টিভিতে দেখাবে? কিন্তু টাই ব্রেকারের শেষ কিক্‌টির নেওয়াটা ওরা নিশ্চয় দেখিয়েছে।

ডেম্পোর পঞ্চম কিক্‌টা নিয়েছিল মিগুয়েল, রাজীব বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে বলটা পেয়ে যায়। ফল তখন ডেম্পোর পক্ষে ৪—৩। সারথির পঞ্চম কিক্‌টা বাকি। একটা বিশাল টাইফুন মাঠের তিনদিকের গ্যালারির ওপর দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল। অনুপমকে পেনাল্টি মারার জন্য এগিয়ে যেতে দেখেই সেটা স্তব্ধ হয়ে পড়ল। অবধারিত ৪—৪। তারপর সাড্‌ন ডেথ। কিন্তু তার আগে ৪—৪ তো হওয়া চাই। আর হবে নাই বা কেন? কিক নিচ্ছে তো অনুপম বিশ্বাস! টাইফুনের যদি প্রাণ থাকে তা হলে তখন সে নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল ডেম্পোর গোলের মধ্যে বল দেখার জন্য।

বাঁ পা টেনে টেনে অনুপম অন্ধকারের মধ্যে এগোচ্ছে। ঘড়িটা হাতে নেই, বোধ হয় পকেট থেকে কোথাও পড়ে গেছে। খালি গায়ে, কালো হাফ প্যান্টটা পরে, শর্ট আর ট্রাউজার্সটা পাকিয়ে বগলে নিয়ে তাঁবুর পেছন দিকের জানলা গলে অন্ধকারের মধ্যে মাটিতে নেমেছিল। হামাগুড়ি দিয়ে সে ক্যান্টিনের পেছনে কাঠের বেড়া পর্যন্ত যায়। বৃদ্ধ সহদেব মালি বেড়ার নীচের একটা তক্তা সরিয়ে বলেছিল, "রাস্তার দিকে একদম যাবে না, অন্ধকার অন্ধকার মাঠ দিয়ে কেল্লার ওই কোনায় চলে গিয়ে চুপচাপ মাটিতে শুয়ে থাকবে। খারাপ লোকেরা এখন মাঠে ঘুরে বেড়ায়। দুলোবাবু গাড়ি নিয়ে আসবে, দেখতে পেলেই ছুটে গিয়ে উঠে পড়বে।...যাও, যাও, আর এ-মুখো হয়ো না। এত নামডাক, এতবড় পেলেয়ার..."

অনুপমের আর কিছু শোনার মতো মনের অবস্থা তখন ছিল না। কিন্তু এখন তার কানে সহদেবের কথাটা স্পষ্ট বেজে উঠল, "যাও, যাও, আর এ-মুখো হয়ো না।" কয়েক পা গিয়েই সে আবার শুনল, "যাও, যাও।" অনুপম বুঝতে পারছে না, ভয় না ঘৃণা, কী ছিল ওর স্বরে?

রাস্তাটা ধনুকের মতো বেঁকেছে। বাঁক ঘুরেই অনুপমের মনে হল কিছু দূরেই একটা বাজার আর মোড়। অনেকগুলো দোকানের সাইনবোর্ড সে দেখতে পাচ্ছে, তবে বেশিরভাগই বন্ধ। রাত দশটায় মফস্বলে দোকান খোলা রাখা নির্ভর করে লোক চলাচলের ওপর। একটা মিষ্টির দোকান, তার পাশে বিড়ি-সিগারেটের দোকান আর সেলাই মেশিনে ব্যস্ত এক দরজি শুধু দোকান খোলা রেখেছে দেখল। এই মোড় থেকে একটা রাস্তা স্টেশনে গেছে।

বাজারের আগে রাস্তার ডানদিকে অন্ধকারে যে একটা অশ্বত্থ গাছ রয়েছে, কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত অনুপম তা বুঝতে পারেনি। গাছতলায় বাঁধানো গোল চত্বরটা ঠাহর হতেই সে স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

এই তো রবিদার বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা।

চার বছর আগে রবিদা হঠাৎই এক দুপুরে তার ব্যাঙ্কে হাজির হয়েছিল দুটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে।

"কী ব্যাপার রবিদা!"

"অনু, তোকে জ্বালাতন করতে এলুম। কী করব বল, বিখ্যাত ভাইয়ের দাদা হওয়া যে কী দুর্ভোগের, এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তুই আমাকে বাঁচা।"

"আমি বিখ্যাত? দুপুরবেলা এত পথ ঠেঙিয়ে ঠাট্টা করতে এলে?"

"যা সত্যি তাই বলেছি। সারা ভারতে এখন সেরা মিডফিল্ডার বলতে তো শুধু একজনই, অনুপম বিশ্বাস।"

কথাটা বলে রবিদা সঙ্গের যুবক দু'জনের দিকে তাকিয়েছিল। তারা বিগলিত হাসি দিয়ে জানিয়ে দেয়, সিদ্ধান্তটা তর্কাতীত।

"অনু, আমার ওখানে অনেকদিন তুই যাসনি। এগারোই, এই রোববারের পরের রোববার আয়।"

"কী ব্যাপার, কিছু আছে টাছে নাকি?"

"আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের মায়ের নামে শিল্ড চালু হয়েছে, এই বছরই প্রথম, রোববার তাই ফাইনাল। এরা এসে ধরল আপনার ভাইকে প্রধান অতিথি করে দিতে হবে। কার্ডফার্ড সব ছাপিয়েও ফেলেছে।"

"অ্যাঁ, আমাকে জিজ্ঞেস না করেই?"

"কেন, তোর অনুমতি নিতে হবে নাকি আমার ওখানে যাওয়ার জন্য?" রবিদা তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিখুশি ঢঙে কথাটা বলেছিল।

"আমার অসুবিধে থাকতে পারে তো ওই দিন। প্রতি রোববারই হয় সভাপতি নয়তো প্রধান অতিথি হওয়া...অন্তত একমাস আগে আমায় না বললে...।" অনুপম গম্ভীর স্বরে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে রবিদার মুখ থেকে আমুদে সজীবতাটা মুছে দিয়েছিল।

অপ্রতিভ রবিদা যুবক দুটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বলে, "আমি তো এদের বলেছি তোকে নিয়ে যাব। হ্যাঁরে দু-চার মিনিটের জন্যও কি সময় করতে পারবি না? তুই না গেলে আমার তো—"

মাথা কাটা যাবে! অনুপম তখন মনে মনে রেগে উঠেছিল। এরা সব ভাবে কী! ধরেই নিয়েছে যেন, অনুপম বিশ্বাস ফুটবল খেলে এত নাম এত সম্মান পেয়েছে এদেরই অনুগ্রহে, তাই যখন খুশি ওকে ডাকলেই যেতে হবে।

আর এই রবিদা। তার নিজের দাদা নয়, দূর সম্পর্কের মামার ছেলে। বিদ্যুৎপুরে তাদের বাড়িতে থেকেই মানুষ। লেখাপড়া স্কুল ফাইনাল পাশ, তবে অসম্ভব পরিশ্রমী আর উদ্যোগী। অল্প বয়স থেকেই খুচখাচ ব্যবসা করত। বছর দশেক আগে তেঁতুলতলায় দোতলা বাড়ি করেছে, এখানেই শ্বশুরবাড়ি। এখন আলুর বড় ব্যবসায়ী, কোল্ড স্টোরেজের অংশীদার, সার আর বীজের দোকান আছে। নিঃসন্তান।

রবিদা ভাল ফুটবল খেলত। অনুপমের শিশু বয়সে তরুণ রবিদাই ছিল তার হিরো। তার ফুটবলকে ভালবাসার প্রথম শিখাটি জ্বালিয়ে দিয়েছিল যে রবিদাই—এটা অনুপম মনে মনে স্বীকার করে।

এক সময় বাড়িতে তার ফুটবল খেলা নিয়ে ঘোরতর আপত্তি উঠেছিল, যখন সে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করল। তখন রবিদা যদি না...

"ঠিক, আছে, যাব।" অনুপম তার গাম্ভীর্য সরিয়ে হালকা চালে বলেছিল। রবিদার

মুখ চোখে ঔজ্জ্বল্যের দপ করে নিভে যাওয়াটা তার মনে খচখচ শুরু করে দিয়েছিল। ব্যাপারটা হালকা করার জন্য সে তখন বলেছিল, "কিন্তু রবিদা, আমি দুপুরে বউদির রান্না খাব। ঠিক এক বিঘত লম্বা কই মাছের ঝাল আর পোস্তর বড়া রাঁধতে বলবে।"

রবিদার মুখে আবার ফিরে এসেছিল আমুদে উচ্ছলতা। যুবক দুটির সামনে সে নানা ভাবে দেখাবার চেষ্টা করল—তোমাদের এই হিরো অনুপম বিশ্বাস আমার খুব অনুগত ভাই। আমায় খুব মান্য করে। অনুপম স্মিত হেসে রবিদার সব কথাই মেনে নেয়।

ওরা চলে যাওয়ার পর তার মনে হয়েছিল, সে যেন অনেক বদলে গেছে। কেমন যেন এক ধরনের দাম্ভিকতা, পায়াভারী ভাব তার মধ্যে আসতে শুরু করেছে যেটা মাঝে মাঝে তাচ্ছিল্য দেখানো ঔদ্ধত্যের মতো তার নিজের কাছেই মনে হয়েছে। অনুপম তখন জানত না একদিন অবস্থার ফেরে পড়ে, ঘটনাচক্রে তাকে এই রবিদার বাড়ি খুঁজে বের করার জন্য রাত্রির অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হবে।

অশ্বত্থ গাছের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সরু রাস্তাটার দিকে অনুপম তাকাল। একটা সুড়ঙ্গের মতো দেখাচ্ছে। চার বছর আগে এখানেই সে মোটর গাড়ি থেকে নেমেছিল। রবিদার সঙ্গে যে দু'জন যুবক তার ব্যাঙ্কে গেছল তাদেরই একজন, গোপাল নাম ছিল, তাকে বেলেঘাটা থেকে মোটরে নিয়ে এসেছিল।

অনুপম মোটর থেকে নেমে বলেছিল, "এখান থেকে কতটা হাঁটতে হবে?"

গোপাল বিব্রত হয়ে বলেছিল, "মিনিট-তিনেকের পথ, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি মোড় থেকে একটা রিকশা নিয়ে আসি।"

"আরে না, না। তিন-চার মিনিট হাঁটলে আমার পা খুলে পড়বে না। অতটা অথর্ব এখনও হইনি।"

মাত্র চার বছরের মধ্যে কথাগুলো কেমন বুমেরাং হয়ে ফিরে এল। এখন গোপাল যদি অন্ধকার ফুঁড়ে তার সামনে এসে হাজির হয়!

অশ্বত্থ তলার বাঁধানো জায়গাটায় বাঁ পা-কে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বসে অনুপম দ্বিধান্বিত মনে ভাবল, তা হলে কি সে বেঁচে যাবে? গোপাল যে তার অন্ধ ভক্ত সেটা বুঝে নিতে তার তিরিশ সেকেন্ডও লাগেনি। ওর চোখ মুখই বলে দেয়, অনুপম আর সারথি সঙ্ঘকে সে পুজো করে। সেদিন সারাক্ষণ গোপাল ছায়ার মতো তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে। অন্য ভক্তদের কাছে আসতে না দিয়ে আগলে রেখেছিল, যেন অনুপম একা তারই সম্পত্তি।

আগের দিন বিকেলে পুকুরে জাল ফেলিয়ে এক বিঘত লম্বা কই পাওয়া যায়নি, গোপাল কলকাতায় এসে তিন-চারটে বাজার ঘুরে নাকি এক বিঘতের কাছাকাছি মাপের কই মাছ কিনে রাত সাড়ে দশটার ট্রেনে ফিরেছিল। দুপুরে খাওয়ার সময় অনুপম মাছ দেখে বলেছিল, "ইস্, কত বড়! যদি আজ না আসতাম তা হলে তো জীবনের একটা বিরাট আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম। রবিদা, তোমার পুকুরে এত বড় কই আছে জানলে তো আমি হপ্তায় দু'বার করে আসতাম।"

রবিদা আঙুল তুলে দরজার কাছে দাঁড়ানো গোপালকে দেখিয়ে বলেছিল, "ওর

জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। বুঝলি অনু, আমাদের এই অঞ্চলটাই সারথির সাপোর্টার। তোর কী দরকার সেটা শুধু একবার বলবি। তারপর দ্যাখ এই গোপাল আর ওর মতো কয়েকটা সারথি-পাগল ছেলে কী করতে পারে। এখানকার পুজো প্যান্ডেলের শামিয়ানার কাপড়ে, সাইনবোর্ডে, পরদায়, ঘুড়িতে, সব ব্যাপারেই সারথির ফ্ল্যাগের কলাপাতা আর গাঁদাফুল রং তুই পাবি। এখানে কার্ড হোল্ডার মেম্বার কত আছে জানিস? অন্তত এগারোজন শুধু তেঁতুলতলাতেই।"

"তেরোজন!" গোপাল রবিদার ভুলটা শুধরে দিয়েছিল।

"সারথি পয়েন্ট লস করলে বা হারলে এখানে বহু বাড়িতেই অরন্ধনের উপবাস চলে। গত বছর লিগে যুগের যাত্রীর কাছে হারের পর শক্তিপ্রসাদ বলে একটা ছেলে এগারো দিন না খেয়ে ছিল।"

"কিন্তু আমরাই শেষ পর্যন্ত লিগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম।" অনুপম বলেছিল।

"এবারেও হব তো?" গোপাল তার ব্যাকুলতা গোপন না রেখেই ব্যগ্র স্বরে জানতে চেয়েছিল।

"নিশ্চয়ই। আমি তো সিজনের শুরুতেই বলেছিলাম, এবারও সারথিকে চ্যাম্পিয়ন করাব।"

চার বছর আগের কথা। সত্যিই লিগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল সারথি। তারপর আর হয়নি। কিন্তু প্রতি সিজনের শুরুতেই অনুপম বলে গেছে, চ্যাম্পিয়ান করাব। প্রতি সিজনে সে টাকার দাবি বাড়িয়েছে এবং আদায়ও করেছে, কিন্তু বড় ট্রফি এনে দিতে পারেনি। সমর্থকরা প্রথমে বিস্মিত হয়েছে, তারপর বিরক্ত। এখন হাসাহাসি করে।

গোপালও কি এখন তাকে দেখে হাসবে? আজ আটটা বডি টেন্টের লনে রেখেছিল। এটা নিয়ে হাসাহাসি হবে? রডটা চালিয়েছিল তার কোমর ভেঙে দেওয়ার জন্য, ভাগ্যক্রমে লাগেনি। ভেঙে গেলে কি হাসাহাসি হত? পঙ্গু অনুপম বিশ্বাসকে কেউ কি মনে রেখে দেবে?

রাস্তা দিয়ে একটা সাইকেল এগিয়ে আসছে। অনুপম শক্ত হয়ে গেল। তাকে দেখতে পেয়ে যদি লোকটা কাছে আসে? এখানকার লোক নয় অথচ অন্ধকারে নির্জনে বসে রয়েছে। চোর, ডাকাত, ছিনতাইবাজ ভেবে চেঁচামেচি করে যদি লোক জড়ো করে।

"কে রে, পাগলা নাকি?"

লোকটা সাইকেল না থামিয়েই কথাটা বলে গেল। পেছনের কেরিয়ারে একটা বস্তা। অনুপম সাড়াশব্দ দিল না।

আর বসে থাকা ঠিক নয়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটলেই মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে, কিন্তু পথে যদি ওদের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? অন্ধকারে নিশ্চয় তাকে চিনতে পারবে না। কিন্তু সঙ্গে যদি টর্চ থাকে? মফস্বলে, গ্রামে রাতে টর্চ ছাড়া মানুষ বেরোয় না। বিদ্যুৎপুরে সন্ধেবেলা কেউ বেরোলেই বাবা মনে করিয়ে যেন, "সঙ্গে টর্চ নিয়েছিস তো, পথে যা সাপখোপ।"

সাপ! অনুপম সরু রাস্তাটায় নামতে নামতে থমকে গেল। কিন্তু এই অন্ধকারে সে

দেখবে কী করে। শব্দ করলে ওরা ভয়ে সরে যায়, কিন্তু ওরা তো শুনতে পায় না। পা দিয়ে জমিতে ধপধপ করে চললে মাটিতে যে কম্পন হয় সেটা ওরা অনুভব করে সরে যায়। বাবাই একদিন বুঝিয়ে বলেছিলেন। তবে এখনও শীত যায়নি, ওরা এখনও গর্তের মধ্যেই রয়েছে।

কিন্তু অন্য ওরা?

তারা যদি ধপধপ শুনে এগিয়ে আসে। মুখে টর্চের আলো ফেলে। যদি চিনতে পারে!

দুলোদা বলে গেল, "সাবধান, খুব সাবধান।"

রবিদা বলেছিল, "তারপর দ্যাখ, এই গোপাল আর ওর মতো কয়েকটা সারথি-পাগল ছেলে কী করতে পারে।"

কী পারে? পিটিয়ে মানুষ মারতে কি পারবে? কী খাতির-যত্নই না গোপালরা করেছিল। ভৃত্যের মতো ক্রীতদাসের মতো পেছন পেছন ঘুরছিল তার কী দরকার জানার জন্য। ওরা চোখের চাউনি দিয়ে সারাক্ষণ তাকে পুজো পাঠিয়ে গেছে। চার বছরেই কি ওরা বদলে যাবে? ওদের ভক্তি, ভালবাসা কি এতই ঠুনকো? কিন্তু দুলোদা তো কয়েক ঘণ্টাতেই বদলে গেল। বড় ভাল লাগত এদের স্তুতি, এদের মুগ্ধতা, এগুলোকে সে সত্যি বলে, স্থায়ী বলেই ধরে নিয়েছিল।

পা ঘষটে অনুপম এগোতে লাগল রাস্তার দিকে চোখ রেখে। দু'পাশে বাড়ি। জানলাগুলোও বন্ধ। কোনও বাড়ি পাঁচিল ঘেরা, কোনওটায় বাইরের দালানে লোহার গ্রিল। তিনতলা পুরনো বাড়িও আছে কয়েকটা। টালির চালের বাড়িটার পরই একটা ডোবা।

কাছে এবং দূরের থেকে একই রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেসে আসছে। রেডিয়োয় গাইছে কোনও মেয়ে। এই গান বাদে সারা বিশ্বচরাচর অনুপমের কাছে শব্দহীন মনে হচ্ছে। কলকাতার বিকট আওয়াজের মধ্যে বাস করার জন্য তার স্নায়ু যে চড়া সুরে বাঁধা হয়ে পড়েছে তাতে মফস্বলের রাতের এই নৈঃশব্দ্য তাকে খুব জোরে আঘাত করল। তার শরীরে ক্লান্তি নেমে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে অভ্যাসবশেই ভীত হয়ে উঠল। ম্যাচ শেষ হতে অনেক সময় বাকি, এখনই টায়ার্ড হয়ে গেলে চলবে না। তাকে পালাতে হবে, সারথির লোকেদের, ভক্তদের, অনুগতদের হাত থেকে বাঁচতে হলে এখন কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে।

তেঁতুলতলায় আসাটাই ভুল হয়েছে। কেন যে সেই দিশাহারা, তুলকালাম, নারকীয় পরিস্থিতির মধ্যে তার রবিদাকেই মনে পড়ল! ঠাণ্ডা, নরম, স্নেহশীল। ওর কাছে সাহায্য চাইলে প্রত্যাখ্যান করবে না, এই ধারণাটা তার মধ্যে কী ভাবে তখন যে এল, অনুপম তা ভেবে পেল না।

সে তো বিদ্যুৎপুরেও বাবা-মা দাদার কাছে চলে যেতে পারত। কিন্তু ষাট-পঁয়ষট্টি মাইল দূরে কে তাকে এক রাতে গাড়ি করে পৌঁছে দিত? দুলোদা দশ-বারো মাইল পর্যন্ত যে এসেছে, আজকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই অদ্ভুত ব্যাপার। হয়তো কৃতজ্ঞতা বোধের ছিটেফোঁটা এখনও ওর মধ্যে রয়েছে। সারথির একজিকিউটিভ

কমিটিতে ওকে ঢোকাবার জন্য শেষ পর্যন্ত অনুপমকে ভোট জোগাড়ে নামতে হয়েছিল।

বাঁ দিকে টানা একটা নিচু পাঁচিল। বাড়িটার বাইরের দালানে একটা টিভি সেট। অনেকগুলো মানুষ। বাড়ির লোক ছাড়াও বাইরের লোকও বোধ হয় রয়েছে। হিন্দি কোনও সিরিয়াল হয়তো। দালানের আলো নেভানো কিন্তু ভেতরের ঘরের আলো জ্বলছে। চেয়ারে দু-তিনজন, বাকিরা মেঝেয় বসে। অনুপম মাথা নামিয়ে কুঁজো হয়ে এগোল।

পাঁচিলের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গা। লোহার গেট। ওর সামনে দিয়ে তাকে যেতে হবে। অনুপম থমকে গিয়ে ভাবল, দালান থেকে কেউ কি দেখে ফেলতে পারে?

মাথাটা তুলে দূরত্ব আর অন্ধকার সম্পর্কে একটা আন্দাজ করে নিয়ে সে স্বাভাবিক হেঁটে ছ-সাত হাত চওড়া গেটের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হোঁচট খেল।

"আহ্হ্।" হাঁটুতে ধাক্কাটা পেয়ে অনুপমের মুখ থেকে একটু জোরেই কাতরানিটা বেরিয়ে এল। পাঁচিলের ওধার থেকে ডেকে উঠল একটা কুকুর।

"কে, কে, কে রে?"

অনুপম ছুটল। হাঁটুর যন্ত্রণা ভুলে সে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তাটা এখান থেকে দু' ভাগ হয়ে দু' দিকে গেছে। সে বুঝতে পারছে না কোনটা ধরে এগোলে রবিদার বাড়ি পৌঁছনো যাবে।

অন্য দিন, অন্য সময় হলে সে রাস্তার লোককে কি কোনও বাড়ির লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিত। এখন ওসব ভাবাই যায় না। বাঁ পা তুলে ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ করল।

কুকুর ডাকছে না। মানুষের গলাও শোনা যাচ্ছে না। আবার সব আগের মতোই নিস্তব্ধ। অনুপমের বুকের মধ্যে ছমছম করে উঠল। বলটা স্পটে বসিয়ে কিক্ নেওয়ার জন্য যখন পিছিয়ে যাচ্ছিল, সারা মাঠ তখন এইরকম নিশ্বাস বন্ধ করা শব্দহীনতার মধ্যে ডুবে ছিল।

এখন তার দরকার যা হোক কোনও শব্দ। অনুপমের মনে হল ডানদিকের রাস্তাটাতেই রবিদার বাড়ি। কেন যে মনে হল, তার কোনও ব্যাখ্যা সে দিতে পারবে না। এই রকম অনুভূতির জন্যই সে অনেক বার এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে বল পেয়েছে, যেখানে বল আসার কোনও সম্ভাবনা তখন ছিল না। সবাই বলে, তার সিক্সথ সেন্স নাকি খুব তীক্ষ্ণ। দারুণ ভাবে কাজ করে। করে বলেই আজ সে প্রাণ নিয়ে এখনও টিকে রয়েছে।

লোহার রডটা কোমরেই লাগত যদি না ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে সে তিন-চার পাক গড়িয়ে যেত। তারপর লাফিয়ে উঠে সে তাঁবুর দিকে ছোটে। তিরিশ-চল্লিশ গজ মাত্র। দু' দিক থেকে জনতা ছুটে আসছে, কয়েকজন মাত্র পুলিশ লাঠি তুলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। অনুপম তাঁবুর মধ্যে পৌঁছে যেতে পেরেছিল।

কী ভাবে যে তাঁবুটা রক্ষা পেল, সে এখনও বুঝতে পারছে না। অন্য কোনও

ফুটবলারকে ওরা মারধোর করার খুব বেশি সুযোগ পায়নি। সরল আর অপূর্বর মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল। পুলকেশ চিত হয়ে কাতরাচ্ছিল, বোধ হয় পাঁজরের হাড় ভেঙেছে। রঞ্জনের বাঁ চোখটা বন্ধ হয়ে গেছে, থু-থু করে রক্ত ফেলছিল মুখ থেকে।

তাঁবুর কোলাপসিবল গেটটা বন্ধ করে দেওয়ার মুহূর্তে ছোটখাটো চেহারার একটা লোক ছুটে এসে ধাক্কাধাক্কির মধ্যে তাঁবুতে ঢুকে পড়েছিল। পরে সে ড্রেসিংরুমের কোণে আধো-অন্ধকারে বসে থাকা অনুপমের কাছে গিয়ে মুখের কাছে মুখ এনে, পানের ছোপ ধরা দাঁতগুলো দেখিয়ে বলেছিল, "অনু, তোর উত্থান আমি দেখেছি, এখন পতনটাও খুব কাছ থেকে দেখব বলে ঢুকে পড়েছি।"

অনুপম তখন বোবা চোখে শুধু তাকিয়ে থেকেছিল প্রভাতী সংবাদের স্টাফ রিপোর্টার, পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি, বাহান্ন কেজি, আটত্রিশ বছর বয়সি সুপ্রিয় গুপ্তর দিকে।

"তোর একটা ফাইনাল ইন্টারভিউ নেব...অনু না বলিস না, তোর দেওয়া অপমানগুলো আমি এখন ভুলে যেতে রাজি...জাস্ট ওয়ান ইন্টারভিউ, হার্ট টু হার্ট টক..."

"সামনে থেকে সরে যাও সুপ্রিয়দা। তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না।" অনুপম চাপা স্বরে চোয়াল চেপে বলেছিল।

"আমাকে সরিয়ে দিতে তুই পারিস, কিন্তু আমি কি তোকে সরিয়ে দিতে পারব আমার মন থেকে? তুই যতক্ষণ থাকবি, যেখানে থাকবি, আমিও সেখানে—"

কে? কে যেন আসছে? অনুপম শক্ত হয়ে গেল। একজন, না কয়েকজন? তার বুকের মধ্যে আবার টাই ব্রেকার কিক্ নেওয়ার আগের মুহূর্তটা ফিরে এল। যতজনই হোক অন্ধকার পথে কেউ কাউকে দেখলেই বলবে, "কে?" পরিচয় নিতে চাইবে। তখন সে কী বলবে? রবিদার নাম করে বলবে তার বাড়িতে যাচ্ছি! তাইতে বাড়ির রাস্তা বাতলে দিয়ে চলে যেতে পারে কিংবা আরও কৌতূহলী হয়ে টর্চ জ্বেলে কিংবা সিগারেট ধরাবার ছলে দেশলাই জ্বেলে তার মুখটা দেখে!...যদি দেখেই ভ্রূ কোঁচকায়? তারপর হনহন করে অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে যদি চেঁচায়। "ওরে অনুপম বিশ্বাস, আমাদের তেঁতুলতলায় অনুপম বিশ্বাস...তোরা শিগগির বেরিয়ে আয়; পালিয়ে যাবে । ধর ওকে, লাশ ফেলে দে।"

রডটা পায়ে লাগার আগে সে শুনতে পেয়েছিল—"শেষ করে দে। টাকা হাতে না পেলে বাবু পায়ে বল ছোঁবে না।" বিদ্রূপে মোচড়ানো স্বরে কুৎসিত নোংরা গালাগালিতে আরও বলেছিল, "বছর বছর প্যাঁচ কষে টাকাই শুধু বাড়িয়েছিস। ট্রোফি আর আনতে পারিসনি।"

দুলোদার কথাটা মনে পড়ল—"সাবধান, সাবধান।...এখন তোর জীবন তোর হাতে। সারথির সাপোর্টার সর্বত্র রয়েছে।"

অনুপম বাঁ দিকে দুটো খেজুর গাছ দেখতে পেল। ঘেঁষাঘেঁষি করে একটা মোটা থামের মতো হয়ে দাঁড়িয়ে। সে গাছ দুটোর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

দুটো ছায়ামূর্তি আসছে। আকার দেখে সে বুঝল ওদের একজন নেহাতই অল্পবয়সি।

"বলিস কী, ছোটমামা রেডিয়োটা আছড়ে ভেঙে ফেলল?"

"হ্যাঁ বাবা বলল, ঘুষ খেয়েছে। টাকা খেয়ে ইচ্ছে করে পেনালটি মিস করল।... গুলি করে মারা উচিত। ক্লাবের মধ্যে পলিটিক্স করবে, প্লেয়ারদের নিয়ে জোট বেঁধে..."

অনুপমের পাঁচ-ছ' হাত সামনে দিয়ে ওরা চলে গেল। ছেলেটার বয়স কতই বা, নয় কি দশ। যা শুনেছে তাই বলল। এইসব শুনতে শুনতে বড় হবে, বিশ্বাসও করবে, অনুপম ঘুষ নিয়ে খেলত।

বুকের মধ্যে হঠাৎই একটা বিশাল কালো গহ্বর তৈরি হয়ে গেল বলে তার মনে হল। কিছুদিন আগে কাগজে পড়েছিল, আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মিল্কি ওয়েতে পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা সূর্যের থেকে দশ লক্ষ গুণ বড় ব্ল্যাক হোল পেয়েছেন। সেটা নাকি প্রতি পাঁচ থেকে দশ হাজার বছরে একটা করে নক্ষত্র গিলে ফেলছে। পড়ার পর সে কল্পনা করতে চেয়েছিল বিশাল একটা অন্ধকার গহ্বরকে। কিন্তু পারেনি। সূর্যটা যে কত বড়, পৃথিবী থেকে চোখে দেখে কোনও ধারণা পাওয়া যায় না। কিলোমিটার আর মাইলে গড়া ব্যাসার্ধ বা পরিধির কথা বলেও কিছু আন্দাজ হয় না। সূর্যের দশ লক্ষ গুণ যে কত বড় হতে পারে, সে কিছুই ধারণায় আনতে পারেনি।

এখন সে অনুভব করতে পারল।

আটজন নাকি মাঠেই মারা গেছে। কথাটা সে দশ-বারোবার শুনেছে। তাঁবুর গেট আর জানলাগুলো বন্ধ করে কে চেঁচিয়ে বলেছিল, "চুপচাপ সবাই বসে থাক।...ডেডবডি এনে শুইয়ে রেখেছে সামনের লনে। জানলা ফাঁক করে দেখার চেষ্টা করিসনি।"

অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে গিসগিসে ভিড়। আর একজন চাপা গলায় বলেছিল, "পাপ। পাপের ভারে পূর্ণ হয়ে গেছে সারথির পথ। তাই চাকা বসে গেল।"

কেউ সেই কথার প্রতিবাদ বা সমর্থন করেনি। শুধু সরল তার পাশ থেকে বলেছিল, "মাথার চুল না কামিয়ে কি জায়গাটা সেলাই করা যায় না?"

"তা কী করে হয়! যে ভাবে রক্ত বেরোচ্ছিল, তাতে কম করে বারো-চোদ্দোটা স্টিচ তো তোর লাগবেই।" প্রকাশ বলল।

"সরল, তোর বিয়েটা কবে?" আর-একজনের প্রশ্ন।

"আঠারো দিন বাকি।"

"তদ্দিনে চুল গজিয়ে যাবে, আর তা নইলে কামানো জায়গাটায় চুল লাগিয়ে নিবি।"

অনুপম দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ চেপে দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে বসে ছিল। কেউ তার সঙ্গে ইচ্ছে করেই কথা বলছে না, এটা সে বুঝতে পারছিল। সে জানে তার প্রতি কারও কোনও সহানুভূতি নেই। এই ঘটনায় বরং সবাই মনে মনে খুশিই হয়েছে এই ভেবে—অনুপম বিশ্বাস ফিনিশ হয়ে গেল। আর মাঠে ফেরা সম্ভব হবে না।

একটা অস্ফুট গোঙানি অনুপমের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। খেজুর গাছে কপালটা ঘষার জন্য জ্বালা করছে। এখন তাকে পেছনে নয় সামনে তাকাতে হবে। জীবন এখন

নিজের হাতে, এটা কোনও ভাবেই ভুললে চলবে না।

রাস্তায় উঠে সে হাঁটতে শুরু করল। বাঁ হাঁটু ভাঙতে পারছে না, অসাড় হয়ে গেছে। তাতে অসুবিধে বোধ করছে না। এখনও পর্যন্ত ওদের কারও সঙ্গে দেখা হয়নি।

চার বছর আগে ফাইনাল ম্যাচে তাকে মঞ্চে তোলার আগে, মাঠের চারধারে তাকে জোড় হাতে ঘুরতে হয়েছিল অন্তত হাজার পাঁচেক দর্শকের অভিনন্দন-উচ্ছ্বাস-হাততালিতে আপ্লুত হওয়ার জন্য। মনে হচ্ছিল, দুটো দলের ফাইনাল খেলা তো নয়, অনুপম বিশ্বাসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। গোপাল আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের কাকুতি মিনতিতে সে রাজি হয়ে গিয়েছিল।

রবিদাও বলেছিল, "অনু যা, সব সারথিরই সাপোর্টার, তোর দারুণ ভক্ত। ওদের নিরাশ করিসনি। তোকে দেখার আশাতেই ওরা এসেছে। না গেলে তোকে অহঙ্কারী ভাববে।"

অতগুলো লোক তাকে চিনে রেখেছে। কিন্তু চার বছরে কি তার মুখটা বদলায়নি? বা চার বছরে কি ওদের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসেনি?

সেও কি জনতার সেদিনের কোনও মুখ মনে করে রেখেছে? সবই তো এক রকম! গদগদ, কৃতার্থ, দাঁত বের করা, হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা, অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য কলম আর খাতা এগিয়ে...আহ্হ্, একটা মুখ মনে পড়ছে, একটা মুখ।

রুগ্ণ, লম্বাটে মুখ, ফরসা রং। পাতাকাটা চুল কপালে ঝুলে ছিল। ড্যাবড্যাবে চোখের মণি দুটো ঘন কালো। বছর বারো বয়স হবে। ওরই বয়সি অনেকে অটোগ্রাফ নিচ্ছে দেখে বোধ হয় ইচ্ছে হয়েছিল। একটা হ্যান্ডবিল কুড়িয়ে এনে তার সাদা উলটো পিঠটা এগিয়ে ধরেছিল একটা পেনসিল হাতে নিয়ে। অনুপম তখন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল সই দিতে দিতে। হ্যান্ডবিলটা দেখে তার মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠেছিল।

"আমার নাম জানো?"

ছেলেটি থতমত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। গভীর, সরল, লাজুক চোখ।

"আমি কোন ক্লাবে খেলি জানো?"

ছেলেটির মুখে হাসি ফুটেছিল। "আপনি অনুপম বিশ্বাস, সারথি সঙ্ঘে খেলেন।"

"কোন পজিশানে?"

ছেলেটির চোখে বিড়ম্বনা ফুটে উঠেছিল। আমতা আমতা করছে, তখন দুষ্টুমি করেই একজন ফিসফিসিয়ে ছেলেটিকে বলেছিল, "বল, গোলে খেলেন।" সঙ্গে সঙ্গে ও বলে ওঠে, "আপনি তো গোলকিপার।"

হোহো করে তাকে ঘিরে থাকা ভিড়টা হেসে উঠেছিল আর অনুপমের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল। তাকে চেনে না এই বয়সি একটা ছেলে? তা হলে তার কীসের নাম, কীসের খ্যাতি! এতগুলো হাসি যেন তাকেই বিদ্রূপ করে উঠল।

হ্যান্ডবিলটা মুঠোয় দলা করে পাকিয়ে ছেলেটির কপালে সে ছুড়ে মেরে বলেছিল, "আমি কে, সেটা আগে জেনে এসো, তারপর সই নিয়ো...অটোগ্রাফ বুকে, এ রকম

বাজে কাগজে নয়।"

ড্যাবড্যাবে চোখের সেই অপ্রতিভ চাহনিটা টিভি রিপ্লের মতো অনুপমের স্মৃতিতে ফিরে এল মন্থর গতিতে। ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সই নেওয়ার জন্য জায়গা করে দু-তিনজন এগিয়ে এসেছে। চোখের কোণ দিয়ে সে দেখেছিল, পায়ে পায়ে ছেলেটি ভিড়ের বাইরে চলে গেল। গোপালরা তাকে ভিড় থেকে উদ্ধার করে মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় ছেলেটি তার মুখোমুখি পড়ে যায়। তাকে দেখে রুগ্‌ণ মুখটায় লাজুক হাসি ফুটিয়ে ও অদ্ভুত চাহনিতে তাকিয়ে থাকে।

জীবনে প্রথমবার অপমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার বিস্ময়ই কি ছেলেটির চাহনিতে ছিল? অবাক হয়ে দেখছিল কি অভব্যতা, দাম্ভিকতার প্রতিমূর্তিকে?

চার বছরে এখন ছেলেটি কিশোর। এতদিনে সে কি জেনেছে অনুপম বিশ্বাস কে?

ঝাঁঝি আর কচুরিপানা পুকুর থেকে তুলে পাড়ে রাখা হয়েছে। সেগুলো থেকেই আঁশটে সোঁদা গন্ধটা আসছে। তাঁবুর মধ্যে দরজা- জানলা বন্ধ অবস্থায় এইরকম একটা গন্ধ তার লেগেছিল। অতগুলো মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস আর ঘাম থেকে, তাঁবুর ওপর এসে পড়া ইট, কাঠ, লোহার টুকরো থেকে, ভয়ার্ত ফিসফাস আর বাইরে থেকে আসা বীভৎস চিৎকার আর গালিগালাজ থেকে একটা আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠেছিল, যার মধ্যে অনুপম এই পুকুরপাড়ের গন্ধটা পেয়েছিল।

কে একজন তখন বলেছিল, "শুধু অনুপমকে এর জন্য দায়ি করছ কেন? সবাই তো ক্লাবটাকে ডুবিয়েছে।"

"সবাই বলতে কাকে বোঝাচ্ছিস?"

"তুমি, আমি, প্লেয়াররা, অফিসিয়ালরা। যে যার নিজের স্বার্থ আগলাতে গিয়ে এমন সব আশকারা প্লেয়ারদের দিয়েছে, এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে ডোবাবার জন্য...."

"থাক, থাক, এখন এই নিয়ে ঝগড়া করার সময় এটা নয়।... যা কখনও হয়নি তাই হল আজ, মানুষ খেপে উঠে মানুষ মারল।"

"ইচ্ছে করে মারেনি। ভিড়ের চাপে, পায়ের চাপে...ওরা পালাতে যাচ্ছিল।"

"ধোঁয়া দেখেছিলাম, আগুন লাগিয়েছে কোথাও।"

"পুলিশের উচিত হয়নি গ্যালারিতে উঠে লাঠি লার্জ করা।"

"না করলে অবস্থা কী হত জানিস? সারথির একটা প্লেয়ারও প্রাণ নিয়ে মাঠ থেকে বেরোতে পারত না।"

"কিন্তু এখন আমরা বেরোব কী করে? পুলিশ কী করছে?"

অনুপমের তখন ভোঁতা হয়ে পড়ছিল মানসিক প্রখরতা। পেশিগুলো যেন জরাগ্রস্ত। ঝিমুনি এসেছিল। চোখ আর খুলে রাখতে পারছিল না। তবু সে বাস্তব পরিস্থিতিকে মন থেকে ছিটকে যেতে দেয়নি। সে বুঝে নিয়েছিল। তাকে সবাই বলির পাঁঠা করবে। জল্লাদের সামনে তাকেই ঠেলে দিয়ে সবাই বাঁচতে চাইবে।

পুকুরের পাশ দিয়ে রাস্তাটা এবার ধনুকের মতো ঘুরে গেছে। এইটুকু পথ আসতে কতটা সময় লাগল? অভ্যাস মতো বাঁ হাত তুলল ঘড়ি দেখার জন্য। কোথায় পড়ে গেল কে জানে!

বাতাস বইছে না, তাই কনকনে ঠাণ্ডা ভাবটা নেই। হাঁটুর ওপরে হাত বুলিয়ে দেখল ফুলে উঠেছে কি না। ব্যথা হবে, কাল সকাল থেকেই বুঝতে পারবে আঘাতটা কত জোরে হয়েছে। আজ রাতেই ঠাণ্ডা-গরম করতে পারলে ভাল হয়। অনুপম ধীরে ধীরে, যতটা সম্ভব হাঁটু না ভেঙে হাঁটতে লাগল।

কীসের যেন শব্দ হল।

রাস্তার কিনারে খাড়াই ঢাল নেমে গেছে পুকুরে, এই সময় পুকুরে জল প্রায় থাকে না। ঢালে আগাছা ঝোপ আর একটা পাতা ছাড়া মাঝারি আকারের গাছ। এই ঢালে গুঁড়ি মেরে কেউ থাকতে পারে ।

দরদরিয়ে ঘেমে উঠল অনুপম। কেউ কি রয়েছে! একজন, দু'জন বা তিনজন! জানল কী করে আমি এখান দিয়ে রবিদার বাড়ি যাব। ফলো করেছিল? শিবের চত্বরে যখন বসে ছিলাম, তখন কেউ দেখে থাকবে, হয়তো সেই সাইকেলওয়ালাই। তারপর অন্য কোনও পথ ধরে এইখানে এসে অপেক্ষা করছে।

পিটিয়ে খুন করার পক্ষে জায়গাটা চমৎকার। একদিকে ফাঁকা জায়গা, বড় বড় গাছ ঘেরা কয়েকটা পাকা বাড়ি, অন্যদিকে পুকুর। নির্জন, অন্ধকার। চিৎকার করলে কোনও বাড়ি থেকে কেউ ছুটে আসবে না। কুকুরগুলো দু-চারবার ঘেউ ঘেউ করবে মাত্র।

আবার সরসর শব্দ হল। ঝোপ যেন নড়ে উঠল। চোখের ভুলও হতে পারে। অনুপম কাঠ হয়ে গেছে। কোনও মানুষ, নাকি জানোয়ার? ইঁদুর, বেড়াল, সাপ, গিরগিটি, শেয়াল কিংবা ছোটখাটো চিতাবাঘ! বুক আর পিঠ বয়ে ঘাম নামছে। মনে হচ্ছে পিঁপড়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

ছুটব কি? অনুপম কুঁজো হয়ে বাঁ পা বাড়াল রেসে স্টার্ট নেওয়ার ভঙ্গিতে। কিন্তু কতটা ছুটে পালাতে পারব? রাস্তাটা বেঁকে পুকুর ঘুরে আর একটু গেলেই রবিদার বাড়ি দেখা যাবে। তার আগেই কেউ তাকে ধরে ফেলবে। এখন তার থেকেও জোরে দৌড়তে পারবে যে-কেউই, একটা বাচ্চা ছেলেও।

অনুপমের চেতনা জুড়ে হঠাৎই একজোড়া ড্যাবড্যাবে চোখ ভেসে উঠল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেই দুটো চোখের দিকে। নিষ্পাপ, সরল, গভীর দৃষ্টি মেলে যেন বুঝতে চেষ্টা করছে, তার অপরাধটা কী? সেও তো আর সকলের মতো সই নিতেই গিয়েছিল। সই নেওয়াটা তো শ্রদ্ধা, অনুরাগেরই প্রকাশ!

চার বছর ধরে কি মনে করে রেখে দিয়েছে! চার বছরে মানুষ কত বদলায়। অনুপম কান আর চোখ তীক্ষ্ণ করে ঝোপের দিকে তাকাল। মনে হচ্ছে না ওখানে কোনও মানুষ আছে। থাকলে এতক্ষণে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। চার বছর সে নিজেও কত বদলে গেছে, ছেলেটাও নিশ্চয়ই কঠিন, নিষ্ঠুর, হিংস্র পরিবেশের থেকে রেহাই পায়নি।

অনুপম এগোতে লাগল। একটা টালির বাড়ি। একটা জানলা আধভেজানো। হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে। ঠং করে বাসন রাখার শব্দ এল। সে আশ্বস্ত বোধ করল। মিছিমিছিই ভয় পাচ্ছিল এতক্ষণ। এতদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে কে আসবে

তাকে মারতে? কী জন্যই বা তাকে মারবে? আটজন মারা গেছে, এটা খুবই দুঃখের। কিন্তু সেজন্য তাকে কেন দায়ী করা হবে, সে কি নিজের হাতে তাদের মেরেছে? তাকে মারধোর করে কী লাভ, হারা ম্যাচটা কি তাতে জেতা যাবে? তাকে মেরে ফেললে সারথির ট্রফি জেতার রাস্তা পরিষ্কার হবে?

"যত্তসব আজেবাজে ভয়।" অনুপম নিজের মনে বিড়বিড় করে মুখ তুলে রবিদার বাড়ির দিকে তাকাল।

ব্যাপার কী, সদর দরজার দু' ধারে বসার জন্য সিমেন্টের রক। তার ওপরের বাল্‌বটা এত রাতে জ্বলছে যে! দোতলায় দক্ষিণের দুটো ঘরের খোলা জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে, বারান্দাটা অন্ধকার। একতলার ঘরের জানলা বন্ধ, ভেতরে আলো জ্বলছে। গ্রিল ঘেরা বাইরের দালানটাও অন্ধকার। সদরের কাঠের দরজা আর কোলাপসিবল গেট পুরো বন্ধ নয়। ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসছে না। এত রাত্রে অন্ধকারে গ্রামের মধ্যে আলো-জ্বলা অথচ নিঝুম বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অনুপম হতভম্ব হয়ে গেল। তার মনে হল, কিছু একটা ঘটেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সে দু' পা পিছিয়ে গেল।

রবিদার বাড়ি কি ওরা অ্যাটাক করেছিল! হতে পারে। অনুপম বিশ্বাসের আত্মীয় বলে হয়তো আক্রোশে রবিদাকেই মারধোর করেছে। অবশ্য রবিদা এখানকার নানান ব্যাপারে টাকা খরচ করে। খুবই জনপ্রিয়, নির্বিরোধ, আমুদে। কিন্তু মানুষকে তো এখন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। দুলোদা তাকে তো প্রায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেল।

অনুপম সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। বাঁ দিকে দোতলার সিঁড়ি। রবিদা আর বউদি দোতলায় থাকে। একতলায় এক দম্পতিকে চার বছর আগে সে ভাড়া থাকতে দেখেছিল। হয়তো এখনও তারা রয়েছে। কিন্তু অন্য কেউ...ওরা কেউ আছে কি না সেটা বুঝে নিতে হবে। এই সময় সদর দরজা খোলা। আলো-জ্বলা যথেষ্ট অস্বাভাবিকই।

অনুপম বাড়ির বাইরে এসে প্লাস্টার না-হওয়া পাশের একতলা বাড়ির দিকে এগোল। রবিদার বাড়ির সঙ্গেই লাগোয়া নিচু পাঁচিল, ঘরের জানলায় পরদা, ভেতরে আলো জ্বলছে। এদেরও বাইরের দালানে গ্রিল দেওয়া। ভেতরে যাওয়ার দরজাটা খোলা। বাড়ির ছাদে অ্যান্টেনা নেই দেখে সে আশ্বস্ত হল।

বয়স্কার গলার শব্দ ভেতর থেকে ভেসে এল, "বউমা, দালানের দরজাটা বন্ধ করে দাও, সন্তু এলে বরং খুলে দিয়ো...দ্যাখো আজ আর ফেরে কি না।"

সরে এল অনুপম। এই বাড়ির সন্তু নামে কেউ এখন বাইরে। রবিদার ওপাশের বাড়িটা একটু তফাতে, জঙ্গুলে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে। ইট বের করা, জরাজীর্ণ। ভাঙা দোতলা বাড়ি। তেঁতুলতলারই একদা ধনী, প্রাচীন কোনও পরিবার থাকে।

"কে?"

অনুপম চমকে উঠে থরথরিয়ে কাঁপল। দোতলা থেকে কেউ থাকে লক্ষ্য করেই বলল। মুখ তুলে রবিদার বারান্দায় সে আবছা একটা মাথা দেখল। আপনা থেকেই

তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "রবিদা আছে? আমি অনু।"

মাথাটা সরে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর আর-একজন এল ব্যস্ত ভঙ্গিতে। ঝুঁকে তাকে দেখেই "ওহ নাহ্" ধরনের একটা শব্দ করে বলল, "অনু ঠাকুরপো!... ওপরে চলে এসো, তাড়াতাড়ি।"

শুনেই কেঁপে উঠল অনুপম। কী রকম যেন চাপা ভয় আর উত্তেজনা নিয়ে 'তাড়াতাড়ি' শব্দটা তার দিকে ছুড়ে দিল!

আবার সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দোতলার সিঁড়ির দিকে ঘুরতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একতলায় ভাড়াটেদের দরজা অল্প ফাঁক করে একটি বছর চারেকের শিশু দাঁড়িয়ে, তার পেছনে একটি বউ, বোধ হয় ওর মা।

বউটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ছ্যাঁত করে উঠল অনুপমের বুক। একটা অসহায় করুণ আর্তি নিয়ে দুটি চোখ তার কাছে কিছু যেন জানতে চাইছে।

চার বছর আগে এই বাড়িতে কয়েক ঘণ্টার জন্য থাকলেও নীচের ভাড়াটেদের সে দেখেনি। বউটিকে সে এই প্রথম দেখল। শিশুটি এক পা পিছিয়ে শাড়ির আঁচল ধরল। টানা টানা চোখ দুটি ঘুমের ভারে শ্রান্ত। এখনও বাচ্চাটা ঘুমোয়নি কেন?

"কোনও খবর পেলেন?" ব্যাকুল কিন্তু মৃদু স্বরে জানতে চাইল বউটি। অনুপম বিভ্রান্ত হল। কারও জন্য অপেক্ষা করছে বোধ হয়।

"কীসের খবর?"

"আপনি কি ওদের সঙ্গে কলকাতায় গেছলেন?"

অনুপমের সিক্সথ সেন্স সজাগ হয়ে উঠল। তার মনে হল, কিছু একটা ঘটেছে এখানে, যে জন্য এত রাতেও আলো জ্বলছে, সবাই জেগে। নিশ্চয়ই কোনও বিপদ-আপদ।

"না তো!" অনুপম চোখের কোণে দেখল সিঁড়ির বাঁকে মুখ বাড়িয়ে বউদি হাতছানি দিয়ে তাকে ওপরে আসতে ইশারা করছে।

"না, আমি তেঁতুলতলার লোক নই।"

কথাটা বলেই অনুপম সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বাঁ হাঁটু ভাঙতে না পারায় ঠোক্কর খেয়েছে। অপ্রতিভ হয়ে পেছন ফিরে দেখল দু' জোড়া চোখ দরজার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে। অবসন্ন, হতাশ, উদ্বেগে কাতর আর কৌতূহলী বিস্ময় নিয়ে সারল্যে ভরা দু' রকম চাহনি। অনুপম হাসল, যে হাসির কারণটা সে নিজেও জানে না।

সিঁড়ি থেকেই বউদি হাত ধরে তাকে টেনে ঘরে নিয়ে এল।

"কী ব্যাপার বউদি, রবিদা কোথায়?"

"চুপ, আস্তে। তোমার দাদা পাড়ার দু' জনকে নিয়ে কলকাতায় গেছেন।"

বউদির ত্রস্ত চোখ খোলা জানলায় গিয়ে পড়ল। জানলার পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে এসে ঘরের দরজায় দাঁড়ানো ফ্রকপরা কিশোরীটিকে ধমক দিয়ে বলল, "অমন হাঁ করে কী দেখছিস, রান্নাঘরটা ধুয়ে পরিষ্কার কর।"

"করেছি।"

"তা হলে দালানে গিয়ে বোস, ঘুমোসনি। সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয়, কতক্ষণ আর খোলা রাখা যায়। আলোটা জ্বালাই থাক আর রাস্তার দিকে নজর রাখিস। মেসোমশাইরা কখন ফিরবেন কে জানে!"

অনুপম বিমূঢ়ের মতো বউদির কথা শুনে যাচ্ছিল আর নিশ্চিত হচ্ছিল, বড় ধরনের কোনও বিপর্যয় এই বাড়িতে আজ ঘটে গেছে। কী সেটা?

"নিয়তির কী পরিহাস ঠাকুরপো, তুমি কিনা আজই এলে?"

"কী হয়েছে?"

বউদি যে ভাবে খাটের ওপর বসে পড়ল তাতেই অনুপম বুঝল টেনশনটা আর নিতে পারছে না।

"না এলেই ভাল হত, তোমার আর আমাদের...সবারই একদিক থেকে ভাল হত। এখন সমস্যাটা আরও বেড়ে গেল।"

"হয়েছে কী, সেটা তো আগে বলবে? আমি খুব বিপদে পড়েই এখানে এসেছি। তোমাদের যদি কোনও অসুবিধে হয় আমি চলে যাব, আজ রাতটা থেকে কাল ভোরেই চলে যাব।"

ঘরের একধারে টেবল আর চেয়ার। অনুপম চেয়ারটার দিকে এগোবার সময় খোঁড়াল। বউদি সেটা লক্ষ করে বলল, "কী হয়েছে পায়ে?"

"লেগেছে...লোহার রড দিয়ে মেরেছে।"

চাপা আর্তনাদ করল বউদি।

"কখন, কোথায়...মাঠেই?"

"হ্যাঁ।"

অনুপম চেয়ারে বসে আলতো স্বরে "আহ্" বলল। অনেকক্ষণ পর হাঁটুটা ভারমুক্ত হল।

"খুব কি গোলমাল হয়েছে?.. অনেক লোক নাকি মারা গেছে?" বউদি ঝুঁকে ফিসফিস করে এমন ভাবে বলল, যেন কোনও গুপ্তকথা ফাঁস করে দিচ্ছে।

"আমি দেখিনি, দেখার মতো অবস্থায় আমি ছিলাম না। পরে শুনেছি আটজন নাকি স্পট ডেড। ভয়ে পালাতে গিয়ে ভিড়ের চাপে আর পায়ের নীচে পড়ে...আর বহু লোককে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।"

"কোন হাসপাতালে?"

"বোধ হয় পিজি-তে। আমার তখন ওসব খবর জানার মতো অবস্থা ছিল না বউদি, আমি নিজেই তখন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত ছিলাম। দেখছ না, নিজের ঘরে কি আর কোথায় না গিয়ে তোমাদের এখানে এসেছি রাতের অন্ধকারে...একটা চোরও আমার থেকে এখন অনেক নিরাপদ, কেননা কেউ তাকে চেনে না বা দু-চারজন চেনে। সে সাহসভরে রাস্তায় হাঁটতে পারবে কিন্তু আমি পারব না। আমি বিখ্যাত। আমার ছবি বহুবার কাগজে, ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে, টিভিতে কতবার দেখানো হয়েছে। সারা দেশ আমার মুখটা চেনে। আমাকে এখন মানুষের চোখের আড়ালে চলে যেতে হবে, লুকিয়ে থাকতে হবে...তাই তো এখানে চলে এলাম।"

একটানা কথাগুলো বলে অনুপম উত্তেজিত হয়ে উঠল। ঝুঁকে, ব্যগ্র চাহনিতে বহু ধরনের প্রশ্ন রেখে সে বউদির দিকে তাকিয়ে রইল। সে বুঝতে চেষ্টা করছে, এখানে আজ তাকে আশ্রয় দেওয়া হবে কি না।

"এমন হল কেন?" আগের মতো ফিসফিস স্বরে বউদি বলল, "তোমার এত নাম, যশ, সম্মান, হাজার হাজার লোকের এত শ্রদ্ধা, ভালবাসা, টাকাও যথেষ্ট করেছ, তবু কেন আজ এই দশায় পড়লে?...তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো পালাতে হচ্ছে কেন?"

জবাব না দিয়ে অনুপম শুধু চোখের পাতা টেনে নামাল। কী বলবে সে মাঠ থেকে বহু দূরে জীবনযাপন করে এমন এক গৃহস্থ বউকে! কেন, কেন, কেন...সব কেনর কি উত্তর হয়? একটা ফুটবলার কি সারাজীবন একই পর্যায়ে ফর্ম রেখে খেলে যেতে পারে? এটা কি রান্না করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা?

"জানো, আজ কী ব্যাপার হয়েছে?"

অনুপম সন্ত্রস্ত হয়ে গেল বউদির কণ্ঠস্বরে। তার মন বলছে, কিছু একটা ঘটেছে যার সঙ্গে সে সরাসরি না হলেও জড়িত। ভাল নয়, আজ কিছুই তার পক্ষে ভাল নয়। সর্বনেশে কিছু একটা বউদি তাকে বলবে।

"কী হয়েছে।" অনুপমের গলা বসে গেল। ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে শুধু। সে বলতে চাইছিল—আমার জন্যই কি?

"নীচের ভাড়াটে, প্রদীপবাবু...প্রদীপ হালদার, দেখেছ কি ওকে?"

"না। অনেক লোক সেদিন আলাপ করতে এসেছিল, মনে হয় না তোমাদের ভাড়াটে বলে রবিদা কারও সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়েছিল।"

"তখন সবে এসেছে বউ আর সঙ্গে চার মাসের ছেলে। অফিসের পরীক্ষায় পাশ করে আমাদের এখানকার ব্যাঙ্কেই প্রথম পোস্টিং। চাষিদের লোনটোন দেওয়ার ভার ওর ওপরেই। খেলাধুলোয় কোনও আগ্রহই নেই। তোমার দাদা ওর কাছে তোমার কথা বলতেন। একদিন বলল, 'দেবেন তো একটা টিকিট, একদিন আপনার ভাইয়ের খেলা দেখে আসব।' তাই তোমার দাদা টিকিটটা ওকে—"

"আজ খেলা দেখতে গেছল।" বউদিকে শেষ করতে না দিয়ে অনুপম নিজেই কথাটা সম্পূর্ণ করে তিক্ত মুখে তাকিয়ে রইল।

"হ্যাঁ।"

"এখনও বাড়ি ফেরেনি।"

"না।"

দু'জনেই চুপ করে রইল। একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কায় ছেয়ে গেল দু' জনের ভাবনা। যে আটজন মারা গেছে তাদের মধ্যে হয়তো প্রদীপ হালদার রয়েছে।

"কখনও বড় ম্যাচ দেখতে মাঠে যায়নি?"

"ছোট কি বড় কোনও ম্যাচই নয়, জীবনে এই প্রথম কলকাতার মাঠে খেলা দেখতে গেল। কী বিচ্ছিরি একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লুম বলো তো। টিকিট দিয়ে তোমার দাদাই তো পাঠিয়েছিলেন। কে জানত যে, এই রকম একটা কাণ্ড খেলার মাঠে ঘটবে।"

বউদি অসহায় চোখে অনুপমের দিকে তাকাল। চোখ সরিয়ে সে দরজার দিকে রাখল। তারপর মুখ ফিরিয়ে ট্রলির ওপর রাখা টিভি সেটটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

"টিভিতে খেলা দেখেছিলে?"

"তোমার দাদা আর পাড়ার কয়েকজন দেখছিলেন।"

"মাঠে গোলমাল দেখিয়েছে।"

"আমি তো খেলা দেখিনি, ওসব কিছু বুঝিটুঝি না, দেখিয়েছে কি না বলতে পারব না। নীচে মণির সঙ্গে, প্রদীপের বউ, ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন। ওপরে খুব হইচই চেঁচামিচি হচ্ছিল, তারপর কেমন যেন চুপ হয়ে গেল। তোমার দাদা গুম মেরে বারান্দায় বসে রইলেন।"

"তা হলে মাঠে যে গোলমাল হয়েছে সেটা জানলে কী করে?"

"সাতটা নাগাদ গোপাল আর ক'জন খেলা দেখে ফিরে এসে মাঠের ঘটনা বলতেই তো আমরা জানলুম। শুনে তো আমার রক্ত জল হয়ে গেল। পঞ্চাশ-ষাটজন নাকি পায়ের চাপে থেঁতলে মারা গেছে। তারপর কী খারাপ খারাপ কথাই না ওরা তোমার সম্পর্কে বলল যে..."

"রবিদা শুনে কী বলল?"

অনুপম জানতে চায়, তার পক্ষ নিয়ে অন্তত একজনও বিরোধিতার সামনে তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। রবিদা ছাড়া আর কেউ যে এখন তার সহায় হবে না, এমন একটা আশা নিয়ে সে প্রশ্ন করল।

"উনি আর কী বলবেন, মুখ বুজে সব শুনে গেলেন! ওরা চলে যাওয়ার পর বললেন, অনুর জন্যই আজ মাঠে এতগুলো নিরীহ লোক মারা গেল। এখানকার লোকে বলবে, আমার ভায়ের জন্য একটা মেয়ে আর তার বাচ্চা পথে বসল। আজীবন এই কথা শুনতে হবে।"

"এই কথা বলল রবিদা!"

"হ্যাঁ। বললেন, এখন আমি ঘরে বসে থাকলে ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে, অমানবিক হবে। আমিও বললাম, খোঁজ নিতে যাওয়া তোমার কর্তব্য, দোষের ভাগী তো তুমিও।"

অনুপম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কপালে ঘামের বিন্দু ফুটছে। মাথার মধ্যে হাজার হাজার গলায় তালগোল পাকানো চিৎকার ওঠানামা করছে। মনে মনে সে আউড়ে গেল, ভুল করেছি, মারাত্মক ভুল করেছি এখানে এসে।

"ঠাকুরপো আজ তোমার এখানে আসা কেন জানি ভাল ঠেকছে না। প্রদীপের খবর না পাওয়া পর্যন্ত মনের মধ্যে কী যে এখন হচ্ছে। ওরা ভাল খবর আনুক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করে যাচ্ছি।"

নীচে সিঁড়িতে কার গলার শব্দ শোনা গেল। অনুপম চকিতে বউদির দিকে তাকিয়ে দেখল মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

"কে? রবিদার গলা তো নয়!"

"বুঝতে পারছি না। দেখছি।" বউদি ব্যস্ত পায়ে ঘরের বাইরে যাওয়ার সময়

দরজার পরদাটা টেনে দিল। অনুপম প্রায় লাফিয়ে সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে ঘরের আলোটা নিভিয়েই ভাবল স্টিলের আলমারিটার আড়ালে দাঁড়াবে কি না।

একটু পরেই বউদি ফিরে এল। ঘর অন্ধকার। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অনুপমকে উদ্দেশ করে বলল, "আলো নেভানোই থাক। তুমি এখন ঘরের বাইরে এসো না। কাছেই থাকে একটা ছেলে, খোঁজ নিতে এসেছিল। বলল, বাজারে স্টেশনারি দোকানের মালিকের ছোট ভাই খেলা দেখতে গেছল, সেও ফেরেনি। তোমাদের দু'জন প্লেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আর গড়ের মাঠের অনেক জায়গায় নাকি নিরীহ লোকদের ধরে ধরে মারা হয়েছে, চৌরঙ্গিতে অনেক দোকান ভাঙচুর করে লুটপাট হয়েছে, ট্রামে-বাসে ঢিল মেরেছে। আমাদের সাবধানে থাকতে বলল।"

"তোমাদের এখানে আর কী হবে?"

"হবে না, এ-কথা বোলো না।" বউদির স্বরে আতঙ্কের ছোঁয়াটা স্পষ্ট বোঝা গেল। "তোমার দাদা পঞ্চমুখে এখানকার লোকের কাছে তোমার খেলা সম্পর্কে যে প্রশংসা করেন..."

যে-কথা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল তা বুঝে নেওয়ার মতো বুদ্ধি অনুপম এখনও হারায়নি। তার এখানে আসাটা বউদি পছন্দ করেনি। গৃহকর্ত্রীর অপছন্দ সত্ত্বেও আজ রাতটা অন্তত তাকে এখানে থাকতে হবে।

"আমি কালকেই চলে যাব। এখানে রয়েছি, এটা জানাজানি না হওয়াই উচিত। কেউ আমাকে এখানে আসতে দ্যাখেনি সুতরাং তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

অন্ধকারে সে বুঝতে পারল না, তার কথা শুনে বউদির মুখে কতটা স্বস্তি ফুটে উঠল।

"না, ভয় আমি পাচ্ছি না। ভয় এখন তোমাকে নিয়ে। এখানে দু'দিন ধরে ছেলেধরার কথা শোনা যাচ্ছে। গ্যাঁদালপাড়ায় কার ছেলেকে নাকি ফুল শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে পুকুরপাড়ে ফেলে রেখে গেছে। আর একটা বাচ্চাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দোকানে বিস্কুট কিনছিল। দোকানির সন্দেহ হওয়ায় দু-চারটে প্রশ্ন করতেই লোকটা সাইকেল চেপে পালায়। অচেনা অপরিচিত লোক দেখলেই এখানে ঘিরে ধরছে।"

"আর যাই হোক ছেলেধরা বলে আমাকে অন্তত এখানকার লোক পিটোবে না। তবে তোমরা যাতে হ্যারাশমেন্টের টার্গেট না হও, সেটাই এখন দেখা দরকার। রবিদা কখন বেরিয়েছে?"

"গোপালরা এসে বলার পরই উনি আমাকে বললেন, দ্যাখো তো প্রদীপ ফিরেছে কি না। নীচে গিয়ে দেখলুম ফেরেনি। মণি বলল, তাড়াতাড়িই ফিরবে বলে গেছে। ওঁকে নিয়ে দোকানে গিয়ে ফ্রিজ পছন্দ করে আসার কথা বলে সেজেগুজে অপেক্ষা করছেন। তারপর ন'টা যখন বাজল তোমার দাদা বললেন, ভাল মনে হচ্ছে না, বেরিয়ে একটু খোঁজখবর করি। পাশের বাড়ির সন্তুকে গিয়ে বললেন, তারপর আরও দু' তিনজনের সঙ্গে কথা বলে, এখানে প্রাইভেটে ভাড়া খাটায় একজন, তার গাড়িতে সন্তুকে নিয়ে উনি কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন। বললেন, আগে লালবাজারে খোঁজ

নেবেন, তারপর হাসপাতালে।"

অনুসন্ধিৎসু হয়ে অনুপম কোনও প্রশ্ন করল না। করার কিছু নেইও। প্রদীপ হালদার আটজনের একজন হতে পারে, নাও পারে। আহতদের মধ্যে থাকতে পারে, নাও পারে। যা হওয়ার হয়ে গেছে, এই নিয়ে ভেবে তার নিজের সঙ্কটের কোনও সুরাহা হবে না।

"বউদি, তোমার ফ্রিজ চলছে?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"বরফ চাই আর গরম জল, পাওয়া যাবে? রডটা হাঁটুতে লেগে মুশকিলে ফেলেছে, ভাল করে চলতে পারছি না। তোমাদের বাজারের কাছাকাছি শিবতলায় একজন মোটরে নামিয়ে দিয়ে গেল, সেখান থেকে হেঁটে আসছি। এখন আর হাঁটু ভাঙতে পারছি না। পেলে একটু ঠাণ্ডা-গরম লাগাতাম।"

"এখুনি বরফ আর গরম জল দিচ্ছি।" বউদি ঘর থেকে বেরিয়ে "পঞ্চি, এই পঞ্চি, বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

অন্ধকার ঘরে দুই তালুতে মুখ ঢেকে, সামান্য কুঁজো হয়ে অনুপম বসে রইল। এই মুহূর্তে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছু নেই। বর্তমানটা তালগোল পাকিয়ে একটা ফুটবলের রূপ নিয়েছে, যেটা নিয়ে খেলতে তার কোনও আগ্রহ নেই।

অতীতের দিকে কত দূর পর্যন্ত অনুপম এখন যাবে? রবিদার সময় পর্যন্ত? যখন রবিদা তাদের বাড়িতে থাকত। বিদ্যুৎপুর স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে গোল পোস্টের পেছনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখত একটা কারণেই। খেলার উদ্দেশ্য গোল দেওয়া, তাই বল মারা হত গোলের দিকে। বেশির ভাগ বল গোলের বাইরে দিয়ে চলে যেত। অনুপম দৌড়ে কুড়িয়ে এনে হাই কিক্ করে সেটা মাঠের ভেতর পাঠিয়ে দিত। শুধু এই কিক্টা করার উত্তেজনা বা সুখ পাওয়ার লোভ তাকে 'বল কুড়োনে অনু' নামে স্কুলে চিহ্নিত করে।

বড়দের মাঠের লাগোয়া ছোট জমিটায় খেলত ছোটরা। অনুপমের ফুটবল খেলার শুরু সেখান থেকেই। কী করে ফুটবল খেলতে হয় সেটা একজনও তাকে শেখায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই খেলাটা তার কাছে এসেছে। বড়দের খেলা দেখে দেখে, বিশেষ করে রবিদার, সে অনুকরণের চেষ্টা করত। বড়রা মাঝেমধ্যে কলকাতায় গিয়ে খেলা দেখে এসে সেই ভাবে খেলতে চাইত। তবে তাদের মধ্যে ফুটবল খেলে প্রতিষ্ঠা অর্জনের কোনও চিন্তা ছিল না।

খেলার আগে যখন দুটো দল তৈরির জন্য ছেলেরা জড়ো হত, তখন মুশকিল হত অনুপমকে নিয়ে। দু' দলই তাকে চাইত। তাই নিয়ে ঝগড়া, হাতাহাতিও হয়েছে। অনেকদিন তাকে দুই দলের হয়েই আধাআধি করে খেলে খুশি করতে হয়েছে দু' পক্ষকে।

লাথালাথি, ঘুসি, খিমচে দেওয়া, এগুলো হতই। প্রায় সবাই ছিল তার থেকে বয়সে বড়। অনুপম বল ধরলেই পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বা পায়ের গোছে লাথি মেরে বা সররা কেটে ফেলে দিয়ে তাকে বলচ্যুত করাই ছিল বিপক্ষের অন্যতম সফল

কাজ। প্রথম প্রথম সে খেপে উঠত, চিৎকার করত, খেলা ছেড়ে মাঠের ধারে গিয়ে বসে থাকত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে মার খাওয়া থামাতে পারেনি।

একদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরল। রবিদা কারণ জিজ্ঞেস করে, সব শোনার পর শুধু বলেছিল, "তুই মার খাচ্ছিস যেহেতু তুই ওদের থেকে ভাল খেলিস। যখন মার খাবি না তখন বুঝবি তুই খারাপ খেলছিস, সেটাই তখন দুর্ভাবনার বিষয়। যে যত বড় হয় ততই লোকে তার নিন্দেমন্দ করে, তার দোষ খোঁজে, তার পেছনে লাগে। এটা আমাদের স্বভাব। এবার থেকে তুই চেষ্টা কর নিজেকে বাঁচিয়ে খেলার।"

রবিদার কথাগুলো তার যে কী উপকারে লেগেছিল সেটা অনুপম বহুবার মনে মনে স্বীকার করেছে ভারতের এক নম্বর মিডিও হয়ে। সেই বিদ্যুৎপুরের ছোটবেলার ফুটবল থেকেই সে জানতে পারে, হঠাৎ যদি নিজের দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দেয় কিংবা বল ধরার সময়টাকে নিখুঁত আন্দাজে বুঝে নিয়ে যদি এগোয় তা হলে বিপক্ষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারবে। কখন তাকে মারতে আসবে, সেটা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতাও সে ওই সময় পেয়ে গিয়েছিল।

লোকে এটাকেই তার সিক্সথ সেন্স বলে। এটাই তাকে আজ বাঁচিয়েছে, এটা কি তাকে কাল বাঁচাবে?

অবশ্যই তাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। রবিদাকে হেনস্থা হতে হবে সে জন্য নয়। নীচের প্রদীপ হালদারের বউ আর বাচ্চাটির জন্যই তার এখানে থাকা সম্ভব নয়। ঘুরেফিরে মাঠের এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটার জন্য সব দায় তার ঘাড়েই চাপবে। দুলোদার কথাগুলো—"আজ অনেকগুলো প্রাণ তুই নিয়েছিস," আমৃত্যু তার কানে ফিসফিস করে যাবে। সব মৃত্যু, সব আঘাত, সব ক্ষয়ক্ষতির দায় তাকেই বইতে হবে। কারণ গোল থেকে বারো গজ দূরে বসানো একটা বলে সে যে শটটা নিয়েছিল সেটা বারের ওপর দিয়ে উড়ে চলে যায়।

অনুপমের মুখ থেকে একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ গোঙানির মতো বেরিয়ে এল। সেটা হাঁটুর ব্যথার জন্য হতে পারে। সে অন্ধকার ঘরে এধার-ওধার তাকিয়ে টিভি সেট, খাট, আলমারি, টেব্‌ল ছাড়া আর কী কী আছে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। এত অন্ধকার, কিছুই আন্দাজে আসছে না। অথচ পরদার তলা দিয়ে দালানের আলো সে দেখতে পাচ্ছে। কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছে।

অনুপম এটুকু বুঝতে পারল, তার ইন্দ্রিয়গুলো একেবারে অসাড় হয়ে যায়নি।

বউদি ঘরে এসে আলো জ্বালল। বেরিয়ে গিয়ে আবার ঢুকল ডেকচি হাতে। তাতে গরম জল থেকে ধোঁয়া উঠছে।

"বরফ ভাল জমেনি। দুপুর পর্যন্ত লোডশেডিং ছিল। ধারেকাছে কারও বাড়িতে ফ্রিজও নেই যে, আনিয়ে নেব।"

"ঠাণ্ডা জল থাকে তো তাতেও হবে। দুটো বালতি আর একটা মগ দাও...জলটা বড্ড গরম, এতে একটু ঠাণ্ডা জল ঢেলে দাও।"

অনুপম উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পায়ে জোর পেল না। চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ হেসে বলল, "রেস্ট পেলেই ঠিক হয়ে যাবে। এসব আমার অভ্যেস আছে।"

বউদি অনুপমের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার বোধ হয় খিদে পেয়েছে ঠাকুরপো।"

"না, না, একদম নয়। আজ রাতটা উপোস দেব, শরীর ফিট থাকবে।" যদিও ঘণ্টা দশেক তার পাকস্থলীতে শক্ত কোনও খাদ্য পৌঁছয়নি তবু অনুপম বিন্দুমাত্র খিদে বোধ করছে না।

বউদি বালতি, মগ, তোয়ালে, ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জল ভরা দুটো বোতল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস ঘরে এনে দিয়ে বলল, "মেঝেয় যদি জল পড়ে তো পড়ুক, আমি মুছে দেব। রাতে অল্পবয়সি বউটা বাচ্চা নিয়ে একা থাকবে, আমি এখন নীচে গিয়ে রাতটা ওর সঙ্গেই থাকব। বেচারা একেবারে...।"

বউদিকে থামিয়ে অনুপম অসহায় এবং কিছুটা ভীত স্বরে বলে উঠল, "আমি কোথায় থাকব। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই এই ঘরটা, বাইরের কেউ যদি এসে পড়ে?"

বউদিকে বিচলিত দেখাল। সমস্যার এই দিকটা বোধ হয় ভেবে দ্যাখেনি। ইতস্তত করে বলল, "কাজের মেয়েটা জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কে হও। ও আগে তো তোমায় দ্যাখেনি। তুমি আমাকে বউদি বলছ তাই বাপের বাড়ির কেউ হও বলতে ভরসা হল না। আবার ওনার ভাই হও বললে যদি পঞ্চি বাইরে কারও কাছে বলেটলে বসে এই ভেবে তাও বলতে পারলাম না। শেষমেশ বললাম, তোর মেসোমশায়ের আলুর ব্যবসার একজন বড় খদ্দের, ভাইয়ের মতো। আলু নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিল, টেম্পোটা উলটে গিয়ে পায়ে চোট লেগেছে তাই রাতটায় থাকতে এসেছে।"

শেষকালে আলুর খদ্দের! তাকে এখন দেওর বা ভাই বলে পরিচয় দিতে ভয় পেল। মুহূর্তের জন্য অনুপমের মনে হল শিকড়হীন একটা গাছের মতো সে খাড়া রয়েছে। আঁকড়ে ধরার মতো জমি তার নীচে নেই। তার নিজের কেউ নেই, কিস্‌সু নেই।

"পঞ্চি বোকাসোকা মেয়ে, যা বলবে বিশ্বাস করবে। কিন্তু ভেতর দিকে ঘর বলতে, কলঘরের পাশে একটা আছে, হাবিজাবি ভাঙাচোরা জিনিস রাখা হয়। থাকতে পারবে? তবে চট করে কেউ দেখে ফেলতে পারবে না।"

"খুব থাকতে পারব।"

বউদি ইতস্তত করতে লাগল। অনুপম জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে।

"খুব নোংরা হয়ে রয়েছে, আর একটা মাত্র জানলা।"

"চারটে দেয়াল আর মাথায় ছাদ আছে এমন যে-কোনও জায়গায় এখন আমি থাকতে পারব।"

"লোহার ফোল্ডিং খাটটা তা হলে বের করতে বলি পঞ্চিকে।"

বউদি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট পনেরো পর পঞ্চি ঢুকল। খালি গায়ে তোয়ালে পরা অনুপমকে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

"মাসিমা কোথায়?"

"বিছানা করে মশারি টাঙাচ্ছে।"

ঠাণ্ডা-গরম জলে সেঁক দিয়ে অনুপমের মনে হচ্ছে হাঁটুটা যেন একটু সহজ

লাগছে। চেয়ারে বসে পা দুটো সামনে তুলে আবার নামাল। কয়েকবার করল। প্যান্টটা দু' পায়ে গলিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে টেনে পরে নিল।

"টেম্পোটা উলটোল কী করে?" পঞ্চির কৌতূহলী প্রশ্ন।

"খুব জোরে যাচ্ছিল। সামনে হঠাৎ একটা ছাগলছানা ছুটে আসতেই সেটাকে বাঁচাতে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল আর ব্যস সঙ্গে সঙ্গে বে-টাল হয়ে কাত হয়ে পড়ল।"

"আলুগুলো কী হল?"

"বস্তার মধ্যে ছিল তাই আর ছড়িয়ে যায়নি।"

"আর যারা ছিল তাদের কী হল?"

'কিছু হয়নি। শুধু আমারই হাঁটুটায় লেগেছে। ওরা সব টেম্পোটাকে তুলে সোজা করে বসাল। বস্তাগুলো তুলল। কিন্তু গাড়ির একটা পাইপ ভেঙে গেছে, না সারালে চলবে না। ওরা মিস্ত্রি খুঁজতে গেছে, কখন ফিরবে কে জানে। আমি দেখলাম কাছেই দাদার বাড়ি তাই চলে এলাম।"

"মেসোমশাইও নীচের দাদাকে খুঁজতে বেইরেচে, এখনও ফেরেনি।...কখন ফিরবে কে জানে!"

"নীচের দাদা কোথায় গেছে?" অনুপম প্রশ্নটা করেই ভাবল জিজ্ঞেস না করলেই ভাল হত। তাকে জড়িয়ে যে দুঃখের ঘটনা ঘটেছে বা হয়তো ঘটেনি, সেটা নিয়ে আর নাড়াচাড়ার দরকার কী! কিন্তু মনের গভীরে কী একটা অস্বস্তি খচখচ করে বিঁধে চলেছে, যে জন্য সে কৌতূহলও সংবরণ করতে পারছে না।

"আজ কলকাতায় ফুটবল খেলা ছিল, খুব বড় খেলা! মেসোমশাইয়ের ভাই, সে খুব ভাল, নামকরা প্লেয়ার, সে খেলবে। আপনি জানেন না? এখান থেকে কত লোক খেলা দেখতে গেছে। আমাদের এখানে টিভি দেখতেও কত লোক এসেছিল। নীচের দাদা তো খেলা দেখতে কলকাতায় গেছে, এখনও ফেরেনি।"

"কেন? খেলা তো অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে।"

"সেইজন্যই তো এত ভাবনায় সবাই পড়েছে।" পঞ্চি হঠাৎ গলা নামিয়ে দিয়ে যোগ করল, "খেলার মাঠে আজ খুব মারপিট হয়েছে, অনেক লোক মরেছে। আপনি জানেন না?"

"না তো! তুমি জানলে কী করে?"

"এখানে সবাই বলছিল। মেসোমশাইয়ের ভাইয়ের জন্যই—"

ঘরে ঢুকল বউদি।

"পঞ্চি তুই শুতে যা। ঠাকুরপো এসো, ঘরটা দেখিয়ে দিই।"

বউদি যে ঘরটিতে অনুপমকে নিয়ে গেল সেটি লম্বায় দশ ফুট, চওড়ায় আট ফুট। লোহার পাইপের নাইলন ফিতের খাটে তোশক পাতা। একটা নীল রঙের মশারি তিনদিকের দেয়ালে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার আর একদিকের দড়িটা দরজা বন্ধ করে ছিটকিনিতে বাঁধতে হবে। ঘরে এক হাত চওড়া দু' পাল্লার একটা বন্ধ জানলা। ঘরে জ্বলছে একটা টিউব বাতি।

বাঁশের ধামা, চটের বস্তা, থাক দেওয়া খালি টিনের কৌটো, ক্যানেস্তারা থেকে

পুরনো খবরের কাগজ, ছবির ফ্রেম, ভাঙা হ্যারিকেন, পুরনো ছেঁড়া জুতো এবং অন্যান্য জিনিসের একধারে খাটটা পাতা। ঘরে পা ফেলার জায়গা নেই বললেই হয়।

ঘরে ঢোকা মাত্র অদ্ভুত একটা বোঁটকা গন্ধ অনুপমকে থমকিয়ে দেয়। সে কোনও ভাবান্তর প্রকাশ করেনি। এখন পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের সময় নয়। ভাগ্য যা দিচ্ছে সেটাই মুখ বুজে মেনে নেওয়া উচিত। সে ধনী বা সম্পন্ন পরিবারের সন্তান নয়। বিদ্যুৎপুরের বাড়িতে জন্ম থেকে যেভাবে থেকেছে সেটা এই গন্ধের মতো এতটা উৎকট না হলেও, মলিনতায়, অপরিচ্ছন্নতায় কাছাকাছিই।

"কী করব বলো, ভাল ঘর দুটো বাইরের দিকে। বিচ্ছিরি লাগছে তোমাকে এখানে—"

অনুপম থামিয়ে দিয়েছিল, বউদিকে।

"পাশেরটাই তো কল-বাথরুম, এটাই বিরাট লাভ। হাঁটতে বেশি হবে না।" অনুপম এই বলে বউদির সঙ্কোচ কাটাতে চেষ্টা করেছিল।

বউদি চলে যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যায়। তখন তার মনে পড়ল, ক'টা বাজে জিজ্ঞেস করা হল না। আলোর সুইচটা বোধ হয় ঘরের বাইরেই। জলতেষ্টা পেলে কলঘরে গিয়ে কল থেকেই খেতে হবে।

মশা আছে। ইতিমধ্যেই সে হাতে কামড় খেয়েছে। মশারি খাটিয়ে শুতে হবেই, কিন্তু কী দমবন্ধ করা গরম এই ঠাণ্ডার দিনেও! বোধ হয় বস্তাগুলোর জন্যই।

হাতড়ে হাতড়ে সে খাটটার অপর ধারে গিয়ে জানলায় হাত রাখল। ছিটকিনি তুলে ঠেলা দিল। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার জন্য পাল্লা দুটো আটকে গেছে। জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলতেই শব্দ করে আছড়ে খুলে গেল।

ঠাণ্ডা বাতাস সারা মুখে যেন আদর বোলাল। অনুপম আজ এই প্রথম সহানুভূতির ছোঁয়া পেল প্রকৃতির কাছ থেকে। বন্ধ চোখ কিছুক্ষণ পর খুলে বাইরে তাকিয়ে সে গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। না পাওয়ার জন্য তার কোনও খেদ হচ্ছে না। তাকে কেউ যেন না দেখে এটাই সে এখন চায়।

মশারির চতুর্থ দড়িটা লাগিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল পা দুটো লম্বা টানটান করে। সারাদিনে এই প্রথম তার বিশ্রাম নেওয়া। চোখ বুজল সে।

ঘুমের মধ্যে সে বারবার পাশ ফিরল। তার খুবই গাঢ় ঘুম হয় কিন্তু আজ হল না। কী এক অস্বাচ্ছন্দ্যে সে ছটফট করে গেল। পাতলা ঘুমের মধ্যেই একসময় তার মনে হল মোটর গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ, দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দ যেন সে শুনতে পেল। আবার ফুঁপিয়ে চাপা কান্নার আওয়াজও পেল।

ঘুম ভেঙে চোখ মেলতেই চৌকো একটা উজ্জ্বলতা তাকে আঘাত করল। জানলাটা ঠিক তার পায়ের ওপরেই। প্রখর রোদে আকাশটা ঝকঝকে।। অনুপম আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। একটা শালিখ জানলার পাল্লায় বসে কর্কশ ডাকে তাকে বিরক্ত করতেই সে সচেতন হল।

বিছানায় উঠে বসে মশারি তুলে পা দুটো মেঝেয় নামাল। কিন্তু দু' কদম গিয়েই সে বন্ধ দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নিথর হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজা

খুলল। বাঁ হাঁটু কংক্রিটের মতো জমাট আর ভারী লাগছে। সারা বাড়িতে কোনও সাড়াশব্দ নেই। বউদি, পঞ্চি, এরা সব গেল কোথায়? ছমছমে একটা চিন্তা নিয়ে সে কলঘরে ঢুকল।

মশারিটা পাকিয়ে বিছানার একধারে রাখা। চাদরটা পরিপাটি করে বিছানো। ইতিমধ্যে পঞ্চি এইসব কাজ সেরে রেখে গেছে। অনুপম পা টেনে টেনে দালানে এল।

কেউ নেই, তবে রান্নাঘরের দিক থেকে বাসনের শব্দ ভেসে এল। নিচু গলায় সে ডাকল, "বউদি।"

"যাই।" পঞ্চির গলা।

ব্যস্ত হয়ে এল পঞ্চি, হাতে একটা ন্যাতা। "মাসিমা বলে গেছে উঠলেই আপনাকে খেতে দিতে। আগে চা খাবেন?"

"হ্যাঁ, কিন্তু বউদি কোথায়, আর সব?"

"সবাই তো ভোরবেলায় চলে গেছে। মেসোমশাই মাঝরাতে কলকাতা থেকে এল। তারপর মাসিমাকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে কী সব বলল। মাসিমা নীচে গেল। তারপর নীচের বউদিকে নিয়ে তিন জন কলকাতা চলে গেল। যাওয়ার আগে বাচ্চুকে পাশের বাড়িতে রেখে আমাকে বলে গেল, দাদা হাসপাতালে, অবস্থা ভাল নয় তাই মণিকে নিয়ে যাচ্ছি। ঠাকুরপো রইল, কাল থেকে না খেয়ে রয়েছে, ভাল করে দেখিস, উঠলেই খেতে দিস। আমি বললুম, সে তোমায় ভাবতে হবে না। রান্নাবান্না, জলখাবার করা সব আমি পারি। আপনাকে মামলেট করে দোব, টোস দিয়ে খাবেন?"

পঞ্চির কথা শুনতে শুনতে অনুপমের মনে হল নতুন কিছুই সে শুনছে না। রাতে ঘুমের মধ্যেই সে এসব জেনে গেছে।

দালানে খাবারের টেবিল আর চারটে চেয়ার। অনুপম একটা চেয়ারে বসল। টেবিলে আজকের খবরের কাগজ ভাঁজ করা অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। কেউ হাত দেয়নি। বারান্দায় যাওয়ার দরজা দিয়ে দূরে নারকেল গাছের মাথা আর আকাশ দেখা যাচ্ছে। সেদিকে শূন্য দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল।

একবার কাগজটার দিকে তাকাল। দেখেই বুঝতে পারল "প্রভাতী সংবাদ'। কালকের ঘটনার কথা কী ভাবে লিখেছে জানার জন্য তার এখন আর কোনও কৌতূহল হচ্ছে না। সুপ্রিয় গুপ্ত এই রকম একটা সুযোগই খুঁজছিল, পেয়ে গেছে। সত্যি-মিথ্যে যা খুশি লিখে দেবে তার বিরুদ্ধে। কে প্রতিবাদ করবে? লোকে তো এখন তাকে শয়তান রূপেই দেখতে চায়।

কিন্তু সে সত্যিই কি শয়তান? প্রদীপ হালদারের যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে ওর বউ-ছেলে কি পথে বসবে? এর মধ্যে তার শয়তানিটা কোথায়! প্লেন ক্র্যাশ করে, ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয়ে তো এর থেকেও বেশি লোক মরে, সেটা কি পাইলটের বা ড্রাইভারের ইচ্ছাতে হয়?

ঘুমের মধ্যে যেন কান্নার শব্দ পেয়েছিল। নিশ্চয় মণি নামের ওই বউটির। হাসপাতালে কেউ ভর্তি হয়েছে শুনলেই তো মেয়েরা আগে কাঁদতে শুরু করে।

প্রদীপ হালদারের সিরিয়াস কিছু নাও হতে পারে। যদি বড় ধরনের অপারেশন করাতে হয় বা ভাল নার্সিংহোমে রাখার দরকার হয় তা হলে খরচ দেওয়ার সামর্থ্য কি ওদের আছে? পাশ করে কিছুদিন হল অফিসার হয়েছে, কত আর পায়, তিন-চার হাজার!

চিকিৎসার জন্য যদি টাকার দরকার হয় তা হলে আমিই দিয়ে দেব। অনুপম একটা গুমোট আলো-বাতাসহীন ঘরের জানলা খুলে দিয়ে যেন হাঁফ ছাড়ল। আমিই টাকা দেব। বেলেঘাটায় তার আলমারির লকারে বারো হাজার টাকা পরশুই সে রেখেছে।

ফুটবলারদের পাওনাগণ্ডা মেটাবার ভার বারিন দত্তের। তাকে সে দু' বার জানিয়ে দিয়েছিল গত বছরের বারো হাজার টাকা হাতে না পেলে সে আর পায়ে বল ছোঁয়াবে না। কথাটা অন্য ভাবে ঘুরিয়ে রং ফলিয়ে প্রভাতী সংবাদে বেরোয়। ক্লাবের ভেতরের সব খবর বারিন যে গোপনে সুপ্রিয়কে জোগায় এটা অনেকেই জানে, আর সেই খবরগুলো সবই বারিন গোষ্ঠীর স্বার্থের পক্ষে আর বিরোধী গোষ্ঠীর, যার অন্যতম নেতা দুলাল শীল, তাদের স্বার্থের বিপক্ষে যাতে যায়, সেই ভাবেই সুপ্রিয় লেখে।

সকালে প্র্যাকটিসের পর মাঠ থেকে তাঁবুতে যাওয়ার সময় সে সুপ্রিয়কে গ্যালারিতে বসে থাকতে দেখে উঠে আসে।

একগাল হেসে সুপ্রিয় তাকে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই অনুপম ওর জামা ধরে টেনে তোলে।

"অনু, অ্যাই কী করছিস!" সুপ্রিয় অবাক হয়ে বলেছিল। গ্যালারি এবং মাঠের ধারে তিরিশ-চল্লিশজন সারথি-ভক্ত ছেলে তখন মজা দেখার সম্ভাবনা নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।

অনুপম বুকের কাছে জামাটা ধরে শীর্ণকায় সুপ্রিয়কে এমন ঝাঁকাতে থাকে যে, ফড়ফড় করে ফেঁসে যায় পুরনো জামা।

"অ্যাই দ্যাখো, থাম থাম, এটা যে নিউজ হয়ে যাবে রে।"

"নিকুচি করেছে তোমার নিউজের। বারিন দত্ত কত টাকা দেয় তোমায় আমার বিরুদ্ধে লেখার জন্য? বলো, বলো।" অনুপম ধাক্কা দিয়ে সুপ্রিয়কে বসিয়ে দেয়।

"এক পয়সাও নয়। যা সত্যি, যা খবর, তাই লিখি। তুই বুকে হাত দিয়ে বল, ও কথা তুই বলিসনি? টাকা না পেলে পায়ে বল ছুঁবি না বলিসনি?"

"হ্যাঁ বলেছি, কিন্তু তুমি যেভাবে লিখেছ সেভাবে নয়। সারথির এখন ক্রাইসিসের সময়ে তুমি এমন ভাবে আমাকে প্রেজেন্ট করলে। যেন ক্লাবের ওপর আমার দরদ নেই, ভালবাসা নেই, শুধু টাকার সঙ্গেই সম্পর্ক, একটা অর্থপিশাচ? হাজার হাজার মেম্বার, সাপোর্টার কী ধারণা করছে আমার সম্পর্কে, সেটা কি জানো?"

"ওই হল। প্ল্যাটিনাম জুবিলি ট্রফিটা গোল দিয়ে জিতে নে, দেখবি সব ধারণা উলটে গেছে। আবার তোকে মাথায় তুলে সাপোর্টাররা নাচবে। কবে কী বলেছিস কেউ মনে করে রাখবে না।"

"সুপ্রিয়দা, ট্রফি নেব, গোলও দেব আর তোমার কলমটাও সেদিন ভেঙে দু'

টুকরো করব।"

তখন ওদের ঘিরে জড়ো হয়ে গিয়েছিল অনুপম-ভক্তরা। তারা সুপ্রিয়কে গালি দিয়ে বিদ্রূপ করতে থাকে। সুপ্রিয় নেমে আসার সময় দু-চারজন পেছন থেকে তাকে চড়চাপড় মেরেছিল। কেউ একজন ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলেও দেয়। অনুপমই টেনে তোলে। তখন সুপ্রিয় মুখে হাসি নিয়ে বলেছিল, "গোল দিয়ে ট্রফি নিতে না পারলে এরাই কিন্তু তোকে ছিঁড়ে খাবে।"

পরদিনের প্রভাতী সংবাদে শিরোনাম হয়েছিল: **'অনুপমের দম্ভ: গোল দেব, ট্রোফি নেব।'** খবরের মধ্যে সাংবাদিকের জামা ধরা ও ছেঁড়া এবং মারধোরের কথা ছিল। শেষদিকে লেখা হয়—'গত বছরের বকেয়া বারো হাজার টাকা না পেলে অনুপম আর পায়ে বল ছোঁবে না।" এই কথা প্রভাতী সংবাদে প্রকাশিত হওয়ায় ফুটবল কমিটির সদস্য বারিন দত্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, "ক্লাবের আর্থিক সঙ্কট চলছে। এই সময় টাকার জন্য এই ভাবে চাপ দেওয়া ক্লাবের কোনও হিতাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকেরই টাকা বাকি আছে কিন্তু তারা কেউ পায়ে বল ঠেকাবে না বলেনি। অনুপম বড় খেলোয়াড়। সে জানে তাকে ছাড়া টিম করা যাবে না। ওকে বলেছি প্ল্যাটিনাম ট্রফি সেমিফাইনালে উঠলেই যতটা সম্ভব ওর টাকা মিটিয়ে দেব।'—এ ব্যাপারে অনুপমের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করেও তাকে রাতে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।"

খবরটা সারথির সাপোর্টারদের মধ্যে অনুপম-বিরোধী একটা বিষাক্ত মনোভাব তৈরি করে দেয়। কিন্তু প্ল্যাটিনাম ট্রফি জেতার আশায় তারা বুক বেঁধে থাকে। কিন্তু দুলোদা অনুপমকে বলেছিল, "বাড়াবাড়ি করলি। গোল দেব, ট্রফি নেব, এতটা বলা তোর উচিত হয়নি। ফুটবলে কেউ আগে থাকতে জিতবেই, বলতে পারে না।"

"আরে রাখো তোমার ওসব কথা। অনুপম বিশ্বাস যদি খেলব মনে করে তা হলে ইন্ডিয়ায় এমন কোনও টিম নেই যে, তাকে আটকাতে পারে।"

দুলোদা অবিশ্বাসভরে তো বটেই, বিরক্তিমাখানো চোখে তাকিয়ে বলেছিল, "এতটা অহঙ্কার কিন্তু ভাল নয়। এই ট্রফিটা আমাদের চাই-ই, না হলে ক্ষমতা থেকে আমরা ছিটকে যাব। বারিন দত্ত গ্রুপ ড্যাংডাঙিয়ে ভোট তুলে নেবে। মনে রাখিস ইলেকশান আসছে।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দুলোদা, ভোটে তোমরা জিতছ। ট্রফি পেলেই হাওয়া ঘুরে যাবে। কিন্তু একটা কথা, বাকি টাকা না পেলে আমি কিন্তু মাঠে নামব না।"

"বারিন তোর টাকাটা দিয়ে দেবে মনে হচ্ছে। ট্রফি জিতে ওকেও তো বাঁচতে হবে।"

বারিন দত্ত আর সুবোধ বোস টাকা নিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন তার ফ্ল্যাটে এসেছিল। আধঘণ্টা থেকে চলে যাওয়ার সময় সুবোধ বলে, "কাউকে আর টাকা দিচ্ছি না, শুধু তোকেই দিলাম। পুলকেশ, রঞ্জন, অপূর্ব ওদেরও বাকি আছে, চেয়েওছে। বলেছি, কাউকেই দিচ্ছি না, টুর্নামেন্ট থেকে না পেলে দিতেও পারব না। জোট করে বলেছিল খেলব না, কিন্তু শেষমেশ রাজি হয়েছে। অনু তোকে যে এই

বারো হাজার দিলাম এটা যেন ওরা জানতে না পারে। এটা যদি লিক হয়ে যায় তা হলে কিন্তু ওরা প্রচণ্ড ঝামেলায় ফেলে দেবে। তুই শুধু বলবি সেমিফাইনালে উঠলে বারিনদা কিছু টাকা দেবে বলেছে তাই খেলছি। মনে থাকবে?"

অনুপমকে কিছু বলতে হয়নি। প্রথম খেলা ছিল আই. টি. আই-এর সঙ্গে। সরল আর রঞ্জনের দেওয়া গোলে ম্যাচ জেতার রিপোর্টের সঙ্গেই আলাদা একটা খবরে বলা হল, "বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল, অনুপম বিশ্বাস আজকের ম্যাচ খেলতে সকাল দশটা পর্যন্তও রাজি ছিল না। কয়েকজন কর্মকর্তা তাকে হাতেপায়ে ধরেও রাজি করাতে পারেননি। অবশেষে তার ফ্ল্যাটে গিয়ে একজন বারো হাজার টাকা পৌঁছে দেওয়ায় সে মাঠে আসে।"

খবরটায় যেন আগুনে ঘি পড়েছিল। সমর্থকদের মধ্যে তো বটেই, টিমের অন্যরাও রাগে ফেটে বলেছিল, "তা হলে অনুপমই খেলুক। শুধু একজনই টাকা পাবে আর বাকিরা সব ফালতু, তা হলে ফালতুর মতোই এবার আমরা খেলব।"

সেই খেলাটা তারা ফাইনালে উঠে ডেম্পোর সঙ্গে খেলল।

কিন্তু তার আগে দুলোদাই হুঁশিয়ারি করে অনুপমকে বলেছিল, "তোকে শেষ করে দেওয়ার মারাত্মক চাল বারিন চেলেছে রে। কাউকে জানাতে মানা করে টাকা দেওয়ার খবরটা সুপ্রিয়কে দিয়ে কাগজে বের করল। শুধু মেম্বার-সাপোর্টাররাই নয়, প্লেয়াররাও তোর ওপর খেপে রইল।"

"কিন্তু দুলোদা, আমি তো অন্য কারও নয়, শুধু নিজের পাওনাটা নিয়েছি, কারও বাড়া ভাতে তো ছাই দিইনি।" অনুপম অসহায়ভাবে নিজেকে বাঁচাতে চেয়ে বলেছিল।

"এ-কথা আমাকে বলে কোনও লাভ নেই। সুপ্রিয়কে বললে আরও খারাপ হবে, দেখবি পরের দিন উলটো কথা কাগজে বেরিয়েছে। তার থেকে বরং চুপচাপ থাক আর খেলে যা। গাবিয়ে কথা বলাটাই তোর সর্বনাশ করছে। এখন ট্রফি যদি না আসে তা হলে বারিনরা বলবে, বারো হাজার টাকা তো দিলাম, অনুপম কী করল? টিমের মধ্যে ঝগড়া তৈরি করা ছাড়া ওর অবদানটা কী? বারিনরা ভাল করেই জানে, তোকে টাকা দেওয়ার খবর ফাঁস হলে কয়েকজন মাঠে নেমেও খেলবে না। তাতে সারথি হারবে, আর তার ফলে আমরাও কমিটি থেকে আউট হয়ে যাব, সেটাই ওদের লক্ষ্য। টাকাটা এখন নিয়ে ভুল করলি অনু...এই বারো হাজার তোকে ডোবাবে।"

না, ডোবাবে না।

অনুপম টেবিলে রাখা রেকাবে পোড়া পাউরুটি আর পেঁয়াজ-লঙ্কা-ডিমের একটা ঘণ্টর দিকে তাকিয়ে আপন মনে মাথা নাড়ল। বারো হাজার টাকা এবার সে যথার্থ একটা ভাল কাজে লাগাবে। একটা প্রাণ...একটা পরিবার যদি তাতে রক্ষা পায়।

"আপনি খাচ্ছেন না যে?" পঞ্চি ভয়ে ভয়ে রেকাবের দিকে তাকিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বলল।

"হ্যাঁ, খাচ্ছি।" একটা টোস্ট তুলে অনুপম কামড় দিল। "খুব ভাল হয়েছে।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল পঞ্চির মুখ। "মেসোমশাই বলে, শক্ত ঝামার মতো টোসের সঙ্গে মামলেট খেতে খুব ভাল লাগে।"

অনুপম সায় দিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল তখন নীচের থেকে কেউ পঞ্চির নাম ধরে ডাকল। চেয়ার থেকে স্প্রিংয়ের মতো উঠে দাঁড়িয়েই অনুপম টলে পড়ে যাচ্ছিল। বাঁ পা তার ভার নিতে পারছে না।

"কে?" পঞ্চি ছুটে বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে নীচে তাকাল। কাকে যেন অপেক্ষা করতে বলেই ফিরে এসে সিঁড়ির দিকে এগোল।

"শোনো।" অনুপমের ভীত তীক্ষ্ণ স্বরে পঞ্চি থমকে অবাক হয়ে তাকাল। "কে এসেছে?"

"পাশের বাড়ির ছেলে তিলু। বাচ্চুর গরম জামা, দুধের কৌটো, খাওয়ার ওষুধ নিতে এসেছে।"

"ও কি ওপরে আসবে?"

"না। সব তো নীচের ঘরে রয়েছে।"

"তিলুকে দিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দেবে।"

পঞ্চি নেমে যাওয়ার পর অনুপমের খাওয়ার ইচ্ছাটা মরে গেল। রাতের ভয় দিনের আলোয় যেন আরও বেশি করে তাকে পেয়ে বসছে। খবরের কাগজটা একই ভাবে পড়ে আছে। হাত বাড়িয়েও সে টেনে নিল।

ভাঁজ-করা প্রথম পাতায় একটা চার কলাম ছবির খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। পাঁজাকোলা করে একটা লোককে একজন নিয়ে যাচ্ছে। মাথাটা আর বাঁ হাতটা ঝুলছে। চোখ বন্ধ। পেছনে আবছা ভিড়। তবু বোঝা যাচ্ছে একটা ছেলে ইট ছুড়ছে। হেলমেট পরা পুলিশ একটা লাঠি উঁচিয়ে ছুটে যাচ্ছে। আকাশের দিকে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া।

ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনুপম। এসব তারই সৃষ্টি। যে লোকটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে কি মৃত? ইট, লাঠি, আগুন বের করে আনল একটা খেলা! দোষটা কি খেলারই, না কি যারা খেলে আর খেলায়, তারাই আসল অপরাধী?

"আপনি খাবেন না?" পঞ্চি উঠে এসেছে।

"না। জ্বর জ্বর লাগছে। পায়ের ব্যথাটা যেন আরও বেড়েছে। তুমি আমাকে এক ডেকচি জল গরম করে দাও আর ফ্রিজ থেকে বরফ দাও।...আর শোনো।" অনুপম ইতস্তত করে বলল, "কেউ এলে যেন বোলো না আমি এখানে আছি। সদর গেট সব সময় বন্ধ করে রাখবে।"

"মাসিমাও তাই বলে গেছে। জানেন আমাদের এখানে ছেলেধরা বেরিয়েছে! হ্যাঁ সত্যি! আমাদের গাঁদালপাড়ায়, যেখানে আমাদের বাড়ি, পরশু সেখানে অবনীকাকার ছেলে পল্টুকে, ছ' বছর বয়স, একটা লোক ডেকে, ফুল নেবে ফুল বলে একটা লাল ফুল দিল। পল্টু ফুলটা শুঁকেই অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন ওখান দিয়ে পল্টুর জেঠি যাচ্ছিলেন, তিনি ওকে শুয়ে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে ওঠেন। তখন লোকটা একটা সাইকেলে চড়ে পোঁ পোঁ করে আমাদের এইদিক দিয়ে পালায়। আচ্ছা, ওরা নাকি

বাচ্চাদের ধরে নিয়ে গিয়ে রক্ত চুষে খায়, সত্যি?"

"সত্যি।"

"তা হলে তো বাচ্চুকে সাবধানে চোখে চোখে রাখতে হবে!" পঞ্চি দায়িত্বের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

"সেই জন্যই তো বলছি সদর মোটেই খোলা রাখবে না। নীচে কেউ নেই, চোর টোর ঢুকেও চুরি করতে পারে। তা ছাড়া আমি এখন তো খোঁড়া, ছেলেধরা এলে কিছুই করতে পারব না।"

এত কথা বলার পর অনুপমের মনে হল পঞ্চির মনে কৌতূহল জাগাবার মতো কোনও কথা কি সে বলে ফেলেছে? বোলো না আমি এখানে আছি'টা একটা সন্দেহ জাগাবার মতোই কথা। এর অর্থ, লুকিয়ে রয়েছি। তবে রক্ষে, মেয়েটা মোটেই চালাক-চতুর নয়। ওকে একটু খুশি রাখা দরকার।

অনুপম পোড়া টোস্টের ওপর চামচ দিয়ে ডিম তুলতে তুলতে বলল, "খেয়েই ফেলি, এত সুন্দর লাগল না। তুমি গরম জল আর বরফ এনে দাও।"

নীচে থেকে আবার তিলুর গলা পাওয়া গেল। পঞ্চি নেমে গেল। অনুপম চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। সার দিয়ে মুখগুলো ভেসে আসছে—রবিদা, বউদি—মণি, বাচ্চু—সেই ছেলেটা, চার বছর আগে অটোগ্রাফ নিতে আসা ছেলেটা, রোগাটে লম্বা মুখ, পাতাকাটা চুল কপালে ঝুলে, ঘন চোখের মণি দুটো বড় বড় চোখ জুড়ে—অবাক, সরল আর আহত চাউনি। দলাপাকানো হ্যান্ডবিলটা ঠিক কপালে—অনুপম সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বজ্রাহত হল। তারপর চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে দু' হাত ঠকঠকিয়ে কেঁপে উঠল।

"দেখুন না, এই লোকটা আমার কথা শুনল না, ওপরে উঠে এল। আমি পইপই বললুম বাড়িতে এখন কেউ নেই।"

পঞ্চির অনুযোগ, কৈফিয়ত কিছুই ঢুকল না অনুপমের কানে। সে তার সামনে সাক্ষাৎ নিয়তিকে যেন দেখতে পাচ্ছে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করল কিন্তু গলা দিয়ে স্পষ্ট কোনও কথা বেরোল না।

"খুব অবাক হয়ে গেছিস তাই না?" পানের ছোপধরা দাঁতগুলো বেরিয়ে এল। সুপ্রিয় গুপ্ত হাসছে।

"তুমি এখানে! জানলে কী করে?"

রেকাবির দিকে তাকিয়ে সুপ্রিয় প্রশ্নটা অগ্রাহ্য করে বলল, "খাচ্ছিলি?"

"না, খিদে নেই। জ্বর জ্বর লাগছে।"

"তা হলে আমি খেয়ে নিচ্ছি। খুকি এক গ্লাস জল দাও তো।"

সুপ্রিয় চেয়ারে বসে ঠাণ্ডা টোস্ট আর ওমলেট মুখের মধ্যে গুঁজে চিবোতে চিবোতে আবার চোখ বুঝল।

"খুব ভোরে বেরিয়েছি, কিচ্ছু খাওয়া হয়নি, দাঁত পর্যন্ত মাজা হয়নি।"

স্বয়ং শিব এসে তার সামনে দাঁড়ালে অনুপম এত অবাক হত না। কী ভাবে জানল সুপ্রিয়! একমাত্র দুলোদা ছাড়া আর কেউ জানে না সে কোথায় এসে উঠেছে।

তেঁতুলতলার একটা রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে গেছে, রবিদার বাড়িটাও দুলোদা জানে না। তা হলে আর কার কাছ থেকে জানল? কখনও কারও কাছে সে তো রবিদা বা তেঁতুলতলার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি।

"কী ভাবছিস। কেমন করে খোঁজটা পেলুম?" সুপ্রিয় খালি জলের গ্লাস পঞ্চির হাতে দিয়ে বলল, "আর এক গ্লাস।"

অনুপম মাথাটা নাড়ল।

"ওসব জেনে তোর আর এখন কী লাভ হবে। এখানে পালিয়ে এসে ভালই করেছিস, কাল তোর ফ্ল্যাটে বিরাট ভাঙচুর হয়েছে। জিনিসপত্তর ভেঙে ছড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করে, তোর চাকরটাকে পিটিয়ে আধমরা করে দিয়েছে। এখন সে হাসপাতালে। তোকে যদি পেত ওরা—।"

"ওরা কে?"

এবার সুপ্রিয়র অবাক হওয়ার পালা। সে পিটপিট করে অনুপমকে কয়েক সেকেন্ড নিরীক্ষণ করে বলল, "সেই তারাই, যাদের সম্পর্কে বলেছিলাম—গোল দিয়ে ট্রফি নিতে না পারলে তোকে ছিঁড়ে খাবে।"

"তুমি এখানে কী করতে এসেছ?" কথাটা সুপ্রিয়কে বলে অনুপম কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পঞ্চির দিকে তাকাল।

"আপনার গরম জল আর বরফ—"

"থাক, লাগবে না এখন, তুমি যাও।"

সুপ্রিয় গলা খাঁকারি দিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠল। অনুপম তার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি কাটাতে চুলের মধ্যে আঙুল ঢোকাল।

"তোর আজকের এই অবস্থায় পৌঁছোনোটা একদিনে হয়নি। ধাপেধাপে হয়েছে। তুই ভাল খেলে নাম করেছিস, তোকে নিয়ে এ-ক্লাব ও-ক্লাব টানাটানি করেছে, তোর দরও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে, চল্লিশ হাজার থেকে আজ দু' লাখে...কিন্তু তুই দারুণ ভাবে বদলে গেলি।"

"তোমরাই আমাকে বদলে দিয়েছ।"

"কী ভাবে?"

"আমার সম্পর্কে এমন ভাবে লিখতে শুরু করলে যেন ভারতে আমার মতো ফুটবলার আগে কখনও জন্মায়নি। 'ভারতের জিকো' 'কলকাতার প্লাতিনি' এসব তোমাদেরই দেওয়া টাইটেল। আমি স্বীকার করছি—" অনুপম থেমে গেল সুপ্রিয়কে পকেট থেকে নোটবই বের করতে দেখে।

"বলে যা।"

"স্বীকার করছি এসব বিশেষণ আমার ভাল লেগেছিল। চারদিকে তখন ভক্ত, যেখানে যাই সবাই আমার দিকে তাকায়, কথা বলতে চায়, বিশেষ ভাবে খাতির দেখায়। এসব আমার ভাল লাগত। সুপ্রিয়দা, এইসঙ্গে আমার বয়সটার কথাও মনে রাখবেন, তা ছাড়া লেখাপড়াও তো বিশেষ করিনি, স্কুল ফাইনালটা কলকাতায় এসে পাশ করেছি, কিন্তু কী ভাবে করেছি সেটা না বলাই ভাল। পড়তে আমার একদমই

ভাল লাগে না, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিনের হেডিং আর ছবি দেখে রেখে দিই'...হ্যাঁ, সিনেমার খবর পড়ি।"

অনুপম কথাগুলো টানা বলে গেল যেন মহলা দেওয়াই ছিল। বলতে তার ভাল লাগল। সুপ্রিয়র ডটপেন নোটবইয়ে দ্রুত সরছে। মুখ ঘুরিয়ে অনুপম বারান্দা দিয়ে বাইরে তাকাল। অটো রিকশা চলে যাওয়ার আর দূর থেকে বাসের হর্নের শব্দ ছাড়া শ্রবণকে আঘাত করার মতো আর কিছু এখানে নেই।

"আমাকে প্রভাবিত করেছিল আপনাদের স্তাবকতা। আপনারা প্রভাবিত করেছিলেন ফুটবলপাগল মানুষদের। তাদের কাছে আমাকে রাজপুত্র বানিয়ে ঠেলে দিয়েছিলেন, রূপকথার রাজপুত্র। মানুষ তো রূপকথা ভালবাসে, তাই তারা আমাকে লুফে নিয়েছিল। তারা আপনাদের কাগজ কেনে আমার সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে, আমার কথা শুনতে, আমাকে তারা বীর হিসেবে দেখতে চায় আর আপনারা তাই দেখাবার জন্য লিখতেন।...

"কেন? আপনাদের কাগজের বিক্রি বাড়াবার জন্য। আমি নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ে গেলাম,...নিজেকে ফাঁপিয়ে বড় করে দেখার ফাঁদ। আমার সম্পর্কে প্রশংসা করে, গুণ গেয়ে যা নই তার থেকেও বড় করে দেখিয়ে প্রচুর মিথ্যে কথা যখন লিখেছেন তখন আমি তার প্রতিবাদ করিনি, চুপচাপ সেসব মেনে নিয়েছি কেননা মিথ্যে কথাগুলো, ভানগুলো আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে।"

"কিন্তু অনেকে তোর বিরুদ্ধে লিখেছে, কড়া কথা বলেছে।"

"হ্যাঁ। লিখেছে, বলেছে আর তাতে আমি বিরক্ত হয়েছি, রেগেও গেছি। আমার মেজাজ, ব্যবহার সব সময় স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকে না—," অনুপমের চোখে ভেসে উঠল, অবাক দুটি সরল চোখের ওপরে লেগে একটা পাকানো হ্যান্ডবিলের ছিটকে যাওয়ার ছবিটা।

"কেন থাকে না তা আমি জানি না, সত্যি বলছি সুপ্রিয়দা, তা আমি জানি না। সতেরো বছর বয়সে গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলাম খেলতে। অমানুষিক পরিশ্রম করে, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অপমান ঠেলে ওপরে উঠেছি।"

"তখন অনেকেই তোকে সাহায্য করেছিল কিন্তু পরে তুই তাদের ভুলে গেছিস।"

অনুপম চুপ করে রইল।

"তোর দেশের বাড়িতে একবার গেছলাম। দেখেছি তোরা কত গরিব ছিলিস, তোর বাবা-মা কত কষ্ট করতেন, আজও করেন। তুই ওঁদের নিয়ে এসে কলকাতায় নিজের কাছে রাখতে পারতিস, কিন্তু তা করিসনি। শেষ বয়সে তা হলে ওঁরা একটু সুখের মুখ দেখতেন।"

"আমি আনতে চেয়েছিলাম সুপ্রিয়দা, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে ওঁরা আসতে রাজি হননি।"

"মিথ্যে কথা বলিসনি, অনুপম, তুই আনতে চাসনি। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েছিস ঠিকই, কিন্তু নিজের অতীতকে তুই এড়িয়ে যেতে চেয়েছিস। আধুনিক, দ্রুতগতির জীবন তোর ভাল লেগে গেছল। সেখানে গ্রামের মানুষরা মিসফিট, বেমানান। তাদের

মানসিক ধারা থেকে তুই নিজেকে ছিঁড়ে বের করে নিয়ে যেতে গিয়েই তুই, আমার মনে হয়, বিপত্তি ঘটিয়েছিস। তোর কী মনে হয়?"

"তুমি কী উদ্দেশ্যে এমন সময়ে এখানে এসেছ? এই সব কথা বলার জন্য?"

"মনে পড়ে, কাল কী বলেছি তোকে? তোর উত্থান দেখেছি, পতনটাও খুব কাছ থেকে দেখতে চাই। বড় তাড়াতাড়ি তুই পড়ে গেলি। হাবিবকে দেখেছিস? হায়দরাবাদ থেকে তোর মতো বয়সেই কলকাতায় এসে কত বছর ধরে খেলে কত নাম কত টাকা করে গেল। বাঙালি ছেলেরা কোথায় দুর্বল, কোথায় পিছলে যায়, আমি সেটাই জানতে চাই বলে সাবজেক্ট হিসেবে তোকে বেছে নিয়েছি। তোকে নিয়ে লিখব।"

অনুপম পাংশু মুখে উঠে দাঁড়াল। সুপ্রিয় জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে হাত নেড়ে বসতে ইঙ্গিত করল।

"যাচ্ছিস কোথায়? বারান্দায় কি জানলায় এখন যাসনি। এই বাড়ি খুঁজে বের করতে বাস থেকে নেমে অনেক লোককে জিজ্ঞেস করেছি। রবিদা নামটা আর চার বছর আগে তার বাড়িতে এসেছিলি, এইটুকু ইনফরমেশন শুধু সম্বল। তোর নাম করে আমি যা গালাগাল শুনলাম সেটা কাল সারথির টেন্টের সামনেও শুনেছি। এখানকার লোক যদি একবার জানতে পারে—"

অনুপম চেয়ারে বসে পড়ল। নীচের দরজাটা পঞ্চি বন্ধ করেছে কি না, সুপ্রিয়র সামনে তা জিজ্ঞেস করলে ভয় পেয়ে গেছে ভাবতে পারে। সে তাচ্ছিল্যভরে বলল, "জানলে কী আর হবে, দল বেঁধে এসে মারবে?...পিটিয়ে মেরে ফেলবে?"

"এখন তো দল বেঁধে পিটিয়ে মারাই হয়। এ-রাজ্যে এটাই তো এখন টপমোস্ট ফেবারিট গেম। কাগজে দেখিস না, ডাকাত সন্দেহে, ছেলেধরা সন্দেহে গেরস্থ ভালমানুষরাও পাঁচজনে মিলে খুন করছে প্রকাশ্যে আর গণপ্রহার বলে খুন করার দায় থেকে হাত ঝেড়ে ফেলছে। দশ-বারোটা লোক যে-কোনও ছুতোয় তোকে দিনদুপুরে বড় রাস্তায় হাজার লোকের সামনে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে, একজনও বাধা দেবে না। আজকের কাগজগুলো পড়েছিস?"

টেবিলে পড়ে থাকা প্রভাতী সংবাদটার দিকে সুপ্রিয় তাকাল। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে ভাঁজ খুলে প্রথম পাতায় চোখ রেখে বলল, "প্রত্যেকটা কাগজে লিখেছে তুই আজ এত বাজে না খেললে, টাই ব্রেকারের পেনাল্টিটা মিস না করলে এত কিছু ঘটত না। এগারোটা লোক মারা গেছে—"

"এগারো! আটটা নয়?"

"মাঠেই আট, হাসপাতালে আরও তিন। মরার মতো অবস্থায় চারজন, সিরিয়াস আহত, মানে হাসপাতালে অ্যাডমিটেড সাতাশজন, তার মধ্যে তোর চাকরটাও রয়েছে। লুটপাট, আগুন, রেড রোড আর ধর্মতলায় মোটর গাড়ির কাচভাঙা, এসব তো আছেই। এসব ঘটনায় তোর রিঅ্যাকশান জানতে কাল তোকে গোরু-খোঁজা খুঁজেছি। সহদেব মালি বলল, তোকে গাড়িতে করে নিয়ে গেছে দুলাল শীল।"

"তা হলে দুলোদা তোমায় বলল আমি এখানে!"

সুপ্রিয়র মুখে কুটিল একটা ফিকে হাসি খেলে গেল। সে হ্যাঁ বা না, কিছুই বলল না।

"দুলোদা বলে দিল?" অনুপম নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না। ক্লাবে তার সবচেয়ে বড় হিতৈষী বলে যাকে সে জানে, অভিভাবকের মতো যার কথা শুনে চলে, যাকে কমিটিতে আনার জন্য সে ক্লাব পলিটিক্সে মাথা গলিয়ে শত্রু বাড়িয়েছে, শেষকালে সেই লোকই কিনা তাকে বিপদে ঠেলে দিল তার হদিস বলে দিয়ে!

সে কি চিৎকার করে উঠবে? সে কি চোখের জল মুক্ত করে দেবে? সে কি কলকাতায় ছুটে গিয়ে দুলালচাঁদের গলা টিপে ধরবে? অনুপম ডান হাতের তালুতে চোখ ঢাকল।

"ওর গাড়িতে তোর পকেট থেকে ঘড়িটা পড়ে গেছল, পাঠিয়ে দিয়েছে। নে ধর।"

অনুপম হাত বাড়াল না। সুপ্রিয় ঘড়িটা টেবিলে রাখল।

"জীবনে অনেক কিছু তোর শেখার বাকি।"

"কিন্তু কেন?"

"আমার যতদূর মনে হয়, যা ঘটে গেল এর পর সারথি তোকে আর রাখবে না। এখন ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো তোকে ফেলে দেবে। কাল তোকে নামিয়ে দিয়ে দুলাল শীল সোজা গেছল বারিন দত্তর বাড়ি। দু' জনে হাতে হাত মিলিয়েছে। ওদেরও তো বাঁচতে হবে। শুধু তোকে আগলে, বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে তো দুলাল নিজের আখের খোয়াতে পারে না। তোকে দিয়ে যতটা পাওয়ার তা পাওয়া হয়ে গেছে, এখন তুই একটা বোঝা।"

"এসব কি তুমি লিখবে?"

"না। এরা হচ্ছে আমার খবর পাওয়ার সূত্র, আমার ওপর এদের আস্থাটা নষ্ট করব কেন? আমাকে বিশ্বাস করে বারিন দত্ত গত বছরই বলেছিল লিগে ক'টা ম্যাচ সারথি কিনেছে, কিন্তু আমি লিখিনি। তুই কি জানিস, কে. এস. টি-র সঙ্গে সেমিফাইনাল ম্যাচটাও কেনা ছিল?"

অনুপম চুপ করে তাকিয়ে রইল। সে জানে। দুলোদা আগের দিনই তাকে জানিয়ে দিয়েছিল। শোনা মাত্র বুকের মধ্যে একটা বরফের চাঁই নেমে এসেছিল। সোজাসুজি খেলে ম্যাচ জেতবার ক্ষমতা আর তার নেই। অথচ সবার চোখে সে বড় ফুটবলার হয়ে রয়েছে। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠেছিল। অপমানে, না হীনতাবোধে, সে ঠিক বুঝতে পারেনি।

"অনুপম, সারথি তোকে ছেড়ে দিলে যাবি কোথায়?"

সুপ্রিয়র ডটপেন অপেক্ষা করছে উত্তরের জন্য। অনুপম এমন একটা প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল না। আরও দুটো সিজন পরে সে এটা নিয়ে হয়তো ভাবত। এখনও তার যা খেলা রয়েছে তাতে কলকাতার মাঠে তার দাম পড়বে না।

"অন্য ক্লাব তোকে নেবে কি না জানি না, নিলেও পঞ্চাশ-ষাট হাজারের বেশি দেবে না।"

"এসব নিয়ে আমি এখন কিছু ভাবতে রাজি নই।"

"হ্যাঁ, এখন তো প্রাণ বাঁচানোটাই সবার আগে। এখানে কত দিন লুকিয়ে থাকবি?"

"জানি না। রবিদা আসুক..নীচের এক ভদ্রলোক কাল রাতে ফেরেননি—"

"জানি, এখানকার একজনের মুখেই শুনলাম। কাল খেলা দেখতে গিয়ে আর ফেরেনি। এখানে ধারণা, গোলমালের মধ্যে পড়ে লোকটা হয় মারা গেছে নয়তো গেছে হাসপাতালে। তোকেই এজন্য দায়ী করছে। আর কী আশ্চর্য, শেষকালে তুইই কিনা এই বাড়িতে!"

"সুপ্রিয়দা প্লিজ, এখন এই আলোচনা বন্ধ করুন। আমার পায়ে এখন সেঁক দিতে হবে, বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"কী ভাবে লাগল! কোথায়, দেখি?" সুপ্রিয় ঝুঁকে হাত বাড়াল অনুপমের পায়ের দিকে।

"থাক, থাক, তোমাকে আর পরীক্ষা করতে হবে না, এটা ফল্‌স নয়। সত্যি ইনজুরি।"

নীচে কোলাপসিবল গেটের চাকা সরার শব্দ হল। "রবিদা" বলে হাঁক দিয়ে কেউ উপরে উঠে আসছে। অনুপম ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে দাঁড়িয়েই পাশের ঘরের পরদা সরিয়ে ঢুকে গেল। আর তখনই দুটো লোক দোতলায় উঠে এল।

"রবিদা ফিরেছে নাকি রে?"

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসা পঞ্চিকে লক্ষ্য করে একজন বলল।

"মেসোমশাই, মাসিমা কেউ ফেরেনি, বউদিও না।

"তুই একা বাড়িতে।" বলেই লোকটি সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি?"

'আমার নাম সুপ্রিয় গুপ্ত, প্রভাতী সংবাদ থেকে আসছি। রবিবাবুর কাছে দু-একটা খবর নেব।"

লোক দুটির ভ্রূ কুঁচকে মুখ থমথমে হয়ে গেল। ওদের একজন, বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, পরনে লুঙ্গি ও খদ্দরের পাঞ্জাবি, গম্ভীর স্বরে বলল, "আপনিই সেই সুপ্রিয় গুপ্ত, যিনি সারথির মন্দ ছাড়া ভাল দিকটা দেখতেই পান না, সারথির গায়ে কাদা না মাখালে যার ভাত হজম হয় না, সারথির ভেতরের কেচ্ছা তারিয়ে তারিয়ে লেখেন।"

সুপ্রিয় সরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে শুধু তাকিয়ে রইল। এই রকম লোকের সম্মুখীন জীবনে সে বহুবার হয়েছে। সে জানে তর্ক করা বৃথা, চুপ করে মেনে নেওয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ।

"রবিদাকে জিজ্ঞেস করে আবার কী খবর নেবেন? উনি তো খেলেন না, খেলে ওঁর ভাই অনুপম। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।"

অন্যজন, আরও কমবয়সি, কর্কশ স্বরে প্রায় ধমক দিয়ে তার মেজাজের অবস্থাটা জানিয়ে রাখল।

"তাকে তো পাচ্ছি না বলেই রবিবাবুর কাছে এলাম। শুনেছি এককালে উনি অনুপমদের গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন, ওকে বাল্যকাল থেকে দেখেছেন, ওর সম্পর্কে জানেনও অনেক কিছু।" সুপ্রিয়র কোমল বিনীত কণ্ঠ আবহাওয়াকে আর তপ্ত

হতে দিল না।

"এখন অনুপমকে নিয়ে লেখার এটাই কি সময়? আপনার আক্কেলকে বলিহারি! ক্লাবটাকে ডুবিয়ে আজ পথে বসাল যে—"

"অনুপমের প্রশংসা করব বলে তো এখানে আসিনি। সারথি সত্যিই ডুবেছে। এবার তাকে টেনে তুলতে হলে বোঝা কমাতে হবে। সবচেয়ে বড় বোঝা এখন অনুপম আর তার মতো প্লেয়াররা, ঠিক কি না?"

"আলবাত। আগে ওটাকে তাড়ানো দরকার।"

"আপনারাই তো লিখে লিখে একটা পাঁঠাকে সিংহ বানিয়েছেন। মশাই এখন পেলে ওকে বলি দিয়ে কোর্মা বানিয়ে খেতুম।"

সুপ্রিয় মুখে স্মিত হাসি লাগিয়েই রেখেছিল, শুধু ওদের কথা শুনতে শুনতে সেটাকে ছোট বড় করে নিচ্ছিল। নিজের দিক থেকে আক্রোশটা অনুপমের দিকে ঘুরে গেছে বুঝে সে মাতব্বরি ঢঙে বলল, "ক্লাবটা তো এক দিনে ডোবেনি, তেমনই তুলে ভাসানোটাও একদিনে সম্ভব নয়। লিগে যতটা করা যায় তা আমি করব কিন্তু মেম্বাররা, হিতৈষীরা যদি এগিয়ে না আসেন তা হলে হাজার লিখেও কিসসু করা যাবে না। আপনারাই পারেন সারথিকে বাঁচাতে। এগিয়ে আসুন, প্রেসার দিন কমিটি মেম্বারদের, নানান জায়গায় মিটিং করুন।"

"তাই করতে হবে এবার।" বেঁটে লোকটা ঘড়ি দেখল। "রবিদারা এখনও যখন আসেনি, তার মানে সিরিয়াস কিছু হয়েছে। আপনি আর কতক্ষণ বসে থাকবেন?"

"দূর থেকে আসছি, দেখি আরও কিছুক্ষণ।"

লোক দুটি নীচে নামার পর গেট বন্ধ করার শব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করে সুপ্রিয় ডাকল, "বেরিয়ে আয়।"

অনুপমের মুখ এই কয়েক মিনিটেই বসে গিয়ে চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। প্রবল তৃষ্ণার্তের মতো চাহনি। দরজার পরদা ধরে সে নিজেকে খাড়া রেখেছে।

"এখানে আর তোর থাকা উচিত নয়। নীচের লোকটার যদি খারাপ কিছু হয় তা হলে তুই খারাপ পরিস্থিতিতে পড়ে যাবি।"

"কিন্তু এখন আমি যাব কোথায়? কীভাবেই বা এখান থেকে বেরোব?"

সুপ্রিয় মাথা নামিয়ে কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বলল, "দুটো থেকে আড়াইটের, না সাড়ে তিনটের সময় আমি গাড়ি নিয়ে আসব। আসা মাত্র উঠে পড়বি।"

"কোথায় যাব?"

"তুই বল কোথায় যাবি, পৌঁছে দেব।"

"কলকাতায় যাব না...দেশের বাড়িতে যাব।"

"সেই ভাল।"

সুপ্রিয় গুপ্ত কোনও বিদায় না জানিয়ে দ্রুত নেমে গেল। অনুপম সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবল, ওর সঙ্গে যাওয়াটা কি উচিত হবে? লোকটা কোনও বজ্জাতি করবে না তো! নানান ধরনের বিপদের কথা তার মনে আনাগোনা করতে লাগল। তারপর ভাবল, যা থাকে কপালে! দেখাই যাক না কী হয়! এইভাবে নিজেকে নিজে কয়েদ

করে কত দিন চলা যায়!

পঞ্চি এসে দাঁড়াল। "গরম জল আর বরফ দোব?"

সারা বাড়ির কর্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেয়ে ওর কর্মতৎপরতা বেড়ে গেছে।

"না থাক। আমার জ্বরটা কম লাগছে, খিদেও পাচ্ছে। ভাত খাব। কাল বউদি বলল, তোমার হাতের রান্না নাকি খুব ভাল।"

খুশিতে আনন্দে পঞ্চির মুখ থেকে কথা সরল না। অনুপম গত চব্বিশ ঘণ্টায় এই প্রথম হৃদয়ের গভীরে একটা শান্ত সুখ অনুভব করল মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে।

আড়াইটে থেকেই অনুপম উৎকর্ণ হয়ে দালানে বসে অপেক্ষা করছে। পঞ্চি ঘরের মধ্যে মেঝেয় ঘুমোচ্ছে। ঘড়িতে দেখল তিনটে বেজে পাঁচ। উঠে গিয়ে সন্তর্পণে মুখটা জানলার কাছে নিয়ে তাকাল। একটা কাঁঠাল গাছ দৃষ্টির অনেকটা আড়াল করে থাকলেও রাস্তার কিছু অংশ দেখতে পেল। জনপ্রাণী নেই।

সে আবার এসে চেয়ারে বসল। কলকাতায় গিয়ে গাড়ি জোগাড় করে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসা কি সম্ভব? গাড়িই বা পাবে কোত্থেকে, সুপ্রিয়র নিজের তো গাড়ি নেই!

তা হলে কি দুলোদার কাছ থেকে চেয়ে আনবে! অসম্ভব, ওই লোকটার কোনও দয়া সে নেবে না। যদি দুলোদার গাড়ি নিয়ে আসে তা হলে সে যেতে অস্বীকার করবে। গত বছর সে একদিন তাই করেছিল, তবে প্রবল ঘৃণায় নয়, প্রচণ্ড রাগে।

সারথি কোচ বদল করে নতুন কাউকে আনবে এটা গত বছর সিজনের আগেই কমিটি ঠিক করে। একটার পর একটা টুর্নামেন্ট হেরে, লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে চতুর্থ হওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত অবধারিতই ছিল। টিম নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর জন্য বাড়তি বাজেটও বরাদ্দ হয়।

তা ছাড়া রোভার্স কাপের সেমি ফাইনালে লিডার্স ক্লাবের কাছে ৩-০ হারের পর অনুপমের যে ইন্টারভিউটা প্রভাতী সংবাদে বেরোয়, সেটা নিয়েও কমিটিতে কথা হয়। তাতে অনুপম বলেছিল, 'সারথি এখন ভরে গেছে অযোগ্যদের ভিড়ে। কেউই কন্ডিশনে ছিল না, দু'জন ভাইটাল প্লেয়ার ইনজুরির কথা চেপে গিয়ে খেলতে গিয়েছিল। টিমকে তারাই ডুবিয়েছে, আর আমার বিরুদ্ধে এখন তারাই বলে বেড়াচ্ছে সিনসিয়ার ছিলাম না।'

ক্লাবে তো বটেই, বাইরেও সমর্থকদের মধ্যে এই ইন্টারভিউটা নিয়ে তোলপাড় হয়। টিমের মধ্যেও প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়। অনুপম কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল। দুলোদার গাড়িতে সেদিন একটা বউভাতের নিমন্ত্রণে যাচ্ছিল। দুলোদা তখনই তাকে বলেছিল, "তোর জন্য টিম স্পিরিট সাফার করছে। কেন তুই সুপ্রিয়কে ইন্টারভিউ দিতে গেলি। মুখ বন্ধ করে থাকতে পারিস না? ক্লাব সম্পর্কে তুই সিনসিয়ার ঠিকই, কিন্তু নিজের প্রতি তুই ইনসিনসিয়ার। তোর খেলা দেখে বোঝা যায় এখন আর তুই খাটিস না, প্র্যাকটিসে মন নেই।"

অনুপম প্রতিবাদ করে বলেছিল, "এইসব রদ্দি লোকের সঙ্গে খেলে খেলে আমি

ভোঁতা হয়ে যাচ্ছি।"

"আগে তুই একাই খেলা দিয়ে এদের ঘাটতি পুষিয়ে দিতিস, টিমকে টেনে নিয়ে যেতিস। কিন্তু এখন আর তা পারছিস না। ভাল প্লেয়ার কলকাতায় আর কোথায়, উঠে আসছে কই? এইসব রদ্দি লোক দিয়েই কাজ চালাতে হবে। তুই এদের মধ্যে মিসফিট, এখন তোকেই মাঠে ফালতু বলে মনে হয়। তোর খেলা এরা বোঝে না, তোকে একটা বল দিতে পারে না, তোর কাছ থেকে নিতেও পারে না।"

"অল্পবয়সি কিছু ভাল ছেলেকে এবার আনুন, আমি তৈরি করে নেব। আমি কোচ করব। এই হেমন্ত সেনকে দিয়ে আর চলে না।"

"অ্যাঁ, তুই কোচ করবি!" দুলোদা এমন মুখভাব করল যেন সারথির জার্সি পরে রোসি বা জিকোকে মাঠে নামতে দেখছে। "হ্যাঁ, কোচ এবার বদলাবার কথা উঠেছে। যে টিমে ট্যালেন্ট নেই সেই টিমকে অন্যভাবে কোচ করে খেলাতে হয়। ছেষট্টির ইংল্যান্ডের ববি মুর, ববি চার্লটন আর ব্যাঙ্কস ছাড়া ছিলটা কী, অথচ ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান হল! স্কিল, ইমাজিনেশন, ফ্লেয়ার এ সবের ঘাটতি এনডিওরেন্স আর স্ট্যামিনা দিয়ে পোষাতে হয়। অবিরাম বলের পেছনে তাড়া করে গেলেও সেটা ফল দেয়।"

"তাকে কি তুমি ফুটবল খেলা বলবে?"

"আমার দরকার ম্যাচ জেতা, ট্রফি আনা। যদি হামা দিয়ে খেলে ম্যাচ জেতা যায়, তা হলে আমি হামাই দেব। আর্টিস্টিক, অ্যাটাকিং ফুটবল খেলব, যখন অমন করে খেলার মতো ট্যালেন্ট পাব। ছক কেটে অঙ্কের মতো করে এবার সারথি খেলবে। নতুন কোচ ভাবা হচ্ছে সুজিত ঘোষকে। প্রস্তাবটা আমারই।"

অনুপম চিৎকার করে বলে উঠেছিল, "সুজিত ঘোষকে তুমি আনছ...তুমি? গাড়ি থামাও।"

অবাক হয়ে দুলালচাঁদ ব্রেক কষে। গাড়ি থেকে নেমে অনুপম বলেছিল, "সুজিত ঘোষকে যে লোক সারথিতে আনতে চায় তার গাড়িতে আমি চড়ব না।"

আগের বছর কলম্বোয় এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের জোনাল প্রতিযোগিতায় ভারতের কোচ সুজিত ঘোষ দুটো খেলায় থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অনুপমকে নামায়নি।

দুলালচাঁদের গাড়িতে তাকে প্রাণ বাঁচাতে তেঁতুলতলায় আসতে হল। কিন্তু এখান থেকে যেতেও হবে কি ওর গাড়িতে?

মোটরের ইঞ্জিনের আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছে। অনুপম চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, গাড়িরই। সে বারান্দায় গিয়ে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করল। একটা কালো পুরনো অ্যাম্বাসাডারের বনেটের একধার, হেডলাইট আর সামনের দরজাটা দেখেই সে পিছিয়ে এল। দুলোদার গাড়ি এটা নয়। সুপ্রিয় তা হলে অন্য কারও গাড়ি এনেছে।

পঞ্চিকে ঘুম থেকে তুলে বলে যাবে কি না, অনুপম ভাবল। দরকার নেই। যেমন

আচমকা এসেছি তেমনভাবেই চলে যাচ্ছি। কেউ কিছু মনে করবে না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে প্রদীপ হালদারের বন্ধ দরজাটার সামনে থমকাল। তালা ঝুলছে। ঘুরে সদরের দিকে এগোতে গিয়ে সে আর পা বাড়াতে পারল না।

গাড়ি থেকে নেমে রবিদা আর বউদি এগিয়ে আসছে। যুবক আর একজন, এই বোধ হয় সন্তু, পাশের বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। কোলাপসিবল লোহার ফাঁক দিয়ে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে শুভ না অশুভ, সেই খবরটা জানার চেষ্টা করল। ঝুঁকে পড়া, বিধ্বস্ত, ক্লান্ত শরীর, উদ্বেগে ঝলসানো রাতজাগা চোখ, রুক্ষ চুল, পায়ে যেন লোহার জুতো পরা।

ধীর পায়ে এগিয়ে অনুপমই গেট খুলে দিল। ওরা দু'জন স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে। রবিদা নিশ্চয়ই শুনেছে সে কাল রাতে এখানে এসেছে—তাই কোনও বিস্ময় ফুটল না। অনুপমের চোখে বিহ্বলতা দেখে রবিদা শান্ত স্বরে বলল, "শ্মশান থেকে আসছি, ওপরে আয়।"

দোতলায় উঠে এসে চেয়ারে বসে শরীর এলিয়ে দিয়ে রবিদা অস্ফুটে "আহ্‌হ্" বলে চোখ বন্ধ করল। অনেকক্ষণ পর চোখ খুলে অনুপমকে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, "বোস। রাতেই এসেছিস। কাল রাত থেকে ছোটাছুটি চলছে। বউমার বাপের বাড়ি বেহালায় গেলাম। অত রাতে বাড়ি খোঁজাও এক দুর্ভোগ, তারপর আবার এলাম এখানে, তোর বউদি আর বউমাকে নিয়ে যেতে। হাসপাতাল, ডাক্তাররা অবশ্য খুব হেলপ্ করেছে নইলে এত তাড়াতাড়ি বডি বের করতে পারতাম না। বউমার ভাইয়ের, কাকা, পাড়ার ছেলেরা রয়েছে, তারাই যা কিছু করার করছে। প্রদীপ হাসপাতালে যখন পৌঁছয় তখনও প্রাণ ছিল, ঘণ্টা দুই বেঁচে ছিল। আমাদের আর কিছু করার ছিল না তাই চলে এলাম।...তোর পায়ে নাকি বড় চোট পেয়েছিস?"

"নীচের উনি ফিরলেন না? ওঁর ছেলেটি তো এখানেই রয়েছে।" মাথা নিচু রেখেই অনুপম বলল।

"না, বউমাকে আর আসতে বললাম না। কী হবে এসে? বাপের বাড়িতেই নিয়ে গেল। বাচ্চুকে কাল আমি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব।"

বউদি ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। পঞ্চি ঘুমভাঙা চোখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"একটু চা খাওয়াবি রে।" রবিদার শ্রান্ত গলা থেকে সজল করুণ একটা সুর যেন বেরিয়ে এল।

পঞ্চির ঘুমের ঘোর কাটেনি। সে সরাসরি জিজ্ঞেস করে ফেলল, "নীচের দাদা এসেছে?"

রবিদাই শুধু নয়, অনুপমও প্রশ্নের আকস্মিকতায় অপ্রতিভ হয়ে গেল। সেটা কাটিয়ে উঠে রবিদা নরম স্বরে বলল, "আনতে পারলাম না রে।"

উত্তরটা বোধগম্য না হওয়ায় পঞ্চি তাকাল অনুপমের দিকে। একটা ঝাঁঝালো রাগ তখন অনুপমের দু' চোখ দিয়ে মাথার মধ্যে ঢুকে গেল।

"মারা গেছে।" সে ঝলসানো শব্দ দুটো মুখ থেকে বের করে আনল কঠিন গলায়।

"অ্যাঁ, দাদা মরে গেছে!...দাদা মরে গেছে!...তা হলে বাচ্চুর কী হবে, ও মেসোমশাই কার কাছে বাচ্চু থাকবে..." বলতে বলতে পঞ্চি সারা বাড়ির অব্যক্ত শোককে মুখর করে ফুঁপিয়ে উঠল। কেউ তাকে কাঁদতে বারণ করল না।

রবিদার চোখের পাতা ধীরে ধীরে নেমে এল। অন্ধ দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলে ফিসফিস করে শুধু বলল, "টিকিটটা আমিই দিয়েছিলাম।"

অনুপম তখন দালানে আবদ্ধ ফোঁপানো বাতাসের উদ্দেশে মনে মনে বলল, "পেনাল্টিটা আমিই মিস করেছি।"

কারও মুখ থেকে পঞ্চির জন্য একটিও সান্ত্বনা-বাক্য বেরোল না। কাঁদতে কাঁদতে সে ঘরে গিয়ে তার মাসিমার কাছে মনের কষ্ট, বেদনা জানাতে লাগল। কিন্তু সেখানেও কোনও জবাব না পেয়ে সে চোখ মুছতে মুছতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

"সন্তুকে বলেছি বাচ্চুটাকে আজ তোদের কাছেই রাখ। ওরও একটা দু' বছরের বাচ্চা আছে, ভালই থাকবে।" রবিদা মন্থর ম্লান গলায় বলল।

"কাল ওকে কখন দিতে যাবে?" অনুপম চেয়ারে বসে, কিছু একটা বলে সজীবতা তৈরি করার জন্য কথা বলল। কালকের ঘটনা এবং তার জন্য কে বা কারা দায়ী, এই ধরনের কথাবার্তা থেকে দূরে থাকতে চায় সে।

"সকালেই যাব। ছ'টার সময় গাড়িটাকে আসতে বলেছি। আমাদের নিয়ে কাল রাত থেকে গাড়িটা খাটছে। সফিকুলের আজ সকালে কাকদ্বীপে যাওয়ার বুকিং ছিল, সেটা ক্যানসেল করে অ্যাডভান্স ফিরিয়ে দিয়েছে। একবার পেট্রল নিল দশ লিটার, দাম দিতে গেলাম, নিল না।...সফিকুলের বাড়ির অবস্থা কিন্তু মোটেই ভাল নয়, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে পুরনো গাড়িটা কিনেছে।" রবিদা মুখ ফিরিয়ে অনুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে অবশেষে বলল, "ছেলেটা তোদেরই বয়সি।"

চোখ নামিয়ে নিল অনুপম। রবিদার এই শেষ কথাটা বলার উদ্দেশ্য কী। সফিকুল আমারই বয়সি তো কী হয়েছে? ও ভাল কাজ করে আর আমি খারাপ কাজ করি?

"তোর পায়ের অবস্থা এখন কেমন?"

"ভাল।"

সেই সময় পঞ্চি দু'জনের জন্য চা এনে ওদের হাতে দিল।

"ইতিমধ্যে কোনও অসুবিধে হয়েছি কি তোর? ডাক্তার দেখাবার মতো সিরিয়াস কিছু হয়ে থাকে...।"

বাইরে থেকে মোটরের হর্নের শব্দ ভেসে এল। কাউকে ডাকার মতো ছোট ছোট করে দু'বার বাজল । অনুপমের হাতের কাপটা একবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। সুপ্রিয় গুপ্ত গাড়ি নিয়ে এসেছে।

"রবিদা, কাল সকালে বাচ্চুকে নিয়ে তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই। আমি ওকে নিয়ে গিয়ে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দেব।" ধীর এবং দৃঢ় গলায় অনুপম কথাটা বলে পঞ্চির দিকে তাকাল। "দ্যাখ তো, মোটর গাড়িটা এই বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে কি না।"

"তুই ওকে নিয়ে যাবি!" বিশ্বাস করা রবিদার সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। "তোর নিজের কথা তুই ভাব, এসব নিয়ে চিন্তা আমি করব।"

"আমি ভেবেচিন্তেই বলেছি।"

পঞ্চি ছুটে ফিরে এল। "হ্যাঁ গো, দুপুরে যে লোকটা এসেছিল, সে আর ব্যাগ কাঁধে একটা লোক গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে।"

"দুপুরে কে এসেছিল?" রবিদার বিস্মিত প্রশ্ন।

"প্রভাতী সংবাদের রিপোর্টার সুপ্রিয় গুপ্ত।"

" জানল কী করে তুই এখানে...উদ্দেশ্যটা কী?"

"উদ্দেশ্য নিজের স্বার্থ, নিউজের সন্ধানে আসা, আমি তো এখন বড় নিউজ। এত বড় ঘটনার পর উধাও...সেই পলাতক ভিলেনকে তার গোপন ডেরায় খুঁজে বের করে তার ইন্টারভিউ নেওয়া...ডিটেকটিভ গল্পের মতো গা-ছমছম করা একটা লেখার সুযোগ পেলে সুপ্রিয় গুপ্ত ছাড়বে কেন!"

আবার হর্নের শব্দ। এবার একটু বড় করে। পঞ্চি আবার ছুটে গেল বারান্দায়।

"যে আমাকে কাল এখানে পৌঁছে দিয়েছে সে-ই ওকে জানিয়েছে। সুপ্রিয় গুপ্ত আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে বলে গাড়ি এনেছে।" অনুপম চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে বলল, "কিন্তু আমি যাব না। আমি যাব কাল,বাচ্চুকে নিয়ে।"

"লোকটা হাত নেড়ে আমাকে নীচে ডাকল, যাব?" উত্তেজিত পঞ্চি তাকাল রবিদার দিকে।

"দরজা খুলে ওপরে নিয়ে এসো।" অনুপম শান্ত স্বরে নির্দেশ দিল।"

"নিয়ে আয়।" রবিদা অনুমোদন করতেই মেয়েটি নীচে নেমে গেল।

"রবিদা, গত চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে চব্বিশ হাজার বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে গেছে, জানি না আরও কত আমাকে দেবে।"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ওরা তাকিয়ে রইল। প্রথমে সুপ্রিয়, তার পেছনে পঞ্চি, তারপর ব্যাগ কাঁধে বেঁটে, টাকমাথা, স্থূলকায় অরবিন্দ পাইন, হাতে ফ্লাশ লাগানো ক্যামেরা।

"কী রে, তুই রেডি হসনি?" ঈষৎ বিরক্ত ও ব্যস্ত স্বরে সুপ্রিয় সিঁড়ি থেকেই বলল।

হেসে অনুপম বলল, "বসুন। সুপ্রিয়দা।"

আলোর ঝলসানিটা চোখকে সইয়ে সে অরবিন্দর ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে একটু বড় করে হেসে বলল, "ভাল করে অনেকগুলো নিন অরবিন্দদা আর আমাকে কিন্তু গোটা দুই কপি দেবেন।"

অরবিন্দ কম কথা বলে। মাথা নেড়ে সে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে রবিদা ও পঞ্চিসমেত অনুপমের ছবি নেবে সেটাই ঠিক করায় মনোযোগী হয়ে পড়ল।

সুপ্রিয় চেয়ার টেনে বসে বলল, "আপনিই রবিদা, নমস্কার, কী ঝামেলায় যে একটু আগে পড়ে গেছলাম।...অনু। তোকে ক' ঘণ্টা আগেই বলে গেলাম না, আমাদের ফেভারিট গেম এখন ডাকাত কি ছেলেধরা বলে লোককে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে

ফেলা, সেটাই ঘটতে যাচ্ছিল আমাদের প্রায় চোখের সামনে, এই এখানকার বাজারের কাছে। অশথ গাছটার নীচে একটা পাথর বসিয়ে যেখানে পুজোটুজো হয়, তার থেকে দু-তিনশো হাত আগে, বাস-রাস্তাতেই!...আমাদের উলটো দিক দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সাইকেল চালিয়ে একটা ছোকরা মোটরের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল আর তার ষাট-সত্তর গজ পেছনে তাড়া করে আসছিল তিরিশ-চল্লিশটা লোক। সাইকেলটাকে ধরতে পারেনি, বাঁ দিকে একটা রাস্তায় নেমে গেল। শুনলাম আর একজনকে ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেছে। হয়তো এতক্ষণে লাশ ফেলে দিয়েছে।...নে, তাড়াতাড়ি চল, কিছু নেওয়ার তো নেই?"

সুপ্রিয় উঠে দাঁড়াল। অনুপম স্থির হয়ে বসে রইল। রবিদার ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে। পঞ্চি ছেলেধরার গল্প শুনে রোমাঞ্চিত।

"আমি যাচ্ছি না সুপ্রিয়দা।"

"সে কী! অফিস থেকে ব্যবস্থা করে গাড়ি আনলাম, তোর থাকারও ব্যবস্থা করেছি, দেশে আর তোকে যেতে হবে না। আমাদের চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্টের দাদার খালি বাড়ি রয়েছে উলুবেড়েয়, গঙ্গার ওপর। চল, এখন না বেরোলে সন্ধে হয়ে যাবে পৌঁছতে।"

"যা বলার বলে দিয়েছি, যাচ্ছি না। নীচের ভদ্রলোক গতকাল হাসপাতালে মারা গেছেন। আমি তাঁর বাচ্চা ছেলেটাকে কাল সকালে বেহালায় পৌঁছে দিয়ে আসব মায়ের কাছে। সেখানে ফোটোগ্রাফার নিয়ে আসুন, আমাদের ফেভারিট গেমের রিপোর্ট করার, ছবি তোলার প্রচুর সুযোগ তখন পাবেন।"

অনুপমের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বর থেকে সুপ্রিয় জেনে গেল, সিদ্ধান্তটার নড়চড় হবে না। থমথমে হয়ে উঠল তার মুখ। একটা দুর্দান্ত স্টোরির টোপ ফেলে, সম্পাদককে রাজি করিয়ে সে গাড়িটা এনেছে। এখন সে খালি হাতে ফিরে গিয়ে বলবে কী?

"তা হলে তুই এটা আগে বললি না কেন? এত তেল পুড়িয়ে, সময় নষ্ট করে এভাবে হ্যারাস্‌ড হওয়ার কোনও দরকার ছিল না।"

"কে বলল দরকার ছিল না। এটাই তো তোমার স্টোরি। অনুপম বিশ্বাসটা যে কত পাজি, শুধু সারথি থেকে কেন, ভদ্রসমাজ থেকেই তাকে তাড়ানো যে কত মঙ্গলজনক কাজ হবে সেটা এবার তুমি কলম খুলে লিখতে পারবে। সুপ্রিয়দা, এতগুলো লোকের মৃত্যু, জখম, কেউ কেউ পঙ্গুও হতে পারে, এ সবের জন্য আমি একা দায়ী নই। যে সিস্টেমে, যে কাঠামোয়, যে পদ্ধতিতে আমাদের ফুটবল চলছে তাই থেকেই বেরিয়ে আসছে এই বিষ। অপরাধের বোঝা আমি একা কেন বইব, অনুশোচনা, অনুতাপ একা আমি কেন করব? সবাইকে বইতে হবে, করতে হবে, আপনাকেও এর ভাগ নিতে হবে। চারদিকে শুধু তো শুঁয়োপোকার ভিড়। মানুষ...বুদ্ধিমান, হৃদয়বান মানুষ কোথায়? কলকাতার ফুটবল চালাচ্ছে যারা, ক্লাব চালাচ্ছে যারা, সেখানে কাদের দাপট, কাদের প্রতিপত্তি? ধান্দাবাজ, আত্মমর্যাদাবোধহীন, পা-চাটা, চোর-জোচ্চোর ক্লাসের বারিন দত্ত, দুলাল শীল, সুবোধ বোসদের হাতে ফুটবল গেলে এই অবস্থাই হয়; আগুন জ্বলে, টেন্ট ভাঙে,

মানুষ মরে। আর বলির পাঁঠা করার জন্য প্লেয়াররা তো আছেই। আর আছেন আপনারা।"

সুপ্রিয় উঠে সিঁড়ির দিকে এগোতেই অনুপম ঝটিতি হাত বাড়িয়ে ওর বাহু ধরে টান দিল। সুপ্রিয় টানের চোটে পিছিয়ে টেবিলে ধাক্কা খেল। অনুপমের দু' চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে, রগ দুটো দপদপাচ্ছে, ফুলে উঠেছে গলার দু'ধারের শিরা। মুঠো করা পুরো বাহুর পেশি স্ফীত।

সুপ্রিয় এবং অরবিন্দ কিছুটা ভয় পেয়ে রবিদার দিকে তাকাল। অনুপম কিছু যদি ঘটিয়ে ফেলে তা হলে এই লোকটি তাদের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় যেন অবতীর্ণ হয়, এমন একটা প্রত্যাশা তাদের দৃষ্টিতে। কিন্তু রবিদার হাবভাবে এই ভূমিকা পালনের কোনও ইচ্ছা ফুটে উঠেছে বলে তাদের মনে হল না। বরং মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকাটাই তাদের চোখে পড়ল।

"অনুপম গলাবাজি তো এখন খুব করছিস। কিন্তু গড়াপেটা ম্যাচে গোল দিয়ে ছোট ছোট টিমগুলোকে হারিয়ে বীরদর্পে যখন মাঠ থেকে বেরোস, ভক্তদের সাষ্টাঙ্গ প্রণামগুলো অবলীলায় যখন গ্রহণ করিস, তখন তোদের এই ন্যায়-নীতি বোধগুলো থাকে কোথায়? তোরা যদি ফুটবলটা খেলতে জানতিস, পরিশ্রম করে খেলাটা শিখতিস, তা হলে কি ম্যাচ গড়াপেটা করার দরকার হত?" সুপ্রিয় এবার কোণঠাসা অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মরিয়া হয়ে গলা চড়াল।

কেউ খেয়াল করেনি ঘরের পরদা সরিয়ে বিষাদে আচ্ছন্ন, ফোলা ফোলা দুটি অশ্রুসজল চোখ নিয়ে বউদি দরজায় দাঁড়িয়ে। রবিদার দৃষ্টি হঠাৎ সেই দিকে পড়তেই সচেতন হয়ে নম্র স্বরে বলে উঠল, "এই নিয়ে এখন তর্কাতর্কি এখানে না করলেই ভাল হয়। বাড়ির কারও এখন মন ভাল নেই।"

রবিদার কথা গ্রাহ্যে না এনে সুপ্রিয় সমানে গলা চড়িয়ে বলে চলল, "আমরা লিখে-লিখে তোর পপুলারিটি, তোর ইমেজ ধরে রেখেছি অনুপম, তা যদি না করতাম তা হলে আজ তুই দেড় লাখ-দু' লাখ এইরকম খেলে কামাতে পারতিস না। তুই একটা বেইমান, তাই কাগজকে দোষী করছিস। তোকে যে কোনও সময় ময়দান থেকে বিদেয় করে দিতে পারি, সেটা যেন মনে রাখিস।"

"তার আগে আমিই তোমায় এখান থেকে বিদেয় হতে অনুরোধ জানাচ্ছি, নইলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে—" অনুপম দু' পা এগোল সুপ্রিয়র দিকে।

"অনু।" ধমক দিয়ে রবিদা দাঁড়িয়ে উঠল। অরবিন্দ ততক্ষণে সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে গেছে। সুপ্রিয় নামতে নামতে মুখ ঘুরিয়ে বিষাক্ত চোখে তাকিয়ে বলল, "একটা ক্রিমিনালের মতো ফেরার থেকে ভেবেছিস বেঁচে যাবি। দেখি কেমন করে তুই বাঁচিস।"

সুপ্রিয় গুপ্ত নেমে গেল। একটু পরেই গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শোনা গেল। অনুপম তখন স্বগতোক্তি করল, "আপদ বিদায় হল।"

এর পর বউদি আর পঞ্চি পাশের বাড়ি গেল বাচ্চুকে দেখার জন্য। রবিদা নীচে নেমে এসে সদর দরজার বাইরের রকটায় বসল। কলকাতা থেকে সে ফিরেছে

জানলে প্রদীপ হালদার সম্পর্কে খবর নিতে কেউ কেউ নিশ্চয় আসবে। বাড়ির বাইরেই তাদের সঙ্গে কথা বলা ভাল, তা হলে দোতলায় অনুপম নির্বিঘ্ন হতে পারবে।

বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যার এগিয়ে আসাটা অনুপম ঘরের পেছনের জানলা দিয়ে দেখছিল। কালকের থেকে ঠাণ্ডাটা কম, গরম জামা পরার মতো নয়। বাড়ির খিড়কি দরজা খুললেই ডোবার মতো একটা পুকুর। তাকে ঘিরে নারকেল গাছ। আরও কিছু গাছ রয়েছে যার মধ্যে পেয়ারা, আম আর বাতাবিলেবু গাছগুলোকে সে চিনল।

এই সবের পেছনে পুরনো, ভেঙেপড়া ইটের পাঁচিল-ঘেরা দোতলা বাড়ি, যেটা সে কাল দেখেছিল। ইটগুলো ক্ষয়ে যাওয়া, শ্যাওলায় কালো। জানলায় রং নেই, শিকও সবগুলোতে নেই। এইরকম এক সময়ের অবস্থাপন্ন কিন্তু এখন কোনওক্রমে দিন গুজরান করা পরিবার সে মফস্বলের বা গ্রামের যেখানেই গেছে, দেখেছে। বাড়িটার পেছনে ও পাশে বড় বড় গাছ আর আগাছার জঙ্গল।

ম্লান হয়ে আসা আলোয় ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে পুকুরে ছায়া ফেলা গাছেরা। অনুপমেরা বুকের মধ্যে দম বন্ধ করা স্মৃতিগুলো জানলা দিয়ে খোলা প্রকৃতির মধ্যে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে। এই বাড়িতে আর কিছুক্ষণ থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে কি না, এমন চিন্তাও তার মধ্যে এল।

সিঁড়িতে দ্রুত উঠে আসা পায়ের শব্দ আর উত্তেজিত চাপা গলায় রবিদার, "অনু, অনু...কোথায় তুই" শুনে অনুপম বলল, "এই যে, ঘরে।"

"সব্বোনাশ হয়েছে। এ বাড়িতে নাকি ছেলেধরা তাড়া খেয়ে ঢুকেছে। আর তাকে নাকি আমি লুকিয়ে রেখেছি ভাই পরিচয় দিয়ে!"

ঘরের দরজায় রবিদা ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। এখন তাকে দেখেই অনুপমের গা শিরশির করল।

"সে কী, কে বলল?"

"ছুটতে ছুটতে এসে পাড়ার ছেলে দেবাশিস খবর দিল, গ্যাঁদালপাড়া বাঁশতলার লোকে খেপে উঠেছে। তারা দলবেঁধে আসতে পারে।"

"এসব রটাল কারা?"

"দেবাশিসকে একজন বলেছে, মোটরে করে যাচ্ছিল দুটো লোক, গাড়ি থামিয়ে তারা বলল, যে ছেলেধরাটাকে সবাই তাড়া করেও ধরতে পারেনি, সেই লোকটাকে চুপিচুপি রবি সরকারের বাড়িতে ওরা ঢুকতে দেখেছে।...তোর সেই রিপোর্টারের কাজ। কী শয়তান লোক! অনু কোনও রিসক নেওয়া নয়। তোকে খিড়কির দরজা দিয়ে—"

রবিদার কথা শেষ হওয়ার আগেই চিৎকার করতে করতে একটি ছেলে ওপরে উঠে এল, "রবিকাকা, রবিকাকা ওরা এসে পড়ছে, অনেক লোক...আপনি শিগগির নীচে গিয়ে কথা বলে আটকান, নয়তো..."

ছেলেটি আসার মতোই বেগে নেমে গেল। রবিদা উদ্‌ভ্রান্তের মতো এধার-ওধার তাকাচ্ছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। অনুপমের সিক্সথ সেন্স বলল, এ বাড়িতে আর

এক মুহূর্তও থাকা নয়। জনতা মানেই বোধবুদ্ধিহীন, অন্ধ এক দানব। ঘটনা ঘটিয়ে তারপর ভাবতে বসে।

কোলাহলের মতো শব্দ ভেসে এল। অনুপম ধাক্কা দিয়ে রবিদাকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "খিড়কির দরজাটা কোথায় দ্যাখাও।"

একতলায় সিঁড়ির পাশে বাড়ির পেছনে যাওয়ার দরজা। সেখানে সিমেন্টের উঠোন, টিউবওয়েল, পাম্প, কলঘর ইত্যাদি এবং বাইরের পুকুরে যাওয়ার ছোট দরজা। অনুপম দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিজেই টেনে বন্ধ করার আগে রবিদাকে বলল, "বলবে, কেউ আসেনি...খিলটা দিয়ে দাও।"

কোলাহলটা এখন চিৎকার আর তর্জনগর্জন। কিছু কিছু কথা স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে।

রবিদা বলছে, "আস্তে আস্তে, কালকেই এই বাড়ির একজন মারা গেছে, বাড়ির মানুষ এখন শোকে দুঃখে..."

"রাখুন রাখুন, ওসব অনেক শোনা আছে।"

"বের করুন, নয়তো বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।"

রবিদা বলছে, "আমি এখানে এতদিনকার বাসিন্দা, আমি কেন এখানকার ছেলে চুরি করব! এখানে আমার ব্যবসা, দোকান...বাড়িতে এখন একটা লোকও নেই।"

"আরে মশাই পুরনো বাসিন্দে ফাসিন্দে বুঝি না। ব্যবসা-দোকান আছে বলে পয়সার গরম দেখাচ্ছেন? ছেলে ধরে বিদেশে পাচার করার, সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বের করে নেওয়ার কারবারেও অনেক পয়সা। বড়লোকেরাই এসব করে।"

"ভেতরে ঢোক, ব্যাটাকে টেনে বের করি।"

অনুপম পুকুরধার দিয়ে, নারকেল গাছগুলো ঘেঁষে পায়ে-চলা সরু জমি ধরে এগোল। তার লক্ষ্য, যত তাড়াতাড়ি দূরে সরে যাওয়া। ওরা শুধু তো বাড়ির মধ্যেই খুঁজবে না, পুকুরের দিকেও আসবে। শুধু একটাই আশা, অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিন্তু ওদের কারও সঙ্গে যদি টর্চ থাকে! এখানে ঘন ঝোপজঙ্গল নেই যে, সে আড়াল নেবে। তা ছাড়া দলবেঁধে ওরা খুঁজবে, লুকোনো কাউকে পেলে এক সেকেন্ডও খরচ করবে না পিটিয়ে মারতে।...রডটা চালিয়েছিল এক সেকেন্ডেই মনঃস্থির করে। কিংবা তখন মন বলে কিছু ছিলই না।

পাঁচিলের ধারে এসে অনুপম উচ্চতা অনুমান করে দু' হাত তুলে লাফাল। পাঁচিলের মাথা দু' হাতের আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরতেই ঝুরঝুর করে গুঁড়ো চুন-সুরকি এবং তারপর দুটো ইট নিয়ে সে জমিতে পড়েই হাঁটুর যন্ত্রণায় কাতরে উঠল।

রবিদার বাড়ির দোতলা থেকে অনেক লোকের গলা আসছে। ওরা ঘরে ঘরে খোঁজ চালাচ্ছে। ছাদেও নিশ্চয় যাবে। সেখান থেকে পুকুরের দিকে চোখ পড়বেই, আর কিছু লোক খুঁজতে আসবেই।

অনুপম আর একটু সরে গিয়ে পাঁচিলে কয়েকটা কিল মেরে বুঝতে চেষ্টা করল, কতটা মজবুত। তারপর আবার দু' হাত বাড়িয়ে লাফাল।

শক্তই। মনে হয় ইট খসে আসবে না। দু' হাতে চাড় দিয়ে বুক পর্যন্ত উঠে একটা

পা পাঁচিলের ওপর রেখে বাকি শরীরটা তুলে নিয়ে পাঁচিলে রাখা। অনুপম চাড় দিয়ে উঠল।

খিড়কির দরজা খোলার শব্দ হল। সে ডান পা তুলল। পাঁচিলের ওপর রেখে বাকি শরীর তোলার জন্য পায়ের ওপর ভর দিতেই ইটটা খসে পড়ল আর সেই সঙ্গে ডান পা ঝুলে নেমে এল।

ইট পড়ার শব্দটা সন্ত্রস্ত করে দিল অনুপমকে। কিছু লোক বেরিয়ে পুকুরের ঘাটলার সিঁড়িতে। মুখ ফিরিয়ে সে কয়েকটা সাদা ধুতির নড়াচড়া দেখতে পেল।

"খিড়কিতে আলো নেই? বললেই হল! জ্বেলে দিতে বল।"

"শিগগির একটা টর্চ নিয়ে আয়। খোঁজ ব্যাটাকে।"

অনুপমের কনুই দুটো জ্বালা করছে। কিন্তু তাই নিয়ে উহু-হু করার সময় এটা নয়। এখন বাঁচা আর মরার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এই পাঁচিল। প্রতিটি সেকেন্ড এখন...। সে আবার লাফিয়ে পাঁচিল ধরল। ডান পা সবেগে পাঁচিলের মাথায় পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একই ঝোঁকে গোটা শরীরটাকে পাঁচিলের ওপর তুলে দিয়ে নিজেকে সে আধপাক গড়িয়ে দিল। আন্দাজ করে নিয়েছিল এদিকের মতো ওদিকেও জমি আট-ন' ফুট নীচেই হবে।

শরীরে একটা পাক দিয়ে নীচে পড়ার সময় তার মনে একটা ভয়ই তখন ঝলসে গেল—ইট পাথর বা লোহার কোনও খোঁচা জমিতে পড়ে নেই তো! কিন্তু ভয়টা অমূলকই। আঘাত পাওয়ার মতো কিছু ওধারে ছিল না।

পাঁচিল ঘেঁষে দুই তালু আর হাঁটুর ওপর ভর রেখে অনুপম শক্ত জমিতে পড়ল এবং মুখ দিয়ে তার প্রথম কথাই বেরোল, "হাঁটুটা গেল।"

যন্ত্রণায় সে ধীরে ধীরে কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল। বাঁ হাতের আঙুলগুলো হাঁটুর ওপর নিজের থেকেই এগিয়ে গেল সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে। দেড় বছর আগে ডা. চ্যাটার্জি বলেছিলেন, বাঁ পায়ের কার্টিলেজ অপারেশন করিয়ে নিতে, 'আবার যদি চোট পাও, তা হলে কিন্তু খেলা ছাড়তে হবে।' অপারেশনে তার ভীষণ ভয়। তখন সে রাজি হয়নি। এখন তার মনে হল, বোধ হয় এবার খেলা ছাড়তেই হবে।

চিত হয়ে সে শুয়ে রইল। পরিষ্কার আকাশ, কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছে। মাটির আর গাছপালার নিজস্ব মিষ্টি গন্ধ আছে। গাছে পাখির ডানা ঝাড়ার শব্দ। অনুপম উৎকর্ণ হল পাঁচিলের ওধারে গলার আওয়াজে। দূর থেকে ফেলা টর্চের রশ্মিটা পাঁচিলের ওপর দিয়ে একটা সাদা লাঠির মতো ঘোরাফেরা করল।

"আরে, সে কি আর এতক্ষণ বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আছে, দ্যাখগে ভালমানুষির মতো মুখ করে সন্তোষের দোকানে বসে এখন চা খাচ্ছে।"

"দেখলে তুই চিনতে পারবি?"

"খুব পারব।"

কথাগুলো ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল। উঠে বসল অনুপম। কাদের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়লাম? এরা কেমন লোক? সারথির সাপোর্টার কি? তাকে চিনতে পারলে কি রড দিয়ে পিটিয়ে মারবে? ছেলেধরা ধরার লোকগুলো এখন কত দূরে?

এখানে কতক্ষণ বসে থাকা যায়? ঝোপজঙ্গলে, বিশেষ করে পাঁচিলের ধারে গর্তে সাপ থাকতে পারে। শীতের ঘুমে যতই আচ্ছন্ন হয়ে থাকুক, ওদের বিশ্বাস নেই।

সুপ্রিয় গুপ্তকেও সে বিশ্বাস করে না। খবর খুঁজে বের করতে না পারলে, বানিয়ে লেখায় সিদ্ধহস্ত। মান-অপমান বোধটাও কম, চক্ষুলজ্জারও বালাই নেই। লোকটা যে কী ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ, এখন সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

কাছেই একটা কুকুর ডেকে উঠল আর অনুপম ব্যস্ত হয়ে কোনওক্রমে উঠে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তার আর একটি ভয় এখন কাছাকাছিই চার পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলে নিরাপদ হওয়া যাবে কি না, এই নিয়ে যখন সে দ্বিধার মধ্যে, তখন আরও কাছে কুকুরটার ডাক সে শুনতে পেল। আর ডাকের ভঙ্গিটা মোটেই বন্ধুজনোচিত নয়।

অন্ধকারে অপরিচিত লোক দেখলে তেড়ে এসে কামড়াতে পারে। ছুটে পালানোর ক্ষমতা এখন তার নেই। তা ছাড়া পালিয়ে সে যাবে কোথায়! ইট ছুড়ে মারলে বরং আরও চেঁচাবে, আরও তেড়ে আসবে। তা ছাড়া অন্ধকারে এখন কোথায় সে ইট-কাঠ খুঁজবে! অন্ধকার থেকে বেরোনোটাই এখন দরকার। চেহারা দেখলে কুকুরটা কামড়াবার আগে একটু ভেবে দেখবে, ও তো গণপ্রহারের কাজে নামেনি।

অনুপম বাঁ পা ফেলেই কাতরে উঠল। সে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করল, "অসম্ভব, অসম্ভব।" তারপরই দেখল হাত-কুড়ি দূরে কুকুর। মাঝারি আকৃতির, গায়ের রং নিশ্চয় সাদা নয়, তা হলে ঘোলাটে দেখাত। ভয় পেয়েই অনুপম, "হ্যাট, হুশশ, হুশশ" শব্দ করল মুখ দিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে জেনে গেল ভীষণ বোকামি করে ফেলেছে।

কুকুরটা মুখ নিচু করে, হিংস্র ডাক ছেড়ে তেড়ে এল তার দিকে। পায়ের ব্যথা ভুলে অনুপম খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়িটার দিকে এগোল। কুকুরটা পেছন থেকে এসে ডান গোড়ালির কাছে তার প্যান্ট কামড়ে টান দিল।

"অ্যাই, অ্যাই।" অনুপম পা ছুড়ল। নিচু হয়ে হাতড়ে হাতড়ে একটা মাটির ঢেলা পেয়ে কুড়িয়ে নিল। কুকুরটা চার-পাঁচ হাত দূর থেকে গজরাচ্ছে।

ঢেলাটা ভেঙে একটা টুকরো ছুড়েই সে বাড়িটার দিকে মরিয়া হয়ে এগোল। প্রায় ছুটেই। পেছনে আবার গজরানি এবং বাঁ পায়ের ডিমের কাছে প্যান্ট ভেদ করে দাঁত বসানোটা টের পেয়েই সে ঘুরে নিচু হয়ে ঘুসি চালাল। কুকুরটার মাথায় লেগেছে। একটু পিছিয়ে গিয়ে তারস্বরে জানোয়ারটা চিৎকার করতে লাগল।

"পল্টন, আয় আয়, পল্টন।" বাড়ির ভেতর থেকে পুরুষকণ্ঠের ডাক শোনা গেল। পল্টন নিশ্চয় এই কুকুরটাই, কেননা ওর ঘেউ ঘেউ আরও বেড়ে গেল ডাকটা শুনে কিন্তু আর কামড়াতে এগোল না।

বাড়ির সামনের দিকে যাওয়ার পথটা যে কোনদিকে অনুপম তা ঠাওর করতে পারছে না। সেই সময় দোতলার জানলা থেকে বয়স্ক পুরুষ গলায় কে বলল, "দ্যাখ তো, পল্টনটা চেঁচাচ্ছে কেন। শুনছি ছেলেধরা নাকি তাড়া খেয়ে এদিকে এসেছে।"

"দয়া করে একটু কুকুরটাকে ডেকে নেবেন?" ডুবন্ত মানুষ সামনে দিয়ে ভেসে

যাওয়া কাঠের টুকরো দেখলে যেমন মরিয়া হয়, অনুপম সেইভাবেই বলল, "আমি আপনাদের পাশের রবি সরকারের বাড়ির লোক।"

দোতলায় বিস্ময়জনিত একটা শব্দ হল। "আপনি এখানে কী করছেন...পল্টন, এই পল্টন।" ধমকে উঠল লোকটি। "আয়, ভেতরে আয়।"

অনুপমকে এড়িয়ে ঝোপের পাশ দিয়ে কুকুরটা ছুটে চলে গেল। দোতলা থেকে নির্দেশ এল, "ডানদিক দিয়ে ঘুরে আসুন।"

অনুপমের আর হাঁটার ক্ষমতা নেই। বাঁ পা ফেললেই হাঁটু থেকে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা মাথার তালু পর্যন্ত পেশি, শিরা, অস্থি চিরে চিরে উঠে আসছে। জ্বালা করছে পায়ের ডিমের কাছটা। দাঁত বসিয়েছে তো বটেই, মাংসও তুলে নিয়েছে কি না সে বুঝতে পারছে না।

সে জমিতে দুই তালু রেখে হামা দিতে গেল। পারল না। ব্যথাটা আরও অসহ্য হয়ে তাকে উপুড় করে প্রায় শুইয়ে দিল। কুকুরটা যদি ফিরে আসে তা হলে কিছুই তার করার থাকবে না। তবে ওটা কুকুরই, প্রভুর আদেশ মেনে চলে।

বাড়ির কোনও লোক যদি এখন এসে পড়ে তা হলে সে এই অসহায়তা থেকে রেহাই পেতে পারে। অনুপম করুণ চোখে জানলাটার দিকে তাকাল। অন্ধকার। কুকুরটা বাড়ির মধ্যে একবার ডেকে উঠল।

আজ এই অবস্থা আমার হল কেন? মাটিতে মুখ ঠেকিয়ে অনুপম চোখের জল আটকে রাখার কোনও চেষ্টা করল না। এত অপমান, এত হীনতা স্বীকার, এত ভয় পাওয়া, এত হেনস্থা আর লাঞ্ছনা! কী পাপ আমি করেছি? মাটিতে গড়াগড়ি খেতে হবে কেন? কী আমার দোষ? ভারতের এত বড় ফুটবলার এমন শাস্তি পাবে কোন রুলস বইয়ের নিয়মে?

টর্চের আলো তার দেহের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে "ওমা!" বলে একটা ভয়-পাওয়া কণ্ঠস্বর অনুপমের মাথার কাছে থমকে পড়ল।

মুখ তুলে তীক্ষ্ণ রশ্মির আঘাতে সে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

"কে আপনি? এখানে কেন?" একটি ছেলের গলা। অনুপম ওঠার জন্য দু' হাতে ভর দিয়ে দেহটা তুলতে গিয়ে পারল না।

"আমাকে একটু ধরে তুলে দেবে ভাই। আমার বাঁ পা-টা জখম হয়েছে, চলার ক্ষমতা নেই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

হাতের লাঠিটা আর টর্চ মাটিতে রেখে অনুপমকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ছেলেটি। "আমি বাড়ি থেকে বরং কাউকে ডেকে আনি। দু'জনের কাঁধে ভর না রাখলে আপনি চলতে পারবেন না। ততক্ষণ লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন।"

ছেলেটি দ্রুত ডেকে আনল একজনকে। দু'জনের কাঁধ ও গলা জড়িয়ে ধরে অনুপম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এল নিচু তক্তপোশ পাতা একটা ঘরে, যার বিবর্ণ দেয়ালে তেলরঙে আঁকা ধূলিমলিন অস্পষ্ট দুটি ছবি। ভারী কাঠের একটা টেবলে পড়ার বই ছড়ানো। ঘরের একমাত্র বালবটা কম পাওয়ারের।

অনুপমকে ওরা চেয়ারে বসাল। এতক্ষণে সে ভাল করে লক্ষ করল তার উদ্ধারকারীদের। মুখের মিল থেকে অনুমান করল বাবা ও ছেলে। কিন্তু ছেলেটির মুখ যেন তার চেনা চেনা মনে হল। কবে, কোথায় যেন সে দেখেছে! চোখ বুজে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে সে মনে করার চেষ্টা করল।

ওরা অবাক হয়ে দেখছিল অনুপমকে। সারা মুখ মাটি আর ময়লা মাখা। জামা আর প্যান্টের সামনের দিকও তাই। প্যান্টের তলা ছেঁড়া। পায়ে রক্ত লেগে।

"পল্টন বোধহয় কামড়েছে। চন্দন তাড়াতাড়ি গরম জল করতে বল, তুলো আর ডেটল আন। মারকিউরোক্রোম দিলেই হবে। আর ওনার মুখ হাত ধোয়ার জন্য এক বালতি জলও আনিস।"

বয়স্ক লোকটি উবু হয়ে অনুপমের প্যান্টটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে তুলে পরীক্ষা করে অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "বাড়ির পোষা কুকুর, কামড়ালেও ইঞ্জেকশন নেওয়ার দরকার হবে না। কিন্তু আপনি কে? বাগানে এখন এলেনই বা কীভাবে?"

"বাবা, ইনি বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়ার অনুপম বিশ্বাস। রবি জ্যাঠামশায়ের ভাই, এখানে একবার এসেছিলেন।"

কথাটা শুনেই অনুপম চোখ খুলল। চন্দনের সঙ্গে চোখাচোখি হল। মুখে হাসি ছড়িয়ে চন্দন ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

এইবার মনে পড়েছে। সেই ফরসা, রুগণ, লম্বাটে মুখ। সেইভাবেই পাতাকাটা চুল কপালে ঝুলে রয়েছে। চারটে বছর ওকে আর একটু বড় করে দিয়েছে আকারে। চোখ দুটিকেও। গলার স্বর অতটা মিষ্টি আর নেই। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া সবই তো আগের মতো।

তাই কি? সেই চাহনি, সেই দৃষ্টি! সরল, গভীর আয়ত চোখে ফুটে ওঠা অপমানের ব্যথাটা তো অনুপম দেখতে পাচ্ছে না! অত লোকের সামনে অপ্রতিভ হওয়ার লজ্জা কাটাতে হাসির জন্য মর্মান্তিক চেষ্টাটা এখন আর ওর ঠোঁটে নেই। কাগজটা পাকিয়ে ছুড়েছিল ওর কপালে। বাইরে কোনও ইনজুরি হয়নি, কোনও আঁচড় স্মৃতিতে পড়েছিল কি? ওর কি কিছুই মনে নেই! তাই কি হয়!

'আমি কে সেটা আগে জেনে এসে...', হায় রে, কে এখন অনুপম বিশ্বাস? তাকে এবার নিজের মুখে নিজের পরিচয় দিয়ে ভিখিরির মতো বলতে হবে, আমাকে বাঁচাও, আমাকে ক্ষমা করে দাও।

"আমাকে যদি রবিদার বাড়ি পৌঁছতে একটু সাহায্য করেন—" অনুপম ওঠার চেষ্টা করতে করতে আবার বসে পড়ল চেয়ারে।

"নিশ্চয়। গরম জলে আগে জায়গাটা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে নিন। রবিদার আর আমাদের বাড়ির পেছন যদিও পিঠোপিঠি, তবে দুটো বাড়ির সদর দুই রাস্তায়। আপনাকে ঘুরে অনেকটা হেঁটে যেতে হবে। আমি বরং রবিদাকে খবর দিয়ে আনাচ্ছি।...খুব কি যন্ত্রণা হচ্ছে? আসলে জানেন, কুকুরটাকে আমরা সন্ধের সময়...."

বিব্রত ও উদ্বিগ্ন ভদ্রলোককে থামিয়ে অনুপম বলল, "যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু কুকুর কামড়ানোর জন্য নয়। দাঁতটা সামান্যই বসেছে। আমি রবিদার কথা ভাবছি। একদল

লোক ওর বাড়িতে হামলা করতে ঢুকেছিল ছেলেধরা খোঁজার নাম করে। তাদের হাত এড়াতে আমি পাঁচিল টপকে আপনাদের বাগানে নেমেছি।" অনুপম কয়েক সেকেন্ডের জন্য নীরব থেকে, মাথা নামিয়ে মৃদুস্বরে আবার বলল, "আমার জন্য, এ সবই আমার জন্য। মানুষের ক্ষতিই শুধু করে গেলাম।...কী যে খেললাম এতদিন ধরে! কারও কোনও উপকারে এলাম না।"

হতভম্ব ভদ্রলোক ওর ব্যথিত বিষণ্ণ কথা শুনে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, "আমি অবশ্য খেলাটেলা বুঝি না, খোঁজখবরও রাখি না, তবে আপনার নাম আমি শুনেছি। বিরাট প্লেয়ার আপনি—"

"বাজে কথা। সব বানানো, সব তৈরি করা। অবিরত লিখে লিখে বিশ্বাস করিয়ে দেওয়া হয়েছে। হতে পারতাম...বড় প্লেয়ার হতে পারতাম। সেই স্বপ্ন নিয়ে বারো বছর আগে ঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলাম। প্রচণ্ড খাটতাম, খেলাই ছিল আমার সব কিছু, আমার ধ্যানজ্ঞান, আমার জীবন।"

অনুপম ম্লান চোখ দেয়ালে টাঙানো ম্লান ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। অন্যমনস্কের মতো কিছু যেন ভাবছে। ভদ্রলোক ওর ভাবনায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে চুপ করে রইলেন।

স্বীকারোক্তি করার মতো নিচু গলায় অনুপম কথা বলছে। এই সময় এই সব কথা বলার কী দরকার, তা সে বুঝতে পারছে না। কথাগুলো নিজের থেকে বেরিয়ে এল অন্তর ভেদ করে।

"নিজেকে নিজেই তৈরি করে নিয়েছি, সেজন্য অনেক ব্যাপারে স্বার্থপর হয়েছি। সবাই বলবে অন্যায় করেছি, বলুক তারা। মানুষকে আনন্দ দেওয়া আমার কাজ, এর একটা গুরুত্ব সমাজে আছে। সারথির হাজার হাজার সাপোর্টারকে আনন্দ দিয়েছি, এর কি কোনও দাম নেই?"

অনুপম ছবি থেকে চোখ সরিয়ে রাখল ভদ্রলোকের মুখে। তিনি গলা খাঁকারি দিয়ে নড়ে বসে বললেন, "আজকের কাগজে দেখলাম—"

"জানি, কী দেখেছেন। আমিই সেই লোক যার জন্য মাঠে এত হিংসা, রক্ত, মৃত্যু ঘটে গেল। ভালবাসার কথা, ভাল কাজ করার প্রেরণা, মঙ্গলের পথ দেখানো—আমার খেলা দিয়ে জানাতে পারিনি, দেখাতে পারিনি।" অনুপমের কণ্ঠস্বর প্রান্তরে হা হা রবে বয়ে-যাওয়া বাতাসের মতো শোনাল।

জল নিয়ে চন্দন ঘরে ঢুকল। শুশ্রূষার দায়িত্ব তাকে দিয়ে তার বাবা রবিদাকে খবর দিতে চলে গেলেন। বালতির জলে মুখ ও হাত থেকে ধুলো-মাটি ধুয়ে ফেলল অনুপম। গরম জলে ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছিল চন্দন। অনুপম ওর শান্ত, অচঞ্চল মুখের দিকে তাকিয়ে আলাপ শুরু করল, "স্কুলে পড়ো।"

"হ্যাঁ, ক্লাস টুয়েল্‌ভ হবে।"

"খেলা দ্যাখো...ফুটবল?"

"আমাদের টিভি নেই। তবে এখানকার খেলা দেখি।"

"কালকের খেলায় যা ঘটেছে তা শুনেছ, পড়েছ?"

"আমাদের পাড়ার একটা ছেলে খেলা দেখতে গেছল, তার কাছে শুনলাম খুব হাঙ্গামা হয়েছে। কাগজেও পড়লাম, লোক মরেছে...আপনার জন্যই সব ঘটেছে।"

"কী করে জানলে আমার জন্যই ঘটেছে?"

"কাগজে লিখেছে।"

তা হলে সুপ্রিয় গুপ্ত সফল। খেলা দেখে না যে ছেলে, তাকেও বুঝিয়ে দিতে পেরেছে অনুপমই সব কিছুর মূলে।

"ট্রাইবেকারে শেষ কিক্‌টা ছিল আমার। যদি গোল দিতাম তা হলে ম্যাচটা ড্র হত, আমরা যুগ্ম বিজয়ী হতাম। আমার কিক্‌টা বারের ওপর দিয়ে চলে গেল। না গেলে আমাকে কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত, এত সব কিছুই হত না।" অনুপম হাসার চেষ্টা করল।

"গোল একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে চন্দন বলল, "পল্টন খুব বেশি কিছু করেনি, দু' দিনেই শুকিয়ে যাবে। ভয়টয় দেখায়, তাড়া করে, তবে ফেরোসাস নয়। আপনার প্যান্টটা গোটানোই থাক, নইলে ওষুধ লেগে যাবে।"

ফুটবল নিয়ে কথা বলায় ছেলেটির কোনও আগ্রহই নেই। অথচ চার বছর আগে আমার অটোগ্রাফ চেয়েছিল! অনুপম এই প্রথম দেখছে, তার উপস্থিতি একদমই উত্তেজিত করল না একটি কিশোরকে।

"তোমার মনে আছে কি, একটা হ্যান্ডবিল নিয়ে তুমি তাতে আমার অটোগ্রাফ চেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।" চন্দনের মুখে লাজুক হাসি ফুটল। "আপনি দেননি।"

"সেটা ছুড়ে তোমার কপালে মেরেছিলাম।"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমার লাগেনি।"

"তাতে তুমি দুঃখ পাওনি।"

"একটু, তারপর ভুলে গেছলাম।" চন্দনের বড় বড় চোখ দুটিতে অনুপমকে গ্রাহ্যে না এনে তাচ্ছিল্য দেখানোর কোনও চেষ্টা নেই। সরল, অকপট, আন্তরিক চাহনি। অনুপমের ভেতরটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল।

"বাবা বলেছিলেন, খুব অন্যায় করেছিস। অতবড় প্লেয়ারকে ওইরকম একটা বাজে কাগজে সই চেয়ে তাকে অসম্মান করেছিস। তারপর আমি ভেবেছিলাম আপনাকে চিঠি লিখে ক্ষমা চাইব। কিন্তু কেমন লজ্জা করল, তাই লেখা হয়নি।...আচ্ছা এখন যদি আপনার কাছে মাফ চাই?"

অনুপম অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলছে কী! ওকে তো আমিই অপমান করেছি, ওরই তো রেগে থাকার কথা। তার বদলে ও আমায় শ্রদ্ধা দিল। একটা আবেগ অনুপমের বুক থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে যেতে লাগল আর সে আবিষ্কার করল তার শরীর থেকে বাথা-যন্ত্রণা ক্রমশ যেন মিলিয়ে যাচ্ছে।

"এখন কার কাছে তুমি মাফ চাইবে, আমি তো সেদিনের মতো অত বড় প্লেয়ার আর নই। আজ আমি মার খাওয়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার জন্য, কাগজে

পড়েছ তো, কত কিছু ঘটে গেল।"

"আপনি নিশ্চয় আবার পরিশ্রম করে বড় হয়ে উঠবেন।" চন্দন খুব সাধারণ গলায় বলল। "আমি ক্লাস নাইনে ইতিহাসে খুব কম নম্বর পেয়েছিলাম, মাত্র পঞ্চান্ন। বাবা বললেন, একটু জোর দাও, আলাদা যত্ন নাও। প্রতিদিন পনেরো মিনিট সময় দিয়েছি ইতিহাসকে। একদিনও বাদ যায়নি। মাধ্যমিকে লেটার পেলাম। আপনিও যদি...না না, পনেরো মিনিটে হবে না জানি। যতটা দরকার, যদি ততটা সময়—।"

চন্দনের পক্ষে বলা সম্ভব নয় একজন ফুটবলারের কী কী করা দরকার। তাই সে কথা থামিয়ে ফেলল। কিন্তু অনুপমের মনের মধ্যে অজস্র কথা ঘুরপাক খেয়ে উঠল।

"চন্দন, তুমি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে চাও কেন?"

মুশকিলে পড়ে গেল চন্দন। এভাবে কেউ এই প্রশ্ন তাকে এখনও করেনি। সে বিব্রত হয়ে বলল , "ভাল রেজাল্ট তো সবাই করতে চায়, আমিও চাই। ওপরের দিকে থাকলে খুব ভাল লাগবে, সবাই প্রশংসা করবে।"

"আমিও তাই চেয়ে খুব পরিশ্রম করেছিলাম। কিন্তু কিছুটা উঠেই আর করিনি। আমার কাজটা হয় বডি দিয়ে, তোমারটা ব্রেইন দিয়ে, এইখানেই আমাদের বড় পার্থক্য। শরীরের ক্ষমতা এক সময় তো কমতে শুরু করবেই কিন্তু তোমার ক্ষমতাটা যত চর্চা করবে, তত বাড়তেই থাকবে।"

কথা বলতে বলতে অনুপমের নিজেকে হালকা মনে হতে লাগল। যে গ্লানিটাকে চার বছর ধরে বয়ে চলেছিল, সেটা যেন চন্দনের সঙ্গে কথা বলে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

"আপনার শরীরের ক্ষমতা কি কমে গেছে? বাবা বলেন, কখনও নেগেটিভ চিন্তা কোরো না, তা হলে তুমি ব্যর্থ হবেই। আর শুধুই চিন্তা করে সফল হওয়া যায় না, কাজও করতে হয়। কাজে কখনও ঢিলে দিয়ো না।"

অনুপম চুপ করে রইল। শরীরের ক্ষমতা এই ঊনত্রিশ বছর বয়সে কমবে কেন, তা হলে তার মধ্যে কী ঘটল? নেগেটিভ চিন্তা? কাজে ঢিলেমি?

"তোমার বাবা কী করেন?"

"ক্লার্ক। ইস্টার্ন রেলে, হাওড়া অফিসে।"

"তোমাদের বাড়িটা খুব বড়, আর পুরনো।"

"একশো কুড়ি বছর আগের তৈরি। এখানে আমাদের অনেক জমিজমা ছিল।"

"এখন নেই?"

চন্দন হেসে, জবাব না দিয়ে দরজার দিকে তাকাল। পল্টন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। মাঝারি গড়নের, কালো আর বাদামি রঙের দো-আঁশলা কুকুর। চন্দন হাত নেড়ে ওকে চলে যেতে নির্দেশ দিল। পল্টন দু' পা পিছিয়ে বসে পড়ল।

"এখন আমাদের কিছুই নেই বাড়ি আর বাগানটা ছাড়া। বাবা বলেন, ধনসম্পত্তি আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, কিন্তু মানমর্যাদা তো চেষ্টা করলে ফিরে পাওয়া যেতে পারে।"

"কীভাবে?" অনুপম টানটান হয়ে বসল। চন্দনের উত্তর তার কাজে লাগতে

পারে।

"আমি যদি বড় হতে পারি। বড় মানে ধরুন...খুব বড় বিজ্ঞানী, বড় ডাক্তার, সুপ্রিম কোর্টের জজ, ব্যারিস্টার কি ভাইস চ্যান্সেলার, ইকনমিস্ট। তা হলে আবার আমাদের বাড়ির কথা এই অঞ্চলের লোকেরা বলবে, তাতে আমারও গর্ব হবে।"

"গর্ব তুমি চাও?"

"নিশ্চয়।" চন্দন এমনভাবে তাকাল যেন অঙ্কের সার বোর্ডে দুই আর দুইয়ে পাঁচ লিখে ফেলেছেন। অনুপমের মনে হল, চন্দন যাকে 'আমাদের বাড়ি' বলল, সেটাই তার কাছে সারথি সঙ্ঘ। সারথির মান-মর্যাদা তিন বছর ধরে ধুলোয় লুটোচ্ছে, তাই তারও আজ কোনও সম্মান নেই। এই ছেলেটি আবার তার বংশের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য মন দিয়ে লেখাপড়া করছে। আর সে?

অনুপমের সারা শরীর মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়েই পেশিগুলো ধকধক করে উঠল। এখনই যেন ভেতরে কোনও বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে উঠছে। তার ইচ্ছে করছে এখনই বল নিয়ে মাঠে ট্রেনিংয়ে নেমে পড়তে। এক মিনিটও আর সে অপেক্ষা করতে পারবে না।...চন্দনের বয়সে তার এমনই হত!

আর সেই সময়েই চন্দনের বাবা ফিরে এলেন, সঙ্গে রবিদা। আর তাদের পেছনে অনুপম যাকে দেখল, তাতে তাজ্জব হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ডা. চ্যাটার্জি, তাঁর পেছনে বারিন দত্ত আর দুলাল শীল!

"এখানে শুয়ো পড়ো, পা-টা দেখি।" ডা. চ্যাটার্জি ব্যস্ত এবং কড়া গলায় প্রথম কথাটি বললেন।

"আপনারা?"

"ওসব পরে শুনো। আগে শোও।"

অনুপমকে দু' পাশ থেকে ধরে তুলল বারিন দত্ত ও দুলাল শীল। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে সে তক্তপোশের ওপর বসল। পা তুলে ছড়িয়ে দেওয়ার সময় যন্ত্রণায় আবার সে কাতরে উঠল।

"এটা কী?"

"কুকুরে কামড়াতে গেছল, পারেনি।" চন্দন সবার আগে উত্তরটা দিল। "বাড়ির পোষা কুকুর।"

ডা. চ্যাটার্জি হাঁটুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে মুখ গম্ভীর করে মাথা নাড়লেন। তারপর আলতো করে আঙুল রেখে সামান্য চাপ দিতেই অনুপম "উহ্হ্ লাগছে" বলে উঠল। হাঁটুটা মুড়ে ওপরে তুলতে গেলেন। অনুপম, "না, না, পারব না।" বলে পিঠ বাঁকিয়ে তুলল।

"আর দেখার কিছু নেই। এখনই কলকাতায় নিয়ে চলুন। এক্স-রেটা আজই করাতে হবে। কালই অপারেশন করব।" ডা. চ্যাটার্জি সাদামাঠা শান্ত পেশাদারি গলায় বললেন।

সারা ঘর চুপ। প্রথম কথা বলল দুলাল শীল। "ফেডারেশন কাপে খেলতে পারবে তো? আর দেড় মাস পরেই—"

"থাম দুলো," বারিন দত্ত হাত তুলে বিরক্ত দৃষ্টিতে দুলালকে মৃদু ধমকাল। "ডাক্তার চ্যাটার্জি যা বলছেন...গাড়িটা ভেতরে আনতে বল। আমার অ্যাম্বাসাডারেই যাবে।...দেড়মাসে কি কখনও হাঁটু ঠিক হয়? তিরিশ বছর ধরে হাঁটুর চোট কম তো দেখিনি। তাড়াহুড়ো করে মাঠে নামিয়ে দিয়ে কত ছেলের কেরিয়ারও শেষ হতে দেখেছি। ফেডারেশন আমার দরকার নেই, সামনের লিগটা নিয়েই আমি ভাবছি।"

"এই পা নিয়ে হাঁটাচলা করলে কী করে?" ডা. চ্যাটার্জির বিস্ময় দেখে অনুপম ফিকে হাসল। শুধু হাঁটাচলাই নয়, আট-দশ ফুট ওপর থেকে একটা লাফও সে দিয়েছে।

"ফুটবলারের পা।" এতক্ষণে রবিদা একটা কথা বলার সুযোগ পেয়ে বলল।

বাইরে মোটর এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। অনুপম রবিদাকে জিজ্ঞেস করল, "ওরা কোনও ঝামেলা করেনি তো?"

"না, না। সারা বাড়ি ঘুরে, পেছনে পুকুর টুকুর দেখে বেড়াচ্ছে, তখন পঞ্চি পাশের বাড়ি থেকে এসে হাজির। লোকগুলো তো সব ওর পাড়ারই—গাঁদালপাড়া, বাঁশতলার। মেয়েটা চেঁচিয়ে মেচিয়ে বলল, এ বাড়িতে কোনও বাইরের লোক ঢোকেনি, কোনও লোক দু'দিন ধরে আসেওনি। তাই শুনেই ওরা সরে পড়ল।"

"রবিদা, আমি বলেছিলাম কাল সকালে বাচ্চুকে নিয়ে আমি—" অনুপম উৎকণ্ঠায় উঠে বসল।

"থাক এখন ওসব। তোর নিজের অবস্থার কথা আগে ভাব। দেরি করলে তোর ক্ষতি হতে পারে, ফুটবল-জীবনটাই শেষ হতে পারে, কিন্তু—বাচ্চুরা তো রইলই। কোন কাজটা তা হলে আগে করা উচিত?" রবিদা শান্ত গলায় কথাগুলো বলে ওর মাথায় হাত রাখল। "যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন যে ক্ষতি হতে পারে সেটা বন্ধ হোক।"

অনুপম অসহায় বেদনার্ত চোখে সবার দিকে তাকিয়ে অবশেষে চন্দনের মুখের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন তার কী করা উচিত সেটাই বলে দিক চন্দন।

কিন্তু চন্দন চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে চলে গেল।

"আর দেরি নয়, রাত হয়ে যাবে পৌঁছতে।" দুলাল শীল তাড়া দিল।

"না।"

ঘরের সবাই সচকিতে অনুপমের দিকে তাকাল। ওর গলার স্বরের সঙ্গে একটা অটল ইচ্ছা বেরিয়ে এসেছে যেটা সবারই কানে ধরা পড়েছে।

"আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমাকে কথা রাখতে হবে।" অনুপম দাঁড়িয়ে উঠে বলল। এক পায়ে জোর না থাকায় সে টলছে।

"কীসের প্রায়শ্চিত্ত?" বারিন দত্ত অবাক এবং বিব্রত হয়ে অনুপমকে ধরার জন্য হাত বাড়াল।

"আমার ভাড়াটে ভদ্রলোক কাল খেলা দেখতে গিয়ে মারা গেছে। তারই চার বছরের একমাত্র ছেলে বাচ্চু। অনু বলেছিল ওকে বেহালায় কাল সকালে মামার বাড়িতে নিজে গিয়ে দিয়ে আসবে।" রবিদা মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল।

"একটা বাচ্চা পিতৃহারা হল কেন, কী জন্য, কার জন্য?" অনুপম সবার মুখের দিকে এক এক করে তাকাল। কোনও মুখ থেকেই সে উত্তর খুঁজে পেল না।

"আমি, এই আমি।" অনুপম নিজের বুকে আঙুল ঠেকাল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "আমার জন্য, আমার জন্য।"

"শুধু তোর জন্য কেন, ফুটবল কি আর একজনের খেলা? গোটা টিমটাই...।"

"না না দুলোদা, আমি শুধু আমিই দায়ী।" অনুপম উত্তেজিত হয়ে এগোতে গিয়ে টলে উঠল। বারিন দত্ত তাকে জড়িয়ে ধরে না নিলে পড়েই যেত।

"ছ-সাত বছর আগেও আমি একাই টেনে নিয়ে যেতে পারতাম সারথিকে, আজ আর পারি না।...কেন, কেন এমন হল? আমার নিজের কাছে আমার কোনও মর্যাদা নেই, এর থেকে যন্ত্রণাকর আর কিছু কি হতে পারে?...আমাকে খুঁজে দেখতে হবে কেন এমন হল। আমাকে আবার গোড়ায় যেতে হবে যখন আমি ছিলাম অনামা অখ্যাত এক উঠতি প্লেয়ার, সেই সময়ে যেতে হবে যখন আমি খাটতুম বড় হবার স্বপ্ন নিয়ে, যখন আমার মোটিভেশন ছিল।" অনুপমের উত্তেজনা, আবেগ তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে দেহকেও থরথর কাঁপাচ্ছে। কথাগুলো যে তার অন্তরের গভীর থেকে উঠে আসছে সেটা বুঝতে পারছে সবাই।

"দুলোদা, বারিনদা, মানমর্যাদা চেষ্টা করলে ফিরে পাওয়া যেতে পারে, আমি আবার চেষ্টা করব।"

"তা হলে তাড়াতাড়ি চল।" দুলোদা ঘড়ি দেখল, "এক্স-রে আজ আর বোধহয় করা যাবে না, কসবায় আমাদের এক মেম্বারের এক্স-রে প্লান্ট আছে, ব্যবসা করে। তাকে গিয়েই ধরব যদি আজই করে দেয়।"

অনুপম মাথা নাড়ল। বারিন দত্ত জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"বাচ্চুকে নিয়ে ওর মার কাছে যাব বলেছি—এইখান থেকেই শুরু হবে আমায় গোড়ায় ফিরে যাওয়া। বারিনদা, আগে এক্স-রে নয়, আগে বাচ্চু—আমার মোটিভেশন।"

"অনু ওকে নিয়ে বেহালায় যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে।" রবিদা বোঝাবার চেষ্টা করল। "আগে বরং এক্স-রেটা করিয়ে নে। কাল তো আমি দিয়ে আসবই। তুই পরে নয় বেহালায় একদিন গিয়ে—।" তার কথায় কান না দিয়ে, মাথা নাড়তে নাড়তে অনুপমকে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে রবিদা কথা থামিয়ে ফেলল।

ঘরের বাইরে দালানে চন্দন উবু হয়ে বসে পল্টনের মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল আর পল্টন চোখ বুজিয়ে তার লেজ মৃদু মৃদু নাড়ছিল। অনুপমকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে চন্দন উঠে দাঁড়াল।

"রবি জ্যাঠামশাই যে কথাটা বললেন সেটাই কিন্তু করা উচিত—আগের কাজ আগে।" চন্দন মৃদু শান্ত স্বরে অনুরোধের ভঙ্গিতে বলল।

"কোন কাজটা আগে করার কথা বলছ?" অনুপম থতমত হল আচমকা এমন একটা কথা শুনে।

"একটু আগে যে বললেন আপনার কাজটা করতে হয় বডি দিয়ে! তা হলে এখন

আগের কাজ হল, বডিটাকে হান্ড্রেড পারসেন্ট ফিট রাখা, তৈরি রাখা। তা না রাখলে আপনার মধ্যে নেগেটিভ চিন্তা আসবেই। হাঁটুতে জখম থাকলে আপনি কি পুরো ক্ষমতা নিয়ে খেলতে পারবেন?...মোটিভেশন যতই থাকুক না।"

"তা হলে?" অনুপমকে বাচ্চাছেলের মতো অসহায় দেখাচ্ছে।

ডা. চ্যাটার্জি অনুপমের পিছনে দাঁড়িয়ে চন্দনের কথাগুলো শুনেছেন। তিনি এবার বললেন, "তা হলে উচিত এখনি এক্স-রে করা। আর আমার যা মনে হচ্ছে, অপারেশন করতেই হবে, কালকেই। প্রচণ্ড ক্ষতি, তা না হলে কিন্তু হয়ে যাবে।"

অনুপম মুখ নামাল ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। পায়ের কাছে মুখ তুলে পল্টন বসে। দুজনে চোখাচোখি হতেই পল্টন কানদুটো ঘাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে লেজ নেড়ে ছোট করে একটা "ভ্যাক্" করল। অনুপম ঝুঁকে দুহাত বাড়াতেই পল্টন সামনের দুপা তুলে দাঁড়িয়ে উঠল। ওর মাথাটা ধরে পেটের কাছে টেনে এনে হাত বোলাতে বোলাতে অনুপম বলল, "বাচ্চুর সঙ্গে দেখা করতে বেহালায় আমি যাব, রবিদা তুমি আমায় নিয়ে যেয়ো। বারিনদা, দুলোদা, সামনের বছরের জন্য যে টাকাটা আমাকে দেবেন সেটা বাচ্চুর মায়ের হাতে...আচ্ছা পরে এ নিয়ে কথা বলব। চলুন তা হলে।" অনুপম হাত বাড়িয়ে চন্দনের কাঁধ ধরে গাড়ির দিকে এগোল।

সামনের আসনে বারিন দত্ত, পেছনে দুলাল শীলের কোলে পা ছড়িয়ে আধশোয়া অনুপম। অন্য গাড়িতে ডা. চ্যাটার্জি। গাড়ি ছাড়ার সময় দুলাল স্বগতোক্তি করল, "কী ভয়ঙ্কর যে চব্বিশটা ঘণ্টা কেটে গেল!"

অনুপম চোখ বন্ধ করল। জানলা থেকে রবিদার গলা শোনা গেল, "তোকে নিয়ে একদিন বেহালায় আমি যাব।"

গাড়ি তেঁতুলতলা থেকে পাকা বাস-রাস্তায় পড়তেই অনুপম দু' হাতে চোখ চেপে ধরল।

দলবদলের আগে



দমদম থেকে ভি আই পি রোড ধরে কলকাতার দিকে যেতে ডান দিকে পড়বে সুশোভন পল্লি। তিরিশ ফুট চওড়া একটা পাকা রাস্তা ভি আই পি রোড থেকে বেরিয়ে ঢুকে গেছে এই পল্লির মধ্যে। রাস্তাটা বেড় দিয়ে রয়েছে বাইশ বিঘার এই বসতিকে। নামের সঙ্গে 'পল্লি' শব্দটা থাকায় অনেকেরই মনে হতে পারে এখানে মাটির বা ছ্যাঁচা বাঁশের দেয়াল দেওয়া খড় বা টালির চালের ঘর, চালের ওপর লাউ বা কুমড়ো গাছের পাতা, কাঁচা নর্দমা আর তাতে জমে থাকা পাঁক, দড়িতে বাঁধা দু-চারটে গোরু বা ছাগল এবং প্রতি বাড়ির সামনে কুকুর আর শুকোতে দেওয়া ভিজে শাড়ি-ব্লাউজ, পাজামা ইত্যাদি দেখা যাবে, তা হলে তিনি কিন্তু ভুল করবেন।

সুশোভন পল্লি সম্পন্ন গৃহস্থদের একটা ছোটখাটো উপনিবেশ। পঁচাত্তরটি প্লট নিয়ে এটি গড়ে উঠেছিল কুড়ি বছর আগে। প্রতি বাড়ির সামনে পনেরো ফুট চওড়া রাস্তা, বাড়িগুলোর অধিকাংশেরই বুকসমান ছোট্ট লোহার ফটক, তারপর সিঁড়ি আর ছোট একটা দালান, যেটা গ্রিল ঘেরা। চেয়ার পেতে সেটা বৈঠকখানাও করা যায়। অধিকাংশ ফটকের পাশের দেয়ালে পাথরের ফলকে বাড়ির নাম আর নম্বর। নামের সঙ্গে স্মৃতি, ভিলা, কুঞ্জ, নীড়, কুটির, নিকেতন প্রভৃতি যোগ করা।

একটি ছোট পুকুর ও চিলড্রেনস পার্ক আছে সুশোভনে। পুকুরে স্নান করা বারণ এবং মাছধরাও। তবে পুঁটি ও মৌরলা ছাড়া আর কিছু যে নেই, সে সম্পর্কে পল্লির বাসিন্দারা নিশ্চিত। কেননা, মাছ-চোরেরাই জানিয়ে দিয়েছে, এই পুকুরে জাল ফেলে তারা আর বোকামি করবে না। আধ বিঘার ছোট্ট পার্কটিতে দুটি দোলনা ও দুটি সি-শ্য ছাড়া আছে মুখোমুখি দুটি কংক্রিটের বেঞ্চ। পার্কের চারদিক ঘিরে কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া গাছ এবং রাস্তা। পার্কটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে দোপাটি, গাঁদা, কামিনী, জবা প্রভৃতি ফুলগাছ দিয়ে সাজানো হয়েছিল। পল্লির অ্যাসোসিয়েশন থেকে একজন মালিও রাখা হয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যে অধিকাংশ গাছ উধাও হওয়ায় সুশোভনকে শোভনীয় করার চেষ্টা থেকে অ্যাসোসিয়েশন ক্ষান্তি দেয়। পার্কের চারধারে যে বাড়িগুলি তার কয়েকটি চারতলা, কয়েকটি দোতলা এবং বাকিসব একতলা। পল্লির পেছন দিকে, যাঁরা দেরিতে প্লট কিনেছিলেন, তাঁদের বাড়িগুলির অধিকাংশই একতলা। কয়েকটা প্লটে প্লাস্টার ছাড়াই অসমাপ্ত বাড়িতে লোক বসবাস করছে। এই বাড়িগুলির পেছনে, অর্থাৎ সুশোভন পল্লির এলাকার বাইরেই বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানার মাঠ।

স্থানীয় লোকেরা এটাকে বলে ইলেকট্রিকের মাঠ। এখানে সকাল-বিকেল ফুটবল খেলা হয়, একটা ফাইভ-এ-সাইড, হাইটের টুর্নামেন্টও পাঁচ বছর আগে শুরু হয়েছে।

বিন্দুবাসিনী চ্যালেঞ্জ শিল্ড বিজয়ীর জন্য, আর পাঁচকড়ি দে কাপ বিজিতের জন্য। কারখানা মালিকরা চার বছর আগে জমিটা বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল এক বিল্ডিং প্রোমোটারের কাছে। কিন্তু কীভাবে যেন সেটা জানতে পেরে নেতাজিনগর আর শহিদ কলোনির ছেলেরা বিক্রি বন্ধের দাবিতে লাঠি, বোমা এবং আরও কী সব জিনিস নিয়ে এমন রইরই কাণ্ড বাধিয়ে দেয় যে, মালিকরা আজও কারখানামুখো হতে সাহস পাচ্ছে না।

এপ্রিলের মাঝামাঝি চৈত্রের শেষাশেষি এমন একটা দিনের ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সুশোভন পল্লির চারজন রাস্তা দিয়ে স্বাভাবিক গতির থেকে একটু জোরে হাঁটছেন। বেড়ানোও নয় জগিংও নয়, সমীরণ নাম দিয়েছে বেগিং। এইভাবে যাঁরা ভোরে রাস্তায় হনহনিয়ে হাঁটেন তাঁদের সে বলে 'বেগার'। বাংলা করে বলে, 'স্বাস্থ্য ভিক্ষুক'। ওর বোন শ্যামলা (শ্যামলী নয়) আর ভাই হিমাদ্রি ছাড়া এই নামকরণের ব্যাপারটা আর কেউ জানে না।

আর কেউ বলতে অবশ্য একজনকেই বোঝায়, তাদের পিসিমা রেখা গুপ্ত। মধ্য কলকাতায় মৌলালির কাছে মেয়েদের একটা স্কুলে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টরের কাজ করেন আর কখনও কোনও শিক্ষিকা অনুপস্থিত থাকলে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ক্লাস ঠাণ্ডা রাখতে। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, সত্তর কেজি ওজনের, ছেচল্লিশের কাছাকাছি বয়সি রেখা গুপ্ত তখন ক্লাসে ঢুকেই সারা ঘরে প্রথমে চোখ বুলিয়ে শুধু একবার "হুম" বলেন। সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জোড়া চোখ ডেস্কের ওপর দৃষ্টি নামিয়ে আনে। "তোমরা কি চাও এখন আমি তোমাদের পড়াই?" ক্লাস নিরুত্তর থাকে। "গুড। তোমরা কি চাও এখন আমি গল্প করি?" মুহূর্তে একটা "হ্যাঁ-আ-আ" শব্দ সিলিংয়ের দিকে উঠতে উঠতে রেখা আন্টির আর একটা হুম-এর ধাক্কায় ডেস্কের ওপর গোঁত খেয়ে নেমে আসে। কিন্তু দশাসই ধড়ের ওপর বসানো মিষ্টি মুখটিতে ঝকঝকে আয়ত চোখজোড়া যখন প্রশ্রয়মাখা দুষ্টুমিতে পিটপিট করে ওঠে, তখনই "আন্টি, গ অল—পোও" এই শব্দটা এবার প্রজাপতির মতো উঠতে উড়তে সিলিং ছুঁয়ে ঘরে ছড়িয়ে যায়। ঘণ্টা বাজলে আন্টি যখন বেরিয়ে আসেন, তখন সারা ঘর হাসিতে লুটোপুটি কিংবা ছলছল চোখে গম্ভীর। টিচার্সরুমে রেখা গুপ্তকে বলতে শোনা যায়, "মেয়েগুলো গল্পের কাঙাল; এদের বাবা-মায়েরা কেমন লোক! রোজ গল্প শোনায় না কেন? কল্পনাপ্রবণ না করে তুললে মনের বিকাশ ঘটবে কী করে? আমি তো রোজ রাতে গল্প শোনাতাম।"

তিনি গল্প শোনাতেন নাককানমলা-দের। ডাকনাম অনুসারে নাক হল নাকু অর্থাৎ সমীরণ, কান হল কানু বা হিমাদ্রি আর মলা বলাবাহুল্য শ্যামলা। রেখা গুপ্ত বাস্কেটবল খেলায় ইউনিভার্সিটি আর স্টেটের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন কুড়ি বছর আগে পর্যন্ত। যখন তাঁর বউদি তিনটি শিশুকে রেখে মারা গেলেন এবং দাদা সুনীলবরণ আধা-সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন শুরু করলেন, তখন ছাব্বিশ বছরের পিসি চার ও দুই বছরের নাকু কানু আর তিন মাসের মলাকে বুকে তুলে নিয়ে একই সঙ্গে ওদের বাবা-মা হয়ে যান। রেখা গুপ্ত বিয়ে করেননি।

সমীরণ যাদের বেগার বলে, তাদের মধ্যমণিটি হলেন তারই পিসি! সুতরাং বেগার শব্দটি যাতে কোনওক্রমেই ওই একজনের কানে না পৌঁছয় সেই ব্যাপারে তিন ভাইবোন হুঁশিয়ার। পৌঁছলে কী হতে পারে সে বিষয়ে সমীরণের মোটামুটি একটা ধারণা আছে।

পাঁচ বছর আগে তিনটি শোবার ঘর, রান্নাঘর, কলঘর এবং খাবার দালানের মোট দশটি ছোট ও বড় জানলার কুড়িটি কাচের পাল্লা সাবান জল ও ন্যাতা দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়েছিল এবং এমনভাবে, যেন ন্যাতা বোলানোর দাগ না থাকে। ছিল বলে তিনটি জানলার রিপিট পরিষ্কার করতে হয়। যখন সে প্রথম ফার্স্ট ডিভিশন লিগে দর্জিপাড়া একতা-য় খেলতে শুরু করেছে তখন যুগের যাত্রীকে সে গোল দিতেই রেফারি অফসাইড জানিয়ে গোলটি বাতিল করে। অবশ্যই অনসাইড থেকে করা গোল, তা ছাড়া সমীরণের মতো আনকোরা ফুটবলারদের কাছে যাত্রীর মতো গত বছরের চ্যাম্পিয়ান দলকে ঘেরা মাঠে প্রথম খেলতে নেমেই গোল দেওয়া তো চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো ব্যাপার। রাগে জ্বলে উঠে সে মনের ভারসাম্য নষ্ট করে রেফারিকে বলেছিল, "যাত্রীর চাকর" এবং আরও কিছু কথা । সঙ্গে সঙ্গে লাল কার্ড তাকে দেখতে হয়েছিল । পরদিন কাগজে তাকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়ার খবরটা পড়ে বেগারদের একজন, রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কম্যান্ডান্ট জি. সি. দত্ত, এই "আনস্পোর্টিং, ইনডিসিপ্লিনড্ বিহেভিয়ার"-এর দুঃসংবাদটি পিসির কানে তুলে দেন। "লজ্জায় মাথাকাটা যাওয়া" রেখা গুপ্ত অতঃপর অপরাধী ভাইপোর আত্মপক্ষ সমর্থন শোনা ও রায় দেওয়ার জন্য কতক্ষণ সময় নিয়েছিলেন?

"রেফারিকে তুই চাকর বলেছিস! এই পরিবারের ছেলে এমন অভব্য, অসভ্য, জন্তু, এমন আনকাল্‌চার্ড হবে ভাবতেও পারি না!"

"পিসি, এর থেকেও খারাপ নোংরা কথা ছেলেরা রেফারিকে বলে। আমি তো সেই তুলনায়—"

"চুউপ।"

"পিসি, রেফারি ইচ্ছে করেই আমার গোলটা—"

"আবার কথা!"

"রেফারি যাত্রীর টাকা—" সমীরণের চুল ততক্ষণে পিসির হাতের মুঠোয় বন্দি।

"চাকর বলেছিলিস? ঠিক আছে, চাকরের কাজই করবি। বাড়ির সব জানলার কাচ...।"

সমীরণ হিসাব করে দেখেছে। বিচার ও শাস্তিদানপর্ব দু'মিনিটেই সারা হয়েছিল। এখন যদি পিসি শোনে তার বন্ধুদের সে আড়ালে বেগার বলে, তা হলে নিশ্চিত তাকে বেগিং-এ নামিয়ে দেবে। হয়তো বলবে, "যাও, শ্যামবাজার কি মৌলালি মোড়ে এই বাটিটা হাতে নিয়ে ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করো। ভিক্ষের পয়সা থেকে আট আনা খাবার জন্য খরচ করে বাকিটা আমায় রাত্রে দেবে। বেগারদের জিলিপি কিনে খাওয়াব।" পিসিমার বেগার মানে সত্যিকারের ভিখারি, যারা রাস্তায় ভিক্ষা করে।

মাঝে মাঝেই বাজার করে ফেরার সময় হিমাদ্রি গরম জিলিপি কিনে রাস্তা দিয়ে খেতে খেতে আসত। বলাবাহুল্য, বাড়ি পৌঁছনোর আগেই জিলিপিগুলো শেষ করে ফেলত। হপ্তার ছ'টা দিন তাকে বাজার যেতে হয়। রবিবারে রবিবারে শ্যামলাকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে যান পিসি নিজেই। হিমাদ্রির জিলিপি খাওয়াটা একদিন দেখে ফেলে বেগারদের একজন, স্বাস্থ্য দফতরের রিটায়ার্ড ডেপুটি সেক্রেটারি অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য। যথারীতি পিসির কাছে "নোংরা হাতে, ধুলোবালি বীজাণু ওড়া রাস্তা দিয়ে, আন-হাইজিনিক পরিবেশে তৈরি চিনির রসে ডোবানো জিলিপি, যা খেলে ডায়বিটিস হতে পারে", এমন জিনিস খাওয়ার সাঙ্ঘাতিক খবরটা পৌঁছে গেল।

সুশোভন পল্লিতে ঢোকার মুখে ভি আই পি রোডের ওপরই 'জয় মা তারা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। হিমাদ্রি যথারীতি সেদিন বাজার থেকে বাঁচানো পয়সায় আটটা জিলিপি কিনে, ঠোঙাটার মুখ খুলে দু'আঙুলে ধরে, একটাকে টেনে সবেমাত্র বের করেছে আর ঠিক তখনই পেছন থেকে "ঠোঙাটা আমায় দে তো কানু।" আঙুল থেকে জিলিপিটা প্রথমেই জমিতে খসে পড়েছিল। তারা মা-র সামনে বসে থাকা কুকুর জগা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে একটা গোটা জিলিপি, সম্ভবত জীবনে প্রথম, পাওয়ার জন্য যার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেজ নেড়েছিল, সে তখন ফ্যাকাশে মুখের পিসির দিকে তাকিয়ে।

"তোর হাতটা দেখি।"

হিমাদ্রি ডান হাতের তালু মেলে ধরল। রেখা গুপ্ত তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে করতে নাক কোঁচকালেন। "এই তো আলুর মাটি, মাছের গন্ধ লেগে রয়েছে...এই হাতে...।"

ছেঁড়া গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা এক বৃদ্ধ সঙ্গে বাচ্চা একটা ছেলেকে নিয়ে দোকানের একধারে হাত পেতে চুপ করে দাঁড়িয়ে। পিসি হাতছানি দিয়ে ছেলেটিকে ডেকে জিলিপির ঠোঙা তার হাতে দিয়ে বলল, "খেয়েনে।"

হিমাদ্রি তখন ক্ষীণস্বরে বলেছিল, "পিসি ওর হাতেও ময়লা আছে।"

"থাকুক, ও আমার ভাইপো নয়।"

এহেন পিসি প্রতিদিন ভোরে শ্যামলা আর সাত-আটটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে নিয়ে, ট্র্যাকস্যুট পরে সুশোভন পল্লিতে চক্কর দিয়ে ছোটেন। খুব জোরে নয়, আবার বেগারদের মতো অত ধীরেও নয়। ট্র্যাকস্যুটটা সমীরণের। গত বছর ইন্ডিয়া টিমের ক্যাম্পে নতুন একটা পাওয়ায় সে পিসিকে বলেছিল, "শাড়ি পরে কি জগ করা যায়! কোনওদিন হোঁচট খেয়ে পড়বে, হাত পা ভাঙবে, বরং আমার একস্ট্রা একটা রয়েছে, তুমি এটা পরেই ছোটো।"

পিসি-ভাইপোর উচ্চতা এবং ওজন সমান সমান। বাড়িতে ট্র্যাকস্যুট পরে নাককানমলাদের সামনে ট্রায়াল দিতে পিসি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় আটবার ছুটে ওঠানামা করে বলেছিলেন, "জিনিসটা ভালই মনে হচ্ছে। অনেক ফ্রি লাগছিল। ওদেরও বলব ট্র্যাকস্যুট পরে দৌড়তে।"

ওঁরা অর্থাৎ বেগাররা একদিন আলোচনায় বসেছিলেন রেখা গুপ্তর প্রস্তাবটা বিবেচনা করতে। বসাক দম্পতি অর্থাৎ বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর সরোজ ও তাঁর স্ত্রী মালবিকা তাঁদের প্রধান অসুবিধার কথা জানিয়েছিলেন এই বলে—ট্র্যাকস্যুট পরলে তাঁদের যে হাইট তাতে আরও বেঁটে মনে হবে। স্বামী পাঁচ-এক, স্ত্রী চার-দশ। উচ্চতার ঘাটতি দু'জনেই পুষিয়ে নিয়েছেন প্রস্থে। ঢোলা জিনিসটার মধ্যে ঢুকে দৌড়লে তাঁদের যে চলমান পিপের মতো দেখাবেই, তাতে কোনওরকম সন্দেহ তাঁরা পোষণ করছেন না।

এহেন অকপট স্বীকারোক্তির পর ট্র্যাকস্যুট পরিধানের জন্য তাঁদের ওপর আর চাপাচাপি কেউ করলেন না। জি. সি. দত্ত অবশ্য বলামাত্র রাজি, তবে একটা শর্তে, "আমাদের স্পিড বাড়াতে হবে।" যে স্পিডে তিনি সাব ইন্সপেক্টর থাকাকালীন একবার খোকাগুণ্ডার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে ধরেছিলেন তিন মাইল দৌড়িয়ে (প্রতি দশ দিন অন্তর গল্পটা বলে থাকেন), তিনি সেই স্পিডে ফেরার বাসনাটাই জানিয়ে দিলেন। প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানালেন প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারি।

"আমরা চোরগুণ্ডা ধরার জন্যই কি তা হলে রোজ সকালে দৌড় প্র্যাকটিস করব? ব্লাড সুগার, অম্বল, ডিসপেপসিয়া, এই তিনটেকেই আমি কন্ট্রোলে রাখার জন্য ঘড়ি ধরে মেপে হিসাব করে পা ফেলি, এর একটা ছন্দ আছে, তাল আছে। হুট করে স্পিড বাড়ানোটা উচিত হবে কি না সেটা ভেবে দেখা দরকার।"

এরপর ট্র্যাকস্যুট পরার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ফললাভ হবে না বুঝে আর কথা বাড়ানো হয়নি। রেখা গুপ্ত একাই পরেন। আজও তিনি দৌড়চ্ছিলেন। প্রথমে রেল এঞ্জিনের মতো, তারপর সাত-আটটি ক্ষুদ্র বগি, শেষ গার্ডের মতো শ্যামলা। চারজন বেগার উলটো দিক দিয়ে 'বেগিং' করেন। আজও তাঁরা মুখোমুখি হতেই শ্যামলা বলল, "আট"। অর্থাৎ, তাঁদের আট চক্কর দৌড় সম্পূর্ণ হল।

"ছয়।" গম্ভীর স্বরে জি. সি. দত্ত নিজেদের সংখ্যাটি জানিয়ে দিলেন।

"ছয় নয়, তিন।" ভটচায ভর্ৎসনা করলেন, "মিছে কথা বলে লাভ কী?"

"আজ শনিবার, কার বাড়িতে চা খাওয়া সেটা কি ভুলে গেছেন?" দত্ত খিঁচিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন।

সপ্তাহের পাঁচ দিন সকালের চা এবং কিঞ্চিৎ 'টা' পাঁচ জনের বাড়িতে পর্যায়ক্রমে ওঁরা খান। শনিবারের পালা রেখা গুপ্তর, এইদিন ওঁর স্কুলের ছুটি থাকে। সাধারণত তিনি চায়ের সঙ্গে লুচি দেন, সহযোগে আলুছেঁচকি। অথবা লুচির বদলে হালুয়া। দেওয়ার পরিমাণটা নির্দিষ্ট হয়, ক' চক্কর দেওয়া হল তার ওপর। ছয় চক্কর মানে ছ'টি লুচি অথবা বৃহৎ ছ' চামচ হালুয়া।

চার চক্করের পরই চার বেগার পার্কের বেঞ্চে বসে পড়লেন। রেখা গুপ্ত পার্কের মধ্যে তখন বাচ্চাদের ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করাচ্ছেন। সাইকেলে দুটি খবরকাগজওলা তিরবেগে সুশোভনে ঢুকল। একজন অন্যদিকে চলে গেল, অন্যজন ওদের কাছে এসে ঝটপট তিনটি কাগজ হাতে ধরিয়েই সাইকেলে লাফিয়ে উঠল। রেখা গুপ্তর কাগজ বাড়িতে দেওয়া হয়। তার দাদা প্রথম পড়ার পর অন্যরা হাতে পায়।

তিনজন তিনটি কাগজ খুলে চোখের সামনে ধরলেন। মালবিকা খবরটবরের ধার ধারেন না। তিনি বাচ্চাদের ব্যায়াম করার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"কপিলদেব কলকাতায় এসে কী বলেছে সেটা পড়ে দেখুন।" দত্তমশাই গুরুগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন।

"কী বলেছে?" ভটচায অবাক চোখে তাকালেন ওর মুখের দিকে।

"আপনার হাতেও তো একটা কাগজ রয়েছে।" দত্ত প্রাক্তন পুলিশি স্বর বের করলেন। ভটচায তাড়াতাড়ি হাতের কাগজটা তন্ন তন্ন দেখে বললেন, "নাহ্, আমার কাগজে নেই।"

"আমার কাগজেও নেই।" বসাক যোগ করলেন।

"তা হলে শুনুন— ট্যালেন্ট থাকলেই হয় না, বড় ক্রিকেটার হতে গেলে চাই নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছে আর অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাওয়ার ইচ্ছে।...কেউ যদি সত্যি যোগ্য হয় তা হলে তাকে আটকে রাখা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না। সে ঠিক ফুঁড়ে বেরোবেই।...যে কোনও খেলাকে ঘিরেই কলকাতার লোকের এত উৎসাহ যে, আমার দারুণ লাগে। একই সঙ্গে এটা ভেবেও খারাপ লাগে যে, কেন এই শহর একটা টেস্ট ক্রিকেটার তৈরি করতে পারছে না।" দত্ত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, "ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন? কপিলদেব কী বলতে চায় সেটা হৃদয়ঙ্গম হল?"

"একটু একটু।" বসাক আমতা আমতা করে বললেন।

"আমি পুরোটাই হৃদয়ঙ্গম করেছি।" ভটচাযের মুখে হাসি ছড়ানো।

"তা হলে বলুন।" দত্ত দাবি জানালেন।

"বাংলায় কিসসু ক্রিকেট খেলা হয় না। এখানে সবাই হুজুগে। ট্যালেন্ট হয়তো আছে, কিন্তু সবাই ফুলবাবু, একটুও পরিশ্রম করে না, কারণ ইচ্ছেটাই নেই। শুধু খবরের কাগজে ছবি বেরোলেই এখানে লোকে ভাবে সে বোধ হয় খুব বড় প্লেয়ার।" ভটচায কথাগুলো বলে উদ্বিগ্ন চোখে দত্তর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দত্ত চোখ বন্ধ করে মাথাটা ঈষৎ কাত করে অনুমোদন দিলেন।

"আমাদের নাকু কিন্তু খুব খাটে। ইলেকট্রিক মাঠে সকাল নেই, দুপুর নেই, বিকেল নেই, শুধু বল নিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি।" বসাক ফাঁক পেয়ে তাঁর কথাটা ঢুকিয়ে দিলেন।

"কথা হচ্ছে ক্রিকেট নিয়ে, ফুটবল নিয়ে নয়।" ভটচায ছোট্ট একটা দাবড়ানি দিলেন।

"কথাটা আসলে সব খেলা নিয়েই, শুধু ক্রিকেট নিয়ে নয়। বসাকবাবু ঠিকই বলেছেন, এই শুনুন কপিলদেবের আর-একটা কথা। ওকে জিজ্ঞেস করা হয় পরিশ্রম করার ইচ্ছা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন কী করে? তাইতে বলছে,—'এখানেই আমার মনে হয় পেশাদারদের সঙ্গে সাধারণ মানসিকতাসম্পন্ন লোকেদের তফাত। পেশাদারকে সবসময় সামনের দিকে চোখ রাখতে হয়। আরও, আরও, আরও, আরও। আমি এই নীতিতে বরাবর বিশ্বাসী। হাতির খিদে আমার'।"

"ওরে বাপস, হাতির!" চমকে উঠলেন ভটচায, "আমার তো দুটো লুচি খেলেই অম্বল। আচ্ছা, হাতিরা ক'টা লুচি খেতে পারে?"

"দুটো।" দত্ত খবরের কাগজে চোখ রেখে বিড়বিড় করে বললেন।

"আচ্ছা দত্তবাবু, আমরা কি সাধারণ মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের দলে পড়ি?" বসাক কাঁচুমাচু মুখ করে জানতে চাইলেন।

"সাধারণ মানসিকতা..." দত্ত চিন্তায় ডুবে গেলেন এবং আধ মিনিট পর ভেসে উঠে জানালেন, "পরিস্থিতি-বিশেষে সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। আমি যখন খোকাকে তাড়া করি কোনও ওয়েপন আমার কাছে ছিল না, কিন্তু ওর কাছে পিস্তল ছিল।" এর পর তোমরা বুঝে নাও গোছের একটা হাসি দত্তর ঠোঁট মুচড়ে দিল।

রেখা গুপ্ত বাচ্চাদের বাড়ি পাঠিয়ে তখন হাজির হলেন ওঁদের সামনে। "চলুন, চলুন। রাতে লেচি করে রেখে দিয়েছি, বেলব আর ভাজব। তবে আজ কিন্তু শুধু আলুভাজা, আমি এগোলাম, বাঙ্গালোর ক্যাম্প থেকে নাকুর আজই ফেরার কথা।"

দ্রুত পায়ে শ্যামলাকে সঙ্গে নিয়ে রেখা গুপ্ত বাড়ির দিকে এগোলেন। ওঁদের বাড়িটা সুশোভনের পেছন দিকে ইলেকট্রিক মাঠের লাগোয়া। মাঠে কয়েকটি ছেলে ফুটবল নিয়ে ট্রেনিংয়ে ব্যস্ত। বরেন মুখোটির একটা লন্ড্রির দোকান আছে নামে মাত্রই, আসলে গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ফুটবলার তৈরি করার কাজেই বেশি সময় দিয়েছেন। এখন পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও, কি শীত কি বর্ষা প্রতিদিন সকালে মুখোটি একটা হুইসল গলায় ঝুলিয়ে মাঠে আসেন।

পাঁচ বছর আগে তাঁরই হাতে গড়া সমীরণকে তিনি দর্জিপাড়া একতার সেক্রেটারির কাছে নিয়ে যান। "ছেলেটা ভাল খেলবে, ফুটবল সেন্সটা আছে, খাটিয়েও। সবথেকে বড় কথা স্বভাবচরিত্র ভাল। একে কয়েকটা ম্যাচ খেলিয়ে দেখুন।" মুখোটির এই ক'টি কথাই যথেষ্ট ছিল। অবশ্য সমীরণ তার প্রথম ম্যাচেই রেড কার্ড দেখে। সেক্রেটারি তখন বলেছিল, "নিমাই আর দুলালকে এক ঝটকায় টলিয়ে ভেতরে ঢুকে কী শটটা নিল দেখলি? ওকে সব ম্যাচ খেলাব।"

সমীরণ সে বছর তেরোটা গোল দেয়। ষাট হাজার টাকায়, পরের বছর যুগের যাত্রী তাকে সই করায়। সই করাবার জন্য কথাবার্তা বলেছিল ঘুনু মিত্তির। তার পোশাকি নামটা যে কী, কেউ আর তা জানে না। পঁয়ত্রিশ বছর আগে খেলার দিন ক্লাবের সদস্য গেটে দাঁড়িয়ে সে কার্ড দেখে লোকেদের ভেতরে যেতে দিত। এরপর সেক্রেটারি নারায়ণ সেন-এর গাড়ির দরজা খুলে দেওয়ার অধিকার অর্জন করে। যাত্রীর কোনও ফুটবলার চোট পেলে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন লোক পাওয়া যায় না তখন ঘুনু মিত্তিরই এগিয়ে যেত। এইভাবেই ধাপে ধাপে উন্নতি বা কুরে কুরে সেঁধিয়ে এখন সে কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং নতুন সেক্রেটারি পতিতপাবন ওরফে পতু ঘোষের প্রায় ডান হাত।

ঘুনু প্রথমেই সমীরণকে জানিয়ে দিয়েছিল, "তোর গোলটা ঠিকই হয়েছিল। তবে বড় ক্লাবের এগেনস্টে ছোট ক্লাব গোল করে সিজনের শুরুতেই দুটো পয়েন্ট নিয়ে

নেবে আর বিশ লাখ টাকা দামের টিমের সাপোর্টাররা সেটা দাঁত বের করে দেখবে, তা তো হতে পারে না। সেটা ময়দানের নিয়ম নয়। সারথিকে গোল দিলেও রেফারি অফসাইড করে দিত। নইলে টেন্ট জ্বলে যাবে। কিছুদিন ময়দানের ঘাস চেন, তখন নিজেই সব বুঝতে পারবি। যাকগে, তোকে আমি যাত্রীতে নিয়ে যাব। বড় ক্লাবে খেলার সুযোগ এক বছর ছোট ক্লাবে খেলেই পাওয়াটা যে কত ভাগ্যের ব্যাপার সেটা কি তুই বুঝিস?" আকাশবাণী ভবনের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে তাদের কথা হচ্ছিল। সমীরণ আবেগে আপ্লুত হয়ে শুধু মাথা কাত করে জানিয়েছিল, সে বোঝে।

"কিন্তু একটা কথা।" ঘুনু গলা নামিয়ে চাপা স্বরে বলেছিল, "যা কনট্রাক্ট হবে তার টেন পার্সেন্ট আমার। অ্যাডভান্স পাবি সিক্সটি পার্সেন্ট, ক্যাশ।"

সমীরণ এবারও মাথা কাত করে ঢোঁক গিলে বলেছিল, "বেশ, তাই হবে। কিন্তু কত দেবে আমায়?"

"চেষ্টা করব যাতে বেশি পাস, তুই বেশি পেলে তো আমিও বেশি পাব।"

ষাট হাজার টাকার টেন পার্সেন্ট ছ'হাজার ঘুনু কেটে নিয়েছিল ছত্রিশ হাজার টাকার অ্যাডভান্স থেকে। একশো টাকার তিনশোখানা নোট যখন সে পিসিমার সামনে খাওয়ার টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে প্রণাম করেছিল তখন তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করতে বা বলতে পারেননি। শ্যামলা আঁতকে উঠে বলেছিল, "দাদা পুলিশ টুলিস আসবে কি? ব্যাঙ্ক ডাকাতি করিসনি তো?" হিমাদ্রি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে করতে মন্তব্য করেছিল, "কমই দিয়েছে। দাদার যা খেলা তাতে এক লাখ ষাট হাজার পাওয়া উচিত।"

নোটগুলো গুছিয়ে দু'হাতে তুলে রেখা গুপ্ত ছুটে গিয়েছিলেন কোণের ছোট ঘরটায়, তার দাদার কাছে। একটু পরে চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে এসে বলেছিলেন, "খুব অবাক হয়ে গেল, বলল, ফুটবল খেলে এত টাকা পাওয়া যায় জানতাম না তো! বললাম আরও চব্বিশ হাজার পাবে। তুই গিয়ে প্রণাম করে আয়।"

সমীরণ গোঁজ হয়ে বসে থেকেছিল। বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের কোনওরকম সম্পর্ক নেই বললেই চলে। অফিস থেকে এসে ঘরে ঢোকেন, শুধু স্নান আর খাওয়ার সময়ই তাঁকে ঘরের বাইরে দেখা যায়, কারও সঙ্গে কথা বলেন না।

"যা না, খুব খুশিই হবে।"

সমীরণ ঘরে ঢুকে সুনীলবরণকে প্রণাম করতেই হাতের বইটা নামিয়ে তিনি ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসেন। বড় ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, "এত টাকা যখন নিচ্ছ, সেইমতন খেলাটাও দিয়ো। নিজেকে অপমান কোরো না।"

বাবার কথাগুলো সমীরণের মাথায় কীভাবে যেন গেঁথে গেছল। খাওয়ার টেবিলের কাছে এসে দেখল, পিসি কিছু নোট আলাদা করে গুনে রাখছেন।

"ওগুলো কী জন্য?" সমীরণ রীতিমতো অবাক হয়ে বলে।

"প্রণামীর টাকা। যে গুরুর কাছে প্রথম শিক্ষা নিয়েছিস, যিনি তোকে হাতে ধরে এগিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ঋণ কোনওদিনই তো শোধ করতে পারবি না। তবু প্রণামী

বলে এই ছ' হাজার কাল সকালেই দিয়ে আসবি। খুব কষ্টে আছে ভাইপোদের সংসারে। দোকানটারও যা হাল হয়েছে।"

"দাদার আরও টেন পারসেন্ট গেল।" হিমাদ্রি হালকা স্বরে বলতেই হাত তুলে সমীরণ তাকে চুপ করিয়ে দেয়।

"কানু, এটাকে গেল বলিসনি। পিসি কেন গ্রেট লেডি জানিস? যে কাজটা সবার আগে করা উচিত সেটাই মনে করিয়ে দিয়ে অপরাধের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। বরেনদার কাছে কাল ভোরেই যাব। কিন্তু পিসি, আমাকে দিয়ে আবার যদি জানলার কাচ পরিষ্কার করাও তা হলে আমার মান-ইজ্জত আর থাকবে না।"

কথাটা গ্রাহ্যে না এনে পিসি ভ্রূ কুঁচকে সমীরণকে একপলক দেখে নিয়ে বলেন, "মান-ইজ্জত বলতে কী বুঝিস? নিজের বাড়ির জানলা নিজের হাতে পরিষ্কার করলে ইজ্জত খোয়া যায়? কতবার তোদের বিদ্যাসাগর মশায়ের গল্প শুনিয়েছি না? আসলে তোর মান-ইজ্জত নির্ভর করবে তো তোর খেলার ওপর। টিম যেদিন হারবে, গোল যেদিন দিতে পারবি না সেদিন তোর ইজ্জত থাকবে কি?"

সিরিয়াস কথাবার্তায় পরিবেশ ভারী হওয়ার দিকে গড়াচ্ছে দেখে শ্যামলা হালকা করার জন্য বলেছিল, "ওসব মান-ইজ্জতের কথা রাখো তো এখন, বলো এতগুলো টাকা নিয়ে তুমি কী করবে? তবে আমায় জিজ্ঞেস করলে বলব, একটা কালার টিভি আর—"

"আর দাদার জন্য একটা স্কুটার।" হিমাদ্রি থামিয়ে দিয়েছিল বোনকে। থতমত হয়ে শ্যামলা বলে, "তা তো দাদা কিনবেই, তবে একতলা বাড়িতে থাকাটা এতবড় প্লেয়ারের পক্ষে একদমই মানায় না। ছাদে একটা অন্তত ঘর না তুললে দোতলা বাড়ি বলা যাবে না।"

সবাই কথাটা শুনে চুপ হয়ে গেছল। অবশেষে পিসিই বলেন, "ঘরে কে থাকবে?"

"তুমি।" সমীরণ বলেছিল।

"না। ওপরে আমায় তুলে দিয়ে নীচে তোমরা ভূতের নাচ নাচবে, এসব মতলব ছাড়ো। যদি ঘর হয় তো থাকবে দাদা, সঙ্গে বাথরুমও থাকবে।"

হাঁপ ছাড়ার নীরবতাটা কাটিয়ে উঠে সমীরণ বলেছিল, "কারেক্ট ডিসিশন। আমার প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করছি। কিন্তু, পিসি, তোমার কি কিছু দরকার নেই?"

"আমার দরকার!" পিসি হতচকিত হলেন এবং তিনজনের পীড়াপীড়িতে অবশেষে বলেন, "একদিন আমার সকালের বন্ধুদের পেটভরে রেঁধে খাওয়াব।"

"তোমার সকালের বন্ধুদের?" হিমাদ্রি চোখ কপালে তুলে বলেছিল, "তার মানে বেগা-আ-আ-আ—কথাটা সে শেষ করতে পারেনি যেহেতু শ্যামলার এক প্রচণ্ড রামচিমটি তখন অতি তৎপরতায় তার বগলের নীচে কামড় বসিয়েছিল। হিমাদ্রি অবশ্য খুব স্মার্টলি "আ-আ-আ"-টাকে দম আটকানো কাশিতে রূপান্তরিত করে কাশতে কাশতে চেয়ার থেকে উঠে বেসিনের দিকে ছুটে গেছল।

"কী হল তোর? বেগা বলে বিষম খেলি কেন?" পিসি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন।

"কানু হয়তো বলতে চেয়েছিল, রান্নাবান্নার মতো কাজে কেন ব্যাগার খাটবে তার

থেকে চিনে দোকানের খাবার এনে—তাই তো রে?" সমীরণ ভাইয়ের দিকে তাকায়। মুখে জল দিতে দিতে হিমাদ্রি শুধু বলে, "হুঁউ।"

"রান্না করে খাওয়ানোটাকে ব্যাগার খাটা বলছিস! কী আনন্দ হয় জানিস লোককে খাওয়াতে? টাকা থাকলে আমি রোজ ধরে এনে লোক খাওয়াতাম।"

রেখা গুপ্ত তাঁর সকালের বন্ধুদের অবশ্যই ভূরিভোজন করিয়ে ছিলেন। কালার টিভি এবং স্কুটারও কেনা হয়েছিল। দোতলায় সে বছর আর ঘর তোলা যায়নি। পরের মরসুমেই সারথি সংঘ একলাখ দশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমীকরণকে সই করায়। যুগের যাত্রীর কাছে তখন তার পাওনা ছিল দশ হাজার টাকা। সেটা আর সে পায়নি।

ময়দানের ঘাস এরপর থেকেই সে চিনতে শুরু করে।

॥ ২ ॥

"না, না, আর না, আমার চারখানা খাওয়া হয়ে গেছে।" ভটচায তাঁর প্লেটের ওপর দুই তালু ছড়িয়ে রেখা গুপ্তর লুচি নামাবার পথ বন্ধ করলেন। "হাতিরা নাকি দুটো খায়, এই দত্তবাবুই বললেন।"

"হ্যাঁ দুটোই খায়...মিস গুপ্ত আমায় আর-একটা, আজ সাত চক্কর টোটাল—"

খুক খুক করে মালবিকা কেশে উঠলেন। দত্ত কটমটিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিসেস বসাকের গণনায় কি সাত চক্কর হয়নি?"

"সাত মানে! আট হয়ে নয় হচ্ছিল তখনই তো ভটচাযদা বসতে বললেন।" মালবিকা গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলেন।

"তা হলে বোধ হয় গুনতে ভুল করেছি, ইয়ে, আমায় তা হলে আর-একখানা।" দত্তবাবু বলা শেষ করেই জুড়ে দিলেন, "আর মিসেস বসাককেও।"

"নাকুও ঠিক গুনে আটখানা খায়।" রেখা গুপ্ত তাঁর কাজ শেষ করে বসলেন সরোজ বসাকের পাশের চেয়ারে। "বসাকদা আপনি তো ভটচাযদার মতোই চারটের বেশি নিলেন না!"

"আমরা এক পালকের পাখি তো, ওনার অম্বল আমার মেদ, চারটের বেশি হলেই প্রবলেম দেখা দেবে।"

ভটচায জোরে জোরে মাথা নাড়লেন দক্ষিণ ভারতীয় ঢঙে। আর সেই সময় বাইরে ফটকের কাছ থেকে কে বলল, "এটা কি সমীরণ গুপ্তর বাড়ি?"

"মলা, দ্যাখ তো কে একজন নাকুকে খুঁজছে।" রেখা গুপ্ত চেয়ার থেকে নিজেকে সামান্য তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। "দলবদলের সময় এসে পড়ল আর সেইসঙ্গে সমীরণ, সমীরণ, নাকু, নাকুদা, ভিখিরিদের মতো ফটকের কাছে ডাকাডাকিও শুরু হয়ে গেল। এরপর চলবে হাত-পা ধরে টানাটানি। কী অদ্ভুত যে এই দলবদলের নিয়মকানুন!"

"বাড়িতে কেউ আছেন?"

ফটকের কাছ থেকে উঁচু গলায় ডাক এল।

"ওরে মলা, দ্যাখ না।"

"রেখা, যত ডাকাডাকি আর টানাটানি, ততই তো দরবৃদ্ধি।" মালবিকা চোখ পিটপিট করলেন আড়চোখে তাকিয়ে।

"মিস গুপ্ত, এবার যদি হাত-পা ধরে টানাটানি করে, টেলিফোনটা তুলে আমাকে শুধু একটা খবর দেবেন, তারপর দেখব কার হাত কোথায় কার পা কোথায় থাকে।" দত্তবাবু দুই মুঠো পাকিয়ে সেই দুটি টেবিলে ঠুকলেন। "অনেকদিন অ্যাকশনে নামিনি তো, শরীরটা কেমন যেন মাখন মাখন হয়ে যাচ্ছে।"

শ্যামলা বাইরে থেকে ঘুরে এসে বলল, "দাদাকে খুঁজতে এসেছে যুগের যাত্রী থেকে। বললাম, দাদার তো আজ সকালে হাওড়ায় নামার কথা। বললেন, তিনি জানেন, বাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজ, সেখানে মাদ্রাজ মেলে উঠে আজ সকাল সাতটায় হাওড়া স্টেশনে নামবে। ট্রেন অবশ্যই লেট হবে। সেই সময়টা ধরেই স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে কম করে দশটা বেজে যাবেই।"

"এখন তো আটটাও বাজেনি!" ভটচায বললেন, "তা হলে উনি এত হিসেব কষেও এখন কেন হাজির হয়েছেন?"

"আমিও তাই বললাম। পিসির সঙ্গে দেখা করতে চায় বলল।"

"যুগের যাত্রীর লোক রেখার সঙ্গে দেখা করতে চায়!" মালবিকা চোখ ছানাবড়া-প্রায় করে রেখা গুপ্তর দিকে তাকালেন, "তুমি আবার কবে থেকে ফুটবল খেলতে শুরু করলে?"

"আরে, ফুটবলারের পিসিমাসিরাও দলবদলের আগে ভি আই পি হয়ে যায়।" সরোজ বসাক স্ত্রীকে বোঝাবার জন্য জুড়ে দিলেন, "আমাদের দেশের ফুটবলাররা খুবই পরিবার-অন্ত-প্রাণ তো, তারা দিদি-বউদি, মা-মাসি, ভাই-বোন, এদের মত না নিয়ে দল বদলায় না, সেজন্য প্লেয়ারদের আগে এদেরই ধরাধরি করা হয়।"

সরোজের কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই দরজার কাছ থেকে মিহিস্বর ভেসে এল, "আমি কি ভেতরে আসতে পারি?" বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ভেতরে ঢুকে এলেন।

নাতিউচ্চ মাঝারি গড়ন, ঈষৎ ক'টা চোখ, গায়ের রং এককালে গৌরবর্ণ ছিল, এখন তামাটে, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির মধ্যে, পাতাকাটা কাঁচাপাকা চুল, বিস্কুট রঙের ট্রাউজার্স ও একরঙা নীল বুশ শার্ট, পাম্পশুটা অন্তত চারশো টাকা দামের। "না বলেই প্রায় ঢুকলাম।" হাতজোড় করে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "আমার নাম ঘুনু মিত্তির, বিখ্যাত লোক নই যে, নামটা শোনা থাকবে। যুগের যাত্রীকে ভালবাসি, ওদের কমিটিতেও আছি, আর প্লেয়ারদের সঙ্গে দুঃখেসুখে একাকার হয়ে গেছি। ওরা মুশকিলে পড়লে আমি সাহায্য করি, আমি অসুবিধায় পড়লে ওরা আমায় দেখে। এইমাত্র শুনলাম, কে যেন বলছিলেন ছেলেরা দলবদলের আগে মা-মাসি দিদি-বউদিদের মত নেয়! কথাটা ওয়ান-ফোর্থ সত্যি। বাকিটা খবরের কাগজের বানানো। ওরা কি দুগ্ধপোষ্য শিশু যে, এখনও মা-মাসির কথামতো চলবে? কেউ কেউ চলে, কারণ তাদের মা কি বউ টাকাকড়ির ব্যাপারটা তাদের থেকেও ভাল

বোঝে। আমি কি বসতে পারি?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, বসুন।" রেখা গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন। ডাইনিং টেবিলে খালি চেয়ার আর নেই। তাই দেখে বেগারদের অন্য চারজনও চেয়ার থেকে উঠে পড়ল।

"আরে আপনারা বসুন বসুন। মা, একটা টুল কি মোড়া থাকলে এনে দাও তো।" ঘুনু মিত্তির বললেন শ্যামলাকে।

প্রায় ছুটে গিয়ে শ্যামলা পিসির ঘর থেকে মোড়া আনল।

"নাকুর বাড়ি তো আমারও বাড়ি। এখানে আমি মেঝেতেও বসতে পারি।" এই বলে ঘুনু অবশ্য মোড়াটাতেই বসলেন। "মনে হচ্ছে কারুরই চা বোধ হয় এখনও খাওয়া হয়নি।"

"না, এইবার চা হবে। আপনাকেও—" রেখা গুপ্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

"চিনি ছাড়া, আমার ব্লাড সুগার একটু বেশির দিকেই।"

"কত এখন?" ভটচায দমবন্ধ অবস্থায় জানতে চাইলেন।

"দুশো একানব্বই।" ঘুনু খুব সহজ স্বরে বললেন। "ওষুধপত্তর খাই না। ডাক্তার বলেছে স্ট্রেস আর টেনশন থেকে শুধু দূরে থাকবেন, আমি তাই থাকারই চেষ্টা করি।"

রেখা গুপ্ত ইশারায় শ্যামলাকে ডেকে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। সমীরণের কাছে তিনি ঘুনু মিত্তির সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন। তাই মনে মনে হুঁশিয়ার হয়েও কিঞ্চিৎ সিঁটিয়ে রইলেন।

"যুগের যাত্রীতে কেউ কি টেনশন ছাড়া থাকতে পারে? শুনেছি ক্লাবের কুকুরগুলো পর্যন্ত নাকি ক্লাবের খেলা থাকলে টেনশন সইতে না পেরে বাবুঘাটে চলে যায়!" ভটচায কিন্তু কিন্তু করে বলে ফেললেন।

"কার কাছে শুনেছেন?"

"আমার শালার ছেলে যাত্রীর মেম্বার, সে বলেছে।"

"বাজে কথা, একদমই বাজে কথা। টেনশন একটু হয় ছোট ক্লাবের সঙ্গে খেলা থাকলে। তা সেজন্য তো আমি আছি। ওদের গোলকিপার আর একটা স্টপার কি একটা ব্যাককে ম্যানেজ করে ফেলি, সেটা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়।"

"নাকুকে কিন্তু পারেননি। লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সে চার বছর যাত্রীর এগেনস্টে খেলেছে, রোভার্স, ডুরান্ড, ফেডারেশন, লিগ, শিল্ড সব মিলিয়ে সাতটা গোল দিয়েছে, তিনটে ডিসঅ্যালাউড হয়েছে। গত দশ বছরে কে পেরেছে...সোজা কথা, দশবার যাত্রীর জালে বল!" ভটচায উত্তেজনা দমন করতে করতে মুখ লাল করে ফেললেন। "কিন্তু আমাদের নাকুকে ম্যানেজ করতে পারেননি।"

"জীবনে আমার এই একটাই ফেলিওর। দশ হাজার টাকা ক্লাব ওকে দেয়নি, সেই রাগটা দ্বিগুণ বিক্রমে ওকে খেলিয়ে দেয় যাত্রীর এগেনস্টে। তবে এবার তো একেবারেই নতুন কমিটি, নাকুকে টাকা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ওর দশ হাজার পাওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দেব।"

পাঁচ কাপ চায়ের ট্রে নিয়ে শ্যামলা প্রথমেই ঘুনুর সামনে ধরে বলল, "ডান দিকে কর্নার ফ্ল্যাগের কাছেরটা চিনি ছাড়া।"

ঘুনু হাসিমুখে কাপটা তুলে নিয়ে বললেন, "ফুটবলারের বাড়ি তো, কথাবার্তাও সেরকম! আপনার বাড়িতে আজই প্রথম এলাম। বেশ বাড়িটা করেছেন।" রেখা গুপ্তর উদ্দেশে কথাগুলো বলে, ঘুনু ঘরটায় চোখ বুলিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন।

"বাড়ি আমার নয়, দাদার।"

"ওই হল। জায়গাটা ভাল, বেশ নিরিবিলি, খোলামেলা। দোতলায় ক'খানা ঘর?"

"একখানা।"

"কেন! আরও দু'খানা করতে পারেন, জায়গা তো রয়েছে! ক'তলার ভিত, তিনতলার নিশ্চয়।"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আরও দুটো ঘর তুলে ফেলুন।"

"সেজন্য টাকা লাগে।" রেখা গুপ্ত সন্তর্পণে কথাটা বলে ভাবতে শুরু করলেন, লোকটা শেষপর্যন্ত কোথায় আলোচনাটাকে নিয়ে যাবে।

"টাকার জন্য আপনার ভাবনা! ওসব নিয়ে কিছু ভাববেন না, আমি করে দেব।"

"আপনি করে দেবেন মানে!" রেখা গুপ্তর আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা হল। "আপনি কেন করে দেবেন?"

"কত লাগবে দুটো ঘর করতে? হাজার তিরিশ? সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যাত্রীতে নতুন যে কমিটি এবার এসেছে, টাকার ব্যাপারে কোনওরকম কেপ্পুনি তারা করবে না। দু'লাখ দেব বললে দু'লাখই দেবে, দেড় লাখ অ্যাডভান্স। চাইলে গুঁড়োও দেবে।"

"গুঁড়ো কী জিনিস?" জি. সি. দত্ত কৌতূহলী হলেন।

"সব টাকা তো আর কাগজেকলমে থাকে না, পঁচিশ-তিরিশ হাজার এধার-সেধার করে দেওয়া হয়। ওটা হিসাব ছাড়াই, লিখিত চুক্তির বাইরে। ওটাকেই গুঁড়ো বলি।"

"ধরুন, একটা প্লেয়ার অ্যাডভান্স নিল, গুঁড়োও নিল, তারপর অন্য ক্লাবে সই করে বসল—।"

সরোজ বসাকের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘুনু কথাটা ছোঁ মেরে তুলে নিল। "ঠিক এই ব্যাপারই তো গত বছর দুলাল চক্রবর্তী করল। সওয়া লাখ অ্যাডভান্স আর কুড়ি হাজার গুঁড়ো নিয়ে বলল যাত্রী ছাড়া আর কোনও ক্লাবে মরে গেলেও খেলবে না। ব্লেড দিয়ে হাতে আঁচড় কেটে রক্ত বের করে বলল, "দেখুন, এর প্রত্যেক কণিকায় যুগের যাত্রীর নাম লেখা রয়েছে।"

"অ্যাঁ! রক্তে নাম লেখা?" মালবিকা চমৎকৃত হয়ে বললেন, "তাও কখনও হয় নাকি!"

"হয়। কলকাতার ফুটবলাররা ক্লাবের প্রতি এতই অনুগত, ক্লাবের ভালমন্দ, মানমর্যাদা নিয়ে এতই ভাবিত যে, ওদের রক্তে ক্লাব মিশে যায়, ওদের নিশ্বাসেও ক্লাবের নাম বেরিয়ে আসে।"

"কী জানি বাবা, আমি তো সায়েন্স পড়েছি, বটানিতে বি.এসসি, এমন কথা তো কখনও চোখে পড়েনি।" মালবিকা মিনমিন করে দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললেন।

"আপনার চোখ নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু আমাদের ফুটবলারদের শরীরে বিশেষ এক

ধরনের রক্তে বয়, সেটা ভাল চোখে দেখা যায় না।" ঘুনু মিত্তির এমনভাবে হাসলেন যার সাত-আটরকম অর্থ হয়। "এই বছর যে প্লেয়ারের রক্তে যুগের যাত্রীর নাম, পরের বছর তারই রক্তে পাবেন সারথি সংঘের নাম, তার পরের বছর হয়তো লেখা থাকবে জুপিটারের নাম।"

"খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার তো!" জি.সি. দত্তর ঘাবড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হল। "এদের আসল রক্ত, মানে বাপ-মা'র কাছ থেকে পাওয়া রক্তটা তো দেখছি আর নেইই। এদের রক্ত যদি ক্লাব-রক্ত হয় তা হলে মানুষের শরীরে দিলে তারা তো মারা যাবে!"

"যেতে পারে। ফুটবলার জানলে ব্লাড ব্যাঙ্ক হয়তো ভবিষ্যতে এদের রক্ত নেবে না। অবশ্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এরা কখনও ব্লাড ডোনেট করে না।" ঘুনু মিত্তির সহজ স্বরে কথাটা বলেই পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরলেন। "হ্যাঁ, গুঁড়োর কথা হচ্ছিল। দুলাল অ্যাডভান্স আর গুঁড়ো নিয়ে সই করার দু'দিন আগে সারথি-র বটা বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে ফোন করে আমায় বলল, বটার ছেলেরা ওকে রাস্তা থেকে ধরে, পিস্তল দেখিয়েই অবশ্য, গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে।"

"আপনারা পুলিশের হেল্‌প নিলেন তো?" ভটচায বলতে বলতে আড়চোখে জি.সি. দত্তর দিকে তাকালেন।

"মাথা খারাপ! পুলিশের কাছে গিয়ে কী হবে? দুলাল তো নিজেই ট্যাক্সি করে বটার ডেরায় গিয়ে উঠেছে। খবর আমি দশ মিনিটের মধ্যেই পেয়ে গেছলাম। আমাদের থেকে পঁচিশ হাজার বেশি দেবে বলাতেই দুলাল টোপ খেয়ে নিল।"

"কিন্তু রক্তে যে যাত্রীর নাম লেখা!" মালবিকা আঁতকে উঠে বললেন। ঘুনু তাতে কান না দিয়ে বলে চললেন, "আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কত বেশি দেবে বলেছে? বলল, পঁচিশ হাজার। আমি বললাম, আরও তিরিশ হাজার দেব, চলে আয়। বলল, যাব কী করে, দরজার বাইরে, রাস্তায় ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে। তখন ফোন রেখে আমি দৌড়লাম দুলালের বাড়ি। ওর বউ মধুছন্দাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, তোমার স্বামী তিরিশ হাজার টাকা হারাবে যদি সারথিতে সই করে। তুমি ওকে সারথির ডেরা থেকে এখুনিই উদ্ধার করে আনো।"

"তারপর মধুছন্দা উদ্ধার করে আনল?" ভটচায চেয়ারের কিনারে টানটান হয়ে বসলেন। ঘরের সবাই উদ্‌গ্রীব।

"মধুছন্দা তখন আট মাসের ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আমায় বলল, চলুন তো, কোথায় ও রয়েছে সেখানে আমায় নিয়ে চলুন। তিরিশ হাজার টাকা ফ্যালনা নাকি! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দেওয়া! পা দিয়ে ফুটবল খেলে বলে কি লক্ষ্মীকেও খেলবে?" ঘুনু অবিকল মধুছন্দার কণ্ঠস্বরে কথাগুলো বললেন।

"আপনি ওকে নিয়ে গেলেন তো?" উৎকণ্ঠিত মালবিকা জানতে চাইলেন।

"অবশ্যই। নিয়ে যাওয়ার জন্যই তো গেছি। ট্যাক্সি করে বটা বিশ্বাসের বেহালার ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে ছেলেকোলে মধুছন্দাকে নামিয়ে দিয়ে বললাম, তিনতলায় ডান

দিকে, আমি ট্যাক্সি নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছি, দুলালকে একেবারে সঙ্গে করে আনা চাই। মনে রেখো তা না হলে তিরিশ হাজার হারাবে।" ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়েও থমকে গেল মধুছন্দা, বলল, "হারাব আমি? তিরিশটা পঁয়ত্রিশ করুন।"

"কী মেয়ে ভাবুন তো! দরাদরি শুরু করল কিনা এই সময়ে, ট্যাক্সি থেকে এক পা রাস্তায় রেখে।"

"আপনি কী বললেন, পঁয়ত্রিশ দেবেন?" জি.সি দত্ত যে মনে মনে হিমশিম হয়ে পড়েছেন সেটা তাঁর ঢোঁক গেলা থেকে বোঝা গেল।

"তা ছাড়া তখন আর উপায় কী। বললাম, পঁয়ত্রিশ দেব যদি দুলালকে এখনিই বের করে আনতে পারো।"

"কিন্তু বাইরে যে ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে?" সরোজ মনে করিয়ে দিলেন।

"কোথায় ছেলেরা!" ঘুনু মিত্তির পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করলেন। "ছেলে ফেলে পাহারা দিচ্ছে, ওসব দুলালের বাজে কথা। যাই হোক, আমি তো ট্যাক্সিতে বসে রইলাম। দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, আধঘণ্টা কেটে গেল। বাড়ি থেকে ওরা কেউ আর বেরোয় না! ভাবলাম হলটা কী! মধুছন্দাকেও আটকে রাখল নাকি?" ডিবে থেকে একটিপ নস্যি বের করে ঘুনু নাকের কাছে এনে থমকে গেলেন। "তারপর দেখি ছেলেকে কাঁখে নিয়ে মধুছন্দা বেরিয়ে আসছে, একমুখ হাসি, সঙ্গে দুলালও।" নস্যিটা ঘুনু নাকে গুঁজে হাত ঝাড়লেন।

"সাকসেসফুল! অ্যাঁ, মধুছন্দা তা হলে পারল!" ভচটায় প্রায় হাততালি দিয়ে ফেলেছিলেন যদি না তখন মালবিকা 'হ্যাঁচ্চো' করে উঠতেন।

"ওহ্‌হ্, আই অ্যাম সরি।" ঘুনু কাঁচুমাচু হলেন।

"নস্যি একটা খুব বাজে নেশা।" এতক্ষণে রেখা গুপ্ত মুখ খুললেন। ঘুনু মিত্তিরকে এই প্রথম কোণঠাসার মতো দেখাল। শুধু নস্যির গুঁড়ো ছড়িয়ে একজন মহিলাকে হাঁচিয়ে দেওয়ার জন্যই নয়, রেখা গুপ্তর বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হওয়াটাই তাঁকে কিছুটা ঘাবড়ে দিল। আসলে তিনি এসেছেন তো নাকুর পিসিকে তুষ্ট করতে। ঘুনু খবর নিয়ে জেনেছেন; সমীরণ গুপ্তকে তুলতে হলে জালটা ফেলতে হবে তার পিসির ওপর। পিসি হ্যাঁ বললে ভাইপো কখনও না বলবে না।

"নস্যি আমি এখনিই ছেড়ে দেব। ঠিক বলেছেন, খুব বাজে নেশা।" ঘুনু ডিবেটা বাড়িয়ে দিল শ্যামলার দিকে, "মা, তুমি এটা এখুনি বাইরে ফেলে দাও তো।"

সারা ঘরে থতমত অবস্থা। চারজন বেগার সমস্বরে "না না না" বলে উঠলেন। শ্যামলা নিজের হাত টেনে নিল। রেখা গুপ্ত রীতিমতো অপ্রস্তুত।

"না কেন? আমি এখনই...ওঁর সম্মান, ওঁর কথা, ওঁর নির্দেশ আমি এখনই রক্ষা করব।" ঘুনু উত্তেজিত হয়ে মোড়া থেকে উঠে জানলার কাছে গেলেন। ডিবেটা কপালে ঠেকিয়ে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরে ছুড়ে বলে উঠলেন, "হতভাগা নস্যি, দূর হ। জীবনে আর তোকে নাকে ঢোকাব না।"

"আমি তো আর ফেলে দিতে বলিনি।" রেখা গুপ্তর গলায় অনুশোচনার মতো ক্ষীণ সুর। ঘুনুর কানে সেটা ধরা পড়ল। একটা নস্যির ডিবে, ক'টাই বা টাকা! কিন্তু

চার ভাগের তিনভাগ কাজ তো এগিয়ে রইল।

"হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম?" ঘুনু যেন সদ্য ঘুম থেকে উঠলেন এমনভাবে তাকালেন।

"মধুছন্দা বেরিয়ে আসছে বটা বিশ্বাসের ফ্ল্যাট থেকে, সঙ্গে দুলাল আর কোলে বাচ্চা।" ভটচায সঙ্গে সঙ্গে সূত্র ধরিয়ে দিলেন।

"হ্যাঁ, ওরা বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠল। ট্যাক্সি ওদের বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল। মধুছন্দা তখন খুশিতে ডগমগ হয়ে কী বলল জানেন?" ঘুনু চোখ বিস্ফারিত করে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"বটা বিশ্বাসের কবজা থেকে দুলালকে বের করে এনেছি।" সরোজ বললেন।

"সারথির টাকার ফাঁস খুলে দুলালকে বাঁচিয়ে দিলাম।" জি.সি. দত্তর অনুমান।

"পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বেশি দেবেন বলেছেন, মনে থাকে যেন।" মালবিকা নিশ্চিত স্বরে আন্দাজ করলেন।

ভটচায মাথা নেড়ে জানালেন তিনি কিছু বলতে চান না।

"মধুছন্দার গলায় একটা সোনার হার ঝুলছে যেটা আগে দেখিনি। সেইটা হাতে করে তুলে আমায় বলল, 'বটাদা এত ভাল, এত সুন্দর মানুষ, দেখুন হারটা, প্রায় দু'ভরি তো হবেই। জানেন, বউদিকে উনি বললেন, তোমার বোন আজ প্রথমবার এসেছে, ওকে একটা উপহার তো দেবে। তারপর নিজেই বউদির গলা থেকে হারটা খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, সুন্দর মেয়ের গলাতেই এই হার মানায়। উহ্, বটাদা যে কী ভাল! না না, দুলাল সারথিতেই থাকবে, বাড়তি পঁয়ত্রিশ হাজারে আমাদের দরকার নেই। বুঝলেন এবার?" ঘুনু সবার মুখের দিকে না তাকিয়ে এবার জানলার বাইরে দৃষ্টি পাঠালেন।

খুক খুক করে প্রথমে হেসে উঠল শ্যামলা। তারপর ঘুনু বাদে অন্যরা।

"কিন্তু দুলাল যে অ্যাডভান্স আর গুঁড়ো নিয়েছিল, তার কী হল?" জি সি দত্ত মনে করিয়ে দিলেন।

"ট্যাক্সি থেকে নেমে মধুছন্দা বাচ্চা কোলে বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার পর দুলাল আমার হাত ধরে বলল, ঘুনুদা পারিবারিক অশান্তির মধ্যে আর যাব না। অ্যাডভান্সের টাকা আমি ফিরিয়ে দেব তবে গুঁড়োটা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু ভেবো না যে মেরে দেব। সামনের বছর যাত্রীতেই আবার ফিরে আসব, তখন অ্যাডজাস্ট করে নিয়ো।"

"অ্যাঁ, সারথিতে সইসাবুদ করার আগেই বলে দিল পরের বছর দল পালটাবে! এ কী রে বাবা!" সরোজকে হতভম্ব দেখাচ্ছে।

"কলকাতায় হাতে গোনা যে-ক'জন ফুটবল খেলতে পারে, দুলাল তাদের একজন। গত এগারো বছরে সাতবার সারথি আর যাত্রী করেছে। বয়স হয়ে গেছে, সত্তর মিনিটের ম্যাচ আগের মতো আর খেলতে পারে না। না পারলেও এক্সিপিরিয়েন্সের তো দাম আছে। সেটাও অনেকখানি কাজ দেয়। বহুবার ইন্ডিয়া টিমে খেলেছে, নাম আছে, সাপোর্টাররাও নামী প্লেয়ার চায়।" ঘুনু মিত্তির এর বেশি আর কিছু বললেন না।

"তা হলে এ-বছর দুলাল চক্রবর্তী যাত্রীতে আসছে।" মালবিকা জানতে চাইলেন না, ঘোষণা করলেন। ঘুনু স্মিত হেসে মাথা কাত করলেন।

"তা আপনি এই সাতসকালে নাকুর খোঁজে এখানে এসেছেন, কী ব্যাপার?" রেখা গুপ্ত গম্ভীর গলায় সোজা প্রশ্ন রাখলেন।

"বুঝতেই তো পারছেন। যাত্রীতে নাকু এই বছর খেলবে এই প্রার্থনা নিয়েই আপনার কাছে আসা।" ঘুনু প্রার্থনা বোঝাতে হাতজোড় করলেন।

"ইয়ে," জি সি দত্ত হাতঘড়ি দেখে খবরের কাগজ হাতে উঠে দাঁড়ালেন। "নাতিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসার টাইম হল।"

বাকি তিনজনও উঠলেন। টাকাকড়ি, দলবদল-সংক্রান্ত আলোচনায় বাইরের লোকেদের থাকা উচিত নয়। অবশ্য ওঁরা জানেন, যা কিছু কথাবার্তা হবে সবই কাল সকালে জেনে যাবেন।

ভেতরের ঘরে ফোন বেজে উঠল। শ্যামলা ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল।

"কে, মলা?"

"দাদা! কোত্থেকে ফোন করছিস?"

"হাওড়া স্টেশন থেকে, ট্রেন বেশি লেট করেনি। পিসি কী করছে?"

"ঘুনু মিত্তির নামে একটা লোক এসেছে তোমায় খুঁজতে, ডাইনিংয়ে বসে আছে।..."

"কী সব্বোনাশ, বাড়িতে এসে গেছে! বাঙ্গালোরেও এসেছিল যাত্রীর একজন, মহাদেব সামুই...কার সঙ্গে কথা বলছে?"

"পিসির সঙ্গে এবার কথা শুরু করবে। বেগাররা এতক্ষণ ছিল তাই..."

"শিগ্গিরি পিসিকে ডাক আমি কথা বলব, কায়দা করে ডাকিস ঘুনুদা যেন বুঝতে না পারে।"

শ্যামলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "পিসি ফোন, তোমার এক ছাত্রীর মা কথা বলবেন।"

রেখা গুপ্ত তাড়াতাড়ি এসে ফোন ধরলেন, "হ্যালো, আপনি..."

"পিসি আমি নাকু, লোকটা কেন এসেছে?"

"বোধ হয় তোকে ওদের ক্লাবে খেলতে বলবে।"

"তুমি কিচ্ছু কমিট করবে না, বলবে যা বলার নাকুকেই বলুন।"

"তাই বলব। তোর ভাত তা হলে রাখব তো?"

"না, রাখার দরকার নেই। এখন আমি বাড়িমুখোই হব না। দুপুরে কোথাও খেয়ে নেব, রাতে ফিরব। এখন একবার দুলালদার মানে দুলাল চক্রবর্তীর অফিসে যাব। ঘুনুদা আশপাশে কোথাও নির্ঘাত ঘাপটি মেরে থাকবে। সন্ধে পর্যন্ত আমি বাড়ির দিক মাড়াব না।"

"তা হলে ওকে এখন কী বলব?"

"বললাম তো, নাকুর সঙ্গে কথা বলবেন, নাকুর ফুটবলের ব্যাপারে আমি নাক গলাই না, ব্যস। এখন রাখলাম।"

রেখা গুপ্ত চিন্তিত মুখে রিসিভার রাখলেন। সেই মুখ নিয়েই এসে বসলেন ঘুনু মিত্তিরের সামনে।

"কোনও দুঃসংবাদ?"

"হ্যাঁ। আমার এক ছাত্রীকে কারা যেন কিডন্যাপ করার চেষ্টা করছে। ওর মা ভয় পেয়ে মেয়েকে আমার কাছে কিছুদিন রাখতে চাইছে।" রেখা গুপ্ত খুবই অস্বস্তিভরে বললেন। মিথ্যা কথা অম্লানবদনে তিনি বলতে পারেন না।

"কী ভয়ঙ্কর কথা! পুলিশে খবর দিয়েছে? ছাত্রীর বয়স কত? নিশ্চয় খুব বড়লোক।" উত্তেজিত ঘুনু মোড়া থেকে নিজেকে বিঘতখানেক তুলে আবার নামিয়ে রাখলেন।

"দিয়েছে। কিন্তু পুলিশ কী করতে পারে? তারা বলেছে মেয়েকে এখন বাড়ি থেকে বের করবেন না। আট বছর বয়স, সারাদিন বাড়িতে বন্দি থেকে বেচারার কী কষ্ট হচ্ছে ভাবুন তো? ওকে বরং আমার এখানেই নিয়ে আসি।"

"কিন্তু এখান থেকেও তো কিডন্যাপ হতে পারে।" ঘুনু বিপদ সম্পর্কে হুঁশ করিয়ে দিলেন।

"আমার এখান থেকে!" রেখা গুপ্ত যেন স্তম্ভিত হলেন ঘুনু মিত্তিরের অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে। "আমি রয়েছি, মলা রয়েছে, এই ওঁরা এতক্ষণ যাঁরা এখানে ছিলেন, পেছনের নেতাজিনগর আর শহিদ কলোনির লোকেরা—কিডন্যাপওলাদের সাহস হবে? বরং ওদের ধরে আমিই কিডন্যাপ করে রেখে দেব।"

"কিন্তু তাদের পাবেন কী করে? তারা তো মোটরে করে আসবে, মেয়েটার মুখ বেঁধে গাড়িতে তুলেই বোঁওও করে...দেখেন না টিভি সিরিয়ালে কীভাবে বাচ্চাদের ধরে?"

"দেখেছি। ওইভাবে ধরতে আসুক না। তা হলে আমিও এইভাবে..." রেখা গুপ্ত হঠাৎ ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ঘুনু মিত্তিরের বুশ শার্টের কলার ধরে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুনুও উঠলেন। "কিডন্যাপ করতে আসা?...অ্যাঁ কিডন্যাপ? দেখাচ্ছি মজা।" কলার ধরে পাকা জাম পাড়ার মতো ঘুনুকে ঝাঁকি দিয়ে আবার বললেন, "কিডন্যাপ করে টাকা কামাবে ভেবেছ?"

"আ-আমি কিডন্যাপার নই, উঁহুহু লাগছে, ছাড়ুন ছাড়ুন।" ঘুনুর মুখে রক্ত জমে লাল, চোখ দুটি গর্ত থেকে প্রায় এক মিলিমিটার বেরিয়ে এসেছে।

রেখা গুপ্ত লজ্জিত হয়ে কলার ছেড়ে দিলেন। "একসাইটেড হয়ে...ছি ছি, আমায় মাফ করবেন।" হাত জোড় করলেন তিনি।

"উফ্‌ফ্‌ কী গায়ের জোর!" বিড়বিড় করলেন ঘুনু মিত্তির। শ্যামলা চুপচাপ ব্যাপারটা দেখছিল। নম্রস্বরে বলল, "বরফ আনব? গলায় ঘষলে ব্যথা আর থাকবে না।"

"না না, বরফ টরফ দরকার নেই, আমার কিছু হয়নি।"

"পিসি একটু রাগি, নইলে মানুষটা খুবই নরম।" শ্যামলা ঢোক গিলল কটমট তাকিয়ে থাকা পিসির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে।

"সত্যিই আমার মনটা খারাপ লাগছে। আমার এখন মুন্নির কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে, মলা যাবি আমার সঙ্গে?" বলেই রেখা গুপ্ত ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। "হ্যাঁ, বলছিলেন কী যেন দরকার আছে আমার সঙ্গে? তাড়াতাড়ি বলুন।"

ঘুনু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন পিসির এলোমেলো কথা আর আচরণে। নিজেকে ধাতস্থ করতে করতে বললেন, "নাকু এ বছর যাত্রীতে আসুক...ওর পুরনো যা পাওনা সবই পেয়ে যাবে আর সারথিতে যা পাচ্ছে তার থেকে...আপনি জানেন তো নাকুকে আমিই দর্জিপাড়া থেকে যাত্রীতে এনেছিলাম ষাট হাজার টাকায়? আজ আবার আমি এসেছি এক লাখ ষাট হাজার দর নিয়ে।"

"তা আমার কাছে কেন? নাকুর আর ফুটবলের ব্যাপার এটা, আমি এর মধ্যে নাক গলাতে চাই না।" রেখা গুপ্ত মৃদু শান্ত স্বরে বললেন।

"আপনি যে নাকুর কতখানি তা কি আমি জানি না? রোজগারের এটাই বয়স। টপ ফর্মে থাকার সময় কিছু কামিয়ে নেওয়া। এবার আমরা খুব ভাল টিম করব, ওর মতো একটা স্ট্রাইকারের যা দাম তা আমরা নিশ্চয়ই দেব। সারথিতে পাচ্ছে তো এক-তিরিশ, আমরা এক-ষাট দেব।" ঘুনু ধীরে মেপে মেপে কথাগুলো বলার সময় রেখা গুপ্তর মুখভাব লক্ষ করছিলেন। কিন্তু কোনও ভাবান্তর দেখতে না পেয়ে অস্বস্তিতে পড়লেন।

"আপনি এসব কথা নাকুকেই বলবেন। আমি চাকরি করি, দাদা চাকরি করেন, নাকু তো করেই, আমাদের এতেই মোটামুটি চলে যায়।" রেখা গুপ্ত আরও মৃদু স্বরে বললেন।

"না, না, টাকার লোভ আপনাদের দেখাব, এত ধৃষ্টতা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নাকু এখন বড় প্লেয়ার। ইন্ডিয়া ক্যাম্পে রয়েছে, ক্যাপ্টেন হবে বলেই শুনেছি। দেশের ক্যাপ্টেন হওয়া তো বিরাট মর্যাদা। আমাদের ক্লাবও সেই মর্যাদার কিছুটা পাবে যদি নাকু যাত্রীতে আসে।" ঘুনুর অস্বস্তি আরও বাড়ল কারণ রেখা গুপ্তর মুখভাব এখনও ধ্যানী বুদ্ধের মতোই রয়ে গেছে।

"পিসি, মুন্নিদের বাড়ি যাবে না?" শ্যামলা মনে করিয়ে দিল।

"ওহ্ হ্যাঁ, স্নানটা করেই..." রেখা গুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে আলোচনায় ইতি টেনে দিয়ে বললেন, "যা বলার নাকুকেই বলবেন। আমায় বলে কোনও লাভ নেই।"

ঘুনু মিত্তির চলে যাওয়ার পরই পিসি আর ভাইঝির খুকখুক হাসি হোহো-তে রূপান্তরিত হল।

॥ ৩ ॥

দুলাল চক্রবর্তী চাকরি করে ব্যাঙ্ক অব বেনারসের চৌরঙ্গি শাখায়। হাওড়া স্টেশন থেকে সমীরণ ট্যাক্সিতে যখন ব্যাঙ্কের সামনে নামল তখন বেলা প্রায় এগারোটা। সঙ্গে একটা সুটকেস। কয়েকবার সে এই ব্যাঙ্কে দুলালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, অনেকের সঙ্গেই তার চেনা। এখানে সারথি এবং যাত্রী দুই ক্লাবেরই কিছু সমর্থক

কাজ করে। কাউন্টারের বাইরে সমীরণকে দেখেই অল্পবয়সি একজন টেবিলের কাজ ফেলে উঠে এল।

"সমীরণদা, বাঙ্গালোর থেকে কবে ফিরলেন?"

"এইমাত্র। হাওড়ায় নেমেই সোজা এখানে।" সমীরণ সুটকেসটা দেখাল। "অরুণ, দুলালদা কোথায়?"

"এই তো মিনিট কুড়ি আগে সারথির নির্মাল্য রায় এসে ওঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সামনেই তো ক্লাবের ইলেকশন, হয়তো ভোট ক্যানভাসিংয়ের জন্য গেছে। আপনাকেও যদি পায় তো কাজে নামিয়ে দেবে।" অরুণ গলা নামিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল।

"পাবে না। এসব কাজ যে আমি করি না সেটা সবাই জানে।"

"কারা জিতবে মনে হয়? বটা বিশ্বাসরা তো খুব তোড়জোড় করেই নেমেছে।"

"বটাই জিতুক কি নির্মাল্যই জিতুক, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার কাজ যেটা, আমি শুধু সেটাই করি।" সমীরণ হাসল। তার কাজটা যে কী সেটা আর বলার দরকার হল না।

"দুলালদার কাছে শুনেছি কেরল থেকে বিনু জন-কে আনার জন্য লোক গেছিল। গোয়ার আলবুকার্কের সঙ্গেও নাকি কথাবার্তা চলছে। দু'জনেই তো স্ট্রাইকার। ওরা এলে তো আপনার..." অরুণের মুখে বিপন্নতার মতো একটা ভাব ফুটে উঠল। যেন সমীরণ নয়, সে নিজেই মুশকিলে পড়বে, এই দু'জন সারথিতে এলে।

সমীরণের কপালে একটা ভাঁজ উঠেই মিলিয়ে গেল। কথাটা সে দিনদশেক আগে বাঙ্গালোরেই শুনেছে কেরলের নুর মহম্মদের কাছে। বিনু জনের বাবার কাছে সারথি থেকে একজন গেছল। সে নাকি বলেছে সমীরণের সঙ্গে ক্লাব অফিসিয়ালদের সম্পর্ক ভাল নয়, তাই সারথি ওকে ছেড়ে দেবে যদি বিনু খেলতে রাজি হয়। সেদিন শুনে সমীরণ মনে মনে হেসে কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল।

তার সঙ্গে অফিসিয়ালদের সম্পর্ক খারাপ, এমন একটা কথা ক্লাবে বছর দুই ধরে চাউর হয়েছে। ক্লাবের দুটো গোষ্ঠীর কোনওটির সঙ্গেই তার মাখামাখি নেই, সে কোনও কর্তার অনুগ্রহে খেলছে না, নিজস্ব কোনও চক্র সে তৈরি করেনি। এই তিনটিই তার বিরুদ্ধে কাজ করছে। সবার সঙ্গে সদ্‌ভাব রেখে যে চলবে কলকাতার তারকা ফুটবল সমাজে সে সন্দেহজনক লোক বলে চিহ্নিত হবে। সমীরণেরও তাই হয়েছে। শত্রু নেই এ কেমন লোক! সুতরাং এ বিপজ্জনক, একে ভাগাও।

সমীরণকে ভাগাবার চেষ্টা গত বছরই হয়েছিল পঞ্জাব থেকে কার্নাইল সিং আর আলিগড় থেকে ইরানি ছাত্র রফসঞ্জানিকে এনে। দু'জনে মোট চারটে ম্যাচ খেলে কলকাতা থেকে বিদায় নিয়ে আর আসেনি। রটনা হয়েছিল, সমীরণ এবং আর কয়েকজন প্লেয়ার 'ক্লিক' করে ওই দু'জনকে খেলার সময় বল না দিয়ে বা ধরা যায় না এমন পাশ দিয়ে হাজার হাজার সমর্থকের সামনে অপদস্থ করেছে। আরও কী, বন্ধু খবরের কাগজের রিপোর্টারদের দিয়ে নাকি ওদের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো মন্তব্যও লিখিয়েছিল। এই সবই নাকি সমীরণের মস্তিষ্কপ্রসূত!

সমীরণ জানে, সব রটনাই বটা বিশ্বাসের 'কোটারি' থেকে বেরিয়েছে। রটনাকে সে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। মাথার মধ্যে গেঁথে থাকা একটা কথাকেই শুধু সে সারসত্য বলে মেনে রেখেছে: এত টাকা যখন নিচ্ছ, সেইমতন খেলাটাও দিয়ো। সারথির সাপোর্টাররা স্বচক্ষেই মাঠে দেখেছে সমীরণের খেলায় আন্তরিকতা। সে জানে ওরাই তার রক্ষাকবচ।

কিন্তু এই জানাটাই তো এখনকার কলকাতার ফুটবলে শেষ কথা নয়। বড় ক্লাবে ক্ষমতা দখল আর প্রতিপত্তি বিস্তারের লড়াই অবিরাম চলেছে। কর্তাদের এক একজনের তাঁবে থাকে দু-চারজন অনভিজ্ঞ, চলনসই, নবাগত ফুটবলার আর ফর্ম ঝরে যাওয়া, বয়স্ক, নামী ফুটবলার। উভয়েই কর্তাদের দলাদলিতে দাবার বোড়ে হয়ে তাদের নির্দেশমতো মাঠে খেলে, পয়েন্ট খুইয়ে কোনও কর্তাকে বিপদে ফেলে দেয়, কোনও প্লেয়ারকে খেলার মধ্যেই অপ্রতিভ করিয়ে তাকে বসিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে, চোট আঘাতের অজুহাতে শক্ত ম্যাচগুলোয় না খেলে ক্লাবকে জব্দ করে। বিনিময়ে পায় অনুগ্রহ, আরও এক বছর ক্লাবে থাকার ছাড়পত্র অর্থাৎ টাকা বাড়িয়ে নতুন চুক্তি। সমীরণ এইসব নীচতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। সে শুধু নিজের খেলাকে আরও ওপরে তোলার চেষ্টা করে গেছে। সব কর্তারাই জানে সমীরণকে দরকার, কিন্তু একটা গোষ্ঠী তলায় তলায় চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে, বাইরে থেকেও সমমানের কাউকে আনিয়ে সমীরণকে সারথি ছাড়তে বাধ্য করার জন্য।

"দুলালদার কথা থেকে মনে হয়েছে," অরুণ দু'পাশে আড়চোখে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "আপনি সারথিতে থাকুন এটা উনি চান না।"

"কেন?" সমীরণের কপালে আবার ভাঁজ পড়ল।

"মনে হয়, উনি নিজেও বোধ হয় থাকবেন না, আবার যাত্রীতেই ফিরে যাবেন।"

"যদি থাকবেনই না আবার, তা হলে ভোট ক্যানভাসিংয়ে নেমেছে কেন!"

"যদি বটা বিশ্বাসের গ্রুপকে হারানো যায়, মানে একটা চান্স নিচ্ছে।"

"বটাদাই তো ওকে যাত্রী থেকে এনেছে, এখন তাকে হারানোর জন্য দুলালদা চেষ্টা করবে কেন? আমি এই ক্লাব পলিটিক্সের মাথামুণ্ডু এখনও বুঝতে পারলাম না। কে যে কখন কার দিকে হয়! কখন যে কার স্বার্থে ঘা লাগে। যাক গে, এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, এখন আমি চলি।" সমীরণ সুটকেসটা তুলে নিল।

"শুনছি মালয়েশিয়া আর সিঙ্গাপুর ট্যুরে আপনিই ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন হবেন। " সমীরণের হাত থেকে সুটকেসটা প্রায় কেড়ে নিয়েই দরজার দিকে যেতে যেতে অরুণ বলল।

"এইরকম একটা কথা নোভাচেকের কাছে আমিও শুনেছি। তবে এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

"নোভাচেক কেমন কোচ?"

"সেটা এখন কী করে বলি! সবে তো কয়েক মাস হল এসেছে। তবে খাটাচ্ছে। স্পিড আর স্ট্যামিনার ওপরই জোরটা বেশি দিচ্ছে, মর্ডান ফুটবলের মূল জিনিস এই দুটো তো একদমই আমাদের নেই। থাক, তোমায় আর যেতে হবে না, আমি ট্যাক্সি

ধরে নিচ্ছি।" সমীরণ সুটকেসটা অরুণের হাত থেকে নিয়ে হাত তুলে থামাল একটা খালি ট্যাক্সিকে।

এরপর সে মুশকিলে পড়ল ট্যাক্সিতে বসে, কোথায় যেতে বলবে ট্যাক্সিওলাকে? ঘুনুদা এতক্ষণ বাড়িতে বসে নেই নিশ্চয়, কিন্তু যদি কাছাকাছি কোনও লোক রেখে থাকে? তাকে বাড়ি ফিরতে দেখলেই ওর কাছে খবর পৌঁছে যাবে! কিছু বিশ্বাস নেই এই লোকটিকে। সব পারে।

"কোথায় যাবেন?" ট্যাক্সিওলা গন্তব্য জানতে চাইল।

"নাগেরবাজার।"

কেন যে নামটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল সমীরণ বুঝতে পারল না। দমদম এলাকার মধ্যে জায়গাটা বাড়িরও কাছাকাছি, এটা একটা কারণ, তা ছাড়া নাগেরবাজারে একটা গলিতে থাকে তার স্কুলের বন্ধু বাসব। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। বাসবের একটা নাটকের দল আছে। একাধারে সে নাট্যকার, নির্দেশক আর অভিনেতা। এমন একটা লোককে হঠাৎই এখন মনে পড়ে যাওয়া কেন? বছর চারেক আগে যখন সে প্রথম যুগের যাত্রীতে খেলছে তখন কিছুদিনের জন্য তার অভিনয় করার ইচ্ছা জেগেছিল। তিন-চারবার মহলা দিয়েই ইচ্ছাটা লোপ পায়। স্টেজে নামা আর মাঠে নামার মধ্যেকার তফাতটা সে দ্রুত বুঝেছিল।

সমীরণ হেসে ফেলল। একটু আগেই অরুণ নোভাচেকের নাম করেছিল। বাসবের চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে চোকোশ্লোভাকিয়ার এই লোকটির। দু'জনেই তামাটে-ফরসা, পাতলা, লম্বা, ওপরের দুটি দাঁত একটু বেরিয়ে থাকে। মাথার গড়নটা একই রকম। তবে কারেলের গলা মিহি, বাসবের জলদগম্ভীর। তবে ওদের যতটুকু চেহারার মিল তাইতেই হয়তো বাসবকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে।

কারেল নোভাচেক ডিসিপ্লিন মানেন কঠোরভাবে। বাঙ্গালোর থেকে আসার সময় সমীরণকে বারবার বলেছিলেন, বাইশ তারিখের মধ্যে না ফিরলে এই ক্যাম্প থেকে তোমাকে ছাঁটাই করব। ছ'জনকে তিনি পত্রপাঠ বিদায় করেছেন মাত্র একদিন দেরিতে পৌঁছনোর জন্য। এ. আই. এফ. এফ সেক্রেটারি অনুরোধ করেছিলেন, ছ'জনকে মাফ করে ক্যাম্পে যোগ দিতে দেওয়া হোক। কারেল জানিয়ে দেন, তা হলে পদত্যাগপত্র আপনার দপ্তরে পৌঁছে দেব।

সমীরণের মাথার মধ্যে 'বাইশ' শব্দটা কানামাছির মতো বোঁ বোঁ করে উড়ে চলেছে আর ঠোক্কর খাচ্ছে। বাইশ থেকেই হয়তো বাসবকে মনে পড়ল। চব্বিশে তারা কোঝিকোড় যাবে নাগজি টুর্নামেন্টে খেলতে। টিম কেমন সেট করেছে কারেল তা পরখ করে নেবেন বলেই নাগজিতে তাদের নামাচ্ছেন। ওঁর কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমীরণের কাছেও। এ. আই. এফ. এফ. দলের ক্যাপ্টেন সে হচ্ছেই, এটা কারেলই তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। বারো বছর আগে যেদিন সে ফাইভ বুলেটস-এর ক্যাপ্টেন হয়ে, পাতিপুকুর থেকে শিল্ড জিতে বাড়ি ফিরেছিল পাড়ার ছেলেদের কাঁধে চড়ে, সেদিন পিসিকে সে বলেছিল, "আমি ইন্ডিয়ার হয়ে খেলব, তুমি দেখে নিয়ো।" তারপর বলেছিল, "আমি ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেনও হব।" প্রথম স্বপ্নটা

সম্ভব হয়েছে, দ্বিতীয়টা বাকি রয়ে গেছে। বাইশে তাকে কোঝিকোড় পৌঁছতেই হবে। কারেল বড় কড়া মানুষ।

নাগেরবাজার থেকে দমদম স্টেশনের দিকে যেতে ডান দিকে মতিঝিল কমার্স কলেজের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে ভেতর দিকে চলে গেছে। ট্যাক্সিটা ঢুকতে গিয়েই বাধা পেল। একটা লরি ধাক্কা দিয়েছে আরোহী সমেত সাইকেল রিকশাকে। দুই মহিলা আরোহীর রাস্তায় ছিটকে পড়া ছাড়া বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি, তুমুল কাণ্ড ঘটাবার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। বিতণ্ডা চলছে, লরিটাকে পুড়িয়ে ফেলা হবে কি না। আশপাশের বাড়ির বাসিন্দা ও দোকানদাররা চাইছে, বড় রাস্তায় নিয়ে গিয়ে পোড়াও, নইলে আগুনে তাদেরও সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিছু লোক চাইছে, ঘটনা যেখানে পোড়ানো সেখানে।

ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে সমীরণ সুটকেস হাতে, ভিড় ঠেলে কয়েকমিনিট হেঁটে পৌঁছল বাসবের বাড়ি। একতলায় বড় একটা ঘরে বাসব একাই থাকে, পরিবারের সবাই দোতলায়। এই ঘরেই অভিনয়ের মহলা হয়। চাকরি করে না, একমাত্র ছেলে, যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি আছে, তাই বাসব সামান্য মাত্রায় অলস। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করে ফেলেছে। সমীরণ তাকে এখন বাড়িতে পাবে আশা করেই ডোর-বেলের বোতাম টিপল, বেল বাজার শব্দ হল না। তা হলে বোধ হয় পাওয়ার কাট।

সমীরণ দরজা খটখটাল, একবার, দু'বার।

"কে-এ-এক-এ!" ঘুমজড়ানো গলার ভেতর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, আর ঠিক সেই সময়...

"সমীরণদা, আমাদের খুব বিপদ।"

কিছু বুঝে ওঠার আগেই সমীরণ দেখল তিনটি যুবক, কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স, গলির মধ্যে ছুটে এল। একজন গোলকিপারের মতো ডাইভ দিয়ে তার পায়ের দুটো গোছ আঁকড়ে ধরল। আর-একজন নিলডাউন হয়ে করজোড়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তৃতীয়জন ফাঁকা জায়গা না পেয়ে ছুটে তার পেছনে এসে জড়িয়ে ধরল।

"একী, একী! হচ্ছে কী?" সমীরণ সুটকেস আঁকড়ে ধরে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ছিনতাই করার নানান পদ্ধতির এটাও একটা বলে তার মনে হচ্ছে।

"আমরা ডুবে যাব, বিশ্বাস করুন আমরা গাড্ডায় পড়ে যাব, পাড়ায় মুখ দেখাতে পারব না আর।" নিলডাউন যুবক সকাতরে বলল।

পায়ের গোছ ধরা যুবক প্রায় ডুকরে উঠে বলল, "আপনি, শুধু আপনিই আজ আমাদের বাঁচাতে পারেন।"

জাপটে ধরা তৃতীয়জন তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল, "পিন্টু কাঁদিস না, ভগবান আমাদের সহায় তাই সমীরণদাকে ঠিক সময়েই পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"হচ্ছে কী? অ্যাঁ, ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।" সমীরণ কনুই দিয়ে কোঁতকা দিল জাপটে ধরাকে। টান মেরে ডান পা, বাঁ পা তুলে গোছ ছাড়িয়ে নিল।

"রাগ করবেন না সমীরণদা। আজ আমাদের ফুটবল ফাইনাল, আটদিন আগে তুষার মৈত্র রাজি হয় প্রধান অতিথি হতে। বলেছিল তিনটের সময় বাড়িতে গাড়ি নিয়ে যেতে। আমরা সকাল থেকে রিকশায় মাইক নিয়ে অ্যানাউন্স করে ঘুরেছি, হাতে লিখে পোস্টারও মেরেছি অন্তত গোটা কুড়ি। আজ সকাল দশটায় তুষার ফোন করে বলল আসতে পারবে না, তাকে নাকি দুপুরে বর্ধমানে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। সেখানে ওর শালাদের ক্লাবেরও ফুটবল ফাইনাল, ওকে চিফ গেস্ট হতে হবে তাই আমাদের এখানে আসতে পারবে না।"

তুষার মৈত্র শুধু যাত্রীরই সেরা নয়, ভারতেও একসময় ওর মতো স্টপার দু-তিনজন মাত্র ছিল। ভীষণ জনপ্রিয়। এগারো বছর ধরে ক্লাব বদলায়নি। ওর সঙ্গে সমীরণের বহুবার কলকাতার এবং বাইরের মাঠে লড়াই হয়েছে। ফলাফল প্রায় সমান-সমান। তবে গত দু' বছর ধরে সমীরণ লক্ষ করেছে পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বয়সি তুষার আগের মতো আর ঝটতি ঘুরতে পারছে না, দ্রুতগতির ফরওয়ার্ডরা ওকে পেছনে ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছে, স্পট জাম্পে ততটা আর শরীর উঠছে না। বহু জুনিয়ার ছেলের কাছে শুনেছে, এখন জার্সি টেনে ধরে বা পেটে ঘুসি মেরে তাদের আটকায়, রেফারিরা ওর বিরুদ্ধে ফাউল দিতে ভয় পায়। যাত্রীর এক কর্তা সুবোধ ধাড়ার গ্রুপের প্লেয়ার বলেই সবাই তুষারকে জানে। সেক্রেটারি পতিতপাবন ওরফে পতু ঘোষের বিরোধী গোষ্ঠী হল ধাড়া গোষ্ঠী।

"তুষারদা আসতে পারবে না তো আমি কী করব? বর্ধমান থেকে তাকে ধরে আনব?" সমীরণ ঝাঁঝালো চোখে তিনজনকে তার বিরক্তি জানিয়ে দিল।

"আপনি রাগ করবেন না সমীরণদা, আজ আমাদের উদ্ধার করে দিন।" বলতে বলতে আবার নিলডাউন।

"আমরা আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।" বলার সঙ্গে ডাইভও। কিন্তু সমীরণ সাইড স্টেপ করে পায়ের গোছ সরিয়ে নিতে পেরেছে।

তৃতীয়জন আর জাপটে না ধরে, বিগ্রহের সামনে ভক্ত যেভাবে জোড় হাতে দাঁড়ায় তেমনভাবে শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ির দরজা খুলে এই সময় বাসব বেরোল, পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে জড়ানো স্বরে বলল, "কী রে নাকু, ব্যাপার কী? এই অসময়ে? আয়।"

বাসব আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে, তখন নিলডাউন লাফিয়ে উঠে "বাসুদা, বাসুদা", বলে তার পিছু নিল।

"মরে যাব আমরা। আপনি বলুন সমীরণদাকে। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য। দুটো টিমের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস আর প্রাইজ দেওয়া।"

"এ তো আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম রে! দুটো রাত ট্রেনে কাটিয়েছি বাঙ্গালোর থেকে হাওড়া পর্যন্ত। এখনও বাড়ি যাইনি, খাওয়া হয়নি, ভীষণ টায়ার্ড লাগছে, ঘুম পাচ্ছে—সমীরণ হতাশভাবে শুকনো স্বরে তার শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে করুণ চোখে তাকাল বাসবের দিকে।

"দাদা, শুধু পাঁচটা মিনিট।"

"খেলার আগে ইন্ট্রোডাকশন, খেলার পর প্রাইজ দেওয়া—পাঁচ মিনিটে হয়? চালাকি করার আর লোক পাওনি?" সমীরণ তেরিয়া গলায় বলল।

"তুই এখনও খাসনি!" বাসব ব্যস্ত হয়ে পড়ল, "এই শোন, এখন তোরা ওকে ছেড়ে দে। আগে চান-খাওয়া করে নিক তারপর কথা বলিস।"

"বাসুদা আপনি ওকে..."

"আরে বাবা বলব, বলব। যাবে, যাবে। এখন তোরা ভাগ তো।" বাসব নিশ্চিন্ত স্বরে তিনজনকে আশ্বাস দিল।

সমীরণ দাঁতে দাঁত ঘষে বাল্যবন্ধুর দিকে তাকানো ছাড়া আর কী করবে ভেবে পেল না।

"অ্যাই চল, বাসুদা যখন ভার নিয়েছে আর কিছু ভাবতে হবে না। সমীরণদা আপনি এখন রেস্ট নিন। একটু ঘুমিয়েও নিন। আমরা ঠিক সময়ে এসে তুলে নিয়ে যাব। এই রানা তুই এখানে থাক।" নিলডাউনের হাবভাব গলার স্বর মুহূর্তে কড়া, রুক্ষ হয়ে উঠল। এই "থাক"-এর অর্থ বুঝতে সমীরণের অসুবিধা হল না। পাহারায় থাক, যেন না পালায়।

"যাত্রীর প্লেয়ার পেলাম না তো কী হয়েছে, সারথির এত নামী একজনকে তো পেয়েছি! সমীরণদা আমাদের এলাকায় দু'দলের সাপোর্টারই আছে।" জাপটেধরার ভাবভঙ্গিতে স্বস্তি এবং সাফল্য দুটোই টানটান।

"পিন্টু, মাইক নিয়ে বেরো।"

ওরা চলে যেতেই সমীরণ বলল, "বাসু, এটা কী হল?"

"কী আবার হবে! পাড়ার ছেলে, জলে বাস করে কুমিরদের সঙ্গে...আগে চান কর, মা'কে বলছি, ভাতটাত করে দিতে।"

কথামতোই ওরা এসে সমীরণকে ঘুম থেকে তুলল। হাঁটলে মাঠটা মিনিট পাঁচেক দূরে, ওরা সাইকেল রিকশায় জোর করেই তুলল।

"এতবড় প্লেয়ার হেঁটে যাবে? তাই কখনও হয়। আমাদের নিন্দে হবে না?" সেই নিলডাউন একদম নতুন ভঙ্গিতে হাত জোড় করে বলল এবং উঠে সমীরণের পাশে বসল।

"আমি তো চিফ গেস্ট, আজকের সভাপতি কে?"

"নীলমণি গড়গড়ি, আপনি চেনেন? খুব বড় প্লেয়ার ছিলেন একসময়ে।"

"আলাপ হয়নি, নাম শুনেছি, উনি যখন খেলতেন তখন আমি জন্মাইনি।"

দূর থেকে লাউডস্পিকারে ভেসে আসছে "নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় সেভেন-এ-সাইড ফুটবল প্রতিযোগিতা, শহিদ বিপুল কুণ্ডু চ্যালেঞ্জ কাপ ও তিনকড়ি চ্যালেঞ্জ শিল্ডের ফাইনাল খেলা এখনই শুরু হতে যাচ্ছে। আজকের খেলায় সভাপতি অতীত দিনের প্রখ্যাত খেলোয়াড় এবং কোচ নিলু গড়গড়ি...নীলমণি গড়গড়ি, আর প্রধান অতিথি...," একটু থেমে, "সমীরণ গুপ্ত, যার কোনও পরিচয় দেওয়ার দরকার হবে বলে মনে করি না।"

"শুনলেন?"

"হুঁউ।"

আবার ভেসে এল, "নির্দিষ্ট প্রধান অতিথি তুষার মৈত্রর শাশুড়ি মারা যাওয়ায় তিনি আজ সকালে বর্ধমান চলে গেছেন, এজন্য আমরা দুঃখিত।"

সমীরণ চোখ বড় করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিলডাউনের দিকে তাকাল।

"এসব না বললে পাবলিক ম্যানেজ করা যায় না। ফুটবলারদের চরিত্র যে কী, দাদা আপনি কিছু মনে করবেন না, লোকে একদমই জানে না। আমরা ছোটখাটো ক্লাব করি, এইসব টুর্নামেন্ট থেকেই তো ফুটবলার বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দিকে বড় বড় ক্লাব, বড় বড় ফুটবলার কোনও নজর দেয় না। পাড়ার লোক, দোকানদার এদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে টুর্নামেন্ট চালাই। দেনাও হয়। আস্তে আস্তে শোধ করি। আমাদের দোষ-ত্রুটি-অপরাধ আপনি মাফ করে দেবেন সমীরণদা।"

শুনতে শুনতে সমীরণের মাথা নীচের দিকে নেমে গেল। ফুটবলটা আসলে কারা বাঁচিয়ে রেখেছে তা সে বোঝে। এইরকম ছোট ছোট ক্লাব বাংলার সর্বত্র রয়েছে। তাদের পাড়াতে এমন একটা ক্লাব থেকেই তো সে খেলা শুরু করেছিল। যদি ক্লাবটা না থাকত, যদি বরেন মুখোটি তাকে ফুটবলের গোড়ার জিনিসগুলো না শেখাতেন তা হলে আজ সে এত খ্যাতি, এত টাকার মুখ কি দেখত?

রিকশা মাঠের ধারে পৌঁছে গেছে। তক্তপোশের ওপর মঞ্চটা সাদা কাপড় ঢাকা। একটা টেবিলে একটি কাপ ও একটি শিল্ড আর ছোট দুটি কাপ। পিতলের ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গোছা। জমিতে রাখা একটা টেবিলে পুরস্কার সামগ্রী—শস্তার কিটব্যাগ ও তোয়ালে।

"সমীরণ গুপ্ত এসে গেছেন। খেলা এখনই আরম্ভ হবে। প্রতিযোগী দল দুটিকে অনুরোধ করা হচ্ছে প্রধান অতিথি সমীরণ গুপ্তর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তারা যেন এবার সেন্টার লাইনের কাছে সার দিয়ে দাঁড়ায়। রেফারি, লাইন্সম্যান, আপনারাও দাঁড়াবেন।"

সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে মালা দেওয়া হল। সমীরণের মনে হচ্ছে সে যেন ইলেকট্রিক মাঠে রয়েছে। চারদিকে বাড়ি, অসমান ঘাসহীন জমি, মাঠ ঘিরে বালক, মাঝবয়সি, এমনকী বৃদ্ধরাও ঠেলাঠেলি করছে সাইড লাইনের ধারে। ছাদে, বারান্দায়, গাছেও মানুষ। এদের বেশিরভাগই কলকাতার ময়দানে কখনও খেলা দেখেনি, যদিও এখান থেকে বাসে ময়দান যাওয়া যায়। ছোট মাঠে, আজীবন এই ফুটবল দেখেই খুশি থাকবে কত লোক! তার নাম শুনেছে, কাগজে ছবি দেখেছে, হয়তো টিভিতেও খেলা দেখেছে, কিন্তু তাকে সামনাসামনি এই প্রথম দেখছে। এরা কী ভাবছে তার সম্পর্কে?

টিম দুটোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য মাঠের মাঝে যেতে যেতে সমীরণ মাথা ঘুরিয়ে দর্শকদের দিকে তাকাল। হাততালি পড়ছে।

তার জন্যই কি? সে খেলতে নামছে না, তবু এই উচ্ছ্বসিত হওয়া কেন? এখানে তো শুধুই সারথির সাপোর্টার নেই, যাত্রীরও আছে। তারাও তো তাকে হাততালি দিল!

এইভাবে আমিও দাঁড়াতাম। সার দিয়ে দাঁড়ানো প্লেয়ারদের সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে

ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সরে যাওয়ার সময় সমীরণের মনে হল এদের মধ্যে কেউ একজন সে নিজেও। কোনজন সে? সবাইকেই তার একাকার লাগছে। ওরা এক পা বেরিয়ে এসে সামান্য ঝুঁকে নিজের নাম বলে যাচ্ছে—হোসেনুর আলম, অরূপ মুখার্জি, রামকুমার সাউ, প্রশান্ত বর্মন...সমীরণ গুপ্ত, সমীরণ গুপ্ত, সমীরণ গুপ্ত...।

পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর গ্রুপ ফোটো তোলা হল। মঞ্চে ফিরে আসার সময় সমীরণ দর্শকদের উদ্দেশে নমস্কার জানাতেই আবার হাততালি পড়ল।

নিলু গড়গড়ি মঞ্চেই থেকে গেছেন। দুটো টিমের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য মাঠের মধ্যে যেতে অস্বীকার করে বলেছিলেন, "আমি কে? ওরা কি আমায় চেনে, না জানে? আমার নামও বোধ হয় শোনেনি। আমি যখন খেলেছি তখন ওদের বাবারা খেলা দেখতে যেত। এখন এই বাচ্চাদের হিরো তো সমীরণরা। ওরা আমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করে মোটেই ধন্য বোধ করবে না। সমীরণ, তুমিই যাও।"

সমীরণ বুঝে গেছল, নিলু গড়গড়ির শরীর যেমন শুকনো কাঠের মতো, কথাগুলো ঠিক তেমনই হওয়ার একমাত্র কারণ, আশাভঙ্গ। পুরনো যুগের এইরকম ফুটবলার সে কিছু দেখেছে। এখনকার ফুটবলারদের এঁরা সহ্য করতে পারেন না, বিশেষত এত পাবলিসিটি, এত টাকা পাওয়াটাকে। ওঁরা খেলার জন্যই খেলেছেন, সেজন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন, অনেক কিছু হারিয়েছেন, পেয়েছেন শুধু প্রশংসা। এখন আর কি তা মনে রেখেছে?

সমীরণের অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য কয়েকটি ছেলে মঞ্চের পাশে ভিড় করে এল। সে একে একে সই করে দিল। তার পাশে বসা নীলমণি গড়গড়ির দিকে ওরা ফিরেও তাকাল না। তার বলতে ইচ্ছা করছিল, ওঁর সইটাও তোমরা নাও। কেন জানি বলতে পারল না।

সমীরণ আর গড়গড়ি পাশাপাশি বসে খেলা দেখল, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। খেলা শেষ হতেই মঞ্চের সামনে ভিড় জমে গেল। পুরস্কার দেওয়া দেখতে তো বটেই, কাছের থেকে সমীরণকে দেখা আর তার ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা লক্ষ করা এবং শোনার জন্যও এই ভিড়।

বারাসাতের তরুণ মিলন সঙ্ঘ দু'গোলে পাইকপাড়ার ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়েছে। ঘেমে যাওয়া, শ্রান্ত দুটো টিম মঞ্চের সামনে মাটিতে বসে। সভাপতি বক্তৃতা দেওয়ার পর প্রধান অতিথি পুরস্কার হাতে তুলে দেবে আর তারপর দু-চার কথা বলবে। সমীরণ ইতিমধ্যেই নিলডাউনকে বলে দিয়েছে, বক্তৃতা দেওয়ার প্রতিভা তার নেই সুতরাং দিতে পারবে না।

"আপনারা একটু পিছিয়ে দাঁড়ান। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এখনই শুরু হবে। তার আগে আজকের এই ফাইনালের সভাপতি শ্রীনীলমণি গড়গড়ি, ভাষণ দেবেন।

গড়গড়ি মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। চশমার কাচ মুছলেন পাঞ্জাবির খোঁটায়। গলা খাঁকারি দিয়ে, মাথাটা নামিয়ে কয়েক সেকেন্ড ভেবে শুরু করলেন, "উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, পুত্রবৎ সমীরণ গুপ্ত, আজকের দুই দলের খেলোয়াড়রা। এই ফুটবল ফাইনাল অনুষ্ঠানে আমাকে সভাপতিত্ব করার জন্য যখন আমন্ত্রণ করা হয় তখন

আমি, যাঁরা আমার কাছে গেছলেন আমন্ত্রণ জানাতে, তাঁদের বলেছিলাম, আমাকে কেন? আমি তো পুরনো দিনের একটা ফসিল। এখনকার ফুটবল, তার পরিবেশ, হালচাল সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমার চিন্তা-ভাবনা অন্যরকম, কোনও যোগাযোগই নেই ময়দানের ফুটবলের সঙ্গে। আমি আপনাদের অনুষ্ঠানে গিয়ে যদি কিছু কথা বলি সেটা অন্যরকম শোনাবে। শুনে লোকে হাসবে। ওঁরা বললেন, আপনি যা বলবেন লোকে তা শুনবে, কেউ হাসবে না।

"না, হাসির কথা বলে আপনাদের হাসাবার জন্য আমি এখানে মাইকের সামনে দাঁড়াইনি। আমাদের ফুটবল যে-জায়গায় পৌঁছেছে তাতে হাসির বদলে এখন কান্নার সময় এসে গেছে। তার কারণ আমাদের ফুটবল এখন মারা গেছে। তবে আমরা মৃতদেহটাকে না পুড়িয়ে বা কবর না দিয়ে নিজেদের স্বার্থে সেটা মমি করে রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু ঠিকমতো নিয়ম না জানায় মমিটাও ঠিকমতো করা হয়ে উঠছে না, ফলে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

"দুর্গন্ধ কী? আপনারে জানেন দু'বছর আগে ময়দানেই একটা খেলা গড়াপেটা করে হচ্ছে বুঝতে পেরে দর্শকরা-সাপোর্টাররা হাঙ্গামা বাঁধায়, টেন্টে আগুন ধরাতে যায়, প্লেয়ারদের মারে, ক্লাবকর্তাদের মারে। এটাই হল দুর্গন্ধ। গত বছর কাগজে পড়ি একজন বড় প্লেয়ার দলবদলের আগে ক্লাবে থেকে যাবে বলে অ্যাডভান্স নিয়েছে, নেওয়ার সময় বলেছে এই ক্লাবের তাঁবু তার কাছে মন্দিরের মতো। পড়ে কী ভাল যে লাগল! এই অবিশ্বাস, দুর্নীতি আর অবক্ষয়ের যুগে, ম্যানেজ আর গড়াপেটার যুগে একজনও অন্তত ফুটবলকে ঈশ্বর উপাসনার মতো ব্যাপার মনে করে। টাকাকড়িটা, তার কাছে বড় কথা নয়। কিন্তু তিনদিন পর কাগজেই দেখলাম সেই ফুটবলার আর-এক বড় ক্লাবের এক কর্তার ফ্ল্যাটে গিয়ে টাকাপয়সা নিয়ে দরাদরি করছে। এটাও হল দুর্গন্ধ।

"ফুটবলকে মেরে ফেলল কারা? প্রাণবন্ত ছিল আমাদের সময়ের ময়দান, এখন তা শ্মশান। ঘুরে বেড়াচ্ছে শেয়াল-কুকুর, যাদের বলা হয় ক্লাব কর্মকর্তা। এখন বিখ্যাত হওয়ার শর্টকাট রাস্তা হল বড় ক্লাবের অফিসিয়াল হওয়া। ট্যাঁকের জোর থাকলে ভাল, না থাকলেও ক্ষতি নেই। এক পয়সাও ইনভেস্ট না করে লাখ টাকার পাবলিসিটি পাওয়া যায়। অফিসিয়াল হতে পারলে তখন যা বলবেন কাগজে বড়-বড় করে ছাপা হয়ে যাবে, লোকের কাছে পরিচিতি পেয়ে যাবেন। ক্লাব ভাঙিয়ে কানেকশান বাড়ানো যাবে, তাই দিয়ে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে অনেক কর্তার দু'নম্বরি কারবার চলছে বলেও কাগজে পড়েছি। এইসব প্রচারলোভী, ময়দানে না এলে লোকে যাদের কোনওদিনই চিনত না, এইসব ক্ষমতালোভী, যারা ফুটবলকে ভালবাসে না, সততা, নিষ্ঠা, পরিশ্রমের কোনও দাম যাদের কাছে নেই, তারা মনে করে যেহেতু তাদের টাকা আছে তাই ময়দানটাকে ইচ্ছে করলেই কিনে নিতে পারে, ফুটবলারদের যারা কুকুর-বেড়ালের মতো মনে করে, তাদের মুখের সামনে টাকার থলি ধরে তু তু করে টেন্টে নিয়ে আসে। এই টাকার লোভই আমাদের ফুটবলের সর্বনাশ করেছে।"

নিলু গড়গড়ি হঠাৎ থামলেন। অনর্গল বাক্যস্রোতে শ্রোতারা ভেসে যাচ্ছিল। তাদের পাড়ে ভিড়িয়ে দিতেই বোধ হয় তিনি বক্তৃতা বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে সমীরণের দিকে তাকালেন। শ্রোতারাও তাকাল। সমীরণ বিব্রত বোধ করল।

"সমীরণ আমার ছেলের বয়সি। এখনকার ফুটবলারদের সম্পর্কে কিছু বললে সেটা নিশ্চয় ওর গায়ে লাগবে তাই আগেই মার্জনা চেয়ে রাখছি। কুকুর-বেড়াল পর্যায়ে আজকের ফুটবলারদের নেমে আসার জন্য কিন্তু তারা নিজেরাই দায়ী। এরা বলে ক্লাব গুরুত্ব দিচ্ছে, মর্যাদা দিচ্ছে তাই রয়ে গেলাম বা গুরুত্ব-মর্যাদা দিচ্ছে না বলে ক্লাব ছাড়লাম, কিন্তু লক্ষ-লক্ষ ফুটবলপ্রেমী মানুষ কাগজে যা এদের সম্পর্কে পড়ছে তাতে তো মনে হয় এক মিলিগ্রাম মর্যাদাবোধও এদের নেই। দলবদলের সময় তো এসে গেছে, আর চার-পাঁচদিন পরই সই করা শুরু হবে। কাগজেই আপনারা পড়ছেন কত নাটক হচ্ছে, ফুটবলাররা ডায়লগ ঝাড়ছে। কিন্তু সইটা করার আগে কত রকম ডিগবাজি যে খাবে, শুধু সেটাই এখন লক্ষ করার।"

ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সমীরণের কান। মাথাটা একটু নিচু হয়ে গেল। নিলু গড়গড়ির কথার মধ্যে এখনও সে অন্যায্য কোনও বস্তু পায়নি। কিন্তু তার সামনে এসব কথা তোলা কেন? সে নিজে তো কখনও মর্যাদা হারাবার মতো কোনও কাজ করেনি! শুধু পাঁচ বছর আগে যখন সে প্রথম ময়দানে খেলতে নেমেছিল, যখন অনভিজ্ঞ কাঁচা ছিল তখন লাল কার্ড দেখেছিল রেফারিকে অপমান করে। পরের বছর ছোট ক্লাব থেকে বড় ক্লাবে, যা সব তরুণ ফুটবলারই চেষ্টা করে। তার পরের বছর অন্য ক্লাবে গেছে বেশি টাকার অফার পেয়ে। এতে অন্যায়টা কী? এ তো তার উন্নতিরই স্বীকৃতি।

কিন্তু তারপর তো সে আর ক্লাব বদলায়নি টাকাকড়ি নিয়ে দরাদরি, প্যাঁচ কষে দর বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য কাগজে আজেবাজে কথা বলা, গ্রুপবাজি করা এসব তো সে কখনও করেনি। ইন্ডিয়া ক্যাম্প থেকে বাংলার অনেকে ছাঁটাই হয়েছে নোভাচেকের কঠিন মাপকাঠিতে অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়। সে কিন্তু রয়ে গেছে। তাই নয়, দেশের ক্যাপ্টেনও হতে চলেছে। তার পক্ষে মর্যাদাহানিকর কাজ করা সম্ভবই নয়।

"এরাই সব মর্যাদাবান ব্যক্তি", এই বলে নিলু গড়গড়ি শ্লেষ মাখানো কণ্ঠে একের পর এক উদাহরণ দিয়ে গেলেন, কোন ফুটবলার মাঠের মধ্যে রেফারির গায়ে থুথু দিয়েছে, রেফারির কান ধরেছে, রেফারিকে লাথি কিল চড় মেরেছে। কোন ফুটবলার এটাই আমার শেষ বছর, তারপর রিটায়ার করব বলেও পরের বছর বলল ক্লাবের জনতা চাইছে তাই অসবর নেব না। কোন ফুটবলার খেলার কয়েক ঘণ্টা আগে বলেছে বাকি টাকা হাতে না পেলে পায়ে বল ছোঁবে না। গড়গড়ি বলে যাচ্ছেন আর সমীরণ আড়চোখে লক্ষ করল নানান বয়সি শ্রোতা, হাঁড়ি থেকে রসগোল্লা টপাটপ মুখে ফেলে চিবোবার মতো বক্তৃতাটা পরমানন্দে চিবোচ্ছে, চোখেমুখে গড়াচ্ছে মজা পাওয়ার রস।

বক্তৃতা শেষ হল প্রচুর হাততালি পেয়ে চেয়ারে বসে গড়গড়ি পাশে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, "তুমি হয়তো অন্যদের মতো নও, কিন্তু পাপের ভাগ

তোমাকে তো নিতেই হবে।"

জবাবে সমীরণ শুকনো হাসি ছাড়া আর কিছু দিতে পারল না, নিলু গড়গড়ি তা লক্ষ করলেন।

"এমন একটা সময় শিগগিরই আসবে যখন গাল দিতে গাধা-গোরু বলা হবে না, বলা হবে ফুটবলার। এক সময় ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল খেলেছি, একথা ভাবলে এখন আমি কষ্ট পাই। হয়তো তুমিও পাবে।" গড়গড়ি আলতোভাবে সমীরণের বাহু স্পর্শ করলেন, যেন আগাম সমবেদনা জানিয়ে।

সমীরণ কাপ, শিল্ড এবং অন্য প্রাইজগুলো হাতে হাতে তুলে দিল। দেওয়ার সময় সবার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে হাসলও, কিন্তু কিছুই তার মনে ছাপ রাখছে না। সে কিছুই দেখছে না, কিছুই শুনছে না। তার ভেতরে কোথায় যেন একটা শর্ট সার্কিট ঘটে গিয়ে ইন্দ্রিয় নামক ডায়নামোটাকে বিগড়ে দিয়েছে।

"সমীরণদা, আপনি কিছু বলুন, অন্তত দুটো কথা। ছোট ছোট ছেলেরা আপনার মুখ থেকে দুটো কথা শোনার জন্য খুব আশা করে আছে।"

ক্লান্ত দৃষ্টিতে সমীরণ সামনের ভিড়ের দিকে তাকাল। যা বলব এরা কি বিশ্বাস করবে? নিলু গড়গড়ির কথাগুলো কানে নেওয়ার পর এদের শোনাবার মতো কোনও কথাই সে খুঁজে পাচ্ছে না।

"সমীরণদা..."

সে মাইকের সামনে উঠে এল। কোনও ভণিতা না করেই শুরু করল, "গড়গড়িদা আমার পিতৃতুল্য, তাঁর বক্তব্য আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। আমাদের দু'জনের খেলার সময়ের মধ্যে অন্তত চল্লিশ বছরের ফারাক, এর মধ্যে ময়দানে প্রচুর পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেটা ভালর না মন্দের দিকে গেছে তা ভবিষ্যৎকালই বিচার করবে। যদি মন্দের দিকে গিয়ে থাকে তা হলে আমাদের জ্যেষ্ঠরা তা যেতে দিলেন কেন? দূরে দাঁড়িয়ে না থেকে তাঁরা বাধা দিতে পারতেন।

"খারাপ লোকেরা এখন ক্লাব চালাতে আসছেন, কিন্তু তাঁরা ক্লাবের কর্তা হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন কী করে? আমাদের ফুটবল সেট-আপটা কারা গড়েছেন? নিশ্চয়ই এখনকার ফুটবলাররা নয়। আমরা পেশাদারের মতো টাকা নিই, কিন্তু ফাঁকি মারি এই সেট-আপের গলদের সুযোগ নিয়ে। ফুটবলকে মেরে ফেলা ফুটবলারদের একার ক্ষমতায় সম্ভব নয়, কলকাতার ফুটবলে মৃত্যুর বীজাণু বহুকাল আগেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেটা করেছেন আমাদের পূর্বসূরিরা। হ্যাঁ, ফুটবলকে মমি করে রাখতে চাওয়া হচ্ছে কিন্তু সেই কাজটা তো বয়স্ক লোকেরাই করছেন।" সমীরণ লক্ষ করল ভিড়ের নজর মাঝে মাঝেই নিলু গড়গড়ির দিকে সরে যাচ্ছে। সেই নজরে মজার ঝিলিক নেই।

"টাকার প্রতি লোভ নেই, টাকার প্রয়োজন নেই এমন কেউ যদি এখানে থাকেন, অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসবেন কি?"

সমীরণ কথা বন্ধ করল। ভিড় থেকে একটা গুঞ্জন উঠেই নীরবতা নেমে এল। সে ধীরে মাথাটাকে দু'বার ঘুরিয়ে দুপাশে তাকাল। অর্থবহ একটা নৈঃশব্দ্য তৈরি হল।

"এখনকার ফুটবলাররা আপনাদের মতো ঘরেরই ছেলে। তাদেরও টাকার প্রয়োজন আছে। আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমার নিবেদন শেষ করলাম।"

সমীরণ চেয়ারে ফিরে না গিয়ে মঞ্চের সিঁড়ির দিকে এগোল। ছোট ছোট ছেলেদের জন্য কোনও কথাই বলা হল না। এজন্য মনটা ভার লাগছে বটে আবার কিছুটা হালকাও বোধ করল নিলু গড়গড়ির থমথমে মুখটা দেখে।

"তুই পরশুই আমার রিহার্সালে হাজির হবি।" উচ্ছ্বসিত বাসব ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। "দাঁড়িয়ে শুনছিলাম তোর বক্তৃতা। কী গলা, কী ডেলিভারি, কী ড্রামাটিক পজ, কী পিচ কন্ট্রোল, কী..." বাসবের দমবন্ধ হয়ে এল।

"তাড়াতাড়ি চল, সুটকেসটা নিয়েই বাড়ি রওনা হব, অনেক কাজ আছে।" সমীরণ জোরে পা চালাল।

"সমীরণদা একটু বসবেন না, একটু মিষ্টি..."

"না, না, মিষ্টি আমি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।"

"সমীরণদা, আপনার জন্য রিকশা..."

"দরকার নেই, হেঁটেই..."

"সমীরণদা, মালাটা অন্তত নিয়ে যান।"

"ওটা গড়গড়িদাকে দিয়ো।"

॥ ৪ ॥

রাত্রের খাওয়া শেষ করে টেবিলেই ওরা গল্প শুরু করেছিল। প্রায় রাতেই ওরা চারজন কিছুক্ষণ বসে সারাদিনের ভালমন্দ অভিজ্ঞতার বা ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে থাকে। আজ ঘুনু মিত্তির এবং নিলু গড়গড়ি প্রসঙ্গ ওঠে।

"ফুটবলারদের গাধা-গোরু বলল! তার মানে, নাকু তুই..." রেখা গুপ্তর অসহ্য বিস্ময় আর প্রচণ্ড রাগ মিশে গিয়ে তাঁকে বাক্য শেষ করার সুযোগ দিল না।

সুযোগ নিল শ্যামলা। "একটা গাধা-গোরু। সমীরণ গুপ্ত, নামের পাশে টাইটেল গা গো।" তারপর সমীরণের কানে কানে বলল, "যেমন তুই বেগার শব্দটা তৈরি করেছিস।"

"ঠাট্টা নয় মলা, ঠাট্টা নয়।" হিমাদ্রির মুখ সিরিয়াস হয়ে উঠল। "দাদা তো আর বাংলা কাগজগুলো বাঙ্গালোরে পড়ার সুযোগ পায়নি, পেলে বুঝতে পারত স্টার ফুটবলাররা এক-একটা সত্যিই গা গো। এই তো সারথির রণেন পাল আর দেবী মাইতিকে যাত্রীর পতু ঘোষ দু' লাখ আশি হাজার দর দিয়েছিল। ওরা বলে বটা বিশ্বাসের সঙ্গে কথা না বলে কিছু করবে না। ওরা এসে বটাকে বলল যাত্রী এই টাকা দেবে, আপনি দর না বাড়ালে যাত্রীতে চলে যাব। বটা তখন দু'জনকে দু' লাখ ষাট করে দেবে বলল। আর দু'জনের গতবারের বকেয়া ছিল পঁচিশ হাজার করে, সেটাও মিটিয়ে দেবে বলল। ওরা মেনে নিয়ে অ্যাডভান্স নিল। তারপর কী করল জানো? দু'জনেই পতু ঘোষের কাছে গিয়ে বলল, আমাদের যদি তিন লাখ করে দেন তা হলে

সারথির অ্যাডভান্স ফিরিয়ে দেব।"

"এইসব কথা কাগজে বেরিয়েছে, না কি তুই বানিয়ে বানিয়ে বলছিস কানু!" রেখা গুপ্ত অবাক হয়ে বললেন।

"পিসি, কাগজগুলো এখনও ঘরে রয়েছে তোমাকে সব দেখাতে পারি, লাইন-বাই-লাইন সত্যি। কিন্তু তোমাকে দেখাব না।"

"কেন?"

"তা হলে তুমি দাদাকে আর ফুটলবল খেলতে দেবে না।"

"কেন দেব না? পরিশ্রম করে খেলা শিখেছে, বছরে এত গাদা গাদা ম্যাচ খেলছে রক্ত জল করে, সেজন্য টাকাকড়ি নেবে না? নিশ্চয় নেবে। মজুরি বাড়াও, মাইনে বাড়াও করে স্লোগান দেবে, মিছিল করবে কুলিমজুর, কেরানিরা, তার বেলা দোষ হয় না, আর ফুটবলাররা দুটো টাকা বাড়াতে চাইলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! নাকু এবার যারা বেশি টাকা দেবে তুই সেখানেই খেলবি।"

সমীরণ হাসল। মাথা নামিয়ে কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে মন্থর ভারী গলায় বলল, "নিলু গড়গড়ির কথাগুলোর মধ্যে অনেক সত্যি জিনিস আছে পিসি। ফুটবলাররা নিজেদের মর্যাদা নিজেরাই খুইয়েছে নানানভাবে। দর বাড়াবার জন্য এই যে একবার পতু একবার বটা আবার পতু, এতে কয়েক হাজার টাকা হয়তো বাড়ানো যাবে কিন্তু ক্লাবের সমর্থকরা কি এদের মানুষ হিসাবে উঁচুতে স্থান দেবে না কি ওরা নিজেরাই নিজেদের সৎ মানুষ ভাববে? ভেবে দ্যাখো পিসি, দেশে এখন অন্যান্য খেলার সঙ্গে তুলনায় ফুটবলের স্থান কোথায়? শুধু বাংলাতেই ফুটবল নিয়ে নাচানাচি হয়। এখানে রাস্তায় হাঁটলে বহু মানুষই তাকায়, ছেলেরা অটোগ্রাফ চায়। কাজকর্ম, দরকার নিয়ে কোথাও গেলে আগে সেটা করে দেয়। কিন্তু বাংলার বাইরে ফুটবলারদের এখন আর কোনও খাতির নেই কেননা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমাদের কোনও পারফরমেন্সই নেই। আছে ক্রিকেটের, ওরা বিশ্বকাপও জিতেছে। তাই ক্রিকেটারদের পেছনে সবাই ছোটে। আমি নিজে বড় বড় শহরে, কেরল বাদে সব জায়গায়, এটা লক্ষ করেছি। কেন এমন হবে?" সমীরণ তার মর্মবেদনা কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করল।

"কিন্তু সেজন্য ফুটবলাররা দায়ী হবে কেন?" হিমাদ্রি তর্ক চালাবার একটা রাস্তা পেয়ে যুক্তির সাইকেলে উঠে পড়ল। "ভারত ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে খেলতেই যায় না, না গেলে ফুটবলাররা তৈরি হবে কী করে? ক্রিকেটে যেসব লোক বোর্ডে যায় তারা বেটার ক্লাস অব পিপল, আর ফুটবলে পতু, বটা, ঘুনু এই তো সব নাম! নামেই বোঝা যায় কী ক্লাসের লোক!" হিমাদ্রি ঠোঁট বাঁকাল।

"কানু, তুই ভুলে যাচ্ছিস, বিরাশির এশিয়ান গেমস দিল্লিতে হয়েছিল। তাইতে আমাদের ফুটবল টিম তৈরি করার জন্য বহুবার বাইরে খেলতে দল পাঠানো হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টে। তখনই আমাদের দেশে নেহরু কাপও শুরু হয়। ভারত এই কাপে এখন পর্যন্ত চৌত্রিশটা ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র একটা! ইডেনে যুগোশ্লাভিয়াকে হারিয়েছিল সেই বিরাশিতে। গোল দিয়েছে মোট সতেরোটা, খেয়েছে চৌষট্টিটা। নিজের দেশের মাটিতে এত বছর ধরে ইন্টারন্যাশনাল খেলছি,

দেশের লোকের সামনে। এতে আলাদা বাড়তি একটা প্রেরণাও প্লেয়ারদের পাওয়ার কথা। দেশের সম্মান দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য, বাড়াবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই তখন একমাত্র কাজ হয়ে ওঠে।"

সমীরণ কথা থামিয়ে তিনজনের মুখের দিকে তাকাল। পিসি ও মলা গম্ভীর হয়ে গেছে। কানুর সাইকেলের চাকা থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

"প্রত্যেকবারই ভারত সবার শেষে। ক্যাম্পে নোভাচেক একদিন বলল, স্যাম, আমাকে সমীরণ বলে না, তোমাদের দেশে কি ফুটবল খেলা হয়? কেমন ফুটবল খেলা হয়? হেল্‌থ নেই, স্পিড, স্ট্রেংথ, স্ট্যামিনা নেই। কিন্তু বেসিক স্কিলগুলো? এখনও পাস ধরতে পারে না, শুটিং পাওয়ার জিরো, কারেক্ট বল দিতে জানে না, এয়ারে ভেরি পুওর, কখন কোথায় থাকতে হবে সেই জ্ঞানটাও নেই। তোমাদের স্কুল লেভেলে কিছুই শেখবার ব্যবস্থা নেই। অজ্ঞ, আনস্কিলড, খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে বেশি বয়সে ক্লাব ফুটবলে আসে। সেখানেও কিছু উন্নতির সুযোগ পায় না। খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে সারা বছরই অবিরাম খেলে খেলে এত ক্লান্ত হয়ে থাকে যে, স্কিল বাড়াবার জন্য খাটার ইচ্ছে আর থাকে না। তারপর ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ওরা যখন আসে, আর তখন কী ফুটবল যে খেলে, সেটা তো খেলার ফলই বলে দিচ্ছে।

"শুনতে শুনতে লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে। তারপর রাগও হয়।" সমীরণ হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রাগী দাঁতচাপা স্বরে বলল, "ইচ্ছে করে লণ্ডভণ্ড করে দিই কলকাতার ফুটবলকে। শুধু ট্রফি জেতা, লিগ জেতা ছাড়া আর কিছু এরা ভাবে না। সারা পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, এমনকী পাশের এই বাংলাদেশও আমাদের ফেলে এগিয়ে গেছে আর আমরা এখানে ট্যাকটিক্‌স আর স্ট্র্যাটেজি ভেঁজে বড় বড় বুলি কপচাচ্ছি। বাইরে থেকে প্লেয়ার ধরতে লাখ লাখ টাকা খরচ করছে এই দুটো ক্লাব। ভাবতে পারো বিনু জন, আলবুকার্ক, কার্নাইল এরা কিনা প্লেয়ারের জাত? অথচ এরাই এখন ময়দানের আরাধ্য দেবতা। এদের আনার চেষ্টা হচ্ছে আমাকে কোণঠাসা করার জন্য।"

"সে কী রে!" পিসি আঁতকে উঠলেন। "কোণঠাসা তো ওরাই হবে তোর কাছে।"

"তোকে কি সারথির আর দরকার নেই?" হিমাদ্রি ভ্রূ তুলে জানতে চাইল। "তোকে যাত্রীতে যাওয়ার সুযোগ দিলে ইলেকশনে বটার কী অবস্থা হবে?"

"কথাটা দরকার বা অদরকারের নয়, টাকা দিয়ে আমায় অবশ্যই ধরে রাখবে। বটা বিশ্বাস যতই আমায় অপছন্দ করুক, সে জানে আমি যা সার্ভিস ক্লাবকে দেব, আর কেউ সারা বছর ধরে তা দিতে পারবে না। এটা সারথির জনতাও জানে। কিন্তু বটা বিশ্বাস ওর নিজের তাঁবের কয়েকটা প্লেয়ার দিয়ে মাঠে আমায় সারা বছর খাস্তা করার চেষ্টা করবেই। ম্যাচ গড়বড় হলেই ওর পোষা ছেলেরা টেন্টে ইট ছুড়ে আগুন ধরিয়ে ঝামেলা পাকাবে আর দোষটা আমার ঘাড়ে ফেলবে। অবশ্য ওর গোষ্ঠীতে যদি ভিড়ি তা হলে কিছুই হবে না।"

"তুই তো বাঙ্গালোর চলে যাবি, তোকে তো তা হলে আর খেলতে হচ্ছে না।" শ্যামলা বলল, ঝামেলা এড়াবার একটা রাস্তা বাতলে।

"আরে, চলে যাওয়াটা কি চিরকালের জন্য? ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেবে, তখন এসে খেলব। আবার ডাকবে, চলে যাব। আমাকে বাইশ তারিখের মধ্যে কোঝিকোড় পৌঁছতেই হবে। নাগজির খেলা শেষ হলে নোভাচেক যদি মনে করে তা হলে ধরে রাখতে পারে একসঙ্গে ট্রেনিংয়ের জন্য। আবার লিগে খেলার জন্য ছেড়েও দিতে পারে। সবই ওর ইচ্ছের ওপর।"

"তোকে তো সারথি কন্ট্র্যাক্ট করতে বলবে।" হিমাদ্রি জানতে চাইল না, একটা স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা যেন বিবৃত করল। "যাত্রীও তোকে চাইছে, বেশি টাকা দেবে বলছে। দু' পক্ষের দরটা আগে শুনে নে।"

"দরটর শুনে কাজ নেই। নাকু, তুই আগে ভাল করে খেলাটা তৈরি কর। ওই চেক সাহেবের কাছ থেকে যত্ন করে সব শিখে নে। সম্মান বাড়া দেশের, দেখবি তাতে তোরও সম্মান বাড়বে।" পিসির কথাগুলো দৃঢ়স্বরে বলা এবং তাইতে বাকি তিনজন অস্বস্তিতে পড়ল।

"পিসি, দাদা তো দেশের সম্মান নিয়ে ভাবছেই, কিন্তু টাকাটাই বা ছাড়বে কেন?" শ্যামলা বাস্তবের কাছাকাছি পিসিকে ধরে রাখার চেষ্টা করল। "এই তো একটু আগে বললে, রক্তজল করে খেলে সেজন্য টাকাকড়ি নিশ্চয় নেবে, যারাই বেশি টাকা দেবে..."

"মলা তুই ভুল করছিস।" হিমাদ্রি থামিয়ে দিল। "পিসি বলতে চায় টাকা তো নেবেই কিন্তু দেশের মর্যাদাও বাড়াতে হবে, তাই তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই-ই" পিসি সমাধানটা পেয়ে গিয়ে হাঁপ ছাড়লেন। আর ঠিক তখনই বাড়ির সামনে মোটরগাড়ির দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো শব্দ ভেসে এল।

"এখন আবার কে!" সমীরণ ওয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "এই সাড়ে দশটায়!"

হিমাদ্রি জানলার কাছে উঠে গেল। শ্যামলা ফটকের আলোটা জ্বেলে দিল।

সবুজ মারুতির দরজা খুলে নামছে ঘুনু মিত্তির। রাস্তায় পা রেখেই বাড়ির জানলার দিকে ইশারা করে আলো নিভিয়ে দিতে বলল।

"ঘুনুটা আবার এসেছে, মলা আলো নিভিয়ে দে।" হিমাদ্রি রিলে করল জানলা থেকে। দরজা খুলতে খুলতে সে বলল, "এত রাতে যে, কী ব্যাপার?"

"এত রাত আর কোথায়, মাত্র তো সাড়ে দশ। কলকাতায় এখনও ট্রাম-বাস চলছে, খাবারের দোকান খোলা রয়েছে। তোমাদের অবশ্য একটু বেশি রাতই। যারা ফুটবলার ক্যাচ করে বেড়ায় তাদের কাছে দুপুর একটা আর রাত একটা সমানই ব্যাপার।" ঘুনু সমীরণকে দেখে খুবই হৃষ্টমনে ডাইনিংয়ের চেয়ারে বসে পড়ল। "হুঁ হুঁ বাবা, একটু রাত না করলে কি বাড়িতে যাওয়া যায়?"

"আর একটু দেরি করলে দাদাকে আর পেতেন না।" হিমাদ্রি গম্ভীর গলায় বলল।

ঘুনু চমকে উঠলেন, "কেন, কেন?"

"সারথির লোক দু'বার এসে খোঁজ করে গেছে। হয়তো রাতেও আসবে। তাই দাদা রাতে বাড়িতে থাকবে না।" হিমাদ্রির থেকেও শ্যামলা আর একটু গম্ভীর গলায়

বলল।

"সারথির লোক!" ঘুনু বিরক্তি, ভয়, উদ্বেগ মিশিয়ে তাকালেন। "বঙ্কু? নির্মল? নাম বলেছে?"

"বলেনি। এইভাবে যখন-তখন ঘনঘন ডিস্টার্বেন্স হলে...আমার পার্টওয়ান পরীক্ষার আর দু' মাসও বাকি নেই—" শ্যামলা ঈষৎ অনুযোগ কণ্ঠে এবং চাহনিতে ফুটিয়ে তুলল।

"ঠিক, ঠিক, ডিস্টার্বড মাইন্ডে পড়াশোনা, পরীক্ষার প্রিপারেশন হয় না, ফুটবল তো খেলাই যায় না। নাকু, গুছিয়ে নে। দুটো শার্ট, একটা প্যান্ট, একটা পাজামা হলেই হবে।"

"দুটো শার্ট, দুটো প্যান্ট গুছিয়ে নে, তার মানে?"

সমীরণের আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা। এমনটি তার আজই হয়েছিল যখন বাসবের গলিতে ওরা তিনজন আচমকা ছুটে এসে তাকে ধরেছিল।

"মানে হল, পতুর বাড়িতে এখনই তোকে নিয়ে যাব।"

"নিয়ে যাবে মানে?"

"ওখানে থাকবি, ওখান থেকে সই করতে যাবি, সই করেই সোজা দমদমে গিয়ে প্লেনে উঠবি। কোথাকার টিকিট কাটব বল? মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, না হায়দরাবাদের? মাদ্রাজেরই কেটে রাখি, ওখান থেকে সাউথের সব ফ্লাইটগুলোই পাবি।"

"থামুন, থামুন।" সমীরণ দু' হাত তুলল। "পতুদার বাড়িতে আমি যাব কেন?"

কথাটা শুনে ঘুনু অবাক হয়ে পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "কেন কী রে? দু'বার যে ঘুরে গেছে। এরপর কি তোকে আর ছেড়ে রাখা যায়!"

"নাকুকে ধরে রাখবেন?" পিসির নির্বিকারত্ব এতক্ষণে ঘুচল। কথার মধ্যে প্রবেশ করলেন সন্দেহ-কুটিল চোখ নিয়ে।

"নিশ্চয়।"

"আমি বেঁচে থাকতে!" চাপা গর্জন আর পিসির উঠে দাঁড়ানো দেখে ঘুনু চেয়ারে তাঁর অবস্থান পালটে ইঞ্চিখানেক পিছোলেন। বাঁ হাতটা আপনা থেকেই বুশ শার্টের কলারের কাছে উঠে গেল।

"কেন? কী করেছে ও? যেখানে খুশি ও খেলবে, যার সঙ্গে খুশি ও যাবে। ও কি গাধা-গোরু যে, দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবেন?"

"আহাহা আপনি এত চটছেন কেন, নাকুর তো দুটোই পা, ও কেন গাধা-গোরু হতে যাবে? আমরা ওই পা দুটোই চাইছি। অন্য কেউ এসে ওর পা ধরে যাতে টান না মারে সেজন্যই ওকে পতুর বাড়িতে সরাতে চাচ্ছি। আপনি অল্পেই রণচণ্ডী মূর্তি ধরেন। আজ সকালে আমার..." ঘুনু গলায় হাত বোলাতে শুরু করলেন। রেখা গুপ্ত অপ্রতিভ হয়ে আড়চোখে তিনজনের মুখ লক্ষ করে বুঝলেন সকালের কাজটা নিয়ে এরা বহুদিন তাঁর পেছনে লাগবে।

"ঘুনুদা, আপনি কি আমায় বাচ্চা ছেলে ভেবেছেন? কেউ ধরে নিয়ে যাবে বললেই কি অমনই ধরা দিয়ে দেব। তা ছাড়া, আমি যাত্রীতে খেলব এ ধারণাটাই বা

আপনাদের হল কী করে?" সমীরণ বিরক্তি লুকোবার চেষ্টা করল না।

"তোর জায়গায় তিনটে প্লেয়ার আনছে, সেটা তো জানিস? আমাদের বুকুকেও টোপ দিয়েছে। সারথি এখন ডেসপ্যারেট একটা-দুটো স্ট্রাইকার পাওয়ার জন্য। নইলে গত তিন বছর একটাও বড় ম্যাচে গোল করতে না পারা বুকুকে কিনা দু'লাখ অফার দেয়?" ঘুনু তাজ্জব বনেছেন বোঝাতে চোখ পিটপিট করলেন।

"তা হলে বুকু চলে যাক সারথিতে।" সমীরণ আলস্য ভাঙার জন্য দু'হাত তুলে দেহে মোচড় দিল। "দু'লাখ পেলে যাওয়া উচিত।"

"পাগল হয়েছিস। সারথিতে গিয়েই যাত্রীকে গোল দেবে। ওকে যেতে দেওয়া চলবে না, দুই-পঁচিশে ও রাজি হয়েছে। আজকেই ওকে পতুর বাড়িতে জিম্মে করে দিয়ে এলাম। তুইও এবার চল।"

"বুকু অর্থাৎ কিশলয় দত্তকে দুই-পঁচিশ, যে গত তিন বছর ধরে বড় ম্যাচে গোল করতে পারেনি। আর সমীরণ গুপ্তকে এক লাখ ষাট হাজার! বাহ্।" হিমাদ্রি দাদার হয়ে দরাদরির প্রথম ধাপে পা রাখল। "আর দুলাল চক্রবর্তীর মতো বানপ্রস্থের সময় হওয়াকে কত অফার দিয়েছেন?"

ঘুমু মেজাজ হারালেন না। খোঁচাটাকে সরল হাসি দিয়ে ভোঁতা করে বললেন, "মানছি দুলালের বানপ্রস্থের সময় হয়ে গেছে, এখন ও পঁয়ত্রিশ মিনিটের প্লেয়ার। কিন্তু বড় ম্যাচে এখনও ওর জায়গায় খেলবার মতো লোক এদেশে নেই। এজন্যই ওকে নিতে হবে। বলেছি তো, ছেঁকে তুলে নেব এবার, টাকাপয়সা নিয়ে কোনও কার্পণ্য যাত্রী করবে না। তা হলে নাকু?" ঘুনু চেয়ার থেকে ওঠার মতো ভাব দেখালেন।

"তা হলে কী?" সমীরণ পা দুটো ছড়িয়ে চেয়ারে শরীর এলিয়ে জানিয়ে দিল, সে ব্যস্ত নয়।

"মামণির পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে, সামনেই পার্ট ওয়ান। পতুর গাড়ি নিয়েই এসেছি। ব্যাগে শার্ট-প্যান্টটা ভরে এবার বেরিয়ে পড়, পাজামা নিতে ভুলিসনি।" অত্যন্ত নিশ্চিন্তে কথাটা বলে, কী যেন ভাবতে ভাবতে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘুনু, নস্যির নতুন ডিবেটা বের করে ঢাকনায় কয়েকটা চাঁটি দিলেন। রেখা গুপ্তর চোখ নিবদ্ধ হল ডিবেটায়। শ্যামলা হাত দিয়ে মুখ চাপল। হিমাদ্রি হঠাৎ বিষম খেয়ে বেসিনের দিকে ছুটে গেল।

সমীরণ এসব লক্ষ করেনি। কারণ চোখ বন্ধ করে সে তখন ভাবছিল। "ঘুনুদা, আমি যাত্রীতে যাব না।"

নীল আকাশ থেকে ঘুনুর মাথায় বাজ পড়লেও এত অবাক তাঁকে দেখাত না। "যাবি না! আমি যে পতুকে দিব্যি গেলে বলে এসেছি, তোকে নিয়ে যাবই! আমার মাথাকাটা যাবে, লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না..."

"থাক ঘুনুদা, এসব কথা বলে লাভ নেই। আমার সঙ্গে কথা না বলেই দিব্যি গেলে ফেলেছেন?" সমীরণ কঠিন গলায় ইঙ্গিত দিল বাজে কথা সে শুনতে চায় না।

"দাদাকে কি গা-গো ভেবেছেন?" শ্যামলা ফুট কাটল।

"গা-গো!" ঘুনু ঘাবড়ে গেলেন, "তার মানে?"

"ও কিছু নয়।" সমীরণ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করল। "মলার মাথায় পোকা আছে, সেগুলো মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে।"

"আহ্হ্।" নিশ্চিত বোধ করে ঘুনু নস্যির ডিবের ঢাকনাটা খুলে আঙুল ঢোকালেন। তাই দেখে রেখা গুপ্ত কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, শ্যামলা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাঁকে চুপ থাকতে ইশারা করল।

"দ্যাখ নাকু এক-ষাটটা হল চুক্তি, আর গুঁড়ো পঞ্চাশ হাজার। তা হলে দু'লাখ দশ হাজার। গত দু'বছর ধরে তোর পেছনে লেগে রয়েছি, এবার আর..." টেবিলে হুমড়ি খেয়ে ঘুনু আঙুলের টিপে নস্যি সহ সমীরণের দিকে দু'হাত বাড়ালেন। "সীতেশের গ্রুপের ছেলে বুকু। ওকে প্রোটেক্ট করার জন্য সীতেশই দু' বছর ধরে তোকে যাত্রীতে আনার ব্যাগড়া দিয়ে গেছে। এ-বছর পতু এসে ওকে কোণঠাসা করে দিয়েছে, তবে বুকুকেও পতু রাখতে চায়। তুই প্রথম দুটো ম্যাচে গোল কর, বুকু ফুকু ফুটে যাবে, সীতেশরাও ভেসে যাবে।"

"যাকে ফোটাতে চান, তার থেকে দাদা পনেরো হাজার কম নেবে কেন?" হিমাদ্রি জেরা করার ভঙ্গিতে বলল। "সাতটা গোল তিন বছরে, এক-একটার দাম কত হবে বলে মনে হয়!"

ঘুনু তাকালেন সমীরণের দিকে। ভাইয়ের প্রশ্নটা দাদার চোখেও। হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে ঘুনু নস্যিটা নাকে ঢুকিয়ে হাত ঝাড়তে গিয়েই মুখ ফ্যাকাশে করে ফেললেন। পর্যায়ক্রমে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হেসে বললেন, "দ্যাখো, কী ভুলো মন যে আমার। আবার আমি নস্যি নিতে শুরু করেছি। এটা যে আজই ত্যাগ করেছি সেটা আর মনেই নেই!"

"এই ডিবেটাও কি জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেবেন?" খুব সাধারণ স্বরে শ্যামলা জানতে চাইল।

"নাহ্।" ঘুনু মাথা নাড়ালেন। "ফেলব না। থাক। বেইজ্জত হতে আর বাকি রইল না। তোমরা সবাই আমাকে ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, অ্যাক্টর বলে নিশ্চয় ধরে নিয়েছ। বোধ হয় আমি তাই। ক্লাব করে করে সোজাভাবে চলাটাই ভুলে গেছি।"

করুণ হয়ে উঠেছে ঘুনুর মুখ, কিন্তু ঝট করে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে সরল হাসি ছড়িয়ে বলে উঠলেন, "যাকগে এসব, বরং তুই পতুর সঙ্গে একবার নিজেই মুখোমুখি কথা বল। এক একটা গোলের দাম কত সেটা ওই ধার্য করবে'খন। মনে হচ্ছে আজ আর তোকে নিয়ে যেতে পারব না, তা হলে কালকে চল।"

"আপনি আমাকে পতুদার ফোন নাম্বারটা দিন, কবে যাব সেটা ফোন করে জানিয়ে দেব।" সমীরণ আন্তরিকভাবে বলল।

ঘুনুদাকে এগিয়ে দিতে ওরা সবাই বাইরের বারান্দায় এল। হঠাৎ তিনি রেখা গুপ্তর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "মুন্নার বাড়িতে গেছলেন কি?"

"অ্যাঁ, মুন—না! কে—?" রেখা গুপ্ত থতমত হয়ে আমতা আমতা করছেন, ততক্ষণে ঘুনু মিত্তির মারুতির দরজায় হাত রেখেছেন।

"আহ্, পিসি, তুমি মাটি করলে। মুন্না কে তা ভুলে গেলে এর মধ্যে?" চাপা ঝাঁঝ শ্যামলার গলায় এবং সেটা অপ্রতিভতার লজ্জা সহ।

"লাস্ট সেকেন্ডে পেছন থেকে এসে গোল করে দিয়ে গেল। নিশ্চয় সারাদিন ওত পেতে ধারেকাছে ছিল।" হিমাদ্রি ঠোঁট কামড়াল।

"নাকু, ভদ্দরলোকের কাছে যে আমি মিথ্যাবাদী হয়ে রইলাম।" রেখা গুপ্ত কাঁদো কাঁদো হয়ে সমীরণের দিকে তাকিয়ে রইলেন। "কী ভাবছেন উনি আমার সম্পর্কে, মলার সম্পর্কে!"

"কিচ্ছু ভাবছে না, এসব ধড়িবাজ লোককে আমি চিনি। এরা সত্যি মিথ্যের ধার ধারে না।" সমীরণ আশ্বস্ত করার জন্য বলল।

"কিন্তু আমি তো ধরি। আমিও তো ধড়িবাজ হলাম। উহহ্হ্, এবার নরক যন্ত্রণা শুরু হবে। নাকু তুই আমায় উদ্ধার কর,...তুই বরং ওর ক্লাবেই এবার যা, তা হলে আমি খানিকটা শান্তি পাব।" বলেই রেখা গুপ্ত দ্রুত নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ঘরের আলো নিভিয়ে খাটে বসে কান ধরে বিড়বিড় শুরু করলেন, "মিথ্যা বলা মহাপাপ, নরকে গমন...মিথ্যা বলা মহাপাপ...।"

ডাইনিংয়ে তখন হিমাদ্রি বলছে, "গ্রেট লেডির অর্ডার, অমান্য করলে কিন্তু ভি আই পি রোডে নিশ্চিত নিলডাউন!"

॥ ৫ ॥

"কে, সমীরণ নাকি, আমি ধাড়াদা, সুবোধ ধাড়া বলছি।"

টেলিফোন বাজার শব্দে সমীরণের ঘুম ভেঙে গেছল। খাবার দালান থেকে রেখা গুপ্তর ঘরে যাওয়ার সরু গলিটার মধ্যে দেয়ালে আঁটা র‍্যাকে টেলিফোন। সে ভেবেছিল মলা বা কানু ফোন ধরবে। ক্রমাগত বেজে যাওয়ায় বিছানা থেকে তাকে উঠতেই হল। আজ রবিবার বেগিং বন্ধ। পিসি আর মলা তা হলে বাজারে গেছে। কানুও বাড়িতে নেই।

"বলুন।" সমীরণ এক চোখ বুজে ঘড়ি দেখল। সওয়া ছ'টা।

"ঘুম ভাঙালাম নাকি?"

"সারারাত লোডশেডিং, এই সকালের দিকে ঘুমটা এসেছিল।" হাই তোলার শব্দ সে ফোন মারফত পাঠিয়ে দিল।

"এহেহেহে, তা হলে তো অন্যায় হয়ে গেল। তুই তা হলে এখন ঘুমো, আমি বরং পরে ফোন করব।"

"ঘুম আর আসবে না, বলুন, কী বলবেন।" বিরক্তি চেপে অমায়িক গলায় সে বলল।

"বলব আর কী, ক্লাবে যা চলছে। এরা, মানে ঘুনুরা, আর কোচ খুঁজে পেল না, শেষে কিনা অজয় তালুকদারকে! কী যোগ্যতা আছে ওর? কোনওদিন কোনও বড় টিমকে কোচ করল না, দুটো ছোট টিমকে কোচ করে 'বি' গ্রুপে তাদের নামিয়ে

দেওয়া ছাড়া যার আর কোনও সাকসেস নেই, কোচিংয়ের ডিগ্রি ডিপ্লোমা নেই, ফুটবল সেন্স নেই, ঝালচচ্চড়ি অম্বল রাঁধার বাইরে আর কিছু যে রাঁধতে জানে না তাকে কিনা ফাইভ স্টার হোটেলের চিফ শ্যেফ করে দিল!...হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস?"

"পাচ্ছি। আপনি বলে যান। কিন্তু এই সক্কালবেলায় এসব কথা আমায় শোনাচ্ছেন কেন? আমি তো যাত্রীর প্লেয়ার নই।"

"ঘুনু তোর বাড়িতে কাল গেছল তোকে তুলে আনতে। পারেনি। আমি জানতুম পারবে না। তোর মতো প্লেয়ারের মানমর্যাদা, ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন হতে যাচ্ছিস, এখন যারা কমিটিতে এসেছে তারা কি দিতে পারবে? ভেবেছে টাকা ছড়ালেই সমীরণ গুপ্ত ছুটে আসবে, তা কি কখনও হয়! হাঘরে ছেলেদের মতো টাকার জন্য আজ এ-ক্লাব কাল সে-ক্লাব, এসব তো তোর পক্ষে সম্ভব নয়। কী ফ্যামিলির ছেলে তুই, আমি তো তা জানি।...হ্যালো, ক'দিন ধরে লাইনটা খারাপ, হ্যালো..."

"আমি ঠিকই শুনতে পাচ্ছি, বলুন।"

"ঘুনু কেমন লোক তা তো তুই ভালই জানিস। ক্লাস এইট পর্যন্ত তো বিদ্যে, আগে নারান সেনের গাড়ির দরজা খুলে দিত, এখন পতুর গাড়িতে চেপে প্লেয়ার ক্যাচ করে বেড়াচ্ছে। নারানদার আমলে সেক্রেটারির ঘরে না ডাকলে ঘুনু ঢুকতে পারত না। আর এখন ও পতুর চেয়ারেও মাঝে মাঝে বসে। ক্লাবের ডিগনিটি বোধটাই নষ্ট হয়ে গেল এদের জন্য। তোর দশ হাজার টাকা তো আজও পেলি না।"

সমীরণ শুনতে শুনতেই বুঝে গেল সুবোধ ধাড়া তাকে ভাংচি দিতে এইসব বলছে। তার মাথায় দুষ্টুমি খেলল। এইসব লোককে নিয়ে মজা করার সুযোগ চট করে তো পাওয়া যায় না।

"ধাড়াদা, কে যেন বলল, টাকাটা নাকি আপনিই..."

"কী বললি, কী বললি, আমি তোর টাকা মেরেছি? জীবনে আজ পর্যন্ত একটা পাই-পয়সাও কাউকে ঠকাইনি। নিশ্চয় ঘুনু বলেছে। আসলে তোর টাকাটা ঘুনুই সই করে তুলে নিয়েছিল। আমি নিজে ভাউচারে ওর সই দেখেছি।"

"তখন আমায় সেটা, এইরকম একটা ফোন করে জানাননি কেন? না ধাড়াদা, আমাকে এত ভালবাসেন অথচ এই খবরটা আমায় দেননি। যদি দিতেন তা হলে আমি হ্যাঁ বলতাম না।"

"হ্যাঁ মানে! হ্যাঁ ব্যাপারটা কী? ঘুনুকে হ্যাঁ বলেছিস নাকি?"

"বলব না? পৌনে তিন লাখ টাকার অফার পেলে কি না বলব?"

"পউউনে তিন!"

সমীরণ দশ সেকেন্ড কোনও শব্দ পেল না ওধার থেকে। হাসল সে। ওষুধ ধরেছে।

"ধাড়াদা হ্যালো, লাইন ঠিকই আছে, হ্যালো, ঘুনুদা বললেন, গত বছর বুকু যা ধেড়িয়েছে তাতে নাকি আমাকেই এখন সবাই চাইছে। মেম্বার নাকি বলছে হিরো থেকে হিরোইন হয়ে গেছে বুকু দত্ত। এখন যাত্রায় নামুক। পতুদা নাকি বলেছেন ব্ল্যাঙ্ক

চেকে সই করে দিচ্ছি, সমীরণকে এনে দাও। আচ্ছা দেখুন তো কী মুশকিলে পড়লাম। আমি যাত্রীতে গেলে এদিকে বটাদা বলেছেন আমাদের বাড়ির সামনে অনশন শুরু করবেন—আমরণ। কী করি বলুন তো?"

"ঘুনুকে হ্যাঁ বলেছিস মানে ফাইনাল কথা, নাকি ল্যাজে খেলাচ্ছিস?"

"ওহো ধাড়াদা, এখন কি ফাইনাল কথা বলে কোনও কথা আছে? সই করার আধঘণ্টা আগেও তো ডিগবাজি খেয়েছে কত তারকা!"

"এখন কিন্তু ওসব খাওয়ার পথ বন্ধ। অলরেডি বটা আর পতু তাদের খোঁয়াড়ে মাল ভরে ফেলেছে। বুকুও ঢুকে গেছে পতুর বাড়িতে। বাকি যারা রয়েছে তাদের একজন তুই, আশ্চর্য হচ্ছি, বটা এখনও কী বলে তোকে ছেড়ে রেখেছে! তোকে কি সারথির দরকার নেই? বিনু জন তো কাল এসে গেছে, কার্নাইল আজ আসছে, তা হলে কি তোকে আর সারথি রাখবে না?"

সমীরণ কয়েক সেকেন্ডের জন্য কাঠ হয়ে রইল বিনু আর কার্নাইলের খবরটা পেয়ে। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করল, "বিনু যতদূর জানি আসবে না আর কার্নাইলকে পঞ্জাব পুলিশ ছাড়বে না। তবে ইলেকশনে জেতার জন্য বটাদা রটাবে ওদের আনিয়ে ফেলেছে।"

একটা হালকা খিকখিক হাসি সমীরণের কানে ধাক্কা দিয়ে জানিয়ে দিল তার কথা নস্যাৎ হয়ে গেছে।

"তুই বড় ছেলেমানুষ সমীরণ। বিনুকে কাল আমিই আমার বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলে রেখেছি চন্দননগরে। বটাকে ইলেকশনটা জেতাতে হবে যাত্রীর স্বার্থেই তো। আলবুকার্ক সারথিতে আসছে আসছে এমন একটা রব তুলতে হবে। আরে খবরের কাগজ আমার মুঠোয়, রব তুলিয়ে দেব । কার্নাইলের জন্য বটার হয়ে আমি অনেক হেল্‌প ওকে করেছি।"

"কেন করেছেন? পতুদাকে ডোবাবার জন্য?"

"হ্যাঁ।" দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ ফোনের মধ্য দিয়ে সমীরণের কানে সুড়সুড়ি দিল। সুবোধ ধাড়া হঠাৎ যেন খেপে উঠল বলে মনে হচ্ছে। "আর শুনে রাখ, যাত্রীতে তুই যদি আসিস তা হলে তোকেও ডুবতে হবে।"

সমীরণের ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল কথাটা শুনে। সতর্ক হয়ে সে বলল, "পতুদাকে ডোবাতে আপনি কিন্তু যাত্রীরই ক্ষতি করবেন।"

"করব, ক্লাবের জন্য করব। একটা প্ল্যান নেই, পরিকল্পনা নেই, দু'হাতে টাকা ছড়িয়ে শুধু প্লেয়ার ধরছে। এসব ঘুনুর মাথা থেকেই বেরিয়েছে। যত টাকা খরচ হবে ততই ওর হিস্যের টাকাও বাড়বে। এত প্লেয়ার নিয়ে শেষে বিপদে পড়তে হবে। ভাব তুই, লেফ্‌ট ব্যাকই চারজন, মিডফিল্ড ন'জন। এইভাবেই রিক্রুট হচ্ছে, অ্যাডভান্স দেওয়া হচ্ছে। পাগল না হলে এমন কাজ কেউ করে? অজয় বলেছে সমীরণকে আনো। ওর ফার্স্ট চয়েস তুই। যদি তুই ফেল করিস তা হলেই বুকু টিমে জায়গা পাবে। এইভাবে কি টিম তৈরি হয়? তুই ফেল করলে তবেই বুকু টিমে আসবে! যাত্রী কি অজয়ের বাপের ক্লাব?"

"ধাড়াদা আপনি তো ক্লাবের শুভাকাঙ্ক্ষী, বুকুরও গডফাদার। শুনেছি ক্লাব লিগ না পেলে একমাস হবিষ্যি করেন, জুতো পরেন না। তা হলে গত বছর সারথির সঙ্গে লিগ ম্যাচের মাঝখানে বুকুর মায়ের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলে টেলিফোন করে হঠাৎ ওকে মাঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন কেন? বুকু তখন তো বেশ ভালই খেলছিল। হয়তো বহুদিন পর গোলও পেয়ে যেত। নিজের ওপর কনফিডেন্সটা ফিরে পাওয়ার জন্য গোল পাওয়া ওর খুবই দরকার ছিল। সেদিন আপনি একই সঙ্গে বুকুর আর ক্লাবের ক্ষতি করেছেন।"

সমীরণ ধীরস্বরে, মেপে মেপে কথাগুলো বলল মাথা নামিয়ে চোখ বন্ধ করে। একজন ভাল ফুটবলারের সর্বনাশ হওয়া দেখতে তার কষ্ট হয়। ফুটবলার হিসাবে বুকুকে সে সমীহ করত। কিন্তু এখন আর করে না। ক্লাবের রাজনীতিতে ধাড়া গ্রুপের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বুকু নিজের ক্ষতি নিজেই করেছে। এইসব দেখে আর শুনে সারথিতে গোষ্ঠী-ঝগড়া থেকে সমীরণ শত হাত দূরে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে।

"সমীরণ তুই বুদ্ধিমান, শিক্ষিত। নোংরামিতে থাকিস না বলে ময়দানে তোর সুনাম আছে। একটা গরিব ঘরের ছেলে, তিন পুরুষ যা পেত না তাই পেয়ে গেছে সাত-আট বছরে। কম করে লাখ দশেক যাত্রী থেকে আর হাজার তিনেক মাসে মাসে ব্যাঙ্কের চাকরি থেকে। দু'বছর আগেই লক্ষ করেছি বুকুর ভেতর থেকে খেলার ইচ্ছেটা ফুরিয়ে গেছে। ও আর কোনওদিনই খেলায় ফিরতে পারবে না এটা আমি জেনে গেছি বলেই মাঠ থেকে বের করে নেওয়ার জন্য মায়ের হার্ট অ্যাটাকের টেলিফোনটা করিয়েছিলুম। ওর এজন্য কোনও ক্ষতিই হয়নি। কিন্তু আমি যা ঘটাতে চেয়েছিলুম সেটা হয়েছিল। ম্যাচ হেরে গ্যালারিতে আগুন জ্বলেছিল। হয়তো সেদিন বুকু একটা গোল করে ফেলত কিন্তু সেল্‌ফ কনফিডেন্স ও ফিরে পেত না। তা পেতে হলে খেলাকেই ধ্যানজ্ঞান করতে হয়। বুকু আর তা পারবে না বলেই ওকে আমি নিজের কাজে লাগাচ্ছি। আর ও এটা জানে, এখন ওভারটাইম খেটে উপরি আয় করার কাজ যতদিন পারে ওকে করে যেতে হবে। কিন্তু তুই অ্যামবিশাস, ফুটবলে বড় হতে চাস, তুই ডেঞ্জারাস।"

"এটা প্রশংসা, না নিন্দে?"

কথাটায় কান দিল না ধাড়া। শুধু বলল, "যেজন্য ফোন করা, তুই সারথিতেই থেকে যা, তোর দর আমি বাড়িয়ে দেব। যাত্রীতে আড়াই লাখ টাকার অফার পেয়েছিস বলে খবরের কাগজে রটিয়ে দেব। সারথি দু'লাখ অফার দিয়েছে শুনে তো বুকুকে তুলে নিয়ে গেছে পতু। তোকেও বটা তুলবে।"

সমীরণ আবার খিকখিক করে হাসি শুনল। সে দ্বিধাভরে বলল, "দু'লাখ, আড়াই লাখ, এসব কি লোকে বিশ্বাস করবে?"

"করবে কেন, করেছে। আবার বলছি, যাত্রীতে এলে ঝামেলায় পড়বি, খেলতে পারবি না...খেলতে দেব না।"

ওধারে টেলিফোন রাখার আর ডোর-বেল বাজার শব্দ প্রায় একই সঙ্গে হল। বাজার নিয়ে রেখা গুপ্ত আর শ্যামলা ফিরল।

"দাদা তোর কী অসম্ভব লাক্, কতদিন পর আজই কিনা বাজারে শুঁড় থেকে টেইল প্রায় ছ'ইঞ্চি লম্বা বাগদা উঠেছে! 'এ' ব্লকের সেই মেমসাহেব, হাউসকোট পরে যিনি বাজার করেন, তিনি মাছওলার সামনে ঝুঁকে আঙুল দিয়ে বাগদার নাড়ি টিপে টিপে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছিলেন। আর পিসি, চল্লিশ হাত দূর থেকে ভিড়ের মধ্য দিয়ে...এককালে যে বাসকেট খেলত সেটা এবার বিশ্বাস হল।"

"মলা।" রান্নাঘর থেকে গম্ভীর স্বরে ডাক পড়ল।

"না পিসি সবটা আমি বলব না।" শ্যামলা চেঁচিয়ে আশ্বাস দিয়েই সমীরণের দিকে বড় বড় চোখ করে বলল, "অসম্ভব একটা ড্রিবল করে ছুটল। তিন-চারজন ভদ্রলোক ধাক্কা খেয়ে কোনওক্রমে টাল সামলালেন বটে, কিন্তু মেমসাহেবকে নির্ঘাত রেড কার্ড দেখানোর মতো ফাউল পিসি করেছে। সোজা গিয়ে একটা সাইডপুশ, মেমসাহেব দড়াম, এক থাবায় চিংড়িগুলো ধরে পাল্লায় চাপিয়ে দিয়েই পিসি বলল, "ওজন করো, সবগুলো নেব।" এক অ্যাকশনে সব ঘটে গেল। মাছওলা পিসিকে জানে। সে বিনা বাক্যব্যয়ে বাটখারা চাপিয়ে ডিক্লেয়ার করল, "এক কিলো পঞ্চাশ গ্রাম, আশি টাকা আর চার টাকা, চুরাশি টাকা...দু' টাকা কম দেবেন, সমীরণদা কাল ফিরেছেন জানি। মেমসাহেব যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন মাছগুলো আমার থলিতে এসে গেছে।"

"মলা।" আবার রান্নাঘর থেকে।

"এই যাই, আর একটু বাকি আছে পিসি। তারপরই বুঝলি দাদা, মেমসাহেব তো চিৎকার শুরু করলেন। মাছওলা তখন প্রায় ধমকেই তাকে বলল, 'পেনাল্টি বক্সের মধ্যে বল পেয়ে কী করতে হয় সমীরণ গুপ্তর পিসিমা সেটা জানেন, আপনি অত লেট করলেন কেন? টাটকা বাগদা আর আপনি কিনা টেপাটেপি করছেন! ফাস্টাইম শট নেবেন তো!' মেমসাহেব তো মাছওলার কথা কিছুই বুঝলেন না। আর পিসি তো হাতজোড় করে প্রচুর মাফটাপ চেয়ে প্রতিশ্রুতি দিল জীবনে আর কখনও মেমসাহেবকে ধাক্কা মারবে না, এমনকী জীবনে আর কখনও চিংড়ি মাছও কিনবে না বলতে যাচ্ছিল..."

"মলা, মিথ্যে কথা বোলো না।" রান্নাঘর থেকে প্রায় করুণ স্বর ভেসে এল।

"আহা, আমি তো বলেছি বলতে প্রায় যাচ্ছিলে, সত্যিই কি আর বলেছ? আমি যদি তখন 'পিসি ওই দ্যাখো এঁচোড়' না বলতাম তা হলে তো তুমি নির্ঘাত বলেই ফেলতে।"

এই সময় রান্নাঘরের দরজায় এসে রেখা গুপ্ত একটা চিংড়ি তুলে গদগদ স্বরে বললেন, "কী রকম টাটকা বল, আর কত শস্তা, আশি টাকা মাত্র!"

"সর্ষে, বাটা আর কষে ঝাল দিয়ে..." সমীরণ টাকরায় জিভ লাগিয়ে একটা শব্দ করল। বহু...বহুদিন বাগদা খাইনি।"

"না, পিসি, নারকোল আর কিসমিস দিয়ে টক-মিষ্টি মালাইকারি।" শ্যামলা নাকিসুরে আবদার জানাল।

"দাঁড়া, দাঁড়া, এঁচোড় দিয়ে একখানা যা ডালনা..." রেখা গুপ্ত রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

"মলা শিগগিরি গিয়ে ধরে পড়, এঁচোড় ফেচোড় বন্ধ কর।"

"তুই গিয়ে বল।"

ভাইবোনের মধ্যে কথা নিয়ে যখন ঠেলাঠেলি চলছে তখন স্কুটার ফটফটিয়ে হিমাদ্রি বাড়ির সামনে থামল। জিলিপির ঠোঙাটা টেবিলে রেখে, "তিরিশটা আছে, সবার ছ'টা ছ'টা, ইনক্লুডিং বাবা।" তারপরেই একটু উত্তেজিত স্বরে বলল, "ট্যাক্সিটা থামিয়ে দুটো লোক, তারা-মা'র সামনে আমায় জিজ্ঞেস করল, সমীরণ গুপ্তর বাড়িটা কোথায়? দেখে মনে হল যাত্রী কি সারথির দলবদলের পার্টি, বললাম জানি না, ভেতরে গিয়ে খোঁজ করুন। ওরা সুশোভনেই ঢুকল, এক্ষুনি এসে পড়বে। বাইরে গিয়ে কথা বলবি।"

হিমাদ্রির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেই ডোরবেল বাজল। সমীরণ বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল।

দু'জনেই সারথির। বটা বিশ্বাসের বিশ্বস্ত দিলীপ আর বাপি। প্রথমজন তার ব্যক্তিগত কাজগুলো করে, অন্যজন তার দেহরক্ষীর মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। সমীরণের সঙ্গে মৌখিক আলাপ ছাড়া ঘনিষ্ঠতা নেই।

"কী ব্যাপার, আপনারা?"

"বটাদা তোমায় একবার ডেকেছে।" দিলীপ জরুরি ভাব দেখিয়ে বলল, "ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

"কিন্তু আমি তো এখন যেতে পারব না। পিসিমা বাগদা চিংড়ি এনেছেন।" সমীরণের সহজ হালকা গলা।

"মানে!" দিলীপ বুঝতে পারল না।

"পিসিমা বাজার থেকে আমার জন্য বাগদা কিনে এনেছেন। এখন তার খোলা ছাড়াচ্ছেন তারপর রাঁধবেন। সেটা না খাওয়া পর্যন্ত আমি তো বাড়ি ছাড়তে পারব না।" সমীরণ হাসিমুখে বলল কিন্তু অন্য দু'জনের মুখে হাসি ফুটল না।

"বটাদা অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।" দিলীপের গলায় ব্যস্ততা একটু বেশিই ফুটে উঠল।

"মাছফাছ এসে খাবে'খন, আগে বটাদার সঙ্গে কথা সেরে আসবে চলো।" বাপি কেউকেটা ভাব দেখিয়ে দু'পা এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

সমীরণের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে দিলীপের দিকে তাকিয়ে থেকে কাটা-কাটা স্বরে বলল, "পিসিমার রান্না না খেয়ে, কোথাও আমি যাব না। এটা আমার কাছে আপাতত সবথেকে জরুরি ব্যাপার। বিকেলের দিকে বটাদার সঙ্গে দেখা করব, উনি তখন কোথায় থাকবেন?"

ওরা দু'জন একটু অবাক ও কিছুটা বিভ্রান্তি নিয়ে সমীরণের কথা শুনল। বটাদা ডাকছে শুনে আঁকপাক করে দেখা করার জন্য ছুটল না, এমন অদ্ভুত ব্যাপার তারা দেখেনি। কিন্তু সমীরণকে ওরা চেনে। কঠিন গলা ও চাহনি থেকে ওরা বুঝে গেছে এখন একে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

"যাত্রী থেকে কেউ এসেছিল?" দিলীপ নরম স্বরে জানতে চাইল।

"হ্যাঁ। ঘুনু মিত্তির।" সমীরণ জানে সব খবরই এরা পায়।

"অফার দিয়েছে?" দিলীপের নিচু গলা।

"হ্যাঁ, তবে আমি কোনও কথা দিইনি।"

দু'জনেই যেন আশ্বস্ত হল। ওরা জানে সমীরণ ছলচাতুরি করে কথা বলে না।

"বিকেলে বটাদা শোভাবাজারে অভয় কুণ্ডুর বাড়িতে থাকবে, তুমি বাড়িটা চেনো?"

অভয় কুণ্ডু একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিন বছর আগে অনেকের সঙ্গে সে অভয় কুণ্ডুর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। বাড়িটা যে ঠিক কোথায়, তার মনে নেই। তবে মাঝারি একটা রাস্তা থেকে গলির মধ্যে, খুব পুরনো বাড়ি, মোটা দেয়াল, উঁচু সিলিং, শ্বেত পাথরের মেঝের হলঘর, সদর দরজার পাল্লা দুটো খুব ভারী, এইটুকুই মনে আছে।

"জায়গাটা জানি, বাড়িটা মনে নেই।"

"তা হলে ঠিক ছ'টায় শোভাবাজার মোড়ে বাপি অপেক্ষা করবে। তুমি ট্যাক্সি ওখানে থামাবে, ও নিয়ে যাবে অভয়দার বাড়িতে। ঠিক ছ'টায়, পাক্কা?"

"হ্যাঁ যাব।" সমীরণ মাথা হেলাল।

॥ ৬ ॥

সমীরণ পৌঁছেছিল দশ মিনিট দেরিতে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম মানলেও, সর্ষে-কাঁচালঙ্কা মাখানো বাগদাকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়ার জন্য এবং মালাইকারিকে অবজ্ঞা করে রুচিহীনতার কবলে না পড়তে চাওয়ায় সে তার খাওয়ার বিধিনিষেধকে আজ শিকেয় তুলে দেয়। অবশ্য শুধু আজকের জন্যই। মনে মনে শুধু বলেছিল, 'হাজার হোক আমি তো বাঙালিই রে বাবা!' মাছের সঙ্গে ভাতও আনুপাতিক হারে বেশি খেয়ে ফেলায় সমীরণকে একটি ভাতঘুমের সাহায্যও নিতে হয় হাঁসফাঁসানিকে সুস্থির করতে। অতঃপর দশ মিনিট বিলম্বকে সে দেরি মানতে চাইল না। অবশ্য ট্যাক্সিতে উঠে বাপি শুধু একবারই বলেছিল। "আমি সেই সাড়ে পাঁচটা থেকে দাঁড়িয়ে।"

ট্যাক্সিটা শোভাবাজার মোড় থেকে পশ্চিমে গঙ্গার দিকের রাস্তা ধরে এগোল। সমীরণ হাটখোলা পোস্ট অফিসটা দেখে মনে করতে পারল এই পথেই সে গিয়েছিল নেমন্তন্ন খেতে। আর একটু এগিয়ে বাপির নির্দেশমতো ট্যাক্সি ডান দিয়ে একটা রাস্তায় ঢুকল। তারপর বাঁ দিকে একটা কানাগলির মুখে দাঁড়াল।

সামনেই চায়ের দোকান। সাত-আটটি যুবক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর বোর্ড রেখে ক্যারম খেলছিল। ট্যাক্সি থামতেই তিনজন এগিয়ে এল। বিগলিত সম্ভ্রম মুখে মাখানো।

"সমীরণদা এসে গেছে রে...আসুন সমীরণদা।" একজন দরজা খুলে ধরল।

একজন ঝুঁকে হাত বাড়াল নামায় সাহায্য করতে। সমীরণ নামার সময় একমুখ

হাসল কিন্তু হাতটা ধরল না।

"সমীরণদা, লিগটাই হল আসল জিনিস, এবার কিন্তু ওটা চাই। শিল্ড, কাপফাপ হোক বা না-হোক, আপনাকে কিন্তু..."

"আরে, একা কি কেউ লিগ জেতাতে পারে! এগারোজনের খেলা, এতদিন ধরে এতগুলো ম্যাচ, টিম কি সবদিন সমানভাবে খেলতে পারে?" বিব্রতভাবে কিন্তু হাসিমুখে সমীরণ বলল। এই ধরনের কথার সামনে বহুবার তাকে পড়তে হয়েছে। বেশি কথাবার্তায় যেতে নেই। মুখে হাসি মাখিয়ে, "অবশ্যই চেষ্টা করব", এবং "এবার নিশ্চয় লিগ জিতব" ধরনের কথা বলে সে পাগল-সমর্থকদের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে।

"না, সমীরণদা, এ-কথা বললে হবে না, টিম আমাদের এবার খুব ভাল, বিনু জন তো...' আচমকা বাপির ধমক খেয়ে ছেলেটি থতমত হয়ে কথা শেষ করতে পারল না।

"কোথায় কী তার ঠিক নেই, বিনু জন নিয়ে হেদিয়ে মরছে। সমীরণ গুপ্ত থাকতে আর কাকে দরকার?" বাপি উত্তেজিত চোখে কটমটিয়ে তাকাতেই ছেলেটি গুটিয়ে গেল। সমীরণের পিঠে মৃদু ঠেলা দিয়ে বাপি বলল, "চলো চলো, এইসব কিসসু যারা বোঝে না জানে না, এদের সঙ্গে..."

সেই পুরনো বড় বাড়িটাই। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে বিরাট একটা অ্যালসেশিয়ান দেয়ালের কড়ার সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা। উপুড় হয়ে, চোখ বোজানো। পায়ের শব্দে একটা চোখ খুলে শুধু তাকাল। ওঠার সময় সমীরণের মনে পড়ল সুবোধ ধাড়ার কথাটা, "বিনুকে কাল আমিই আমার বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলে রেখেছি চন্দননগরে।" আর এই ছেলেটা সবে যখন বলছিল, "বিনু জন তো," ঠিক তখনই বাপি খিঁচিয়ে উঠে ওর মুখ বন্ধ করে দিল।

বিনুকে আনিয়ে বটা বিশ্বাস তার ওপর চাপ তৈরি করে রাখতে চায়। তারপর আলবুকার্ক, তারপর কার্নাইলও আসবে। একটা বিষাক্ত আবহাওয়া তৈরি করে বটা বিশ্বাস তার দমবন্ধ করে দেবে। পারস্পরিক দোষারোপ শুরু হবে, খবরের কাগজে বেরোবে কে কার বিরুদ্ধে কী বলল আর তার জবাবে আর-একজন কী বলল। মেজাজ নষ্ট হবে, খেলায় স্ফূর্তি আসবে না। সার্পোটাররা অকথ্য ভাষায় গাল দেবে।

হলঘরে দুটো সোফায় চারজন লোক বসে। সমীরণ চারজনকেই চেনে। ক্লাবটা এখন এরাই চালায়। বটা বিশ্বাস হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে একটা টাইপ করা কাগজ পড়ছিলেন। বয়স দেখে মনে হয় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, আসলে পঞ্চান্ন। গোলাকার মুখ, পাঞ্জাবির নীচে পেটের কাছে ফুলে রয়েছে চর্বি, গায়ের রং খুবই ফরসা, ডান হাতের আঙুলে পলা ও পোখরাজ বসানো দুটি আংটি। লোকটি সৌম্যদর্শন, কথা বলেন ধীরে। হাতের কাগজটা রেখে চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে সমীরণের দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে মুখ ভরে গেল অনাবিল হাসিতে।

"কাল এসেছিস অথচ খবর দিসনি। ফোনেও তো জানাতে পারতিস।" সস্নেহ অনুযোগ করলেন বটা বিশ্বাস। নিজের পাশে বসানোর জন্য সোফায় চাপড় দিতে

দিতে বললেন, "বোস, বোস।"

"কাল বাড়ি ফিরলামই তো রাত্রে। খুব টায়ার্ড ছিলাম।" সমীরণ বসার আগেই সতর্কভাবে বলল। বটা বিশ্বাস সব খবরই রাখে সুতরাং আড়াল দিয়ে কথা না বলাই ভাল।

"টায়ার্ড তো হওয়ারই কথা। স্টেশন থেকে দুলালের ব্যাঙ্ক, তারপর দমদমে প্রধান অতিথি, ধকল তো কম নয়।" বটা বিশ্বাস মিটিমিটি হাসছেন।

লোকটার কাছে এইসব খবরও পৌঁছে গেছে! আশ্চর্য বোধ করছে, এটা কোনওভাবেই যাতে মুখে ফুটে না ওঠে সমীরণ সেই চেষ্টায় সফল হল। মুখটা ব্যাজার করে বলল, "তার ওপর রাতে আবার ঘুনুদার ঘ্যানঘ্যানানি শুরু হল।"

বটা বিশ্বাস বিস্ময় প্রকাশ করলেন না ঘুনু নামটা শুনে। ঘুনু প্রসঙ্গ না তুলে খুবই স্বাভাবিক গলায় বললেন, "এ-বছর সারথিতেই তো থাকবি?"

প্রশ্ন বা উৎকণ্ঠা নয়, বটা বিশ্বাসের বলার ভঙ্গিটা যেন একটা বিবৃতি শুরু করার মতো। "প্রচুর দেনা রয়ে গেছে গত বছরের। এই দ্যাখ, ব্যাঙ্ক তাগিদ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। কী ভাবে যে এবার টিম করব ভেবে পাচ্ছি না।"

"সুদে-আসলে এগারো লাখ ব্যাঙ্ক এখন পাবে।" শুকনো গলায় বটা বিশ্বাসের পাশে বসা সহসচিব অপূর্ব মজুমদার বললেন।

সমীরণ এই ধরনের কথা গত বছরও দলবদলের আগে শুনেছে। তখন ধারের অঙ্কটা ছিল আট লাখ। এখন যে কাগজটা দেখাল সেটা সত্যিই ব্যাঙ্কের চিঠি কি না তাতে সন্দেহ হলেও সে চুপ করে রইল।

"তুই তো ঘরের ছেলে, যা দেব তাই নিবি সোনামুখ করে। কিন্তু সবাই তো তা নয়।"

"সবাই তো সমীরণ গুপ্ত নয়।" অন্য সোফায় বসা অভয় কুণ্ডু নিজেকে তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলেন বটা বিশ্বাসের সঙ্গে।

"তুই ছিলিস না, কী অসুবিধেয় যে পড়েছিলাম। কাকে কাকে নেব, কাকে কাকে ছেড়ে দেব, এই নিয়ে কথা বলার লোকই পাচ্ছিলাম না। নির্মলকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বিপ্লব বোস, গৌতম চ্যাটার্জিকে যাত্রী থেকে নিতে বলল। বোঝ, ও দুটো কি প্লেয়ার! একটার তো ডান পা বলে কিছু নেই, শুধু পারে লম্বা লম্বা দৌড়। আর অন্যটা ফুলবাবু, সাজিয়েগুজিয়ে পায়ে বল পৌঁছে দিলে তবেই তিনি নড়বেন। মডার্ন ফুটবল এইসব প্লেয়ার দিয়ে কি খেলা যায়?"

বটা বিশ্বাসের মুখে "মডার্ন ফুটবল" কথাটা শুনে সমীরণ হাসি চাপল।

"মডার্ন ফুটবলে সারাক্ষণই তো দৌড়াদৌড়ি করতে হবে," অভয়ের সংযোজন।

সোফায় বসা চতুর্থজনের দিকে মাথা হেলিয়ে বটা বিশ্বাস বললেন, "পুলকেশবাবু ছোট টিমের চারটে ছেলের নাম দিয়েছেন। ওদের অ্যাডভান্স করা হয়ে গেছে।"

"বাইরে থেকে কাকে পাচ্ছেন, কার্নাইলের ট্রান্সফার নিয়ে নাকি প্রব্লেম হচ্ছে?" সমীরণ জানতে চাইল। দল গড়ার ব্যাপারে গত তিন বছরে কখনও তার মতামত বা পরামর্শ কেউ নেয়নি। এইবার তাকে খাতির দেখাবার এই ভানটায় তার ভেতরটা

কাঠ হয়ে উঠল।

"কার্নাইলের কেসটা একটু কমপ্লিকেটেড। এ আই এফ এফ জানিয়েছে, কার্নাইল ওর অফিস থেকে লোন নিয়েছে, টাকা শোধ না করা অবধি রিলিজ অর্ডার দেবে না। সরকারি অফিস তো, তাই ফ্যাচাং আছে। আলবুকার্কের এগেনস্টে রয়েছে সন্তোষ ট্রফির খেলায় রেফারির ম্যাচ রিপোর্ট। আর বিনু জন ইন্টার স্টেট ট্রান্সফার চেয়েছে বাংলা আর মহারাষ্ট্রে। এটা তো হয় না। দুটো স্টেটে খেলতে চাইলে পারমিশন দেবে কী করে?" বটা বিশ্বাস অসহায়ভাবে সবার মুখের দিকে একবার করে তাকালেন। সবাই মাথা নেড়ে তাদের অসহায়তাও বুঝিয়ে দিল।

সমীরণ খটকায় পড়ে গেল। সুবোধ ধাড়া যে বললেন বিনু এসে গেছে? কিন্তু উনি তো বাজে কথা বলার লোক নন। ঠিক এই সময়ই বছর-বারোর একটি ছেলে ভেতর থেকে হলঘরের দরজায় এসে বলল, "বাবা, চন্দননগর থেকে একজন ফোন করেছে।"

অভয় কুণ্ডু প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন। হাত তুলে তাকে নিরস্ত করে বটা বিশ্বাস সোফা থেকে উঠলেন। "ব্যস্ত হতে হবে না, আমিই ধরছি।"

বটা বিশ্বাস ফোন ধরতে গেলেন। ঘরে সবাই চুপ করে বসে রইলেন। নীরবতা অস্বস্তিকর লাগায় সমীরণ অভয় কুণ্ডুকে বলল, "সুখেনদা থাকছেন তো?"

সুখেন কর সারথির কোচ। বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, দরদি। কথা কম বলেন এবং ডিসিপ্লিন সম্পর্কে নোভাচেকের মতোই কঠোর। গত বছর মাঠে এসেও, শরীর ভাল নেই বলে ট্রেনিংয়ে না নামায় দুলাল চক্রবর্তীকে সাতদিন ট্রেনিং করতে দেননি সুখেন কর। তাই নিয়ে জোট বেঁধে দুলালের নেতৃত্বে কয়েকজন বয়স্ক ফুটবলার ছোটখাটো একটা বিদ্রোহ করে ফেলেছিল। বটা বিশ্বাসের মধ্যস্থতায় বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

"নিশ্চয়। সুখেন কর ছাড়া আর কারও কথা আমরা ভাবছিই না। তবে নির্মাল্যরা চাইছে হেমন্ত গাঙ্গুলিকে। আরে, যার কোনও কোচিং ডিগ্রি-ডিপ্লোমা নেই সে কিনা সারথির মতো ক্লাবে কোচ হবে!" অভয় কুণ্ডু আকাশ থেকে পড়তে শুরু করলেন।

সমীরণের মনে পড়ল, সুবোধ ধাড়াও ঠিক একই ভাবে অজয় তালুকদারকে যাত্রীর কোচ করার বিপক্ষে এই যুক্তিটাই দিয়েছিলেন। একই মানসিকতা দুটো ক্লাবে। ডিগ্রি-ডিপ্লোমার প্রতি এত ভক্তি, মডার্ন ফুটবলের জন্য এত ব্যাকুলতা অথচ ক্লাব চালাতে লক্ষ-লক্ষ টাকা দেনা না করে এরা থাকতে পারে না।

"অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে কি হায়ার সেকেন্ডারি ফেল-মারা কোনও ছাত্রের পড়ার সুযোগ পাওয়া উচিত? যদি পায় বুঝে নিতে হবে, সে সুযোগ পাচ্ছে খুঁটির জোরে, নিয়মবহির্ভূতভাবে। হেমন্ত সম্পর্কে আমার কোনও অ্যালার্জি নেই। কিন্তু আমাদের তো সারথির স্বার্থের কথাটাই ভাবতে হবে। ও যখন যাত্রীতে খেলত তুই তখন গড়ের মাঠ চোখে দেখিসনি। তখন সারথিকে একটা ম্যাচে দু'গোল দিয়েছিল। আমাদের মেম্বার গ্যালারির দিকে কী অশ্লীল অসভ্য অঙ্গভঙ্গি যে হেমন্ত সেদিন করেছিল তা আজ পনেরো-ষোলো বছর পরও চোখে ভাসছে। ওর পরিচয় তো যাত্রীর ছেলে হিসাবেই, সারথির মেম্বাররা ওকে মোটেই মেনে নেবে না।"

"মেম্বার চায় ট্রফি।। ট্রফি পাইয়ে দিলে কোচ কার ছেলে কার নাতি এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।" সমীরণ বিরক্তি চেপে বলল।

এবার পুলকেশবাবু আসরে নামলেন। চাপা গলায়, খুবই গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "বাংলার কোচ হয়ে হেমন্ত সন্তোষ ট্রফি নিয়ে এল মাদ্রাজ থেকে, সে তো স্রেফ চুরি করেই, বাঁকা পথে। এখন এ আই এফ এফ সেক্রেটারি পদ্মনাভন তো মাদ্রাজেরই লোক। সে তো বলেইছে, বাংলাকে এর মাশুল গুনতে হবে। সেই হেমন্তকে সারথির কোচ করলে, তুমি কি ভেবেছ পদ্মনাভন খুব গদগদ হয়ে আমাদের সুনজরে দেখবে?"

"কার্নাইল, আলবু, বিনুর ক্লিয়ারেন্সে নো অবজেকশন লিখে দেবে?" অভয় কুণ্ডুর সংযোজন।

ঘরে ফিরে এলেন বটা বিশ্বাস। ওরা দু'জন জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। সমীরণকে একপলক দেখে নিয়ে বটা বিশ্বাস বললেন, "না, তেমন কিছু নয়। ওখানে থাকতে একটু অসুবিধে হচ্ছে...কলকাতায় আসতে চায়। হ্যাঁ, ভাল কথা সমীরণ, ঘুনু তোকে যে অফার দিয়েছে, জানি, আমি জানি কত টাকা বলেছে, কিন্তু অত টাকা সারথি তোকে দিতে পারবে না।" বটা বিশ্বাস ব্যাঙ্কের চিঠিটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে হাতে রেখে বললেন, "গতবারের থেকে বিশ হাজার বেশি দেব।"

"তার মানে পুরো দেড় লাখ।" অভয় কুণ্ডুর সংযোজন।

সমীরণ তখন মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। তার মাথায় ঘুরছে চন্দননগরের ফোন। বিনু জনই করেছে। ধাড়াদা বাজে কথার লোক নন। ওখানে বন্ধুর বাড়িতে তিনিই বিনুকে তুলে রেখেছেন।

"তোকে কবে ক্যাম্পে ফিরতে হবে?" বটা বিশ্বাস জানতে চাইলেন।

"বাইশের মধ্যে কোঝিকোড় ফিরতে হবে।"

"তা হলে তো আর মাত্র ক'টা দিন।" পুলকেশবাবু ক্যালেন্ডার খুঁজতে লাগলেন দেয়ালে।

"বটাদা, যাত্রী কিন্তু আমায় অনেক বেশি অফার দিয়েছে।"

"দিক না, দেবী আর রণেনকেও তো দু'লাখ আশি হাজার করে অফার দিয়েছে, ওরা তিন লাখ করে চেয়েছে। পতু ঘোষ ভাববার জন্য সময় নিয়েছে। আমি সময় টময় নিইনি। দু'জনকেই বলেছি দু'লাখ দশ হাজার, অ্যাডভান্স চল্লিশ হাজারের চেক এখুনি দেব। ওরা চেক নিয়ে গেছে।"

"চেক নিয়ে গেছে?" সমীরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"শুধুই কি নিয়ে গেছে, খবরের কাগজে স্টেটমেন্ট গিয়ে দেবী বলেছে, শত প্রলোভনেও দল ছাড়ছি না, ক্লাব এখন রক্তে মিশে গেছে। হ্যাঁ, ক্লাব যদি অবহেলা করত তা হলে একটা কথা ছিল। কিন্তু যেভাবে গুরুত্ব পাচ্ছি তাতে আমাদের ক্ষোভ থাকার কথা নয়। আমাদের অনুরোধেই সুখেনদাকে কোচ করা হয়, প্রতি ম্যাচে দল গড়ার সময় আমাদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে, এবারেও ক্লাব নির্বাচনের ডামাডোলে কর্তারা ব্যস্ত কিন্তু আমাদের অনুরোধ মেনে চল্লিশ হাজার করে ধার চাইতেই বটাদা

ধার দিয়ে দিলেন...”

মৃদুমন্থর কণ্ঠ পুলকেশবাবুর কথা কেড়ে নিয়ে অভয় কুণ্ডু উচ্চগ্রামে বেগসঞ্চার করে যোগ করলেন, “এত গুরুত্ব, এত ভালবাসা আর কোথায় পাব, টাকাটাই তো জীবনের সব নয়, লক্ষ লক্ষ সারথি সমর্থকের ভালবাসার দাম কি টাকায় হয়?” অভয় কুণ্ডু নিজেকেই প্রায় হাততালি দিয়ে ফেলছিলেন। সেটা না করে, বটা বিশ্বাসের দিকে আপ্লুত চোখে শুধু তাকালেন।

শুনতে শুনতে নিলু গড়গড়ির বক্তৃতা সমীরণের মনে পড়ছিল। কলকাতার ফুটবল মরে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। গড়গড়ি বলেছিলেন, গত বছর কাগজে পড়ি একজন বড় প্লেয়ার ক্লাবে থেকে যাবে বলে অ্যাডভান্স নিয়ে বলেছিল এই ক্লাবের তাঁবু তার কাছে মন্দিরের মতো কিন্তু তিনদিন পরই সেই ফুটবলার আর এক ক্লাবের এক কর্তার ফ্ল্যাটে গিয়ে টাকাপয়সা নিয়ে দরাদরি করছে। এটাই হল দুর্গন্ধ।

সমীরণের গা গুলিয়ে উঠল। গত বছরের ওই ফুটবলারটি আর কেউ নয়, দেবী। তার মনে হল, পুরনো এই বাড়ির হলঘরটা যেন একটা মর্গ, শবাগার। এই লোকগুলো এক একটা ডোম। এখান থেকে বেরিয়ে না গেলে সে বমি করে ফেলবে।

“যাত্রীকে গিয়ে কিন্তু তুই খেলতে পারবি না। বিরাট ঝগড়া, গোলমাল, কামড়াকামড়ি চলছে, সারা বছরই চলবে। তোর খেলা ও-ক্লাবে গেলে শেষ হয়ে যাবে। টাকা কম দেবে সারথি, তোর দামের থেকে অনেক কম। এখানে কিন্তু নিজের খেলাটা খেলতে পারবি।” বটা বিশ্বাস তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। সমীরণ মাথা নিচু করে দ্রুত ভেবে চলেছে। বটা বিশ্বাস ধরে নিলেন, এই নীরবতার অর্থ, সম্মতি।

“ওপরের তিনটে ঘরে এখন রয়েছে প্রফুল্ল, মানিক, অরবিন্দ আর সতু। তুই প্রফুল্লের ঘরে চলে যা। প্রথম দিন এখান থেকেই সই করতে যাবি। তোকেও অ্যাডভান্স দিচ্ছি চল্লিশ হাজার।”

সমীরণ শুনতে শুনতে থ’ হয়ে গেল। এখানে বন্দি হয়ে থাকতে হবে! ব্যাপারটাই তো লজ্জার, অপমানেরও। সে কি গাধা না গোরু? তাকে বিশ্বাস করে এরা ছেড়ে রাখতে চায় না।

“এখানে বাপির ছেলেরা রয়েছে। যাত্রী কোনওরকম হাঙ্গামা হুজ্জুত করতে আসবে না, তা হলেই চেম্বার বেরোবে এটা ওরা জানে। তোফা খাবিদাবি, ঘুমোবি, ভিডিও-র সিনেমা দেখবি, পঞ্চাশটা হিন্দি-ইংরেজি মারপিটের ফিল্মের ক্যাসেট রয়েছে, কত দেখবি দেখ না! একদমই বোর লাগবে না।” গৃহকর্তা অভয় কুণ্ডু দরাজ স্বরে আতিথ্য গ্রহণের আহ্বান জানালেন।

“বটাদা, পিসিমার সঙ্গে কথা না বলে এখন আমি কথা দিতে পারব না।”

বটা বিশ্বাসের ভ্রু কুঁচকে উঠেই স্বাভাবিক হয়ে গেল। “এজন্য তোকে পিসিমার সঙ্গে কথা বলতে হবে?”

পুলকেশবাবু বলে উঠলেন, “তা কী করে হয়।”

অভয় কুণ্ডু বললেন, “টেলিফোনে কথা বলে নে।”

“না, এসব কথা টেলিফোনে হয় না। আমাকে বাড়ি যেতেই হবে।” সমীরণের

দৃঢ়স্বর বুঝিয়ে দিল তার সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না।

"তা হলে পিসিমার সঙ্গে কথা বলে আয়। অভয়বাবু, বাপিকে ডাকুন একবার, সমীরণকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার সঙ্গে করেই নিয়ে আসুক।" বটা বিশ্বাসকে হঠাৎ ক্লান্ত দেখাল।

"আজ রাতে আর আসা সম্ভব নয়, কাল সকালে এসে আপনাকে জানাব।" সমীরণ উঠে দাঁড়াল।

"তা হলে বাপির ছেলেরা সারারাত তোর বাড়ির সামনে পাহারা দেবে। না, না। অন্য কিছু নয়। ওরা সারথিকে যেমন ভালবাসে তেমনই তোকেও। তোর জন্য ওরা প্রাণ দিতেও পিছপা হবে না, তেমনই প্রাণ নিতেও। তুই সারারাত নিশ্চিন্তে থাকবি।" বটা বিশ্বাস সোজা সমীরণের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শীতল দৃষ্টিতে। সমীরণ চোখ সরিয়ে নিল না। নিরুচ্চার একটা চ্যালেঞ্জ বিনিময় ঘটল।

অভয় কুণ্ডুর অ্যাম্বাসাডরের পেছনের সিটে সমীরণ আর বাপি, ড্রাইভারের পাশে নারান নামে একটি ছেলে। পেছনে একটা ট্যাক্সিতে আরও তিনজন।

সিগারেট বের করার ছলে বাপি বুশশার্ট তুলে প্যান্টে গোঁজা পিস্তলটা বের করে সিটে রাখল।

"ওটা দেখাবার দরকার নেই, যথাস্থানে রেখে দাও।"

"না না, তোমাকে দেখাচ্ছি না।" বাপি অপ্রতিভ হয়ে ওটা তুলে নেয়। "তোমার জন্য তো নয়, নিজেদের সেফটির জন্য এটা রাখতে হয়।"

এর পর সারা পথটাই সমীরণ সিটে হেলান দিয়ে বাঁ হাত কপালের ওপর রেখে চোখ বুজে রইল।

বাপি আর নারান মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে কথা বলেছিল কিন্তু সমীরণের কানে তার একটা শব্দও ঢোকেনি।

॥ ৭ ॥

মোটর থেকে নেমেই সমীরণ ফটক খুলে ভেতরে এসে ডোর-বেলের বোতাম টিপল। সব জানলায় পরদা টানা, খাবার দালানে শুধু আলো। পেছনে তাকিয়ে দেখল ফটকের সামনে পাঁচজন দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। সময় দেখার জন্য বারান্দার কিনারে এসে রাস্তার আলোয় বাঁ হাতটা তুলল। আটটা বেজে দুই।

রাস্তা নির্জন। এখন টিভি-তে সিনেমা দেখানো হচ্ছে তাই একেবারেই শুনশান। তাদের দু'পাশের বাড়িগুলোর জানলা বন্ধ মশাদের ঢোকা আটকাতে।

আবার সে বেল বাজাল। বাড়িতে কি কেউ নেই? দরজার পাল্লায় কান লাগিয়ে সাড়াশব্দ পাওয়ার চেষ্টা করল। পিসির ঘরে বসে সবাই টিভি দেখতে থাকলে, অন্তত হিন্দি সিনেমার নাচগান কি মারপিটের আওয়াজ তো ভেসে আসবে। তাও আসছে না। টিভি বন্ধ।

হঠাৎ দরজার পাল্লা খুলে গেল। সুনীলবরণ। বাবাকে দেখে সমীরণ হতভম্ব।

"কী ব্যাপার, আপনি? ওরা সব গেল কোথায়?" একবার পেছনে তাকিয়ে, ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সমীরণ বলল। সব ঘর অন্ধকার, শুধু আলো জ্বলছে খাবার দালানে।

"কানু, মলা আর রেখা গেছে অনিরুদ্ধ ভটচাজ মশায়ের বাড়িতে। ভদ্রলোক সাইকেলের ধাক্কায় পা ভেঙেছেন বিকেলে। ওরা দেখতে গেছে।" সুনীলবরণ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলেন।

সমীরণ দ্রুত ভাবতে শুরু করল। এখন কী করা যায়। কার্যত সে এখন গৃহবন্দি। বাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই ওরা তাকে জোর করে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবে। সকালে ওদের পাহারাতেই বটা বিশ্বাসের খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকতে হবে।

অসম্ভব।

যদি বলি সারথিতে খেলব না, তা হলে জোর করে আটকে রাখতেও পারে। কিন্তু বাইশের মধ্যেই তাকে কোঝিকোড় পৌঁছতে হবে, যেভাবেই হোক। ইন্ডিয়া টিমের জন্য ক্যাম্প তো টানা সারা বছর ধরে চলবে না, প্লেয়ারদের ছেড়ে দেবে। তখন কলকাতায় এসে খেলতেই হবে। সমীরণ দোটানায় পড়ল। খেললে হয় সারথিতে, নয় যাত্রীতে। দুটো ক্লাবের যেটাতেই সে খেলুক, আই এফ এ-তে নাম রেজিস্টার্ড করতেই হবে। সে শুনেছে ক্যাম্পের প্লেয়ারদের অন্য নিয়ম হয়েছে নির্দিষ্ট দিনের পরেও এটা করা যাবে।

সে ঘরে গিয়ে সন্তর্পণে জানলার পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাল। একজনকে দেখতে পেল, রাস্তার ওধারে রঙের ব্যবসায়ী অমিয় চাটুজ্যের ফটকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। বাকি চারজনকে সে দেখতে পেল না। বোধ হয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একসঙ্গে সবাই জটলা করলে লোকে সন্দেহ করতে পারে ডাকাত বলে। তবে সমীরণ নিশ্চিত, এখানকার সব লোকই শিক্ষিত, অতএব ডাকাত ধরার চেষ্টা করবে না। সেজন্য একটু সাহস দরকার।

কিন্তু এভাবে কোনও ক্লাবে খেলার কথা এখন সে ভাবতে পারছে না। যদি সকালে ওদের সঙ্গে যেতে সে অস্বীকার করে? সমীরণ বুঝে উঠতে পারছে না, তা হলে কী ঘটনা তখন ঘটতে পারে। শুনেছে বছর ছয়েক আগে নাকি হেদায়েত আলিকে নিয়ে এইরকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল। যাত্রীতে যেতে চেয়েছিল হেদায়েত, জুপিটার তাকে সুবোধ ধাড়ার পটলডাঙার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছল বোমা ফাটিয়ে। রাস্তার একটা লোক তাইতে মারাও যায়। ধাড়ার একতলাটা তছনছ করে দিয়েছিল।

যদি এরাও তাই করে। সমীরণের মাথার মধ্যে অসাড় হয়ে আসছে। অন্ধকার ঘরে খাটে বসে সে দু'হাতে মাথা চেপে ধরল। কেউ তাকে চাপা স্বরে এখন পরামর্শ দিল, "পালিয়ে যা, এখান থেকে যেভাবেই হোক, পালিয়ে যা। আজ রাতেই।" বটা বিশ্বাসের কথাটা এখন ভীষণভাবে তার মনে পড়ল। "তোর জন্য ওরা প্রাণ দিতেও পিছপা হবে না। তেমনই প্রাণ নিতেও।" কথাগুলোর মানে খুবই স্পষ্ট।

বাবা, পিসিমা, কানু, মলা এদের আহত রক্তাক্ত দেহ পলকের জন্য তার চোখে

ভেসে উঠেই অদৃশ্য হল। সে ফিসফিসিয়ে নিজেকেই বলল, "আমার জন্য এরা কেন বিপদে পড়বে? হতে পারে না, তা হয় না। এদের বাদ দিয়ে আমি কেউ নই, আমার কোনও অস্তিত্বই থাকবে না।"

সমীরণ খাট থেকে উঠে আবার পরদা সরিয়ে দেখল। একজনও নেই। ব্যাপার কী! ওরা কি চলে গেল? দোতলার ছাদে গিয়ে কি একবার দেখবে? এইসব যখন সে ভাবছে, তখন ধীর গতিতে কথা বলতে বলতে দু'জন বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। একজনকে সে চিনল, নারান।

ওরা তা হলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারারাতই কি ওরা ঘুরবে? সমীরণ ভেবে কূলকিনারা পেল না। সে পায়চারি শুরু করল।

হঠাৎ ডোর-বেল বেজে উঠল। সমীরণ লাফ দিয়ে পরদা সরিয়ে তাকাল। রাস্তা ফাঁকা। টিভি-তে হিন্দি খবর পড়ার শব্দ আসছে। বারান্দায় একটা কোণ দেখা যায় কোনওক্রমে। তার মনে হল পিসিরা বোধ হয় ফিরল।

দ্বিতীয়বার বেল বাজার সঙ্গেই দরজা খুলল সমীরণ। পিসি, মলা আর কানু দাঁড়িয়ে। প্রথমেই সে তিনজনের পেছনে ফটকের দিকে তাকাল। মনে হল রাস্তায় কেউ একজন সরে গেল।

"আর বলিসনি, ভটচাযদার যা কাণ্ড! পায়ের ওপর দিয়ে সাইকেল রিকশার চাকা চলে গেছে!" রেখা গুপ্ত হাসি চাপতে চাপতে বললেন।

"এমন চেঁচাচ্ছেন যেন পা'টা দু'খণ্ড হয়ে গেছে।" শ্যামলা বলল।

"দাদা, তোর কথাবার্তার কতদূর? কত অফার দিল?" হিমাদ্রি জানতে চাইল।

"বোসো সবাই। বিপদ হয়েছে। রাস্তায় কি কাউকে ঘুরে বেড়াতে দেখলে?" সমীরণের চাপা স্বর আর উৎকণ্ঠিত মুখ দেখে তিনজনের মুখের ভাবও বদলে গেল।

"কেন, কী বিপদ হয়েছে? রেখা গুপ্তর গলা অজানা ভয়ে কেঁপে গেল।

"রাস্তায় দুটো লোক দেখলাম আমাদের পেছন পেছন আসছিল। আর ওই মোড়ে কুকুরওলা বাড়ির কাছে একটা লোক ছিল। তা ছাড়া তো আর কাউকে দেখলাম না!" শ্যামলা মনে করার চেষ্টা করতে করতে বলল।

"ওই লোকগুলো গুণ্ডা, পাঁচজন রয়েছে, বটা বিশ্বাসের লোক ওরা, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।"

"অ্যাঁ, কেন?"

"আস্তে কথা বলো, পিসি।" শ্যামলা চাপা ধমক দিল।

"ওরা সারারাত আমার ওপর নজরদারি করবে। কাল সকালে আমাকে সঙ্গে করে আবার বটা বিশ্বাসের কাছে নিয়ে যাবে।"

"কেন?" হিমাদ্রি জানতে চাইল।

"আমাকে সারথিতেই খেলতে হবে। ওরা ছাড়বে না। পিসির সঙ্গে কথা বলে কাল সকালে জানাব এই কড়ারে বাড়ি এসেছি। ওরা সঙ্গে এসেছে। পাছে আমি পালিয়ে যাত্রীর ঘরে গিয়ে উঠি, তাই সেটা আটকাবার জন্য ওরা রয়েছে। একজনের কাছে পিস্তল আছে দেখেছি।" সমীরণ ধীর নিচু গলায় কথাগুলো বলল। কেউ কোনও কথা

বলল না। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং চমকে কথা বলার অবস্থা কারও নেই।

"এটা কি মগের মুল্লুক?" হিমাদ্রি গজরে উঠল। "আমার ইচ্ছেমতো কি কোথাও খেলতে পারব না। ঘাড় ধরে খেলাবে আর আমায় খেলতে হবে?"

সমীরণ ভাইয়ের মুখের দিকে শুধু নীরবে তাকিয়ে রইল। রেখা গুপ্ত ব্যাকুলভাবে বললেন, "পুলিশে খবর দিলে হয় না?"

"পুলিশ কী করবে?" সমীরণ বলল।

"ওদের অ্যারেস্ট করবে।"

"কোন অপরাধে?"

"তোকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে বলে।"

"প্রমাণ কই যে, ধরে নিয়ে যেতে এসেছে? পুলিশ শুধু তো অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারে না।" সমীরণকে হতাশ দেখাল। "তা ছাড়া ওরা তোমাদের ওপরও হামলা করতে পারে। আমি যদি এখন পালিয়ে যেতে পারতাম—।"

"আচ্ছা পিসি, তোমাদের জি. সি. দত্ত তো পুলিশ অফিসার ছিলেন, ওঁকে বলে দেখলে হয় না?" শ্যামলা বলল।

"তিনি কী করবেন?" হিমাদ্রি কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যভরে জানতে চাইল।

"উনি তো বলেন খোকাগুণ্ডা না কাকে যেন পিস্তল সমেত ধরে ফেলেছিলেন। তা এখানেও তো পিস্তল নিয়ে একজন রয়েছে, তাকে এসে ধরুন না, আর দাদাও বাড়ি থেকে সেই ফাঁকে বেরিয়ে যাবে।" শ্যামলা খুব সহজ একটা সমাধান পেশ করে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগল।

"এই রাতে বেরিয়ে কোথায় যাবে?" হিমাদ্রি বিশদ হতে চাইল।

"কোথাও একটা.এখানেই কারও বাড়িতে।" আমতা আমতা করে শ্যামলা বলল।

"তারপর?" সমীরণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"মলা ঠিকই বলেছে, দত্তবাবু ধরুন বা না-ধরুন, ওদের ভয় তো দেখাতে পারবেন।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই রেখা গুপ্ত ফোনের কাছে উঠে গেলেন।

"পিসি তুমি এদের চেনো না।" সমীরণ উঠে এল। "এদের ভয় দেখানো দত্তবাবুর কর্ম নয়।"

রেখা গুপ্ত ততক্ষণে ডায়ালে পঞ্চাশ সংখ্যাটি ঘুরিয়ে ফেলেছেন। সমীরণ হালছাড়া ভাবে ঘরে এসে পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওদের কাউকে দেখতে পেল না। তার বদলে স্বামী-স্ত্রী আর একটা বাচ্চা ছেলেকে হেঁটে যেতে দেখল। ছাদে গিয়ে পাঁচিলের আড়াল থেকে কাউকে দেখা যায় যদি, এই ভেবে সে সিঁড়ির দিকে এগোল। পিসির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে শুনল—"তা হলে আর বলছি কী, দারুণ গুপ্তা, আপনি যেমনটি পছন্দ করেন ঠিক সেইরকম।"

"পিসি বলো পিস্তলও আছে।" শ্যামলার ব্যগ্র স্বর।

"না, ওসব বললে দত্তবাবু খেপে যেতে পারেন।" রিসিভারে হাতচাপা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে পিসিকে বলতে শুনল সমীরণ, সিঁড়িতে ঘোরার সময়।

সুনীলবরণের ঘরের দরজায় পরদা ঝুলছে। সামান্য ফাঁক, তার মধ্যে দিয়ে একনজরে সমীরণ দেখতে পেল টেবিলে ঝুঁকে বাবা কিছু লিখছেন। মোটা দু'খানা বই খোলা রয়েছে। সন্তর্পণে দরজা পার হয়ে গুঁড়ি মেরে সে চোখ দুটি শুধু পাঁচিলের কিনারে রাখল।

বাঁ দিক থেকে তিনজন বেড়াবার মতো শ্লথভঙ্গিতে আসছে। দূর থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এল, "অ্যাই, অ্যাই।"

ওরা তিনজন ঘুরে দাঁড়াল। সমীরণ মুখটা একটু তুলে দেখতে পেল, লুঙ্গি আর গেঞ্জিপরা জি. সি. দত্তর দশাসই চেহারাটি বেগিং-এর গতিতে এগিয়ে আসছে।

"কে তোমরা, এখানে এত রাতে কী করছ?" দত্তর উচ্চ স্বরে দুটো বাড়ির বারান্দায় লোক টেনে আনল, একতলার জানলা খুলিয়ে দিল।

তিনজন কী জবাব দিল সমীরণ তা শুনতে পেল না। দত্ত যে জবাবে একদমই সন্তুষ্ট হননি, সেটা তাঁর আচরণে প্রকাশিত হল। খপ করে তিনি পুলিশি কায়দায় দু'জনের জামার কলার ধরলেন।

"আমাকে ধোঁকা দেবে? তোমাদের উদ্দেশ্য আমি বুঝিনি ভেবেছ? এত বছর পুলিশে—" কথা অসমাপ্ত রেখে জি. সি. দত্ত হঠাৎই কণ্ঠস্বর বদলে, "অ্যাই, অ্যাই কী হচ্ছে!" বলতে বলতে দু'হাতে লুঙ্গি চেপে ধরলেন। তারপরই "য়্যা-আ-আ" ধরনের একটা শব্দ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত মাথার ওপর ওঠালেন। লুঙ্গিটি তখন তাঁর পায়ের গোছে নেমে এল।

জি. সি. দত্ত কাতরকণ্ঠে কী যেন বললেন। বাপির গলা শোনা গেল, "তুলে বেঁধে দে।"

একজন লুঙ্গিটা তুলে দত্তর কোমরে গ্রন্থিবদ্ধ করে দিল। সমীরণ এইবার দেখতে পেল বাপির হাতের পিস্তলটা। বাপি কিছু একটা বলল। দত্ত দু'হাত তোলা অবস্থাতেই ঘুরলেন। এই সময় দোতলার বারান্দাগুলো নিমেষে নির্জন হয়ে গেল, জানলার পাল্লাগুলো ফট ফট শব্দে বন্ধ হল। বাপি ঝুঁকে দত্তর কানে কিছু বলেই পিস্তলের নলটা দিয়ে খোঁচা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে জি. সি. দত্ত দু'হাত তুলে বাড়িমুখো রওনা হলেন। একটা ব্যাপার সমীরণ বুঝতে পারছে, জি. সি. দত্ত পরোপকারী, আন্তরিক, দরাজ মানুষ, না হলে এইভাবে, ফোন পাওয়ামাত্রই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছুটে আসতেন না। কিন্তু পরিবর্তিত বাস্তবের সঙ্গে ওঁর তেমন কোনও যোগ নেই। উনি এখনও খোকাগুণ্ডার আমলেই রয়ে গেছেন, বাপিগুণ্ডাদের সম্মুখীন কখনও হননি।

ডান দিক থেকে দু'জন আসছে। সমীরণ মুখটা নামিয়ে নিল। তাদের বাড়ির সামনেই পাঁচজন দাঁড়াল। হাসাহাসি করল। একজন বলল, "আরে, এখানে শিক্ষিত লোকেরা থাকে। কেউ ঝামেলা করবে না।"

আর-একজন বলল, "বাপিদা খিদে পেয়েছে।"

"বাইরে বড় রাস্তায় দেখেছি তারামা না ফারামা নামে একটা দোকান রয়েছে, তোরা খেয়ে আয়। আচ্ছা, চল, আমিও যাচ্ছি, গোরা তুই তা হলে এখানে থাক।

আবার কেউ হুজ্জত করতে এলে কিছু বলবি না, কাটিয়ে বেরিয়ে চলে আসবি।" বাপি গলা নামিয়ে কথা বলার দরকার আর বোধ করছে না। প্রতিটি কথা সমীরণ শুনতে পেল।

চারজন মন্থর গতিতে ভি আই পি রোডে মিষ্টির দোকানে খাওয়ার জন্য সুশোভন পল্লির প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেল। সমীরণ ছাদ থেকে নীচে নামার সময় শুনতে পেল টেলিফোনে পিসি কথা বলছে।

"বলছেন কী দত্তবাবু?...আপনি দু'জনের ঘাড় ধরে...তা হলে ওদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই?...তা তো হবেই, আপনাকে আর চিনবে না!...হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেন কী, খেলনা পিস্তল!...তাই বলুন, আচ্ছা আচ্ছা।"

টেলিফোন রেখে উদ্ভাসিত মুখে রেখা গুপ্ত কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, সমীরণ তাঁকে থামিয়ে বলল, "পিসি ঘুনু মিত্তির যে টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে গেল সেটা কোথায়? মলা, তুই টুকে রেখেছিস।"

"কেন, ঘুনু মিত্তির কী করবে?" রেখা গুপ্ত বিভ্রান্ত।

"এখন ওর বুদ্ধিটাই দরকার। বাপিদের মোকাবিলা ওকে ছাড়া সম্ভব নয়।" সমীরণ টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল।

শ্যামলা ফোন নাম্বার লেখা কাগজটা দিতেই সমীরণ ডায়াল করল।

"হ্যালো, এটা কি পতিতপাবন ঘোষের বাড়ি?"

"হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন?" সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন এল।

"আমার নাম সমীরণ গুপ্ত, আমি ঘুনুদার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

ওধারে কিছুক্ষণ কথা বন্ধ। ফিসফিস করে কাকে তখন বলা হচ্ছে "সমীরণ, সমীরণ গুপ্ত!"

"হ্যালো...।"

"ঘুনুদা তো এখানে নেই, বাড়িতে চলে গেছেন। আপনার কী দরকার বলুন।"

"ওঁর বাড়ির ফোন নাম্বারটা দিন, দরকারটা ওঁকেই বলব।"

নাম্বার লিখে নিয়ে ঘুনু মিত্তিরের বাড়িতে সমীরণ ফোন করল। "হ্যালো" শুনেই সে বুঝতে পারল ঘুনুদা রিসিভার তুলেছেন।

"আমি নাকু বলছি।"

"বল। বটার ছেলেরা তো তোর বাড়িতে গেছে।" নিশ্চিন্তে চিবিয়ে চিবিয়ে ঘুনু বললেন।

"আমি সারথিতে থাকব না ঠিক করেছি। এখনই আমাকে বের করে নিয়ে যান।" কথাক'টি বলতে গিয়ে সমীরণের হাঁফ ধরল। টানটান হল হাতের পেশি। বুকের কাছে চিনচিন করে উঠল। তিন বছরের সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলতে কষ্ট তো হবেই। কিন্তু এখন দুঃখে মুহ্যমান হওয়ার সময় নেই।

ঘুনু কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন কথাগুলো মগজের ভেতর-দেশে চালানোর জন্য। চমকে উঠলেন না, উল্লসিত হলেন না, ধীর শান্ত গলায় বললেন, "এখন তোর পজিশনটা কী?"

"বাড়িতে বন্দি। রাস্তায় পাঁচজন ঘোরাফেরা করছে। একজনের কাছে চেম্বার আছে।"

"অ। গোলমালের মধ্যে গিয়ে কোনও লাভ নেই। তুই যে-কোনওভাবেই হোক, আজ রাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবি? আমি গাড়ি নিয়ে থাকব কোথাও। এসব কাজে দেরি করতে নেই।"

"বেরোনো?" সমীরণ সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, "ছাদ থেকে বাড়ির পেছনদিকে নেমে একটা মাঠ, ইলেকট্রিকের মাঠ।"

"আলোটালো নেই তো? অন্ধকার তো?"

"একদম ঘুটঘুটে।"

"এখন আর বেশি কথা নয়। আমি ওই মাঠের ধারে, রাস্তায় গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব, ঠিক দুটোয়।"

"আপনি চিনে আসতে পারবেন মাঠে?"

"আরে, আমি ঘুনু মিত্তির। তারামা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গা দিয়ে শহিদ কলোনির দিকে যাওয়ার রাস্তা, মাঠটা তো তার ওপরই! বরেন মুখোটি ওই মাঠেই ট্রেনিং করায় না?"

"হ্যাঁ।"

"হুঁ হুঁ বাবা, এ হল ঘুনু মিত্তিরের মেমারি। শোন, ঠিক দুটোয় নেমে আসবি। ছেলেগুলো তখন কোথায় কী অবস্থায় রয়েছে আগে সেটা দেখে নিবি। ছাড়ছি। ঠিক দুটোয়।"

তিনজন হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে। সমীরণ ব্যস্ত হয়ে বলল, "ব্যাগটা কোথায়? শার্ট, প্যান্ট, টুথব্রাশ, চিরুনি, তোয়ালে, শেভিংকিট...পিসি হাজার তিনেক টাকা কাল কানুকে দিয়ে আমার জন্য প্লেনের টিকিট কেটে রাখবে। কানু, একুশ তারিখের কোঝিকোড়ের টিকিট, ভায়া বোম্বে, একদিনেই তা হলে পৌঁছতে পারব। না পেলে বাঙ্গালোরের, ওখান থেকে ঘণ্টা দশেকের বাস-জার্নি। ঘুনুদা ঠিক দুটোয় ইলেকট্রিক মাঠের ঘরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবেন। আমি ছাদ থেকে নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠব।"

"উঠে কোথায় যাবি?" উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন রেখা গুপ্তর।

"জানি না।"

সমীরণ ঘরে ঢুকে গেল। আলো জ্বালবে কি জ্বালবে না ভাবতে ভাবতে জ্বেলেই ফেলল। জানলার পরদা সরিয়ে দিয়ে কাঁধে ঝোলানোর পলিথিন ট্রাভেলিং ব্যাগটা আলনা থেকে নামাল। রাস্তা থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে। স্লিপিং সুট ব্যাগ থেকে বের করে নাড়াচাড়া করল। সে যে এখন ঘুমোতে যাচ্ছে, এটা যেন ওরা বুঝে যায়। আলো নিভিয়ে ডোরাকাটা পাজামা আর ঢিলে জামাটা পরে নিয়ে আবার আলো জ্বালাল। এইসব করার সময় সে একবারও বাইরের দিকে তাকাল না।

শ্যামলাকে ডেকে এক গ্লাস জল চাইল। জল খেয়ে গ্লাসটা ওর হাতে দেওয়ার সময় সে বলল, "তোরা খেতে বোস টেবিলে, আমারটা এখানে দিয়ে যা, ওদের

দেখিয়ে দেখিয়ে খাব, শোব, তুই মশারিটা ফেলে গুঁজে দিবি, আলো নেভাবি। সব যেন নর্মাল ভাবে হয়। আর শোন, ছাদ থেকে নামার জন্য একটা শাড়ি কি বেডকভার ঠিক করে রাখ। ঠিক দেড়টায়, সারা বাড়ি যেন অন্ধকার থাকে।"

॥ ৮ ॥

বাড়ি অন্ধকারই ছিল। জানলার পরদা অল্প সরিয়ে হিমাদ্রি এবার-ওধার তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, "কাউকে তো দেখছি না।"

"সর, আমি দেখছি।" শ্যামলাও রাস্তার দু'ধারে তাকিয়ে মাথা নাড়াল। কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। জানলার ধার ঘেঁষে মাথাটা চেপে, এক চোখ দিয়ে বাঁ দিকটা দেখতে দেখতে সে এবার অস্ফুট শব্দ করে ছিটকে সরে এল।

"কী কাণ্ড! ওরা আমাদের বাইরের বারান্দায় শুয়ে রয়েছে।"

"ভালই হয়েছে। পাঁচজনই আছে কি?" হিমাদ্রির গলায় খুশি ফুটে উঠল।

"সবটা তো দেখা যায় না, তা ছাড়া রাস্তার আলোও তো কম।" শ্যামলার চাপা স্বর।

"দরজা জুড়ে শুয়েছে পালানোর পথ বন্ধ করার জন্য। এভাবেই যেন শুয়ে থাকে। দাদা, চটপট এবার রেডি হয়ে নে।"

"রেডিই আছি। এই স্লিপিং সুট পরেই চলে যাব। একটা বেডকভারেই তো হয়ে যাবে, আর-একটা জোড়ার দরকার কী?"

"দরকার আছে। কানু ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেখেছে জমির অনেক ওপর পর্যন্ত থেকে যাচ্ছে। লাফিয়ে পড়লে শব্দ হবে।" রেখা গুপ্ত বেডকভারটা আঁকড়ে বললেন, "আমি আর-একটা বেঁধে নিয়েছি। ছাদে চল। আর শোন, যেখানেই যা, পৌঁছেই ফোন করে জানাবি কিন্তু।"

সুনীলবরণের ঘরের দরজা বন্ধ। চারজন নিঃসাড়ে ঘরটা পেরিয়ে পাঁচিলের ধারে এল। নীচেই বাড়ির পেছনে সরু গলি। তারপর পাঁচ ফুট উঁচু সীমানার পাঁচিল। ওটাও সমীরণকে টপকাতে হবে এবং বহুবারই সে এটা করেছে মাঠে যাওয়ার জন্য শর্টকাট করতে গিয়ে।

বেডকভার ঝুলিয়ে হিমাদ্রি আর শ্যামলা ধরে রইল। কাঁধে ব্যাগটা নিয়ে সমীরণ কার্নিসে নেমে বেডকভার আঁকড়ে সন্তর্পণে একটা পা প্রথমে ঝোলাল। পা রাখার মতো জায়গা নেই।

"দুর্গা, দুর্গা।" পাঁচিলে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে রেখা গুপ্ত ভাইপোর মাথা স্পর্শ করলেন।

হিমাদ্রি ও শ্যামলা প্রাণপণে টেনে রয়েছে। প্রায় সত্তর কেজি ওজনের টান সামলাতে দু'জনেরই দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।

"আহ্হ্", সমীরণ কাতরে উঠল।

"কী হল নাকু?" রেখা গুপ্ত ঝুঁকে পড়লেন।

"একটু টেনে তোলো, একটা শিক, তাড়াতাড়ি, লাগছে।

রেখা গুপ্ত প্রায় লাফিয়েই এসে বেডকভার ধরলেন। তার ধাক্কায় হিমাদ্রির মুঠো আলগা হয়ে গেল। অবশ্য পিসির মুঠো ততক্ষণে শক্ত করে ধরে ফেলেছে। একটা টানেই তিনি সমীরণকে প্রায় দু' হাত তুলে নিলেন।

"কানু জিজ্ঞেস কর, আর তুলব?"

হিমাদ্রি পাঁচিলে ঝুঁকে ফিসফিস করে ফিরে এল। "এইভাবে ধরে থাকতে বলল।"

রেখা গুপ্ত বেডকভার ধরে শরীরটা প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি পেছনে হেলিয়ে দিলেন। টানটান বেডকভার হঠাৎই ঢিলে হয়ে গেল, আর রেখা গুপ্ত ছাদের ওপর চিত হয়ে পড়লেন, শ্যামলাকে বুকের ওপর নিয়ে।

"নাকু তা হলে এখন মাটিতে!" রেখা গুপ্তর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় আশ্বস্তের ভাগটাই বেশি। ধড়মড়িয়ে উঠে তিনি পাঁচিলের কাছে যাওয়ার আগেই, বেড়ালের মতো লাফিয়ে পাঁচিল টপকে সমীরণ ইলেকট্রিক মাঠে নেমে পড়েছে।

তিনজন তীক্ষ্ণ নজরে অন্ধকার চিরে চিরে সমীরণকে খুঁজে পেল না। একটু পরে মোটর স্টার্ট দেওয়ার ক্ষীণ শব্দ পেয়ে শ্যামলা তালি দিয়ে উঠল। হিমাদ্রি বলল, "সেফলি পৌঁছে গেছে।" রেখা গুপ্ত জোড়হাত কপালে ঠেকালেন।

কী বা অন্ধকার কী বা আলো, ইলেকট্রিক মাঠটাকে সমীরণ চেনে তার হাতের রেখাগুলোর মতো। তার একটাই শুধু ভয় ছিল, কাছাকাছি কুকুরগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না। রাস্তার দিকে এগোতে এগোতে সে খুঁজল মোটরগাড়ি। যে মারুতিটায় ঘুনুদা এসেছিলেন নিশ্চয় সেটাতেই আসবেন। কুকুরের ডাক উঠল না, তবে ছোট্ট করে একবার হর্ন বেজে উঠল। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকা মোটরের ছায়া দেখে সে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

"ঢুকে পড়।" দরজা খুলে মিষ্টি স্বরে ডাক দিলেন। গাড়ির এঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। সমীরণ পেছনের সিটে বসে দরজা বন্ধ করার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

"কোনও ঝামেলা হয়নি?" ঘুনু শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন। ভি আই পি রোডে পড়ে ডান দিকে সবেগে বাঁক নিয়েই নির্জন রাস্তায় মারুতি প্রায় উড়ে চলল।

"ছেলেগুলো আমাদের বাইরের বারান্দায় ঘুমোচ্ছে। কাল সকালে যখন জানতে পারবে, কী যে তখন করবে কে জানে।"

"কিছু করতে পারবে না। তোর পিসিকে যতটুকু বুঝেছি তাতে এটুকু বলতে পারি, হাড়গোড় আস্ত রেখে সবক'টা যদি ফিরে যেতে পারে তা হলে সেটা হবে ওদের বাপের ভাগ্যি।"

"ঘুনুদা, এখন কোথায় যাচ্ছি?"

"যেখানে তুই সবথেকে নিরাপদ থাকবি, পতুর বাড়ি।"

এতক্ষণে সমীরণের খেয়াল হল, পেছনের সিটে আর-একজন বসে রয়েছে। অন্ধকারে তাকে চিনতে পারল না।

"আমি দুলালদা।"

সমীরণ 'অ্যাঁ' বলে চমকে উঠতে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে বলল, "তুমিও সারথি

ছাড়লে?"

"হ্যাঁ। নির্মাল্যদার জেতার কোনও আশা নেই।" দুলাল মৃদুস্বরে কথাটা বলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

উল্টোডাঙা মোড়, ফুলবাগান, বেলেঘাটা রোড, কনভেন্ট রোড হয়ে সি. আই. টি. রোড এবং পতু ঘোষের বিরাট পাঁচতলা বাড়ির গেট দিয়ে মারুতি যখন ঢুকল তখন রাত আড়াইটে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে পর পর দুটো দরজা। বাঁ দিকেরটির ডোর বেল বাজিয়ে ডান দিকের দরজাটি দেখিয়ে ঘুনু বললেন, "পতুর প্রাইভেট ড্রইংরুম। অবশ্য ভেতর দিয়েও ওদিকে যাওয়ার দরজা আছে।"

ঘুম-চোখে দরজা খুলল অল্পবয়সি একটি ছেলে। ভেতরে ঢুকে সমীরণ ঘরটা দেখল। দেয়াল থেকে দেয়াল কার্পেট, তাতে পা ডুবে যায়, এত পুরু আর নরম। নিচু টেবিল, কোচ, সোফা, টিভি, টেবিল ল্যাম্প, এয়ার কুলার, আলমারিতে বই, দেয়ালে কয়েকটা পেইন্টিং, রেফ্রিজারেটর, ইনভারটার, জানলায় মেঝে-ছোঁয়া ভারী পরদা। তার দেয়ালে বিচিত্র লাইট শেড। এটা বসার ঘর। এর একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি দুটি ঘরের দরজা।

ঘুনু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "দেবু, খাবারদাবার কী আছে?"

"বিরিয়ানি আর কড়াপাকের সন্দেশ আছে।"

"নাকু?"

"না, না, ঘুনুদা, আমি খেয়ে এসেছি।"

"লজ্জা করিস না। এখানে অঢেল ব্যবস্থা। যা খেতে ইচ্ছে করবে দেবুকে বলবি। তুষার তো কাল থেকে শুধু ফিশফ্রাই আর চিনে খাবারই খেয়ে যাচ্ছে।"

"তুষারদা এখানে?"

"বুকুও তো রয়েছে। কড়াপাক বোধ হয় ওর জন্যই আনা?" ঘুনু তাকালেন দেবুর দিকে।

"আজ পঁচিশটা এনেছি, বুকুদা পনেরোটা খেয়ে নিয়েছে।"

"ভাল। গরিবের ছেলে তো, একটু খাই খাই ভাব রয়ে গেছে। নাকু তুই দুলালের সঙ্গেই এক ঘরে থাক।" পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করলেন।

"আগে একটা টেলিফোন করব পিসিকে।"

"টেলিফোন? কিন্তু ওটা তো ওদিককার ড্রইং রুমে। দরজার চাবি দেওয়া।" ঘুনু আমতা আমতা করলেন। "কাল সকালে করিস।"

দেবু একবার ঘুনুর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ সিলিংয়ে তুলল। দুলাল বলল, "ঘুম পাচ্ছে, আয়।"

"আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি, কথাটথা কাল হবে। অবশ্য বলার মতো কথা আর কীই-বা আছে। নিজেই এলি, এতে আমার কী আনন্দই যে হচ্ছে। তোর কোনও ব্যাপারে কোনও অসুবিধা হবে না। ক্লাব পলিটিক্স কলকাতায় কী রকম হয় তা তো জানিসই! সুবোধ কি সীতেশ চেষ্টা করবে তোকে খচাবার, কিন্তু পারবে না। যা এখন,

শুয়ে পড়।"

ঘুনু চলে গেলেন। দুলালের সঙ্গে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই সমীরণের মনে হল কোনও ফাইভ স্টার হোটেলের ঘরে যেন সে ঢুকল।

"পতুদার গেস্টরা এসে এখানে থাকে, সেইভাবেই সাজানো। কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার, কয়লা আর স্টিল...কোটি কোটি টাকা।" দুলাল সসম্ভ্রমে বলল পাজামা পরতে পরতে। "কিন্তু মানুষটাকে দেখে তোর মনেই হবে না, এত টাকার মালিক। ব্যবসার কাজে এখন কানপুর গেছে...তুই কতয় এলি?"

"দুই-দশ অফার দিয়েছেন ঘুনুদা।"

"রাজি হয়ে ভালই করেছিস। সারথিতে থাকলে পুরো টাকা কখনওই পেতিস না। আমি এখনও পনেরো হাজার পাব, কিন্তু বটা বিশ্বাস আটকে রেখেছে। যাত্রী দেবে পৌনে দুই, ওখানের থেকে পঁচিশ বেশি।"

"দুলালদা, এখন এসব টাকাপয়সার কথা থাক। তিনটে বাজতে চলল, এবার শোব।" সমীরণ বালিশটা কার্পেটের ওপর ছুড়ে দিয়ে বিছানা থেকে বেডকভারটা তুলে নিল।

"তুই মেঝেয় শুবি?"

"নিশ্চয়ই। ওই ফোম রবারের ওপর শুলে আরাম পাওয়া যায়, কিন্তু শরীরটার তেরোটা বাজবে। এই এয়ার কুলারের ঠাণ্ডাটা খুবই আরামের, তবে আমার পছন্দ পাখার হাওয়া।"

"এয়ার কুলার কিন্তু আমি বন্ধ করব না।" দুলাল বেশ কড়া গলায় সমীরণকে জানিয়ে দিল।"

"আলো নেভাব?"

"হ্যাঁ।"

আলো নিভিয়ে, স্লিপিং সুট পরা সমীরণ বেডকভারটা গায়ের ওপর টেনে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর দুলাল বলল, "সমীরণ, একটা কথা বলব?"

"হুঁ, বলো।"

"তুই কেন জানি একটু অন্যরকম। সেজন্যই তোকে আমার ভাল লাগে। লেখাপড়া করা প্লেয়ার বা আমার মতো 'ক-অক্ষর গোমাংস' প্লেয়ার কম তো দেখলাম না, কেউ কিন্তু গভীর শ্রদ্ধা ফুটবলকে দেয় না। দিলে সে সবার আগে শরীরের যত্ন নিত, ক্ষমতা বাড়াত, স্কিল বাড়াত, ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করত। কিন্তু শ্রদ্ধা যে আনব বা দেব তারও তো একটা সঙ্গত কারণ থাকা চাই। বেশিরভাগই আমার মতো গরিব ঘর থেকে এসেছে, অশিক্ষিত। সবার আগে নিরাপত্তা, টাকা, এটাই আমাদের মাথায় থাকে। এটা কি অন্যায়?"

"অন্যায় তো নয়ই, প্রফেশনালিজমের এটাই আসল ভিত।"

"বলছিস?"

"হুঁ। টাকার জন্যই মারাদোনা, গাওস্কর, লেন্ডল, কার্ল লুইসরা ফর্ম ধরে রাখতে

প্রাণপণ করে গেছেন আর সাকসেসও পেয়েছেন। তুমি-আমি তো কোন ছার। টাকাকে অশ্রদ্ধা কোনওমতেই করা উচিত নয়। আসলে আমাদের পরিবেশটাই এত খারাপ যে, এক লাখ কি দু'লাখ পাচ্ছি শুনলেই লোকে চমকে ওঠে। এরা একবারও ভেবে দেখে না টিভি-তে যাদের খেলা দেখে আহা আহা করে তারা বছরে কোটি টাকা পায়। তাদের একটা নিরাপত্তা আছে। এখানে আমার কী আছে?"

"কিচ্ছু নেই। আর সেজন্যই আমাকে উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়।"

"তা হলে এবার তুমি ঘুমোও।"

সমীরণ বেডকভার টেনে নিজেকে ঢেকে দিল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে এসে দেবুর দেখা পেল।

"চা দেব?"

"হ্যাঁ, তার আগে ফোন করব।"

"যান না ও-ঘরে, ঘরের দরজা তো শুধু বন্ধ করা।"

"চাবি দেওয়া নয়?"

কালকের মতো সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে দেবু বলল, "ঘুনুবাবুর কথার ওপর কথা বলা বারণ।"

সমীরণ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "চিরটাকাল একই রকম থেকে গেল।"

তিক্ততায় ভরে উঠল সমীরণ। এত টাকা খরচ করছে যাত্রী ভাল একটা দল গড়ার জন্য, অথচ এইসব ক্ষুদ্রতা নীচতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারল না।

পতু ঘোষের ব্যক্তিগত ড্রইংরুম তার গেস্টরুম থেকে একটু বেশি সমৃদ্ধ। পরদার এবং সোফার কাপড় আরও দামি, কার্পেটের নকশা আলাদা, দেওয়ালে পেইন্টিং তো আছেই। তা ছাড়া করাত দিয়ে কাটা বাকলসহ বিশাল একটা গাছের গুঁড়ির টুকরো রাখা হয়েছে, ঘরের একধারে। ফোনের রিসিভারেই ডায়াল বাটন।

"হ্যালো, কে মলা?"

"দাদা?"

"খবর কী, ওই ছেলেগুলো--"

"আর বলিসনি। পিসি তো আজ বেগিংয়ে বেরোয়নি। কাল ছাদে পড়ে গিয়ে কোমরে লেগেছে। এখন বিছানায়। আমি মাদার ডেয়ারির বুথ থেকে দুধ আনতে যাব বলে দরজা খুলে বেরিয়েই দেখি পাঁচ মূর্তি বসে রয়েছে বারান্দায়। বললাম, "এ কী আপনারা বাড়ির মধ্যে কেন?" একজন বলল, "পিসির সঙ্গে সমীরণদা কথা বলা কি শেষ হয়েছে? তাড়াতাড়ি আসতে বলুন।" বললাম, "কাকে আসতে বলব?" বলল, "সমীরণদাকে। বটাদা বলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে।" তখন বললাম, "দাদা তো অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে চলে গেছে।" তাই শুনেই তো ওদের চক্ষু চড়কগাছ। ভেতরে ঢুকে সব ঘর, ছাদ তন্নতন্ন করে দেখে প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কোথায় গেছে সমীরণদা, বলুন কোথায় গেছে?" কানু বলল, "কলকাতার ফুটবলের হাল দেখে বোধ হয় সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয় চলে গেছে।" আমি বললাম, "দাদা তো সন্ন্যাসী হওয়ার লোক নয়, দেখুন

গিয়ে তারামা'য় বসে হয়তো জিলিপি খাচ্ছে।" শোনামাত্র পড়িমড়ি দৌড়ল তারামা'র দিকে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল চলে যাওয়ার সময় ওদের মুখ দেখে।"

"মলা শোন, আমি এখন পতু ঘোষের বাড়িতে। ফোন নাম্বারটা রেখে দিস, দরকার হলেই ফোন করবি।"

"জায়গাটা কেমন?"

"ফুটবলারদের ধ্বংস করার জন্য যা দরকার সেটা এখানে ভালমতোই আছে, প্রচুর টাকা, প্রচুর আরাম। ভাল কথা, কানু যেন প্লেনের টিকিটটা কেটে রাখে।"

"ওখানেও কি জেলখানা?"

"বুঝতে পারছি না, কয়েক ঘণ্টা তো এসেছি। আজকের দিনটা দেখে বুঝতে পারব।"

"পিসিকে কিছু বলতে হবে?"

"না, না, কিছু বলার দরকার নেই। শুয়ে থাকতে দে। মনে হয় না বটা বিশ্বাস বাড়িতে এসে গোলমাল করবে, এখন রাখছি।"

গেস্টরুমগুলোর লাগোয়া, ঘরের মাপের একটা ডাইনিং স্পেস। ছ'জনের জন্য একটা টেবিল। পরদা টেনে দিলেই এই খাবার জায়গাটা বসার জায়গা থেকে আলাদা হয়ে যায়। টেবিলে দেবু থরে থরে খাদ্য সাজিয়ে রেখেছে। বিশাল এক বৌলে স্যালাড। আপেল, কলা, আঙুর স্তূপ করা। বাটিভরা মাখন আর জেলি। প্লেটে দুধে ডোবানো কর্নফ্লেকস। থরে থরে সাজানো সেঁকা পাউরুটি। কড়াপাকের সন্দেশ।

দুলাল ছুরি দিয়ে মাখন লাগাচ্ছে রুটিতে, এক একটা স্লাইসে প্রায় একশো গ্রাম। তুষার বিরক্ত চোখে মাখনের বাটিটা পাওয়ার জন্য তাকিয়ে রয়েছে দুলালের দিকে। বুকু অবাক হয়ে গেল সমীরণকে দেখে।

"তুই! এখানে?"

"কাল রাত্তিরে এসেছে", তুষার একদৃষ্টে মাখনের বাটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কীরে দুলে, রুটির ওপর মাখনের ড্রিবলিং অনেকক্ষণ তো চালাচ্ছিস, এবার পাসটা বাড়া।"

"তুই জেলি মাখানো শুরু কর না। ওভারল্যাপটা কখনওই ঠিক সময়ে তোর দ্বারা আর হয়ে ওঠে না। আচ্ছা এই নে।"

দুলালের ঠেলে দেওয়া মাখনের বাটিটার দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে তুষার বলল, "এটা নিয়ে করব কী! কিছুই তো রাখিসনি। চিরকালই তোর ফাইনাল পাসটা এমন জায়গায় হয় যে, গোল আর করা যায় না। সন্দেশের প্লেটে কিন্তু হাত দিবি না বলে রাখলুম।"

"ওটা বুকুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নে।" গোলমরিচের গুঁড়ো রুটিতে ছিটিয়ে কামড় বসাবার আগে দুলাল বলল।

"নাকু, তুই তো সারথিতেই থেকে যাবি শুনেছিলাম!" বুকুর বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি।

"মত বদলালাম।"

"কেন? দরে পোষাল না?"

সমীরণ উত্তর দিতে গিয়েও দিল না। শুধু মাথা নাড়ল। বুকু চোখ সরু করে তেরছা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে শুরু করল। সমীরণ প্লেটে স্যালাড তুলতে তুলতে সেটা লক্ষ করে হাসল।

"নাকু তুই হাসলি যে?" দুলাল বলল।

"সারথির পাঁচটা ছেলে বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছিল কাল রাতে। এখন বটাদা তাদের কী বলছে সেটা মনে করেই হাসি পেল। আচ্ছা দুলালদা, পৃথিবীতে আর কোনও দেশে কি এইভাবে দলবদলের আগে ফুটবলারদের গাধা-গোরুর মতো খোঁয়াড়ে পোরা হয়?"

"একটা দারুণ কথা নাকু তুই বললি।" তুষার মুখভরা রুটির মধ্যে একটা ফাঁক তৈরি করে বাক্যটি বের করে আনল। "মানুষকে গাধা-গোরু কখনওই বানানো যায় না যদি না সে নিজেই তা হতে চায়। আমরা হতে চেয়েছি তাই ওরা বানিয়েছে। না চাইলে বানাতে পারত না। এখানে লাস্ট চারটে ওয়ার্ল্ড কাপের সাত-আটটা ম্যাচের ক্যাসেট আছে। তুই তার যে-কোনও একটা ম্যাচ দ্যাখ। তোর মনে হবে গাধা-গোরুরা নয়, বাঘ-সিংহের লড়াই হচ্ছে। ওদের খোঁয়াড়ে ভরার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাববে না।...দুলে কড়াপাকের দিকে আর তাকাসনি বাবা। আগের সিজনে বুকু যে-ক'টা সিটার মিস করেছে ঠিক সেইক'টাই এখন রয়েছে। ওর থেকে যদি খাস—।" তুষারের কথা থেমে গেল। রাগ করে বুকু উঠে পড়েছে।

"সব সময় পেছনে লাগার স্বভাবটা তোমার আর গেল না। আমি ক'টা মিস করেছি তার ফর্দ তুমি রেখেছ, আর তুমি ক'টা গলিয়েছ তার হিসাবটাও কি রাখো?"

"রাখি।" নির্বিকার মুখ তুষার বলল। যত্নভরে কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সে আড়চোখে একবার সমীরণের দিকে তাকাল! "কলকাতার মাঠে লাস্ট সিজনে চারবার বিট হয়েছি শুধু নাকুর কাছে। কিন্তু ও গোল দিতে পারেনি। হ্যাঁ মানছি, চারবারই সারথির পেনাল্টি পাওয়া উচিত ছিল। এবার আর নাকুকে মেরে থামাতে হবে না ভেবে পুণ্য অর্জনের সম্ভাবনায় ঠিক করেছি স্যাক্রিফাইস করব।"

তিনজোড়া চোখ তুষারের ওপর গেঁথে গেল।

"সন্দেশগুলো, বুকু তুই একাই খেয়ে নে।"

"আমার মুশকিলটা কী জানো তুষারদা, তোমার এগেনস্টে খেলার সুযোগ একবারও পেলাম না। পেলে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম...।" বুকু অর্থপূর্ণ হাসি তিনজনকে উপহার দিল।

তুষার ভ্রূ তুলে বলল, "কী বুঝিয়ে দিতিস?"

"বুঝিয়ে দিতাম তোমার রিটায়ার করার সময় এসে গেছে।"

বুকু কথাটা বলেই টেবিল থেকে উঠে বসার জায়গায় গিয়ে টিভি সেটের সুইচ টিপল। ধীরে ধীরে তুষারের মুখ থমথমে হয়ে উঠল।

"খবরের কাগজ কখন আসে?" সমীরণ বলল প্রসঙ্গটা সহজ করার জন্য দুলালকে লক্ষ্য করে। এইসব আকচাআকচি, হিংসা, মনোমালিন্য তার মনটাকে

ঘুলিয়ে দেয়। সে শুনেছে ক্লাবে আধিপত্য বিস্তারের জন্য এই দু'জনের মধ্যে লড়াই চলছে। দু'জনে দুই কর্তার প্লেয়ার।

"আসে না।"

"মানে? তোমরা কাগজ পড়ো না?"

"পড়ি।"

"তা হলে?"

"তা হলে আবার কী?" দুলাল বিরক্তিভরে বলল, "আমাদের খবরের কাগজ পড়া বারণ, তাই আসে না।"

স্তম্ভিত হয়ে গেল সমীরণ। সে বুঝে উঠতে পারছে না কাগজ পড়ার মতো একটা সাধারণ ব্যাপারে আপত্তি কেন?

দুলাল ওর মনের কথাটা আন্দাজ করেই বলল, "ক্লাব অফিসিয়ালদের বিবৃতি, ইন্টারভিউ, প্লেয়ারদের হাম্বা হাম্বা, কে কাকে ধরতে গিয়ে ফসকে গেল, কে বলছে অমুক ক্লাবে খেলব তমুক ক্লাবে যাব না, কাকে কত টাকা অ্যাডভ্যান্স দেওয়া হল আর কে অ্যাডভান্স নিয়েও বিরোধী ক্যাম্পে গিয়ে উঠল, অফিসিয়ালদের কে নিজের ক্লাবের বিরুদ্ধেই কথা বলল—এইসব যাতে আমরা জেনে না যাই সেজন্যই খবরের কাগজ দেওয়া হয় না।" দুলাল ফিক ফিক হেসে চামচে কর্নফ্লেক্স তুলে মুখে দিল।

"এটা অত্যন্ত অন্যায়, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।" সমীরণ রেগে উঠল।

দুলাল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল দেবু এসে তাকে বলল, "বউদির ফোন।"

দুলাল ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল। তুষারও উঠল। সমীরণ টেবিলে একা বসে রুটি চিবোতে চিবোতে দেবুকে বলল, "চা দাও।"

"চা নয়, হরলিক্স খেতে হবে।"

শুনেই সমীরণ চোখ সরু করল। "খেতে হবে। যাক, দরকার নেই।"

পাংশু মুখে ফিরে এল দুলাল। সমীরণের সামনের চেয়ারে বসে নার্ভাস স্বরে বলল, "মুশকিলে ফেলল দেখছি। বটা বিশ্বাসের ষাট-সত্তরটা ছেলে বাড়ির সামনে চিৎকার করছে, গালাগাল দিচ্ছে আমার নামে। কী করা যায় বল তো।" অস্থিরভাবে দুলাল সোফায়-বসা তুষারের কাছে চলে গেল।

"তুষার, এখন কী করি বল তো?"

"কী আবার করবি। বউকে বল দরজা জানলা বন্ধ করে, কানে তুলো দিয়ে বসে থাকতে। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে ওরা আপনা থেকেই চলে যাবে।"

"তাইই বলেছি। কিন্তু বটাদা টেলিফোন করে বউকে বলেছে দেখা করতে আসবে। এটাই তো ভয়ের কথা। ছন্দা তো বটাদা বলতে অজ্ঞান।"

"হোক না অজ্ঞান! তোর জ্ঞানটা ঠিক থাকলেই হল।"

"ছন্দাকে তো চিনিস না, ও অজ্ঞান হলে আমাকেও যে অজ্ঞান হতে হবে এটা বটাদা জানে। গত বছর ওকে দিয়ে বটাদা এমন প্রেশার দেওয়াল যে, যাত্রীর অ্যাডভান্স নিয়েও সারথিতে যেতে হল।"

সমীরণ এসে দু'জনের সঙ্গে বসল। বুকু সঙ্গে সঙ্গে টিভি বন্ধ করে ঘরের মধ্যে

চলে গেল। ডোর-বেল বেজে উঠল। দেবু দরজা খুলে দিতেই সুবোধ ধাড়া, সীতেশ রায় এবং সাত-আটজন যুবক ও মাঝবয়সি লোক ভেতরে ঢুকল।

সমীরণকে দেখেই সুবোধ ধাড়া একগাল হাসল।

"বটাকে ম্যাজিক দেখালি? ভাল, ভাল, এবার মাঠে নেমে পায়ের জাদুটাও দেখাস।"

সমীরণ চুপ করে রইল। দুলাল ইশারায় সুবোধ ও সীতেশকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। ওদের সঙ্গে আর যারা ঢুকেছে তারা সোফায় বসে নিজেদের মধ্যে জোর গলায় কথা বলা শুরু করল—কোন প্লেয়ারকে আনা দরকার, কার কত দর হওয়া উচিত, আর পঁচিশ হাজার বাড়ালেই কাকে পাওয়া যাবে, কাকে একদমই বিশ্বাস করা যায় না, কে ল্যাজে খেলাচ্ছে, এইসব কথার থেকে সরে যাওয়ার জন্য সমীরণ বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়াল।

মরক্কো চামড়া-বাঁধানো ইংরেজি এবং বাংলা নানাবিধ বই থেকে সে অনুমান করল পতু ঘোষ লোকটা উটকো এবং সাজানো বনেদি নয়। শিক্ষা, রুচির একটা ভিত পরিবারে আছে। আলমারির পাল্লা টানতেই খুলে গেল। সে বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর একটা খণ্ড বের করে পাতা ওলটাল। কয়েকটা উপন্যাস রয়েছে এই খণ্ডে। বইটা নিয়ে সে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে পরদা টেনে দিল। জানলার পরদা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল একটা অফিসবাড়ি। দোতলায় ব্যাঙ্ক। রাস্তার কিছুটা চোখে পড়ে। বাস, মোটর ইত্যাদি চলছে। আকাশ কষ্টেসৃষ্টে দেখা যায়। সে একটা চেয়ারে বসে আর-একটায় দুটো পা তুলে দিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সে 'কপালকুণ্ডলা'য় ডুবে গেল।

উপন্যাসটা যখন প্রায় শেষ করে এনেছে, হঠাৎ একটা মেয়েগলার চিৎকারে সমীরণ বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল।

"কোথায় দুলাল চক্রবর্তী? তাকে কোথায় রেখেছেন, বের করে দিন।"

"কে আপনি?"

"আমি ওর বউ মধুছন্দা।"

"এখানে দুলাল চক্রবর্তী নেই।"

"নেই মানে, আজ সকালেই ফোনে কথা বলেছি। আমায় বলল, এখানে ওকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। আমি সব ঘর সার্চ করব।"

"বলছি তো এখানে নেই। আপনি যেতে পারেন।"

সমীরণ পরদার ওপারের সংলাপ শুনে বুঝল সুবোধ ধাড়াদের সঙ্গে আসা সেই লোকগুলি ছাড়া ওখানে আর কেউ নেই। নিশ্চয় আগাম জেনেছে মধুছন্দা আসছে তাই কেটে পড়েছে।

"আমায় আটকাবেন না বলছি। নীচে একশো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা আমার স্বামীকে অবৈধভাবে এখানে ধরে রেখেছেন।"

"আপনি যদি ঘর দেখতে চান, দেখতে পারেন, কিন্তু অন্য কাউকে ঢুকতে দেব না, সেটাও তা হলে অবৈধ ব্যাপার হবে।"

"ঠিক আছে, এই তোমরা এখানে দরজার বাইরেই থাকো।"

"না বউদি, আমরাও আপনার সঙ্গে থাকব।"

"আপনাকেও যদি আটকে রেখে দেয়?"

"অ্যা অ্যা অ্যা, আটকাবে আমাকে? জ্বালিয়ে দেব না সারা বাড়ি। আমি একাই দেখছি, তোমাদের ঢুকতে হবে না।"

বটা বিশ্বাস তা হলে এর মধ্যেই অর্গানাইজ করে ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। সমীরণ পাতার সংখ্যাটা দেখে বই বন্ধ করল। কিন্তু যদি তাকে এখন দেখে ফেলে? যদি জবরদস্তি চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায়? তারপরই মনে হল, প্লেয়ার তোলা এভাবে হয় না। যাকে তোলে সে স্বেচ্ছায়ই হাজির হয়।

ঘরের দরজা খোলা আর বন্ধের শব্দের সঙ্গে মধুছন্দার গলা ভেসে এল। "কোথায় ওকে সরিয়েছেন আপনারা বলুন, নয়তো কুরুক্ষেত্র বাধাব বলছি।"

"বললাম তো আপনাকে, দুলাল চক্রবর্তী আধঘণ্টা আগে ওর জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ, নিজের থেকেই। যাওয়ার সময় শুধু বলল, এখানে থাকব না, বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। যদি বউ খোঁজ করতে আসে—", কথাটা শেষ হওয়ার আগেই সমীরণ শুনল তুষারের গলা, "তা হলে বলে দেবে, বটাদা এবার কত ভরির হার দেবে সেটা জেনে নিয়ে যেন বাড়িতে বিকেলে ফোনের পাশে বসে থাকে। পাঁচ ভরির কম হলে সারথিতে থাকব না।"

"তুষারদা, আপনি তো একজন বড় প্লেয়ার, আপনিই বলুন, ফুটবলারদের কি বিশ্বাস করা যায়? ওদের কথার কি কোনও দাম আছে?"

"ছন্দ, আমিও কিন্তু একজন ফুটবলার।"

"না, না, আপনাকে বলছি না, আপনি বাদে আর সবাই। আমাকে বলল একটা হিরের নাকছাবি করিয়ে দেবে সারথির টাকাটা পেলেই। এক বছর হয়ে গেল, কোথায় নাকছাবি? এবার বলল যাত্রীর অ্যাডভান্স পেলেই—না, না, আমি আর বিশ্বাস করছি না। বলুন না তুষারদা ও কোথায়? বটাদা বলেছেন মামনকে লরেটোয় ভর্তি করিয়ে দেবেন। উনি এককথার মানুষ, যা বলেন তাই করেন।"

"লরেটোয় তো পতুদাও ভর্তি করিয়ে দিতে পারেন।"

"পারেন? আপনি একটু বলবেন তুষারদা?"

"তুমি নিজেই বলো না।"

"ঠিক আছে আমিই বলব। জানেন, আমার বড়দির মেয়ে কী ফটাফট ইংরিজি বলে! মেমসাহেবদের মতো উচ্চারণ। শুনলুম পতুদা এখানে নাকি নেই?"

"কাল-পরশুই এসে যাবে, তুমি বরং পরশুই এসো।"

সমীরণ ভেবে পাচ্ছে না, হাসবে, না, রাগবে। একটা ফুটবলারকে জীবনে কতজনের কতরকমের স্বার্থ, লোভ দেখে চলতে হয়। দুলালদা প্রায়ই বলে, "গুছিয়ে নে, নাকু, গুছিয়ে নে। এই খেলা চিরকাল তো থাকবে না, যা পারিস বাগিয়ে নে।" দুলালদা বাগিয়ে নেওয়ার জন্য যাত্রী আর সারথির মধ্যে লাথি খাওয়া বলের মতো যাতায়াত করছে।

বইটা খুলে আবার সে পড়তে শুরু করল। কয়েক মিনিট পর দেবু পরদা সরিয়ে

মুখ বাড়াল।

"দুপুরে কী খাবেন?"

"যা হোক।"

"তুষারদা ইলিশ খাবে বলেছে, বুকুদা চিকেন। যে যা খেতে চাইবে তাই দেওয়া হবে। বুকুদা তো কাল এগারোটা ক্যাডবেরি চকোলেট খেল।"

"আমি খাব ভাত, ডাল, তরকারি আর যে-কোনও একটা মাছের ঝোল।"

"আর?"

"আবার কী?" সমীরণ তাকাল দেবুর বিড়ম্বিত মুখের দিকে। "রোজ যা খাই তাই খাব, তবে ইলিশভাজা পেলে ছাড়ি না আর দই পেলে তো খুবই ভাল হয়।"

দেবুর স্বস্তি পাওয়া মুখ দেখে সে বলল, "বউদিটি চলে গেছেন, না দলবল নিয়ে নীচে বসে আছেন?"

"বসেটসে নেই, একদমই চলে গেছেন। এদিকে এরাও সব তুষারদাকে নিয়ে বড়বাবুর ড্রইংরুমে গিয়ে বসেছে। মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরের দরজাও লক করে দিয়েছি। বড়বাবুর কড়া অর্ডার প্লেয়ার ছাড়া এদিকে কেউ থাকবে না। ঝামেলাটামেলা হলে ওদিককার ঘরেই হোক। কাল গৌরবন্ধু বেরা-র বাবা এসে যা চেঁচামেচি করল।"

"গৌরবন্ধু, মানে সারথির তিন নম্বর গোলকিপার?"

"হ্যাঁ। ওকে সত্তর হাজার দেওয়ার কথা হয়েছে। লোকটা এসে বলে একলাখ পঁচিশ চাই। ভাবুন একবার, জুনিয়ার বেঙ্গলে একটা ম্যাচ শুধু খেলেছে, সিনিয়ার বেঙ্গল টিমের রিজার্ভে ছিল, সারথিতে গত বছর চারটে একজিবিশন ম্যাচে নেমেছে, আপনি তো আমার থেকেও ভাল জানবেন, এই প্লেয়ার কিনা চাইছে সোয়া লাখ! দু' ঘণ্টা ধরে ওর বাপ চেঁচাল, রাগ দেখাল, তারপর কান্নাকাটি, হাতজোড়, মানে শান্তিগোপাল, স্বপনকুমারও হার মেনে যাবে!"

"চাইবে না কেন? সারা ময়দানে রটে গেছে টাকার বস্তা নিয়ে পতু ঘোষ প্লেয়ার কেনার দোকান খুলেছে। কানা, খোঁড়া, নুলো, খোকা, বুড়ো যাকে পারছে অ্যাডভান্স ধরাচ্ছে। গৌরবন্ধুর কতয় রফা হল?"

"আশি হাজার।"

"অ্যাঁ। ওর দাম তো আশি টাকাও নয়, আর কিনা পাবে আশি হাজার!"

"আপনি অ্যাডভান্স নিয়েছেন?" দেবুর স্বরে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা।

"না।" সমীরণ হুঁশিয়ার হল। এইসব বিষয় নিয়ে এই পর্যায়ের লোকের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়।

"চাইলে অ্যাডভান্স কেন, পুরো টাকাটাই আপনাকে দিয়ে দেবে। আপনি যাত্রীর বড় ক্যাচ, আপনাকে যে পাব এটা তো আমরা আশাই করিনি।"

এই সময় চেঁচিয়ে একজন বলে গেল, "সমীরণ তোমার ফোন এসেছে।"

নিশ্চয় বাড়ি থেকে। আর তো কেউ জানে না সে এখানে! সমীরণ প্রায় ছুটেই ড্রইংরুমে গেল।

"কে, দাদা? আমি কানু।"

"পিসি স্কুলে গেছে?"

"যায়নি। হটওয়াটার ব্যাগ নিয়ে সেঁক দিচ্ছে। শোন, এইমাত্র বাঙ্গালোর থেকে তোর ফোন এসেছিল।"

মাথার মধ্যে ঝনাৎ শব্দ করে সমীরণের শরীর শক্ত হয়ে গেল। "কে করেছে?"

"পদ্মনাভন, এ. আই. এফ. এফ. সেক্রেটারি। এক্ষুনি তোকে রওনা হতে বলল।"

"এক্ষুনি রও—" সে থেমে গেল। সারা ঘর কান পেতে, সব চোখ এখন তার দিকে। খোলাখুলি কথা বলা নয়।

"কেন বলল?"

"নাগজি টুর্নামেন্টে তোরা খেলছিস না, কারণ চেকোশ্লোভাকিয়া ট্যুর গভর্নমেন্ট স্যাংশন করেছে। দশদিনের মধ্যেই টিম রওনা হবে। তোর জন্য নোভাচেক অপেক্ষা করছে। মিনিটখানেক কথা হল।"

সমীরণের হাতের ফোন থরথর কাঁপছে। তার জীবনের স্বপ্ন বাস্তব হয়ে ফোনের মধ্য দিয়ে সারা শরীরকে সুখে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেই একটা সন্দেহ কাঁটার মতো তার মগজে বিঁধল। ফোনটা বাঙ্গালোর থেকে, না কি শোভাবাজারের অভয় কুণ্ডুর বাড়ি থেকে? এটা আগে যাচাই করে নেওয়া দরকার। কলকাতার ফুটবলে নোংরামির তো অন্ত নেই।

"কানু, তুই একবার পদাকে ফোন কর, এক্ষুনি?" নম্বরটা লেখা আছে ফোন-গাইডে।"

"পদা কে?"

"আহা, একটু আগেই তো বললি তোকে ফোন করেছিল পদা।" সমীরণ আড়চোখে ঘরের লোকেদের দিকে তাকাল। "আমার সুটকেসের একটা নোট বইয়ে নোভুদার ফোন নাম্বার আছে। ওখানে করলেও হবে।"

"পদ্মনাভন, নাকি নোভাচেক, আগে কাকে করব?"

"যাকেই হোক, জিজ্ঞেস করে আগে কনফার্মড হয়ে নে। অন্য কেউ ধাপ্পা দেওয়ার জন্য এভাবে বলছে কি না সেটা ভজিয়ে নেওয়া দরকার। যদি সত্যি হয় তা হলে যা কিনতে বলেছি সেটা কিনে ফেল।"

"কিনতে মানে প্লেনের টিকিট কাটতে বলেছিলিস।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। তবে বো নয় বা।"

"আরে বাঙ্গালোরেরই কাটব। আমার বন্ধুর দাদা, সারথির পাগল সাপোর্টার, এখনও জানে না তুই যাত্রীতে উঠেছিস, তিনি এয়ারলাইন্সের অ্যাকাউন্টসে আছেন। তাঁকে ফোন করে কালকের বোম্বাইয়ের টিকিট চেয়েছিলাম, বললেন হয়ে যাবে। এখন আবার বাঙ্গালোরের চাইতে হবে। অবশ্য প্রথমে পদার কাছ থেকে জেনে নিয়ে।"

"জেনেই আমাকে জানাবি, এক সেকেন্ডও দেরি করবি না। ভীষণ ক্রুশিয়াল এটা আমার কাছে।"

সমীরণ রিসিভার রাখতেই প্রশ্ন হল "নাকু, কোনও খারাপ খবর?"

"অ্যাকসিডেন্ট নাকি সমীরণ?"

"তোমার পিসিমার?"

দুর্ভাবনা-পীড়িতের মতো দেখাচ্ছে সমীরণকে। এখন তাকে এই ভাবটা দেখাতেই হবে। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ কর্ম নয়। তাকে আটকে দেবেই। যাত্রীর সে বড় ক্যাচ।

"হ্যাঁ, তুষারদা, একজন ফোন করে ভাইকে বলেছে স্কুলের সামনে বাস থেকে পিসিমা পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়ায় চোট পেয়েছে। কথাটা সত্যি কি না কমফার্ম করার জন্য ভাইকে বললাম, পদাদা, আমার এক মামাতো দাদা, পিসিমার স্কুলের পাশেই থাকেন, তাকে ফোন করে জেনে নিয়ে আমাকে জানাতে। কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না, বাড়িতেও কেউ নেই যে—।" সমীরণ ক্লিষ্ট মুখে ধীরে ধীরে তুষারের পাশে বসে পড়ল।

অভিনয়! এখন সে স্টেজের ওপর। ঘাগু দর্শকদের সামনে তাকে অভিনয় করতে হচ্ছে। একটু এধার-ওধার হলেই এরা ধরে ফেলবে। বাসব কী যেন বলেছিল? "কী গলা, কী ডেলিভারি, কী পিচ কন্ট্রোল!" এসে একবার দেখে যাক সমীরণ গুপ্তর অভিনয়।

"পিসিমার তো দারুণ স্বাস্থ্য, প্রচণ্ড ফিট। শুনেছি এককালে রেগুলার বাস্কেট খেলতেন।" তুষার সমীহ করে বলল।

জবাব না দিয়ে সমীরণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টেলিফোনটার দিকে। তার মাথায় এখন অন্য চিন্তা। কানু কি সুটকেস থেকে নোটবইটা পেয়েছে?...ট্রাঙ্ককলে লাইন পেতে কত সময় লাগবে?...নোভাচেক কি পদ্মনাভন এখন যদি কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাকে? অন্য কেউ ফোন ধরলে সে নিশ্চয় বলতে পারবে ইন্ডিয়া টিম ট্যুরে যাচ্ছে কি না। যদি যায় তা হলে অবশ্যই তাকে জলদি যেতে বলবে। যেতে হলে প্রথমে এখান থেকে তাকে বেরোতে হবে।

"পিসিমার যদি কিছু হয়ে থাকে তা হলে আমাকে তো যেতেই হবে।" সমীরণ ব্যকুল হয়ে বলল।

"যাওয়া তো দরকারই।" তুষার সমর্থন করল।

রুগ্‌ণ, লম্বা মাঝবয়সি লোকটি, সমীরণ যাকে আগে কখনও দেখেনি, বলল, "ঘুনুদা না বললে তো যাওয়া সম্ভব নয়।"

আর-একজন বলল, "তোমার ভাই, কন্‌ফার্মড হয়ে আগে তো তোমাকে জানাক, তারপর দেখা যাবে।"

দপদপ করে উঠল সমীরণের কানের দু'পাশ। কিন্তু সে জানে রাগারাগি করে কোনও লাভ নেই। সবার আগে তাকে কাজটা হাসিল করতে হবে।

"আমি ঘরে যাচ্ছি, ফোন এলেই খবর দেবেন।" এই বলে সে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এসে খাবার টেবিলে রাখা বঙ্কিম গ্রন্থাবলীটা তুলে নিয়ে, নিজের ঘরে এসেই অবাক হল। বুকু শুয়ে রয়েছে, দুলালের শূন্য বিছানায়। বুকের ওপর টেপ রেকর্ডারে

নিচু স্বরে বাজছে হিন্দি গান।

"কী ব্যাপার, এখানে?" সমীরণ বলল।

"তুষারদার সঙ্গে থাকব না, অত্যন্ত বাজে লোক।"

সমীরণ আর কথা না বলে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। কপালকুণ্ডলা শেষ করার বাসনা এখন আর তার নেই। তার মাথায় এখন চেকোশ্লোভাকিয়া ট্যুর, বাঙ্গালোর, কানুর ট্রাঙ্ককল, প্লেনের টিকিট, পতু ঘোষের বাড়ি থেকে বেরোনো, ঘুনু মিত্তিরের অনুমতি এবং নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ পর-পর খেলে চলেছে।

"তোদের ক্যাম্পে ছিল নাগাল্যান্ডের খাংমা, ঘুনুদা তাকে আনতে কোহিমা যাচ্ছে।" টেপরেকর্ডার বন্ধ করে বুকু বলল।

সমীরণ নিজের ভাবনার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল, তার মধ্যেই বুকুর কথাটা তার মগজে আঘাত করল। অবাক হয়ে বলল, "খাংমা মানে সেই স্টপারটা? নোভাচেক তো ওকে তিনদিন দেখেই ক্যাম্প থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়!"

"হ্যাঁ, ওকেই আনতে যাচ্ছে। অজয় তালুকদার ওকে চেয়েছে। ওর মধ্যে নাকি ভারতের সেরা স্টপারটা লুকিয়ে আছে, অজয়দা তাকে বের করে আনবে। অতএব ব্রিফকেস নিয়ে ঘুনু মিত্তির এবার প্লেনে উঠবে।"

"একটা হাতির ঘুরতে যে সময় লাগে খাংমার লাগে তার আটগুণ সময়। বিনু কি আলবু তো তাস খেলতে খেলতে ওকে বিট করবে!"

"তাতে কী হয়েছে, ছ'ফুটের ওপর লম্বা, পঁচাশি কেজি ওজন, এটাই তো যথেষ্ট দেড় লাখ টাকার পক্ষে। গৌরবন্ধু, খাংমা, এইসব নিয়ে গোল খাবে আর সেই গোল শোধ করতে হবে আমাকে, এবার থেকে তোকেও। আর না পারলে কী অবস্থাটা আমাদের হবে...পাবলিক জানে অলরেডি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা যাত্রী খরচ করে বসে আছে।" বুকু টেপরেকর্ডারটা আবার চালিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্বরগ্রাম কমিয়ে বলল, "তুই আসায় আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই।"

সমীরণ বিছানা থেকে উঠে ঘরের বাইরে এল। ঘরের কোণে টেবিলের ওপর রাখা ঘড়িটা টুংটাং শব্দ করল। এগারোটা। সমীরণ অস্থির মনে পায়চারি করতে করতে একসময় ড্রইংরুমে ঢুকল। লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে। তাদের মধ্যে তিন-চারজনকে মস্তানগোছের বলে তার মনে হল। যাত্রীর দু'জন ফুটবলারও রয়েছে এর মধ্যে, বোধ হয় দরাদরি করার জন্য এসেছে। ট্রেজারার মহাদেব সামুই একটা বালিশ বগলে রেখে সোফায় কাত হয়ে আধশোয়া।

ফুটবলারদের একজন সামুইকে তখন বলছিল, "সারথির নির্মাল্য রায় কাল এসেছিল।"

"চুঁচড়োয়? তোর বাড়িতে?"

"হ্যাঁ, বললেন ফুড কর্পোরেশনে, নয়তো কোল ইন্ডিয়ায় চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"ভাল কথা, তা হলে সারথিতেই চলে যা।"

ফোন বেজে উঠল। সামুইয়ের হাতের কাছে ফোন, তিনি তুললেন, শুনলেন এবং

উদগ্রীব সমীরণের দিকে সেটি বাড়িয়ে ধরলেন।

"কে, কানু?"

"কারেক্ট খবর। নোভাচেককেই ফোন করেছিলাম, বলল ট্যুরটা হঠাৎই ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গেছে। সম্ভব হলে স্যাম আজই ফ্লাই করুক, নয়তো পজিটিভলি যেন কাল করে। একদিন দেরি হলে ওকে বাদ দেব। হাতে একদমই সময় নেই। দাদা, আমি এখন টাকা নিয়ে এয়ারলাইন্স দৌড়চ্ছি।"

"কিন্তু আমি যাব কী করে কানু, এখানে আমায় নজরবন্দি করে রেখেছে, ধরে রেখেছে। আই অ্যাম ইন এ জেইল।" সমীরণ চিৎকার করে উঠল। ঠকঠক কাঁপছে তার দেহ। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘাম ফুটেছে কপালে। "যেভাবে পারিস উদ্ধার করে নিয়ে যা। আমি ভারতের ক্যাপ্টেন হয়ে খেলতে চাই, সবার আগে আমি একটা মানুষ হতে চাই।"

সমীরণ আর কিছু বলার সুযোগ পেল না। ছোঁ মেরে তার হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়েছে মহাদেব সামুই।

"কী আজেবাজে কথা বলছিস সমীরণ! এটা কি জেলখানা? যাত্রীর সেক্রেটারির বাড়িকে তুই জেলখানা বলছিস? তুই আছিস যাত্রীর গেস্ট হয়ে, পতুর গেস্ট হয়ে, আর বলছিস কিনা...এমন বদনাম...ছি ছি ছি, কেউ দেবে না।"

"তা হলে আমাকে যেতে দিন।" সমীরণ দরজার দিকে পা বাড়াল। তিন-চারজন যুবক ছুটে গিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল। সমীরণ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মুখটা নামাল। কাঁধ দুটো হতাশায় ঝুলে সে কুঁজো হয়ে গেছে। পায়ে পায়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। টেপরেকর্ডারে তখনও হিন্দি গান হয়ে চলেছে।

॥ ৯ ॥

"কী বলল?" খাটের ওপর ধীরে ধীরে উঠে বসলেন রেখা গুপ্ত। "যেভাবে পারিস উদ্ধার করে নিয়ে যা!...আমায় ধরে রেখেছে! আমার নাকুকে ওরা ধরে রেখেছে? আমি যাব।"

খাট থেকে নামলেন রেখা গুপ্ত। পিসির চোখমুখ দেখে শ্যামলা জড়িয়ে ধরে টেনে এনে তাঁকে খাটে বসাল।

"কোথায় যাবে তুমি?"

"যেখানে নাকুকে ধরে রেখেছে। কত ক্ষমতা আছে ওই ঘুনু মিত্তিরদের, আমি দেখব।"

"ওখানে গিয়ে কোনও লাভ হবে না পিসি। দাদাকে যদি বের করে আনতে হয় তা হলে অন্য উপায় ভাবতে হবে।" শ্যামলা ঠাণ্ডা গলায় বলল।

"কী উপায়?" রেখা গুপ্তর চোখের আগুন অল্প স্তিমিত হল।

"ভাবতে হবে।"

"তা হলে তাড়াতাড়ি ভাব।"

"এসব কি একা ভাবা যায়? তুমিও ভাবো।"

"আমি কী ভাবব, আমার মাথার কিছু ঠিক নেই এখন। এখন ইচ্ছে করছে জেল ভেঙে, ওদের হাত-পা গুঁড়িয়ে, মাথা ফাটিয়ে নাকুকে বের করে আনতে। এছাড়া আর কিছু মাথায় আসছে না। ভটচাযদের মতো ঠাণ্ডা মাথা তো আমার নয়।"

"হয়েছে।" শ্যামলার চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল চিচিংফাঁক হওয়া গুহাটা। "ওকেই বলে দেখি। তুমি চুপ করে এখন শুয়ে থাকো। কানুর এয়ারলাইন্স অফিস থেকে ফিরতে দেড়-দু' ঘণ্টা তো লাগবেই, ততক্ষণে আমি ভটচায-জেঠুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।"

"দত্তবাবুকেও ব্যাপারটা বলিস। পুলিশে ছিলেন তো, বদমাইশ লোকেদের শায়েস্তা করার ব্যাপারটা জানেন।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে ডাইনিং টেবিল ঘিরে বসে গেল বেগারদের শলাপরামর্শের অধিবেশন। সরোজ বসাক কাজে বেরিয়েছেন, তাই অনুপস্থিত। সমস্যাটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়ে শ্যামলা বলল, "তা হলে কী উপায়?"

"শঠে শাঠ্যং ছাড়া কোনও উপায় তো দেখছি না।" ভটচায চিন্তিত চোখে ব্যান্ডেজ জড়ানো পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মালবিকা ইতস্তত করে বললেন, "মলা তুমি বলছ বিনু না পিনু জন, তাকে পাওয়ার জন্য এই ঘুনু মিত্তির দু'-দু'বার এর্নাকুলম পর্যন্ত ছুটেছিল?"

"কাল রাত্তিরে মশারি গুঁজে দেওয়ার সময় দাদা বলল, 'টুলে বসে একটু কথা বল যাতে বাইরে থেকে ওরা বুঝতে পারে আমি রিল্যাক্সড আছি।" তখনই তো দাদা বলল, "বিনু জনকে পাওয়ার জন্য ঘুনুদার এত ছোটাছুটি, পয়সা খরচ হল, অথচ সে এখন কিনা চন্দননগরে সারথির কবজায়।"

"নাকুর সঙ্গে বিনুর আলাপ কেমন?" ভটচায জানতে চাইলেন।

"খুব আলাপ।" দাদা বলল, " ও তো আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসতেও চেয়েছিল।"

"হুম্‌ম।" ভটচাযের আঙুলগুলো টেবিলের কাঠে ঢাকের বোল তুলল। সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে।

"বিনু জনকে দিয়ে এখন কী হবে!" জি. সি. দত্ত অধৈর্য হয়ে পড়লেন। "এখন দরকার কুইক অ্যাকশন। বহুদিন হাত-পা গুটিয়ে রেখে শরীরটা আমার মাখন মাখন হয়ে পড়েছে। আমি বরং রেইড করতে যাই পতু ঘোষের বাড়িতে। যা হওয়ার হবে।"

"কাল রাতে তিনটে গুণ্ডাকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন বলে কি ভেবেছেন, সবাই আপনাকে ভয় পাবে?" মালবিকা প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসল।

হাত তুলে, চেয়ার থেকে ওঠা দত্তর চ্যালেঞ্জ গ্রহণটাকে বসিয়ে দিয়ে ভটচায বললেন, "আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। যাত্রীর কাউকে আমরা যদি হোস্টেজ রাখতে পারি তা হলে বন্দি বিনিময়ের মতো—"

"কাশ্মীরে যা হচ্ছে?" মালবিকা বললেন।

"আসামেও তো হচ্ছে।" দত্ত জানিয়ে দিলেন তিনিও ওয়াকিবহাল।

"মলা তুমি একটু পাশের ঘরে এসো, কথা আছে।"

পাশের ঘরে ওরা দু'জন মিনিটসাতেক ফিসফিস করে বেরিয়ে এল।

"এটা কিন্তু ঠিক হল না মিস্টার ভটচায।" জি. সি. দত্ত দেরিতে হলেও তাঁর ক্ষোভটা জানালেন। "আমাদের সামনে কি কথা বলা যেত না?"

"যেত, তবে কিনা আমি অত্যন্ত গুরুতর একটা ব্যাপার নিয়ে, মানে একটি তরুণের বড় হওয়ার চেষ্টাকে সাহায্য করার একটা কাজ নিয়ে ফেলেছি। তাই বুদ্ধিটাকে থিতিয়ে নিয়ে, মানে অবান্তর কথাবার্তা থেকে সরে গিয়ে এখন কাজে নামা দরকার।" ভটচায এত আন্তরিক ও গম্ভীর হয়ে কথাগুলো বললেন যে, দত্ত পর্যন্ত মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে ফেললেন, "তা তো বটেই।"

"মলা, তা হলে ফোন করো।" ভটচায নির্দেশ দিয়ে চেয়ারে টান হয়ে বসলেন।

শ্যামলা ডায়াল করে ঘরের সকলের দিকে নার্ভাস চোখে একবার তাকাল।

"হ্যালো, এটা কি ঘুনু মিত্তিরের বাড়ি?...তিনি কি আছেন?...আমি? আমি সমীরণ গুপ্তর বাড়ি থেকে বলছি, ওর বোন।...ঘুমোচ্ছেন? খুব জরুরি একটা দরকার, যাত্রীর জন্য একটা ইনফরমেশন দেব যেটা ওঁর খুব কাজে লাগবে...আচ্ছা ধরছি।"

শ্যামলা ঘরের ওপর চোখ বুলিয়ে আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল। প্রত্যেকের চোখমুখ, এমনকী বসার ভঙ্গিতে সিঁটোনো ভাব। যেন তার ওপরই নির্ভর করছে সমীরণের মুক্তি।

"হ্যালো কাকাবাবু, আমি নাকুর বোন মলা। আমাদের বাড়িতে ঘণ্টাখানেক আগে", শ্যামলা ঝপ করে গলার স্বর নামিয়ে বলল, "বিনু জন এসেছে।...বিনু জন, বিনু জন কেরলের। বাঙ্গালোর ক্যাম্পে দাদার সঙ্গে তো ওর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। অনেকবার বলেছে তোমাদের বাড়িতে যাব, কয়েকদিন থেকে কলকাতাটা দেখব। তা সারথির লোকেরা তো তিন-চারবার ওর কাছে গেছল। শেষে ওর বাবার হাতে অ্যাডভান্স ধরিয়ে দিয়েছে...দাদার কাছেই এসব কথা কাল রাতে শুনেছি। তা সেই বিনু জন সই করার জন্য চলে এসেছে। কিন্তু এয়ারপোর্টে সারথির কেউ ছিল না। বোধ হয় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমাদের ঠিকানাটা ওর কাছে ছিল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আমাদের বাড়ি চলে এসেছে।...কাকাবাবু, আমার মেজো ভাই কানু, ও বলল, তুই লুকিয়ে চট করে ঘুনুদাকে ফোন করে ব্যাপারটা বল। সারথির হাতে পড়ার আগেই বিনু জনকে যেন যাত্রীর ক্যাম্পে উঠিয়ে নিয়ে যায়...য়্যাঁ, ফোনটা বিনু জনকে দিতে বলছেন?" শ্যামলা ঢোঁক গিলল। ভটচায ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে, নিজের বাড়ির দিকে আঙুলটা তুলে, কানে অদৃশ্য ফোনের রিসিভার ধরলেন।

"কাকাবাবু, আমি এখানকার ভটচাযবাড়ি থেকে ফোন করছি।...কী বললেন? বিনু সম্পর্কে আর ইন্টারেস্টেড নন? অ, আচ্ছা...না না আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই, ভাবলাম যাত্রীর যদি এতে লাভ হয়, অন্তত ওকে আটকে রেখেও সারথিকে বঞ্চিত করে...হ্যাঁ, নমস্কার।"

শ্যামলা হতাশ চোখে সবার দিকে তাকিয়ে রিসিভার রাখল। ফ্যালফ্যাল করে

তাকিয়ে আছেন রেখা গুপ্ত। ভটচায মাথা চুলকোচ্ছেন, মালবিকা কপালে ঠুকলেন হাতের মুঠি। জি. সি. দত্ত "ঘোঁত" ধরনের একটা শব্দ মুখ থেকে বের করে কী একটা বলতে যাচ্ছেন তখনই ফোন বেজে উঠল।

শ্যামলা রিসিভার তুলতে যাচ্ছে, ভটচায চিৎকার করে উঠলেন, "না, না, তুমি নও। হয়তো ঘুনু মিত্তিরই ফোন করে তোমার কথাটা যাচাই করতে চায়। মিস গুপ্ত, আপনি ধরুন, বলবেন বিনু জন এখন বাড়ি নেই, রান্না-করা কিছু নেই, কানু ওকে খাওয়াবার জন্য 'তারামা'য় নিয়ে গেছে। মহা ঘাঘু লোক, এটা মনে রাখবেন।"

"মিথ্যে কথা বলব?" রেখা গুপ্ত অসহায়ভাবে তাকালেন।

"হ্যাঁ মিথ্যে বলবেন, নাকুর জন্যই বলবেন।" জি. সি. দত্ত-র দারোগাগর্জনে তিনটি হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠলেও চতুর্থজন সটান হয়ে ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"হ্যালো...ওহ্ নমস্কার, আমি নাকুর পিসিমা বলছি।...ফোন ধরার তো কেউ নেই, আমি শয্যাশায়ী, কাল ছাদ থেকে নামবার সময় আমি নিজেই পড়ে গিয়ে...এখন একটু ভাল আছি। সকালে উঠতে পারিনি, রান্নাবান্নাও কিছু হয়নি, এদিকে নাকুর এক বন্ধু, কী যেন নাম বলল পিনু না বিনু, সে এসে হাজির। ঘরে খাবারদাবার নেই, তাই কানুকে বললাম তারামা থেকে কিছু এনে দে, বেচারা কখন প্লেনে উঠেছে, উপোস করে আছে...ছেলেটি তো এখন বাড়ি নেই, কানুর সঙ্গে বেরিয়েছে। বাঙালির মিষ্টি কত রকমের, কেমন চেহারার হয় দেখার খুব ইচ্ছে, তাই ওর সঙ্গে দোকানে গেছে। মলাটাও যে শুট করে কোথায় বেরোল। তা কী জন্য ফোন করছেন? নাকু ভাল আছে তো?...অ, আচ্ছা আচ্ছা, কানুকেই বলব পিনু জনকে যাহোক করে বসিয়ে রাখতে, আপনি এসে ওকে নিয়ে যাবেন...নমস্কার।"

রেখা গুপ্ত কাঁপা হাতে রিসিভারটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলা 'পিসি...গো-ও-ও-ল।" বলে দু'হাত তুলে ভাংরা নাচের মতন শরীরটা ঝাঁকাল।

মালবিকা জড়িয়ে ধরলেন রেখা গুপ্তর দুটি হাত। "আমি এতক্ষণ ভগবানকে ডাকছিলাম, হে ভগবান রেখা যেন গুছিয়েগাছিয়ে মিথ্যে কথাটা বলতে পারে।"

"মনে হচ্ছে খুব আন্তরিকভাবেই ডেকেছেন। আমারও ভয় হচ্ছিল এই বুঝি গুবলেট করলেন। তবে এজন্য দত্তবাবুই ক্রেডিট পাবেন। নাকুর নামটা না করলে উনি এত শক্ত হতে পারতেন না।" ভটচাযের সপ্রশংস নজরে দত্তর বুকের ছাতি ও বাইসেপ্স ফুলিয়ে দিলেন।

"আর দেরি নয়, দেরি নয়, আমাদের জেলখানা কোনটে হবে?" মালবিকা তাড়া দিলেন।

সবাই তাকাল দত্তর দিকে। এ-ব্যাপারে পুলিশের অভিজ্ঞতার কাছে তাদের হাত পাততেই হবে। জি. সি. দত্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঘরগুলো আগে দেখব।"

শ্যামলাকে নিয়ে তিনি তিনটি শোবার ঘর, তাদের গ্রিল, জানলা, দরজা, মায় দেয়াল পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে পরখ করলেন। রান্নাঘরে, এমনকী বাথরুমেও ঢুকলেন। দোতলায় উঠে সুনীলবরণের ঘর দেখলেন।

"ছাদের ঘরটাই মনে—"

"না। দাদার ঘরে ওইসব পাজি লোক ঢোকাব না।" রেখা গুপ্তর কঠিন গলা দত্তকে দ্বিতীয় নির্বাচনে ঠেলে দিল।

"তা হলে কোণের ওই ছোট ঘরটা।" দত্ত অনুমোদনের জন্য রেখা গুপ্তর দিকে তাকালেন।

"কানুর ঘর, হ্যাঁ হতে পারে।"

এর পর দত্তর নির্দেশে দালানের জানলা বাদ দিয়ে সব ঘরের জানলা বন্ধ করা হল। চাপা গলায় তিনি বলতে লাগলেন, "ফটক খোলা থাক। বেল বাজলে মলা দরজা খুলে ওকে সোজা নিয়ে যাবে কানুর ঘরে। এই সময়টা খুবই ক্রুশিয়াল, একটু সন্দেহ হলেই কিন্তু পালিয়ে যেতে পারে। বিছানায় শুয়ে থাকবেন মিস গুপ্ত, চাদর মুড়ি দিয়ে। লোকটা ঘরে ঢুকলেই আমি ছুটে এসে দরজা বন্ধ করে দেব।"

"তারপর আমি কী করব?" রেখা গুপ্ত ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলেন।

"দরজা বন্ধের শব্দ পেলেই আপনি চাদর ফেলে লাফ দিয়ে উঠবেন। তারপর আপনি জাপটে ধরবেন লোকটাকে।"

"এ আপনি কী বলছেন, রেখা জাপটে ধরবে?" মালবিকা প্রতিবাদ এবং ভর্ৎসনা করলেন।

"খোকাকে তো আমি জাপটেই—"

"দত্তবাবু এ খোকা নয়, খোকার জ্যাঠা। অন্যভাবে ধরার প্ল্যান করুন।" ভটচাযকে বিরক্ত দেখাল।

"তা হলে একটা ডাণ্ডা হাতে রাখুন। লাফ দিয়ে উঠেই সেটা মাথায়—।"

"তারপর সত্যিকারের থানা, পুলিশ, জেল হোক রেখার।" মালবিকা হাত তুলে মনে হল ডাণ্ডাটা ধরলেন।

"আচ্ছা আমরা তো তখন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে ঘুনু মিত্তিরকে ঘিরে ধরতে পারি, গায়ে হাতটাত না দিয়েই।"

শ্যামলা সমাধানের পথ বাতলাল।

"হ্যাঁ, তাও হতে পারে।" দত্ত হাঁফ ছাড়লেন।

অতঃপর রেখা গুপ্ত একটা চাদর নিয়ে কানুর ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অন্যরা দরজা ভেজিয়ে নাকুর ঘরে বসে রইলেন। দালানে পায়চারি করতে লাগল শ্যামলা।

অবশেষে পতু ঘোষের সবুজ মারুতি ফটকের সামনে থামল। শ্যামলা পরদা ফাঁক করে জানলায় উঁকি দিয়ে দেখল ঘুনু মিত্তির ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে নামলেন এবং পেছনের সিটে বসা দুটি লোককে কী যেন বললেন। তারপর পকেট থেকে ডিবে বের করে নস্যি নাকে দিয়ে কিছুটা ইতস্তত করে ডিবেটা ড্রাইভারের হাতে জমা দিলেন।

সঙ্গে দুটো লোক! শ্যামলা রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। এটা তো হিসাবের মধ্যে রাখা হয়নি। লোক দুটো যদি অপেক্ষা করে করে ঘুনু মিত্তিরকে বেরিয়ে আসতে না

দেখে তখন তো খোঁজ করতে বাড়ির মধ্যে আসবে। সঙ্গে নিশ্চয় চেম্বার আছে। প্লেয়ার তুলতে এসব তো সঙ্গে রাখতেই হয়। তা হলে উপায়?

শ্যামলা দৌড়ে কানুর ঘরে এসে দেখল চাদর ঢেকে শুয়ে থাকার বদলে পিসিমা খাটের ওপর কাঠ হয়ে বসে, হাতে চাদর।

"সব্বোনাশ হয়েছে পিসি, লোকটার সঙ্গে আরও দুটো লোক। তারা অবশ্য গাড়িতেই বসে।"

ডোর-বেল বাজল।

"মলা আমি কী করব?" করুণ মুখে রেখা গুপ্ত বললেন।

"যা বলা হয়েছে তাই করো, চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো।" শ্যামলা ঠেলা দিয়ে রেখা গুপ্তকে বিছানার ওপর ফেলে চাদর দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে দিল।

দ্বিতীয়বার বেল বাজার সঙ্গেই দরজা খুলল শ্যামলা। "ওহ্ আপনি এসে গেছেন।" গলা নামিয়ে এর পর বলল, "খুব টায়ার্ড, ও ঘরে ঘুমোচ্ছে। আপনি এখন এখানেই বসুন।"

"সব বন্ধ কেন, অন্ধকার অন্ধকার লাগছে।" ঘুনু মিত্তির চেয়ারে বসলেন হাসি হাসি মুখে। "তুমি মা খুব বুদ্ধিমতী। ছেলে হলে তোমাকে ট্রেনিং দিয়ে যাত্রীর রিক্রুটিং অফিসার করে নিতাম। এমন সব বোকাহাবাদের নিয়ে কাজ করতে হয়। বিনু জন যে কলকাতায়, এটা তুমি না জানালে আমি জানতেই পারতাম না।"

"ওকে এখন কোথায় নিয়ে যাবেন?"

"দেখি কোথায় রাখা যায়।"

"কিন্তু ও তো সারথিতে খেলবে বলে এসেছে, আপনার সঙ্গে যাবে কেন?"

"আহা আমি তো সারথিরই লোক।" ঘুনু মিত্তির ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ টিপলেন। "ও কি আর চেনে কে যাত্রীর আর কে সারথির! সইসাবুদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও আমাদের কাছে থাকবে।"

"যেমন দাদাকে আপনারা রেখে দিয়েছেন। কিন্তু কাকাবাবু, দাদাকে এই মুহূর্তেই যে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। বাঙ্গালোর থেকে আজ ট্রাঙ্ককল এসেছে, ইন্ডিয়া টিম চেকোশ্লোভাকিয়া ট্যুরে যাচ্ছে। দাদাকে এক্ষুনি বাঙ্গালোর ফিরে যেতে হবে। সুতরাং সমীরণ গুপ্তকে এখনই বাড়িতে পাঠিয়ে দিন, কাল ভোরের ফ্লাইটে সে বাঙ্গালোর যাবে।"

"ইম্পসিব্‌ল। নাকুকে আমি ছাড়ব না। ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন হয়ে, ইন্ডিয়ার হয়ে খেলে ওর কি ল্যাজ গজাবে? কী পাবে ও? তোমরা অত দেশ দেশ করে চ্যাঁচাও কেন? চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়ে দশটা ম্যাচ খেলে তো চল্লিশটা গোল খেয়ে আসবে। ক'টা টাকা পাবে দেশের হয়ে খেলে? এসব চিন্তা ও ছাড়ুক। তার থেকে ক্লাবে খেলুক, টাকা কামাক, অর্জুন ফর্জুন হোক, তারপর কোচিংয়ে নামুক। তাতেও ভাল পয়সা, অফিসেও উন্নতি করুক, অফিসার হোক ব্যস বাঙালির ছেলের জীবনে আর কী চাই?"

"হ্যাঁ, আরও চাই। মনের গভীরে একটা সুখ, যেটা লাখ লাখ টাকা আয় করেও

মেলে না। এটা আমার নয়, দাদার কথা। আপনি আমার দাদাকে এনে দিন।"

"নাকু আমার অনেকদিনের টার্গেট, ওর আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম। ভগবান যখন পাইয়ে দিয়েছেন তখন আর হাতছাড়া করব না।"

"সেক্ষেত্রে, আপনিও আর এ-বাড়ির বাইরে যেতে পারবেন না।" শ্যামলা দাঁড়িয়ে কথা বলছিল এবার চেয়ারে বসল।

"তার মানে?"

"যেভাবে দাদাকে আটকে রেখেছেন, সেইভাবে আপনিও এই বাড়িতে আটকা থাকবেন। সে ছাড়া পেলে আপনিও পাবেন।"

"তা হলে বিনু জনের ব্যাপারটা ধাপ্পা?"

"পুরোপুরি।"

"তা হলে জেনে রাখো, নাকুকে আমি ছাড়ব না। তোমরা যা করতে পার করো।"

"তা হলে যেটা পারি তা হল, একটা একটা করে আপনার হাত, পা আমি ভাঙব, চোখ দুটো উপড়ে নেব।"

ঘুনু মিত্তির আর শ্যামলা চমকে চেয়ার থেকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। রেখা গুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর দু' চোখে ঠাণ্ডা চাহনি। অত্যন্ত ঠাণ্ডা চাহনি। ঘুনু মিত্তিরের দু' হাতে কাঁটা উঠল। ঘাড়টা সিরসির করছে।

"নাকুর জীবন যাত্রীর নয়, সারথির নয়, আপনার নয়, আমারও নয়, নাকুর জীবন নাকুরই। সেই জীবন যা চায় তাইই করবে। আপনি তা করতে দেবেন না। তা হলে আমিও—"। রেখা গুপ্ত দু' হাতে ঘুনু মিত্তিরের কলার ধরলেন, "আমিও আপনার স্বাধীনতা কেড়ে নেব।"

একটা হ্যাঁচকা টানে ঘুনু মিত্তির টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়লেন। তাঁর দুটি হাত পিছমোড়া করে ধরে একটু ঝুঁকে ঘুনুর কানের কাছে মুখ এনে, রেখা গুপ্ত বরফের মতো গলায় বললেন, "প্রথমে দুটো হাত, তারপর দুটো পা। সারাজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে।" বলেই তিনি হাতে মোচড় দিলেন।

ঘুনু মিত্তির যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন। শ্যামলা চোখ বন্ধ করে ফেলল। পিসির এই মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি। নাকুর ঘরের দরজার পাল্লা ঈষৎ ফাঁক হল এবং বন্ধ হয়ে গেল।

"আমার দুটো ছেলেকে মোটরে রেখে এসেছি, আমি কিন্তু এবার চ্যাঁচাব।"

"তা হলে ঘাড় মটকে দিয়ে চেঁচানি বন্ধ করে দেব।" রেখা গুপ্ত কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতে আবার মোচড় দিলেন। আবার আর্তনাদ।

"ফুটবল টুটবল আমি বুঝি না। এই তিনটে ছেলেমেয়েকে অনেক কষ্টে বড় করেছি। এরা আমার বুকের তিনটে পাঁজর! এর একটা ভেঙে দিলে আমি মরে যাব। আর জেনে রাখুন, মরতে যদি হয় তো মেরে মরব, ফাঁসিতে যেতে হয় তো যাব।"

তাঁর গলার দু'পাশের পেশি ফুলে উঠেছে। রক্ত জমে মুখ লাল। চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে রয়েছে দাঁতে দাঁত চাপার জন্য। রেখা গুপ্ত শেষবারের মতো একটা মোচড় দিয়ে ঘুনু মিত্তিরকে ছেড়ে দিলেন। ঘুনু নিথর হয়ে টেবিলের ওপর থুবড়ে পড়ে

রইলেন। দুটো হাত ঝুলছে।

"এখুনি টেলিফোন করে বলে দিন, নাকুকে যেন পৌঁছে দিয়ে যায়, নইলে—" এবার দুটো তালু সাঁড়াশির মতো ঘুনুর ঘাড়ে এঁটে বসল। "আমার শরীরে অল্পস্বল্প জোর আছে। এই ঘাড়টা ইচ্ছে করলেই—"। দশটা আঙুলের ব্যূহ ছোট হয়ে এল ঘুনুর শীর্ণ গলাটি ঘিরে।

এবার আর আর্তনাদ নয়, চাপা কান্নার মতো আওয়াজ হতেই হুঁশ ফিরে এল শ্যামলার। এগিয়ে এসে রেখা গুপ্তকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ধমকে উঠল, "পিসি, তুমি কি পাগল হলে? এখনি দমবন্ধ হয়ে মরে যেত।" তারপর ঘুনুকে মিনতির সুরে সে বলল, "কাকাবাবু, পিসিকে থামানো যাবে না। আপনি ওর কথা শুনুন, ফোন করে দিন।"

ঘুনুর চোখ বন্ধ, মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না। শুধু মাথাটা নাড়লেন।

"ফোন করবেন?"

"হ্যাঁ। আমার হাতে কোনও জোর নেই, নাড়াতে পারছি না।" হাঁপাচ্ছেন। দুই চোখে ছেয়ে রয়েছে আতঙ্ক।

"আপনি বসুন, আমি ডায়াল করে রিসিভারটা আপনাকে দিচ্ছি।"

শ্যামলা যখন ডায়াল করছে, রেখা গুপ্ত তখন প্রায় ছুটেই কানুর ঘরে চলে গেলেন।

"হ্যালো, এটা কি পতু ঘোষের বাড়ি?...একটু ধরুন, ঘুনুদা কথা বলবেন...হ্যাঁ ঘুনু মিত্তির।"

রিসিভারটা ঘুনুর হাতে তুলে দেওয়ার সময় শ্যামলা মুখ ঘুরিয়ে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল, চাদরে নিজেকে ঢেকে নিয়ে পিসি বিছানায় উপুড় হয়ে। ফুলে ফুলে উঠছে পিঠ।

"কে, মানু নাকি?...শোন, নাকু কোথায়?...আচ্ছা, ওকে এখনি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যা।" ঘুনু আড়চোখে শ্যামলার মুখটা দেখে নিলেন। শ্যামলা মাথা নাড়ল। "একটা ট্যাক্সি করে নে, ওর যা জিনিস আছে সে সবও যেন নিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি করিস, নইলে—"। ঘুনু রিসিভারটা তুলে দিলেন শ্যামলার হাতে।

"কাকাবাবু আপনি একটু চা খান, আমি করে আনছি।"

ঘুনু সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন কথা না বলে। তারপর ধীরে ধীরে মাথাটা নামিয়ে টেবিলে কপাল রাখলেন। শ্যামলা রান্নাঘরে গেল। তখন নাকুর ঘরের দরজার একটা পাল্লা সন্তর্পণে খুলে পা টিপেটিপে তিনজন বেরিয়ে এলেন। ফটক পার হয়েই বেগিংয়ের থেকে দ্রুত গতিতে তাঁরা বাড়ির পথ ধরলেন।

"..আই সি ফ্লাইট নাম্বার সেভেন সেভেন ওয়ান ফর বাঙ্গালোর আর রিকোয়েস্টেড টু প্রসিড..." সিকিউরিটি চেকিংয়ের জন্য ঘোষণা হচ্ছে।

শ্যামলা তাড়া দিল, "দাদা লাইন পড়ে গেছে।"

"পড়ুক।" সমীরণ ব্যস্ততা না দেখিয়ে বইয়ের দোকানের দিকে এগোল। ওখানে

খবরের কাগজও বিক্রি হয়। সাড়ে পাঁচটা এখন। এত ভোরে এয়ারপোর্টে কাগজ পাওয়া যাবে কি না তাই নিয়ে সে উদ্বিগ্ন থাকায় লক্ষ করেনি লোকটিকে।

"দাদা।"

শ্যামলার দৃষ্টি অনুসরণ করে সমীরণ অবাক হয়ে দেখল, লাউঞ্জের একটা চেয়ারে ঘুনু মিত্তির বসে রয়েছেন। কোলে ব্রিফ কেস। বাঁ হাতের কনুইয়ের মোটা ব্যান্ডেজ, হাতটা গলায় বাঁধা ব্যান্ডেজে ঝুলিয়ে বুকের কাছে তুলে রাখা। ঘুনু তাদের দিকেই নির্বিকার মুখে তাকিয়ে রয়েছেন। "আপনি এখন এখানে?" সমীরণ বলল।

"খাংমাকে ধরতে যাচ্ছি। আমার প্লেন আটটা-চল্লিশে, একটু আগেই এসে গেলাম।...তুই সত্যি সত্যিই বাঙ্গালোর যাচ্ছিস, না ধাপ্পা মেরে বটার ঘরে উঠছিস সেটা তো দেখতে হবে।" ঘুনু মিত্তিরের গলায় কোনওরকম আবেগ নেই। বারো ঘণ্টা আগে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, মনে হচ্ছে না তার কণামাত্রও তিনি মনে করে রেখেছেন।

"ট্যুর থেকে ফিরে এসেও তো দাদা সই করতে পারবে আর করলে পিসি যা বলেছে, সেই ক্লাবেই করবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হাঁসফাঁসানিটা শ্যামলার গলা থেকে বেরিয়ে এল।

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে বলছ?" ঘুনু মিত্তিরের মুখের নির্বিকারত্ব মুছে গিয়ে হাসি ফুটে উঠল।

"ভি আই পি রোডের ওপর নিলডাউন হয়ে থাকার থেকে আপনার হাতে ধরা দেওয়া অনেক ভাল।" সমীরণের মুখও নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল।

ঘুনু মিত্তির ডান হাতটা সেলামের ভঙ্গিতে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "তোর পিসিকে নমস্কার।"

সিকিউরিটি চেকিংয়ের জন্য দ্বিতীয় ডাক শোনা গেল।

"নাকু, একটা কথা বলে রাখি, তোর কাছে দেশ যেমন বড়, আমার কাছে তেমনই ক্লাব...আমি ক্লাবের কাজ হাসিল করার জন্য নিজেকে যতটা ঢেলে দিই, আশা করব তুইও দেশের কাজটা সেইভাবে করবি।" তারপরেই চোখ টিপে নিচু গলায় বললেন, "কিন্তু, পা বাঁচিয়ে।"

শিবার ফিরে আসা



হাসপাতালের ডাক্তার বলেছিলেন, একদম নড়াচড়া নয়। পাঁচ হপ্তা পর প্লাস্টার খোলা হবে।

সেদিন তার বেড-এর পাশে ওরা সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল।

শ্রীকান্তদা বলেছিল, "কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় শরীরে অত আঘাত নিয়ে অতটা ছুটে যাওয়া! ওটা আমার কথা নয়, ডাক্তারবাবুই বললেন। পাঁজরে, পেটে, মাথায়, কোথায় না মেরেছে, হাত দুটোর অবস্থা তো—"

ভবানীসার বলেছিলেন, "তোমার পক্ষে এখন কথা বলা তো সম্ভব নয়, পরেই নয় বলব। মনের জোর এবার তোমায় সারিয়ে তুলবে।"

শচীনকাকু একটা খোলা ছাড়ানো সিদ্ধ ডিম বার করে মুখের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল। তখন সাগরমামি ছোট্ট একটা ধমক দেয়, "খাবে কী, চিবিয়ে কিছু খাওয়ার ক্ষমতা কি ওর আছে?"

"ডিমটারে কী কইরবেন?" ননী বলেছিল। "আমারে দ্যান, ক্ষুধা লাগচে।" ডিমটা শচীনকাকুর হাত থেকে তুলে নিয়ে, কামড় বসাতে গিয়ে থমকে গেছল ননী। "নাহ, আগে ওস্তাদরে ফিট কইরা তুলি, তারপর ভাগ কইরাই খামু। অ নিতুদা, অরে কবে বাড়ি লইয়া যাইতে পারুম?"

"ডাক্তার তো বললেন, দিন দশেকের আগে নয়।"

"অঃ। তারপর ফিট হইতে হইতে আরও তিন-চার মাস এইডা কোনও সময়ই না।" তারপর মুখের কাছে ঝুঁকে ননী বলেছিল, "তোর বস্তাফস্তা, দড়িদড়া, গ্লাভ্স সব তদ্দিনে আবার রেডি হইয়া যাইবি।"

প্লাস্টারের বাইরে যতটুকু শরীর, তাতে হাত বুলোতে বুলোতে মা বলেছিল, "ছোট থেকেই বাড়ন্ত গড়ন। বেশি বয়সি ভেবে সবাই ওর সঙ্গে বড়দের মতো ব্যবহার করেছে, ওর মনটা যে বাচ্চা রয়ে গেছে সেটা আর কেউ ভেবে দেখেনি।"

চোখ দুটো এধার-ওধার ঘুরিয়ে শিবা সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। ঘাড় ঘোরাবার ক্ষমতা ছিল না। তখন তাকে দেখাচ্ছিল মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত প্লাস্টারে মোড়া মমির মতো।

সেই সময় তার মনে হচ্ছিল, যন্ত্রণা তার শরীরে নয়, সেটা যেন, যারা তার বেড ঘিরে দাঁড়িয়ে, তাদেরই মনে। সবার চোখ ব্যথায় ঘন, নরম, ছলছল হয়ে রয়েছে। তখন তার মনে হয়েছিল, একটা নাড়ির বাঁধন যেন রয়েছে তার সঙ্গে দেবদাস পাঠক রোডের দু' ধারের মানুষদের, তার সঙ্গে 'পূর্বপল্লি' কলোনির প্রতিবেশীদের। ওদের চাহনিতে কী একটা যেন রয়েছে, শিবা সেটা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছিল না। শুধু

মনে হচ্ছিল সে আবার নতুন করে যেন জন্মাচ্ছে। এইবার সে কেঁদে উঠবে। মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বাচ্চা যেমন করে কেঁদে ওঠে, সেই ভাবে কান্না তার গলায় উঠে আসছিল। সে তখন মনে মনে বলেছিল, "আমি ফিরব, ফিরে আসব, আবার আমি রিং-এ উঠব।"

॥ ২ ॥

"অ শিবা, ওঠ ওঠ।"

কাঁধ ধরে মা নাড়া দিল যাকে, সে শুধু "উঁউঁউঁ" বলে পাশ ফিরল।

"ওঠ বাবা। নিতু কখন উঠে বেরিয়ে গেছে, দেরি করিসনি আর।"

"হুঁউউ।"

আরও মিনিট পাঁচেক শুয়ে থেকে শিবা প্রায় লাফিয়েই উঠে পড়ল। ছ্যাঁচা বাঁশের দেয়ালের ঘর। দেয়ালের ফাঁকগুলোয় জোনাকির মতো বিন্দু বিন্দু আলো থেকে সে অনুমান করার চেষ্টা করল সূর্য কতটা উঠেছে। তার মনে হল এখন সাড়ে ছ'টার বেশিই হবে। অবশ্যই তা হলে দেরি হয়ে গেছে।

ওদের একটাই ঘর। তাতে দুই ভাই আর মা থাকে। ঘরটা লম্বায় দশ হাত, চওড়ায় আট হাত। মেঝেয় একসময় সিমেন্টের একটা আস্তরণ ছিল, এখন সবটাই প্রায় চটা ওঠা। ঝাঁট দিলে চুন-সুরকির গুঁড়ো ওঠে। দেয়ালগুলোয় একটি করে দু' হাত লম্বা জানলা। দড়িতে ঝুলছে জামা-প্যান্ট ইত্যাদি। চন্দনের ও সিঁদুরের দাগ লাগা লক্ষ্মীর পট যে দেয়ালে, তার বিপরীত দেয়ালে আঁটা শীর্ণকায় একটি লোকের আবক্ষ বাঁধানো ফোটো।

ছবিটা শিবার মৃত বাবা দয়ালচাঁদ আইচ-এর। লম্বাটে মুখ, পাতাকাটা চুল, আয়ত চোখ দুটিতে আত্মবিশ্বাস ও জেদ প্রকাশ পাচ্ছে। স্কুলে পড়ার সময় বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিয়ে আট মাস জেল খাটেন। বড় ছেলের নাম নেতাজি ও মেজো ছেলের নাম শিবাজি রেখেছিলেন সংগ্রামী মানসিকতাকে শ্রদ্ধা জানাতে। তার পরের দুটি ছেলে, যারা অল্পবয়সে কলেরায় মারা যায়, তাদের নামের সঙ্গে কোনও দেশবরেণ্যর স্মৃতি আর তিনি জড়াননি। তারা শুধুই দিলীপ আর নীলেশ। প্রায় ভিখারি অবস্থায়, তিক্ত, ভগ্ন হৃদয়ে, বিনা চিকিৎসায় তিনি যক্ষ্মা রোগে মারা যান এই ঘরেই। জমিদার মুখুজ্যেদের পোড়ো জমি তাঁরই নেতৃত্বে জবরদখল করে গড়ে উঠেছে 'পূর্বপল্লি', নামকরণ দয়াল আইচেরই।

ঘরের কোণে একটা বেঞ্চ। তার ওপর গোল করে পাকানো দুটো মাদুর মোড়া কাঁথা ও বালিশ। শিবা তার নিজের শয্যা অর্থাৎ কাঁথা-মাদুর ওই দুটির ওপর রেখে দিল । একটা টেবিল ঘরের অন্য দেয়াল ঘেঁষে। সেখান থেকে গুঁড়ো মাজনের কৌটোটা তুলে ঢাকনা খুলেই শিবা ভ্রূ কোঁচকাল। চেঁচিয়ে বলল, "মা, নিতুদা মাজন শেষ করে রেখে গেছে। এখন কী করি?"

ঘরের বাইরে চার হাত চওড়া মাটির দাওয়া। টালির চালটা তার ওপর এত ঝুঁকে

পড়েছে যে, মাথা নামিয়ে বাইরে থেকে দাওয়ায় উঠতে হয়। দাওয়ার এক প্রান্তে ইটের কোমর-উঁচু দেয়ালে ঘেরা অংশটা রান্নার জায়গা। করুণা তখন উনুনে কয়লা সাজাচ্ছিলেন। চেঁচিয়ে বললেন, "কী আবার করবি, ছাই দিয়ে মেজে নে।"

"না।" শিবা বিরক্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "ওতে দাঁত খারাপ হয়ে যায়।"

দাওয়া থেকে নেমে ডান দিকে প্রায় কুড়ি হাত দূরের তাদেরটার মতোই আর একটা টালির ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল।

"মামি আছ না কি?"

"কেন রে শিবা?" ঘরের ভেতর থেকে সাগরমামি সাড়া দিল।

"তোমার কাছে মাজন আছে, সাদা মাজন? আমাদের ফুরিয়ে গেছে।"

"দাঁড়া দিচ্ছি।"

সাগরমামি ঘর থেকে বেরিয়ে এল, হাতে লাল প্লাস্টিকের একটা কৌটো। পেছনে তার স্বামী শক্তি দাস।

"এইসব মাজনটাজনে দাঁত মাজিস না, এতে দাঁত শক্ত হয় না।" শক্তি দাসের হাতে নিমের দাঁতন। সেটা চিবোতে শুরু করল। "এই যে নিমের রস, এটা শুধু দাঁতেরই নয়, লিভারের পক্ষেও ভাল।"

সাগরমামি কড়া চোখে একবার স্বামীর মুখে তাকিয়ে কৌটোটা শিবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আধ ঘণ্টা ধরে নিমের কাঠি চিবোতে গেলে মেয়েদের চলে না।"

"তুমি ঢেলে দাও।" শিবা বাঁ হাতের তালু মেলে ধরল। কৌটোর ঢাকনা খুলে ঝাঁকিয়ে মাজন বার করতে গিয়ে সাগরমামি থমকে গেল।

"তোর আঙুলটা তো এখনও বাঁকা রয়ে গেছে!"

শিবার বাঁ হাতের তর্জনীটা দু' আঙুলে ধরে সাগরমামি নাড়ানাড়ি করে দেখতে লাগল।

"আগে আরও বাঁকা ছিল।" শিবা বলল।

"ব্যথা করে?"

"না, একদমই না।" শিবা হাসল।

"কতদিন হল বল তো?"

"সাড়ে তিন বছর তো হবেই।"

কৌটোটা ঝাঁকিয়ে তালুতে মাজন ঢেলে সাগরমামি বলল, "তবু ভাল, বড়রকমের কোনও অঙ্গহানি হয়নি। যা মার তোকে মেরেছিল, ভাবলে এখনও শিউরে উঠি।"

"ওদের টার্গেট ছিল শিবার দুটো হাত। আর যাতে না ঘুসি ছুড়তে পারে সেজন্য অকেজো করে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য।" শক্তি দাস বহুবার বলা এবং শোনা কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করল। শুধু নতুন একটা কথা যোগ করল, "শিবার ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সাধটা আর পূরণ হল না। ওই একবারই যা ফাইনালে—"

শিবা তখন ডান হাতের তর্জনীতে মাজন লাগিয়ে দাঁতে ঘষতে শুরু করে দিয়েছে।

ঘষা বন্ধ রেখে শক্তি দাসের দিকে একবার তাকাল। কিছুই বলল না। চাউনি থেকেও বোঝা গেল না ব্যাপারটা নিয়ে সে কখনও ভেবেছে কি না।

"না শিবা না, ঘুসোঘুসিতে আর যাসনি।" সাগরমামির আন্তরিকতা তার চোখে ফুটে উঠল। "এ বড় মারাত্মক খেলা। তুই এইই ভাল আছিস। গরিবের ছেলে গতর খাটিয়ে কাজকম্মো করে খেতে হবে, ঘুসোঘুসি গুণ্ডা-বদমাশরা করুক।"

"আহ্‌হা, শিবা গুণ্ডা হওয়ার জন্য ঘুসি চালাবে না কি? এর নাম বক্সিং, রীতিমতো শিক্ষা করতে হয়, ট্রেনিং করতে হয়। লড়াই হয় মোটা কাছি দিয়ে ঘেরা উঁচু একটা দালানের মতো জায়গায়...সেদিন শ্রীকান্তদার ঘরে টিভিতে দেখলে না, দুজনে লড়ছিল। হাতে পরা ছিল বস্তার মতো দুটো গ্লাভ্‌স। ওটা পরে ঘুসি মারলে তেমন লাগে না।"

"লাগে না তো, ঘুসি খেয়ে একজন দড়াম করে চিতপটাং হয়ে আর উঠল না কেন? বাজে বকা তোমার একটা ওব্যেস। লাগে কি লাগে না তা আর আমায় বোঝাতে এসো না।"

সাগরমামির মুখঝামটা ভোরবেলায় আরম্ভ হলে সেটা রোদ চড়ার সঙ্গে সঙ্গে একই তেজে চড়বে। শক্তি দাস দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত তার এই জ্ঞানটুকু এবার বিজ্ঞতা সহকারে প্রয়োগ করল।

"দড়াম করে চিতপাত হল কেন, সেটা তোমার মতো বুদ্ধিমতীকে কি বুঝিতে দিতে হবে? একজনের ঘুসির জোর বেশি, আর-একজনের শরীরে ক্ষমতা কম, ব্যস। শিবার শরীরের ক্ষমতা আমার থেকে বেশি, এই আমি যদি এখন ওকে ঘুসি মারি—" শক্তি দাস দাঁতনটা দাঁতে চেপে দু' হাতের ঘুসি পাকাল। সাগরমামির চোখও সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত হল।

"তার মানে? তুমি ওকে ঘুসি মারবে নাকি? খবদ্দার বলছি, এই সেদিন অত ঝড় বয়ে গেল ওর শরীরের ওপর দিয়ে, ছেলের অখনও গায়ের ব্যথা মরেনি।"

"না, না, মামি, এতদিন হয়ে গেল, ব্যথাট্যথা কিছু নেই, একদম ফিট।" শিবা তাড়াতাড়ি তার শারীরিক ক্ষমতা সম্পর্কে ভুল ধারণাটা ভেঙে দেওয়ার জন্য আর-একটু যোগ করল, "দু'বার ডেকচিভরা আলুর দম ঘাড়ে নিয়ে এক মাইল যেতে হয়, বালতি বালতি জল টিউকল থেকে বয়ে আনতে হয়, প্লেট, গ্লাস ধুতে হয়, খদ্দেরকে দেখতে হয়, এসব কি শরীরে ক্ষমতা না থাকলে করা যায়?"

পূর্বপল্লি আর দেবদাস পাঠক রোডের বহু লোকের মনে ধারণা তৈরি হয়ে গেছে, শিবার শরীরে আগের মতো আর জোর নেই। সাধুর লোকেরা যেভাবে মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে দিয়েছিল, তারপর তো শক্তি ফিরে পাওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। বক্সার হিসেবে ও তো শেষ হয়েই গেছে। সবাই ওকে একটু করুণার চক্ষেই দেখে। এজন্য সে অস্বস্তি বোধ তো করেই, মনে মনে রেগেও ওঠে। গায়ে জোর নেই, এটা তার কাছে লজ্জার ব্যাপার।

দাওয়ায় জলভরা বালতিতে প্লাস্টিকের মগ ভাসছে। শিবা মগে জল নিয়ে মুখ ধুয়ে চলে যাওয়ার জন্য দু'পা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। "মামি, এখানকার

গুণ্ডা-মাস্তানরা ঘুসোঘুসি করে না, তাই তাদের গায়ের জোর থাকারও দরকার হয় না। বোমা, পিস্তল, পাইপগান আর চার-পাঁচজনে চেপে ধরে একজনকে ছোরা মারার জন্য কি এক্সাইজ করার দরকার হয়?"

"সাধুর শরীরে কিন্তু প্রচণ্ড জোর আছে, একসময় ও এক্সাইজ করত।" শক্তি দাসের চোখে, স্বরে সমীহ ও ভয় ফুটে উঠল।

দপ করে উঠেই শিবার চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। পুরনো সিনেমার বিবর্ণ ছবির মতো একসার ঘটনা ও মানুষ তার মাথার মধ্যে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে মাথাটা দু-তিনবার নেড়ে স্বীকার করল কথাটা। হ্যাঁ, সাধুর শরীরে ক্ষমতা আছে, ওয়েটলিফ্টার ছিল। শিবা কথা না বলে চলে গেল।

"শিবার গায়েও জোর আছে।" সাগরমামি নরম গলায় বলল শিবার ঘাড় আর পিঠের দিকে তাকিয়ে।

"জোর বলে জোর! ওর একটা ঘুসিতেই সাধু চিতপটাং হয়েছিল, তখন তো ওর বয়স মাত্র সতেরো!" শক্তি দাস প্রায় চার বছর ধরে তার জমিয়ে রাখা বিস্ময় থেকে খানিকটা ব্যয় করে ভারমুক্ত হল। "এখন সে বিত্তান্ত কাউকে বললে তো ভাববে গাঁজায় দম দিয়ে গপ্পো ফাঁদছি!"

"কাউকে বলার দরকার কী? যেমন দাঁতন করছ তাই করো, শিবা যেমন আছে তেমনই থাক।" নিঃসন্তান সাগরমামি স্বামীর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে ঘরের মধ্যে যাওয়ার সময় বলল, "সাধ টাধ পূরণ করার ইচ্ছেটা আর ওর মধ্যে চাগিয়ে তুলো না।"

"চাগিয়ে কি আর তুলতে হয়, এসব ব্যাপার আপনা থেকেই হয়ে যায়।" দাঁতনকাঠিটা চিবোতে চিবোতে শক্তি দাস আপন মনে বলল, "ঘুসিটা কি আর আগে থেকে ভেবেচিন্তে তারপর মেরেছিল? ওটা না মারলে শিবা কোনওদিন কি বক্সার হতে পারত?" ঘর থেকে স্ত্রীকে বেরিয়ে আসতে দেখে শক্তি দাস এবার জোরে জোরে দাঁতন ঘষতে শুরু করে দিল।

যে বৃত্তান্তর কথা শক্তি দাস উল্লেখ করল, সেটা লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে এখন কিংবদন্তির চেহারা নিয়েছে। এই অঞ্চলে নবাগত কাউকে সে কাহিনী বললে সত্যিই সে বিশ্বাস করবে না।

দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সাধন ঘোষ, যে এখন অনেকের কাছে সাধনবাবু বা সাধুদা, কয়েক বছর আগে সে কিন্তু সবার কাছে পরিচিত ছিল সাধু গুণ্ডা নামে। তখন বোমা, ছোরা, পাইপগান নিয়ে রাহাজানি, গুণ্ডামি, ট্রাক থেকে মাল লুট ছাড়াও, দাঙ্গা বাধানো, ধর্মঘট ভাঙা, ভাড়াটে তোলা, ভোটের বুথ দখল করা, বস্তিতে আগুন দেওয়া, রাস্তার বাজার থেকে তোলা আদায়, এমনকী স্কুলের পরীক্ষায় টোকাটুকির ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা ব্যাপারে সাধুর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল।

গত তিন বছর ধরে সে একটা কালীপুজো করছে ধুমধামিয়ে। তার পাড়া মিলনপল্লি থেকে বি টি রোড পর্যন্ত সাতদিন আলোর বন্যায় ভেসে যায়। সর্বত্র লোডশেডিং হলেও সাধুর কালীপুজোয় হয় না। পুজোয় সে পঞ্চাশজন গরিবকে বস্ত্র

বিতরণ করে। এম. পি, এম. এল এ, ফুটবলার, ফিল্মস্টাররা আসে, গানের ফাংশন হয়, গুণিজন সংবর্ধনা হয়, যাত্রা হয়, তিন দিন সিনেমা দেখানো হয়। এলাকায় সাধু খুবই জনপ্রিয়। বহু লোক ওকে ভক্তিশ্রদ্ধাও করে। বছরে একটি দরিদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়ের যাবতীয় খরচ সে দেয়। এজন্য কেউ কেউ তাকে রবিনহুডের সঙ্গে তুলনা করে।

কিন্তু চার বছর আগে সাধু যখন ভয়াবহ গুণ্ডা হিসেবেই পরিচিত অর্থাৎ যখনও সে 'বাবু' হয়ে ওঠেনি, সেই আমলের একটা সন্ধ্যায় ঘটনাটা ঘটেছিল।

শিবা তাকে ঘুসিটা মেরেছিল।

॥ ৩ ॥

দশ কিলোগ্রাম আলু, তারই দম। রাত্রে সমান মাপে আধখানা করে আলুগুলো কেটে সিদ্ধ করে রাখেন তারাময়ী। ভোরবেলায় কয়লার উনুন ধরিয়ে তিনি আলুর দম তৈরি করতে বসেন। নিতুর নির্দেশ মতোই ঝোলটা বেশি, ঝালটাও বেশি, এমন একটা দম তাঁকে তৈরি করতে হয় যাতে রসুনের গন্ধটা যেন নাকে লাগে। জুট মিলের মজুররা এমন জলখাবারই পছন্দ করে যেটা দামে সস্তা, খেতেও বেশ! পাউরুটি কোয়ার্টার পাউন্ড আর আলুর দম দু'টুকরো দেড় টাকা। ওরা ঝোলটাই বেশি করে চায়। একটার সময় টিফিনের ভোঁ বাজলে নিতু আর শিবার দম ফেলার সময় হয় না। দশ কিলো আলুর দম আর কুড়ি থেকে পঁচিশ পাউন্ড পাউরুটি আধ ঘণ্টায় উড়ে যায়। এইসঙ্গে আছে চা আর ওমলেট।

বি টি রোড থেকে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গার ধারে, পার্কিন্স জুট মিল-এর কাছে ফিডার রোডের মোড়ে সাত-আটটি চায়ের ও খাবারের দোকানের একটি হল নিতুর। তিন বছর আগে সে শুধু আলুর দমের ডেকচি, থলিভরা পাউরুটি, জলের বালতি ও কয়েকটি চায়ের প্লেট নিয়ে খোলা আকাশের নীচে তার ব্যবসা শুরু করেছিল। এখন বাঁশের খুঁটিতে লম্বায় ও চওড়ায় চার হাত করে পলিথিন চাদরের চালা, ইট আর মাটি দিয়ে তৈরি কোমর সমান উঁচু কয়লার উনুন, যাতে চা, ওমলেট ও রুটি সেঁকা হয়। বালতি এখন তিনটে। কাচের গ্লাস ও প্লেট দু' ডজন করে।

নিতুর প্রথম কাজ সকালে এসে উনুন ধরানো, সাইকেল ভ্যানে বেকারি থেকে পাউরুটি দিয়ে গেলে সেগুলো চার টুকরো করা, চায়ের জল গরম করা ইত্যাদি। তার আগে অবশ্য গ্লাস, প্লেট, অ্যালুমিনিয়ামের মগ, সসপ্যান, চা তৈরির সরঞ্জাম, ঘুঁটে-কয়লা ইত্যাদি যেসব জিনিস রাত্রে বাড়ি ফেরার আগে অধীরের সাইকেল গ্যারাজের এককোণে রেখে দেয়, সেগুলো নিয়ে আসে। রাখার জন্য মাসে চল্লিশ টাকা ভাড়া দিতে হয়। এই অধীর নন্দীই নিতুকে এখানে খাবার বিক্রির জন্য বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে জুট মিলের ইউনিয়ন, থানার মেজোবাবু আর মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় কমিশনারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে। তবে সেজন্য সে শর্ত দিয়েছিল, "যখন গ্যারাজে থাকব না, তখন নজর রাখবি চুরি টুরি যেন না যায়, আর

ঝামেলা টামেলা হলে দৌড়ে আসবি। তুই না তুই না, শিবা যেন এসে দাঁড়ায়।"

শর্তের কথা শুনে শিবা ক্ষুব্ধ হয়ে নিতুকে বলেছিল, "আমাকে ভেবেছে কী, গুণ্ডা? আমি গিয়ে মারামারি করব?"

"আহ্হ্, এটা একটা মাথাগরম করার মতো কথা নাকি?" ভাইকে ঠাণ্ডা করার জন্য নিতু বলে। "ওখানে পা রাখার মতো একটা সুযোগ প্রথমে দরকার। অধীরদা যা বলে, শুনে যাওয়া আর ঘাড় নাড়া। ঝামেলা যদি হয়ই, মিটমাট করে দিবি। মারপিটই করতে হবে এমন কোনও কথা আছে কি? মনে রাখিস আমাদেরও ওখানে ব্যবসা চালাতে হবে। মারপিট একদম নয়।"

নিতু গম্ভীর ও কড়া স্বরে শেষ বাক্যটি বলে দিল। শিবা মাথা নিচু করে শুনে বিড়বিড়িয়ে বলে, "আমার সম্পর্কে কী যে ধারণা লোকের!"

"ওই যে সাধুকে ঘুসি মেরেছিলি, লোকে সেটাই মনে করে রেখে দিয়েছে," নিতু বলেছিল।

"তারপর, সাধুরা যে আমায় মেরে ছ'মাস বিছানায় শুইয়ে রাখল—সেটা আর লোকেরা মনে রাখল না।"

নিতু ম্লান হেসে বলেছিল, "লোকেরা বীরত্বকেই মনে রাখতে চায়, কাপুরুষত্বকে নয়। একের সঙ্গে এক মুখোমুখি লড়াইটাই হল বীরের ধর্ম, কাজ। তুই সেটাই করেছিলি।"

শিবা তখন আড়চোখে তারাময়ীর দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, মায়ের চোখ জ্বলজ্বল করছে বড় ছেলের কথা শুনে, আর চাহনি ধরে হালকা মেঘের মতো ছায়ারা ভেসে আসছে তার দিকে।

প্রতিদিন সকালে শিবার প্রথম কাজ, তারাময়ীর রাঁধা আলুর দমের অর্ধেকটারও বেশি একটা বিশাল ডেকচিতে ঘাড়ে নিয়ে এক মাইল হেঁটে সাতটার মধ্যে দোকানে হাজির হওয়া। যাওয়ার পথে ডিম ব্যবসায়ী সতু বাঁড়ুজ্যের দোকান থেকে থলিটা এক হাতে তুলে নেয়, যাতে থাকে পঞ্চাশটা ডিম। তারপর সে খালি ডেকচি নিয়ে দুপুরে ফিরে এসে আবার বাকি আলুর দমটা নিয়ে যায় সন্ধ্যার খদ্দেরদের জন্য।

নিতুর দোকানের আলুর দমের চাহিদা আছে, কেননা তারাময়ীর রান্নার হাতটি অসাধারণ। কিন্তু উনুন থেকে রান্না নামাবার পর প্রতিদিনই তিনি বুকে অতি ক্ষীণ একটা কাঁপুনি বোধ করেন এই ভেবে—ঠিকমতো হয়েছে তো?

আজও তিনি প্রতিদিনের মতো ডাকলেন, "শিবা আয়।"

স্নান করে এসে শিবা ঘরে চুল আঁচড়াচ্ছিল। অস্ফুটে "উঁউ" বলে এমন গলায়, যা তারাময়ীর কানে পৌঁছল না।

বাটিতে আলুর দমের ঝোল নিয়ে তিনি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। "শিবা ঘরে আছিস?" ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে চুল আঁচড়ানোয় ব্যস্ত শিবাকে দেখে বললেন, "ঘরে ঢুকব না, হাত বাড়া, ধর তাড়াতাড়ি।"

বন্ধ হয়ে গেল চুল আঁচড়ানো। শিবার সারা দেহ শক্ত হয়ে গেল। ঠিক এই কথাগুলো, প্রায় এই কথাগুলোই ঠিক এইরকম স্বরেই তো মা বলেছিল...কত বছর

আগে...কত বছর? মা তখন রাঁধুনির কাজ করত জমিদার মুখুজ্যেবাড়িতে।

ঝোলের বাটিটা হাতে নিয়ে শিবা তারাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। উৎকণ্ঠিত মুখ। ঠিক এইরকমই তখন দেখাত মাকে।

"খেয়ে বল, ঠিক হয়েছে কি না, নুন কম হয়েছে? ঝাল?"

ঝোলে চুমুক দিয়ে কয়েক সেকেন্ড পর শিবা মাথা নেড়ে জানাল, ঠিক আছে।

তখনই কিন্তু শিবার মাথার মধ্যে সামান্য গোলমাল ঘটে গেল। আলুর দমের ডেকচিটা মাথায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে মুখজ্যেবাড়ির বাগানের পাঁচিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পাঁচিল শেষ হওয়ার পর বাঁ দিকে দেবদাস পাঠক রোড, যেটা গিয়ে মিশেছে বি টি রোডে।

পাঁচিলে একটা জায়গা ভাঙা। শিবা ডেকচি মাথায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখুজ্যেদের রান্নাঘরটা এই ভাঙা জায়গাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। জানলাটায় তারের জাল লাগানো। আগে তো জাল ছিল না! শিবার মাথার মধ্যে শুরু হওয়া গোলমালটা রূপান্তরিত হল ঘূর্ণিঝড়ে। সাঁ সাঁ করে দশটা বছর পিছিয়ে গিয়ে তার স্মৃতি আছড়ে পড়ল রান্নাঘরের ওই জানলাটার কাছে।

উনুনের ঠিক পেছনেই জানলাটা। জানলার বাইরেই আবর্জনার স্তূপ আর কাঁচা নর্দমা। সে দাঁড়িয়ে ছিল দেয়াল ঘেঁসে। ওধারে লোহার ফটক। বাগানটা ঝোপঝাড়ে ভরা। একটা কাঁঠাল আর গোটা-তিনেক আমগাছ ছাড়া বাগান বলার মতো আর কোনও বড় গাছ নেই। পাঁচিলের ভাঙা জায়গাটা দিয়ে সে প্রতিদিন ঢুকত। রান্নাঘরের জানলার পাশে কাদা-প্যাচপ্যাচে জমিতে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করত। তখন বারবার দু'ধারে তাকিয়ে দেখত কেউ তাকে দেখে ফেলল কি না। কোনও কোনওদিন আধঘণ্টাও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, যদি রান্নাঘরে গিন্নিমা কিংবা ভৃত্য হরিহর হাজির থাকত। যখন কাদায় পায়ের পাতা ডুবিয়ে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সে অপেক্ষা করত, রান্নাঘর থেকে তখন ভারী সুন্দর রান্নার গন্ধ ভেসে আসত। জিরে, পাঁচফোড়ন, গরমমশলা, কখনও-বা রসুন বা পেঁয়াজ। এইসব জিনিস দিয়ে রাঁধা খাবার তাদের বাড়িতে হত না।

গন্ধটা নাক দিয়ে শরীরে মধ্যে পাঠিয়ে সে নিশ্বাস বন্ধ করে রাখত। তখন সারা শরীরে একটা ঝিমঝিমে ভাব তৈরি হত। বারবার ঢোঁক গিলে চেষ্টা করত গন্ধটাকে পাকস্থলিতে চালান করার। তখন পেট জুড়ে একটা ব্যথা ছড়িয়ে যেত। ফুটন্ত মাছের ঝোলের বা ডালের বগবগ শব্দও সে শুনতে পেয়েছে কোনও-কোনওদিন। একটা বড় থালা দিয়ে মা কড়াইয়ের মুখ ঢেকে দিলে শব্দটা বন্ধ হয়ে যেত, গন্ধটাও আর পাওয়া যেত না। এক-একদিন সে ভাবত, মাকে বলবে কড়াইটা ঢেকে না দিতে। ওই রান্নার শব্দ আর গন্ধর জন্যই তো সে সারাদিন জানলাটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত।

বিরাট কড়ায় আঠারো জনের রান্না হয়। মা নামাতে পারত না, হরিহরকে ডাকতে হত কড়া নামাবার জন্য। তখন সে কল্পনা করত, মুখুজ্যেবাড়ির ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়ার আগে দালানে সার দিয়ে খেতে বসেছে। গরম গরম ভাত, ডাল, তরকারি,

মাছের ঝোল। সবই তার মায়ের হাতে রাঁধা। ওই সারির মধ্যে রয়েছে রঞ্জুও। সেজোবাবুর ছেলে রঞ্জন, তারই বয়সি। ধবধবে ফরসা গায়ের রং। বি টি রোড থেকে স্কুলবাসে ওঠার জন্য সে হরিহরের সঙ্গে হেঁটে যেত। পিঠে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে রঞ্জুর হাঁটা দেখতে তার খুব ভাল লাগত।

রান্নাঘরের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ওদের খাওয়ার দৃশ্য সে কল্পনায় দেখত। খেতে-খেতে রঞ্জুর মুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠছে, এটাই সে ভেবে নিত। রঞ্জুর তৃপ্তিকে নিজের তৃপ্তি করে নেওয়ার জন্য সে মনে মনে চেষ্টা করলেই তখন পাকস্থলিটা ঘুলিয়ে উঠে মুখে জল জমা হত। কিন্তু কান তার সজাগ থাকত একটা কথা শোনার জন্য, "শিবা, হাত বাড়া।"

জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে মায়ের হাতটা বেরিয়ে আসত। শালপাতা অথবা কাগজে মোড়া ভাত, ডাল, তরকারির একটা মণ্ড থাকত তার মধ্যে। সেটা হাতে নিয়েই বিদ্যুদ্বেগে সে জানলা থেকে সরে গিয়ে ভাঙা পাঁচিল টপকে বাড়ির দিকে ছুটত। মণ্ডটা থেকে গরম ভাপ তালু বেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে যেত তখন।

দিলু আর নিলু ঘরের কাছাকাছিই অপেক্ষা করত। তাকে দেখামাত্রই "মেজদা এসে গেছে" বলে ছুটে আসত। তাকে ঘিরে ওরা দাওয়ায় উবু হয়ে বসত। জাদুকর যেভাবে টুপির মধ্য থেকে খরগোশ বার করে সেইভাবে সে শালপাতা বা কাগজের মোড়কটা খুলত। ভাত, চচ্চড়ি বা সিদ্ধ ডাল, এইরকম কিছুই বেরিয়ে আসত। দিলু বা নিলু, কেউ একজন "ই ই ই" বলে আওয়াজ করে উঠত।

কিন্তু একদিন তারা ধরা পড়ে গেল।

নিশ্চয় কেউ তাদের লক্ষ করেছিল। হাতেনাতে ধরার জন্য তক্কে তক্কে ছিল। মা "শিবা আছিস" বলে ডাকতেই সে জানলার সামনে এসে হাত বাড়ায়। মা শালপাতার মোড়কটা যখন হাতে দিয়েছে তখন সে দেখতে পায়, রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গিন্নিমা তাকিয়ে রয়েছে।

সে ছুটে পালাতে যেতেই একেবারে হরিহরের মুখোমুখি। তার চুলের মুঠি ধরে হরিহর টেনে আনল বাড়ির মধ্যে। সে দেখতে পেল গিন্নিমার পা জড়িয়ে ধরে মা কী একটা কথা বলার চেষ্টা করছে। গিন্নিমাকে গালে হাত দিয়ে বলতে শুনেছিল, "বলো কী! এগারো বছর মাত্র বয়স দেখে তো মনে হয় ষোলো-সতেরো।"

"সত্যি বলছি মা, ও বাচ্চা ছেলে, ওকে মারবেন না। দোষ আমারই, আমিই চুরি করে ওকে দিয়েছি। ওর কোনও দোষ নেই মা। পেটের জ্বালায় বাচ্চা ছেলেগুলো ছটফটায়, মাথার ঠিক রাখতে পারিনি মা। ওদের উপোসি মুখ চোখ দিয়ে আর দেখতে পারি না।"

তখন সে মায়ের চোখ দুটো দেখেছিল। ভয়, নিদারুণ একটা ভয় সেই চোখে। চাকরিটা চলে যাবে। ষোলো বছরের বড় ছেলে নিতু চার টাকা রোজ-এ কারখানায় কাজ করে। তার রোজগারের টাকায় পাঁচটা পেট চালানো মানে একবেলা দু'মুঠো ভাতও নয়, হয়তো এইজন্যই ভয় কিংবা এগারো বছরের ছেলে চোরের মার খাবে বা পুলিশের হাতে যাবে, হয়তো সেইজন্যও।

শিবা তার জীবনের প্রথম ভয়কে দেখেছিল মার চোখে। তখন বয়স এগারো। সেই প্রথম শুনেছিল তার শরীরের আকারটি বড়, অন্তত পাঁচ-ছ বছর টপকিয়ে তার শরীর এগিয়ে রয়েছে। মায়ের সেই ভীত চাহনি একজোড়া গরম লোহার শিকের মতো সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনায় গেঁথে গেছল। তার যন্ত্রণা কখন যে নিঃসাড়ে শিরা-উপশিরা দিয়ে পেশিতে ছড়িয়ে গেছল, সে টের পায়নি। হরিহর একটা প্রচণ্ড থাপ্পড়ে তাকে যখন উঠোনে ফেলে দেয়, সে কোনও ব্যথা বোধ করেনি। তার সর্বাঙ্গ মায়ের চাহনি থেকে পাওয়া ভয় আর লজ্জায় অসাড় হয়ে ছিল। সে তখনই জেনে যায় ভয় একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এর মধ্যে ডুবে থাকার সময় খুব জোরে আঘাত এলেও দেহ তা শুষে নেয়।

এর কিছুদিন পর বিয়েবাড়ির বাসি খাবার খেয়েছিল ওরা তিনভাই। চাকর ফেলে দিচ্ছিল, শিবাই চেয়ে এনে, রেলপুকুরের ধারে লুকিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে দিলু-নিলুকেও খেতে দেয় সন্ধ্যায়। পরদিন সকালে ওদের দু'জনের ভেদবমি শুরু হতেই সে ভয়ে কথা বলতে পারেনি। দিলু-নিলু রাত্রে মারা যায় বিনা চিকিৎসায়। সে রক্ষা পেল কী করে, তাই নিয়ে অনেক ভেবেও কোনও কারণ খুঁজে পায়নি। কলেরাকেও তার শরীর শুষে নিয়েছিল।

সিনেমা চলতে চলতে হঠাৎ ফিল্মের রিল ছিঁড়ে যাওয়ার মতো, অতীতে ফিরে গিয়ে পুরনো একটা ঘটনা দেখা বন্ধ হল ননীর ডাক শুনে।

"চাইরবার চিল্লালাম 'ওস্তাদ ওস্তাদ' কইরা, মনডা কি ডেচকির মদ্যে আলুর দমের সাথেই ঢাকনা দিয়া রাখলা?" ধীরে প্যাডেল করতে করতে ননী শিবার পাশাপাশি সাইকেল রিকশাটাকে চালিয়ে যেতে যেতে বলল।

শিবা ত্যারচা চোখে ননীর মুখটা একবার দেখে নিয়ে বলল, "শুধু একটা আলু, ঝোল পাবি না।"

"এইডা কি একটা কথা হইল! এক মাইল পথ...না, না, এহান থিকা আধা মাইলই...কিনা একডা মাত্তর আলু, তাও ঝোল নয়!"

ডেকচি মাথায় শিবা দাঁড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ননীর সাইকেল রিকশাও।

"তোর সঙ্গে কথাই ছিল মাইল পিছু দুটো আলু আর ঝোল। আধ মাইল তো আমি হেঁটেই চলে এসেছি, বাকিটাও হেঁটে চলে যাব।" শিবা রাগত স্বরে বলল।

"হেই ওস্তাদ, একটু লেট কইরা ফ্যালাইচি, সেজন্য এভাবে ফাইন কইরো না। কাইল রাতে একটা খুচরা অ্যাকসিডেন্ট কইরা এমন মাইর খাইচি...ওঠো, ওঠো, যাইতে-যাইতে কমু।" সাইকেলের সিট থেকে নেমে ননী ব্যস্তভাবে শিবার মাথার ডেকচিতে হাত লাগাল। উচ্চতায় সে প্রায় শিবারই সমান, ছ'ফুট। কিন্তু প্রস্থে, দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়ালে মনে হবে বটগাছের পাশে সুপুরি গাছ।

ননী ঢ্যাঙা, লিকলিকে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। পরনে একটা ঢলঢলে সবুজ গেঞ্জি, যার বুকে ইংরেজিতে হলুদ অক্ষরে লেখা 'আই লাভ ইউ'। জিন্স-এর প্যান্টটা দু' বছর আগে শিবারই দেওয়া, হাঁটুর ওপর নীল কাপড়ের তাপ্পি, পায়ে হাওয়াই চটি, পেছনে

ওলটানো চুল, যার প্রান্তভাগ পায়রার ছড়ানো লেজের মতো। ননী বয়সে শিবার থেকে এক বছরের ছোট। ওর বাবা রাধেশ্যাম রিকশা চালাত, হাঁপানির জন্য আর পারে না। বউ আর দুই মেয়ের সঙ্গে বাড়িতে বসে এখন ঠোঙা বানায়।

ননীর শরীর দেখে বোঝা যায় না তার মধ্যে কতটা ক্ষমতা, সহনশীলতা লুকোনো আছে। দুশো কিলোগ্রাম ওজনের চালের বস্তার বা একটি সুপুষ্ট পরিবারের ভার, দেড় বা দুই মাইল সে রিকশায় চাপিয়ে সহজেই নিয়ে যায়। অকল্পনীয় তার কলিজার শক্তি। আর ঠিক ততটাই তার দুর্বলতা শিবা সম্পর্কে। যেদিন শিবা ঘুসি মেরে সাধুর চোয়াল ভেঙে দিয়েছিল, তার শাগরেদ দেবুর মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিল, সেদিন ওই দু'জনের বাড়ি ফেরার মতো শরীরের জোর ছিল না। সাধু একটা রিকশা ডেকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল ইশারায়, চোয়াল নাড়াবার মতো অবস্থা তখন তার ছিল না। রাধেশ্যাম পাগলের মতো চিৎকার করছিল, "অহনো ভগমান আচে, বুঝলা আচে। দীন-দুঃখীর ডাকে অহনো সাড়া দ্যায়। আমার পোলাপনগুলার সেই শুকনা মুখ—"

সাধু ও দেবুর প্রচণ্ড মার খাওয়া দেখে আনন্দে রাধেশ্যামের ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর কারণও ছিল। একবার সাধু তার রিকশায় চড়ে ভাড়া দেয়নি। না দেওয়াটাই তার রীতি। যেমন মিষ্টির দোকানে খেয়ে, লন্ড্রিতে কাপড় কাচিয়ে বা হকারের কাছ থেকে ম্যাগাজিন নিয়ে টাকা না দেওয়াটাও তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। রাধেশ্যাম সেদিন ভাড়া না পেয়ে চিৎকার করে প্রতিবাদ করেছিল। তাইতে বহু লোকের সামনেই সাধুর ছেলেরা তার রিকশার একটা চাকা খুলে নিয়ে যায়। কেউ বাধা দিতে এগিয়ে আসেনি, বরং রাধেশ্যাম যে চেঁচামেচি করে পাড়ার শান্তি বিপন্ন করল, এজন্য তারা খুবই ক্ষুব্ধ হয়। পনেরো টাকা জরিমানা দিয়ে সাত দিন পর সে চাকাটা ফেরত পায়, আর সেজন্য তাকে কর্জ করতে আর সুদে-আসলে ধার শুধতে দিতে হয় মোট পঁচিশ টাকা । সাতটা দিন তার আধপেটার সংসারকে সিকিপেটা থাকতে হয়েছিল।

শিবার হাতে সাধু আর দেবু বেদম মার খাওয়ার পর রিকশা চেয়েছিল। হেঁটে ফেরার মতো অবস্থা তাদের ছিল না। তখন রাধেশ্যামের গাল বেয়ে জল ঝরছিল আর বলছিল, "সাক্ষাৎ শিবরে আইজ চক্ষে দ্যাখতাসি..." তখন ননী তার বাবার হাত ধরে শান্ত স্বরে বলেছিল, "বাবা তুমি চুপ করো, এই দুডারে রিকশায় কইরা আমিই পৌঁছাইয়া দিমু।" তারপর সে আরও ঠাণ্ডা শক্ত গলায় বলেছিল,."রিকশাডারে সোজা বনোয়ারির নাদার গর্তে লইয়া ফ্যালামু।" বনোয়ারি গোয়ালার আটটা গোরু-মোষের খাটালের কিনারে গভীর একটা গর্ত আছে, সেখানে গোবর জমানো হয়, দু'হপ্তা অন্তর বিক্রির জন্য। ননী অবশ্য রিকশাটাকে সেই গর্তে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি, কারণ সাধু তার রিকশায় উঠতে অস্বীকার করেছিল।

আলুর দমের ডেকচিটা রিকশার পাদানিতে সাবধানে রেখে শিবা বলল, "হয়েছিল কী? মার খেলি কেন?"

"কইতাচি।" ননী রিকশার সিট তুলে ঢাকনা লাগানো একটা প্লাস্টিকের কৌটো বার করে বলল, "একডা না, তোমারে ওস্তাদ কই, তুমি দুইডাও দাও। ইজ্জত বাঁচনের ব্যাপার কিনা।"

শিবা প্রথমে একটা, পরে আর-একটা আলুর খণ্ড কৌটোয় রেখে আড়চোখে তাকাল। ননী তখন গভীর মনোযোগে টায়ারের হাওয়া পরীক্ষায় ব্যস্ত। উৎকণ্ঠায় ভুরু কোঁচকানো। শিবা তৃতীয় খণ্ডটি কৌটোয় রাখতেই ননীর ভুরু সমান হয়ে প্রায় উদাসীনতার পর্যায়ে চলে গেল। "নাহ্, হাওয়া ঠিকই—" বলতে বলতে কৌটোয় ঢাকনা এঁটে সিটের নীচে রেখে দিল।

প্যাডেল করতে করতে ননী বলল, "বাসি রুটি দিয়া আলুর দম, বুঝলা ওস্তাদ, অ্যামন খাওয়া হয়ের—"

"বুঝেছি। ডিম নিতে যাব, তাড়াতাড়ি চালা।...বল এবার, কেন মার খেলি?"

"কাল সন্ধ্যায় ব্যালঘরিয়ায় গ্যাছিলাম একডা ফ্যামিলিরে লইয়া...।" এর পর ননী যা বলল তার সংক্ষিপ্তসার: লোডশেডিংয়ের জন্য সরু রাস্তায় কতটা কিনার দিয়ে গেলে নালায় পড়বে না তাই নিয়ে সে খুবই ভাবিত ছিল। ফলে রাস্তার ধারে রাখা স্কুটারটা সে দেখতে পায়নি। রিকশার চাকার ধাক্কায় স্কুটারটা জমিতে পড়ে যায়। ব্যস, হইহই করে কয়েকটা লোক ছুটে এসে তাকে পিটোতে শুরু করে। যাই হোক, চড়চাপাটি, লাথি-ঘুসি খাওয়ার পর ননী আবিষ্কার করল এবং এইটিই মোক্ষম আঘাত, তার সওয়ার ফ্যামিলিটি অন্ধকারে ইতিমধ্যে মিলিয়ে গেছে। "আসল মারডা ওস্তাদ অরাই মাইরা গেল। ছয়-ছয়ডা ট্যাহা...।" ননী আফশোসে মাথা নাড়ল।

"অ্যাই, অ্যাই, দাঁড়া, দাঁড়া।"

ননী ব্রেক কষে মাথা ঘুরিয়ে দেখল শিবা রাস্তার ওধার দিয়ে হেঁটে যাওয়া, কালো সালোয়ার ও হলুদ কামিজ পরা, সাদা চুন্নি গায়ে এক তরুণীর দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে। "ননী চিনতে পাচ্ছিস ওকে?"

তীক্ষ্ণ নজরে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে ননী বলল, "হেই মাইয়াডা না? ভবানীসারের কোচিংয়ে আইয়া পড়ত!"

"হ্যাঁ। লালবাগান বক্সিং জিমন্যাশিয়ামেরই গায়ে একটা জিমন্যাস্টিক ক্লাবে ও প্র্যাক্টিস করত। লালবাগান পার্কের গেটের কাছে একদিন ওর সঙ্গে দেখা হতে বলেছিলুম, 'তুমি আর ভবানী-সারের কাছে পড়তে যাও না কেন?' বলেছিল, 'ওটা গুণ্ডাদের জায়গা।' আমি বললুম, 'গুণ্ডারা ভীষণ মার খেয়ে প্রতিজ্ঞা করে গেছে ও পাড়ায় আর আসবে না।'"

"ক্যারা মারচিল সেডা কি কইচিলা?"

"ধেত, নিজের ঢাক নিজে পেটায় নাকি, লোকে হাসবে।"

"পিডায়, পিডায়, তা না করলি অহনকার দিনে বড় হওন যায় না।"

ননী আবার প্যাডেল করতে শুরু করল।

"ও কিন্তু ভবানীসারের কোচিংয়ে আর আসেনি। বোম্বাইয়ে ন্যাশনালে লড়তে গিয়ে আবার ওকে দেখেছিলুম। ভেবেছিলুম কোনও জিমন্যাস্টিক টুর্নামেন্টে বুঝি

নামতে এসেছে। অ-ম্মা, দেখি স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলছে! খেলাটা ছিল বেঙ্গল-রাজস্থান। তারপর চৌপট্টিতে দেখলুম টিমের কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে ভেলপুরি খেতে এসেছে। তখন ওকে আবার বলেছিলুম, কোচিংয়ে যাও না কেন, গুণ্ডার ভয় তো আর নেই। কিন্তু কথাটায় কোনও গা করল না, এড়িয়ে গেল।"

"জিমন্যাস্টিক ছাইড়্যা কিরকেট! এর পর সারের কোচিংয়ে যখন আর গ্যাল না তাইলে তো পড়াডাও ছাড়চে!"

"রোজারিওর সঙ্গে আমার ফাইনালের লড়াইটা দেখতে ওরা কয়েকজন গেছল।"

"তাই কও! বক্সিংয়ের ওরা বোঝেডা কী?"

"না বুঝুক, হারা-জেতাটা তো বোঝে। দুয়ো শুনতে শুনতে ড্রেসিংরুমে ফিরে যাওয়ার সময় ওকে দেখেছিলুম, চোখে চোখ পড়তেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল।"

শিবার স্বরে বিষাদের ছোঁয়াটুকু ননীর কানে ঠেকল। সে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো নরম গলায় বলল, "হাইর‍্যা গ্যালে না সবাই মুখ ফিরাইয়া লয়, এইডাই নিয়ম। দ্যাহনা জিতলা পরে কত না সংবর্ধনা, কত না পুরস্কার...।"

তখন শিবা মুখ ঘুরিয়ে পেছনের রাস্তা দেখছিল, ননীর কথাগুলো তার কানে গেল না। মেয়েটি হাঁটতে হাঁটতে বাঁ দিকে জোনাকি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কস নামে স্টোভ ও হ্যারিকেন তৈরির কারখানা যাওয়ার রাস্তায় বেঁকে গেল। শিবা অবাক হয়ে ভাবল, এত সকালে মেয়েটি এই রাস্তায় কেন, এখানেই থাকে নাকি! কই এতদিনে একবারও তো তার চোখে পড়েনি? রিকশাটা তো ওর বেশি দূর দিয়ে যায়নি, একবার মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েও ছিল অথচ তাকে চিনতে পারল না! তার চেহারাটা তিন-চার বছরে কি খুব বদলে গেছে?

ব্রেক কষার ঝাঁকুনিতে শিবা সামনে তাকিয়ে দেখল ননীর চোখ তার মুখে আটকে রয়েছে। বুকের কাছে দুই মুঠি জড়ো করা।

"শিবা, তুই আবার শুরু কর, আবার তুই রিংয়ে নাম একবারটি।" ননীর কণ্ঠে মিনতি, চোখ দুটি ভিক্ষাপ্রার্থীর মতো, "মায়ের কিরা, বক্সিংয়ের কিরা, এই রিকশার কিরা...তুই চ্যাম্পিয়ান হইবিই। আমার মন কইত্যাচে,...কথাডা শোন। এইসব আলুর দম টম বেচা বন্ধ কইরা তুই প্র্যাক্টিসে নাইমা পড়। যহন তুই প্র্যাক্টিস করবি, তোর হইয়া নিতুদার লগে আমি কাম করুম। রোজারিওর লগে হাইরাচিস, জেতা লড়াই হাইরাচিস, কী দুখ্য যে পাইচিলাম, পুরবো পল্লির হগ্গলে—"

ননীর চোখে জলের আবরণ ছড়িয়ে রয়েছে। শিবার বুকের মধ্যে একটা ভয় চমকে উঠল। ননী যখন 'ওস্তাদ' না ডেকে শিবা, আর 'তুমি'র বদলে তুই বলে, শিবা বুঝতে পারে আবেগে, উত্তেজনায় ননী তখন গভীরভাবে আন্তরিক, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সে কথা বলছে। ওর মুখে 'শিবা' ডাকটা তার কাছে অত্যন্ত দামি, বুকের মধ্যে গরম লোহার শিকের মতো সেঁধিয়ে যায়। ওই ডাকে, অনেকটা মায়ের চোখে দেখা জীবনের প্রথম ভয়টাই তাকে পাইয়ে দেয়। সে জানে ননী অতি সরল, অতি সৎ। সব বিরোধিতা এদের কাছে নুয়ে পড়ে। মুখটা নামিয়ে শিবা বলল, "চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

॥ ৪ ॥

দেবদাস পাঠক রোডে বটকেষ্টর চায়ের দোকানে এক সময় শিবা কাজ করত। রাতে বাড়ি না ফিরে সে দোকানেই ঘুমোত। ভোরে উনুন ধরানো থেকে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত প্রধানত খদ্দেরদের চা দেওয়াই তার কাজ। অবশ্য, তারই ফাঁকে ওমলেট, টোস্ট আর ঘুগনিও সরবরাহ করতে হয়। দোকানে দোকানে চা দিয়ে আসার জন্য পাঁচ আঙুলে পাঁচটা গ্লাস ধরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাকে বেরোতে হলেই ভবানীসারের কোচিংয়ে একবার তখন উঁকি দিত।

যতীন্দ্রকিশোর হাই স্কুলে ক্লাস সেভেনে শিবা চার মাস পড়ার পর মাইনে বাকি পড়ায় নাম কাটা যায়। পূর্বপল্লির শচীন বটকেষ্টর দোকানের রাঁধুনি। শিবাকে সে-ই কাজটা জুটিয়ে দেয়। দু'বেলা ভাত আর কুড়ি টাকা বেতন। প্রথমদিকে সে রাত্রে বাড়ি ফিরে যেত। কেউটে সাপের তাড়া খাওয়ার পর নিতুই বারণ করে বাড়ি না ফিরতে। মাসে এক দিন যেত বেতনের টাকাটা দাদার হাতে দিয়ে আসার জন্য। দাদা দুটো টাকা তার হাতে দিয়ে বলত, "তোর হাতখরচ।"

একটা টেবলে মৌরির বাটি আর খাতা নিয়ে বটকেষ্ট বসে থাকে সারাদিন, দুপুরে ঘণ্টা তিনেকের জন্য বাড়ি যায়। কোথায় ক'টা চা বা ওমলেট যাচ্ছে তাই দেখে আর খাতায় লেখে। কোনও কিছু দিতে দেরি হলে খদ্দেরদের আগে বটকেষ্টই তাড়া লাগায়—"শিবা, অ শিবা, আধঘণ্টা আগে যে ক্যাসেটের দোকান দুটো চা বলেছে" অথবা "ডাক্তারবাবু যে মামলেট চাইল, কখন দিয়ে আসবি?" দু-তিন মিনিটকে বটকেষ্ট আধঘণ্টা বলে।

ভবানীসারের সঙ্গে শিবার সম্পর্কটা ছিল একটু অন্যরকমের। শান্ত, নির্বিরোধী, গম্ভীর প্রকৃতির ভবানীচরণ মাইতি পঁচিশ বছর যতীন্দ্রকিশোরে অঙ্কের শিক্ষকতা করছেন। ছোটখাটো শীর্ণ চেহারা, মাথায় টাক, কাচের গ্লাসের তলার মতো চশমার লেন্স দুটি পুরু, চশমা ছাড়া প্রায় অন্ধ। খদ্দর ছাড়া পরেন না। হাঁটেন মিলিটারির মতো থুতনি তুলে, সটান দেহে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ।

সকাল-সন্ধ্যায় কয়েকটি ছেলে ও একটি মেয়ে পড়তে আসে। ভবানীসারের কোচিংয়ের খ্যাতি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো। সিঁথি, বরানগর, বেলঘরিয়া থেকে পড়ুয়ারা আসে, কিন্তু তিনি দশটির বেশি নেন না। তার মধ্যে দু'জনকে পড়ান বিনা দক্ষিণায়, যেহেতু তারা গরিব এবং অঙ্কের মাথাটা দারুণ।

কোচিংয়ের একটি দেয়ালে ব্ল্যাকবোর্ড ঝোলানো। তার ওপরে স্বামী বিবেকানন্দের রঙিন একটি বাঁধানো ছবি। পড়ুয়ারা বসে মেঝেয় শতরঞ্চিতে। শিবা স্কুলে ভবানীসারের কাছে কখনও পড়েনি। উনি শুধু উঁচু ক্লাসে অঙ্ক এবং প্রয়োজনে ইংরেজি পড়ান।

শিবা বুঝতে পারত না, এই লোকটি কেন তাকে আকর্ষণ করে। রাশভারী, কম কথা বলা, গম্ভীর, কিন্তু একটা ছেলেমানুষিও আছে। কোচিংঘরের পাশের দরজা দিয়ে তিন হাত গলিতে বেরিয়ে পেছনে গেলেই সারের সংসার, কোচিংঘর ও

সংসারের মধ্যে কোনও দরজা-জানলা নেই, স্ত্রী সুপ্রভা শুধু সেখানে। একমাত্র ছেলেটি পিকনিক করতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মারা গেছে। ভবানীসার স্ত্রীকে ভয় পান। সুপ্রভা মুখরা এবং বাজে খরচ একদমই বরদাস্ত করেন না। তাঁর ধারণায়, সকাল-সন্ধ্যা এককাপ করে চা, ব্যস, এর বেশি খাওয়ার দরকার নেই। দু'কাপের বেশি হলেই সেটা বাজে খরচের তালিকায় পড়ে, তবে অনেক কাকুতিমিনতির পর সারাদিনে তিন কাপ বরাদ্দ করেছেন। ভবানীসার গঞ্জনাকে ভয় পান। অথচ চা তাঁর কাছে খুবই জরুরি পানীয়। আধঘণ্টা অন্তর গলাটা না ভেজাতে পারলে, অঙ্ক ব্যাপারটা তাঁর কাছে নীরস কিছু সংখ্যা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

একদিন শিবা চা দিতে ঢুকেছিল কোচিংঘরে। দরজায় দাঁড়িয়ে ভবানীসার তখন কথা বলছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে। পড়ুয়াদের জনা দুই সবেমাত্র এসেছে। শিবার হাতে চায়ের গ্লাস দেখে সুপ্রভা ভুরু কুঁচকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, "কী ব্যাপার? চা খাচ্ছ?" ফ্যাকাশে মুখে ভবানীসার মাথা নেড়ে বলে ওঠেন, "চা খাব আমি! পাগল নাকি! শিবা কোচিংয়ে পড়তে চায়, আমি বলেছি চায়ের দোকানের কাজ ছাড়লে, স্কুলে ভর্তি হলে, তবেই পড়াব। কিন্তু কাজটা ছেড়ে দেওয়াও তো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে-ওখানে দেওয়ার জন্য চা নিয়ে যাতায়াতের পথে রোজই একবার এসে ধরাধরি করে। যত বলি হবে না, স্কুলের ছাত্র ছাড়া পড়াই না, তবু শোনে না। এই দেখো, সকালে একবার এসেছিল, আবার এখন এসেছে। উফ্‌ফ কী যে নাছোড়বান্দা ছেলে। শিবা, বলেছি তো তোমাকে—এখন তুমি যাও, পরে ভেবে দেখব।"

শিবা প্রথমে হকচকিয়ে গেছল। কিন্তু ভবানীসারের মতো লোক যখন এইভাবে ঝাড়া মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেন, তখন নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। তার প্রাথমিক অনুভূতি বলল—বিপদে পড়েছেন, এখনই সারকে সার্পেটি করো।

সঙ্গে সঙ্গে চায়ের গ্লাস সমেত হাত দুটো বুকের কাছে তুলে কাঁচুমাচু মুখে সে বলল, "আপনি রোজই বলেন পরে ভেবে দেখব। কিন্তু কখনওই আমার কথা ভাবেন না।" তারপর একটু রাগ দেখিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমি গরিব, আপনাকে মাইনে দিতে পারব না তাই আমাকে ভর্তি করতে চান না। ঠিক আছে, আর কখনও আপনাকে বলতে আসব না।" এই বলেই সে আর দাঁড়িয়ে থাকেনি।

আধঘণ্টা পর বটকেষ্টর দোকানের সামনে এসে ভবানীসার হাতছানি দিয়ে শিবাকে ডাকেন।

"তুমি যে এত বুদ্ধিমান, তা তো জানতাম না। খুব বাঁচা বাঁচিয়েছ। ব্যাপারটা কী জানো, পারিবারিক শান্তি বজায় রেখে তো চলতে হবে।" ভবানীসার তারপর দৈনিক তিন কাপ বরাদ্দের কথা বলে শিবার কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন, "কী করে একটু চা খাওয়া যায় বলো তো?"

শিবার পরামর্শ মতোই তিনি প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর কোচিংঘরের বাইরে এসে ডান হাতটা তুলে দাঁড়ান, যেভাবে ক্রিকেট আম্পায়াররা আউটের সঙ্কেত দেন। এইভাবে সঙ্কেতের অর্থ: অনর্থ হবে না, চা দিয়ে যাও। শিবাও এক ঘণ্টা অন্তর দোকান থেকে বেরিয়ে প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে তাকিয়ে দেখে, হাত তুলে কোনও লোক স্ত্রীকে

চলাফেরার সময় পেশিগুলো অজগরের মতো ওর শরীরে নড়াচড়া করে। ওর পাশব শরীরে সব থেকে বেমানান মুখটি। গ্রিক দেবতার মতো মুখের আদল, শিশুর মতো চাহনি। বেঁটেখাটো সাধুর ডান পা-টি জন্ম থেকেই একটু ছোট।

এই পাড়ায় সাধু বহুদিন আসেনি, তাই অনেকের চোখ তার দিকে। দোকানে যারা এক গ্লাস চা নিয়ে সারা সন্ধ্যা বসে থাকে, তারা উঠে চলে গেছে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অনেকেই সাধুর দিকে একবার তাকিয়েই চলার বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। দেবদাস রোডে ছমছমে একটা ভাব।

সাধু আঙুল নেড়ে শিবাকে ডাকে, "শুনে যা।"

ফ্যালফ্যাল চোখে শিবা শুধু তাকিয়ে থাকে। রোগাটে, লম্বা সাধুর সঙ্গীটি তিরিক্ষে স্বরে বলল, "অ্যাই ব্যাটা, শুনতে পাসনি নাকি?"

শিবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে।

"মাস্টারটাকে চা দিতে গেছলি?" সাধু শান্ত গলায় জানতে চায়।

"হ্যাঁ।"

"ঘরে এখন কে আছে?"

শিবা জবাব দেওয়ার আগেই বটকেষ্ট বলে ওঠে, "কে আবার থাকবে, কয়েকটা ছেলে আর একটা মেয়ে...ওরে শিবা যা যা দৌড়ে যা, গ্যারেজে চা দিয়ে আয়।"

আঙুলের ডগায় তিনটে গ্লাস ধরে শিবা বেরিয়ে গেল। গ্রেট বেঙ্গল অটো রিপেয়ারিং-এর হেড মেকানিক শ্রীকান্ত দাস ব্যাটারির খোলের ওপর বসে মোটরের চাকায় ব্রেক শু লাগাচ্ছে। গ্যারেজের মালিক দুর্লভ চক্রবর্তী আর ঘিয়ে রঙের প্যান্ট ও নীল টি শার্ট পরা, কাঁচাপাকা চুলের কৃষ্ণকায় দোহারা গড়নের একটি লোক দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে তার কাজ।

চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়েই শ্রীকান্ত বলল, "অ্যাহ্হ্ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, যা গরম করে নিয়ে আয়।" দুর্লভও গ্লাসের চা ফেরত দিল। দু'গ্লাস চা ফিরিয়ে এনে শিবা দেখল সাধু ও তার সঙ্গীটি নেই। তার বুকের মধ্যে কেন জানি ছ্যাঁত করে উঠল। ভবানীসারের কোচিংয়ের দিকে তাকিয়ে রাস্তায় ওদের দেখতে পেল না। তা হলে ওরা গেল কোথায়?

চা আবার গরম করে গ্যারেজে পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় তার মনে হল কোচিংটা একবার দেখে এলে কেমন হয়!

তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মুহূর্তটি কখন এসেছিল, এই নিয়ে শিবা পরে যখনই ভেবেছে, ভাবতে ভাবতে সে এই জায়গাটাই পৌঁছেছে। একবার দেখে আসার ইচ্ছাটা তার মনের মধ্যে তৈরি না হলে সেদিন কোচিংঘরের জানলায় এসে দাঁড়াত না। না দাঁড়ালে সে দেখতে পেত না সেই দৃশ্য।

॥ ৫ ॥

"দুটো আলুর দম, রুটি।"

হুকুমের স্বরে কথাটা বলে লোক দুটি দুপা সরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল। নিতু দুটো ডিশ ওদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের কাজে মন দিল। শিবা বালতি থেকে জল নিয়ে এঁটো ডিশ ধুচ্ছিল। একবার মাত্র লোক দুটির মুখের দিকে তাকাল। নতুন খদ্দের, আগে কখনও এদের সে দেখেনি।

"সদর দরজাটা আটকে দিলে বেরোবার আর কোনও রাস্তা নেই। তার আগে টেলিফোন লাইনটা কেটে দেওয়া।"

"ঘেরাও কদ্দিন চলবে?"

"যদ্দিন না রিজাইন করবে। আরে বাবা, ইলেকট্রিসিটি বন্ধ, জলের লাইন বন্ধ, বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ। বউ আর একটা বাচ্চা নিয়ে ক'দিন ঘরে বসে থাকবে? বাচ্চাটাকে খাওয়াতে হবে না?"

"উদ্ধার করতে পুলিশ এলে, তখন?"

"আসবে না, ওসব ব্যবস্থা করা আছে।" এই বলে লোকটি ঝোল মাখানো পাউরুটি চিবোতে চিবোতে বলল, "ঝোলটা বেড়ে করেছে। আর-এক প্লেট খাব।"

"আমাকেও আর-একটা দিতে বল।"

শিবা কথাগুলো শুনল বটে, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝল না। আলুর দমের প্রশংসা শুনলে তার ভালই লাগে। লোক দুটো কুলিমজুর ধরনের নয়, কথার উচ্চারণ থেকেই শিবা সেটা বুঝতে পারল।

জুট মিলে রাতের শিফটে কাজ করতে যাওয়ার আগে চা খাচ্ছিল কয়েকজন। একজন নিতুকে বলল, "জোনাকিতে লকআউট হচ্ছে, শুনেছ নাকি?"

"না।"

নিতু তার দোকান ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামায় না, কৌতূহলও দেখায় না। ভোর থেকে রাত, শুধু খেটে যাওয়া। ব্যবসাটা বড় করা ছাড়া তার জীবনে আর কোনও লক্ষ্য নেই। একসময় সে ছোটখাটো একটা কারখানায় কাজ করত। মজুরি আর বোনাস বৃদ্ধি সহ এগারো দফা দাবি নিয়ে যে ধর্মঘট হয়, সে তার অন্যতম নেতা ছিল। সাধুর ছেলেদের দিয়ে পিটিয়ে মালিক গোরাবাবু ধর্মঘট ভেঙে দেয়। ধর্মঘটি নেতাদের বেশিরভাগই বন্ডে সই করে কাজে ফিরে যায়। নিতু যায়নি। "শ্রমিক আন্দোলন' কথাটা শুনলেই এখন তার ঠোঁট মুচড়ে ওঠে, বিদ্রূপে না ঘৃণায়, সেটা বলা শক্ত।

"আমার কানেও অমন একটা কথা এসেছে।" আর-একজন বলল, "ছেলে বলছিল, ওর এক বন্ধুর কাকা ওখানে কাজ করে, তার কাছেই শুনেছে। মালিক কারখানাটা তুলে দিয়ে ওখানে ফ্ল্যাটবাড়ি বানাবে। কিন্তু ছোকরা ম্যানেজার নাকি বেঁকে বসেছে। বলছে, কারখানা তুলে দেওয়া চলবে না। কোয়ার্টারও সে ছাড়বে না। রগড় জমেছে ভাল। ম্যানেজারের সঙ্গে মালিকের লড়াই বেধে গেছে!"

শুনতে শুনতে দুপুরে সেই দুটো লোকের কথোপকথন শিবার মনে পড়ে গেল। তার ভ্রূ দুটো তখন একবার শুধু কুঁচকে উঠল । রাতে বাড়ি ফেরার সময় সে জোনাকির মোড়ে থমকে দাঁড়াল। প্রায় দুশো মিটার দূরে কারখানার উঁচু পাঁচিল আর টিনের চালার কিছুটা দেখা যাচ্ছে। ভেতরে কাঠের থাম্বায় ইলেকট্রিক বালব জ্বলছে। মানুষজন নেই। রাস্তার দু' ধারে একতলা পাকা বাড়ি এবং মাটির বাড়ি। রাস্তায় আলো নেই।

দু'দিন পর সকালে শিবা ডেকচি ঘাড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ননীকে খুঁজল। দেখতে না পেয়ে হেঁটেই রওনা দিল। জোনাকির মোড়ের কাছে এসে ওপারের বাস স্টপে চোখ পড়তে তার চলা থেমে গেল।

সেই মেয়েটি, বোধহয় বাসের জন্যই দাঁড়িয়ে। এত সকালে, এখানে! শিবা ইতস্তত করে, কৌতূহল আর না চাপতে পেরে রাস্তা পার হল।

"চিনতে পারো?"

বড় ডেকচি ঘাড়ে বসানো একটি তরুণ হঠাৎ সামনে এসে হাসিমুখে কথাটা বলায় মেয়েটি প্রথমে থতমত হয়ে পড়ল। চোখ কুঁচকে চেনার চেষ্টা করতে করতে অবশেষে মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। দুই মুঠো তুলে বলল, "বক্সার না?"

শিবা মাথা কাত করল, "দু'দিন আগেও তোমাকে দেখেছি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ। এখানেই থাকো নাকি?"

"এখানে দিদি-জামাইবাবু থাকে। এই ভেতর দিকে জোনাকি নামে স্টোভ আর হারিকেনের যে ফ্যাক্টরিটা আছে, দেখেছ কি, জামাইবাবু তার ম্যানেজার। ওদের কোয়ার্টারটা ফ্যাক্টরির মধ্যেই একপাশে।"

"দেখিনি, তবে জানি ওই রাস্তাটার ভেতর দিকে একটা আছে।" শিবা ডেকচিটা ঘাড় বদল করল।

"কী আছে এতে?"

"আলুর দম। দাদা একটা দোকান দিয়েছে ফিডার রোডের মোড়ে, খদ্দের সব পার্কিন্‌স জুট মিলের। আমি সাহায্য করি দাদাকে। বাড়িতে মা তৈরি করে, এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

"তোমরা তো সেই ভবানীসারের কোচিংয়ের কাছাকাছিই থাকো, না?"

"হ্যাঁ। তুমি তো আর পড়তে গেলে না।"

"নাহ্। বাবা মারা গেলেন, একটু অসুবিধায় পড়ে গেলাম আমরা, খরচ টরচ কমাতে হল।"

একটা শ্যামবাজারগামী বাস এসে দাঁড়াল। দুটো দরজায় যাত্রী ঝুলছে। শিবা বলল, "সকালে বাসে খুব ভিড় হয়। আটটায় যাদের হাজিরা, তারা এই সময়ই যায় তো।"

মেয়েটা হতাশ চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "অসম্ভব। আমার দ্বারা হবে না। কলেজে যেতে আজও দেরি হবে।"

"এখান থেকে কলেজে যাবে! কোথায় কলেজ?"

"এখান থেকে প্রথমে যাব বাড়ি, পাইকপাড়ার মোড়ে। চান-খাওয়া সেরে সেখান থেকে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ।"

"দিদির বাড়িতে তা হলে বেড়াতে এসেছ?"

মেয়েটি হেসে ফেলল। "দিদি সবে জন্‌ডিস থেকে উঠেছে, আবার ওর দু'বছরের ছেলেটার হয়েছে জ্বর। জামাইবাবু তো ফ্যাক্টরির নানা গোলমাল নিয়ে সারাদিনই ওখানে। দেখাশোনা, সাহায্য করার জন্য নিজেদের একজন কারও তো থাকা দরকার, তাই আমি আসি, মাও আসে।"

আর-একটা বাস এল। এটাতে আরও ভিড়। মেয়েটা এবার ওঠার চেষ্টা করতে দরজার দিকে এগোল। সেই সময় শিবার নজরে এল খালি রিকশা নিয়ে ননী ফিডার রোডের দিকেই চলেছে, বোধহয় তারই সন্ধানে। 'হগ্গের দ্যাবতাদেরও জোটে না' এমন খাদ্য ননী হারাতে রাজি নয়।

মেয়েটিকে হাতধরে টেনে শিবা দাঁড় করাল। "উঠো না, উঠো না, তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করছি...ননী।" শিবা চিৎকার করল, "অ্যাই নন্‌ই।"

মুখ ঘুরিয়ে দেখেই, ব্রেক কষে ননী হাত তুলল। রাস্তা পার হয়ে সে আসামাত্র শিবা বলল, "একে এখুনি ডানলপে নিয়ে গিয়ে বাসে তুলে দে। তুমি এর রিকশায় চলে যাও। ডানলপ ব্রিজ থেকে বাস ছাড়ে, বসে যেতে পারবে। ননী ফুল স্পিডে যাবি,...অ্যাঁ!" শিবা হতভম্ব হয়ে তাকাল। বরাভয় দানের মতো ননী হাতটা বুকের কাছে রেখে পাঁচটা আঙুল নাড়াচ্ছে।

"বেশি নয়, পাঁচটা।" ননীর মুখে বুদ্ধের প্রশান্তি ও সৌম্যতা।

"না, না, রিকশা আমার দরকার নেই, পাঁচ টাকা দিয়ে এইটুকু পথ যাওয়ার কোনও মানে হয় না।" মেয়েটি শশব্যস্তে বলল।

"দাঁড়াও তুমি, ব্যাপারটা টাকার নয়।" এই বলে দ্রুতপায়ে শিবা রিকশার কাছে এল। "পাঁচ কী রে, অ্যাঁ! চারটে দোব।"

"উঁহু, চারটার কাম নয়, পাঁচটা।"

"এইটুকু তো পথ।" শিবা গলা চেপে ধমকাল।

"দূরত্বটা তো বড় কথা নয়, দু'বার প্যাডেল মাইরলেই তো ডানলপ পৌঁচায়ে যামু। কামের গুরুত্বটাই হইল আসল কথা। হক্কালবেলায় বিউটিফুল একডা মাইয়ারে রিকশায় একা বসাইয়া বি টি রোড ধইরা যাওয়া...এতে কত যে রিক্‌স, কত যে ডেঞ্জার, তা...তুমি বুঝবা না...না, না, পাঁচটাই।"

"ঠিক আছে।" দাঁতে দাঁত চেপে শিবা রাজি হল। হাতছানি দিয়ে সে মেয়েটিকে ডেকে এনে বলল, "উঠে পড়ো। এর নাম ননী। আমার বন্ধু, উপকার করতে খুব ভালবাসে। সকালে প্রথম প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে ও ভাড়া নেয় না, তাই না রে ননী? ঠিকমতো বাসের সিটে ওকে বসিয়ে দিবি।"

"দ্যাহো ওস্তাদ, পরশুও শুনচি, অহনও শুইনলাম, 'ওকে, ওকে' কইরা ওনাকে বইলত্যাচ, ক্যান, ওনার কি কোনও নাম নাই? হ্যাঁ দিদি, আপনার নামডা কী?"

"মিতা, পারমিতা দাস। তোমার নাম তো শুনলামই, আর তোমার নামটাও

জানি।"

শিবা অবাক হয়ে বলল, "জানো! কী করে?"

"বোম্বাইয়ে, মনে আছে, তোমার লড়াই দেখতে গেছলাম! গ্যালারি থেকে চিৎকার হচ্ছিল, 'কিল শিবা, কিল কিল কিল, নকআউট শিবা, নকআউট।' তুমি অবশ্য পারোনি।"

মিতার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ননী প্যাডেল শুরু করে দিল। সে দেখেছে, শিবার মুখটা যন্ত্রণায় আর লজ্জায় ফ্যাকাশে হয়ে আসছে।

তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ফিডার রোডের মোড় জমজমাট। রাস্তায় সওদা রাখা ফেরিওলাদের চিৎকার, সাইকেল রিকশার ভেঁপু, আনাজপাতির বাজার থেকে হাঁকাহাঁকি, এরই মাঝে খিদে পাওয়া মানুষদের তাড়া। শিবা আর নিতুর দম ফেলার সময় নেই। তারই মধ্যে শিবা দেখতে পেল মিতাকে।

বিভ্রান্তের মতো ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে এধার-ওধার তাকাচ্ছে। দু'চোখে উদ্বেগ। শিবা হাত তুলল, যদি দেখতে পায়। পায়নি, তবে দাঁড়িয়ে থাকা এক চানামটরওলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে। শিবা নিশ্চিত, তাকেই খুঁজছে, নয়তো এখানে ওর আসার আর কোনও কারণ তো থাকতে পারে না।

"এই যে, তোমাকেই খুঁজছি শিবা, ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি। ননী বলেছিল কোনও দরকার টরকার হলে তোমাকে বলতে।" মিতা নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে, পারছে না। "দিদি, জামাইবাবু ওদের বাচ্চাটা...।"

"কী হয়েছে?" শিবা হাত ধরে মিতাকে সরিয়ে আনল দোকানের সামনে থেকে। নিতু অবাক হয়ে দেখছে।

"কোয়ার্টারে ওদের আটকে রেখে দিয়েছে, ঘেরাও, ধর্মঘট, অবরোধ যাই বলো না কেন, স্রেফ বন্দি হয়ে আছে। টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, বেরোতেও না। বিকেলে এসে ঢুকতে গিয়ে ফ্যাক্টরির গেটেই ওরা আমায় আটকে দিল।"

"ওরা কারা?"

"যারা দুপুর থেকে ধর্মঘট শুরু করে গেটের সামনে বসে পড়েছে। আমার পক্ষে তো কাউকেই চেনা সম্ভব নয়। একজন আমার দিকে তেড়ে এসে বলল, মালিকের দালালকে তো বটেই, তার আত্মীয়-স্বজনকেও ধোলাই দেওয়া হবে। ওখানেই শুনলাম, যতক্ষণ না জামাইবাবু রেজিগনেশন লেটারে সই করছে, ততক্ষণ কোয়ার্টারের মধ্যে ফ্যামিলি সমেত তাকে আটকে রাখা হবে, বাইরের সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হবে। টেলিফোন, ইলেকট্রিক, জল, সব কিছুর কানেকশন কাট-অফ করে দেবে। রেশন, ওষুধ, দুধ, এসব কিছুই পাবে না। খাবার জলটুকুও না। শিবা, তা হলে ওরা বাঁচবে কী করে, ওরা তো মরে যাবে!" মিতা দু'হাতের মুঠো ঝাঁকাল। তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার মতো অবস্থায়।

"আগে তুমি একটু শান্ত হয়ে দাঁড়াও দেখি। হাতের কাজ সেরে নিই।" শিবাকে বিচলিত দেখাল। দু'দিন আগে দুটো লোক খেতে খেতে যা বলছিল, সেই কথাগুলোই তো ঘটেছে!

"এইসব শুনে কি কেউ শান্ত থাকতে পারে? আমি পেট্রল পাম্প থেকে কোয়ার্টারে টেলিফোন করি, লাইন ডেড। ভাবছি থানায় যাব।"

"যেতে পারো, কিন্তু কোনও কাজ হবে না। পুলিশ তোমার জামাইবাবুকে উদ্ধার করতে যাবে না, ব্যবস্থা করা আছে।"

"বলছ কী!"

শিবা জবাব না দিয়ে নিতুর কাছে এল। "দাদা, এর নাম মিতা। ভবানীসারের কোচিংয়ে পড়ত। ওর জামাইবাবু জোনাকির ম্যানেজার। আজ দুপুর থেকে তাকে ফ্যামিলি সমেত কোয়ার্টারে আটকে রেখে ধর্মঘট শুরু করেছে। আমি একটু দেখে আসব ব্যাপারটা, তুমি ততক্ষণ চালিয়ে নিয়ো।"

"ধর্মঘট! তুই কী করবি ওখানে? ও তো আপনিই ভেঙে যাবে—তোকে আর ঝামেলায় জড়াতে হবে না।" নিতু বিরক্ত স্বরে ভাইকে বারণ করল।

"তবু একবার দেখে আসি। একটা দু'বছরের ছেলে বন্দি থাকবে, দুধ পাবে না, জল পাবে না, তা কি হতে পারে!"

বসার টুলটা মিতার সামনে রেখে শিবা বলল, "তুমি এখন বসে থাকো। জোনাকি থেকে আমি একবার ঘুরে আসি, কোয়ার্টারটা কোথায়?"

"গেট দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে একটা ফাঁকা জমির পরেই একতলা গোলাপি রঙের বাড়ি। বেরোবার একটাই দরজা। গেটের কাছ থেকে দেখা যায়। আমি দেখেছি, গোটাকতক লোক কোয়ার্টারের সামনে হাত তুলে তুলে স্লোগান দিচ্ছে।"

কিছুক্ষণ পরে শিবা ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে জোনাকির গেটের কাছে পৌঁছল। জনা পঁচিশ লোক সেখানে। গেটের সামনে চৌকি। তার পেছনে লাল শালুর কাপড়ে শ্রমিক ইউনিয়নের নাম লেখা। খুঁটিয়ে সে লোকগুলির মুখ দেখল, কিন্তু একজনকেও তার চেনা লাগল না। পরিবেশটা শান্ত, ধর্মঘট হলে যে চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা থাকে, তার কিছুই নেই। পাঁচিলের গায়ে হাতে-লেখা কয়েকটা পোস্টার। অনেকেই ভাঁড়ে চা খাচ্ছে। দুটো বড় বালব থেকে আলো ছড়িয়ে রয়েছে।

শিবা গেট পর্যন্ত চলে গেল । কেউ তাকে লক্ষ করল না। লোহার চাদরের গেট, পাল্লা দুটো আধ-খোলা। কিছু ধর্মঘটী ভেতরেও রয়েছে। তীক্ষ্ণ নজরে সে বাঁ দিকটায় চোখ পাঠাল। কাঠের থাম্বায় ফ্যাক্টরির ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। ফাঁকা জায়গায় বড় বড় ঘাস, কিছু ভাঙা প্যাকিং বাক্সের কাঠ, টিনের স্ক্র্যাপ, তার পেছনে একতলা আবছা একটা বাড়ি। জানলাগুলো বন্ধ, সদর দরজাটাও। বাড়ির মধ্যে কোনও আলো জ্বলছে বলে তার মনে হল না। কয়েকটা লোক বন্ধ দরজার সামনে বসে শালপাতা থেকে কিছু খাচ্ছে। বাড়ির পেছন দিকে কী রয়েছে বোঝা গেল না। দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ফ্যাক্টরি এলাকাটা ঘেরা। পাঁচিলের ধারে গোটা পাঁচেক কৃষ্ণচূড়া গাছ।

"অ্যাই এখানে কী চাই, য়্যা? ভেতরে কী দেখছ?" চৌকিতে আধশোয়া একটি

লোক চোখ কুঁচকে কর্কশ স্বরে বলল।

"ননীকে খুঁজছি।" শিবার নিরীহ মুখ থেকে ব্যস্ত স্বরে কথা বেরোল।

"কে ননী? কোথায় কাজ করে?"

কোথায় করে! শিবা ফাঁপরে পড়ল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা স্টোভকে সে মনে মনে দেখে নিল।

"বলেছিল রঙের কাজ করে। আলুর দম আর রুটির দাম পাব, মাসকাবারে দেবে বলেছিল। ধর্মঘট চললে তো আমার টাকা—হ্যাঁ দাদা কদ্দিন চলবে বলতে পারেন?" শিবার মুখে দুর্ভাবনা ছড়িয়ে পড়ল।

লোকটির চোখ এবার স্বাভাবিক হয়ে এল। "কত টাকা খেয়েছে? দেখতে কেমন?"

"সাতাশ টাকার। দেখতে খুব রোগা, কালো, আমার মতোই লম্বা। একটা গেঞ্জি পরে, তার বুকে লেখা—'আই লাভ ইউ'।"

লোকটা খিকখিক করে হেসে উঠল। "ভালবাসে যখন, ও টাকা মার যাবে না, দু'দিন পরে এসে খোঁজ নিয়ো।"

"তখন ফ্যাক্টরি খুলে যাবে?"

"তা আমি কী করে বলব। সবই নির্ভর করছে ওদের মরজির ওপর। দাবিগুলো মেনে নিলে আমরাও ধর্মঘট তুলে নেব।"

"দাবি নিয়ে কী কথা হচ্ছে তুলসীদা?" এগিয়ে এল এক গাঁটাগোট্টা অল্পবয়সি, বুকে পিন দিয়ে আঁটা কাগজের ব্যাজ। শিবার মনে হল, একে কোথায় যেন সে দেখেছে। মনে মনে সে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। "আলো আজ বন্ধ হয়েছে, কাল জলও বন্ধ হবে। কার মরজির ওপর দাবি মেটানো হবে সেটা কি অন্য লোক ঠিক করে দেবে?" হাতের খেঁটোটা তক্তায় ঠুকে লোকটা কটমটিয়ে এবার শিবার দিকে তাকাল। "আমরা ঠিক করে দেব।"

এবার শিবার নজরে পড়ল দু'হাত করে লম্বা কয়েকটা খেঁটো আর লোহার রড চৌকির পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা। দুটো লোক ফ্যাক্টরির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

"একটা শতরঞ্চি কি মাদুর হবে তুলসীদা?"

"কেন, ঘুমোবি নাকি?" বুকে ব্যাজ আঁটা বলল। কথা বলার ভঙ্গিটা শিবাকে মনে পড়িয়ে দিল একে সে দেখেছে ছায়াবাণী সিনেমা হলের সামনে। লোকটা টিকিট কালোবাজারিদের সর্দার।

"ঘুমোব না তো কী! সারারাত জেগে বসে থাকার দরকার কী? সদর দরজাটায় তালা মেরে দিয়েছি, বেরোবার আর তো পথ নেই।"

"অ্যাই তোমার আর কী এখানে দরকার, যাও, যাও, কেটে পড়ো। ননীটনি বলে এখানে কেউ নেই।" তুলসীদা উঠে বসল।

অনিচ্ছুক পায়ে ফিরে যেতে যেতে শিবা বলল, "তা হলে কাল সকালে একবার আসব।"

"তাই এসো।"

সাইকেলে রিকশায় বসে ছিল ননী। শিবাকে দেখে নেমে পড়ল।

"বুইজল্যা শুইনল্যা কী, ব্যাপারডা ক্যামন ঠ্যাকল?"

"বলছি। মিতা বাড়ি চলে গেছে?"

"হ। বাসে তুইল্যা দিয়ে কইয়া দিচি, দু'জনায় মিল্যা রাত্রে ভাবনাচিন্তা কইর‍্যা একডা উপায় বাইর করবই। কাইল হগ্গালে ভবানীছারের কোচিংয়ে যেন আসে।"

শিবা রিকশায় উঠে বসে বলল, "চল, যেতে যেতে বলছি। একটা প্ল্যান করতে হবে। ননী তুই এখানকার পথগুলো সব চিনিস? জোনাকির পেছন দিকে পাঁচিলের ধার দিয়ে রাস্তাটা কোথায় গেছে জানিস?"

"সব জানি না, তয় কিছু কিছু জানি।"

"দাঁড়া, দাঁড়া, এটা কিছু কিছু জানলে হবে না, ভাল করে জানা চাই। এখুনি তুই একটা চক্কোর দিয়ে ঘুরে দেখে আয় তো, পেছন দিয়ে বি টি রোডে বেরোবার কোনও পথ আছে কি না। আমি ওদের সামনে দিয়ে এখন যাব না, তুই যা।"

"ওস্তাদ, তোমার মতলবডা কী?"

"বলছি। ভেতর থেকে কৃষ্ণচূড়া গাছের কোনও ডাল পাঁচিলের বাইরে বেরিয়ে আছে কি না দেখছি। গেটের সামনে দুটো বালব ছাড়া বাইরে সব অন্ধকার, তবু দেখবি রাস্তায় আলোটালো আছে কি না। যা, চট করে ঘুরে আয়, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর গ্যারেজে যাব, ওখানে মোটা মোটা দড়ি দেখেছি একধারে পড়ে আছে। হাত পাঁচেক লম্বা একটা নিতে হবে। তারপর—।"

॥ ৬ ॥

জোনাকি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কস-এর পাঁচিল ঘেঁসে ননীর রিকশা যখন নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াল, তখন রাত আড়াইটে। আরোহী শিবা। সিটের ওপর সে উঠে দাঁড়াতেই পাঁচিল ছাড়িয়ে প্রায় দু'ফুট ওপরে উঠে গেল তার মাথা। ফ্যাক্টরির পেছন দিকটা এই প্রথম সে দেখছে। দূরে জ্বলছে ইলেকট্রিক বাতি। আবছা আলোয় যতটা দেখা যায় তাইতে দেখল লম্বা লম্বা ঘাস, ডোবার মতো একটা শুকনো গর্ত, প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে কোয়ার্টারটা। একতলা, নিচু ছাদ। তার মনে হল, ডান দিকের ঘরটাই শোওয়ার।

দুটো বড় জানলাই খোলা। নিশ্চয় গরম সহ্য করতে না পেরে খুলতে বাধ্য হয়েছে।

ছাদের পাঁচিল থেকে কার্নিসে নামাটা শক্ত নয়। তার দু'হাত নীচেই জানলার ওপরে বেরিয়ে রয়েছে কংক্রিটের ছাঁচা। ওর ওপর নামতে গেলে একটু সাহায্য লাগবে। তারপর ছাঁচা থেকে মাটিতে, কাঁধে পা রেখে নেমে পড়তে পারবে। একটু মুশকিল হবে দু' বছরের বাচ্চাটা নিয়ে।

ওটা কিছু নয়, এই ভেবে শিবার মাথাটা যখন হালকা হতে শুরু করেছে, তখনই টর্চের আলো অন্ধকার কেটে কেটে ঘাসের ওপর খাঁড়ার কোপ দিল। শিবা চট করে

নামিয়ে নিল মাথা। কোয়ার্টারের অপর দিকে কেউ একজন জেগে পাহারা দিচ্ছে, অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না। পাঁচিলের ওপর চোখ পর্যন্ত তুলে সে লক্ষ করতে লাগল লোকটা এখন কোথায়, ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না, এই দিকে আসবে কি না।

এল না। কোনও সাড়াশব্দ বা টর্চের আলো আর পড়ল না। তা হলেও খানিকটা সময় দেওয়া দরকার, এখনই কাজে নামা ঠিক হবে না। শিবা রিকশার সিটের ওপর বসল।

"ক্যামন দ্যাখলা?" ননী ফিসফিসিয়ে বলল।

"একজন জেগে পাহারায় রয়েছে, টর্চ নিয়ে।"

"তা হলে তো ডেঞ্জার!"

"ডেঞ্জার আবার কী, একটু টাইম দিয়ে তারপর নামব। তুই কাছিটা ওদিকে ঝুলিয়ে রাখবি। মিতার দিদি, জানি না ধরে উঠতে পারবে কি না, মিতা হলে বিনা দড়িতেই একটা ভল্ট দিয়ে উঠে যাবে, জিমন্যাস্টিক করত তো!"

"ওর দিদিও তো মিতা, পুরা নাম মধুমিতা, পারমিতারই বড় বইন। তাইলে ভল্ট দিতি পারুম না ক্যান?"

"তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কি শুধু রিকশার প্যাডেলেই ঘুরপাক খাবে, হ্যান্ডেল পর্যন্ত ওঠাতে পারিস না? দু'বছরের একটা বাচ্চার মা, সে কিনা ভল্ট খাবে?...জামাইবাবুর নাম উৎপল, সেটা মনে রাখবি।"

"পদবিটা চাটুজ্জে না রায়, কী একডা যেন কইছিল মিতা?"

"চট্টরাজ। আর মিতাকে বাড়িতে ডাকে পারো বলে। দুই বোন মধু আর পারো। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করেছিলি জামাইবাবুর ফিটনেস কেমন, দৌড়তে, লাফাতে পারে কি না?"

"জিগাই নাই। তয় দুখ্যু কইরা কইছিল, মালিকের লগে আপস ক্যাইল্লে আইজ আর দিদিরে এই হ্যানস্তায় পইড়তি হইত না।"

"লোকটা খুব জেদি, মনের ফিটনেসটা দারুণ!"

"কিন্তু সংসারের ব্যাপার স্যাপারে একদম আনফিট। ওনার উচিত আছিল রিজাইন কইর‍্যা, টাহাকড়ি পকেটে পুইর‍্যা চইলা যাওয়া। কাম জানা, ল্যাহাপড়া জানা লোক, ওনার কি চাকরির অভাব হইব?"

"তার মানে! অন্যায়কে মেনে নিতে বলছিস? অধর্মকে তুই বলছিস মেনে নিতে? একটা এত বড় ফ্যাক্টরি, কত লোক এখানে কাজ করে! এটা তুলে দেওয়া কি অন্যায়, অধর্ম নয়?"

কথাটা বলেই শিবা বুকের মধ্যে একটা বিদ্যুৎচমক বোধ করল। মাথার মধ্যে আলোর ঝলকানি লাগল। তার মুখ দিয়ে 'অন্যায়' আর 'অধর্ম' শব্দ দুটো কী করে বেরোল? কে তুলে দিল তার মুখে? তার মাথার মধ্যে এই শব্দ দুটো বাসা বেঁধে রয়েছে কবে থেকে?

আবার একটা ঝলকানি।...শিবা দেখতে পেল জানলার একটা পাল্লা আধখোলা।

ঘরের ভেতরে দেখা যাচ্ছে শুধু একটা কোণ। সে দেখতে পাচ্ছে পাঁচটি ছেলে ও একটি মেয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। তারা যেন কাঠের পুতুল, কেউ নড়ছে না, শুধু সামনে তাকিয়ে। প্রত্যেকের চোখে ভয়, মুখের চামড়ার নীচে রক্ত নেই।

শিবার কেন যে ইচ্ছে হল ভবানীসারের কোচিংটা একবার ঘুরে দেখে আসার! বটকেষ্টর দোকানে সাধু আর তার সঙ্গীকে দেখতে না পেয়ে তার মনে যে ভয় ধরল, হয়তো তাই থেকেই কৌতূহলটা তৈরি হয়।

জানলা দিয়ে ছয় জনের দিকে হতভম্ব হয়ে সে যখন তাকিয়ে, তখন ঘরের আর-এক কোণে, ভেজানো পাল্লার পাশেই একটা কণ্ঠস্বর শুনল।

"যদি হাতটা ভেঙে দিই?" মৃদু, শান্ত উচ্চারণ। শিবার মনে হল, সাধুর গলা।

উত্তর দিল না কেউ।

"কথা নেই কেন মুখে? যদি ভেঙে দিই, তা হলে অঙ্ক কষাবেন কী করে?"

"বাঁ হাত দিয়ে।"

"ওরে বাবা! দেবু শুনলি, বাঁ হাত দিয়ে উনি—"

"বাঁ হাতটাও তা হলে ভেঙে দাও।"

"দরকার নেই ওসবের। শুনুন, পরীক্ষার ক'টা দিন আপনি স্কুলে যাবেন না। এই ঘরে বসে যত খুশি অঙ্ক কষুন, কিন্তু স্কুলে যাবেন না।"

"তার মানে অন্যায়ের কাছে আমাকে মাথা নোয়াতে হবে, অধর্ম আমাকে মেনে নিতে হবে!"

ভবানীসারের গলা। অনুত্তেজিত, গম্ভীর অথচ কঠিন। শিবার সারা শরীর শক্ত হয়ে পড়ছে। পাঁচটি ছেলে ও একটি মেয়ে একইভাবে দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে।

"অতশত বুঝি না, মোট কথা, যা বললুম তাই করবেন। বাড়িতেই থাকবেন, পরীক্ষা হয়ে গেলে স্কুলে গিয়ে চুটিয়ে মাস্টারি করবেন। কাল আপনি তিনটে ছেলের ক্ষতি করতে গেছলেন, ওদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন, অবশ্য ম্যানেজ করে নিয়েছি।"

"আমি সত্যিই দুঃখিত যে, ওদের ক্ষতি করতে পারিনি। একটা কথা তুমি শুনে রাখো, হাতই ভাঙো আর পা-ই ভাঙো, অন্যায়কে আমি প্রশ্রয় দেব না। আমার হাতের চেয়েও বড় ব্যাপার এই ছেলেদের চরিত্র তাদের মনুষ্যত্ব। সেটা আমাকে বাঁচাতেই হবে। এভাবে স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করলেও, জীবনের পরীক্ষায় তো এরা বরাবরই ফেল করবে। ঘুণ ধরে ঝাঁঝরা হওয়া মানুষ, কি পরিবারের কি সমাজের কোনও বড় কাজের দায়িত্বই তো নিতে পারবে না, ভেঙে পড়ে যাবেই।"

"বড় বড় কথা এখন শোনার সময় নেই, ওসব ক্লাসে কপচাবেন। পাশ করলে চাকরি জুটবে, খাইয়ে-পরিয়ে সংসার বাঁচাতে পারবে, এটাই বড় কথা।" সাধুর গলা থেকে এবার রাগ বেরিয়ে এল।

"না, না, পারবে না, এটা কোনও কাজের কথা নয়। মানুষ শুধু খেয়েই বাঁচে না। তার মন আছে, চেতনা আছে, আত্মা আছে।" ভবানীসারের গলায় ব্যাকুলতা।

"সাধু, কথাবার্তা কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?" দেবুর ধৈর্য আর অপেক্ষা

করতে পারছে না।

"থাম তুই, আমাকে আত্মা দেখাচ্ছে! আত্মা তা হলে তো আমারও আছে, বলুন, আছে তো?"

সাধু এক পা পিছিয়ে দাঁড়াতেই শিবা ওকে এবার দেখতে পেল, ডান হাতটা বুকে ঠেকানো। আত্মা বোধহয় ওখানেই থাকে। সাধুর সুন্দর মুখটা কুঁকড়ে রয়েছে রাগে, চোখ জ্বলছে। বাঁ হাতের বেতের ব্যাটনটা দিয়ে সে সামনে দাঁড়ানো কাউকে খোঁচা মারল, বোধহয় সারকেই।

"তা হলে আমারও আত্মা আছে, বলছি আছে। এই ছেলেগুলোরও আছে, দেখবেন?"

সাধু তালুর উলটো পিঠ দিয়ে একটি ছেলের গালে আঘাত করল। "আঁ" বলেই ছেলেটি গালে হাত দিয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল। বিশ্বাস করতে পারছে না এভাবে মার খাবে! সংবিৎ ফিরে পেয়েই ছেলেটি খোলা দরজা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল। সাধু হাসতে শুরু করল।

"দেখলেন? ওর আত্মা বলল পালাও, তাই সটকান দিল।"

সাধু আর-একটি ছেলের সামনে দাঁড়াল। ডান হাতটা ধীরে ধীরে তুলতে শুরু করতেই দু'হাতে মুখ ঢেকে ছেলেটি ফুঁপিয়ে উঠল।

"এর আত্মা বলল কাঁদো, তাই না?" সাধু ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে হাসল। "এই হচ্ছে আত্মা। শরীরের জন্যই আত্মা। এই এলাকার সব আত্মা সুযোগ-সুবিধে পাওয়ার জন্য, কাজ উদ্ধারের জন্য আমাকে তোয়াজ করে, ভয় পায়, হাতজোড় করে।" তারপর সে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে চারটি ছেলে ও মেয়েটিকে মৃদুস্বরে বলল, "বাড়ি যাও।"

মেঝে থেকে বই-খাতা কুড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েই ওরা বি টি রোডের দিকে প্রায় ছুটতে শুরু করল, শুধু মেয়েটিই একবার দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে পেছনে তাকায়।

জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে শিবার মনে হচ্ছিল, সে যেন হিন্দি সিনেমা দেখছে। পরদা থেকে একটা ভিলেন জ্যান্ত নেমে এসেছে তার চোখের সামনে। বটকেষ্টর চিৎকার ভেসে এল। চেঁচাক, এমন একটা সত্যিকারের সিনেমা ফেলে তার এখন যাওয়া সম্ভব নয়।

সাধু পা পা এগিয়ে গেল ঘরের কোণের দিকে, মুখভরা হাসি।

"আমার আত্মা বলছে আপনার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে হবে, আপনার আত্মা বলছে হাত দুটো আস্ত রাখতে হবে। দুটোই সম্ভব। ঠিক বলেছি কি?"

জানলার কিনারে মুখ রেখে একচোখ দিয়ে শিবা ঘরের অন্য দিকটা দেখার চেষ্টা করল। ভবানীসার ডান হাতটা বাড়িয়ে, মুখে পাতলা হাসি। চশমার পুরু কাচে ইলেকট্রিক আলো, বরফ কুচির ওপর রোদের মতো ঝকঝক করছে।

"হাত আমার দরকার নেই, তুমি এটা নিতে পারো, কিন্তু স্কুলে আমি যাবই।"

"যাবেনই।"

"হ্যাঁ।"

কোনও দ্বিধা নেই একফোঁটা শব্দটিতে। বাড়ানো হাতটা আর-একটু তুলে বিবেকানন্দর ছবিটির দিকে নিবদ্ধ করলেন।

"ওই মানুষটি একটি কথা বলেছেন।"

সাধু মুখ ঘুরিয়ে ছবিতে চোখ রাখল।

"বলেছেন, সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনও কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।" হাতটা নামিয়ে ভবানীসার হেসে বললেন, "পরীক্ষার ক'টা দিন আমি স্কুলে যাব। অন্যায় হচ্ছে দেখলে বাধা দেব।"

এবার সাধু এগিয়ে গেল। ভবানীসারের ডান হাতের কবজি মুঠোয় ধরে চোয়াল শক্ত করল। সাধুর হাতের পেশিগুলো, আঙুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত, ফুলে উঠে ডেলা বেঁধে গেল। সারের মুখের হাসিটা থমকে গিয়ে যন্ত্রণায় একবার কুঁকড়ে উঠল, তবে দু-তিন সেকেন্ডের জন্য। আবার হাসি ফুটল।

সাধুর মুখ টসটস করছে উত্তেজনায়, কপালে ঘাম ফুটছে। একদৃষ্টে সে সারের মুখের দিকে তাকিয়ে। হাতের পেশিগুলো আরও কঠিন হচ্ছে।

সারের মাথাটা এবার ধীরে ধীরে সামনে ঝুঁকে পড়ছে। ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। থরথর করতে করতে তাঁর দেহ কুঁজো হয়ে গেল। "আহ্হ্ আহ্হ্, আমি নুইব না, কিছুতেই না, ওহ্হ্...পারবে না, আমাকে দিয়ে অন্যায়, অধর্ম—"

এর পর শিবা নিজেও জানে না কখন সে কোচিংয়ের দরজায় এসে দাঁড়াল। সাধু মুখ ফিরিয়ে তাকে শুধু দেখল মাত্র। তখন ভবানীসারের কবজিটা তার মুঠোর মধ্যে ধরা।

শিবা বলল, "ছেড়ে দাও সারকে।" বাঘের গর্জনের আদল ছিল তার স্বরে।

পাঁচিল থেকে একটা বেড়ালের মতো লাফিয়ে শিবা ঘাসের ওপর নামল। ফ্যাক্টরি ঘিরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কোয়ার্টারের পেছনে অন্ধকার, সামনে আলো। এতে তার সুবিধেই হবে। গুঁড়ি মেরে সে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত এগোল পেছনের জানলা লক্ষ্য করে।

জানলার নীচে উবু হয়ে বসে সে বোঝার চেষ্টা করল ঘরে কেউ জেগে আছে কি না। কোনও সাড়াশব্দ নেই। খোলা জানলার কাচে সে তিনটে টোকা দিল। সাড়া নেই। এবার একটু জোরেই টোকা দিয়ে সে ফিসফিসিয়ে ডাকল, "উৎপলবাবু, উৎপলবাবু।"

"কে? কে?" সন্ত্রস্ত চাপা পুরুষ গলা।

"ভয় পাবেন না, জানলায় আসুন, আমি পারমিতার বন্ধু।" শিবা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে গলা নামিয়ে বলল।

একটা ছায়ামূর্তি সন্তর্পণে জানলার দিকে এগিয়ে এসে একটু দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াল। "কে? কে আপনি?"

"আমার নাম শিবা। মিতা, পারমিতা আমার বন্ধু। আপনাদের তিনজনকে

কোয়ার্টার থেকে বার করে নিয়ে যেতে এসেছি।"

একটা সন্দিগ্ধ নীরবতা। কোনও উত্তর এল না। ঘরের মধ্যে চাপা গলায় দু'জনের কথা বলার শব্দ শোনা গেল । স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। শেষরাতে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে কোনও অপরিচিত লোক যদি বলে, "বার করে নিয়ে যেতে এসেছি" তা হলে চট করে তাকে বিশ্বাস করা শক্ত, উচিতও নয়।

"আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। ওরা আপনার টেলিফোন আর ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়েছে, কাল থেকে কলের জল পাবেন না। দরজায় তালা মেরে দিয়েছে। আপনাকে ওরা রিজাইন করতে বাধ্য করাবেই। আপনার ছেলে টুটু, যার হাম হয়েছে, তাকে বাঁচাবার কথা ভাবুন।" শিবা প্রায় মিনতির সুরে কথাগুলো বলল।

আবার ঘরের মধ্যে চাপা কথাবার্তা শোনা গেল। শিবা আবার বলল, "মিতা ভবানীসারের কোচিংয়ে পড়ত, আমি তার কাছাকাছিই থাকি। একদিন এক গুণ্ডা সারকে মারবার জন্য কোচিংঘরে ঢুকেছিল। তারপর থেকে ও আর পড়তে যায়নি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," ঘরের মধ্যে নারীকণ্ঠে শোনা গেল, "ঠিকই, পারো তারপর আর যায়নি। শিবা নামে একটা ছেলে গুণ্ডাটাকে নাকি—"

"দিদি, আমিই সেই শিবা। নির্ভাবনায় আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন।"

"তুমিই সেই বক্সার?" উৎপল জানতে চাইল।

"হ্যাঁ" বলতে গিয়ে শিবার জিভ আটকে গেল। বলল "আগে ছিলাম। কিন্তু আপনারা আর দেরি করবেন না।"

"কীভাবে যাব? বাড়ির সামনে লোক, গেটেও লোক।"

"পেছনের পাঁচিল টপকে বেরিয়ে যাব। আপনারা ছাদ থেকে নামবেন। নিচু ছাদ, পা রাখারও জায়গা আছে। দিদিকে আর টুটুকে আমি নামিয়ে নেব। দরকারি জিনিস যা নেওয়ার, সঙ্গে নিন। একটা কাপড় নিন ছাদ থেকে ধরে নামবার জন্য। তাড়াতাড়ি করুন। পাঁচিলের বাইরে আমার বন্ধু ননী সাইকেল রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেরি করবেন না। একবার সামনের জানলা দিয়ে দেখে নিন তো লোকগুলো কী করছে।"

উৎপল আধ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে বলল, "দু'জন মাত্র চ্যাটাইয়ে শুয়ে রয়েছে, ছিল তো পাঁচ-ছ'জন!"

"সব দরজা জানলা বন্ধ করে এবার ছাদে চলে যান। টুটু কি ঘুমোচ্ছে? দেখবেন যেন কেঁদে না ওঠে।"

টুটু কেঁদে ওঠেনি। ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে কার্নিসে পা রেখে, পাকানো বেড কভারটা ধরে মধুমিতাই প্রথমে নামল জানলার ওপরের ছাঁচায়। শাড়ি পালটে সালোয়ার-কামিজ পরে নেওয়ায় তার সুবিধেই হয়েছে।

"দিদি, কাপড়টা শক্ত করে ধরে থেকে এবার বসুন, পা দুটো ঝুলিয়ে আমার কাঁধে রাখুন, না, না, লজ্জা করবেন না, তাড়াতাড়ি।" জমিতে দাঁড়িয়ে শিবা জরুরি তাড়া দিল।

কাঁধে দাঁড়ানো মধুমিতাকে নিয়ে শিবা ধীরে ধীরে উবু হয়ে বসল। মধুমিতা কাঁধ থেকে ছোট্ট লাফে জমিতে নামল। উৎপল বেডকভারটা ধরে আছে ছাদে। শিবা

এবার ছাঁচার ওপর উঠে বলল, "টুটুকে নামিয়ে দিন আমার হাতে।"

অসুস্থ, সদ্য ঘুমভাঙা বাচ্চার অন্ধকারের মধ্যে এই ধরনের নাড়ানাড়ি পছন্দ হচ্ছে না। দু'হাত ধরে তাকে ঝুলিয়ে দিতে সে ভয়ে কেঁদে উঠল শিবাকে জড়িয়ে ধরে।

"দিদি ধরুন।" টুটুকে সে দ্রুত নামিয়ে দিল মায়ের বাড়ানো হাতে। "যেন না কাঁদে আর।"

উৎপল চট্টরাজ যুবক এবং মোটেই আনফিট নয়। বেডকভার টেনে ধরে থাকার জন্য ছাদে আর কেউ নেই। সেটা ছাদেই রেখে দিয়ে সে কার্নিস থেকে অবলীলায়ই ছাঁচায় দাঁড়ানো শিবার পিঠে পা দিয়ে নামল এবং বগলে একটা পলিথিনের ব্যাগ ঝুলিয়ে।

সবাই জমির ওপর। অন্ধকার থেকে ফ্যাক্টরির পাঁচিল পর্যন্ত যেতে, দূর থেকে আসা আলোয় আবছা হওয়া প্রায় কুড়ি মিটার জমি অতিক্রম করতে হবে। শিবা এগিয়ে গেল দু'ধারে তাকাতে-তাকাতে। পাঁচিলের ওপর ননীর মুণ্ডুটা দেখতে পেয়ে সে হাত নাড়ল। ননী দু'বাহু তুলে হাতছানি দিয়ে বোঝাল, বিপদ নেই, চলে এসো।

টুকুকে কোলে নিয়ে মধুমিতা দৌড়ল পাঁচিলে ঝোলানো কাছিটা লক্ষ্য করে। তার পেছনেই শিবা এবং উৎপল। বড় বড় ঘাসের মধ্যে একটা ঢিপি, দেখে বোঝা যায় না। মধুমিতা হোঁচট খেয়ে টুটুকে নিয়েই ঘাসের ওপর পড়ল। ভয়ে এবং আঘাত পেয়ে টুটু এবার জোরেই কেঁদে উঠল। ওকে এক ঝটকায় কোলে উঠিয়ে শিবা ছুটে গেল পাঁচিলের দিকে।

" ননী একে তুলে নে।"

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণ দুটি হাত টুটুকে তুলে নিয়েই মুহূর্তে পাঁচিলের ওপাশে অদৃশ্য হল। টুটুর কান্না বেড়ে তখন আরও উচ্চগ্রামে উঠেছে।

"দিদি কাছিটা ধরুন, কাঁধে উঠুন।" শিবা উবু হয়ে বসেই দ্রুত নির্দেশ দিল। আর সেই সময়ই টর্চের আলো এসে পড়ল এবং চিৎকার শোনা গেল, "কে ওখানে, কে?...আরে পালাচ্ছে, ওরে দৌড়ে আয়, ম্যানেজার পালাচ্ছে।"

মধুমিতাকে কাঁধে নিয়ে শিবা সোজা হয়ে দাঁড়াল। পাঁচিলের ওপর সে উঠে বসতেই ননীর অনুত্তেজিত গলা শোনা গেল, "আমার হাতডা ধরেন...রিসকাডা পায়ের নীচেই, নাইম্যা পড়েন।"

চারটে লোক ছুটে আসছে। হাতে লাঠি আর রড। ওরা চিৎকার করছে, "পালাচ্ছে, পালাচ্ছে, ধর, ধর, ধর,...পিটিয়ে লাশ ফেলে দেব।"

"দেখছেন কী হাঁ করে? উঠুন।" উবু হয়ে বসে, শিবা অধৈর্য স্বরে ধমক দিল।

"তুমি?"—ইতস্তত করল উৎপল।

"ধ্যাত তুমি, আগে নিজে বাঁচুন তো।"

কাছি আঁকড়ে উৎপল কাঁধে পা রেখে দাঁড়াতেই শিবা সোজা হয়ে উঠল। উৎপল চটপট ওধারে যখন নেমে যাচ্ছে ঠিক তখনই শিবার পিঠে প্রথম লাঠিটা পড়ল।

রিকশার সিট আর হ্যান্ডেল ধরে ননী তৈরিই ছিল। প্রায় পনেরো মিটার রিকশাটা নিয়ে দৌড়ে, লাফিয়ে উঠেই সে দেহটিকে খাড়া রেখে, সামনে ঝুঁকে, সিট থেকে

পাছা তুলে প্রাণপণে প্যাডেল করতে শুরু করল।

"শিবা যে ভেতরে রয়ে গেল।" উৎপল চাপাগলায় আর্তনাদ করে উঠল। "পাঁচটা লোক, হাতে ডাণ্ডা!"

ননী গ্রাহ্য করল না কথাগুলো। জোনাকির পেছনের পাঁচিল ঘেঁষে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে মিনিটখানেক যাওয়ার পর তার প্যাডেল করার গতি বাড়ল।

"অহন চুপ থাহেন। শিবারে লইয়া আপনার ভাইববার দরকার নাই, নিজেদের কথাডা ভাবেন।"

এর পরই রিকশা প্রচণ্ড গতিতে বাঁ দিকে ঘুরে কলোনির ইট বাঁধানো সরু রাস্তায় ঢুকল। ঘুটঘুটে অন্ধকার, একতলা ছোট ছোট বাড়িগুলোকে ভুতুড়ে মনে হয় যেন, ভাঙাচোরা রাস্তায় রিকশা ছোটার ধড়ধড় শব্দে ঘুম ভেঙে ছুটে আসা কুকুরের চিৎকার পেছনে রেখে রিকশাটা অন্তত সাত-আটবার পথ বদল করে ইলেকট্রিক আলো জ্বলা একটা পিচের রাস্তায় উঠল। আরোহীরা নির্বাক, টুটু কান্না বন্ধ করে মাকে জড়িয়ে। তাড়া করে তাদের ধরতে যাতে না পারে, ননী সেইজন্যই অনেকটা ঘুরে এসেছে। এখান থেকে বি টি রোড আরও আধ মাইল।

"চালাইলাম ক্যামন, কন?"

ঢোঁক গিলে উৎপল বলল, "দারুণ! ভাবাই যায় না তোমার পায়ে এত জোর আছে!"

প্যাডেল ঈষৎ মন্থর করে, মাথা ঘুরিয়ে ননী বলল, "আমার পায়ের থাইক্যাও শিবার হাতের জোর বেশি। ও যদি বক্সিং ভুইল্যা না যায় তাইলে লোকগুলার কপালে আইজ দুঃখ আচে। মাইর যেমন খাইতে পারে তেমনি দিতেও পারে। মুস্কিলডা হইল কী, শিবার তো অহন কোনও প্র্যাকটিসই নাই!"

ক্ষীণ স্বরে অতঃপর মধুমিতা জানতে চাইল, "আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?"

"ভবানীসারের বাসায়। আপনার বুইনরে ওখানেই হগালে আইবার কইচি।"

এর পর ননী কুঁজো হয়ে হ্যান্ডেলের ওপর ঝুঁকে পা দুটোকে পিস্টনের মতো ওঠানামা করাতে শুরু করল।

॥ ৭ ॥

লাঠিটা পিঠের ওপর আসছে, চোখের কোণ দিয়ে শিবা তা দেখেই পিঠের পেশিগুলো শক্ত করে ফেলেছিল। লাঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘুরে ডান হাত বাড়িয়ে মুঠোর মধ্যে সেটা পাওয়ার চেষ্টা করেও পেল না। একটা রড তার মাথা তাক করে চালিয়েছিল যে-লোকটি, সে খুবই নিশ্চিত ছিল সেটা শিবার খুলি দু' ফাঁক করে দেবে। রড চালিয়েই সে ঝুঁকে পড়েছিল। শিবা একটা রাইট ক্রসকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার মতো বাঁ হাত তুলে রডটাকে পুরো বাহুর পেশির ওপর নেওয়ার সঙ্গেই ডান হাতে আপার কাট চালাল। দু'পাটি দাঁতের মধ্যে প্রবল সঙ্ঘর্ষের এবং আঘাতজনিত যন্ত্রণা পাওয়ার শব্দ হল। লোকটা ছিটকে পড়েই থুতনি চেপে ধরল

দু'হাতে।

বহু দিন, বহু মাস পর শিবা হাড়ের সঙ্গে হাড়ের, হাড়ের সঙ্গে পেশির ধাক্কা লাগার শব্দটা পেল। তার ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে উঠেছে। একটা বাঘ যেন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরটা চাটছে আর ক্রমশ সে নিজেই বাঘ হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এইরকম একটা বোধ সেদিন তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। "ছেড়ে দাও সারকে" বলার সময় মাথার মধ্যে গরগর করে উঠেছিল একটা খ্যাপা রাগ। দমকে দমকে সেই রাগটা ফুলে উঠে তাকে ঠেলে দিয়েছিল ফেটে পড়ার জন্য। এগিয়ে গিয়ে সে সাধুর ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়। ওর সঙ্গী দেবুর হাতে একটা ছোরা তখন ঝলসে উঠেছে। ভবানীসার কবজি ধরে উবু হয়ে, ছোরাটা সাপের ফণার মতো দোলাতে দোলাতে দেবু এক পা দু'পা এগোল। শিবা একদৃষ্টে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে। এক পা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে সে দেয়ালে বাধা পেল। আর তার পিছু হটার উপায় নেই। ডাইনে দেয়াল, বাঁয়ে খোলা দরজা। ছুটে বেরিয়ে যাওয়া যায়। পালাবে? তার মাথার মধ্যে একটা কথাই ঝনঝন করছে, "বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে।"

বাঁচার প্রেরণা সবচেয়ে জোরালো হয়ে উঠে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হলে। সেদিনে ছিল দেবুর ছোরা, আর এখন তাকে ঘিরে রড আর লাঠি। ওদের উদ্দেশ্যটা একই—তাকে খুন করে ফেলা। সেদিনের মতোই, মাথা থেকে একটা সঙ্কেত তার স্নায়ুতন্ত্রী মারফত বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে, "শিবা, বাঁচা নিজেকে।"

দেবুর ছোরাটা তার তলপেট লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে—একটা রড উঁচু থেকে মাথায় নেমে আসছে—প্রায় দশ ইঞ্চি ঝকঝকে একটা ইস্পাতের ফলা—প্রায় দু'হাত লম্বা কালো একটা লোহার রড—আসছে, আসছে, এক সেকেন্ডও লাগবে না দু'মিটার বাতাস কেটে ছোরাটার এগিয়ে আসা।

সেদিনের মতোই শিবার এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় শুধু লাগল নেমে আসা রডের পথ থেকে নিজেকে বিঘতখানেক সরিয়ে নিতে। তার কাঁধ থেকে রডটা পিছলে জমিতে ঠোক্কর খেল আর মারার ঝোঁকে লোকটার মাথা নেমে গেল।

সেদিন বে-টাল দেবুর মুখটাও ঠিক এইভাবে তার দিকে এগিয়ে এসেছিল। স্নায়ুকেন্দ্র থেকে সঙ্কেত পৌঁছে গেল বাঁ হাতে—মারো। দেড় ফুট দূরে ছিল দেবুর বুক আর পেট। কনুইটা সামান্য পেছনে টেনে পলকে সে ওর পেট লক্ষ্য করে বাঁ হাতের মুঠোটাকে স্প্রিংয়ের মতো ছেড়ে দিয়েছিল।

রড হাতে লোকটা মাথা তোলা মাত্র শিবা বাঁ হাতের হুকটা তার ডান চোয়ালে রাখল। 'আঁক' শব্দটার পরই জমিতে একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হল। তারপরই শিবা দুই মুঠো মুখের কাছে ধরে তিন পা পিছিয়ে এসে নাচ শুরু করল যেভাবে বক্সিং রিংয়ে প্রতিপক্ষকে ঘিরে সে নাচত।

তিনটে লোক প্রথমে হকচকিয়ে গেল শিবার এহেন কাণ্ড দেখে। তাদের একজন পাশ থেকে রড চালাল। শিবার বাহুর এক হাত দূর দিয়ে সেটা অর্ধচক্রাকারে বেরিয়ে গেল। দড়িতে স্কিপ করার মতো জমি থেকে সামান্য লাফিয়ে লাফিয়ে শিবা সরে সরে যাচ্ছে শরীরটা দুলিয়ে ক্রিকেট ব্যাট ধরে পুল করার ভঙ্গিতে, ওরা রড তুলে পা

পা এগিয়ে এল।

ডান দিকের লোকটা। শিবা বেছে নিল ওকেই। রড ধরা হাতটা বেশি নামিয়ে রাখার জন্য রডের মাথাটা জমির দিকে। ওটা তুলে নিয়ে পেছন দিকে টেনে তারপর সামনে চালাতে গেলে, অন্তত এক সেকেন্ড বেশি সময় খরচ হবে। ওই এক সেকেন্ডেই ফয়সলা হয়ে যাবে।

শিবা এক পা, দু'পা, তিন পা এগোল নাচ না থামিয়ে। বাঁ দিকের লোকটা দাঁত চেপে একটা শব্দ করে হাতের রড তুলল। শিবা জানে দু'হাত লম্বা কিছু দিয়ে জোরে আঘাত করতে হলে আঘাতের জিনিসটাকে অন্তত তিন থেকে আড়াই হাত দূরে থাকতে হবে। ওই তিন হাতের মধ্যে ঢুকে লোকটার শরীরের কাছে চলে যেতে পারলে—।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই শিবা ডান দিকের লোকটাকে যেন মারতে যাবে এমন একটা ভান দেখাতে, ডান দিকে শরীর হেলিয়েই ছোবল মারার মতো পলকে বাঁ দিকে সরে, তিন হাত গণ্ডির মধ্যে ঢুকেই লেফ্‌ট হুক করল। ঠিক ডান কানের নীচে চোয়ালের গোড়ায়—ফ্রাঙ্ক গোম্‌স বলেছিল, 'ইউ হ্যাভ আ বিউটিফুল লেফ্‌ট হুক'—ঘুসিটা জমে গেল।

ঘুসির পরিণতিটা জানার জন্য শিবা চোখের কোণ দিয়েও তাকাল না। ঘুসিটা শেষ করার সঙ্গেই সে ডাইনে নজর ঘুরিয়েছে। ডান দিকের লোকটার রডের মাথা জমি থেকে উঠছে।

"হুঅঅঅ...উউউ।" বিকট স্বরে সে এক ডাকাতে চিৎকার করেই লোকটার এক হাতের মধ্যে ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল। অবশ্যই হকচকিয়ে গেছল লোকটা এবং তারপরই কম্বিনেশন পাঞ্চ-এর ওয়ান-টু-থ্রি, ওয়ান-টু-থ্রি তার দুই চোয়ালকে ও সংবিৎকে অবশ করে দিল। টলতে টলতে দু'পা পিছিয়ে গিয়েই লোকটি উবু হয়ে বসল এবং কাত হয়ে জমিতে গড়িয়ে পড়ল।

তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া রডটা তুলে নিয়ে শিবা অবশিষ্ট লোকটিকে চাপা গলায় বলল, "এবার তোর পালা।"

দূর থেকে আসা ফ্যাক্টরির আলোয় চোখমুখের ভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু লোকটির ভঙ্গিতে ধরা পড়ছে, প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

"না, না, আমি না—" বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা পেছন ফিরে অবিশ্বাস্য গতিতে দৌড়তে শুরু করল, "ডাকাত, ডাকাত" চিৎকার তুলে।

একটা হইচইয়ের শব্দ গেটের দিক থেকে উঠল। শিবা বুঝে গেল, দল বেঁধে এবার ওরা আসবে, আর এখানে থাকা নয়। সে ছুটে গেল পাঁচিলের কাছে। লাফিয়ে পাঁচিলের মাথা ধরে হিঁচড়ে নিজেকে তুলে একটা পা রেখে পাঁচিলে উঠে বসেই দেখতে পেল কিছু লোক ছুটে আসছে। ইটের বড় একটা খণ্ড শিবার হাতচারেক দূরে পাঁচিলের গায়ে এসে লাগতেই টুক করে সে ওধারে লাফিয়ে যে রাস্তায় ননীর রিকশাটা গেছে, সেইদিকে ছুটতে শুরু করল। ভাঙা ইট, পাথরকুচি, গর্ত করা রাস্তা তার খালি পা দুটিকে ব্যথায়, যন্ত্রণায় নাজেহাল করতে লাগল।

মিনিট কয়েক ছোটার পর তার মনে হল, কেউ আর তাড়া করে আসবে না। অন্ধকারে এভাবে ছোটা বা হেঁটে যাওয়াও বিপজ্জনক। তাকে চোর ভেবে যদি কেউ চেঁচিয়ে ওঠে, যদি কুকুরে তাড়া করে। পিটিয়ে মানুষ মেরে ফেলার ঘটনা তো এখন চারদিকেই ঘটছে!

একটা পুকুরের ধার দিয়ে যেতে যেতে সে অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করল। জল দেখে তার ইচ্ছা হল স্নান করে তাজা হয়ে নেওয়ার। অন্ধকারে সে আঘাটাতেই, গেঞ্জি খুলে জলে নেমে পড়ল। গলা পর্যন্ত শরীর ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। চার বছর সে এই ধরনের পরিশ্রম করেনি। এই ধরন বলতে, বক্সিং। প্রায় এক রাউন্ড সময় সে ব্যয় করেছে পাঁচটা লোকের সঙ্গে। সেইসঙ্গে উদ্বেগ, ভয় আর উত্তেজনার ধকল যোগ করলে—! পুকুর থেকে টলতে টলতে সে উঠল। তার সারা দেহে পানা, দু' পায়ে পাঁক।

হাঁটু থেকে পায়ের নীচের দিক তার পাথরের মতো ভারী লাগছে। সে পা টেনে টেনে কিছুটা হেঁটে আর পারল না। শরীরটা দুলছে, মাথার মধ্যে কামড়ে ধরছে যন্ত্রণা। ঠাণ্ডা জল শরীরটা জুড়িয়ে দেওয়ায় এখন তার শরীরে বিছিয়ে যাচ্ছে আলস্য।

রাস্তাটা ফাঁকা ফাঁকা, বাড়িগুলো দূরে দূরে। একটা ছোট মাঠের মতো, মাঝখানে ঝাঁকড়া ডালপালা নিয়ে একটা গাছ। শিবা এগিয়ে গেল গাছটার দিকে। গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। ভোরের হাওয়ায় শীত শীত লাগছে। তার চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠছে।

ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। শিবা জোরে মাথা ঝাঁকাল। ননী ওদের নিয়ে ঠিকমতো পৌঁছতে পেরেছে কি না কে জানে! সে আকাশের দিকে মুখ তুলল। গাঢ় অন্ধকারটায় এখন ছাই ছাই রং ধরেছে। একটু পরেই ভোর হবে। একটা দিন থেকে আর-একটা দিন...জীবনের একটা সময় থেকে আর-একটা সময়...।

হঠাৎ শিবা সোজা হয়ে বসল।...আশ্চর্য, সবই তো ঠিকঠাক রয়েছে!...সেই ফুটওয়ার্ক, সেই হুক, আপার কাট, রাইট ক্রস! কিছুই তো সে ভোলেনি, কিছুই হারায়নি!

মনে পড়ছে জীবনের প্রথম ঘুসিটা! শিবা অবাক হয়ে আকাশে তাকাল। পাশে একটা দোতলা বাড়ির পাঁচিল। এটা বোধহয় খেলার মাঠ। আবছাভাবে গোলপোস্ট দেখা যাচ্ছে। তার মনে পড়ল, দেবুর পেট লক্ষ্য করে প্রথম ঘুসি, তারপরই ডান হাতের মুঠো নীচের থেকে ওপরে উঠল থুতনিতে। দেবু দেওয়ালে ছিটকে গিয়ে খালি বস্তার মতো ঝরে পড়ল মেঝেয়। তিন-চার সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল।

তারপর একটা খ্যাপা গোরিলার মতো সাধু দু'হাত ছড়িয়ে এগিয়ে এল। এক পা পিছিয়ে সরে যাওয়ার জন্য শিবা জলপোকার মতো নড়াচড়া করল ডাইনে-বাঁয়ে। সাধুর দুটো হাত হাতুড়ির মতো নেমে এল শিবার দুই কাঁধের দিকে। বিদ্যুৎগতিতে হাঁটু ভেঙে শরীরটা নামিয়ে নিয়ে আঘাতের ধাক্কাটা কমিয়ে নিতে নিতেই সে পাশে সরে গেল। কিন্তু বাঁ কাঁধটা এড়াতে পারেনি সাধুর ডান মুঠোর আঘাতটা। অসাড় হয়ে

গেল বাঁ কাঁধ।

সাধু আবার জোড়া মুঠো তুলেছে। 'মারো'—সঙ্কেতটা ডান হাতে পৌঁছনো মাত্র ঘুসিটা বেরিয়ে এসে সাধুর বাঁ কানের নীচে চোয়ালে বসে গেল। সাধুর চোখদুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে বিস্ময়ে কিংবা আঘাতের ধাক্কায়। তোলা দুটো হাত ধীরে ধীরে নেমে এল। তারপরই শিবার দুটো ঘুসি পাঁজরের দু'ধারে 'ঢপ ঢপ' শব্দ তুলল। দু'হাতে বুক চেপে সাধু ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল।

তখন তার মাথার মধ্যে কিছু নেই, একদম খালি। শুধু সোঁ সোঁ বাতাসের শব্দ। সে বুঝতেই পারছিল না দু'মিনিটের মধ্যে কোচিংঘরের মধ্যে নিঃশব্দেই প্রায় কী ঘটে গেছে।...ভোররাতে গাছতলায় বসে সেদিনের মতো শিবা বুঝতে পারছে না, জোনাকি ফ্যাক্টরির পাঁচিলের ধারে, নিঃশব্দেই বলা যায়, সে কী ঘটাল!

সেদিন ছুটে এসেছিল অনেকে। প্রথমে বটকেষ্ট এসে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে, কুঁজো হয়ে বসা ভবানীসার, দেয়ালে নেতিয়ে থাকা দেবু, হাতে ভর দিয়ে মেঝে থেকে ওঠার চেষ্টা করা সাধু, আর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা শিবাকে দেখে চিৎকার করে মাথা চাপড়ে বলেছিল, "সব্বোনাশ হয়ে গেছে গো, এবার আমরা মারা পড়ব গো! অর আমাদের রক্ষে নেই। শিবা আমাদের সব্বোনাশ করেছে।"

"কী হল বটকেষ্ট, চ্যাঁচাচ্ছ কেন?"

"বটাদা, কীসের সব্বোনাশ?"

"বটুবাবু, কে মারা গেল?"

সবশেষে হাউহাউ করে উঠে সুপ্রভা বলেছিলেন, "ওগো, আমি কোথায় যাব গো!"

ঘরের মধ্যে অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখতে দেখতে জমে ওঠা ভিড়ের মধ্যে কে ফিসফিস করে প্রথম বলেছিল, "শিবা, আমাদের শিবা করেছে!"

"শিবা, চায়ের দোকানের ছেলেটা?"

সাধু কথা বলতে গিয়ে, "আহ্‌হ" বলে গাল চেপে ধরল। তারপর ইশারায় জানাল, সাইকেল রিকশা চাই। ননী তখন বলেছিল, "এই দুডারে রিকশা কইর‍্যা আমিই পৌঁছাইয়া দিমু।"

রিকশাটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। শিবার মুখের ওপর ননীর ছায়া। চোখ পিটপিট করে দু'ধারে তাকিয়েই শিবা ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। গাছতলায় কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল!

প্যান্ট থেকে ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বোকার মতো হেসে শিবা বলল, "তুই...ক'টা বাজে?...ইস্‌স বেলা হয়ে গেছে, দাদা বসে আছে দোকানে আলুর দমের জন্য, আর আমি কিনা...তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে চল আমায়।"

শিবা প্রায় ছুটে গিয়েই রিকশায় বসল। তারপরই মনে পড়ায় উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওদের ঠিকমতো নিয়ে গেছিস তো?"

প্যাডেল করতে করতে ননী বলল, "তর হারগোর ঠিক আচে তো?"

"যা বলছি তার জবাব দে।" শিবা ঝাঁঝিয়ে উঠল। "ওরা কোথায় এখন?"

"বোধহয় অহন কোয়ার্টারেই। পথেই ধরা পইরা গ্যালাম। আন্ধারে ওত পাইত্যা কয়েকজন যে বইসা আছে, তা আর ক্যামন কইরা জানুম...আমারে কয়ডা চরচাপ্পর মাইরা কইল ভাগ, নয়তো খতম কইরা ফ্যালামু। এই বইলা অগো নামাইয়া লইয়া গেল।" ননী নিস্পৃহ স্বরে কথাগুলো যখন বলছে, শিবার অবস্থা তখন বজ্রাহতের মতো।

"এত কাণ্ড করে শেষে কিনা—"। দুঃখে, মর্মবেদনায়, হতাশায় শিবার স্বর আটকে গেল। মাথা নিচু করে সে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর চোখ থেকে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরল।

ব্রেক কষে রিকশাটা থেমে যেতেই শিবা মুখ তুলল। ননী হাসছে। কয়েক সেকেন্ড তার সময় লাগল হাসির অর্থটা বুঝে নিতে। তারপরই, "ছুঁচো কোথাকার, ছারপোকা কোথাকার...।" হাত বাড়িয়ে শিবা ননীর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল।

"আমারে মাইরা হাতে গন্ধ কইরলে তর হাতের থাইকা আলুর দম কিন্তু খামু না। আমি নিতুদার থাইকাই নিমু।"

"কোথায় ওরা?"

"অতক্ষণে ট্যাসকিতে ভবানীসারের কোচিং হইতে পাইকপাড়ায় মিতাগো বাড়ি পৌঁচাইয়া, হন্দেশ, রসগোল্লা বইস্যা বইস্যা সাঁটাইতেচে।"

"শিগগির চল, মা ডেকচি নিয়ে বাড়িতে বসে আছে।" শিবা ব্যস্ত হয়ে গেঞ্জিটা পরে নিল।

"অহন নয়ডা বাজে, ডেচকি লইয়া গিয়া নিতুদার সামনে দাঁড়াইয়া কইবিডা কী? আগে সেইডা মনে মনে ঠিক কইরা ল।" তারপর রিকশা থেকে নেমে ননী শিবাকে নির্দেশ দিল, "নাম।"

"কেন?"

"আগে নাম তো, তারপর কইতাচি।"

শিবা নামতেই, সিট তুলে যাত্রীদের সামনে ঝোলাবার পলিথিনের ময়লা চাদরটা বার করে ননী বলল, "হাসপাতালে যেভাবে রুগিরা যায়, ত্যামন কইরা এডা আপাদমস্তক গায়-মাথায় জড়াইয়া সিটে কাত হইয়া শুইয়া থাক। অরা পথে ঘুরতাসে, যদি তরে একবার দেইখ্যা চিইন্যা ফেইলতে পারে...নে জড়া, জড়া, গায়ে জড়া।"

পলিথিনে মাথা-মুখ ঢেকে শিবা রিকশায় কাত হয়ে পড়ল, ননী হুডটা তুলে দিল। মিনিট দশেক চলার পর রিকশা থামল। শিবার মনে হল, এত তাড়াতাড়ি তো পূর্বপল্লিতে পৌঁছনোর কথা নয়! মুখের সামনে থেকে চাদরটা সামান্য সরিয়েই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

রিকশাটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। নিতুদা গ্লাসের ওপর গুঁড়ো চা দেওয়া ছাঁকনিটা ধরে গরম জল ঢালতে ঢালতে তারই দিকে তাকিয়ে। সামনে আলুর দমের ডেকচিটা।

কী ব্যাপার, ডেকচিটা পৌঁছল কী করে!

"কেন লাফালাফি করতে যাস?" নিতু বিরক্ত স্বরে ধমকে উঠল। "কী বললেন

ডাক্তারবাবু, হাত-পা ভেঙেছে?"

বুঝতে না পেরে শিবা হকচকিয়ে তাকাল ননীর দিকে। ননী ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বলল, "কইলেন, বোধহয় ভাঙে নাই। তবুও পনেরো ফুট উঁচা কার্নিস থাইক্যা লাফাইছে তো, একবার খালি হাড়ের একটা ছবি তুইলবার কইচে আর দুই হপ্তা পুরা রেস্ট। তো আমি কইলাম, ডাক্তারবাবু শিবা যদি পুরা রেস্ট লয় তাইলে নিতুদা একা দোকানডা সামলাইব কী কইরা?...তহন অনেক ভাইব্যা তিনি কইলেন, ঠিক আচে একবেলা কাম কইরব আর বাকি দিনডায় রেস্ট লইব। বড় ডাক্তার তো, নামের পর বিলাতি ডিগ্রিই ছয়-সাতটা! চিকিচ্ছার কায়দাই আলাদা! কোনও ওষুদপত্তর না, মলম-ইনজেকশান না, কইয়া দিলেন শুদ্দ রেস্ট।"

"কী দরকার ছিল তোর, অত রাত্তিরে জানলার ওপর থেকে বেড়াল-বাচ্চা নামাতে যাওয়ার?...সারারাত আমি আর মা ভেবে মরি!" কাজের মধ্যেই নিতু গজগজ করতে লাগল। "এখন চুপ করে বসে থাক এখানে। পায়ের রেস্ট মানে দাঁড়ানো উচিত নয়।"

"রিশকায় বইসা আছে, ওহানেই থাউক, আমি বরং অহন ওরে বাড়ি লইয়া যাই। তোমার লগে হগালে যে কথাডা হইল নিতুদা, মনে আছে তো?"

"মনে আছে মানে?" নিতু বিরক্ত হয়ে বলল, "তুই বিকেলে এসে শিবার বদলে কাজ করবি আর আমি তোর সেই কাজ নেব।"

"আহা রাগ করো ক্যান। বিড়াল-বাচ্চাটা নামাইতে আমিই তো অরে উশকাইয়া ছিলাম। দোষ তো আমারই। দুপুর থাইকা বিড়ালডা জানলার উপর। ডাক্তারবাবুর মাইয়া কান্নাকাটি করতা আছিল। তাই দেইখা আমিই শিবারে খোঁচাইলাম, দ্যাখ নামাইয়া আনতে পারস কি না। তয় একডা কথা নিতুদা, ডাকতারবাবু ভদ্দর লোকই, রাইতে তিনি শিবারে বাড়িতে রাইখা সেবাযত্ন করচ্যান। আমার মনের মইধ্যে একটা খচখচানি তহন থাইকাই কইরতাচে—ইয়ের জন্য দায়ি তো আমিই। শিবা তো সাদাসিদা মানুষ, অর ক্ষতি তো আমিই কইরাচি।...না না নিতুদা, অর আধা কাম আমিই করুম, তুমি না কইরো না।" চোখে জল এনে, গলা কাঁপিয়ে ননী ঝপ করে বসে নিতুর পা জড়িয়ে ধরল।

"অ্যাই অ্যাই, এ কী হচ্ছে! ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুইই আদ্ধেক কাজ করবি।" নিতু আপ্লুত হয়ে ননীকে দু'হাতে দাঁড় করাল। "ডেকচিটা—আনা-নেওয়া শুধু এইটুকু করে দিস। তা হলেই হবে। তোকেও না, শিবাকেও না, কাউকেই আমার দরকার নেই। রিকশা চালানো বন্ধ করে লোকসান করবি, তাতে আমার মনেও তো খচখচানি শুরু হবে।"

শিবার কাছে পুরো ব্যাপারটাই হেঁয়ালির মতো প্রথমে ঠেকছিল। এইবার কুয়াশাটা যেন রহস্য থেকে কিছুটা কাটছে। ডেকচিটা সকালে বাড়ি থেকে ননীই তা হলে এনে দিয়েছে। রাতে বাড়িতে না ফেরার জন্য কোনও এক কাল্পনিক ডাক্তারের মেয়ের বেড়াল-বাচ্চা পাড়া এবং পাড়তে গিয়ে পায়ে চোট আর সেজন্যই বাড়ি ফিরতে না পারা! কৃতজ্ঞ চোখে ননীর দিকে তাকিয়েই শিবার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। ননীর বরাভয়

দানের পাঞ্জায় চারটে আঙুল উঠে রয়েছে। সারা মুখে নধর একটি হাসি ছড়ানো।

"দাদা, ননীর...ইয়ে," শিবা ঠিক গুছিয়ে কথাটা বলতে পারছে না।

"আমার আবার কী!" ননী খুবই অবাক হয়ে শিবার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরই কিছু একটা মনে পড়ার মতো ভাব করে বলল, "অঅঅ, হগালে আমি কী খামু তাই নিয়া তুই ভাবতাচস? আরে দূর পাগল, নিতুদারে এসব কওন লাগে না। চাইরডা আলু আর একডা পাউরুটি, এ তো নিতুদা আসা মাত্রই দিব।"

"নিশ্চয় দেব। ননী, খাওয়ার ব্যাপারে তুই একদম নিশ্চিন্ত থাকবি।" নিতু শশব্যস্তে বলে উঠল। "তুই চারটের সময় আসবি, আটটা পর্যন্ত থাকবি, ওই সময়টায়ই আমার একটু হেল্‌প দরকার হবে। সেজন্য তোকে পাঁচটাকা রোজ দেব।"

রিকশায় শিবাকে নিয়ে পূর্বপল্লিতে ফেরার সময় ননী বলল, "তর ভাগ্যি ভাল অমন এক ভাই পাইচিস। খাঁটি মানুষ, লোক ঠকাইয়া পয়সা করে না।"

"খাঁটি মানুষ বলেই ঘেন্নায় ইউনিয়নবাজি থেকে সরে এসেছে। কিন্তু তুই ওখানে পৌঁছলি কী করে?"

"কোথায়? যেহানে তুই ঘুমাইতেচিলি?"

এরপর ননী যা বলল তার সারাংশ: রিকশায় সে উৎপল, মধুমিতা এবং টুটুকে নিয়ে হুহু করে চালিয়ে ভোর হওয়ার আগেই পৌঁছে যায় ভবানীসারের কোচিংয়ে। সার অপেক্ষা করছিলেন তাদের জন্য। কিন্তু শিবা ফিরে না আসায় তিনি খোঁজ করার জন্য বেরোতে যাচ্ছিলেন। ননীই তাঁকে আটকে রেখে ভোরের আলো ফুটতেই রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

প্রথমে সে যায় শিবার বাড়ি। নিতুদা তখন বেরিয়ে গেছে। তারাময়ী ওর কাছে শিবার হদিস জানতে চাইলে তখন বিড়াল নামানোর গল্পটা তার মাথায় আসে। তারপর সে আলুর দমের ডেকচিটা রিকশায় তুলে নিয়ে—"মা কালীর কিরা ডেকচির ঢাকনা খুলি নাই।"—নিতুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেরিয়ে প্রথমে ভবানীসারের কোচিংয়ে এসে শুনল, মিতা এসেছিল। ওরা ট্যাক্সিতে পাইকপাড়ায় চলে গেছে। নিতুকেও সে গল্পটা বলে এবং শিবার জন্য একবেলা ছুটির ব্যবস্থা করে নেয়। তারপর সে শিবাকে খুঁজতে বেরিয়ে, বহু ঘোরাঘুরির পর আদর্শ সম্মেলনীর ফুটবল মাঠে তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে।

"ওস্তাদ, একবেলা ছুটির ব্যবস্থা কেন কইরলাম কইতে পারো?" ননী গম্ভীর গলায় বলল দেবদাস পাঠক রোডে ঢোকার আগে রিকশাটা থামিয়ে।

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে আবার বলল, "ওস্তাদ, আইজই বিকালে লালবাগানে গিয়া প্র্যাকটিস শুরু কইর‍্যা দাও। নিতুদা বাইর হইলেই তুমিও বাইর হইবা। মায়েরে কইবা ডাক্তারের কাছে যাইতেচি। রোজ বিকালে প্র্যাকটিস করনের জইন্যই ছুটির এই ব্যবস্থাডা! নইলে আমি মিথ্যা কথা কইতাম না।"

মুখ ঘুরিয়ে শিবার চোখের দিকে তাকাল। জ্বলজ্বল করছে ননীর মুখ। চপল, পরিহাসপ্রবণ ভাবটা চোখে আর নেই। এই ননী যেন রিকশাওলা নয়, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ! "শিবা তোরে ফিইরা আইতে হইব। বকসিং তোর রক্তে।

চার-পাঁচডারে একসঙ্গে ফ্যালাইতে পারিস আর রিংয়ে উইঠ্যা একডারে ফ্যালাইতে পারবি না? ক শিবা ক, তুই আবার ফিরবি। আমাগো পোলা ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান হইতে পারে নাই, আমাগো হেই লজ্জা মুইছ্যা দিবি।"

দু'জোড়া চোখ পরস্পরের সঙ্গে প্রায় কুড়ি সেকেন্ড ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধে রত হল। অবশেষে একজোড়া চোখ পরাজয় মেনে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বলল, "চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা!" চিৎকার করে উঠল ননী। "যারা জিততে চায় তারা কহনো 'চেষ্টা' কয় না, তারা কয় 'জিতুম'। হ, চেষ্টা নয়, জিতুমই।"

"জিতুম।" শিবা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধীরকণ্ঠে, চোখে চোখ রেখে বলল, "ননী আমি ফিরব, জিতব।"

শিবার মাথার থেকে সঙ্কেত তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। মুঠি দুটো পাকিয়ে সে শূন্যে পরপর কয়েকটা ঘুসি ছুড়ল।

ঠিক সেই সময় বি টি রোড দিয়ে দ্রুত ধাবমান একটা স্কুটার ব্রেক কষে মন্থর হল। হেলমেট পরা চালক পেছনে বসা লোকটিকে বলল, "দেবু, ওটা কে রে? শিবা না? আবার বক্সিং শুরু করেছে নাকি?"

"কই, তেমন তো কিছু শুনিনি! আচ্ছা খবর নিচ্ছি।"

চালকের হাতটা ডান কানের নীচে চোয়ালে অজান্তেই যেন উঠে এল। চোয়ালটা কঠিন হল।

॥ ৮ ॥

"আরে শিবা না! আয়, আয়...কত বছর পরে আবার তুই এলি। ...থাক, থাক, ভালভাবে বেঁচে থাক। শরীরে আর কোনও ঝামেলা নেই তো?...সব শুনেছি আমি, গুণ্ডারা মেরে তোর কী অবস্থা করেছিল...।"

লালবাগান জিমন্যাশিয়ামের আঠারো বছরের সচিব আশ্চর্য ঘটক শিবার প্রণাম নিতে নিতে কথাগুলো বললেন। সারা মুখে প্রসন্ন হাসি। প্রথম দিন শিবা যেমনটি দেখেছিল, আশ্চয্যদা আজও তেমনই রয়েছেন। মিশকালো বিরাট কাঠামো, একটু কুঁজো, চিবুকে ও ঘাড়ে দু'থাক চর্বি। সাদা ধুতি, সাদা হাফ শার্ট, বাহুতে সোনার তাবিজ, চোখ দুটি আয়ত ও কোমল।

রিংয়ের ধারে লম্বা বেঞ্চটায় দু'জনে বসল। দু'জোড়া ছেলে রিংয়ে স্পার করছে। দড়ি নিয়ে স্কিপ করছে একজন। রিং ঘিরে দুটি ছেলে ছুটছে শূন্যে ঘুসি ছুড়তে ছুড়তে। অ্যাসবেসটসের চাল দেওয়া হলঘরটায় কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো হেভি ব্যাগে ঘুসি মেরে যাচ্ছে একটা ছেলে। বালিভরা ব্যাগটা আকারে বছর সাত-আট বয়সি ছেলের মতো। একটি ছেলে সেটা দু'হাতে ধরে রয়েছে যাতে না দোলে।

সাধুর চোয়াল ভেঙে দেওয়ার কয়েকদিন পর শিবা প্রথম লালবাগান জিম-এ পা দিয়ে যা কিছু দেখেছিল, আজও ঠিক তাই দেখছে। তেলোহাঁড়ির মতো রবারের স্পিড ব্যাগে অনবরত ঘুসি মেরে চলেছে একজন। ওপরে নীচে স্প্রিং দিয়ে টানা, তার

মাঝখানে ব্যাগটা শূন্যে। ঘুসি খেয়ে ব্যাগটা ছিটকে গিয়েই পলকে ফিরে আসছে মুখের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুসি। অতি দ্রুত হাত চালাবার প্র্যাকটিস।

দেয়ালে বিরাট আয়নাটার সামনে শ্যাডো করে যাচ্ছে দু'জন। নিজেদের প্রতিবিম্বের সঙ্গে একাকী লড়াই করে চলেছে তারা। ঘুসি চালাচ্ছে, ঘুসি কাটাচ্ছে, নেচে নেচে সরে যাচ্ছে, হঠাৎ মাথাটা ডুব দেওয়ার মতো নামাচ্ছে, পেছনে হেলছে, পাশে কাত হচ্ছে।

বেঞ্চে বসে জানলা দিয়ে জিম-এর মধ্যে অনেকটা অংশ দেখা যায়। আশ্চয্যদা এইখান থেকে ভেতরে-বাইরে দু'দিকেই নজর রাখেন। এটা শিবা টের পেয়েছিল প্রথম দিনেই। সেদিন অবাক হয়ে এখানকার ব্যাপারস্যাপার লক্ষ করতে করতে রিংয়ের পেছনে ছ্যাঁচা বাঁশের ছ'ফুট উঁচু বেড়ার ওধারে তার চোখ আটকে গেছল।

ওধারে একটা জিমন্যাসটিকস ক্লাব। সেখানে বিম-এর ওপর একটা মেয়ে দেহটাকে চাকার মতো ঘুরিয়ে ভল্ট দিচ্ছিল। কখনও তার দুটো পা শূন্যে উঠছে, কখনও-বা দু'হাত ছড়িয়ে বিমের ওপর দিয়ে টলমল করে হাঁটতে গিয়ে নৌকো থেকে প্রতিমার বিসর্জনের মতো পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটির মুখ চেনা চেনা লাগছিল বলেই সে তাকিয়ে থেকেছিল। সেই সময় আশ্চয্যদা পেছন থেকে বলে উঠেছিল, "ওদিকে কী দেখছ? এখানে কেউ আশপাশে তাকায় না। এটা ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে সাধনার জায়গা।" কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ বা রুক্ষতা ছিল না। শিবা লজ্জা পেয়েছিল।

বিম-এ ভল্ট দেওয়ার প্র্যাকটিস করছিল যে-মেয়েটি, শিবা পরে তাকে চিনতে পেরেছিল। ভবানীসারের কোচিংয়ে পড়তে আসে। তারপর এখন তো সে জানেই ওর নাম মিতা, পারমিতা দাস।

"আশ্চয্যদা, আমি আবার শুরু করব, রিংয়ে নামব।" গলা নামিয়ে শিবা প্রায় ফিসফিস করে বলল।

আশ্চর্য ঘটক ভালমতো শুনতে পেলেন না। মাথাটা কাত করে বললেন, "কিছু বললি?"

"আমি আবার শুরু করব।"

"কী শুরু করবি?"

"বক্সিং।"

আশ্চর্য ঘটকের চোখ পৃথিবীর নবম বা দশম আশ্চর্যতম বস্তুটি দেখার মতো হয়ে উঠল। কী বলবেন, ভেবে পাচ্ছেন না।

"তুই...তুই আবার—।"

"পারব না? মাত্র তো চারটে বছর সরে আছি, আবার ফেরা যাবে না?" শিবা ব্যগ্র উৎকণ্ঠা নিয়ে আশ্চর্য ঘটকের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে রইল।

"ফেরা যায় না মানে! আলবাত ফেরা যায়। মহম্মদ আলি সাড়ে তিন বছর পর রিংয়ে ফিরে আরও দু'বার চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। তা হলে তুই কেন ফিরে আসতে পারবি না?"

"আলির সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই হয় না। কী বিরাট ফাইটার! ওর কাছে

আমি তো একটা পিঁপড়ে।"

"ঠিক কথাই, তুই আলি নোস কিন্তু তোর অপোনেন্টরাও তো কেউ ফ্রেজিয়ার, নর্টন বা ফোরম্যান হবে না। বড় বড় ফাইটারদের মতো নিজেকে ভাব, তাদের সঙ্গে একই লাইনে নিজেকে দাঁড় করা, এটাকে 'বামন হয়ে চাঁদ ধরা' বলে হেসে উড়িয়ে দিসনি। এইরকম করে ভাবলে তবেই চেষ্টাটা আসে।" আশ্চর্য ঘটক থেমে গিয়ে হেসে উঠলেন। "এই দ্যাখ লেকচার দিয়ে ফেলছি! কবে থেকে শুরু করবি?...তোর শরীর তো আগের থেকে অনেক বড় হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে জোরও বেড়েছে, লাইট ওয়েটে লড়েছিলি, এখন ওজন কত?"

"জানি না, ওজন নিইনি।"

"চল, চল, ঘরে চল, ওজনটা নিয়ে দেখি।"

শিবাকে নিয়ে তিনি হলঘরে এলেন। এরই কোণের দিকে ছোট্ট অফিসঘরটা। আশ্চর্য ঘটককে দেখে ছেলেরা জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাল। জরুরি কিছু বলার না থাকলে, যখন ট্রেনিংয়ে ছেলেরা ব্যস্ত থাকে তখন তিনি হলঘরে পা দেন না।

হেভি ব্যাগটার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে আশ্চর্য ঘটক থেমে গিয়ে মুচকি হাসলেন। ব্যাগে হাত রেখে বললেন, "মনে আছে তোর?"

শিবা লাজুক হাসল। ঘটনাটা মনে তো আছেই, চিরজীবনই তার মনে থাকবে।

তখন রাত প্রায় দশটা। জিম-এর হলঘরটা, ইলেকট্রিক খরচ বাঁচাবার জন্য অন্ধকার। শিবা একাই হেভি ব্যাগে ঘুসি মেরে চলেছে। বাইরে কয়েকজন প্রবীণ মেম্বারের সঙ্গে আশ্চর্য ঘটকও বেঞ্চে বসে গল্প করে যাচ্ছেন। ঢপ ঢপ ঢপ, ব্যাগে ঘুসি মারার শব্দটা ওদের কানে আসছিল।

একজন জানতে চাইল, "অন্ধকারের মধ্যে কে ট্রেনিং করছে, আশ্চয্য?"

"গোম্‌সের ছেলে, ডেডিকেটেড, শিবা নাম। গোম্‌স এবার ওকে নিয়ে পড়েছে।" আশ্চর্য ঘটক বললেন।

"এই নিয়ে গোম্‌স ক'টাকে ধরে আনল বলো তো? একটাও তো ন্যাশনালের ফাইনালে পর্যন্ত উঠতে পারল না।...ওঠার জন্য খাটতে হয়, এটাই বাঙালি ছেলেরা পারে না। জোর চাই জোর, ঘুসির জোর।" এই বলে ভদ্রলোক বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক তখনই হলঘরের দরজার কাছ থেকে শিবার ভীত সন্ত্রস্ত গলা শোনা গেল, "আশ্চয্যদা, একবার আসবেন?"

আশ্চর্য ঘটক হলঘরে গেলেন, আলো জ্বাললেন এবং এক মিনিটের মধ্যেই ছিটকে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে ডাকলেন, "নোটনদা, নোটনদা, এক মিনিট, একটু এদিকে আসুন।"

কৌতূহল নিয়ে সবাই হলঘরে ঢুকলেন। এককোণে শিবা জড়োসড়ো, চুরির দায়ে ধরা পড়ার মতো মুখ। ওঁরা সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে কিছুই বুঝতে পারলেন না।

আশ্চর্য ঘটক আঙুল দিয়ে হেভি পাঞ্চিং ব্যাগটাকে দেখালেন। ক্যাম্বিসের খোলের মধ্যে বালি ভরা ব্যাগটা নিথর হয়ে ঝুলছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে ব্যাগের একটা

জায়গায় দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দিতেই ঝুরঝুর করে মেঝেয় বালি পড়ল।

"অ্যা, ফেটে গেছে!" নোটনদা হাঁ করে শিবার দিকে তাকিয়ে রইলেন। "তুমি ফাটিয়েছ?"

সবাই ব্যাগটাকে তন্নতন্ন পরীক্ষা করলেন। কাপড়টা খুব পুরনো নয়। মাসছয়েক আগে ব্যাগটা করানো হয়েছে। সন্দেহ প্রকাশ করে তখন ওঁরা অনেক কথাই বলেন—কাপড়ের ওই জায়গাটা পচে গেছল, ছেঁড়াটেড়া ছিল, বাহাদুরি নেওয়ার জন্য ছেলেটা কিছু একটা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করে রেখেছিল।

শিবা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "আমি শুধু পাঞ্চ করে গেছি, আর কিছু করিনি।"

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর শিবা চোখে জল নিয়ে বলে, "আশ্চয্যদা, মাইনে পেলেই আমি নতুন ব্যাগ করিয়ে দেব, ইচ্ছে করে আমি ফাটাইনি।"

"তুই একটা বলদ! ইচ্ছে করে কি কেউ ঘুসি মেরে এই ব্যাগ ফাটাতে পারে?" তারপর ভাল্লুকের থাবার মতো বিশাল দুই তালুতে শিবাকে আঁকড়ে বুকে টেনে নিয়ে আশ্চর্য ঘটক বলেছিলেন, "সামনেই হলধর টুর্নামেন্ট, তোকে নামাব।...চালিয়ে যা শিবা, চালিয়ে যা, যত ব্যাগ ফাটাতে চাস ফাটিয়ে যা।

ওজন যন্ত্রের কাঁটার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য ঘটক ভ্রূ কোঁচকালেন। "করেছিস কী, প্রায় বায়াত্তর কেজি!...লাইট মিড্‌ল। অবশ্য ট্রেনিং করতে করতে শরীর ঝরবে, একাত্তরের নীচে ওয়েল্টারে এসে যাবি।"

খালি গায়ে শুধুমাত্র জাঙিয়া পরে শিবা ওজন দিতে যন্ত্রের ওপরে উঠেছিল। প্যান্ট আর টি-শার্টটা পরতে পরতে বলল, "গোম্‌সসার কখন আসেন আশ্চয্যদা?"

"গোমস?" আশ্চর্য ঘটক আমতা আমতা করে বললেন, "ও তো আর আসে না। বছর-দুই আগে ওর একমাত্র মেয়ে বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়া চলে যাওয়ার পর থেকেই কী রকম যেন হয়ে গেল। দুনিয়ায় ওই মা-মরা মেয়েটি ছাড়া আর কেউ তো ছিল না। প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। পুরনো মোটর কেনাবেচার ব্যবসাটা ছেড়ে দিল। হাতে যা টাকা ছিল তাই দিয়ে দিনরাত্তির মদ খেতে শুরু করল।...জিম-এ আসা বন্ধ করল। ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা আমরা করেছি। দু-তিনবার এসেওছিল; বুঁদ হয়ে বসে থাকত, হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে উঠত, ছেলেদের চড়-থাপ্পড়ও মারত। তারপর নিজেই আসা বন্ধ করে দিল।"

"সেই পার্ক সার্কাসের বাড়িতেই আছেন?"

"না রে, ওখান থেকে বাড়িওলা উঠিয়ে দিয়েছে। আর ভাড়া দিতে পারত না।"

ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌সের কথা শুনতে শুনতে শিবা যেমন দুঃখ পেল তেমনই অসহায়ও বোধ করল। গোম্‌সই তাকে বক্সিং শিখিয়েছে, তার প্রথম ও একমাত্র গুরু। এখন নতুন করে গুরু চাই।

"আমাদের এখানে ট্রেনার এখন কান্তি, কান্তি সরকার। তুই তো ওকে চিনিস।"

কান্তি নামটা শোনামাত্র শিবার মুখ হাজার বছরের পাথরের মূর্তির মতো ঘষা, ভাঙা, কর্কশ হয়ে উঠল। লোকটাকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। ধূর্ত, শয়তান এবং

অতি-অমায়িক। লালবাগান জিম-এরই বক্সার ছিল। গোম্‌স যখন ইস্টার্ন রেলওয়ের কোচ ছিলেন তখন সেখানে ওকে চাকরি করে দেন। কান্তি এখন আর রিংয়ে নামে না।

শিবা মাথা নেড়ে বলল, "কান্তিদাকে নয়, আমার চাই গোম্‌সসারকে। ওঁকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?"

"বলতে পারব না, তবে পাড়ার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো হদিস মিলতে পারে।"

শিবা ঠিক করল হদিসই করবে। পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর পাশের রাস্তায় গোম্‌স থাকতেন। পরদিন বিকেলে সে হাজির হল সেখানে। কাঠের পাল্লার ফটক দিয়ে ঢুকে দশ মিটার জমি পেরিয়ে চারধাপ সিঁড়ি। ঢাকা বারান্দা। এখানেই চেয়ার-টেবল নিয়ে বৈঠকখানা, পেছনে দুটো ঘর। এখন আর তা নেই। বারান্দার আধখানা কাঠের পার্টিশান দিয়ে জেরক্স মেশিন বসিয়ে ব্যবসা চলছে।

সেখানে মালিকের মতো হাবভাব দেখে লোকটিকে সে জিজ্ঞেস করল, "এখানে ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌স নামে একজন থাকতেন, তিনি কোথায় গেছেন, বলতে পারেন কি?"

লোকটি জানাল সে মাত্র সাতমাস এখানে ভাড়া নিয়ে এসেছে। ভেতরের ঘরে কীসের একটা অফিস। শিবা উঁকি দিয়ে জনাচারেক লোককে দেখল। নিশ্চয় এখানে বাস করে না, সুতরাং কিছুই বলতে পারবে না গোম্‌স সম্পর্কে। তবু একবার বলে দেখাই যাক না ভেবে সে একজনকে জিজ্ঞেস করল। তিনজন মাথা নাড়ল, শুধু চতুর্থজন পরামর্শ দিল—"গেটের সামনে পানের দোকানটায় জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।"

পানওয়ালা গোমসকে চেনে, কিন্তু কোথায় যে গেছে সেটা আর জানে না। "কিছুই বলে যায়নি। রাতারাতি হাওয়া হয়ে গেল। তবে শুনেছি এধার-ওধারেই কোথাও আছে।"

ওদের কথা দাঁড়িয়ে শুনছিল মাঝবয়সি একজন। সে বলল,"হপ্তাতিনেক আগে ট্রাম থেকে ওকে এলিয়ট রোডে দেখেছি। একটা বড় হোটেল আছে, তার সামনের গলিতে ঢুকল।"

এলিয়ট রোডে কীভাবে যাবে জেনে নিয়ে শিবা বাসে উঠল এবং কন্ডাক্টরের হাঁক শুনে ঠিক জায়গাতেই নামল। বড় হোটেল ওই একটিই, অতএব সেটিকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। তার উলটোদিকের গলিটি এঁকেবেঁকে কত দূর ঢুকে গেছে কে জানে! দু'ধারে ঘিঞ্জি পুরনো বাড়ি, রাস্তায় প্রচুর আবর্জনা আর দোকান। এখানকার লোকেদের পোশাকআশাক দেখেই বোঝা যায় অঞ্চলটায় অভাবী মানুষই বেশি।

কাকে সে জিজ্ঞেস করবে ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌স নামে কাঁচাপাকা চুল, কুচকুচে কালো, ছিপছিপে গড়নের, বাংলা-হিন্দি বলা এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেবকে কোথায় পাব?

সে একের পর এক দোকানদারদের জিজ্ঞেস করে করে এগোতে থাকল। শোনামাত্রই তারা মাথা নেড়ে দিল, কেউ কেউ কয়েক সেকেন্ড ভাবার চেষ্টাও করল।

সন্ধ্যা নামছে। রাস্তার আলো, দোকানের আলো জ্বলল। কিন্তু গোম্‌সের পাত্তা সে পাচ্ছে না। যত সে গলির মধ্যে ঢুকছে, বাড়ির চেহারাগুলো বদলে যাচ্ছে। টালির বা টিনের চালের কাঠের দোতলা বাড়ি, তবে একতলা বাড়ির সংখ্যাই বেশি। রাস্তার জলের কলে ভিড়। শিবা ঠিক করল আর সে এগোবে না।

ফিরে আসার জন্য ঘুরে হাঁটতে শুরু করেই ভাবল, শেষবার সে একজন কাউকে এবার জিজ্ঞেস করবে। বাড়ির দরজার পাশে রকে এক বৃদ্ধ চিনা, কোলে বাচ্চা নিয়ে বসে। একেই বলা যাক, ঠিক করে শিবা এগিয়ে গেল।

শিবার কথাগুলো মন দিয়ে শুনে সেই চিনা আঙুল দিয়ে সামনের বাড়িটা দেখিয়ে বলল, "ওহি কোঠিমে দেখো তো। ডাহিনা পহেলা কামরামে এক আদমি আয়া। তুম য্যায়সা বোলতা, ওহি মাফিকই হ্যায়। উয়ো লোক তো আভি বাহার গিয়া, থোড়া ওয়েট করো। আ যায়গা।"

শিবা কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে পায়চারি শুরু করল। গোমসসার এইরকম একটা নোংরা বস্তিতে আছেন, এটা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সে মনে মনে বলল, যে লোকটার জন্য অপেক্ষা করছে সে যেই হোক গোম্‌স সার যেন না হয়! ফিটফাট শৌখিন মানুষ এই দুর্গন্ধভরা পরিবেশে!

"এই ছোকরা।" বৃদ্ধ শিবাকে ডেকে আঙুল দিয়ে দেখাল। "তুমারা আদমি আতা হ্যায়।"

শিবা তাকিয়ে রইল। চেক লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা, হাতে একটা কাগজের মোড়ক নিয়ে যে-লোকটা এগিয়ে আসছে সেই কি ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌স?

"গোম্‌সসার।"

গোম্‌স থমকে ঘুরে দাঁড়ালেন। "হু?"

"আমি শিবা।"

এবার গোম্‌সের চমকে ওঠার পালা।

"শিবা! আই মিন শিবাজি আইচ?"

"হ্যাঁ সার।"

"তুমি তো মরে গেছ শুনেছি!"

"না সার, তবে প্রায় মরে গেছলুম।"

গোম্‌স হঠাৎ দু'হাতে শিবাকে জড়িয়ে ধরল। শিবা ওর মুখ থেকে যে-গন্ধটা পেল, জুট মিলের বহু মজুরের মুখে সে এই গন্ধ পেয়েছে।

"কাম, কাম টু মাই রুম। আমি একাই থাকি।"

ঘরটায় একটা চৌপায়া, চামড়ার একটা জীর্ণ সুটকেস, প্লাস্টিকের জল-রাখার জার। দুটো কাচের গ্লাস আর হ্যাঙারে প্যান্ট আর বুশ শার্ট। তার পাশে দেয়ালে আঁটা বিঘতখানেক লম্বা মাটির একটা মূর্তি—ক্রুসবিদ্ধ যিশু। বিছানা বলতে সুজনি আর ওয়াড়বিহীন চিটচিটে বালিশ। বালব থেকে নির্গত জন্ডিস রুগির মতো পাণ্ডুর আলোয় ঘরটাকে শ্রান্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছে।

"সিট ডাউন।"

শিবা চৌপায়ায় বসল। তারপরই দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিত স্বরে বলল, "সার, এ কী দশা হয়েছে আপনার! কী করে হল? কেন হল? আপনি যে এখানে নেমে আসবেন, এ তো কল্পনাও করা যায় না। আপনাকে যেভাবে দেখেছি, তার সঙ্গে আজকের এই দেখা...।" তার চোখে জল এসে গেল।

"সিট ডাউন, সিট ডাউন...আপসেট হয়ে গেছ তুমি। আমার কথা শুনে তোমার কোনও লাভ হবে না, আই অ্যাম ফিনিশ্‌ড। আমার জীবনে আর কিছু করার নেই, শুধু এই বডিটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া। ওয়েলেসলিতে একটা পুরনো ফার্নিচারের দোকানে কাজ করি, ছ'শো টাকা দেয়। এই ঘরটার ভাড়া দেড়শো। বাকি টাকায় এর থেকে স্টাইলে কি থাকা যায়?"

হাতের মোড়কটা খুলে গোম্‌স শিবার সামনে ধরল। রুটি, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা আর শুকনো কয়েক টুকরো ভাজা মাংস। "টেক।"

"না।"

"বিফ, তাই খাবে না?"

"তা নয়। খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না।"

"কেন?"

"আপনি আমার সঙ্গে প্রথম যেদিন কথা বলেছিলেন, সেসব কথা কি আপনার মনে আছে?"

"প্রথম কবে বলেছি? আই কান্ট রিমেমবার।"

"দুর্লভ চক্রবর্তীর গ্যারাজ থেকে একটু দূরে একটা কোচিং, সেখান দিয়ে যেতে যেতে আপনি কিছু একটা দেখেছিলেন।"

"ওহ্‌হ্‌, ইয়েস, ইয়েস, ফ্যান্টাস্টিক! তুমি একটা মাসকিউলার গুণ্ডার জ-এ লেফট হুক ল্যান্ড করালে, তখন আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেটা দেখতে পেয়ে থেমে গেলাম। আই ওয়াজ স্টান্ড। তোমার কাছে গিয়ে বললাম—ইউ হ্যাভ আ বিউটিফুল লেফট হুক, টেরিব্‌ল, আ ডেডলি জেম অব আ পাঞ্চ, কতদিন ট্রেনিং করছ? যখন বললে জীবনে তুমি বক্সিং করোনি, নেভার ফট ইন দ্য রিং, তখন বললাম লালবাগানে এসো, আমি তোমাকে শেখাব, ট্রেনিং করাব।...ইয়েস শিবা, ডিভিডলি আমার মনে পড়ছে তোমার সেই মুখ, ফ্ল্যাবারগাস্টেড অ্যান্ড ইনোসেন্ট ফেস। আই লাইকড দ্যাট ফেস। বললে, তোমার বয়স ওনলি সেভেনটিন। শুনে আমি কী বলেছিলাম, মনে আছে?"

গোমসের কথাগুলো জড়িয়ে আসছে। রুটি ছিঁড়ে মুখে তুলতে গিয়ে সে থমকে বলল, "খাবে না?"

"না।"

"ওয়েল।" মাংসের টুকরো মুখে ঢুকিয়ে গোম্‌স শিবার দিকে তাকাল। "কী বলেছিলাম সেদিন?"

হঠাৎ গলা চড়ে গেল গোমসের। "হোয়াট আই সেইড অন্য দ্যাট ডে? আই সেইড—তুমি বড় আছ, স্ট্রং আছ, ফাস্ট আছ, কারেজিয়াস আছ। ভাল ফাইটার

হবে।" গোমসের বসে যাওয়া দুটো গালের চামড়া টানটান হয়ে উঠেছে। কোটরের মধ্যে চোখের মণি দুটো জ্বলছে।

"তুমি কি ফাইটার হয়েছ?"

শিবার মাথা ঝুঁকে পড়ল।

"তুমি লালবাগান জিম-এ প্রথমে আসোনি। আমিই গিয়ে চা-এর দোকান থেকে তোমাকে ধরে দুর্লভের গ্যারাজে নিয়ে যাই। ওকে বলেছিলাম, দিস বয় উড বি আ ব্রিলিয়ান্ট ফাইটার। যদি আমার কাছ থেকে ফারদার কাজ চাও তা হলে একে চায়ের দোকান থেকে সরিয়ে এনে তোমার কাছে রাখো। বলেছিলাম, দারুণ জিনিস আছে এই ছেলেটার মধ্যে। দুর্লভ আমার রিকোয়েস্ট রেখেছিল, তোমাকে কাম দিয়েছিল। ঠিক কি না? বাট ইউ লেট মি ডাউন। রোজারিওর কাছে ফাইনালে হেরেছিলে, একটা ওল্ড ফাইটার...হোয়াট আ শ্যেম!"

শিবার মাথা আর-একটু ঝুঁকল।

"তুমি এখানে এসেছ কেন, হোয়াট ফর?" আচমকা গোম্‌স বিরক্ত গলায় প্রশ্নটা করল। "আই অ্যাম গ্র্যাজুয়ালি ফেডিং আউট ফ্রম লাইফ, এক দিন এই ঘরেই লাশ পড়ে থাকবে। আমি চাই না চেনা কেউ এখানে এসে আমার খোঁজ করুক। ইউ মে গো নাউ।"

"সার, আমি আবার রিংয়ে নামতে চাই।"

"হোয়াট! সে ইট এগেইন!" গোম্‌স প্রায় চিৎকার করে উঠল।

"আমি আবার শুরু করতে চাই, ফিরে আসতে চাই। আপনি আমাকে ফিরিয়ে আনুন।" শিবা অবলম্বন খোঁজার মতো করে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। গোম্‌স তা দেখেও দেখল না।

"কাম ব্যাক? তুমি কাম ব্যাক করতে চাও? টেক সামওয়ান এলস অ্যাজ ইওর ট্রেনার। নট মি।...ইউ মে গো নাউ।"

"সার, এবার আমি কোনও ভুল করব না, চ্যাম্পিয়ান হবই।"

"ভেরি গুড, নাউ গেট আউট।" গোম্‌সের তর্জনী দরজা দেখাল।

এরপর আর থাকা যায় না। শিবা উঠে দাঁড়িয়ে মন্থর ভাবে দরজায় পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল।

"সার, এই ঘরেই মরে পড়ে থাকবেন?"

গোম্‌স রুটি চিবোতে ব্যস্ত, জবাব দিল না।

"আমাকে আপনি ভেসে উঠতে সাহায্য করবেন না?"

ভ্রূ তুলে গোম্‌স একবার তাকাল।

"আপনি হেরে গিয়ে ডুবে মরতে চাইছেন।"

গোম্‌স রুটি চিবোনো বন্ধ করল।

"দ্যাটস মাই বিজনেস।"

"সার, একটা ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানও আপনি তৈরি করতে পারেননি। সবাই বলে ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌স একটা জালি ট্রেনার। বক্সিং-এর কিছু জানে না, শুধু বড় বড় কথাই

বলে।"

"আই নো দ্যাট, আমিও শুনেছি।"

"একবার শেষ চেষ্টা করুন না সার...সবার মুখ বন্ধ করে দিয়ে তারপর যেখানে ইচ্ছে মরে পড়ে থাকুন। একটা নকআউট পাঞ্চ শেষবারের মতো দিয়ে যান।" শিবা দরজা থেকে ফিরে এসে গোম্‌সের সামনে উবু হয়ে দুই মুঠি তুলে ধরল। "এই দুটো আপনাকে ভাসিয়ে তুলবে সার...আপনি আমাকে শুধু তৈরি করে দিন।"

নীরবতা নেমে এল ঘরে। কেউ আর কথা বলছে না। গোমসের রুক্ষ কর্কশ মুখভাব ধীরে ধীরে মোলায়েম হয়ে আসছে। সে মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে, অন্যমনস্কভাবে। মৃদু স্বরে বলল, "ইউ আর টেমটিং-মি। কিন্তু শিবা, লাইফে আমি একটা টোটাল ফেইলিওর...আমার সাক্‌সেস দেখে খুশি হবে এমন কেউ আর আমার নেই।"

"কেন, আমি আছি, ননী আছে, আশ্চয্যদা আছে, সাগরমামমি, পূর্বপল্লির মানুষরা আছে।...আরও কত, কত লোক যে খুশি হবে! বেঙ্গল থেকে বক্সিং-এ একটা ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান কত বছর যে বেরোয়নি!"

শিবার উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গোম্‌স। ঠোঁট দুটো কাঁপল। নাকের নীচে রুটির গুঁড়ো লেগে, আঙুল দিয়ে মুছল। চোখ তুলে পেরেক দিয়ে ক্রুসে বেঁধানো যিশুর দিকে তাকাল। তার মুখের ওপর দিয়ে করুণাঘন যন্ত্রণার ছায়া ভেসে গেল।

"তুমি বাইবেল পড়োনি, তাতে রেজারেকশন বলে একটা ব্যাপার আছে। ক্রাইস্টকে কবর দেওয়ার পর তিনি উঠে এসেছিলেন। এর পর একটা ডিপার মিনিং আছে। জীবন মরে পড়ে থাকে না, সে উঠে আসে।...শিবা, আমি জিম-এ যাব।"

তাঁর দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা শিবার মাথায় গোম্‌সের হাত নেমে এল।

॥ ৯ ॥

গোম্‌স একদা বলেছিল বটে, 'এই ছেলেটার মধ্যে দারুণ জিনিস আছে', কিন্তু শুধু 'জিনিস' দিয়েই তো খেলোয়াড় তৈরি করা যায় না! 'জিনিস'টাকে মারাত্মক করে তোলার জন্য সেটাকে নিয়ে কাজ করতে হয়। কাজ মানে পরিশ্রম। সেটাকেই ধ্যানজ্ঞান করে তোলা, অর্থাৎ তাতে সময় দেওয়া। এই সময় দেওয়াটাই শিবার কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল।

সকালে ননী রিকশায় ডেকচি ও শিবাকে পৌঁছে দিত, যেহেতু শিবার পায়ের চোটটা বিশ্বাসযোগ্য করে নিতুর কাছে দাখিল করতে হত। দু'সপ্তাহ পর ননী ঘোষণা করে, "ডাক্তারবাবু পরীক্ষা কইরা কইয়া দিছেন শিবা ফিট, অহন হাঁটতে চলতে পারব আগের মতন।"

এবার বিপদে পড়ল শিবা। ফিট হয়ে যাওয়া মানে দু'বেলাই দাদার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, সাহায্য করা। তা হলে লালবাগানে সে যাবে কখন? সে সমস্যা সমাধানের

জন্য সাহায্য চাইল ননীর।

"আর আমি মিথ্যা কইতে পারুম না।" ননী ঝাঁঝিয়ে উঠল। "তুই অন্য লোক দ্যাখ এবার। তোর জইন্য এত মিথ্যা কথা কইচি যে, তিন-চারডা নরক লাগব আমারে শাস্তি দিতে...তুই কালা সাহেবরে দিয়া কওয়া না, মনে তো হয় নিতুদারে বোঝাইতে পাইরব।"

গোম্‌সকে ননী 'কালাসাহেব' বলে, অবশ্য সামনাসামনি নয়। শিবা বিব্রত মুখে বলল, "সারের অবস্থা তো বলেছি তোকে। বিনি পয়সায় ওঁর কাছ থেকে ট্রেনিং নিতে আমার লজ্জা করে, নিজেকে বড় সুবিধাবাদী মনে হয়।"

"মনে হওয়া তো উচিতই। আমি যে কষ্ট কইর‍্যা রিশকা চালানো শিকচি, সে কি লোককে মাগনায় রিশকায় চড়াইয়া ঘুরামু বইল্যা?"

"সারের জন্য কিছু একটা করা দরকার। অন্তত ভাল একটা জায়গায় রাখা, ভাল একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করা...টাকা-পয়সার থেকেও এটা জরুরি।"

"তারও আগে তর নিজের কথাটা তুই ভাইব্যা দ্যাখ। নিতুদারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া আলুর দমের হাত হইতে নিজেরে কীভাবে রক্ষা কইরবি, আগে সেইডা ঠিক কর। একসময় আমিই তোরে কইছিলাম, তুই যখন প্র্যাকটিশ করবি তোর লইয়া নিতুদার লগে আমি কাম করুম। একবার তো কইতে গেলামও, দ্যাখলাম নিতুদা ব্যাপারডা অ্যাকদমই পসন্দ করতাচে না। রিশকা ফ্যালাইয়া চা-রুটি-আলুর দম পরের হইয়্যা বেচুম ক্যান? এ-কথার তো জবাব দিতে পাইরল্যাম না। কালা সাহেবরে দিয়া না হইলে অন্য কাউরে দিয়া কওয়া না, তুই নিজেই ক না!"

"ওরে বাবা! আমার দ্বারা বলাটলা হবে না। আমি তো জানি, কী কষ্ট করে দিনরাত খেটে, একাই দোকানটা দাঁড় করিয়েছে। দোকানে যাব না, এটা বলার মতো পাপ আর হয় না! আরও দুটো খাবার দোকান রয়েছে তাদের সঙ্গে কম্পিট করে বিক্রি বাড়ছে, এইসময় দাদার আরও বেশি করে হেল্পার দরকার। এখন যদি বক্সিংয়ের জন্য—।"

শিবা চমকে উঠল ননীর মুখের দিকে তাকিয়ে। মেদ মাংসহীন শীর্ণ মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে। ওর চোখ থেকে একটা হলকা বেরিয়ে এল। শিবার বুকের মধ্যে পর পর কে যেন ঘুসি মেরে যাচ্ছে। ঢপ, ঢপ, ঢপ শব্দগুলো কলজের না ঘুসির, সে বুঝতে পারছে না। ননীর মুখে কী একটা কথা যেন ফুটে উঠেছে!

কী কথা! শিবার মনে হল ননী যেন মনে মনে বলছে, এই বক্সিংয়ের জন্যই তুই একদিন দাদাকে, মাকে, আমাকে পূর্বপল্লির সব মানুষকে ত্যাগ করে চলে গেছলি গোরাবাবুর কাছে। সেখানে পেট ভরে ভাল খাওয়া, ভাল জামা-জুতো, ভাল বিছানা, এইসবের লোভে তুই সোনার বকলস পরে কুকুর হয়ে গেছিলিস। গোরাবাবুর কারখানার নিতুদারা ধর্মঘট করেছিল। সেই ধর্মঘট গোরাবাবু সাধুর দলবলকে দিয়ে পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তুই কিনা সেই লোকটারই আশ্রয়ে গিয়েছিলি! বক্সিংয়ের নাম করেই তুই বেইমানি করেছিলি আমাদের সঙ্গে।

"অহন বক্সিংয়ের জইন্য,—এই বইল্যা চুপ কইরা গেলি ক্যান? ক, কী কইতে

চাস, ক?"

"ননী তুই...তোরা এখনও কি সেসব কথা মনে রেখেছিস?"

"অহন আমি রিশকা লইয়া বাইরমু, আজেবাজে কথা শোনার মতো সময় নাই। তুই কালাসাহেবরে দিয়াই নিতুদারে কওয়া।" ননী একটু বেশিই ব্যস্ততা দেখিয়ে চলে গেল।

শিবা বুঝল, হঠাৎ পুরনো ব্যাপারটা উঠে আসায় ননী অস্বস্তিতে প্রায় পালিয়েই গেল।

কিন্তু সে পালাতে পারছে না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনালে শিবা উঠেছিল পর পর দুটো লড়াইয়ে নক আউট করে। প্রথমটায় এক মিনিট, পরেরটায় কুড়ি সেকেন্ড সময় তার লেগেছিল। বক্সিং মহলে সাড়া পড়ে গেছল। সেবার শিবা ছাড়া আর কেউ নক আউটে একটা লড়াইও জিততে পারেনি। বলাবলির বিষয় হয়ে উঠেছিল তার ক্ষিপ্রতা আর ঘুসির জোর।

ফাইনাল রিংয়ে উঠে লড়াইয়ের আগে নিজের কর্নারে দাঁড়িয়ে শিবা দর্শকদের দিকে চোখ বোলাতে বোলাতে দেখেছিল সাধুকে। অবাক হয়ে গেছল। টকটকে ফরসা গায়ের রং, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা চোখে দেওয়া, মাথার চুল পাতলা একটি লোকের পেছনে বসে সাধু, সামনে ঝুঁকে লোকটিকে কিছু বলছে আর তার দিকে তাকাচ্ছে। ঠোঁটে হাসি খেলছে।

প্রথম রাউন্ডেই সুনীল বেরাকে নক আউট করে শিবা বাংলার লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হয়। রিং থেকে নেমে আসতেই বুকে জড়িয়ে ধরে আশ্চর্য ঘটক বলেছিলেন, "এভাবে প্রত্যেকটা খেলায় নক আউট, আমি কখনও দেখিনি রে। লালবাগানের ইজ্জত বাড়িয়ে দিলি।" ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌স বলেছিল, "ঘোটক, তোমাকে যা বলেছিলাম এবার তা মিলিয়ে নাও। ঝুটা কি সাচ্চা, আমি ঠিক চিনতে পারি।" তারপর শিবাকে বলেছিল, "আই অ্যাম রিয়্যালি প্রাউড টুডে। এবার হার্ড ট্রেনিং ন্যাশনাল্‌সের জন্য।"

এরই মিনিট পাঁচেক পর এক অচেনা শীর্ণকায় প্রৌঢ় তার কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, "তোমার সঙ্গে গোরাবাবু একটু কথা বলতে চান, একবার বাইরে আসবে?"

"কে গোরাবাবু?" শিবা জিজ্ঞেস করে।

"গোরাচাঁদ সেন। খেলাধুলোর একজন বড় পেট্রন, অনেক ক্লাবকে টাকা দেন। খুব বড় ব্যবসায়ী, কারখানা আছে তিনটে। তোমার লড়াই ওঁর খুব ভাল লেগেছে তাই কথা বলতে চান।"

গোরাবাবুর সঙ্গে শিবার সেই প্রথম সাক্ষাৎ। তাকে একশো টাকার নোট দিয়ে গোরাবাবু বলেছিল, "পুরস্কার।" তারপর "কাজ করবে? তোমার বক্সিংয়ের ক্ষতি হতে পারে এমনও কোনও কাজ নয়। সামান্যই। আমার বাড়িতে থাকবে, খাবে,

মাইনেও দেব। এবার তোমার ভাল খাওয়াদাওয়া দরকার, মোটর গ্যারাজে পড়ে থেকে কি ওপরে উঠতে পারবে? এসো আমার বাড়িতে।" গোরাবাবু নাম ঠিকানা লেখা কার্ড দিয়েছিল শিবাকে।

শিবার মনে হয়েছিল জীবনটাকে বদলে নেওয়ার একটা সুযোগ তার কাছে এসেছে। এটাকে সে ছাড়বে না। তখন নিতুদের কারখানায় ধর্মঘটের এগারো দিন চলছে। সেই ধর্মঘট ভাঙতে সাধু আর তার দলের ছেলেরা এসেছিল । শিবা খালি হাতেই লোহার চেন আর ছুরির সামনে দাঁড়িয়ে গুণ্ডাদের পালটা মার দেয়।

ঠিক তখনই সেই লোকটার আবির্ভাব হল, যে তাকে বলেছিল, গোরাবাবু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। ধর্মঘটীদের মধ্যে ছিল শক্তি দাস। সে ফিসফিস করে একজনকে তখন বলে, "এটা তো মালিকের সুকতলা প্রিয় হালদার, এখানে যে!"

প্রিয় হালদার ক্ষুব্ধ স্বরে তখন বলেছিল, "তুমি এখানে কী করছ শিবাজি! বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান কিনা মাস্তানি করছে? সকালে এদিকেই আমরা এসেছিলুম, খবর পেলুম তোমায় নাকি গুণ্ডারা ঘিরে ধরে মারছে! শুনেই তো গোরাবাবু ছুটে এসেছেন, গাড়িতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। চলো, চলো...এ কী তোমার হাতে কনুইয়ে কাটাছেঁড়া কেন? ভেঙেটেঙে গেলে চিরকালের মতো বক্সিংই যে শেষ হয়ে যাবে।"

এই বলে প্রিয় হালদার তাকে টেনে নিয়ে যায়। তখন হাত তুলে শিবা নিতু আর শক্তি দাসকে জানিয়েছিল, সে এখনই আসছে। ওরা বিভ্রান্ত মুখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুখটা কঠিন করে ফেলে।

কিন্তু শিবা আর আসেনি।

এখনও শিবা সেই স্মৃতি থেকে পালাতে পারছে না। সেদিন গোরাবাবুর মোটরে প্রিয় হালদার তুলে নিয়ে যাওয়ার পরই সাধুর দল ফিরে এসে মিনিট তিনেকের মধ্যেই ধর্মঘটীদের মেরে হটিয়ে দেয়, নিতু ও শক্তি দাসকে হাসপাতালে যেতে হয়। এসব কথা কয়েকদিন পর গ্যারাজে ফিরে এসে শিবা জানতে পেরেছিল। দুর্লভ চক্রবর্তী বলেছিল, "নিজের দাদাকে গুণ্ডাদের হাতে ফেলে দিয়ে পালাবি, এটা আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। ধর্মঘট ভেঙে গেছে, ওদের আর চাকরি হয়নি। এইসব জামা জুতো পরার লোভেই পালালি?"

"আমি পালিয়েছি?" শিবা চিৎকার করে ছুটে গেছল বাড়িতে। প্লাস্টারে হাত বুক মোড়া নিতু তাকে দেখে বলেছিল "আয়, বোস।" শিবা বলেছিল, "জানতুম না গোরাবাবুই তোমাদের কারখানার মালিক, বিশ্বাস করো দাদা।" নিতু ঘাড়টা নাড়তে গিয়ে যন্ত্রণায় কাতরে উঠে বলেছিল, "আমি কিছু মনে করিনি।"

সেই সময়ই মা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, "বেরো, বেরো, বেইমান।" একটা অন্ধ রাগ হঠাৎই শিবাকে তখন আচ্ছন্ন করে দেয়। সেও পালটা চেঁচিয়ে ওঠে, "কীসের বেইমানি? গুণ্ডা ঠেকাবার দায় আমার হতে যাবে কেন? আমি কি ধর্মঘট করতে বলেছি?...আমারও জীবন আছে, সেটা তো কেউ দেখতে আসবে না? নিজেকে নিজেই দেখতে হবে।...সবাই বড় হতে চায়, সেজন্য যে পথই খোলা পাব

সেই পথে আমি যাব।"

এর পর সে দরজার পাল্লায় একটা ঘুসি বসায়। তাতে পাল্লাটা ফেটে গেছল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হনহনিয়ে যখন সে বটকেষ্টর দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন শচীনকাকু ডেকে একটা মোড়ক তার হাতে দিয়ে বলে, "ননী তোর জন্য রেখে গেছে।"

শিবা সেটা খুলতেই বেরোয় বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হওয়ার মেডেল, সার্টিফিকেট আর বেস্ট বক্সার হওয়ার ট্রফি। এক টুকরো কাগজও ছিল। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা, "শাবাশ ফাইটার। এবার পাবি সোনার বকলস।"

কাগজটা মুঠোয় চটকে শিবা নিজেকে বলেছিল, হ্যাঁ, সোনার বকলসই পরব।

কিন্তু এর পরও দাদা, ননী, শক্তিমামা, সাগরমামি, আশ্চর্যদা,...সবাই তাকে আপন করে কাছে টেনে নিয়েছে। ওরা হয়তো ভুলে যাওয়ার ভান করছে, কিন্তু সে তো ভুলতে পারছে না। দাদাকে দোকানে একা ফেলে রেখে বক্সিংয়ে আবার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছার কথা সে বলবে কোন মুখে! তার প্রধান সহায় ননী। কিন্তু সে স্পষ্টই জানিয়ে দিল, অন্য কাউকে দিয়ে বলাও।

গোম্‌সসারকে বললেই রাজি হয়ে যাবেন, কিন্তু দাদা কি ওঁর কথা শুনবে? তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যাক, এই ভেবে শিবা লালবাগান জিম-এ যাওয়ার জন্য যখন বাসস্টপে দাঁড়িয়ে, একটা স্কুটার তখন তাকে দেখেই থেমে পড়ল।

হাত নেড়ে সাধু তাকে ডাকছে। ভ্রূ কুঁচকে শিবা স্কুটারের দিকে এগিয়ে গেল।

"আবার বক্সিং শুরু করেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"হলধর বর্ধন টুর্নামেন্টে নামছিস?"

"কে বলল?"

"আমি সব খবরই রাখি। গোম্‌স তোকে ট্রেনিং করাচ্ছে, কর, ভাল করে কর। কোনও সরঞ্জামের, কি জিনিসপত্রের যদি দরকার হয় আমাকে বলিস...না, না, আগে যা হয়ে গেছে তা হয়েই গেছে, সেসব কথা আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। গোরাবাবুর সঙ্গেও আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই। ঠিক করেছি, আমি নিজেই এবার বেটিং অর্গানাইজ করব।" সাধু হেলমেটটা মাথা থেকে নামিয়ে পেটের পর চেপে ধরে রয়েছে। এবার সেটায় হাত বোলাতে লাগল।

"কী অর্গানাইজ করবে?" শিবা ভ্রূ কুঁচকে সন্দিগ্ধ গলায় বলল।

"গোরাবাবু যা করত, সেটাই। বেটিং করে লোকটা কয়েক লাখ কামিয়েছে। কিন্তু তোর ওপর বাজি ধরে যে চোটটা পেল...যাকগে ওসব কথা—।"

"যাকগে কেন?" দাঁত চেপে বলার সঙ্গে সঙ্গে শিবা হাত মুঠো করল।

"ন্যাশনালের ফাইনালে রোজারিওর মতো বুড়োর হাতে মার খেলাম, তারপর ইনভিটেশন টুর্নামেন্টেও ওর হাতে ফার্স্ট রাউন্ডেই নক আউট হলাম। কেন? লড়াইয়ের আগে ড্রেসিংরুমে কান্তিদা কমলালেবু এনে বলল, গোম্‌স পাঠিয়ে দিয়েছে। গোম্‌সের নাম শুনে চোখ বুজে সেই কমলা আমি খেলাম, আর তারপরই

সব ঝাপসা দেখতে লাগলাম, শরীর ঝিমিয়ে পড়ল। কান্তিদাকে বিষাক্ত কমলা দিয়ে কে পাঠিয়েছিল?"

"টাকা কামাবার জন্য রোজারিওর ওপর বেট করে, কিন্তু কাজটা আমি করিনি। হ্যাঁ, তুই ঠিকই ধরেছিস, ইঞ্জেকশন করে ওষুধ ঢোকানো কমলা কান্তির হাত দিয়ে আমিই পাঠিয়েছিলাম।" স্বচ্ছ চোখে, সরল ভঙ্গিতে সাধু খুবই সাদামাঠা গলায় তার দুষ্কর্মের কথাটা জানাল। "আমি শুধু শোধ নিতে চেয়েছিলাম।" সাধুর বাঁ হাতটা তার বাঁ চোয়ালের কাছাকাছি উঠে এসেই নেমে গেল। এক চিলতে হাসি শুধু তার ঠোঁটে লেগে রইল।

"তা এখন হঠাৎ কী মনে করে? জিনিসপত্তর দেব, ভাল করে ট্রেনিং কর...ব্যাপারটা কী?"

"এবারের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ানশিপে তুই হবি আমার বাজির ঘোড়া। তোকে জিততে হবে, চ্যাম্পিয়ান হতে হবে।"

"অদ্ভুত তো! গোরাবাবুর হুকুমে সেদিন রিং থেকে কতকগুলো লোক সোজা আমাকে তুলে ওর বাড়িতে নিয়ে গেছল। আমার শরীরে তখন একফোঁটা শক্তিও ছিল না। সেখানে একটা ঘরে দুটো লোক দু'দিক থেকে আমায় চেপে ধরেছিল, আর একজন আমায় হেভিব্যাগ বানিয়ে পাঞ্চ করে গেছল। পাঞ্চিং শুরু করার আগে সে বলেছিল, 'চোয়ালের কথা আমার মনে আছে। আমার গায়ে হাত তোলার সাহস আজ পর্যন্ত কেউ দেখায়নি। তুই এখনও যে বেঁচে আছিস এটাই আশ্চয্যের।'...সেই লোকটার বাজির ঘোড়া এখন আমি! আমি তা হলে এখনও বেঁচে আছি! মার খেতে খেতে সেদিন অজ্ঞান হয়ে গেছলাম। ভোরবেলায় বি. টি. রোডের ধারে একটা নালায় আমাকে পড়ে থাকতে দেখে রিকশাওয়ালা তুলে নিয়ে হাসপাতালে দিয়ে আসে। বিছানায় উঠে বসতে চার মাস লেগেছিল আর এই আঙুলটা সিধে হল না।" শিবা বাঁ হাতের তর্জনীটা সাধুর চোখের সামনে তুলে ধরল।

সাধুর ঠোঁট থেকে হাসিটা কিন্তু মুছল না। বাঁকা তর্জনীটা আলতো করে দু'আঙুলে ধরে বলল, "অপারেশন করে ঠিক করে নে, আমি খরচ দেব।...তোর মাথা গরম হয়ে উঠছে, এখন তোর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। পরে বলব'খন।" সাধু হেলমেটটা পরে স্কুটারে স্টার্ট দেওয়ার জন্য কিকার-এ লাথি দিল। ক্লাচ দিয়ে স্কুটারটাকে সাত-আট মিটার চালিয়েই থামিয়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে সাধু বলল, "জোনাকির ঘটনাটা শোনামাত্রই বুঝে গেছলাম কাজটা কার। পাঁচটা রডের সঙ্গে খালি হাতে একজনই লড়তে পারে। ওরা কিন্তু আমার ছেলে নয়। আর-একটা জিনিসও বুঝে গেছি, আগের শিবা আবার ফিরে এসেছে।...চলি, আবার পরে কথা হবে।"

সাধুর বিলীয়মান পিঠ থেকে চোখ সরিয়ে শিবা দেখল বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে। তাদের চোখে চাপা সমীহ আর ভয়।

॥ ১০ ॥

ট্র্যাফিক জ্যামের জন্য চিড়িয়ার মোড় পার হয়েই বাসটা দাঁড়িয়ে গেল। টালা ব্রিজের ওপরও যানবাহন জমে রয়েছে, হয়তো শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পর্যন্তও এই অবস্থা। এই জট কখন ছাড়বে, সেজন্য বসে থেকে সময় নষ্ট না করে শিবা বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল।

কিছুটা এগোতেই তার চোখে পড়ল উৎপল চট্টরাজকে, দুটো বাসের মাঝে এক হাত ফাঁক দিয়ে গলে রাস্তার ওপারে যাওয়ার জন্য দোনামনা করছে।

"উৎপলবাবু, উৎপলবাবু।" শিবা হাত তুলে চিৎকার করল। উৎপল মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

শিবা ছুটে এসে বলল, "এভাবে কখনও পার হবেন না।"

"বড্ড তাড়া রয়েছে...তোমার খবর কী? তারপর তো আর দেখা হল না।" উৎপলকে কিছুটা অপ্রতিভ দেখাল।

"খবর তো আপনিই দেবেন। জোনাকির গোলমাল কি মিটেছে? দিদি, টুটু এরা কোথায়?"

"ধর্মঘটের ব্যাপারটা তার পরের দিনই, আমাকে আর জব্দ করতে না পেরে ওরা তুলে নেয়। ভাল কথা, সেদিন ওদের চারজনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়, দু'জন অ্যাডমিটেড হয়েছিল। ওরা রটায় আমি নাকি সাত-আটজন গুণ্ডা এনে ওদের পিটিয়েছি।" উৎপল হো হো করে হেসে উঠল। শিবা হাসল না।

"তা হলে আর গোলমাল নেই?"

"গোলমালের থেকেও বেশি, এখন সমস্যার পাহাড় জমে গেছে। রাস্তায় এভাবে দাঁড়িয়ে অত কথা তো বলা যায় না, সংক্ষেপে বললে, আসল যে ইউনিয়ন, তারা এখন ঠিক করেছে সমবায় ভিত্তিতে কারখানা তারাই চালাবে, এই নিয়ে এখন কথাবার্তা চলছে। মালিক গোরাচাঁদ সেন লেবারদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, ই এস আই-এর টাকা গায়েব করেছে, নানান দেনা চারধারে, টেলিফোনের টাকা দেয়নি, বিদ্যুতের সত্তর হাজার টাকা বাকি, ট্যাক্স বাকি; ম্যানেজমেন্টের মোট প্রায় ষাট লক্ষ টাকা দেনা। বলছে এসব শোধ দিয়ে তবেই সমবায় হবে। এদিকে লকআউট করার অজুহাত বানাতে নিজেদের লোক দিয়ে সাজানো ধর্মঘট বাধাতে চেয়েছিল আমাকে তাড়াবার ইস্যু তুলে। সেটা ভেস্তে গেছে, ঠিকমতো বললে, তোমারই জন্য।"

শিবার মুখে রক্ত ছুটে এল। প্রশংসা অবশ্যই তার ভাল লাগে, অস্বস্তিও হয়।

"আপনিই তা হলে ওদের পথের কাঁটা?"

"অন্যতম, একমাত্র কাঁটা নই। ব্যাপারটা কী জানো, এতগুলো পরিবারকে পথে বসিয়ে, রাজনীতি করা লোকেদের আর প্রোমোটারের সাপোর্টে কারখানা তুলে দিয়ে বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করাটা—"

"আমি এসব রাজনীতি-টিতি একদম বুঝি না, বোঝার দরকারও নেই। নিরীহ, সৎ মানুষ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা উচিত, শুধু এইটুকুই বুঝি। এখন যাচ্ছেন

কোথায়?"

"কোয়ার্টারে। এখন আমি একাই ওখানে থাকি। আবার কবে কী ঝামেলা বাধে তার ঠিক নেই, তাই ওদের আর নিয়ে যাইনি।"

"আমার একটা উপকার করবেন?" শিবার মুখে এবং স্বরে মিনতি ফুটে উঠল।

"অবশ্যই করব, যদি সাধ্যের মধ্যে হয়। তুমি যা করেছ আমাদের জন্য তো—।" শিবা তাকে থামিয়ে দিল।

"ওসব কথা থাক। আপনার কোয়ার্টারে একজনকে থাকতে দেবেন? আমার ট্রেনার, বয়স্ক লোক, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, তিন কুলে কেউ নেই, একা মানুষ। ওঁকে যদি থাকতে দেন, তা হলে আমার খুব উপকার হয়। আমি আবার ন্যাশনালে নামব, গোম্‌সসারের কাছেই ট্রেনিং করছি। ওঁর খাওয়াদাওয়ার জন্য আপনাকে কিছু করতে হবে না, শুধু থাকতে দেওয়া।" শিবা প্রায় এক নিশ্বাসে বলে গেল কম্বিনেশন পাঞ্চ করার মতো দ্রুতগতিতে।

"আরে, এ আর এমনকী, সঙ্গে একজন থাকলে, তার ওপর আবার বক্সিং ট্রেনার, তো আমার বরং সুবিধাই হয়। আর খাওয়াদাওয়া তো আমার সঙ্গেই—।"

তিন-চার মিনিট পর শিবাকে দেখা গেল সে প্রায় ছুটে চলেছে লালবাগান জিম-এর দিকে।

তিনদিন পর ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌স ননীর রিকশা থেকে নিতুর দোকানের সামনে নামল।

"সাহেব আপনার লগে দেখা কইরতে চায়, তাই লইয়া আইলাম।"

সাহেব শুনেই নিতু অস্বস্তিতে পড়ল। তবে রংটা ঘোর কালো, এটাই যা ভরসা। বাংলাটাংলা বলতে যদি নাও পারে নিশ্চয় বুঝতে ঠিকই পারবে। সে ফিসফিস করে ননীকে বলল, "কে? আমার কাছে কেন?"

"গোম্‌সসার! শিবারে ইনি তো বক্সিংয়ের অন্দিহন্দি সব চিনাইছেন, শিকাইছেন। এনারে টেরনার করো, বক্সিংয়ের মাস্টারমশয়! টেরনার ছাড়া কেউ চ্যাম্পিয়ান হইতে পারে না।"

"তা আমার কাছে কেন?"

"গুড আফটারনুন।" গোম্‌স এগিয়ে এসে হাত বাড়াল। ওদের কথোপকথন সে শুনেছে। নিতু বিমূঢ়ভাবে গোম্‌সের বাড়ানো হাতটা ধরতেই ঝাঁকুনি খেল। "ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌স।...আপনিই শিবাজির দাদা নেতাজি?"

"হ, নিতুদা।" ননী আগ বাড়িয়ে বলল।

"আপনার নাম শুনেছি, তবে এই প্রথম চোখে দেখছি।" নিতু সতর্ক ভঙ্গিতে বলল।

"শিবাকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছুটি দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট নিয়ে আমি এসেছি।"

নিতু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সাহেব বাংলাটা এত ভাল বলে যে, বাঙালি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

"কী জন্য ছুটি?" নিতু এবার বিভ্রান্ত।

"শিবা কামব্যাক করবে বক্সিংয়ে। আবার রিং-এ নামবে, আবার লড়বে। এজন্য ট্রেনিং করতে হবে, হার্ড ট্রেনিং।"

শুনতে শুনতে নিতুর মুখ গম্ভীর হতে লাগল। "ট্রেনিং করবে তাই দোকান দেখতে পারবে না, তাই তো?"

গোম্‌স কিঞ্চিৎ স্মার্টনেস হারাল নিতু সরাসরি এই প্রসঙ্গে আসায়। এ যেন রাউন্ড শুরুর বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রতিপক্ষর একটা জ্যাব!

"দোকান আর ট্রেনিং দুটো একসঙ্গে চালালে খুবই টায়ার্ড হয়ে যাবে। তাই বলছি, ডিসেম্বরে ন্যাশনাল্‌স পর্যন্ত ওকে যদি আপনি ছেড়ে দেন।"

"হগ্গালে ডেচকি লইয়া আসার কামডা অবইশ্য শিবা চালাইয়া যাইব, ওডা তো ওর টেরনিংয়ের মদ্যেই পড়ত্যাসে।"

"তুই থাম।" নিতু ধমক দিল। ননী গুটিয়ে গিয়ে পিছু হটে রিকশায় উঠল। "আমি অহন যাই," বলেই প্যাডেল করতে শুরু করল।

"কিছুদিন আগে শিবা পায়ে বড়রকমের চোট পেয়েছে, এখন আর ওকে বক্সিং করতে দেওয়ায় আমার মত নেই। তা ছাড়া এই বক্সিং থেকেই তো ওর জীবনে বিপদ এসেছিল। গুণ্ডারা ওকে যা মার মেরেছিল! তা তো আমি ভুলতে পারব না।" থমথমে মুখে নিতু কথাগুলো বলে খদ্দেরে মনোযোগ দিল।

গোম্‌স কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, নিতুর হাত খালি হতে বলল, "শিবার চোট এখন কমপ্লিটলি কিওরড। ডাক্তার ও. কে. করে দিয়েছে। আর গুণ্ডারা যে-জন্য মেরেছিল সেসব কারণ এখন আর নেই।...বক্সিং এমনই একটা খেলা, বেইটাররা এতে হেভি বেট করে। গোরাচাঁদের বক্সার ছিল শিবা। তখন আমার ট্রেনিংয়ে ছিল না। ও ইমম্যাচিওর ছিল তাই জানত না কত রকমের বদমাইশি করে হারিয়ে দেওয়া হয়। বহু টাকা হেরে রাগে গুণ্ডা দিয়ে গোরাচাঁদ ওকে পিটিয়েছিল। শিবার পেট্রন এখন শিবা নিজেই।" গোম্‌স দুই মুঠিতে তুলে নিল নিতুর দুই হাত। "আমার রিকোয়েস্ট নিতুদা...তুমি রাখো, জাস্ট ওয়ান্স, একবার। এবার আমিই ওকে গাইড করব। এটা শুধু তোমার ভাইয়েরই নয়, আমারও কামব্যাক হবে।"

আপনি থেকে তুমি, তার ওপর নিতুদা! কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল নিতুর মাথাটা। সে আমতা আমতা করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই গোম্‌স বলল, "ও যদি ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান হয়, মোস্ট প্রোবাবলি হবে, তা হলে সেটা একটা রিভেঞ্জ নেওয়া হবে। তা ছাড়া ওর সামনে অনেক ওপেনিং আসবে...চাকরি মিলবে, ইন্ডিয়া টিমে আসবে, নানান দেশ ঘুরবে...এশিয়ান গেম্‌স, ওলিম্পিকস,...ফ্যামিলির মান বাড়বে।"

নিতুর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। পৃথিবীতে না হোক, এশিয়ার মধ্যেও যদি শিবা সেরা হতে পারে, তা হলে দেশের কোটি কোটি মানুষ ওর নাম জানবে। কলকাতার উত্তরে লাখ লাখ মানুষ গর্ব করে বলবে, "চেনো না! এখানকারই ছেলে শিবাজি আইচ, পূর্বপল্লি কলোনিতে থাকে। জানো না, ওর বাবা দয়াল আইচ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী! স্বাধীনতার পরও তিনি সংগ্রাম থামাননি; অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের

জন্য আমৃত্যু লড়াই করেছেন।...তাঁর ছেলে লড়াইয়ে নামবে না তো কে নামবে?...শিবার দাদা নিতু, চা, রুটি, আলুর দম বেচে, সেও তো লড়াই করে...দারুণ একটা ফ্যামিলি...।"

"শিবার বড় হওয়ার লড়াই আমার জন্য আটকাবে, তা কখনও হতে পারে!...বংশের মুখোজ্জ্বল করবে, সবাই বড় মুখ করে বলবে, 'শিবা আমাদের ছেলে, নিতুর ভাই'...আমি দাদা হয়ে বাধা দেব! শুধু একটাই অনুরোধ, আপনি ওকে একটু দেখবেন।" নিতু হাত বাড়িয়ে ফ্র্যাঙ্ক গোমসের দুটো হাত ধরল।

সেদিন রাতে দুই ভাই পাশাপাশি শুয়ে। কারও ঘুম আসছে না। এক সময় নিতু বলল, "সাহেবকে দিয়ে বলাবার কী দরকার ছিল, তুই নিজেই তো আমায় বলতে পারতিস। আমি আপত্তি করব, এই ধারণাটা তোর হল কী করে?"

"আমার অনেক অপরাধ জমা আছে।" বালিশে মুখ চেপে শিবা বলল।

"কী অপরাধ?"

"তোমাদের ফেলে আমি চলে গেছলুম সোনার বকলস পরতে।"

নিতুর হাত শিবার গলায় ঠেকল। শান্ত গলায় নিতু বলল, "বকলসটা নেই, কোনও দাগও নেই।...তোকে ট্রেনিং ছাড়া আর কিছু ভাবতে হবে না। দরকার হলে আমি লোক রেখে দোকান চালাব।"

শিবার মনে হচ্ছে একটা ভারী পাথর তার বুক থেকে নেমে যাচ্ছে। হালকা হওয়ার আনন্দে তার চোখ থেকে জল গড়াল।

হলধর বর্ধন বক্সিং টুর্নামেন্ট শুরুর আগের রাতে শিবা ঘুমোতে পারল না। বিকট একটা স্বপ্নের মতো, চার বছর পেরিয়ে অতীত থেকে একটা চিৎকার আসছে। সেটা আবার ভারী পাথরটা তার বুকে তুলে দিচ্ছে। সেই রাতের প্রতিটি কথা, ঘটনা তার স্পষ্ট মনে আছে। এতদিন ভুলে থেকেছে কিন্তু এখন সেগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।

ঠিক চার বছর আগে এই হলধর টুর্নামেন্টেই, হেভি ব্যাগ ফাটানোর ভীতিকর খ্যাতি নিয়ে রিং-এ নেমে সে জীবনের প্রথম লড়াই হেরে গেছল, ই সি পি সি-র সুনীল বেরার কাছে, পয়েন্টে।

ইস্ট ক্যালকাটা ফিজিক্যাল কালচারের ছেলেরা লড়াইয়ের ফল ঘোষণার পর শিবার উদ্দেশে চিৎকার করছিল, 'বলো হরি হরি বোল...বলো হরি হরিবোল।' আর শিবা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে মিশে যেতে যেতে ভেবেছিল এখন এখান থেকে পালাতে হবে।

প্রায় পালিয়েই শিবা ফিরে এসেছিল দুর্লভ চক্রবর্তীর গ্যারাজে। তখন সে গ্যারাজেই বাস করত। একটা মোটরের চালে চিত হয়ে শুয়ে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বক্সিং আর করবে না।

ননী তখনই গ্যারাজে ঢুকেছিল। শিবা তাকে বলেছিল বক্সিং ছেড়ে দেবে।

"সেই ভাল। ফাইট করা তর দ্বারা অইব না। ফাইটার অইন্য ধাতুতে গড়া হয়।"

"কী ধাতু?"

"কী ধাতু তা অবইশ্য জানি না, তয় ঘটিবাটি থালা গেলাসের ধাতু নয়। এডা হইত্যাছে মনের ধাতু। কোচিংঘরে স্বামীজির ছবিটা দ্যাখছস? চোক্ষু দিয়া যেন আগুন বাইরয়।"

শোনামাত্র শিবার কানে বেজেছিল, "নুইব না, আমি নুইব না।"

এর পর মোটরের চাল থেকে লাফ দিয়ে নেমে সে অন্ধকার গ্যারাজের কোণ থেকে বালিভর্তি চটের বস্তাটা, যেটাকে হেভিব্যাগ বানিয়ে সে প্র্যাকটিস করে, টেনে আনে। বস্তার মুখ বাঁধা দড়িটা, মোটরের এঞ্জিন তোলার কপিকলে লাগিয়ে টান দিয়ে সেটা জমি থেকে তুলল। কপিকলের লোহার চেনটা বাঁশের সঙ্গে জড়িয়ে দিল।

"আয় ননী, হেল্প কর। বস্তাটা দুলিয়ে ছুড়ে দে আমার দিকে।"

ননী বস্তাটাকে দু'হাতে দোলাতে লাগল। সেটা শিবার বুকে, পেটে আঘাত করে ফিরে এলেই ননী আবার ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। মিনিট কয়েক পর শিবা বসে পড়েছিল বুকে হাত দিয়ে। হাঁ করে শ্বাস টানছিল। বস্তার ধাক্কায় কলজে নিংড়ে বাতাস বেরিয়ে গেছে।

"এ কী! এর মদ্যেই টেরনিং হইয়্যা গ্যাল? এতেই তুই ফাইটার হবি? ওঠ ওঠ..." কথাটা বলেই ননী ডান পা দিয়ে শিবার পিঠে লাথি মেরেছিল। "লজ্জা করে না তর? হাজার লোকের চোক্ষের সাইমনে মাইর খাইয়া আলি, লজ্জা করে না?" আবার সে লাথি কষাল।

প্রথমটিতে শিবা চমকে উঠে শুধু তাকিয়ে থেকেছিল অবাক হয়ে। অন্ধকারে ননীর মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। ননী যে এমন দুঃসাহসিক কাণ্ড করতে পারে, এটা সে বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। দ্বিতীয় লাথিতে সে রাগে লাফিয়ে উঠে ননীর চুল ধরে ঝাঁকাতে থাকে।

"তোর সাহস তো বড় কম নয়? পা-টা যদি এবার ভেঙে দি!"

"গায়ে জোর আছে, তা ভাঙতে পারস, কিন্তু আইজকার লজ্জাটা কি তাতে ভাঙব?"

তখন শিবার মনে হয়েছিল, সে যেন সাধু, আর ননী যেন ভবানীসার। সাধুর মতোই তার মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে— পা-টা যদি এবার ভেঙে দি!

"কাল অনেকেই জিগাইব, শিবা জিতছে তো?"

"মানুষমাত্রেই হারে। আমিও হেরেছি।"

"মানুষ জেতেও, তার জইন্য মনের জোর চাই।"

এখন এই মধ্যরাত্রে চিত হয়ে জেগে থাকা শিবা দুঃস্বপ্ন থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে গোম্‌সসারের সেদিনের কথাগুলোর প্রতিটি শব্দ স্মরণ করতে লাগল— "জীবনের প্রথম ফাইট তুমি হেরেছ। ঠিক আছে। হার কাকে বলে না জানলে জিত কাকে বলে জানা যায় না। এটাই শিক্ষা, এটাই এডুকেশন। শিক্ষা নিতে পারলে বড় হবে।"

"শিবা এই কথাটা জেনে রাখ, চ্যাম্পিয়ান জিম-এ তৈরি হয় না, তৈরি হয় তাদের

ভেতরের, একেবারে ভেতরের জিনিস থেকে। সেটা হল ইচ্ছা, একটা খোয়াব। মনের মধ্যে এটা না থাকলে কেউ বড় হয়ে উঠতে পারবে না।...আর চাই মনের জোর, 'উইল'। স্কিলের থেকেও স্ট্রং হতে হবে ইচ্ছা, যাকে বলে উইল। তুমি দেখবে, অনেকে হারে তার থেকেও কমতি-স্কিলের অপোনেন্টের কাছে। কেন? মনের জোরের, উইলের কমতি থাকে বলে?

"তুমি প্রথমেই একটা ঘুসি খেয়ে মাথা গরম করে ফেলেছিলে। তাতে তোমার বুদ্ধি গুলিয়ে গেছল। মাথার মধ্যে গোলমাল হতেই তোমার বুদ্ধি খারাপ পথে চলে গেল। তখন তুমি শর্টকাটে, নক আউট করে লড়াই জেতার কথা ভেবেছিলে। কিন্তু তুমি অপোনেন্টকে মেপে নাওনি, জানতে চেষ্টা করোনি তার ক্ষমতা কত, তার গলদ কোথায়। ফাইটার্স আর ডিসকভারার্স, তারা খুঁজে বার করে। তারা নিজেদেরও তখন ডিসকভার করে, নিজেদের ভালমন্দও তখন জানতে পারে।...একটা কথা মনে রেখো, রিং-এর মধ্যে কীভাবে ফাইট করবে এটা বাইরে থেকে তোমার ট্রেনার বলে দিতে পারে না। তোমাকে নিজে সেটা ঠিক করে নিতে হবে। এজন্য তোমার বুদ্ধি, মন তৈরি করতে হবে।...সবার আগে চাই জেতার ইচ্ছা, ডিজায়ার।"

এক মাস পর স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপে প্রথম রাউন্ডেই শিবা নক আউট করেছিল সুনীল বেরাকে। রিং থেকে নেমে এসে বলেছিল, "সার আমার ভেতরে ইচ্ছেটা হয়েছে কি?"

"হ্যাঁ সার, আবার আমার জেতার ইচ্ছে হয়েছে বলেই আমি ফিরে আসতে চাইছি।"—শিবা নিজেকে কথাটা বলে অনেক হালকা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সে ফিরে-আসার প্রথম লড়াইটা পয়েন্টে জিতল। সাধারণ, মামুলি লড়াই। সারের চার বছর আগের কথাগুলো মাথায় রেখে সে লড়েছিল। বোম্বাইয়ে ন্যাশনালসের সাড়ে সাড়ে তিন বছর পর এই প্রথম রিংয়ে ওঠা। ভয় করেনি, কিন্তু অনিশ্চিত একটা বোধ তাকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল। লড়তে হবে গোল্ডেন গ্লাভ্সের শওকত হক নামে একজনের সঙ্গে। অনেক বক্সারই প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আগাম খোঁজখবর নিয়ে থাকে, গোম্সসার বলে দিয়েছিলেন, "এসবের দরকার নেই। এটা একটা মাইনর টুর্নামেন্ট, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ নয়।"

ড্রেসিংরুমেই সে হককে প্রথম দেখে। প্রথম তাকিয়েই শিবার মনে হয়েছিল, হক ভয় পেয়েছে। হয়তো শুনেছে শিবাজি আইচ নক আউটের মাস্টার, পাঞ্চের জোর দারুণ। হক দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে। শিবা স্বস্তি বোধ করল। সুনীল বেরার সঙ্গে লড়ার আগে সে-ও এইভাবে বসে ছিল। হক নিশ্চয় তাকে নক আউটের চেষ্টা করবে।

রিংয়ে ওঠার আগে গোম্সসার তার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। কোনও উপদেশও দেয়নি। ক্লাবেরই প্রাক্তন বক্সার অনিমেষ তার সেকেন্ড্স। সাহায্য করেছে কোমরে লাল রিবন আর গ্লাভ্স পরিয়ে লেস বেঁধে দিয়ে, মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে মাউথপিস। শিবার কর্নারে তোয়ালে, জলের বোতল আর বসার টুল নিয়ে

অনিমেষ, তার পাশে গোম্‌স। রিংয়ে উঠে মাস্‌ল আলগা করার জন্য হালকাভাবে লাফাতে-লাফাতে শিবা বাঁশের গ্যালারির দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় সাধুকে, তার পাশে দেবু।

চোখাচোখি হতেই সাধু শূন্যে ডান হাতে-বাঁ হাতে দুটো ক্রস চালিয়ে, মাথাটা কাত করে চোখ বুজিয়ে জিভ বার করল। শিবা বুঝল, সাধু কী বলতে চায়—নক আউট করো। সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

রিংয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে রেফারি হাত নেড়ে দু'জনকে ডাকতেই হক এগিয়ে এসেছিল দম-দেওয়া পুতুলের মতো যান্ত্রিকভাবে। কোমরে সবুজ রিবন। শিবা ওর চোখ দেখে আন্দাজ করল, কীভাবে লড়বে হক সেটা ঠিক করেই রেখেছে, নড়চড় হবে না তার কৌশলের।

"তোমরা দু'জনেই নিশ্চয় রুল্‌স জানো।" রেফারি তাদের প্রথামাফিক বক্তৃতাটা দিয়েছিল। "যখন বলব ব্রেক, দুজনেই তখন এক পা পিছিয়ে যাবে, তার মধ্যে ঘুসি চালাবে না। পিছিয়ে গিয়ে তারপর আবার বক্স করবে।...নো হিটিং বিলো দ্য বেল্ট। কিডনি পাঞ্চ...কোমরের পেছন দিকে কিংবা র‍্যাবিট পাঞ্চ...ঘাড়ের পেছনে, একদম করবে না। যখন স্টপ বলব থেমে যাবে, যখন বক্স বলব লড়াই শুরু করবে। পরিচ্ছন্নভাবে লড়বে...গুড, ক্লিন স্পোর্টসম্যান ফাইট।"

হকের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। ও কী ভাবছে, শিবা তা জানে। সেও প্রথমবার ভেবে রেখেছিল—মেরে শুইয়ে ফেলব। টাইমকিপারের ঘণ্টা বাজল। রেফারি দু'হাত নেড়ে রিংয়ের মাঝে দু'জনকে আসতে বলল।

"বক্স।"

হক গ্লাভ্‌সজোড়া মুখের সামনে রেখে তেড়ে এল। শিবা প্রথম জ্যাবটা থেকে মুখ পাশে সরিয়ে নিয়ে এক পা পিছিয়ে এসেই জ্যাব করল হকের কপালে।

শিবা ঘুরছে হককে ঘিরে। সারের কথাটা মনে রেখে, "ডান্স, ডান্স, ডান্স...ঘুরে-ঘুরে নাচো। ও এগিয়ে আসবে তোমাকে রোপ-এ নিয়ে কর্নার করতে। তুমি জ্যাব করেই সরে যাও। লোকে বলবে পালাচ্ছে, তাতে কান দিয়ো না।...তুমি পয়েন্ট তুলে নাও...ওকে টায়ার্ড করে দাও ঘুসি মারতে দিয়ে। এক একটা পাঞ্চ-এ দম বেরিয়ে যাবে।...ভেতরে এসে কম্বিনেশন চালিয়েই আবার সরে যাও।"

শিবা তাই করল প্রথম রাউন্ডে। নিজের কর্নারে টুলে বসে হক হাঁফাচ্ছে, বুক ওঠানামা করছে হাপরের মতো। গ্যালারিতে সাধু আর দেবু একই সঙ্গে লেফট-রাইট ক্রস চালিয়ে জানাচ্ছে—নক আউট করো। গোম্‌সসার তার দিকে তাকাচ্ছে না, কথা বলছে আশ্চয্যদার সঙ্গে। ননীকে সে আসতে বারণ করেছে, তাই আসেনি। আত্মীয়-বন্ধু কারও মুখই সে এখানে দেখতে চায়নি। অন্তত প্রথম দিনে নয়।

টুল নিয়ে অনিমেষ দড়ির ফাঁক দিয়ে গলে রিংয়ে ঢুকেছে। শিবা টুলে বসতেই সে হাঁটু ভেঙে চেয়ারের মতো হয়ে ওর দুটো পা নিজের উরুর ওপর তুলে নিল। চার বছর আগে শিবা লজ্জায় পা নামিয়ে নিয়েছিল। অনিমেষ ধমকে উঠে বলেছিল, 'রাখ।" কিন্তু এখন সে পা দুটো রেখে দিল। মুখে জল ছিটিয়ে তোয়ালে দিয়ে শিবার

হাত-মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে অনিমেষ বলল, "ভাল লড়ছিস। এবার একটু কাছে যা, ইন ফাইটিংয়ে আয়...জ্যাব করার সময় ওর ব্যালান্স থাকছে না।"

"দেখেছি। নক আউট করে দিতে পারতুম।"

"করলি না কেন?"

শিবা হাসল শুধু। দরকার কী, এটা তো একটা মাইনর টুর্নামেন্ট! সাড়া জাগিয়ে ফিরে আসার থেকে নিঃশব্দে এগোনোই ভাল।

ঘণ্টা বাজল। এক মিনিটের ইন্ট্যারভ্যাল শেষ।

"নক আউট শিবা, নক আউট।" গ্যালারি থেকে দেবু বিকট স্বরে চিৎকার করে তাকে তাতিয়ে তুলতে চাইছে। শিবা ফিরেও তাকাল না। 'নক আউট শিবা' ইমেজটা সাধুর দরকার তাকে নিয়ে ব্যবসার বা বেটিং করার জন্য। চেঁচাক ওরা, চেঁচাক।

দ্বিতীয় রাউন্ডে হুক একটামাত্র জবর পাঞ্চ শিবার পাঁজরে বসাতে পারল। বিনিময়ে তাকে বহু পয়েন্ট দিতে হল। তাকে পাক দিয়ে শিবার ঘুরে ঘুরে দূরে যাওয়া ও কাছে আসা, আচমকা লেফট রাইট কম্বিনেশন হককে শুধু দিশেহারাই নয়, ভয়ও পাইয়ে দিল। সে এই ধরনের স্ট্র্যাটেজির সামনে কখনও পড়েনি। এমন বিদ্যুৎগতির নড়াচড়াও সে কখনও দেখেনি।

তৃতীয় রাউন্ডে পুনরাবৃত্তি হল প্রথম দুটির। তবে তার একটা রাইট ক্রস হককে ক্যানভাসে ফেলে দেয়। রেফারি আট পর্যন্ত গুনতেই সে উঠে দাঁড়ায়। শিবা তখন হাঁফ ছেড়ে স্বস্তি বোধ করেছিল। বাকি সময়টুকু হক পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ঘটনা বলতে শুধু এইটুকুই। দ্বিতীয় রাউন্ডেই শিবা বুঝে গিয়েছিল সে লড়াইটা জিতেই গেছে। হক এমন কেউ নয় যে, তার কাছে জিতে নাচানাচি করতে হবে।

রেফারি তার হাতটা তুলে বিজয়ী ঘোষণা করার এবং হককে জড়িয়ে ধরে তাকে সাবাশ জানাবার পর শিবা রিং থেকে নেমে এসে উদ্ভাসিত মুখে ফ্র্যাঙ্ক গোমসের সামনে দাঁড়ায়।

"সার, কিছু কি বলবেন?"

"নিশ্চয় বলব। কাল সাড়ে ছ'টায় তোমার নেক্সট বাউট সাম টি. মিত্রার সঙ্গে। এখন সোজা ঘর যাও, অ্যান্ড রিলাক্স। কাল মর্নিং-এ রোড রানিং নয়, ওনলি ফ্রি হ্যান্ডস অ্যান্ড রেস্ট।...গুড নাইট।"

লালবাগান জিম থেকে বেরিয়ে বাসস্টপের দিকে যাওয়ার সময় শিবা দেখল স্কুটারে বসে রয়েছে দেবু এবং সাধু। হাতছানি দিয়ে সাধু ডাকল।

"তুই তো আমাকে ডোবাবি। এটা কি একটা লড়াই হল! তোর কাছ থেকে এমন মিনমিনে ব্যাপার আমি আশা করিনি।"

"কী আশা করেছিলেন?" শিবা 'ছিলে' বলতে গিয়ে 'ছিলেন' বলল। সাধু বয়সে বড় এবং নিজের এলাকায় মান্যগণ্যও বটে।

"নক আউট, নক আউট! আবার কী?" সাধু চেঁচিয়ে উঠল।

"জেতাটাই আমার লক্ষ্য, যেভাবেই হোক।" শান্ত গলা শিবার।

"শিবা ঠিকই বলেছে।" পিলিয়নে বসা দেবু বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল। "স্টেপ বাই স্টেপ ফর্মে ফিরতে হয়। এক লাফে মগডালে ওঠা যায় না।"

"তা হলে ন্যাশনালসের ফাইনালে তুই ফার্স্ট রাউন্ডেই নক আউট করবি?...বল করবি?" সাধু ব্যাকুলতা আর অনুরোধের মাঝামাঝি একটা স্বরে বলল। হঠাৎ ঝুঁকে ফিসফিস করল। "বাজি ধরব...জিতলে তোর টেন পারসেন্ট, অনেক টাকা!"

কয়েক সেকেন্ড সাধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শিবা হাঁটতে শুরু করল। বাসস্টপ ছাড়িয়েও সে হেঁটে চলল। পাশ দিয়ে স্কুটারটা চলে যাওয়ার সময় দেবু বলে গেল, "মনে রাখিস, টেন পারসেন্ট।"

দেবদাস পাঠক রোডের মোড়ের স্ট্যান্ডে তিনটি রিকশা দাঁড়িয়ে। তৃতীয়ে ননী। শিবাকে দেখে সে বলল, "আয়, বয়, পৌঁছায়ে দিমু।"

শিবা রিকশায় উঠল। ননী প্যাডেল শুরু করে বলল, "টায়ার্ড?"

"হ্যাঁ।"

ননী পকেট থেকে একটা পেয়ারা বার করে হাতটা পেছনে বাড়িয়ে বলল, "ধর।"

পেয়ারাটা নিয়ে শিবা বলল, "কোথায় পেলি?"

"এক প্যাসেঞ্জার রিশকা থাইক্যা লামবার সময় থলিডা একবার ধইরতে দিছিল। পিয়ারায় খুব ভিটামিন...কাল তর লড়াই আছে না?"

"হুঁ।"

ভবানীসারের কোচিংঘরের দরজা বন্ধ। রিকশা থামিয়ে শিবা নামল। জানলায় উঁকি দিয়ে দেখল ভবানীসার হুমড়ি দিয়ে বসে একটা খাতায় অঙ্ক কষছেন। শিবা কথা বলে ব্যাঘাত করল না। তবে দেয়ালে একটা নতুন লেখা চোখে পড়ল। কিছুই বুঝতে পারল না, যেহেতু সেটা ইংরেজিতে।

"সারের কোচিংয়ে আবার নাকি ভিড় হচ্ছে?" শিবা জানতে চাইল।

"হ। দশ-পনেরোজনরে ফিরাইয়া দ্যাছেন। মুখুজ্যেবাড়ির রঞ্জু আমারে ধরছিল তার ভাইপোডারে সারের কোচিংয়ে ভর্তি করাইবার জইন্য। গিয়া কইলাম সাররে। এককথায় লইয়া লইলেন।"

"তুই বলাতেই সার নিয়ে নিলেন!"

"ক্যান, রিশকা চালাই বইল্যা কি আমার মানসম্মান কম নাহি? সার রোজ আমারে ডাইক্যা তর কথা জিগায়, খবর লয়। তা আমি যদি এহন একডা রিকোয়েস্ট ওনারে করি, রাইখবেন না? রঞ্জুর দাদা কাঠের ফারনিচার কাইরখানা কইরতাচে ওনাদের বাগানের জমিতে, সেজ ভাইডারে ওহানে ফিট কইরা দিবার কথা ভাইবত্যাচি।"

ননী কিন্তু সারাক্ষণে একবারও জিজ্ঞেস করল না, আজকের লড়াইয়ের ফল কী হল!

পরদিন শিবা কাঁকুড়গাছি ব্যায়াম সমিতির তুষার মিত্রকে নিয়ে তিন রাউন্ড ছেলেখেলা করল। ছেলেটি মাসতিনেক হল বক্সিং শুরু করেছে। বহু পয়েন্টের ব্যবধানে শিবা জিতল। তার পরের দিন ফাইনালে শিবা যাকে পেল, রাস্তায় মারামারি করায় তার নাম হয়েছে, একটা 'হবু সাধু', ই সি পি সি এ-র গৌতম নাগ। প্রথম

রাউন্ডে নকআউটে জিতেছে। ওর লড়াইয়ের কায়দাটা হল, বুনো শুয়োরের মতো ঘোঁত ঘোঁত করে তেড়ে যাওয়া, রাইট সুইং আর লেফ্‌ট সুইং, বাটারফ্লাই সাঁতার কাটার মতো দু'হাতে দু'পাশ দিয়ে ঘুসি চালায়, তবে পাঞ্চে জোর আছে। নড়াচড়ায় অত্যন্ত মন্থর।

বিদ্যুৎগতিতে সরে সরে শিবা জ্যাব করে গেল বাঁ হাতে। এত দ্রুত সে ঘুরছিল যে, গৌতম বুঝে উঠতে পারছিল না কোনদিক থেকে লেফট হুক আর জ্যাবগুলো তার দিকে আসবে, মাথায় লাগবে রাইট ক্রস। অন্তত ছ'বার শিবা নিখুঁতভাবে নকআউট পাঞ্চ বসাতে গৌতমের চোয়াল পেয়েছিল। বসায়নি। শিবা বক্সিং লড়াই সম্পর্কে চমৎকার একটা শিক্ষা দিয়ে গৌতমকে বুঝিয়ে দিল রাস্তার মাস্তানি আর রিংয়ের মাস্তানি এক জিনিস নয়। ঘাম, রক্ত, পরিশ্রম, বুদ্ধি আর শৃঙ্খলাপরায়ণতা— এতগুলো জিনিস এবং সবার ওপরে ট্যালেন্ট, চ্যাম্পিয়ান হয়ে ওঠার জন্য দরকার হয়।

রিং থেকে নেমে আসতেই গোম্‌স তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেমন লাগছে? খুশি?"

শিবা মাথাটা দু'পাশে নাড়িয়ে বলেছিল, "বেঙ্গল বক্সিংয়ের খুবই শোচনীয় দশা সার। বেড়াল আর নেংটি ইঁদুরের সঙ্গে খেলে কি খুশি হওয়া যায়!"

"টাইগার আর লায়ন এ দেশে কোথায় পাবে, ইন্ডিয়ান বক্সিংয়েই নেই! তবে ন্যাশনালসে ডোবারমান কি আলসেশিয়ান তুমি পাবে।...রেডি থেকো।"

॥ ১১ ॥

জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হবে ন্যাশনাল বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপ্‌স।

বাংলা দলে শিবা মিডলওয়েটে নির্বাচিত। আশ্চর্য ঘটক বলেছিলেন, ট্রেনিং করতে করতে শরীর ঝরবে। বাহাত্তর কে জি-র শরীরটা একাত্তর কিলোগ্রামের নীচে নেমে এসে তাকে ওয়েল্টার করে দেবে। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌স সেটা হতে দেয়নি। বরং গত এক মাসে বাহাত্তরকে নিয়ে গেলেন সাড়ে চুয়াত্তরে, অর্থাৎ মিডল বিভাগে।

পুষ্টিকর খাদ্য, ট্রেনিং আর বিশ্রাম ওজন বাড়াতে সাহায্য করেছে শিবাকে। দু-তিনজন অবশ্য আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, কম ওজন বিভাগে শিবাকে নামালে ফল ভাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গোম্‌স বলেছিল, ন্যাচারাল গ্রোথ যা হওয়ার হোক। তাকে জোর করে বদ্ধ করলে শরীর উইক হয়ে পড়বে।

শিবা আবার লড়তে নামবে, এ-কথা পূর্বপল্লির সবাই জেনে গেছে । কাজটা শারীরিক এবং পরিশ্রমের, সুতরাং তার শরীরের যত্ন নেওয়া দরকার, এই ধারণাটাই তাদের ব্যস্ত করে তুলল। যে যেমন পারে খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে দেয়; যার অধিকাংশই কোনও খেলোয়াড়ের খাওয়া উচিত নয়। শিবা সে-সবই ফিরিয়ে দিয়ে জানিয়েছিল, যদি চ্যাম্পিয়ান হতে পারি তা হলে সবার ঘরে একদিন করে গিয়ে খেয়ে আসব।

বিশেষ উৎসাহ শক্তি দাসের, রোজই একবার খোঁজ নিয়ে যায় শিবার। সুযোগ পেলেই চেনা পরিচিতদের সে জানিয়ে দেয়, "শিবা তো আর বক্সিং করবে না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিল। রোজ ওর পেছনে লেগে লেগে তবে না চাগিয়ে তুললাম ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সাধটা।"

শচীনকাকু আবার দিয়ে যাচ্ছে সেদ্ধ ডিম। বটকেষ্টর দোকানের যাবতীয় রান্না সে করে চলেছে গত কুড়ি বছর ধরে। শিবা যখন চার বছর আগে লালবাগানে যাতায়াত শুরু করে বক্সার হওয়ার জন্য, তখন শচীন তাকে রোজ দু'বেলা দুটো সেদ্ধ ডিম দিত, অবশ্যই বটকেষ্টর অগোচরে। ডিম দেওয়া সে বন্ধ করেছিল শিবা যখন গোরাবাবুর বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সাধুদের হাতে প্রবল মার খেয়ে শিবা হাসপাতালে যখন অর্ধমৃত অবস্থায়, অন্যদের সঙ্গে তাকে দেখতে গিয়ে শচীন একটা সেদ্ধ ডিম সঙ্গে নিয়ে গেছল। সাগরমামি তাকে ধমকে বলেছিল, "খাবে কী, চিবিয়ে কিছু খাবার ক্ষমতা কি ওর আছে?" শচীন এখন আবার শিবাকে সেদ্ধ ডিম দিতে শুরু করেছে, গায়ে জোর বাড়াবার জন্য।

লালবাগান জিম-এ শিবা চার থেকে ছ'ঘণ্টা ট্রেনিং করে। গোম্‌সসার সারাক্ষণই তার সঙ্গে। একটা মিনিটও তারা নষ্ট করে না। একদিন মিতা আর তার দিদি এসেছিল। তারা হলঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, আশ্চর্য ঘটক তাদের আটকান। "এখানে মেয়েদের ঢোকা বারণ।...আপনারা কাকে চান?" শিবার সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে আশ্চর্য ঘটক মাথা নেড়ে বলেছিলেন, "দেখা হবে না। ওর ট্রেনারের কড়া হুকুম, ট্রেনিং চলার সময় কোনওরকম ডিস্ট্র্যাকশন যেন না হয়। আপনারা রাত আটটার পর আসবেন।" দুটি মেয়ে দেখা করতে এসেছিল—এই খবর, বলা বাহুল্য, শিবার কানে আর পৌঁছয়নি।

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে কান্তি প্রায়ই সন্ধ্যায় এসে আশ্চর্য ঘটক এবং অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলে আর লক্ষ করে শিবার ট্রেনিং। ওয়েলেসলির পুরনো ফার্নিচারের দোকানের কাজ সেরে ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌স জিম-এ আসে সন্ধ্যার পর। সে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কান্তি জিম থেকে বেরিয়ে পড়ে।

একদিন হেভি ব্যাগে শিবার ঘুসিমারা দেখতে দেখতে কান্তি বলল, "জীবনের প্রথম ঘুসিটা তুই আমার কাছে খেয়েছিলি, এই জায়গাতেই, মনে আছে?"

খুব ভালভাবেই শিবার মনে আছে। কিন্তু সে কান্তির কথায় কান না দিয়ে পাঞ্চ করে যেতে লাগল।

"এখন ভাবলে হাসি পায়। সেদিন তুই যদি পালটা এটা ঝাড়তিস তা হলে ভাঙা চোয়াল নিয়ে আমাকে জীবন কাটাতে হত।"

শিবা ঘুসি চালানো বন্ধ করল। "কান্তিদা, আপনার চোয়াল জোড়া যেত, সাধুর তো জোড়া লেগে গেছে!"

"সাধুকে তো আস্তে মেরেছিলি, আমাকে কি আর আস্তে মারতিস?"

"বোধহয়, না।" কথাটা বলে শিবা হলঘরের দরজার দিকে এগোল, বাইরে খোলা বাতাসে জিরিয়ে নেওয়ার জন্য।

এই দরজা দিয়ে হলঘরে প্রথমদিন ঢুকে সে কান্তির সামনেই পড়েছিল। "কী রে, তোকে আগে কখনও তো দেখিনি?"

"আমাকে আসতে বলেছিল।"

"কে, গোম্‌স নিশ্চয়?"

শিবা মাথা কাত করে।

"কখনও লড়েছিস?"

"না।"

"ঘুসি মেরেছিস কখনও?"

"না।"

"বক্সিং শিখতে এসেছিস, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"শিখতে গেলে প্রথমেই কী করে ঘুসি হজম করতে হয় তার ট্রেনিং নিতে হয়।" কান্তি দু'হাতে গ্লাভস পরে হাত দুটো শিবার মুখের কাছে ধরে বলেছিল, "কী বল তো?"

"ঘুসি।"

"বাহ্, তুই তো জানিস দেখছি। এটা এবার তোকে হজম করতে হবে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই শিবার ডান পাঁজরে সে ঘুসি মারল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার চোখের সামনের যাবতীয় বস্তু কালো হয়ে যায়। শ্বাস নিতে গিয়ে বুকে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা বোধ করে। এর পর আবার ঘুসি বাম পাঁজরে। তারপর দু'হাতে কান্তি চারটে ঘুসি মারল বুকে আর পেটে। শিবা উবু হয়ে বসে পড়ে বুক চেপে ধরে।

"এবার তুই বাইরে গিয়ে বাঁ দিকে যাবি। ওখানে রিংয়ের পাশে একটা বুড়োকে দেখবি বেঞ্চিতে বসে আছে। নাম আশ্চয্যদা। এখানকার সেক্রেটারি। তাকে গিয়ে বলবি কান্তি সরকার আশীর্বাদ করে দিয়েছে, এবার আমি বক্সিং শিখব।" এই বলে কান্তি খিকখিক করে হেসে যেতে থাকে।

অকারণে মানুষকে আঘাত করে, যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়া মুখ দেখে কেউ যে আনন্দে হেসে উঠতে পারে এমন লোক সাধুর পর শিবা দ্বিতীয়বার দেখল কান্তি সরকারকে।

"আমার ওপর তুই রেগে আছিস জানি।"

শিবা বর্তমানে ফিরে এল কথাগুলো শুনে। কান্তি হলঘর থেকে বেরিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"কিন্তু তুই বিশ্বাস কর, কমলালেবুতে যে ওষুধ দেওয়া আছে তা আমি জানতাম না। সাধু বলল, শিবাকে দিয়ে বলবি গুড উইশ জানিয়ে গোম্‌স পাঠিয়ে দিয়েছে, লড়াইয়ের আগে যেন খায়। তা হলে এনার্জি দেবে, স্ট্যামিনা দেবে।...খোসা ছাড়িয়ে টিফিন কৌটোয় ভরে আমিই তোকে দিয়ে এসেছি।" কান্তির গলা ধরে এল। শিবার কাঁধে সে হাত রাখল।

"এসব কথা এখন, এত বছর পর কেন?" কান্তির হাতটা রূঢ়ভাবে শিবা কাঁধ থেকে ফেলে দিল।

"তুই আমাকে সারাজীবন ভুল বুঝে থাকবি।...তোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, সাধনা দেখে আমার বুকের মধ্যে কী যে হচ্ছে! শিবা তুই বড় হয়ে ওঠ, ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করি তুই বড় হ, আবার আগের মতো নক আউটের পর নক আউট করে রিং কাঁপিয়ে দে। দূর থেকে আমি দেখব আর চোখের জল মুছব।"

"নক আউট!"

"হ্যাঁ। তোর কাছে এটা খুব সামান্য চাওয়া। ট্রেনিংয়ে তোকে যেরকম দেখছি তাতে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি প্রত্যেকটা লড়াই তুই নক আউটে জিততে পারবি।"

"শিবা ওয়ার্ক আউট কি শেষ হয়ে গেছে?" আশ্চর্য ঘটকের গলা ভেসে এল।

"না, আশ্চয্যদা।" শিবা একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে হল-এ ঢুকে গেল। রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপটাই ছিল নির্বাচনী ট্রায়াল। হলধর টুর্নামেন্টে যাদের সঙ্গে লড়েছিল, ট্রায়ালে সে তাদেরই পেল; উপরন্তু নতুন একজন, হাওড়ার সমীর সাঁতরাকে। ওর সঙ্গে লড়াইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে শিবার নতুন একটা অভিজ্ঞতা হয়। সাঁতরার একটা রাইট ক্রস থেকে মুখ সরালেও গ্লাভ্স্টা তার বাম ভ্রূ ঘষে বেরিয়ে যায়। ভ্রূ-র ওপরের চামড়া ফেটে রক্ত চুঁইতে থাকে চোখের ওপর । সে দেখতে পাচ্ছিল না বাঁ চোখে।

একটা চোখে ঝাপসা, অন্যটায় পরিষ্কার দেখা জীবনে এই প্রথম। হয়তো বিস্মিত হয়েই সে পাঁচ-ছ' সেকেন্ড বিহ্বল হয়ে থমকে গেছল।

"শিবা!"

রিংয়ের বাইরে থেকে ফ্র্যাঙ্ক গোম্সের তীক্ষ্ণ চিৎকারে তার সংবিৎ ফিরে আসে। অস্বস্তিকর একচোখা দৃষ্টি নিয়ে সে সাঁতরার ঘুসির এলাকার বাইরে চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করে। সাঁতরা যতই এগোয়, ততই সে সরে সরে যায়। রাউন্ড শেষের ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত সে বাঁ চোখের পাতা বন্ধ করে রাখে। ডাক্তার রক্ত পড়া বন্ধ করে স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে দেন। তৃতীয় রাউন্ডে শিবা পরিষ্কার চোখে সাঁতরাকে মারতে শুরু করে। তবে মনের মধ্যে একটা খচখচানি শুরু হওয়ায় মুখটা বাঁ দিকে সামান্য ঘুরিয়ে রেখেছিল যাতে কাটা জায়গাটায় আঘাত না লাগে।

শিবা পয়েন্টেই জিতেছিল। ড্রেসিংরুমে যখন সে চুল আঁচড়াচ্ছে, কান্তি তখন তার পাশে এসে দাঁড়াল।

"চোখ নিয়ে তোর খুব অসুবিধে হচ্ছিল।"

"কে বলল হচ্ছিল!"

হাসি খেলে গেল কান্তির চোখে। "আমি একটু আধটু বক্সিং করেছি যে, চোখে কিছু পড়লে তখন কী হয় আমি জানি। ইনজুরিটা তাড়াতাড়ি সারা, আর তো মাত্র হপ্তাতিনেক সময় আছে।"

কান্তি সরে গেল গোম্সকে আসতে দেখে।

"ঘর যাবে তো, চলো।" গোম্স কথাটা বলে ভ্রূ তুলল। "কান্তি তোমায় কী বলছিল?"

"চোখ নিয়ে...।"

"শিবা।" গম্ভীর হয়ে গেল গোম্‌স। "আজ যদি একটু ভাল ফাইটারের সামনে পড়তে যার মগজ আছে, যে অপোনেন্টকে কিনলি অবজার্ভ করে, চোখের ওপর থেকে চোখ সরায় না, হু ইজ অ্যান অপারচুনিস্ট, সামান্য দু' সেকেন্ডের সুযোগকেই যে কাজে লাগায় এমন কেউ আজ থাকলে তোমায় নক আউট করে দিত। ইউ আর ভেরি ভেরি লাকি।"

শুনতে শুনতে ফ্যাকাশে হয়ে গেছল শিবার মুখ। ক্ষীণ স্বরে বলল, "কখন করত?"

"ফোর-ফাইভ সেকেন্ডস তুমি নিজেকে আনগার্ডেড রেখেছিলে। ইনাফ টাইম টু নক ইউ আউট: ইনাফ, ইনাফ...রিমেম্বার হোয়েন আই শাউটেড? রিমেম্বার রোজারিও?"

শিবার মনে হল, তাকে অজ্ঞান করে অপারেশন টেবিলে তোলার জন্য ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। ফ্যালফ্যাল করে সে গোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অপলকে।

"চলো ট্যাক্সি ধরব, ইন্‌জুরি নিয়ে বাসে ফেরা চলবে না।"

ট্যাক্সিতে শিবা নিজেকে সিটে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। সাড়ে তিন বছর...কিন্তু এখনও তার স্পষ্ট সব কথা, সব ঘটনা মনে আছে। সাড়ে তিন বছর আগে বোম্বাইয়ে, ন্যাশনালসের ওয়েল্টার ওয়েট ফাইনাল...রিমেম্বার রোজারিও। হ্যাঁ, সে কখনও ভুলবে না সেই হারের কথা...কিন্তু কেন সে হেরেছিল! নক আউট করেছিল তিনজনকে, ফার্স্ট রাউন্ডেই, ফাইনালে সে ফেভারিট...ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে লোক ভেঙে পড়েছিল নক আউট দেখার জন্য।

শিবা কাতরে উঠল। চিবুক তুলে হাঁ করে ট্যাক্সির চালের দিকে তাকাল। পাশে বসা গোম্‌স আলতোভাবে শিবার কপালে আঙুল ছুঁইয়ে কোমল গলায় বলল, "পেইন হচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

"পেইন কিলার ক্যাপসুল খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

শিবা মনে মনে বলল, ঠিক হবে না। তাকে সাড়ে তিন বছর আগে ফিরে গিয়ে স্মৃতির মধ্যে ডুব দিতে হবে। প্রতিটি মানুষ, তাদের কথা চাহনি, চলাফেরা, হাসি, চিৎকার...সব তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে মনের মধ্যে।...রিমেম্বার, রিমেম্বার রোজারিও।

চোখ বন্ধ করল শিবা। তিন বছর আগে বোম্বাইয়ে, মেরিন ড্রাইভ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চৌপট্টিতে...সে আর সুনীল বেরা। মেলার মতো ভিড়। ভেলপুরি, আলু-মটর, আইসক্রিম, পাওভাজি, যা দেখছিল তাই কিনে খাচ্ছিল। বালি আর কাদা মাড়িয়ে সে সাগরের জলের স্বাদ কেমন জানার জন্য আরব সাগরের দিকে যাচ্ছিল। তখন দেখতে পায় সুনীল কথা বলছে রোজারিওর সঙ্গে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছয়-সাত বছরের একটি ছেলে আর স্কার্ট-ব্লাউজ পরা শ্যামবর্ণা এক মহিলা।

সুনীল তাকে হাতছানি দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল।

তারপর...

॥ ১২ ॥

সে এগিয়ে যেতেই রোজারিও হাত বাড়িয়ে দিল। কুণ্ঠিতভাবে সে হাত মেলাল।

"বেরা ওয়াজ জাস্ট টেলিং মি অ্যাবাউট ইউ। হাম তো রিটায়ার করনেওয়ালা বুঢ়া হ্যায়। বেরাসে শুনা তুমহারা পাঞ্চ বহত জবরদস্ত হ্যায়। তো দেখো বাবা, হামকো জারা আস্তে সে হিট করো! হাম মর যায়গা তো মেরা বিবি-বাচ্চাকো কউন দেখেগা।" রোজারিও এই বলে হো-হো করে হেসে ওঠে।

লোকটাকে তার ভাল লেগে গেল। সে বলে ফেলল, "হাম তো আপনার কাছ সে শিখে গা।"

"কেয়া শিখে গা?"

সে ভেবে পাচ্ছিল না এবার কী বলবে! রোজারিওর মুখের হাসিটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ধীর শান্ত স্বরে বলল, "তো শুনো, নেভার শেক হ্যান্ড উইথ অ্যান অপোনেন্ট আনটিল ইউ হ্যাভ হুইপ্‌ড হিম। জিতনে কা আগে অপোনেন্ট কা সাথ কভি হ্যান্ডশেক না করো।"

"হ্যান্ডশেক আপ তো আভি কিয়া। শিবা তো আপকা অপোনেন্ট হ্যায়।" সুনীল বলল।

"দেখো, হাম অপোনেন্টকো হেট করতা। উই ফাইট, লেকিন ডিপ ইন আওয়ার মাইন্ড উই ডু নট রিয়্যালি হেট। হাম মনমে হেট বানাতা, মনমে অপোনেন্টকো খারাপি দুশমন বানাকে অ্যাটাক করতা।"

তার পাশেই দাঁড়িয়ে রোজারিওর ছেলেটি। একদৃষ্টে বেলুনওলার হাতে ধরা বিশাল বিশাল বেলুনগুলোর দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে।

সে ঝুঁকে বলল, "খোকা, বেলুন নেবে?"

ছেলেটি লজ্জা পেয়ে মায়ের দিকে সরে গেল। হাত ধরে ছেলেটিকে সে বেলুনের দিকে টেনে নিয়ে দশ টাকায় দুটো বেলুন কিনে ওর হাতে দিতেই খুশিতে ঝকমক করে উঠল ওর মুখ। হাসিতে টোল পড়ল গালে।

"কী নাম তোমার, নাম কেয়া?"

"নীল, নীল রোজারিও।"

নীল! ধক করে উঠল বুকের মধ্যে। ছোট ভাই নিলু, অনেকটা এই বয়সেই মারা গেছে।

"আচ্ছা শিবা, থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্যা বেলুনস। হামকো আভি তো কোলাবা যানে পড়ে গা, এক ফ্রেন্ড কা হাউস মে।...ইয়ে মেরা লাস্ট অ্যান্ড ফিফ্‌টিন্‌থ ন্যাশনাল। পাপ্পা ক্যায়সা ফাইটার, নীল আপনা আঁখো সে দেখে গা। ইস লিয়েই হাম উনকো বোম্বাই লে আয়া, ইটস নীলস লাস্ট চান্স টু উইটনেস হিজ ফাদার ইন দ্য রিং।"

যাওয়ার সময় নীল বলল, "থ্যাঙ্ক য়ু আঙ্কল।" যেতে যেতে মুখ ফেরাল, হাত নাড়ল। সেও হাত নাড়ল।

"ছেলেটা বেশ। আমার এইরকম একটা ভাই ছিল।" তার কথার কোনও জবাব

সুনীল দিল না।

"কী বলল বলো তো হ্যান্ডশেক করা নিয়ে?" সে জিজ্ঞেস করেছিল সুনীলকে।

"বলল, অপোনেন্টকে মারার জন্য আমরা মনের মধ্যে একটা ঘৃণা তৈরি করি, আসলে কিন্তু অন্তরে আমরা কাউকে ঘেন্না করি না।"

"মনের মধ্যে ঘেন্না বানিয়ে লড়তে হবে, জিততে হবে! কেন, ওটা ছাড়া এমনই কি জেতা যায় না?"

সুনীল বলেছিল, সে জানে না।

প্রথম লড়াইয়ের আগে ড্রেসিংরুমে কাঁচাপাকা চুল ভরা মাথা, ঘাড়েগর্দানে, বেঁটে একটা লোক এসে বলল, "আই অ্যাম বেহরাম মিস্ত্রি।"

প্রিয় হালদারের কাছে নামটা সে শুনেছে। গোরাবাবুর সঙ্গে এই লোকটা আর এক পাঞ্জাবি মিলে নাকি অল ইন্ডিয়া টুর্নামেন্ট করবে। বেহরাম বলল, "গোরাচাঁদ টেলেক্সমে ভেজা, তুম বহত ফাস্ট অউর হার্ড হিটার বক্সার! তুমহারা পর উইনকা দর আহমেদাবাদ অউর বোম্বাইমে তিন-এক, ক্যালকাটামে চার-এক, ফার্স্ট রাউন্ড নক আউট কা দর আট-এক, কানপুরমে পাঁচ-এক। ফার্স্ট রাউন্ড নক আউট করো, এক হাজার রুপেয়া ইনাম মিলেগা।"

রিং গেমে দু' মিনিটের মধ্যে দিল্লির অরুণকুমারকে নক আউট করেছিল। স্টেডিয়ামের দর্শকদের উন্মত্ত চিৎকার তার ভাল লাগছিল। ওরা চায়, ঘুসি মেরে একটা লোকের লুটিয়ে পড়া দেখতে। যে দেখাতে পারে তাকে ওরা ভালবাসবে। সে ভালবাসা চায়। গোরাবাবুর আশ্রয়ে নিঃসঙ্গ জীবনটা ভরাবার জন্য এই চিৎকার তার দরকার। বেহরাম হাজার টাকা দিয়েছিল।

পরের লড়াই রেলওয়েজের মার্টিনের সঙ্গে। আবার বেহরাম বলল,"ফার্স্ট রাউন্ড নক আউট করো...হাজারই মিলেগা।"

ফার্স্ট রাউন্ডেই সে মার্টিনকে ফেলে দিয়ে কানের পরদা ফাটানো চিৎকার শুনেছিল। রিং থেকে নামতেই অনেকে ছুটে আসে পাগলের মতো, তাকে স্পর্শ করার জন্য। বেহরাম হাজার টাকা দিয়েছিল।

সেমিফাইনাল ছিল সার্ভিসেসের শ্যামবাহাদুরের সঙ্গে। ইতস্তত করে, বেহরাম বলেছিল, "ফার্স্ট রাউন্ড নক আউট হোগা?" দু'বার হয়েছে, তৃতীয়বারও কি তা সম্ভব?

"চেষ্টা করেগা।"

"দো হাজার।"

দু'হাজার টাকাও সে জিতে নিল। রিং থেকে কারা যেন তাকে কাঁধে তুলে ড্রেসিংরুমে নিয়ে গেছল। তখন যা কিছু দেখছিল, যা কিছু শুনছিল, সবই অবাস্তব, অলীক বলে তার কাছে মনে হচ্ছিল। চায়ের দোকানের শিবা ব্রেবোর্নকে কাঁপিয়ে "শিবাজি...শিবাজি" চিৎকারে যেন ছত্রপতি শিবাজিরই মর্যাদা পাচ্ছে। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

তার ফাইনালে ওঠার খবর পেয়ে কলকাতা থেকে প্লেনে উড়ে এল গোরাবাবু।

তাকে হোটেলে ডেকে এনে বলল, "এই ফাইনালে তোমাকে নিয়ে বেটিং হচ্ছে, হাজার হাজার টাকার বাজি! আমারও অনেক টাকা এতে রয়েছে। ফার্স্ট রাউন্ড নক আউট, ফোর্থ টাইম...কী মনে হচ্ছে? লড়তে হবে রেলের রোজারিওর সঙ্গে, ওর লড়াই দেখে নিয়েছ?"

"রোজারিও বুড়ো হয়ে গেছে, আমার থেকে অনেক স্লো, পাঞ্চেও জোর নেই, দমও নেই।"

"লোকটা কিন্তু পাঁকাল মাছের মতো পিছল, শেয়ালের মতো ধূর্ত।" গোরাবাবু হুঁশিয়ার গলায় বলল।

"দেখা আছে সব।" সে একটু তেতে উঠল তার সামর্থ্যের ওপর গোরাবাবুর দ্বিধা দেখে। সব জারিজুরি ভেঙে দেবে চোয়ালে একটা লেফট হুক বসিয়ে।

"বেহরাম আমার পার্টনার হলেও ওকে আমি বিশ্বাস করি না। গোপনে হয়তো ও বাজি ধরবে রোজারিওর ওপর, তাই চাইবে ফেভারিটকে হারিয়ে আপসেট ঘটাতে। তোমাকে কিছু খেতে টেতে দিলে খাবে না, জলও নয়। নিজে সঙ্গে করে ফ্লাস্কে জল নিয়ে যাবে। মনে রেখো, অনেক টাকা ধরেছি তোমার ওপর...ফার্স্ট রাউন্ড।"

কিন্তু সে জানত না রোজারিওর বউ ও ছেলে রিংয়ের ধারে বসবে। ছেলে একবার অন্তত বাবাকে লড়তে দেখুক, এটাই রোজারিওর ইচ্ছে। রিংয়ে তার চোখে পড়ল নীল, তার দিকে তাকিয়ে। বড় বড় দুটি চোখে বিস্ময়, সারল্য, কৌতূহল। চোখাচোখি হতেই নীল হাত নাড়ল। সে পারল না। হাত তুলতে গিয়ে মনে হল বগলটা জং-ধরা কবজার মতো।

তখন সে ভেবেছিল, হেট দরকার, হেট। রোজারিওকে ঘেন্না। নয়তো সে লড়তে পারবে না। মনের ভেতর একটা গনগনে আক্রোশ এখন চাই। এই জং-ধরা কবজাটায় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করছে, এটাকে হেট দিয়ে ঘষে ঘষে সচল করে তুলতে হবে।

কিন্তু রোজারিওকে খারাপ মানুষ ভাবার মতো ওর সম্পর্কে তো কিছুই সে জানে না। যতটুকু ওকে দেখেছে, বেশ ভালই লেগেছে। হাসিখুশি, ভদ্র, আমুদে। রিংয়ে শ্যাডো করতে করতে নজর আবার নীলের ওপর গিয়ে পড়ল। তখন সে নিজের ওপর রেগে উঠে ভাবল, কেন ওকে নীলু মনে হল! কেন ওকে বেলুন কিনে দিতে গেলুম!

রোজারিও রিংয়ে উঠতেই নীল দাঁড়িয়ে উঠল। এগিয়ে এল রিংয়ের ধারে। উবু হয়ে বসে রোজারিও রোপ-এর ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে নীলের কপালে চুমু দিল। গলা জড়িয়ে নীল বাবার দুই গালে চুমু দিল। দেখতে দেখতে তার বুকের মধ্যে একটা ধস নামল। একদম নির্জন ফাঁকা হয়ে গেল বুকের মধ্যে। তার কোনও আপনজন এখানে নেই। কলকাতা হলে ননী নিশ্চয়ই থাকত! ননী আর থাকবে না। কেউ তার চারপাশে আর নেই—মা, দাদা, ভবানীসার, সাগরমামি, শচীনকাকু, আশ্চয্যদা, গোম্‌সসারও।

প্রথম রাউন্ড শুরুর ঘণ্টা বাজতেই রোজারিওর দিকে সে তেড়ে গেল। কয়েকটা জ্যাব আর স্ট্রেট লেফ্‌ট দিয়েই তার মনে হল লোকটার ফুটওয়ার্ক অসম্ভব ভাল।

শরীর থেকে ঘুসি ঝেড়ে ফেলার কায়দাটা জানে। জানুক। তার বাঁ হাতের চৌহদ্দি থেকে রোজারিওকে বেরোতে দেবে না। ফার্স্ট রাউন্ডে ফেলে দিতে হলে ওকে টেনে আনতে হবে কিংবা এগোতে হবে।

শেয়ালের মতো ধূর্ত! চিন্তার হদিস পেয়ে গেছে নিশ্চয়। দূরে-দূরে ঘুরছে, ইনফাইটিংয়ে একেবারেই আসতে চাইছে না।

সে এগোল। রিংটাকে আড়াআড়ি কেটে এগোতে এগোতে সে রোজারিওকে কর্নারে যখন নিয়ে যাচ্ছে, প্রায় আট হাজার দর্শক তখন নক আউটের গন্ধ পেয়ে বীভৎস চিৎকার করল, "কিল, কিল, কিল।"

তার লেফ্‌ট হুকটা তৈরি হয়ে ওঠার আগেই রোজারিও দ্রুত এগিয়ে এসে জড়াজড়ি করে ফেলল। তার গলা জড়িয়ে ধরেছে ওর ডান হাত, বাঁ হাতে কোমর। এই অবস্থায় ঘুসি মারা যায় পেটে বা বগলে, তাও খুব জোরে নয়। কয়েকটা বোবা ঘুসি সে চালাল, রোজারিওকে ঠেলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল, কিন্তু ও ছাড়ছে না।

"ব্রেক।" রেফারি বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'জনকে সরে যেতে হুকুম দিল।

পিছোতে গিয়ে তার ডান পা অতি সামান্য পিছলে গেল। পলকের জন্য সে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক কানের ওপর রোজারিওর রাইট সুইংটা এসে পড়ল এবং সেটাকে অনুসরণ করে বাঁ হাতের সোজা একটা পাঞ্চ।

ক্যানভাসের ওপর তার পড়ার শব্দটা ব্রেবোর্নের নর্থ স্ট্যান্ডের চালে ধাক্কা খেয়ে নেমে এল দর্শকদের ওপর। তারা হতবাক। দ্রুতই সে উঠে পড়ে, কিন্তু মনের জোর যেন কিছুটা তুলে নিয়ে গেল ওই দুটো পাঞ্চ। সেই জায়গায় ঢুকে এল ভয়। আর সেই ভয়ের তাড়সেই সে বুনো শুয়োরের মতো এগোল।

মুখে দুটো জ্যাব পড়ল, পাঁজরে সোজা একটা। রোজারিওর পাঞ্চে জোর নেই, সে কোনওরকম ব্যথা টের পেল না, তখন সে খুঁজছে বাঁ হাতের পাল্লার মধ্যে ওই বুড়োটাকে পেতে। পেয়েও গেল। লেফ্‌ট হুকের সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতেও একটা।

পড়ে গেল রোজারিও। রক্ত বেরিয়ে আসছে নাক দিয়ে। কয়েক হাজার কণ্ঠের চিৎকার একসঙ্গে বেরিয়ে বোমার মতো ফাটল। ওরা যা চাইছিল তা পেয়েছে।

"পাপ্পা...পাপ্পা!"

একটা ভীত কচি কণ্ঠস্বর। ছোট্ট ফোঁপানি।

"পাপ্‌পা...ওহ্‌হ।"

ক্যানভাসে উপুড় হয়ে থাকা রোজারিও ধীরে ধীরে মুখ তুলল। দু'হাতে ভর দিয়ে নিজেকে তুলে তাকাল যেদিক থেকে ডাকটা আসছে। তারপরই ওর দু'চোখে ঠিকরে উঠল দুর্দমনীয় জেদ আর ইচ্ছা।

সে তাকিয়ে দেখছিল রোজারিওকে। লোকটা মানুষ না অন্য কিছু! ওই দুটো ঘুসি খাওয়ার পরও উঠে দাঁড়াচ্ছে!

"ফাইভ...সিক্স..."

"পাপ্পা প্লিইজ গেট আপ।"

রোজারিও ছেলের দিকে মুখটা ফেরাল। গালের পেশি দুমড়ে গেল। টপটপ রক্ত থুতনি বেয়ে সাদা গেঞ্জিতে ঝরছে। বিড় বিড় করে কিছু বলল।

"এইট...নাইন..."

শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রোজারিও উঠে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসল। একবারও পা কাঁপল না। চোখ বন্ধ করল না, টলে উঠল না।

কর্নার থেকে সে এগোল আবার ওকে মারার জন্য। রোজারিও মুখের সামনে দু'হাতের গার্ড রেখে পিছিয়ে গেল। আর তখনই প্রথম রাউন্ড শেষের ঘণ্টা পড়ল।

বিভ্রান্ত চোখে সে রোজারিওর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, এত জোর লোকটা পেল কোথা থেকে? তিনটে নক আউট এই পাঞ্চেই হয়েছে, অথচ উঠে দাঁড়াল! কীসের জোরে! গেঞ্জির বুকের কাছটা রক্তে লাল। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। নিজের কর্নারে গিয়ে রোজারিও টুলে বসল।

"পাপ্পা ইউ আর আ ফাইটার...পাপ্পা ইউ আর আ ফাইটার...পাপ্পা..."

রোজারিওর একটা চোখের চারপাশ ফুলে উঠেছে। অন্য চোখে অদ্ভুত একটা হাসি। ভীষণ মজাদার এই লড়াইটা, তাই না রে, এমন একটা ভাব করে সে ছেলের দিকে তাকিয়ে। ডান হাতে গ্লাভ্সটা তুলে নাড়ল। ওর জীবনের সবচেয়ে দামি স্বপ্নটা সার্থক হয়েছে।

ফার্স্ট রাউন্ড নক আউট হল না। কীরকম একটা বিষণ্ণতা তার মধ্যে ছেয়ে আসছে। হাত, পা, মুখ, তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে সুনীল ঝড়ের মতো নির্দেশ, উপদেশ দিয়ে কথা বলে যাচ্ছে। কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না।

অন্য কর্নারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে ভবানীসারকে দেখতে পেল। মাথাটা ঝোঁকানো, ঠোঁট দুটো সামান্য খোলা...আমি নুইব না, নুইব না! সে নিজেকে তখন জিজ্ঞেস করল, আমি কি তা হলে সাধু হয়ে গেছি? এখন শিবাকে চাই...কোথায় সে?

"পাপ্পা কাম অন...ফাইট।"

তার বুকটা কেঁপে উঠল। মনের গভীরে সে অসহায়ের মতো শিবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রোজারিওর মুখটা ভবানীসারের মতো কেন?...রোজারিও পয়েন্ট তুলে নিচ্ছে তাকে হিট করে করে।

"শিবাজি, নক হিম আউট, কাম অন শিবাজি।"

চিৎকারগুলো আর তার মধ্যে উত্তেজনা আনছে না। সে আর মারতে চায় না, মার খেতে চায়। দ্বিতীয় রাউন্ড শেষে সে টুলে বসে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

"শিবাজি ইজ আ চিট...ফেক হ্যায়, নকলি হ্যায়।"

বলুক, ওরা বলুক। তোয়ালে নেড়ে সুনীল বাতাস করছে। আর কোনও উপদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে না। বোধহয় বুঝে গেছে লড়াই শেষ, তৃতীয় রাউন্ডও দ্বিতীয়টার মতো হবে।

গোম্সসার বহুবার বলেছিল, চ্যাম্পিয়ান তৈরি হয় তাদের ভেতরের একেবারে

ভেতরের জিনিস থেকে...সেটা হল ইচ্ছা, মনের জোর, যাকে বলে উইল। রোজারিওর ইচ্ছা ছেলের সামনে বীর হবে। বীরের ছবিটা চিরকাল নীলের মনে জ্বলজ্বলে হয়ে থাকুক। এই ইচ্ছা নিয়েই রিংয়ে উঠেছে।

সে কারও জন্য ছবি আঁকতে চায় না। তার কোনও ইচ্ছা নেই, তার কোনও নিজের লোক নেই। ভবানীসার হারেনি। রোজারিও হারবে না বুঝে গিয়েই সে তৃতীয় রাউন্ডের জন্য উঠে দাঁড়ায়।

লড়াই শেষে রেফারি তার হাতটা তুলে ধরেনি।

"আর ইউ অ্যাশ্লিপ...শিবা?"

গোম্‌সের আলতো নাড়ায় শিবা খাড়া হয়ে বসল। ট্যাক্সি দেবদাস পাঠক রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে!

"পেইন হচ্ছে?"

"না। একদম সেরে গেছে।" ট্যাক্সি থেকে নামার পর শিবা বলল, "কালই আমি জিমে যাব সার। আসবেন?"

"ইয়েস, অফকোর্স যাব।"

॥ ১৩ ॥

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপ্‌স শুরুর আগের দিন লালবাগান জিম থেকে একটু দূরে স্কুটারে বসে সাধু কথা বলছিল পাশে দাঁড়ানো কান্তির সঙ্গে।

"বলছ কী কান্তি, ছ'-ছ'টা লড়াই কোনওক্রমে যে জিতল তাকে বলছ কিনা দারুণ ফর্মে আছে? শিবা তো এখন পয়েন্টের বক্সার!"

"সবার তাই-ই মনে হবে, কিন্তু আমি তো ওর ট্রেনিং দেখছি, একটু-আধটু বক্সিং যা বুঝি, তাতে বলতে পারি ও এখন দারুণ শ্যেপ-এ আছে। কাদের সঙ্গে ওকে লড়তে হবে তা অবশ্য জানি না, ড্র-টাই বক্সিংয়ে খুব ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার, তবে ফাইনালে সার্ভিসেসের রঙ্গরাজন উঠছেই। সিওল কাপে ব্রোঞ্জ গতবছর, এবার ম্যানিলায় মেয়রস কাপে গোল্ড পেয়েছে।"

" জানি। শুনেছি দারুণ জোরে মারে, কিন্তু স্লো। ম্যানিলায় দুটো নক আউট করে ফাইনালে একটা মঙ্গোলিয়ানের কাছে জিতেছে, বাইশ-সাত পয়েন্টে, বোম্বাই থেকে খবর আমি আনিয়েছি। ওর এগেনস্টে শিবার কোনও চান্সই নেই। আমি ওর ওপর টাকা ফেলতে রাজি নই।"

"অত জোর দিয়ে বোলো না সাধু...শিবা ওর ফর্ম লুকিয়ে রেখেছে, ওই ব্যাটা গোম্‌সের এটা চালাকি। যদি ওর ওপর বাজি নাই ধরো তবু, 'সাবধানের মার নেই' পলিসি নাও। যদি শিবা ফাইনালে ওঠে, তা হলে ওকে নক আউটের ব্যবস্থা করে রাখো।" ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে কান্তি বলল।

"কীভাবে?" সাধুও ঝুঁকে পড়ল।

"ব্যবস্থা হয়ে যাবে...কী দেবে সেইটে বলো।"

"পাঁচশো।"

"উঁহুঁ।"

"এক হাজার।"

"তুমি কামাবে পঁচিশ-পঞ্চাশ, আর আমি মাত্র এক!"

"আরে, ওকে তো এমনিতেই রঙ্গরাজন নক আউট করবে, ব্যবস্থা করার কোনও দরকার নেই।"

"নেই তো নেই। পরে কিন্তু আমার কাছে ছুটে এসে 'বাঁচাও কান্তি, ডুবে গেলুম' বলে হাত চেপে ধোরো না।"

কান্তি হাঁটতে শুরু করল। স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে সাধু কান্তির পাশাপাশি চালাতে চালাতে বলল, "তুমি ঠিক বলছ, শিবা ফর্ম লুকিয়ে রেখেছে?"

"একশোভাগ শিওর আমি।"

"ও ফাইনালে যাবে?"

"যাবেই।"

"ঠিক আছে, কত চাও?"

"পাঁচ।"

"অ্যাঁ!" সাধু অবাক হয়েই গম্ভীর হয়ে গেল। শুধু বলল, "ঠিক আছে।"

"আমি লোকাল অফিশিয়াল হয়েছি, বাইরের টিমগুলোকে লড়াইয়ের সময় দেখভাল করার দায়িত্ব আমার। স্টেডিয়ামে তুমি আমার ধারেকাছে আসবে না কিন্তু।"

শিবার প্রথম লড়াই হরিয়ানার সতীশ শর্মার সঙ্গে।

স্টেডিয়ামের ভি আই পি এনক্লোজারের সামনে এরেনা-র মাঝামাঝি, রিং তৈরি করা হয়েছে, গ্যালারিতে পাঁচশো দর্শকও হয়নি। বক্সিং বছর তিরিশ-পঁয়ত্রিশ আগেও কলকাতায় জনপ্রিয় ছিল, যেমন ছিল কুস্তি। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান ছেলেরাও বক্সিং লড়ত। ভারতের ওলিম্পিক্স দলে কলকাতার বক্সার বা কুস্তিগিররাও নির্বাচন পেত। কিন্তু বক্সিং রিং বা কুস্তির আখড়া পশ্চিমবাংলায় এখন আর দেখাই যায় না। কয়েকটি মাত্র টিমটিম করে জ্বলছে। ক্রিকেট আর ফুটবল নিয়েই এখন মাতামাতি। গায়ের জোরের খেলায় বা যে-খেলায় সংবাদ মাধ্যমগুলোর ঢাকে কাঠি পড়ে না, বাঙালি ছেলেরা সেই খেলায় আর মাতে না।

কলকাতায় জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে দর্শক যৎসামান্য হওয়ায় কেউই আশ্চর্যবোধ করেনি। পঞ্চম লড়াইটি ছিল মিড্‌ল ওয়েটের। শিবার কর্নারম্যান ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌স আর আগেরবারের মতোই সুনীল বেরা এবং অনিমেষ। রিংয়ে ঢুকে দু'হাতে দড়ি ধরে শিবা নিজেকে ঝাঁকাচ্ছিল, পেশিগুলো আলগা করার জন্য। গোম্‌স বিপরীত কর্নারের দিকে তাকিয়ে শিবাকে বলল, "টেক ইট ইজি...মাথায় রক্ত চড়িয়ে

দেবে না...মনে রেখো ফাইটারস আর ডিসকভারারস, ওর ফল্টগুলো বার করো।"

শিবা পাঁচ-ছ'টি ত্রুটি শর্মার মধ্যে বার করেছিল প্রথম রাউন্ডেই।

"কী মনে হচ্ছে?" শিবার মুখ থেকে মাউথপিসটা বার করে গোম্‌স জিজ্ঞেস করল।

"টার্নিং খুব স্লো...দু'হাতে জ্যাব নেই,...ইনফাইটিংয়ে আসতে চায় না।"

গোম্‌স শুধু মুচকি হাসল। সুনীল বরফজলের স্পঞ্জ শিবার ঘাড়ে গলায় ঘষতে ঘষতে বলল, "দে না শেষ করে।" গোম্‌স ঠোঁটে আঙুল রেখে সুনীলকে চুপ থাকতে ইশারা করল।

দ্বিতীয় রাউন্ডে সে শর্মার খুব কাছে ওয়ান-টু-থ্রি কম্বিনেশন পাঞ্চ মুখে চালিয়েই পিছিয়ে এল। শর্মা পায়ে পায়ে এগোচ্ছে, শিবা দড়ির দিকে সরে এল। এবার বাগে পেয়েছি ভেবে নিয়ে শর্মা বিশাল একটা ডান হাতে ক্রস শিবার মাথার দিকে চালাবার জন্য শরীরের সব ভার ডান পায়ের ওপর রেখে নিজেকে প্রায় ছুড়ে দিল। বিদ্যুৎগতিতে শিবা সরে গিয়ে শর্মাকে দড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দিয়ে পয়েন্ট তুলে নিল দুটো জ্যাব করে। তৃতীয় পাঞ্চটি দিতে যাচ্ছিল একটা আপার কাট, যেটা হয়তো নক আউট পাঞ্চই হত।

"নো ও ও ও।"

শিবা সংবিৎ ফিরে পাওয়া চোখে নিজের কর্নারের দিকে একবার তাকাল। গোম্‌স হাত তুলে রয়েছে। তার কাছাকাছি দাঁড়ানো একটি ব্যাজপরা লোকের ঠোঁটে তখন হাসি খেলে গেল এবং তারপরই ঠোঁট কামড়ে ধরল। লোকটি কান্তি।

রেফারি তুলে ধরল শিবারই হাত। তেইশ-দুই পয়েন্টে সে জিতেছে। স্টেডিয়ামের পশ্চিমদিকের এনক্লোজার থেকে তখন একটি গলা সারা এরেনায় প্রতিধ্বনিত হল, "ওস্তাই—দ।"

শিবা তাকাল। হাত তুলে নাড়ল। ননীর পাশে সে উৎপল চট্টরাজকে দেখতে পেল। আশ্চর্য ঘটক বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ভাল লড়েছিস।"

দ্বিতীয় লড়াই রেলওয়েজের মকরন্দ সুলেকরের সঙ্গে। ছিপছিপে লম্বা এই মারাঠির ঘুসি পৌঁছনোর দূরত্বটা শিবার থেকে বেশি এবং বুদ্ধিমান বক্সার। গতবারের রানার্স। ম্যানিলায়ও ভারতীয় দলে ছিল।

শিবা হুঁশিয়ার হয়েই প্রথম রাউন্ডটায় শুধু দূরে দূরে চক্কর দিল। দ্বিতীয় রাউন্ডে সুলেকর কৌশল বদলে আক্রমণে এগিয়ে এল। শিবার মনে হল, নিশ্চয় তার প্রথম দিনের লড়াইয়ের ধরন দেখেছে সুলেকরের কোচ। তাই কায়দাটা বদল করল। তাকেও এবার বদলাতে হবে, চমকে দিতে হবে। সেও পালটা তেড়ে গেল।

সুলেকরের মুখোমুখি হয়ে দু'হাত বৃত্তের মধ্যে ঢুকে এসে পর পর জ্যাব এবং রাইট ও লেফ্‌ট হুক করে শিবা ওকে বিস্ময়ে ফেলে দিয়েই পিছিয়ে এল। কিন্তু সে যে তারপরও আবার তেড়ে আসবে, সুলেকর সেটা বোধহয় ভাবতে পারেনি। ওকে ধাতস্থ হতে সময় না দিয়ে সে এক-দুই, এক-দুই-তিন কম্বিনেশন পাঞ্চ চালিয়ে গেল। সুলেকরের তখন আত্মরক্ষা ছাড়া আর কোনও চিন্তা ছিল না এই রাউন্ডে।

মানসিক ভারসাম্য এক মিনিটের বিরতিতেই সুলেকর গুছিয়ে নিয়ে তৃতীয় রাউন্ড শুরু করল। কেন সে নিজের বিভাগে ভারতের অন্যতম সেরা, এবার সে শিবাকে তা বুঝিয়ে দিতে শুরু করল। তবে মাথায়, পেটে, বুকে ঘুসি খেয়েও কিন্তু শিবা তার আগ্রাসী লড়াই থেকে হটল না। পঁচাত্তর ভাগ ঘুসি সে এড়িয়ে গেল শুধু তার দ্রুতগতিতে। নিজেকে ঘুসি থেকে সরিয়ে নেওয়ার এবং ঠিক জায়গায় ঘুসি পৌঁছে দেওয়ার পাল্লাদারিতে শিবা টেক্কা দিল।

শিবা জিতল আট-পাঁচ। তুমুল উল্লাসধ্বনি ছাপিয়ে শোনা গেল একটা গলা, "চালাইয়া যাও ওস্তাদ...কাইল আম্‌মো ফ্রি রিশকা চালাইমু, পয়সা নিমু না।"

উৎপল চট্টরাজ আজও হাজির। শিবা দেখল তার পাশে মিতা। সে গ্লাভ্‌স-পরা হাত দুটো জোরে জোরে নাড়ল মিতার হাতনাড়া দেখে। এই মিতাই বোম্বাইয়ে চৌপট্টিতে বলেছিল, "বক্সিং বিশ্রী, খালি ঘুসি মারা, মুখ ফাটিয়ে দেওয়া।" কিন্তু ব্যাপারটা যে শুধুই তা নয়, সেটা হয়তো আজ সে বোঝাতে পেরেছে। স্কিল, গায়ের জোর, বুদ্ধি, মার নেওয়ার ক্ষমতা...সবই তো সে আজ দেখাল।

দেখল ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌সও, মিতাকে। রাত্রে জোনাকির কোয়ার্টারে সে উৎপলকে জিজ্ঞেস করল, "আজ আপনার পাশে গ্রিন শালোয়ার-কামিজ-পরা একটা মেয়ে ছিল। চেনেন তাকে?"

"চিনব না কেন! ও তো আমার শ্যালি, মিতা, পারমিতা!"

"ফাইনালের দিন ও যেন শিবার বাউট দেখতে আসে, কাইন্ডলি আপনি কি সেটা দেখবেন?...আই উইল টেক নো চান্সেস। মিস্টার চট্টরাজ, অ্যাড্রিনালিন বলে একটা রস বডিতে তৈরি হয় যদি ইমোশনালি কেউ এক্সাইটেড হয়। এই রসটা এক্সট্রা পাওয়ার দেয়, রোখ বাড়ায়, পুশ করে অলআউট যাওয়ার জন্য। ফাইনালে ওটা আমার দরকার।...সেদিন নিতুকে আসতে হবে, একজন টিচারকে শিবা রেসপেক্ট করে, ননীকে বলে তাকেও আনাব। রিংয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত ওর মেন্টাল বিল্ট আপে কোনও গলদ আমি রাখতে চাই না। চার্জড হয়ে রিংয়ে উঠবে ইমোশনটা সঙ্গে নিয়ে। আর সেটাই...।"

"সেটাই বা কী?"

"শিবার ফিরে আসা...আমারও কামব্যাক, উইথা ব্যাং...আ নক আউট আই ওয়ান্ট ফর দ্য রেজারেক্‌শন।"

সব ওয়েট বিভাগের মধ্যে শুধু মিড্‌ল ওয়েটের ফাইনালেই বাংলার একজন। হঠাৎ যেন হুঁশ ফিরল কলকাতার। দর্শক পাঁচ হাজার ছাপিয়ে গেছে।

ড্রেসিংরুম থেকে শিবা বেরোতেই যে পারছে তার পিঠ চাপড়াচ্ছে। প্রত্যেকের মুখে একটাই কথা: জিততে হবে। বাংলার মান রাখতে হবে।

আশ্চর্য ঘটক শুধু বলল, "তুই জিতলে বক্সিংয়ের দিকে বাঙালিরা তবু একটু তাকাবে।"

ফ্র্যাঙ্ক গোম্‌সই শুধু অনুত্তেজিত। মুখে সামান্য হাসিও লেগে আছে।

কান্তি সরকার খুবই ব্যস্ত। সার্ভিসেসের ড্রেসিংরুমে বারবার যাতায়াত করছে

তত্ত্বাবধানের কাজে। শিবাকে রিংয়ের দিকে যেতে দেখে সে ছুটে এল। ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "সাবধান, তোকে ফার্স্ট রাউন্ডেই নক আউট পাঞ্চ মারার প্ল্যান করেছে, রঙ্গার কোচকে আমি বলতে শুনলাম!"

গোম্‌স শিবার সামনে হাঁটছিল। ঝটিতি সে ঘুরে রাগি চোখে কান্তির দিকে তাকাল। কান্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং দু'পা পিছোল।

"ওর কথাগুলো মাথা থেকে বার করে দাও...খুব হার্মফুল এখন এসব কথা...কনসেনট্রেট!" গোম্‌স কথাগুলো বলল যখন শিবা কাঠের সিড়ি দিয়ে রিংয়ে উঠছিল।

প্রথমেই একটা বিশাল চিৎকারে তাকে অভ্যর্থনা জানাল দর্শকরা। প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে বোম্বাইয়ে ব্রেবোর্নের মতোই লাগল শিবার কানে। হঠাৎ একটা নাড়া পড়ল তার মাথার মধ্যে। সেদিনও ছিল ফাইনাল!...রোজারিওর কাছে সে হেরেছিল...ছেলের সামনে 'বীর' হওয়ার জন্য বুড়ো বক্সার লড়েছিল।

"ওস্তাইদ, এধারে তাকা...আমরা আইসাচি।"

শিবার গ্লাভ্‌সের ফিতেটা আর-একবার শক্ত করে বেঁধে দিচ্ছিল সুনীল। মুখ ঘুরিয়ে শিবা তাকাল। দেখতে পেল ননীকে। তার পাশে শক্তি দাস আর তার বউ সাগরমামি,...টাক, চশমা ভবানীসার।...উৎপল...টকটকে শাড়িপরা মিতা! তার দিদি, কোলে টুটুও!...শচীনকাকু!...দুর্লভ চক্রবর্তী, গ্যারাজ তা হলে বন্ধ রেখেছে!...দাদা কই?...ওই তো, সবাই হাত নাড়ছে, দাদা নাড়ছে না।

শিবা হাসল। দাদার স্বভাবটা সে জানে। ধীর, ঠাণ্ডা, সহজে বিচলিত হয় না। এই মুহূর্তেও হচ্ছে না।

রঙ্গরাজন রিংয়ে উঠল। হাততালি পড়ল। দু'হাত তুলে মাথা ঝুঁকিয়ে সে অভিবাদন জানাল। তার কর্নারে কয়েকজনের সঙ্গে কান্তিও রয়েছে।

রিংয়ের মাঝে দু'জনকে ডেকে রেফারি যখন বাঁধা গত আউড়ে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল, রঙ্গা তখন ঠাণ্ডা চোখে শিবার মুখের দিকে তাকিয়ে। খুনির মতো চাহনি। শিবার বুকের মধ্যে সিরসির করে উঠল। এইটেই হচ্ছে পরস্পরের বুকের পাটা মেপে নেওয়ার, অন্যের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার মুহূর্ত। সার বলে দিয়েছে, খবরদার, চোখ সরাবে না, পালটা তুমিও চোখ রাঙাবে।...শিবার চোখ জ্বলে উঠল।

ঘণ্টা পড়ল।

দু'জনে পরস্পরের দিকে দ্রুত এগিয়ে এসেই পাঁচ হাত ব্যবধান রেখে থমকে গেল। দু'জনেই কয়েক পা পিছোল। তারপর শিবা আবার এগোল। রঙ্গাও এগিয়ে এল। এবার দু'জনে চক্কর দিয়ে ঘুরতে লাগল। মুখের কাছে গ্লাভ্‌স, এগোব এগোব ভাব দেখিয়ে, শিবা কুঁজো হয়ে দুলছে। রঙ্গার একটা সোজা ঘুসি শিবার মুখে পৌঁছবার আগেই সে মাথা সরিয়ে পালটা একটা সোজা বিদ্যুৎগতিতে বসিয়ে দিল রঙ্গার কপালের মাঝখানে। চিৎকার উঠল দর্শকদের, শিবা প্রথম ঘুসিটা মেরেছে।

রঙ্গা নাড়া খেয়ে তেতে উঠল। শিবার কাছে পৌঁছে কম্বিনেশন মারতে গিয়ে হাত আটকে গেল শিবার হাতে। রঙ্গা বাঁ হাতে শিবার গলা জড়িয়ে চাপ দিয়ে মাথাটা হেঁট

করিয়ে ডান হাতে ছোট দু-তিনটে আপার কাট মুখে-কপালে মারল। রেফারি এসে ওদের ছাড়িয়ে দিল। তারপর আবার দূরত্ব রেখে চক্কর দিতে দিতে হঠাৎ এগিয়ে আসার ভান দু'জনেই করতে লাগল। যেন দু'জনের হাতেই বন্দুক, কে প্রথম গুলিটা ছুড়বে! ছুড়ে যদি ফসকায় তা হলে অন্যজন শেষ করে দেবে। যদি ঘুসি ছুড়ে না লাগাতে পারো আর অন্যজন যদি তৈরি থাকে, তা হলে ঘুসি খেতে হবেই।

এই সময়ই শিবার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। বাঁ হাতের গ্লাভ্স দিয়ে সে চোখ রগড়াল।...কয়েক সেকেন্ড পর জ্বলুনিটা বাড়ল। আবার সে গ্লাভ্স দিয়ে চোখ রগড়াল। তার মনে হল চোখের পাতা ফুলে উঠে ঢেকে দিচ্ছে তার দৃষ্টি।

রঙ্গা এগিয়ে আসছে। পর পর দুটো জ্যাব শিবার মুখে পড়ল। বাহুর ওপর আর বুকে আরও দুটো। টলে গিয়ে শিবা পেছনে হটে গেল...তার চোখ জ্বলছে, পাতা দুটো ভারী লাগছে...তার হাত চলছে কিন্তু রঙ্গার শরীরে লাগছে না।

কী হল চোখে! শিবা ভারী হয়ে যাওয়া চোখ টানটান করে দেখতে পেল রঙ্গা যেন অবাক হয়ে লক্ষ করল তার অবস্থাটা। তার চোখেও বিভ্রান্তি। সেটা কাটিয়ে উঠেই সে শিবার দিকে এগোল এবং এক-দুই কম্বিনেশনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড একটা লেফট হুকে শিবার মুখ ঘুরিয়ে দিল।

শিবা প্রথমে আছড়ে পড়ল দড়ির ওপর। দু'হাতে দড়ি ধরা অবস্থাতেই ধীরে ধীরে ক্যানভাসের দিকে নামতে লাগল তার দেহ। সারা স্টেডিয়াম স্তব্ধ, বিমূঢ়। এখন তার কানে এল:

"ওস্তাইদ...এ কী অইল!"

ক্যানভাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেফারির গোনা শুরু হল, "ওয়ান...টু..."

"শিবা রে..." মেয়েগলায় একটা ফোঁপানি উঠল।

রোজারিও...তুমি উঠেছিলে, তা হলে আমিও পারব না কেন?

"সিক্স...সেভেন..."

বহু দূর থেকে ক্ষীণ কচি গলায় কে যেন বলছে 'পাপ্পা, গেট...আপ।' শিবা মুখ তুলে দেখল রঙ্গা তার কর্নারে দাঁড়িয়ে, তার পায়ের কাছে রিংয়ের বাইরে কয়েকটি মুখ, তার মধ্যে রয়েছে কান্তিও।

"শিবা উঠে পড়।"

দাদার গলা। রাগি, বিরক্ত স্বর। ভোরে সবার আগে ঘুম থেকে উঠে সে ধাক্কা দিয়ে বলে...

শিবা উঠে দাঁড়াল। ঘণ্টা পড়ল রাউন্ড শেষের।

দড়ি গলে রিংয়ে উঠে এল গোম্স, সুনীল অনিমেষ।

"কী হয়েছে চোখে?" শিবাকে টুলে বসিয়ে দিয়ে উদ্বিগ্ন গোম্স জানতে চাইল।

"জানি না সার। কীরকম জ্বালা করছে, চোখ মেলে তাকাতে পারছি না।" অসহায় কাতর স্বরে শিবা বলল।

ওর দুটো চোখের পাতা তুলে গোম্স তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল। জলে ভরে

গিয়ে লাল হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। আঙুলটা বাঁ চোখের চারপাশে বুলিয়ে গোম্‌স নিজের চোখে লাগাল। চোখ কোঁচকাল।

"ইটস বার্নিং।...কোনও শয়তানি ব্যাপার আছে।" বলেই আঙুলটার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। জ্বালা করছে। "সুনীল, তুমি ওর চোখের ওপর আঙুল বোলাও তো।"

সুনীল স্পঞ্জটা অনিমেষকে দিয়ে ডান তর্জনীটা শিবার দুই ভ্রূ আর চোখের পাতায় বোলাল। জ্বালা করে উঠতেই বলল, "সার, এ বিছুটির রস!"

বারবার জলের ঝাপটা দিল সুনীল। কয়েকবার তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল চোখ আর কপাল।

"এখনও কি জ্বালা করছে?" গোম্‌স উৎকণ্ঠিত।

"করছে।"

"গো নাউ শিবা, ডান্স...রঙ্গার রিচ-এর বাইরে থেকে মুভ করো...স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম হিম।" গোম্‌স মাউথপিসটা শিবার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে ওকে তুলে দিল।

দ্বিতীয় রাউন্ড এবং অবিশ্বাস্য হল শিবা। চোখে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। রঙ্গার ঘুসির পাল্লার বাইরে থাকার জন্য সে চক্কর দিচ্ছে, দুই পা তাকে ঘূর্ণির মতো ঘোরাচ্ছে রঙ্গাকে ঘিরে। কাছাকাছি হয়ে এলে বাঁ হাতে রঙ্গাকে ঘুসি পাঠিয়েই পিছিয়ে যাচ্ছে। সারা স্টেডিয়াম তাজ্জব। শ্বাসরোধ করে তারা অপূর্ব একটা মানুষের আত্মরক্ষার লড়াই দেখে যাচ্ছে।

সে এটুকু বুঝেছে, রঙ্গাকে কাছে আসতে দেওয়া মানেই লড়াই খতম। ওর একটা জ্যাব, একটা হুক যদি আবার মুখে কি মাথায় পড়ে তা হলে সে আর দাঁড়াতে পারবে না।...ডান্স, ডান্স...স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম হিম...রঙ্গার রিচ-এর বাইরে থাকতে হবে...সবাই হাসছে, হাসুক। লড়াইয়ের ওরা কী বোঝে! ওরা জানে কি তার চোখের অবস্থা?

রঙ্গা এগিয়ে এসে শিবাকে দড়ির ধারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। চোখের পাতা টেনে তুলে রেখে শিবা শুধু একটা কালো আবছা আকাররূপে রঙ্গাকে দেখছে। জলে ভাসা চাহনির মধ্য দিয়ে সে দু'জনের মধ্যের দূরত্বটা হিসেব করে জলপোকার মতো সরে সরে যাচ্ছে। রঙ্গার মন্থর স্টাইল কিছুতেই ওকে বাগে আনতে পারছে না, যদি বা সে কাছে পৌঁছচ্ছে, শিবার বাঁ হাতের জ্যাব তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার সময় আদায় করে নিচ্ছে।

এবার হতাশ আর বিরক্ত হয়ে উঠল রঙ্গা। সে শুনেছে শিবাজি একজন বিপজ্জনক ফাইটার। তাকে বলা হয়েছিল এবং স্বচক্ষে এখানে দেখেছেও—পাঞ্চ করে অসম্ভব ফাস্ট...দুর্দান্ত ওয়ান-টু কম্বিনেশন, জ্যাবের সঙ্গে-সঙ্গে মারাত্মক স্ট্রেট লেফট...আর ওই ফুটওয়ার্ক, স্পিড...কিন্তু এরকম এক ফাইটার পালিয়ে পালিয়ে লড়বে, রঙ্গা তা ভাবেনি। ওর চোখ দেখে তার মনে হচ্ছে, কিছু একটা হয়েছে! চোখ পিটপিট করেই জোর করে পাতা খুলে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রঙ্গার মনে হল, শিবাজি যেন ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না।

তা হলে এখনই তো মার দেওয়ার সুযোগ। কিন্তু শিবা এমন ক্ষিপ্রতায় তার পাঞ্চগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে যে,তাকে সুযোগ দিতে

দিচ্ছে না। রেগে উঠে রঙ্গা দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ডান হাত তুলে শিবাকে দেখাল। ভাবখানা—দেখছেন তো, এর সঙ্গে কী লড়ব!

গ্যালারিতে দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল উঠল। রঙ্গা একবার ভ্যাংচাবার জন্য শিবার ফুটওয়ার্ক নকল করে দেখাল এবং এগিয়ে গিয়ে একটা সুইং ডান হাতে, আর বাঁ হাতে সোজা একটা। দুটোই সে ফসকাল। আবার সে এগোল, তবে হতাশভাবে এবং দুটো হাত নামিয়ে। এই প্রথম সে কনসেনট্রেশন নষ্ট করল। হুঁশিয়ার থাকার চেষ্টা না করে, মুখের সামনে প্রহরীর মতো সজাগ দুই হাতের মুঠি তুলে না রেখে দেখাতে চাইল, সে শিবাকে ধর্তব্যের বাইরে গণ্য করছে। প্রতিপক্ষকে উপহাসের পাত্র বানাতে গিয়ে সে নিজেকে ঢিলে করে দিল।

চোখের পাতা টান করে তুলে শিবা শুধু দেখতে পেল রঙ্গা তার থেকে ফুটপাঁচেক দূরে এসে গেছে, মুখের গার্ড নামানো!

তখনই বুকের মধ্যে কে যেন বিশাল চিৎকার করে বলে উঠল, "বহু পয়েন্টে হেরে তো গেছিসই...শিবা এই তোর শেষ সুযোগ—মার।"

রঙ্গা পিছিয়ে যাওয়ার বা হাত দুটো মুখের সামনে তোলারও সময় পেল না। রেফারি পরে বলেছিলেন, তিনি ঠিকমতো দেখে উঠতে পারেননি শিবার লেফ্‌ট হুকটাকে। এত সুইফ্‌ট, এক পা এগিয়ে এসে, এত ফাস্ট পাঞ্চ তিনি কখনও দেখেননি।

মুখের থেকে সামান্য তাচ্ছিল্যের রেশটুকু মুছে নেওয়ার সময়ও রঙ্গা পায়নি। 'মার', এই নির্দেশটা মাথা থেকে শিবার হাতে পৌঁছনো এবং নির্দেশ অনুযায়ী কাজটা এমন গতিতে ঘটল, যেটা রকেটের গতি মাপার যন্ত্রে ছাড়া ধরা সম্ভব নয়। কথাটায় বাড়াবাড়ি রয়েছে, কিন্তু শিবার এই ঘুসিটাও তো তাই-ই। সে তার সারা দেহ নিংড়ে ক্ষমতার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত বার করে লেফ্‌ট হুকটা চালিয়েছিল। আকাশে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল এবং তিন-চার সেকেন্ড পর রঙ্গা ক্যানভাসে পড়ল বজ্রাহতের মতো।

রেফারির দশ গোনার পরও সে ওঠেনি।

"শিবাজি যখন ঘুসিটা মারলে তখন তুমি কী ভাবছিলে?"

"শিবাজি, এই মুহূর্তে তোমার কেমন লাগছে?"

"শিবাজি, কত বছর বয়স থেকে বক্সিং করছ? কেন তুমি বক্সিংয়ে এলে?"

"কার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছ?"

"তোমার বাড়িতে কে কে আছেন? তুমি কতদূর পড়াশোনা করেছ? এখনও কি লেখাপড়া করো?"

"ড্রেসিংরুমে হতভম্ব চোখে শিবা প্রশ্নকর্তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে। ওরা সাংবাদিক। শিবার গলায় ঝুলছে তিনরঙা রিবনে বাঁধা একটা মেডেল।

"অ্যাত কথা আর অহন জিগাইবেন না, অর অহন একা থাকন দরকার।" উদ্বিগ্ন অভিভাবকের উৎকণ্ঠা ননীর গলায়। কীভাবে যেন ম্যানেজ করে সে ড্রেসিংরুমে ঢুকে

পড়েছে। "যা জিগাইবার আমারে জিগান, সব হিসটিরি আমি কইয়া দিমু...তয় আইজ নয়, সময় কইরা রিশকা স্ট্যান্ডে একদিন আসেন...শিবা উঠ উঠ, তরে লইয়া যাইবার জইন্য হগ্গলে গেটে খাড়ায়ে আচে।"

তখন মাঝরাত্রি। ননীর রিকশাটা পূর্বপল্লিকে চতুর্থবার চক্কর দিয়ে দেবদাস পাঠক রোড, বি.টি. রোড দিয়ে মিলনপল্লিতে সাধুর বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে আবার ফিরে আসছে। এই রিকশা চালাচ্ছে শিবা, পিছনের সিটে বসে ননী।

"পাগলের মতো চোখ কইর‍্যা সাধু কইতাচিল, শিবা ঘুসিটা তো রঙ্গারে মারে নাই, আমারেই আর একবার মাইরলঅ।...অর বহু টাহা নাকি লোকসান অইচে।...জনে জনে খোঁজ লইত্যাচিল কান্তিরে দ্যাখচ? কান্তিরে দ্যাখচ?"

মাথা নিচু করে ধীর গতিতে শিবা প্যাডেল করে যেতে লাগল। কোনও মন্তব্য করল না।

"হ্যা রে শিবা, কাগজের লোকগুলান আইব তো?"

"জানি না, আমি তো ফুটবল-ক্রিকেট খেলি না।"

একটু পরে সে বলল, "যদি আসে, তা হলে তুই কী বলবি?"

"পরথমে কইমু, আমার এই পা দুইডা দ্যাহেন, ভাল কইর‍্যা দ্যাহেন। এই দিয়া চাইর বচ্চর আগে একদিন শিবারে আমি লাথ্‌থি মাইরছিলাম। পা দুইডারে শিবা ভাইঙা দিতে পারত...দেয় নাই।" বলার সঙ্গে সঙ্গে ননী তার দুই পা শিবার কাঁধের ওপর তুলে দিল।

"এবার যদি পা দুটো ভেঙে দিই!"

"ভাঙ, ভাঙ...আমার সারা শরিলের হারগোর তুই ভাইঙা দে। আমার মইদ্যে অহন কী যে হইত্যাচে তরে আমি বোঝাইতে পারুম না।"

মধ্যরাত্রে, নির্জন পথে, রিকশায় বসে ননীর চোখ দিয়ে টপটপ জল পড়তে লাগল। শিবা রিকশা চালানো বন্ধ করে পেছনে তাকাল।

"শেষ কবে আমি কেঁদেছি জানিস? হাসপাতালে যখন তোদের সবাইকে আমার বেডের পাশে দেখলুম। মনে হল আমি যেন আবার জন্মাচ্ছি। তখন মনে মনে বলেছিলুম, আমি ফিরব, আবার রিংয়ে উঠব।"

শিবার ঘাড় থেকে ননী পা নামাল। দু'জনের যেন বলার মতো আর কথা নেই, তারা চুপ করে বসে থাকল। একসময় ননী বলল, "তর নবজনম অইল।"

"হ্যাঁ।"

"তাইলে কানতাচস না ক্যান? মায়ের প্যাট থেকে পইড়াই তো বাচ্চারা—"

হঠাৎ দু'হাত তুলে শূন্যে ঘুসি ছুড়ে, বিশাল অট্টহাসিতে নিশুত রাতে শূন্য পথ, জনবসতি এবং অন্ধকার ভরিয়ে দিয়ে শিবা হেসে উঠল, তারপর রিকশা থেকে নেমে এসে ছুটতে শুরু করল।

সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল রিকশাটা তার পেছনে বনবনিয়ে ধাওয়া করল।

তুলসী



এই কাহিনীতে বলা হয়েছে দুটি মানুষের কথা। তাঁদের একজন পুরুষ ও অন্যজন মেয়ে। পুরুষটির বয়স ষাটের কাছাকাছি। মেয়েটির বয়স প্রায় কুড়ি।

প্রথমে পুরুষটির কথা বলি। ওঁর দৈহিক উচ্চতা পাঁচ ফুট। দেহের পেশিগুলো একটু ভারী। ঘাড় ও গলা ছোট হওয়ায় তাঁকে ঘাড়ে-গর্দানে দেখায়। মনে হয় অল্প বয়সে ব্যায়াম করেছেন এবং হয়তো এখনও চর্চাটা রেখেছেন। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। চোখে পড়ার মতো বিশেষ কিছুই ওঁর চেহারায় নেই, শুধু উচ্চতাটুকু ছাড়া। তবে বেঁটে মানুষ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ আছে, সুতরাং এটা কোনও বিশেষত্ব হিসেবে গণ্য হতে পারে না। ওঁর যে মসৃণ টাকটি, সেটাও বহু লক্ষ লোকের মাথায় দেখা যায়। তবে মাথার খুলির গড়ন গোলাকার হওয়ায় টাকটি দু'নম্বর ফুটবলের কথা মনে পড়ায়।

এই লোকটির বিশেষত্ব বলে যদি কিছু থাকে তা হলে সেটি হল, ওঁর হাঁটা। হাঁটেন অতি দ্রুত। সাধারণ মানুষ জগ্ করে যে গতিতে, ইনি হাঁটেন সেই গতিতে। ওঁর উচ্চতার সঙ্গে হাঁটার বেগ, দুটো মিলিয়ে দাঁড়ায় একটা বেমানান দৃশ্য। যেটা হাসি পাইয়ে দেওয়ার জন্য খুবই কার্যকর হয়। যারা ওঁকে প্রথম দেখে, তারা আড়ালে হাসাহাসি করে। তবে প্রতিদিন দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা আর হাসে না।

কিন্তু বাজারের কাছের রামপ্রসাদ কলেজ হস্টেলের কোনও কোনও ছেলের হাসির ইচ্ছেটা একটু বেশিই। সকালে বাজার করে থলি হাতে ফেরার সময় যখন তিনি হস্টেলের কাছাকাছি হন, তখন দোতলার বারান্দা থেকে ইদানীং কে একজন মাঝেমধ্যে সুর করে গেয়ে ওঠে:

মাথার উর্ধ্বে আছে মাদল
নিম্নে উতল পদযুগল
গড়গড়িয়ে চলিছে বল।
চল চল চল॥

শেষের 'চল চল চল'-এর সময় আরও দুটো গলা যোগ দেয়। গানের সঙ্গে টিনের কৌটোয় দুটো কাঠি দিয়ে ড্রাম বাজানোর শব্দ হয়। গায়ক ও বাদককে রাস্তা থেকে দেখা যায় না। আমাদের এই লোকটির নাম বলরাম গড়গড়ি। যেভাবেই হোক হস্টেলের ছেলেরা নামটা জোগাড় করে ফেলেছে।

প্রথমদিকে বলরাম গানটিকে আমলই দিতেন না। ছেলেপুলেরা নতুন কোনও গণসঙ্গীত চর্চা করছে ধরে নিয়ে আপন মনে তিনি হস্টেলের সামনে দিয়ে চলে যেতেন। একদিন তাঁর প্রতিবেশী পান্নালাল বাজার করে ফেরার সময় তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলল, "শুনেছেন বলুদা, ছেলেরা কেমন প্যারডি বেঁধেছে আপনাকে নিয়ে।"

"আমাকে নিয়ে। কই, শুনিনি তো!" বলরাম খুব অবাক হয়েই বলেন, "কেন, কী জন্য?"

"শুনুন ভাল করে, তা হলেই বুঝবেন।" পান্নালাল মুখ টিপে হেসে চলে যায়।

বলরাম হস্টেলের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই গানটা শুরু হয়ে গেল। দু'বার শোনার পর তিনি গম্ভীর হয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন। ঊর্ধ্বে মাথায় বাজা মাদলটি যে তাঁরই টাক, এবং গড়গড়িয়ে যাওয়া বলটি যে বলরাম গড়গড়ি, এটা বোঝার মতো বুদ্ধি তাঁর আছে। ক্লাস এইট পর্যন্ত বিদ্যের পানু অর্থাৎ পান্নালাল যখন বুঝতে পেরেছে, তখন তাঁর মতো বাংলায় অনার্স গ্র্যাজুয়েটের না বুঝতে পারার মতো কঠিন ব্যাপার তো এটা নয়। অনার্সে নজরুলের কবিতা তাঁকে পড়তে হয়েছে।

প্রথমেই বলরামের মাথা গরম হয়ে উঠল। ভাবলেন হস্টেলে ঢুকে ছেলেগুলোকে কান ধরে ওঠবোস করাবেন। তারপর মনে হল, এই বয়সে উঠতি জোয়ানদের কান ধরা তাঁর পক্ষে কি সম্ভব হবে? গায়ে ততটা জোর নিশ্চয়ই নেই। আগে নিজের শক্তি যাচাই করে তবেই কান ধরার মতো কাজে নামা উচিত।

কী ভাবে গায়ের জোর যাচাই করা যায়। বলরাম খুবই ফাঁপরে পড়ে গেলেন। তিনি চাকরি করেন বিধাননগরে সরকারি অফিসে। বিদ্যানগর থেকে, যদি ঠিকমতো ট্রেন চলে তা হলে আধঘণ্টা ট্রেনে কাটিয়ে নামেন বিধাননগর স্টেশনে। সেখান থেকে বাসে অফিসে। তাঁর সহকর্মী মনোজ সামন্ত খুবই বিজ্ঞ লোক। বলরাম তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন, "সামন্ত বলতে পারো, গায়ের জোর পরীক্ষার উপায় কী?"

মনোজ সামন্তর এরকম প্রশ্ন শুনে অবাক হওয়ারই কথা, কিন্তু তিনি হলেন না। শুধু বললেন, "কোনও ভারতশ্রী'র সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে বসুন।"

"তাতে তো হেরে যাব।" বলরামকে হতাশ দেখাল।

"তা তো হারবেনই, কিন্তু কতক্ষণে হারবেন সেটা দিয়ে পরিমাপ হবে আপনার গায়ে কতটা জোর রয়েছে।"

"ধরুন এক সেকেন্ডে হারলাম।"

"গড়পড়তা সবাই ওই এক সেকেন্ডেই হারবে। সুতরাং আপনার গায়ের জোরও ওই গড়পড়তা সবার মতোই ধরে নেবেন।"

"এটা তুমি কী বললে!" বলরাম অখুশি হলেন। "এইভাবে পাঞ্জা লড়ে কি শক্তি মাপা যায়?"

"তা হলে কীভাবে মাপতে চান? আর মাপতে চাওয়ার উদ্দেশ্যটাই বা কী?"

বলরাম একটু বিব্রত হলেন। উদ্দেশ্য তো ক'টা ছেলেকে কান ধরে ওঠবোস করানো। কিন্তু কেন করাতে চান, সেটা কি সামন্তকে বলা ঠিক হবে?

তবে ঘুরিয়ে অন্যভাবে অবশ্য ব্যাপারটা বলা যায়। এই ভেবে বলরাম বললেন,

"আমাদের বিদ্যানগরে একটা কলেজ হস্টেল আছে, সেখানে কিছু অ্যান্টিসোশ্যাল ছেলে ঢুকেছে। ওদের জন্য লোকজন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারে না।"

"কেন পারে না?"

"নানারকম কথাবার্তা বলে, ফিল্মের গান গায়, রাস্তার মাঝে অসভ্যতা করে।"

"হস্টেল সুপারকে গিয়ে বলুন। তিনি কিছু না করলে থানায় গিয়ে বলুন।" মনোজ সামন্ত ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বললেন, "আপনি কি এজন্য মারপিট করবেন?"

"মারপিট! কে বলল?" বলরাম সচকিত হয়ে উঠলেন।

"তা হলে গায়ের জোর পরীক্ষা করে দেখতে চান কেন? গড়গড়িদা সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার ছেলেছোকরাদের সঙ্গে লাগতে যাবেন না। একটা টিঙটিঙে ছোকরা দূর থেকে যদি বোমা ছোড়ে কি পাইপগান চালায় তা হলে কী করবেন? গায়ের জোরের দিন আর নেই, সুতরাং—" মনোজ সামন্ত একটা মোটা ফাইলের ফিতে খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

বলরাম তাকিয়ে রইলেন সামন্তর দিকে। 'সুতরাং' বলে থেমে গেল কেন? আড়চোখে বলরামের মুখ দেখে নিয়ে সামন্ত আবার বললেন, "বুড়োবয়সে গায়ের জোর পরীক্ষা করে লাভ কী?"

"বুড়োবয়স মানে? আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি?" বলরাম অবাক হয়ে সামন্তকে যেন চ্যালেঞ্জ জানালেন।

চোখ কুঁচকে মনোজ সামন্ত সেকেন্ড দশেক বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মুচকি হেসে বললেন, "না, বুড়ো হননি, ছোকরাই আছেন। বয়স কত হল?"

সেইদিন বিকেলে ট্রেন ধরার জন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বলরামের মনে হল, সামন্ত বোধ হয় ঠিক কথাই বলেছে। বুড়োবয়সে কেউ কি গায়ের জোর পরীক্ষা করে? কিন্তু একটা কথা তাঁর মনে কাঁটার মতো খচখচ শুরু করল। বিদ্রূপ করেই অবশ্য সামন্ত বলল, 'ছোকরাই আছেন'—কিন্তু থাকব নাই-বা কেন?

এই 'থাকব নাই-বা কেন' কথাটা বলরামের মাথার মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গেল যে তিনি ট্রেনে উঠে মনে করতে শুরু করলেন তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে ছোকরা বয়সে কী কী করতেন। তিনি ফুটবল-ক্রিকেট খেলেননি। কবাডিও নয়। কোনও দলগত খেলার দলে ঢুকতে পারতেন না শুধু এই দৈহিক উচ্চতার জন্য, তাই ওইসব খেলার দিকে যাননি। যে খেলা একা খেলা যায় এবং নিখরচায়, তিনি সেই খেলার দিকেই ঝোঁকেন।

তিনি গঙ্গায় সাঁতার কাটতেন। হাটখোলায় তাঁদের ভাড়াবাড়ি থেকে আহিরিটোলা লঞ্চ ঘাট ছিল মিনিট তিনেকের পথ। সেখানে বেলা এগারোটা নাগাদ তাঁরা জনা সাত-আট ছেলে সাঁতার কাটতে যেতেন। ওপারে সালকিয়ার বাঁধাঘাটগামী ফেরি লঞ্চে উঠে মাঝগঙ্গা পর্যন্ত গিয়ে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়তেন জলে, সাঁতরে ফিরে আসতেন আহিরিটোলা ঘাটে। বলরাম পিছিয়ে পড়তেন না, কিন্তু সবার আগেও থাকতেন না। মাঝারি ধরনের সাঁতারু ছিলেন। পরপর তিন বছর তিনি বালি ব্রিজ

থেকে আহিরিটোলা ঘাট পর্যন্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। শেষবারে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন একত্রিশজনের মধ্যে। যে কাপটা পান সেটা ছিল আসল রুপোর। ছোটকাকা স্যাকরার দোকানে দাম যাচাই করে এসে বলেছিলেন, "কম করে দেড়শো টাকা তো হবেই।"

কাপটা এখন আর নেই। বিদ্যানগরে জমি কিনে, কোনওরকমে একটা দু'ঘরের বাড়ি তৈরি করে হাটখোলা থেকে দশ বছর আগে উঠে আসার সময় কাপটা হারিয়ে যায়। ট্রেনের কামরায় গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে চিঁড়েচ্যাপটা অবস্থাতেই বলরাম তাঁর হারানো কাপের কথা ভাবলেন।

মুঠোয় ধরার জন্য ঝোলানো হাতলগুলোয় বলরামের হাত পৌঁছয় না। তাই তিনি চেষ্টা করেন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু সবদিন এই সুবিধেটা তিনি পান না, যেমন আজও পাননি। এক একটা স্টেশন এলে হুড়মুড়িয়ে ট্রেনে ওঠার যাত্রীরা কামরার মধ্যে যে ধাক্কা তৈরি করে, তাতে বলরাম সিধে হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। তখন শরীর বেঁকে যায় এবং বাঁকানো শরীরটাকে সিধে করার জন্য দু'পায়ে চাপ দিয়ে পিঠ, কোমর ও কাঁধের পেশি শক্ত করে নিজেকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে হয়। বলরামকে আজও তাই করতে হল। এবং এই কথার মধ্যেই তাঁর মনে হল, এটা কি গায়ের জোরের একটা পরীক্ষা নয়। রোজই তো এই পরীক্ষাটা দিচ্ছি আর পাশও করছি, তা হলে কি এটাকে 'ছোকরা' থাকা বলা যেতে পারে না?

বিদ্যানগরের আগের স্টেশন ঠাকুরপাড়ায় ট্রেন পৌঁছবার আগেই বিদ্যানগরে নামার যাত্রীরা দরজার দিকে এগোতে থাকে। ট্রেন থামলেই হুড়মুড়িয়ে নামতে হবে, নয়তো দুড়দাড়িয়ে ওঠা বিপরীত স্রোতের বিরুদ্ধে ট্রেন থেকে নামাটা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে যায়। বলরাম আজ চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কাজটা ভুলে গেলেন। যখন খেয়াল হল তখন কয়েক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেছে। মরিয়া হয়ে তিনি দরজা দিয়ে ঢোকা যাত্রী-স্রোতের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু করলেন। তখন কে যেন তাঁর মাথায় একটা চাঁটি দিল। ট্রেনের বাইরে সবে পা রাখতে যাবেন তখন কাঁধে একটা জোর ঠেলা খেয়ে প্ল্যাটফর্মে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গড়াগড়ি গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াচ্ছেন, তখন আর একটা ধাক্কায় আবার পড়োপড়ো হয়ে তিনি পেছন থেকে দু'হাতে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন যাকে, সে একটি মেয়ে।

হলুদ শালোয়ার ও খয়েরি-সবুজ নকশার কামিজ পরা মেয়েটি চমকে ঘুরে দাঁড়াল। একজন বয়স্ক লোককে কাঁচুমাচু হয়ে হাতজোড় করতে দেখে সে সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাসি ফুটিয়ে, বলরামকে আশ্বস্ত করে ভিড়ের সঙ্গে চলতে শুরু করে দিল। ট্রেন থেকে নামা লোকের প্ল্যাটফর্মে পড়ে যাওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। কেউ ফিরে তাকায় না। কিন্তু বলরামের জীবনে এটা প্রথমবার ঘটল। তিনি লজ্জিতভাবে দুপাশে তাকালেন এবং দেখলেন রামপ্রসাদ হস্টেলের দুটি ছেলে, তাদের হাতে ধরা প্লেটে ঘুগনি এবং তারা খাওয়া ভুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের চাউনির মধ্য দিয়ে যে খবরটা বলরাম পড়তে পারলেন, তাতে তাঁর বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। হয়তো আবার শুরু হবে, 'গড়গড়িয়ে চলিছে বল'।

প্ল্যাটফর্মে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'ছোকরা থাকা'র পক্ষে যেসব যুক্তি খাড়া করেছিলেন সেগুলো তো চুরমার হয়েই গেছিল। এখন ছেলে দুটি ব্যাপারটাকে হস্টেলে কীভাবে চাউর করবে সেটাই বলরামকে অস্বস্তির মধ্যে রাখল।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে চার জোড়া রেললাইন পার হয়ে স্টেশনের পুবদিকে এসে বলরাম কলা কেনার জন্য দাঁড়ালেন। তখন দেখলেন সামনের 'মা তারা সাইকেল গ্যারেজ' থেকে সাইকেল নিয়ে সেই মেয়েটি বেরিয়ে এল। সাইকেলটি মেয়েদের জন্য নয়। কলাওয়ালার পাশেই শশাওয়ালা। মেয়েটি শশা কেনার জন্য বলরামের পাশে দাঁড়াল এবং তার দিকে তাকিয়ে সহানুভূতি জানাবার মতো করে হাসল।

"তুমি কিছু মনে করোনি তো, মা?" বলরামের স্বরে ক্ষমাপ্রার্থনার সুর।

তাঁর মনে হয়েছে মেয়েটি বিবেচক এবং বোধ-বুদ্ধিটাও আছে। হালকা টাইপের নয়। সারা মুখ ক্লান্তিতে শুকনো, দুই গাল বসে গিয়েছে। ছিপছিপে লম্বা, কিন্তু দৃঢ় শরীর। শরীর ঘিরে কঠিন জীবনের ছাপ। কোনও প্রসাধন নেই, গহনা বলতে শুধু কানে নকল দুটি সাদা পাথরের ফুল আর হাতে রিস্টওয়াচ। মেয়েটির রং, বোঝা যায় একসময় গৌরই ছিল, এখন রোদে পোড়া, তামাটে। ওর বগলে যে ব্যাগটা, দেখতে চামড়ার মতো হলেও ওটা কমদামি নকল চামড়ার। হাতে ধরা সাইকেলটা খুবই পুরনো, কেরিয়ারে পাকিয়ে রাখা আছে একটা বাজারের থলি।

কাহিনীর শুরুতে যে পুরুষ ও মেয়েটির কথা বলা হয়েছে সেই পুরুষটি বলরাম গড়গড়ি, আর মেয়েটি হল—এখন তিনি যাকে বললেন, "কিছু মনে করোনি তো, মা?"

"না, না, এতে মনে করার কী আছে।" নম্র স্বরে সে আশ্বস্ত করল বলরামকে। "একজন মানুষ পড়ে যাচ্ছিলেন, তিনি অন্য একজন মানুষকে ধরে সেটা সামলালেন, এটাই তো স্বাভাবিক...ওই শশাটা, ওইটে, ওইটে, ছাড়িয়ে দিন।" শশাওয়ালাকে নির্দেশ দিয়ে মেয়েটি মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে বলল, "মেসোমশাই, আপনি একটা খাবেন?"

"না, না, তুমি খাও। বড্ড পেট ভার করে। আমি এই সময় কিছু খাই না।"

"পেট ভরিয়ে রাখে বলেই তো খাই। বড্ড খিদে পায় এই সময়টায়।" বলেই মেয়েটি হেসে উঠল। বলরাম দেখলেন দাঁতগুলো ঝকঝকে কিন্তু অসমান, আর গলার স্বরটি সুমিষ্ট নয় অর্থাৎ কম মেয়েলি।

"আমি কলা কিনব, তুমি একটা খাবে?"

"খাব।"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। বলরাম খুব খুশি হলেন। মেয়েটির মধ্যে ভান নেই। এমন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভাল লাগে।

লম্বা চার ফালি করা খোসা ছাড়ানো শশাটায় নুন ঢুকিয়ে এক টুকরো কাগজে রেখে, লোকটি তুলে দিল মেয়েটির হাতে। একটা পঞ্চাশ পয়সা লোকটির হাতে দিয়ে সে একটা ফালি তুলে কামড় দিল এবং আড়চোখে কলা কেনায় ব্যস্ত বলরামের দিকে তাকাল।

বলরাম একছড়া কলা কিনে তার থেকে দুটি কলা ছিঁড়ে বাড়িয়ে ধরলেন। মেয়েটি তাড়াতাড়ি শশার টুকরো মুখে পুরে কলা দুটো নিয়ে বলল, "একটা দিলেই তো হত।"

"খিদে পেয়েছে বললে। এইটুকু কলা একটা খেয়ে কি কিছু হয়?"

চেইন খুলে ব্যাগের মধ্যে কলা দুটো রেখে মেয়েটি হাসল, "পরে খাব, আগে কাগজটা কিনে নিই।"

স্টেশন রোডের দু'ধারে সারি দিয়ে নানারকমের দোকান। সাইকেল রিকশা, অটো রিকশা আর শুধুই সাইকেল রাস্তাটাকে বিশৃঙ্খল করে রাখে। সেইসঙ্গে মানুষের ভিড়ে পথচলা দায়। বাজার কিছু দূরে। ওরা ভিড় ঠেলে হাঁটতে শুরু করল।

"কাগজ, মানে খবরের কাগজ?" বলরাম জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ।"

বলরাম বুঝলেন, সন্ধেবেলায় খবরের কাগজ কম দামে বিক্রি হয়, তাই সকালে না কিনে অনেকেই অফিস থেকে ফেরার পথে কেনে। এই মেয়েটিও তাই কেনে। কিন্তু খবরের স্টল তো তারা ফেলে এসেছে, তা হলে যাচ্ছে কোথায়!

"তুমি এদিকে খবরের কাগজের দোকান তো পাবে না?" বলরাম ভুল ধরিয়ে দেওয়ার মতো স্বরে বললেন।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল এবং হেসে ঠিক সামনেই পুরনো খবরের কাগজ ও শিশি-বোতলের দোকানটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

"আমি পুরনো কাগজ কিনব, ঠোঙা বানানো হবে।"

বলরাম মনে মনে অপ্রতিভ হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সামলে উঠে বললেন, "ঠোঙা বানানোটা কুটিরশিল্প। তুমি নিজে বানাও?"

"মা বানান। আমিও হাত লাগাই, মাঝে মাঝে ছোট ভাইও বসে।" এর পর ইতস্তত করে বলল, "মেসোমশাই, সাইকেলটা একটু ধরবেন, আমি কাগজগুলো আনি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

বলরাম সাইকেলটা ধরে দাঁড়ালেন। বোধহয় আগেই বলা ছিল, ওজন করে পুরনো বাংলা খবরের কাগজ ডাঁই করে রাখা। সাইকেলের কেরিয়ারে যে বাজারের থলিটা ছিল সেটি আকারে যে কত বড়, বলরাম সেটা আগে বুঝতে পারেননি। এখন মেয়েটি দোকানির কাছে থলির মুখ খুলে ফাঁক করে ধরতে বলরাম সেটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এ তো বাজারের ছোট থলি নয়, হাতে ধরে চাল বওয়ার জন্য অন্তত পনেরো কেজি-র থলি। তবে খবরের কাগজের পরিমাণ দেখে তাঁর মনে হল, পনেরো কেজি-র অনেক কমই হবে।

"মাস্টারমশাই এখন আছেন কেমন?" দোকানি জানতে চাইলেন মেয়েটির কাছে।

"সকালে তো জ্বর দেখে বেরিয়েছি। তবে পেটের যন্ত্রণাটা কমেনি।" মেয়েটি থলিটা মেঝে থেকে দু'হাতে তুলে ভেতরের কাগজগুলো ঝাঁকাল।

"ডাক্তারবাবু কী বলেন?"

"কী আর বলবেন, সেই এক কথা...অপারেশন না করলে...আমি এখন আসি গোপালদা।"

"আয়।"

মেয়েটি এক হাতে থলিটা তুলে সাইকেলের কাছে এল। শরীরটা একটু বাঁকিয়ে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট টিপে ধরা।

"মেসোমশাই, সাইকেলটা একটু ধরবেন, এটা হাতলে ঝুলিয়ে দিই।"

"ওজন কত?"

"দশ কেজি।"

"যাবে কদ্দুর?"

"কুলডাঙা।"

"সেটা কোথায়?"

"এই তো, মাজাভাঙা, তারপর হোতর তারপর কুলডাঙা...মাইলচারেক।"

জবাব দিতে দিতে সাইকেলের হাতলের রডে থলিটা ঝুলিয়ে দিল।

"চাআর মাইইল যাবে এই দশ কেজি সাইকেলে ঝুলিয়ে!" বলরাম এবার যথেষ্ট অবাক হলেন।

মেয়েটিও অবাক এইরকম একটা কথা শুনে। "কেন, আমি তো কতবার কাগজ নিয়ে গেছি!" সাইকেল হাতে ধরে সে হাঁটতে শুরু করল, তার পাশে বলরাম। আরও কিছুটা গিয়ে ডান দিকের রাস্তায় তার বাড়ি।

"রাস্তার অবস্থা যা! গর্তে ভরা, দশগজ রাস্তাও সমান নয়, তার ওপর অন্ধকার। এই রাস্তায় হ্যান্ডেলে অত ওজন নিয়ে চালাতে গেলে তো পড়ে যাবে!" বলরামের উদ্বেগ তাঁর স্বরে ফুটে উঠল।

"এখনও তো পড়িনি।" হালকা স্বরে মেয়েটি বলল।

"কাজটা তো দাদা, কাকা বা বাড়ির কোনও পুরুষ করতে পারে, তুমি একটা মেয়ে—।"

বলরাম চুপ করে গেলেন। তাঁর মনে হল একটু বেশিই যেন গায়েপড়া হয়ে যাচ্ছে।

"আমার দাদা নেই, আমিই বড়, কাকাও নেই, শুধু একটা তেরো বছরের ভাই, স্কুলে পড়ে। বাবা স্কুলমাস্টার ছিলেন। তিন বছর রিটায়ার করেছেন, কিন্তু এখনও পেনশন পাননি। ওই যে "গোপালদা' বললাম যাঁকে, উনি বাবারই এক ছাত্র। কাগজের দাম নিলেন না। ঠোঙা তৈরি করে গোপালদাকে দিয়ে যাব। বিক্রি করে কাগজের দাম কেটে রেখে বাকিটা আমাকে দেবেন। বাবার আরও ছাত্র আছেন, নানাভাবে সাহায্য করেন।"

"খবরের কাগজে প্রায়ই তো দেখি, রিটায়ার করে শিক্ষকরা কেউ আট, কেউ দশ বছর পেনশন পাচ্ছেন না।" বললাম সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, "তোমার বাবা নিশ্চয় ভাল শিক্ষক ছিলেন, তাই ছাত্রেরা সাহায্য করছে।"

"বাবা এখন ঘরভাড়া করে কোচিং খুলেছেন। স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ান,

তাতেই সংসার চলে। আগে কখনও করেননি, এখন করতে হচ্ছে বলে খুব কষ্ট পান।"

"তুমি করো কী?"

"কাজের চেষ্টা করছি। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ, চাইলেই কি চাকরি পাওয়া যায়? অনেককে বলে রেখেছি,...মেসোমশাই আপনাকেও কিন্তু বলে রাখলাম।" মেয়েটির স্বরে এবার লঘুতার কোনও আভাস নেই।

"আমি খোঁজ পেলে তোমায় জানাব।" বলরামের গলায় আন্তরিকতা।

মেয়েটি এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আর দাঁড়াল ঠিক রামপ্রসাদ কলেজ হস্টেলের সামনেই। বলরাম মুখ না তুলেই দেখতে পেলেন দোতলার বারান্দায় গুটিতিনেক মুখ নীচের দিকে তাকিয়ে।

এক হাত উঁচু কংক্রিটের একটা চাঙড়া বহুদিনই রাস্তার ধারে পড়ে আছে। মেয়েটি তার ওপর দাঁড়িয়ে সাইকেলের সিটে বসল। লাজুক হেসে বলল, "যখন কাগজ নিয়ে যাই তখন এইখানে এসে এইভাবেই উঠি। এমনি উঠতে গেলে ব্যালান্স রাখা যায় না, একবার পড়ে গেছলুম।...আসি তা হলে মেসোমশাই, খোঁজ পেলে বলবেন।"

বলরাম কিছু বলার আগেই মেয়েটি সাইকেল চালিয়ে দিল। প্রথম দশ-পনেরো মিটার টালমাটাল হয়ে সাইকেলটা সোজা হল এবং দূরের আলোবিহীন রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

থাকে কুলডাঙায়, কিন্তু মেয়েটির নামটা তো জানা হল না। বলরাম নিজের বুদ্ধিহীনতায় নিজের ওপর বিরক্ত হলেন। যদি কোনও কাজের সন্ধান পান, অবশ্য না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তা হলে ওকে খবর দেবেন কী করে? একটা উপায় অবশ্য আছে, পুরনো কাগজের দোকানি গোপালকে বলে দিলে মেয়েটি খবর পেয়ে যাবে। বেশ ভাল মেয়ে, কত সহজে 'মেসোমশাই' ডাকল, ঠিক নিজের মেয়ের মতোই কথা বলল।

বলরাম আরও কিছুটা হেঁটে ডান দিকে বাড়ির পথ ধরার সময় মুখ ফিরিয়ে হস্টেলের বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখলেন মুখগুলো তাঁকে লক্ষ করছে।

বাড়ি ফিরে বলরাম তাঁর স্ত্রী বিমলাকে বললেন, "আজ একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। বড় ভাল মেয়ে। বয়স খুব কম, বলুর থেকেও ছোট। খুব পরিশ্রমী।"

বলু অর্থৎ বলাই, তাঁদের একমাত্র সন্তান। বছর দুই সে খড়্গপুর আই আই টি-তে ভূ-বিদ্যার ছাত্র। বলরাম-বিমলার সংসারে একটি কাজের মেয়ে ছাড়া আর কোনও লোক নেই। ট্রেনে নামার সময়ের ঘটনা থেকে শুরু করে দশ কেজি কাগজ হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে সাইকেল চালিয়ে কুলডাঙা রওনা হওয়া পর্যন্ত, মেয়েটির আচরণ ও কথাবার্তার সবকিছুর বিবরণ স্ত্রীকে দিলেন বলরাম। বিমলা সব শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটির নামটা তো বললে না?"

বলরাম মাথা অর্থাৎ টাক চুলকে বললেন,"ওটা জিজ্ঞেস করার সময় আর পাইনি।"

"সময় কখনওই তোমার হবে না।"

যে সময়ে বিমলা এই কথা বলছিলেন ঠিক তখনই কুলডাঙায় একতলা দু'ঘরের একটি বাড়ির সামনে মেয়েটি সাইকেল থেকে নামল।

"মা, দিদি এসেছে।" ভেতর থেকে একটি ছেলে চেঁচিয়ে তার মাকে জানিয়ে দিল।

ব্যস্ত হয়ে টালির চালার রান্নাঘর থেকে মা বেরিয়ে এলেন। "ওরে খুকি, জগন্নাথকাকা খবর পাঠিয়েছেন, আজই তোকে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

হ্যান্ডেল থেকে কাগজের থলিটা নামাবার জন্য সে ডাকল, "বাবু এদিকে আয়।" তারপর ক্লান্ত স্বরে সে মাকে বলল, "কাল সকালে গেলে হয় না?"

"বলেছেন আজই দেখা করতে। ওঁর আপিসে বোধ হয় লোক নেবে।" মায়ের স্বরে ব্যস্ততা আর ক্ষীণ একটা আশা।

মেয়েটি থলিটা ভাইয়ের হাতে দিয়ে সাইকেলটা ঘোরাল। অন্ধকার রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে সাইকেলে উঠল। জগন্নাথ সেন কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে উচ্চপদে চাকুরে, তাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। থাকেন বিদ্যানগর স্টেশনের পশ্চিম দিকে।

এখন তাকে চার মাইল সাইকেল চালিয়ে আবার যেতে এবং ফিরতে হবে।

মেয়েটি যখন জগন্নাথ সেনের বাড়িতে পৌঁছল, তখন তিনি ছেলের বিয়ের ব্যাপারে ভাবী কুটুমদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সাইকেলটা বারান্দার ধারে দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে সে সিঁড়ি দিয়ে দু'ধাপ উঠে বারান্দা থেকে বসার ঘরে উঁকি দিল।

"কে? কে ওখানে?" ঘরের ভেতর থেকে জগন্নাথবাবু হাঁক পাড়লেন।

"আমি তুলসী।"

মেয়েটি কুণ্ঠিত পায়ে ঘরে ঢুকল। ঘরে সোফায় দুটি লোক, তাদের মুখোমুখি আর একটি সোফায় জগন্নাথবাবু। মাঝে নিচু টেবিলে দুটি প্লেটে কিছু মিষ্টি আর চা।

"ডেকেছিলেন, জগন্নাথকাকা?"

"হ্যাঁ। দিল্লি থেকে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে একটা চিঠি এসেছে। আমরা এবার খেলার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে কিছু খেলোয়াড়কে চাকরি দেব।" জগন্নাথবাবু এর পর সামনের লোক দুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আমি এর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।"

"না, না, মনে করার কী আছে।" ওদের একজন ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন। "আপনি কথা বলে নিন।"

"আমাদের মিনিস্টার তো খেলাধুলো খুবই ভালবাসেন। গতবছর ফুটবল টিম আমরা করেছি, টেবল টেনিস আর ভলিবলেও টিম হয়েছে কিন্তু সবই ছেলেদের। মিনিস্টার চান মেয়ে খেলোয়াড়দের চাকরি দিতে। বিদেশ থেকে সোনাটোনা তো ওরাই আনে।" জগন্নাথবাবু সামনের লোক দুটির দিকে তাকিয়ে শেষের কথাটি

বললেন।

"পি টি উষা, সাইনি আব্রাহাম।" অপেক্ষাকৃত কমবয়সি লোকটি নাম দুটি মনে করিয়ে দিলেন।

"আমাদের ছেলেগুলো তো কোনও কম্মের নয়, তাই স্পোর্টস বোর্ড ঠিক করেছে, ছেলেদের নয়, এবার শুধু মেয়েদেরই চাকরি দেবে। বারোজনের কোটা ঠিক করে দিয়েছে ইস্টার্ন সার্কেলের জন্য। আমরা পেয়েছি পাঁচজনের চাকরির কোটা। দুটো ক্লাস থ্রি, তিনটে ক্লাস ফোর-এর চাকরি। কিন্তু পাঁচজন দিয়ে কোনও খেলার টিম তো আর করা যায় না। কাল আমাদের স্পোর্টস ক্লাবের মিটিংয়ে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আমি আবার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।"

জগন্নাথবাবু সামনের দুই অতিথির দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন। তাঁরা দু'জন খুব অবাক হলেন।

'আপনি স্পোর্টসেও আছেন! কই, এটা তো আমাদের বলেননি?" বয়স্কজন বললেন ঈষৎ সমীহভরে।

"এ আর বলার মতো কথা নাকি! এককালে খেলতুম টেলতুম, ফার্স্ট ডিভিশনে ফুটবল খেলেছি, ভলিটাও খারাপ খেলতুম না। তারপর যা হয়, চাকরিতে মন দিলুম, মাঠে যাওয়াও ছাড়লুম। এখন দেখছেন তো শরীরের অবস্থা।" জগন্নাথবাবু নিজের বিশাল ভুঁড়িটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তৃপ্তমুখে হাসলেন।

তুলসী হাসল না। সে ঠায় দাঁড়িয়েই আছে। জগন্নাথবাবু তাকে বসতে বলতে ভুলে গেছেন। তার নিজেরও কুণ্ঠা লাগছে খাবারের প্লেটের সামনে নিজের থেকে বসতে। তার মুখে ক্লান্তিমাখা উদ্বেগ। জগন্নাথবাবুর কথাগুলো থেকে সে এইটুকু বুঝেছে, পাঁচটা চাকরি ওঁর অফিসে পাঁচজন মেয়ে পাবে, কিন্তু তাদের খেলোয়াড় হতে হবে। কোন খেলার খেলোয়াড়দের জন্য চাকরিগুলো, সেটা এখনও জগন্নাথবাবু বলেননি। তবে স্বাভাবিক বুদ্ধিবিবেচনা থেকে সে ধরে নিয়েছে, রাজ্য পর্যায়ের খেলোয়াড় না হলে সরকারি চাকরি মেলে না।

"কাল মিটিংয়ে আমরা ঠিক করলাম, ওলিম্পিকে যেসব খেলা আছে তার মধ্যে থেকে ইনডিভিজুয়াল খেলার একটা-দুটো বেছে তাতেই চাকরি দেব। তুই আর্চারি কি রাইফেল শুটিং কি ব্যাডমিন্টন, এসব খেলা খেলেছিস? স্টেট মিটে চ্যাম্পিয়ান না হলেও অসুবিধে হবে না। সেকেন্ড, থার্ড পজিশন পেলেও আমরা স্পোর্টস বোর্ডে সুপারিশ করে বলব, ভবিষ্যতে এই মেয়েটির উন্নতি করার মতো সম্ভাবনা আছে। তুই এইসব খেলা—" জগন্নাথবাবু কথা অসমাপ্ত রেখে তুলসীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চোখ নামিয়ে তুলসী শুনে যচ্ছিল। তার মনে হচ্ছে, কী এক অবাস্তব জগতে তার এই জগন্নাথকাকা বাস করছেন! কুলডাঙার মতো জায়গায় বাস করে যে মেয়ে, সে তিরধনুক, রাইফেল, ব্যাডমিন্টন পাবে কী করে? সে শুনেছে মাত্র এইসব খেলার কথা, পাশের বাড়ির টিভি-তে মাত্র একবার দেখেছে। শুনেছে হাজার হাজার টাকা লাগে একটা ধনুক বা রাইফেল কিনতে। ব্যাডমিন্টন খেলার কোনও ব্যবস্থাই নেই তাদের দশ বর্গ মাইলের মধ্যে।

"না কাকা, আমি এসব খেলা কখনও খেলিনি।"

"তাই তো।" জগন্নাথবাবু হতাশ হয়ে যেন ঝিমিয়ে পড়লেন। "তা হলে আর কী খেলা জানিস?"

"সাঁতার জানি, সাইক্লিং জানি তবে কম্পিটিশনে কখনও নামিনি।" তুলসী আশাভরে তাকাল। কিন্তু জগন্নাথবাবুর মুখের ভাব বদলাল না দেখে সে দমে গেল।

"আমাদের অল ইন্ডিয়া ইন্টার সার্কেল স্পোর্টসে যে-যে বিষয়ে কম্পিটিশন হয়, শুধু সেই খেলাগুলোতেই প্লেয়ার নিয়ে থাকি। তার মধ্যে মেয়েদের সাইক্লিং নেই, সাঁতার অবশ্য আছে। কিন্তু সুইমার নিতে হলে তো আমরা নামী সুইমারই নেব।"

"নামী মানে, কীরকম নামী?" তুলসী জানতে চাইল।

"নামী মানে রেকর্ড টেকর্ড করেছে, ন্যাশনালে গোল্ড কি সিলভার পেয়েছে।"

তুলসী অপ্রতিভ হয়ে মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পারছে জগন্নাথকাকা যা চাইছেন, তা পূরণ করা তার দ্বারা সম্ভব নয়। তবু মরিয়া হয়ে বলল, "অ্যাথলেটিক্সে তো নিতে পারেন।"

জগন্নাথ কিছুক্ষণ তুলসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, "অ্যাথলেটিক্স অবশ্য ইনডিভিজুয়াল ব্যাপার, এতে আমরা মেয়ে নিতে পারি। তুই কম্পিটিশানে নেমেছিস কখনও? স্ট্যান্ড করেছিস?" এর পর তিনি অতিথি দু'জনের প্রতি মনোযোগ করলেন। "এ কী, আপনারা এখনও শুরু করেননি? আমাদের এখানকার ক্ষীরের চমচম খুব বিখ্যাত, শুরু করুন।"

তুলসী স্কুলে পড়ার সময় বাৎসরিক স্পোর্টসে নেমে পরপর চার বছর প্রথম হয়েছে, একশো, দুশো, চারশো মিটারে। স্পোর্টসের দিন দশেক আগে, মাইলখানেক দূরের হোতরের ফুটবল মাঠে সে কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে নিত। আর তাতেই প্রথম হয়ে যেত। সে এটুকু অন্তত বোঝে, স্কুলের স্পোর্টসের রেজাল্ট দেখিয়ে এইসধ চাকরি চাওয়া যায় না।

কিন্তু এখন সে মরিয়া একটা চাকরি পাওয়ার জন্য। তাই একটা মিথ্যা কথা বলে ভাগ্যপরীক্ষা করতেও রাজি। সূর্য সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রতি বছর দৌড়ের রোড রেস হয়। মেয়ে-পুরুষ তাতে দৌড়য়। পথের ধারে ভিড় করে লোকে দেখে, তুলসীও দেখেছে কিন্তু দৌড়ে কখনও নামেনি। কিন্তু এখন সে বলল, "পাঁচ মাইল রোড রেসে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছি।"

"আমাদের ইন্টার সার্কেলে রোড রেস হয় না, আর যা হয় না তাতে চাকরি দিই না। তবে মেয়েদের পাঁচ হাজার কি দশ হাজার কিলোমিটার দৌড় হয় কি না বলতে পারছি না। খোঁজ নিয়ে দেখি, যদি হয় তোকে খবর দেব। তবে দৌড়ের থেকে ফিল্ড ইভেন্টে, মানে জাম্পিং-এ থ্রোয়িং-এ পয়েন্ট পাওয়ার চান্স বেশি। তাই, নিলে, এইসবেতেই আমরা মেয়ে নেব। তুই ডিসকাসে কি শটপাটে কোনও মিট-এ নেমেছিস?"

ফাঁপরে পড়ল তুলসী। কোনওটাতেই সে জীবনে নামেনি। ট্রেনে যেতে যেতে ঠাকুরপাড়া স্টেশনের পাশের মাঠে সে কয়েকটি ছেলে আর মেয়েকে দৌড়, লং

জাম্প, ডিসকাস প্র্যাকটিস করতে দেখেছে। ওখানে 'যুব সম্মিলনী' নামে অ্যাথলেটিক্সের একটা ক্লাব আছে। একদিন সে একটি মেয়েকে একটা নারকেলের সাইজের লোহার বল ছুড়তে দেখেছে। এই ছোড়াকেই বলা হয় শটপাট। তার মনে হয়েছিল গায়ে জোর না থাকলে লোহার বল ছোড়া যায় না এবং ছবিতে দেখেছে যেসব মেয়ে ছোড়ে, তাদের তাগড়াই ভারী চেহারা, অথচ সে ছিপছিপে, হালকা। সুতরাং সে শটপাটার এ-কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। তা ছাড়া চাকরি দেওয়ার আগে সার্টিফিকেট তো অবশ্যই দেখতে চাইবে। তখন সে কী দেখাবে?

তুলসী মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, সে ডিসকাসে বা শটপাটে নামেনি। "কিন্তু কাকাবাবু, আমি যদি শিখে নিতে পারি?"

এবার ঘরের তিনজনেই বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকালেন। বলে কী মেয়েটা! লোহার গোলাটাকে কি হাতের মোয়া বা ডিসকাসের চাকতিটাকে কি গুড়ের পাটালি ভেবেছে নাকি? শিখে নেব বললেই কি শেখা যায়? বছরের পর বছর প্র্যাকটিস তা হলে দরকার হয় কেন?

জগন্নাথবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তুই এখন যা, এঁদের সঙ্গে এবার কথা বলব। কিছু হলে তোকে খবর পাঠাব।"

ঘর থেকে বেরিয়ে সাইকেল হাতে ধরে রাস্তায় আসার সময় সে ভাবল, জগন্নাথকাকা গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন? 'শিখে নিতে পারি' শুনে ধরে নিয়েছেন নিশ্চয় মাথায় গোলমাল আছে। সত্যিই হয়তো আছে, নইলে এমন একটা অবান্তর কথা তার মুখ দিয়ে বেরোবে কেন!

সাইকেল চড়ে সে বিদ্যানগর স্টেশনে পৌঁছে সাইকেল থেকে লেভেল ক্রসিংয়ে নামল রেললাইনগুলো পার হওয়ার জন্য। ট্রেন আসছে তাই গেটটা বন্ধ। কিন্তু ধৈর্য হারানো কিছু লোক সাইকেল হাতে ধরে নিচু হয়ে, আড়াআড়ি-থাকা কাঠের খুঁটির তলা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। তুলসীও তাই করল।

ডাউন দু'নম্বর রেলের ট্র্যাকে লোকাল ট্রেনের হুটার শোনা গেল। তুলসী সাইকেল দু-হাতে ধরে উঁচু লাইনগুলো আর পাথরকুচির ওপর দিয়ে ছুট দিল। আপ এক নম্বর ট্র্যাক পেরিয়েছে। দু'নম্বরটা পার হতেই একটা গর্ত। বহুদিন ধরেই রয়েছে এই গর্তটা। কিন্তু লম্বা লম্বা ঘাসে আর ফলওয়ালাদের ফেলে দেওয়া ফলের পাতায় ঢেকে থাকায় বোঝা যায় না ওখানে একটা গর্ত রয়েছে। যারা নিয়মিত যাতায়াত করে, তারা জায়গাটাকে চেনে, তাই এড়িয়ে যায়। তুলসীও গর্তটাকে জানে। কিন্তু এখন ট্রেনটাকে সামলাতে গিয়ে তার সরে যাওয়ার মতো সময় ছিল না। গর্তে পড়ল সাইকেলের সামনের চাকা। সেটা টেনে তুলে তিন নম্বর ট্র্যাকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা ঢুকল বিদ্যানগর স্টেশনে।

কিছু লোক যারা তুলসীকে এইভাবে লাইন পার হতে দেখল, তারা তার দিকে ভর্ৎসনা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে। একজন বলল, "একটু ধৈর্য ধরতে পারো না?"

আর একজন বলল, "এখন মানুষের যেন আর তর সয় না, আধ মিনিটও সবুর করতে পারে না। এত ব্যস্ততা কীসের?"

তুলসী মাথা নামিয়ে কথাগুলো শুনতে শুনতে চার নম্বর ট্র্যাক পেরিয়ে স্টেশন রোডে এল। তার মনে হল, সত্যিই তার ধৈর্যটা কম। কিন্তু এই লোকগুলো কি জানে, এখনিই তার একটা চাকরি দরকার। আলসারে বাবা ধুঁকছেন, আর তিনি সংসার টানতে পারছেন না। তেরো বছরের ক্লাস সেভেনে পড়া ভাই ট্রেনে চিনেবাদাম ফেরি করার কাজ নেবে বলছে। হ্যাঁ, সে খুবই ব্যস্ত।

সাইকেলে উঠল তুলসী। জলতেষ্টা পেয়েছে। খিদেটা এখন হুহু করে বাড়ছে। এখানে ধারেকাছে টিউবওয়েল নেই। শশাটাও যে কখন হজম হয়ে গেছে! আর সেই টাকওলা ভদ্রলোক বললেন কিনা 'বড্ড পেট ভার করে'। এখন তো লোহা খেয়ে সে হজম করে ফেলতে পারে। এত খিদে—

আর ঠিক এই সময়ই সাইকেলের সামনের চাকার টিউব পাংচার হয়ে চাকাটা বসে গেল। ব্রেক কষে তুলসী সাইকেল থেকে নামল। টায়ারটা আঙুল দিয়ে টিপে সে মাথা নাড়ল। দু'মাস আগে একবার সে এই অবস্থায় পড়েছিল। তবু রক্ষা, পাংচারটা হয়েছিল বাড়ির কাছেই, কিন্তু এখন?

তার কাছে পাঁচটা পয়সাও নেই। টিউবটা সারিয়ে নিতে হলে তাকে ধার রাখতে হবে। বিপদের কথা বলে ধরাধরি করলে, 'জটাধারী সাইকেল রিপেয়ারিং শপ'-এর বুড়ো মালিক জটাধারী হালদার হয়তো দয়া দেখাতে পারে। এই ভেবে তুলসী আবার ফিরে এল স্টেশনের দিকে।

হায় কপাল! দোকানটা যে বন্ধ! তুলসী ফ্যালফ্যাল করে বন্ধ ঝাঁপের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সময় পাশের রেডিমেড পোশাকের দোকানের মালিক বলল, "আজ দুদিন হল জটুদার দোকান বন্ধ। বোধ হয় অসুখবিসুখ করেছে।"

এবার তা হলে সাইকেল হাতে ধরে চার মাইল হেঁটে কুলডাঙায় ফিরে যাওয়া! আজ সারাদিন একটা কাজও তার সফল হল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিল "বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া প্রসাধনসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য কয়েকজন সেলসগার্ল আবশ্যক। সত্বর দেখা করুন।" এবং সে আজ কলকাতায় দেখা করতে গিয়ে শুনল "পাঁচজন মেয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। পরে আবার নেওয়া হতে পারে । মাঝে মাঝে এসে খবর নেবেন।" তারপর জগন্নাথকাকার কাছ থেকেও হতাশ হয়ে ফিরে আসা। এমন সব খেলার জন্য চাকরি, যার একটাও সে খেলেনি। কবাডি, খো খো সে ভালই খেলে। এক বছর সে সূর্য সঙ্ঘের হয়ে কলকাতায় কবাডি লিগে খেলেছে। একবার তার মনে হয়েছিল জগন্নাথকাকাকে বলে "আপনারা মেয়েদের কবাডি টিম করুন না!" কিন্তু উনি যখন বললেন মাত্র পাঁচজনকে চাকরি দেওয়ার কোটা পেয়েছেন, তখনই সে মনে মনে চুপসে যায়। একটা কবাডি টিম করতে কমপক্ষে বারোজন প্লেয়ার চাই। সাতজন খেলে, পাঁচজন রিজার্ভে থাকে।

সাইকেল হাতে ধরে স্টেশন রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তুলসীর আর একটা কথা মনে হওয়ায় তার সারাদিনের ব্যর্থতার কষ্টটা যেন আরও বেড়ে গেল। সে একটা মিথ্যা কথা বলেছে। পাঁচ মাইল দৌড়ে সে কখনও নামেনি। অথচ চাকরি পাওয়ার আশায় সে জগন্নাথকাকাকে বলে দিল, মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে! একেই কি বলে

'অভাবে স্বভাব নষ্ট'? ছি ছি ছি, তুলসী মাথা নাড়ল। বাবা, মা, কি ছোটভাইটা শুনলে তার সম্পর্কে কী ভাববে?

লোকটা ঠিকই বলেছে, "এত ব্যস্ততা কীসের?" আর এই জন্যই তো সে বোকার মতো বলে বসল, "আমি যদি শিখে নিতে পারি?" গাছে না উঠতেই এককাঁদি! খেলাধুলোয় ওপরদিকে উঠতে গেলে কত ধৈর্যের আর খাটুনির দরকার। আর সে কিনা বলে বসল—। তুলসী মাথা নাড়ল। লোকটা ঠিকই বলেছে, "একটু কি ধৈর্য ধরতে পারো না?" পি টি ঊষা, সাইনি আব্রাহাম কত বছর পরিশ্রম করেছে বলেই না ওপরে উঠেছে। আর আমি, কুলডাঙার তুলসী রায়, আমি কিনা দু-দিনেই শটপাট, ডিসকাস শিখে নিয়ে চাকরি পাব আশা করছি!

স্টেশন রোড শেষ হয়ে গেল। এবার রাস্তায় আর আলো নেই। মাজাভাঙা, হোতর, কুলডাঙা। সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তুলসী তাকাল। আজ সে মোট বারো মাইল সাইকেল চালিয়েছে। পেটে আগুন জ্বলছে। এখনও চার মাইল তাকে হাঁটতে হবে।

ঠিক আছে। তুলসী হাঁটা শুরু করল।

সকালে বাজার থেকে ফিরছেন বলরাম। হস্টেলের কাছাকাছি হতেই শুরু হল অদৃশ্য গায়কদের কোরাস:

ট্রেনের এই খোলা কপাট,
নামে লোক ঝপাত ঝপাত
চিত পটাত
প্ল্যাটফরমের পাষাণ পরে।

বলরাম থমকে দাঁড়ালেন। হঠাৎ তাঁর দেহের সব রক্ত যেন মাথার দিকে উঠতে শুরু করল, ফলে মাথাটা গরম হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষে অস্ফুটে বললেন, "অসভ্যতা এবার বন্ধ করা দরকার। দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে।"

চশমা-পরা একটি মুখ মুহূর্তের জন্য বারান্দায় উঁকি দিয়েই সরে গেল। তারপরই আবার শুরু হল:

ওরে ও তরুণ বুড়ো,
গড়াগড়ি দিসনে আরও
লম্ফ মারো
উঠবে রে চুল টাক উপরে ॥

'টাক উপরে' যখন শেষ হচ্ছে, বলরাম তখন বাজারের থলি হাতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে এসেছেন। দুটি ছেলে রাস্তার দিকে মুখ করে গেয়ে চলেছে। মেঝেয় বসে একজন দুটো কাঠি দিয়ে বনস্পতির একটা গোল টিনে ড্রাম বাজাচ্ছে।

"পাজি, হতভাগা, নচ্ছার।" চিৎকার করে উঠে বলরাম থলিটা নামিয়ে রেখে চড়

কষালেন চশমাপরা, ফরসা, টিঙটিঙে রোগা ছেলেটির গালে।

চশমাটা ছিটকে পড়ামাত্র একটা কাচ ভেঙে গেল। এর পর দ্বিতীয়টির গেঞ্জি ধরে এমন টান দিলেন যে, সে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং গেঞ্জি ছিঁড়ে গেল। ড্রামবাদক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলরাম টিনের কৌটোয় জোরে লাথি মারতেই সেটা দেয়ালে গিয়ে লাগল।

হতভম্ব অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে ওরা তিনজনে একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু করল। বলরামের মুখে শুধু একটাই কথা, "দাঁড়া, আজ তোদের মজা বার করছি।... ওরে ও তরুণ বুড়ো?... দ্যাখ তবে বুড়োটা কে?"

বলতে বলতে বলরাম দু-হাতে অন্ধের মতো ঘুসি ছুড়তে লাগলেন, যার একটাও কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে সরে যাওয়া ওদের গায়ে লাগল না। এর মধ্যেই ড্রামবাদক, যে রীতিমতো বলিষ্ঠ এবং চটপটে, বলরামকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ল্যাং মেরে মেঝেয় ফেলে দিল। বাকি দু-জন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর।

গোলমালের আওয়াজে হস্টেলের অন্যান্য ছাত্ররা ছুটে এসেছে। কাচভাঙা চশমাটা হাতে নিয়ে টিঙটিঙে যুবক তখন চিৎকার করে যাচ্ছে, "বাঁচাও, বাঁচাও। আমরা আক্রান্ত।" উপুড় হয়ে পড়া বলরামের পিঠের ওপর চেপে বসে, ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে ছেলেটি দু-হাতে তাঁর মাথায় চাঁটি মেরে চলেছে আর টিনের ড্রাম বাজাতে বাজাতে অন্যজন গেয়ে যাচ্ছে, "মাথার ঊর্ধ্বে আছে মাদল, নিম্ন উতলা পদযুগল, গড়গড়িয়ে চলিছে বল, চল চল চল।"

ব্যাপারটা যদিও বিদঘুটে হাস্যকর, কিন্তু বলরামের কাছে সেটা মর্মান্তিক। হস্টেলের বয়স্ক ছাত্ররা এমন একটা দৃশ্য দেখে প্রথমে থতমত খেয়ে যায়। তারপর ছুটে গিয়ে একজন বলরামের পিঠের ওপর থেকে ড্রামবাদককে টেনে নামাল।

"হচ্ছে কী? একজন বুড়ো লোককে এইভাবে হেনস্থা করে?"

"এই বুড়ো লোক আমাদের কী করেছে, অনিলদা তুমি কি সেটা দেখেছ? তুমি শুধু ওকে হেনস্থা করাটাই দেখলে। হেনস্থা নয়, এটা হল আত্মরক্ষা।" ড্রামবাদক বাজনা থামিয়ে কথাটা বলেই আবার তার বাদন শুরু করল।

"উঠে আয়, ওঠ্ ওঠ্।" অনিলদা নামের ছাত্রটি বলরামের পিঠ থেকে টেনে তুলল ছেঁড়া গেঞ্জিপরা ছেলেটিকে।

বলরাম উপুড় হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তিনি কিছুই ভাবছেন না। মাথার মধ্যে শুধু অন্ধকার আর ঝোড়ো বাতাসের মতো শোঁশোঁ শব্দ। প্রচণ্ড রাগে জ্বলে ওঠার বদলে এখন তিনি গভীর লজ্জায় ডুবে যাচ্ছেন। 'কেন, কেন, এমন একটা বোকামি করতে গেলাম?' এই কথাটাই এখন তাঁকে ছোবলাতে শুরু করেছে।

তিনি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। কপালে, নাকে ধুলো লেগে। বাহু তুলে পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে ধুলো মুছলেন। বারান্দার এককোণে বাজারের থলিটা কাত হয়ে রয়েছে। দুটো পেঁয়াজ মেঝেয় পড়ে। বলরাম নিচু হয়ে পেঁয়াজ দুটো তুলে থলির মধ্যে রেখে, মাথা নিচু করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

এতক্ষণ ওরা কেউ নড়েনি, শুধু চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল। বলরাম নীচে নেমে

যেতেই ওরা বারান্দার পাঁচিলে এসে নীচের দিকে তাকাল। থলি হাতে পাঁচ ফুট এক ইঞ্চির একটি মানুষ মাথা নামিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, হাঁটছেন ধীরগতিতে। কী যেন তিনি ভাবছেন।

"আর যদি একবারও তোরা গান ধরিস, তা হলে এই রামপ্রসাদ হস্টেলে তোদের আর—।"

"অনিলদা, আমরা তো ওঁর নাম করে গান—"

"চওওপ্।" বিশাল একটা দাবড়ানিতে, ওরা তিনজন মিইয়ে গেল।

"তিনটে ছোকরা মিলে একজন বুড়ো মানুষকে মারছিস, লজ্জা করে না। তোরা কি ইয়াংম্যান? উনি কী অন্যায় করেছেন তা আমার জানার দরকার নেই। আমি শুধু দেখলাম তিনটে অল্পবয়সি ছেলে একজন বুড়ো মানুষের গায়ে হাত তুলেছে। উনি বিনা দোষে যদি মারেনও, দাঁড়িয়ে মার খাবি, তাতে লজ্জার কিছু নেই। গায়ে জোর থাকলেই ইয়াং হয় না, বুঝলি, 'ম্যান' বলেও একটা কথা আছে। আগে 'ম্যান' হওয়ার চেষ্টা কর...এই বলে রাখলাম, হস্টেলের বদনাম হয় এমন কাজ আর যেন না ঘটে।"

অনিল ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় জলন্ত চোখে তিনজনের দিকে তাকিয়ে গেল।

বলরাম বাড়ি ফেরার পথে ভাবছিলেন, সত্যিই তিনি বোধ হয় বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর ধৈর্যশক্তি কমে গেছে, সহিষ্ণুতা লোপ পেয়েছে। তা না হলে এমন করে রেগে উঠবেন কেন? ওরা প্যারডি বেঁধেছে তো কী হয়েছে? মজা করতে চেয়েছে তো মজা করুক। ওদের সঙ্গে আমারও তো মজা পাওয়া উচিত ছিল। ভগবান আমাকে এমনই একটা চেহারা দিয়েছেন, এতে আমার তো কোনও হাত নেই। হাঁটাটা অবশ্য আমার নিজস্ব। এটা বদলাবার চেষ্টা করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা করিনি। লোকে আমার হাঁটা দেখে হাসে। হাসবেই তো! যা ঘটে গেল, নিশ্চয় এটা জানাজানি হয়ে যাবে। রসিয়ে রসিয়ে লোকে বলাবলি করবে আর হাসবে। ইস্স্...।

বলরামের চোখে জল এসে গেল। পাঞ্জাবির হাতায় চোখ ঘষলেন। আর ধীরে ধীরে তখন তাঁর মনের মধ্যে একটা লোহার মতো কঠিন ইচ্ছা দানা বাঁধতে শুরু করল। বাড়িতে ঢোকার আগে সদর দরজায় কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ালেন। ফিসফিস করে নিজেকে শুনিয়ে তিনি বললেন, "আমাকে বুড়ো না হওয়ার পরীক্ষা দিতে হবে।"

"মেসোমশাই, মেসোমশাই।"

চিৎকার করে হাতছানি দিচ্ছে তুলসী। বলরাম থমকে দাঁড়ালেন। গোপালের কাগজের দোকানে উবু হয়ে বসে সেই মেয়েটি। মেঝেয় দড়ি দিয়ে দিস্তা করে বাঁধা ঠোঙার স্তূপ।

"অফিসে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

তুলসী বেরিয়ে এল দোকান থেকে। "মনে আছে, আমি যা বলেছিলাম?"

বলরাম ভাবতে শুরু করলেন।

"চাকরির কোনও সন্ধান পেলে আমাকে জানাবেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে আমার।" বলরাম অপ্রতিভতা কাটাতে একটু জোর দিয়েই বললেন, "নিশ্চয়ই খবর দেব তোমায়. কিন্তু তোমার নামটা তো জানা হয়নি এখনও! কুলডাঙায় থাকো, শুধু এটাই জানি।"

"আমার নাম তুলসী রায়। কুলডাঙায় রমেন স্যারের বাড়ি বললে যে কেউই দেখিয়ে দেবে। তা ছাড়া আপনি গোপালদাকেও বলতে পারেন, আমি রোজই তো এখান দিয়ে যাই।"

"ঠিক আছে, আমি এখানেই বলব।" বলরাম স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন এবং তাঁর আগের গতিতে নয়। তুলসীও তাঁর সঙ্গে চলেছে।

"তোমার সাইকেলটা কই?"

"সেটাই তো আনতে যাচ্ছি। আর বলবেন না, সেদিন রাতে বাড়ি ফিরেই আবার আসতে হয়েছিল স্টেশনের ওপারে আমার এক দূরসম্পর্কের কাকার বাড়িতে, ওই চাকরির খোঁজেই। কথা বলে বুঝলাম, হবে না। ওরা খেলোয়াড় মেয়ে চায়।"

"কী খেলার?"

"আর্চারি, রাইফেল শুটিং, শটপাট...এইসব। আমি তো এর কোনওটাই জানি না। সাইকেল চালাতে পারি, দৌড়তে পারি, আমাদের গ্রামের সরকারি ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টের বিরাট একটা দিঘি আছে, 'রানিসায়ের' নাম, সেখানে প্রায়ই যাই। ঘণ্টাখানেক সাঁতার কাটি। কিন্তু সেই সাঁতারের কথা বলে চাকরি তো আর চাওয়া যায় না!"

"আমিও সাঁতার কাটতাম। কলকাতায় আমাদের বাড়ির কাছেই গঙ্গা। স্কুলের গরমের ছুটি পড়লে, গঙ্গাতেই ঘণ্টা দুয়েক রোজ পড়ে থাকতাম। গঙ্গায় একটা কম্পিটিশনে একবার কাপও জিতেছি, সেকেন্ড হয়েছিলাম।" বলরাম বাধো বাধো স্বরে খবরটা জানালেন।

তুলসী মুখ ফিরিয়ে চোখ কুঁচকে তাঁকে দেখল। বলরামের মনে হল, মেয়েটি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছে না। তিনি মুখ গম্ভীর করে বললেন, "তোমাদের রানিসায়রে গিয়ে সাঁতার কাটা যাবে?"

"কেন কাটা যাবে না! আসুন না আপনি।"

"ভাবছি ভোরবেলায় একটু ব্যায়াম করা দরকার, তাতে ব্লাডপ্রেশারটা কমবে। সাঁতারের থেকে ভাল ব্যায়াম আর কী আছে!"

কথা বলতে বলতে ওরা স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে। তুলসী দাঁড়িয়ে পড়ল সাইকেল সারাইয়ের দোকানের সামনে।

"সেদিন রাতে সাইকেলের টিউব পাংচার হয়ে কী বিপদে যে পড়েছিলাম কী বলব! সারাব বলে এই দোকানে দিতে এসে দেখি দোকান বন্ধ। তখন ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি। পরদিন আবার হাঁটিয়ে এনে জটধারীবাবুর দোকানে

দিলাম। শুধু কি পাংচার? শরীরে ওরও অজস্র ব্যামো। ব্রেক, বেয়ারিং, চেন সবকিছুই ঝরঝরে হয়ে গেছে। এ কি আজকের সাইকেল! আমার জন্মেরও আগে বাবা কিনেছিলেন।"

শুনতে শুনতে বলরাম স্টেশনের দিকে তাকাচ্ছিলেন। প্ল্যাটফর্মে অফিসযাত্রী ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের ভিড়টা যেন একটু বেশিই। নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল হয়ে ট্রেন বন্ধ রয়েছে।

খবরের কাগজের ওপর হাতে লেখা পোস্টার নিয়ে দুটি ছেলে দেয়ালে সাঁটার জন্য জায়গা খুঁজছে। বলরাম তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ নেই। তাই সকাল আটটা থেকে ট্রেন বন্ধ। এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। মনে মনে তিনি ঠিক করলেন, আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে দেখবেন, তার মধ্যে ট্রেন না এলে বাড়ি ফিরে যাবেন।

ব্যাঙ্ক বাড়ির দেয়ালে, নানা দাবি জানানো পুরনো ছেঁড়া পোস্টারের ওপর ছেলে দুটি তাদেরটি মেরে দিল। বলরাম একবার তাকিয়ে পোস্টারটা দেখে নিলেন। সূর্য সঙ্ঘের পরিচালনায় একটা কী যেন দৌড় প্রতিযোগিতা। তিনি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোলেন।

"দিদি, সাইকেলটা এবার ছাড়ুন। এর আর কিছু নেই।" তুলসীকে উপদেশ এবং পরামর্শ দুটোই দিলেন প্রৌঢ় জটাধারী। একটি বালককে সহকারী নিয়ে তিনি নিজেই সাইকেল মেরামতির কাজ করেন।

"ব্রেকের যা অবস্থা, কোনদিন অ্যাকসিডেন্ট করে বসবেন। সামনের চাকার হাব-এর ওপর এই যে রডটা বসানো রয়েছে, এটা তো জং ধরে ঝরঝর করছে। পেছনেরটারও একই অবস্থা। ভেঙে পড়লে আর দেখতে হবে না!"

"এখনও তো অ্যাকসিডেন্ট করিনি।" এই বলে তুলসী সাইকেল নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "সারাতে গেলে টাকা লাগে। পাব কোথায়?"

সাইকেলে চড়তে গিয়ে তার নজর পড়ল পোস্টারটা। সে পড়ার জন্য এগিয়ে গেল।

বিরাট দৌড় প্রতিযোগিতা
পরিচালনায় সূর্য সঙ্ঘ
মেয়েদের ১০ কিলোমিটার ও পুরুষদের ২০ কিলোমিটার। নাম দিবার শেষ দিন ৭ অক্টোবর। প্রবেশ মূল্য ১০ ও ১৫ টাকা।
চিত্তাকর্ষক পুরস্কার।

'পাঁচ মাইল রোড রেসে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছি'—তুলসীর মাথার মধ্যে বাক্যটি বিদ্যুৎ চমকের মতো চড়াত করে উঠল। মিথ্যেটাকে যদি সত্যি করতে হয় তা হলে এই সুযোগ। সত্যি সত্যিই দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমে মিথ্যাটা খণ্ডাবার এই সুযোগ তার ছাড়া উচিত নয়। সূর্য সঙ্ঘ স্টেশনের পশ্চিমে, জগন্নাথকাকার বাড়ির কাছেই। ক্লাব ঘরটা সে চেনে। ঠোঙা বিক্রির টাকা থেকে এনট্রি ফি দশ টাকা সে আজই সন্ধ্যায় দিয়ে আসবে। দৌড়টা পাঁচ মাইল না হয়ে ১০

কিলোমিটার, তাতে কিছু যায় আসে না। ১০ কিলোমিটার মানে তো ছ' মাইল। পাঁচের থেকেও বেশি। এটা তাকে জিততেই হবে। তুলসী সাইকেলে উঠে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হল।

বলরাম আধঘণ্টারও বেশি অপেক্ষা করে ট্রেনের আর দেখা পেলেন না। ফিরে আসতে আসতে পোস্টারটার দিকে আর একবার তাকিয়ে থেমে পড়লেন। খুঁটিয়ে পড়লেন। শুনেছিলেন বটে এখানে একটা বড় দৌড় প্রতিযোগিতা হয়, সেটা তা হলে এটাই বোধ হয়। তাঁর মনে ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠল তুলসীর কোঁচকানো চোখ দুটো। সাঁতার কম্পিটিশনের কোনও সুযোগ থাকলে মেয়েটার কোঁচকানো চোখকে ছানাবড়া করে দিতে পারেন এখনও।

বলরামের বুকের মধ্যে একটা চনমনে উচ্ছ্বাস ফেঁপে উঠল। নিজেকে তাঁর খুব শক্ত বলিষ্ঠ মনে হল। হ্যাঁ, এই বয়সেও তিনি গঙ্গায় চার-পাঁচ মাইল সাঁতরাতে পারবেন, শুধু একটু প্র্যাকটিস করে নিতে হবে, এই যা! পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেই কাপটা জিতেছিলেন। এত বছর পর আর-একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? তুলসী বলল, ওদের গ্রামের পাশে রানিসায়র নামে বিরাট দিঘি আছে। ওখানে তো প্রাকটিস করা যায় ভোরবেলায়, সেইসঙ্গে ব্যায়ামটাও হয়ে যাবে।

কিন্তু চার মাইল যাওয়া আর চার মাইল আসা, সেটা কী করে হবে? অসম্ভব! মাথা নাড়তে নাড়তে বলরাম রামপ্রসাদ হস্টেলের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আড়চোখে দোতলার বারান্দার দিকে তাকালেন। সেদিনের পর থেকে ওদের গান গাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কেন বন্ধ হল কে জানে! তবে এখনও তিনি হস্টেলের কাছাকাছি হলে কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

বাড়ির সামনেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল সাইকেল হাতে-ধরা পান্নালালের। স্টেশনের ওপারে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে কেরানির কাজ করে। সাইকেলে যায়-আসে। বলরাম বললেন, "পানু, তুমি আছ ভাল। ট্রেনে চড়ে চাকরিতে যেতে হয় না, সাইকেলের দু'বার প্যাডেল মেরেই অফিস! আর আমাকে কিনা আজও কামাই করতে হল, ট্রেনের তারে বিদ্যুৎ নেই! তোমার মতো একটা সাইকেল যদি থাকত তা হলে অফিসে চলে যেতাম। লেট হবে নিশ্চয়ই, তবু কামাইটা তো হবে না, তা ছাড়া এটা ভাল ব্যায়ামও।"

পানুর হেসে ওঠা উচিত ছিল বলরামের সঙ্গে। কিন্তু হাসল না। একটু অবাক হয়ে বলল, "বলুদা, আপনি সাইকেল চালাতে পারেন?"

"কেন পারব না? তেরো-চোদ্দো বছর বয়সেই কলকাতায় শিখেছি। সাইকেল চড়ে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, এমন কী, ব্যান্ডেল চার্চ পর্যন্ত গেছি। একবার দল বেঁধে ডায়মন্ড হারবার যেতে গিয়ে আমতলার কাছে একটা ষাঁড় শিং নেড়ে এমন তাড়া করল যে, পালাতে গিয়ে ডোবায় পড়লাম, মাথা ভাঙল। ব্যস, বাবা বললেন আর সাইকেল না, সেই আমার শেষ চড়া।"

পানু শুনতে শুনতে বলরামের আপাদমস্তক দু'বার দেখে নিয়ে বলল, "বড়দের, না বাচ্চাদের সাইকেল চালাতেন?"

প্রশ্নটা অবশ্যই তাঁর উচ্চতাকে কটাক্ষ করে। বলরামের রেগে ওঠা উচিত। রাগের বদলে হেসে উঠলেন তিনি।

"বলেছ ভাল।" হাসি চাপতে চাপতে বললেন, "সত্যিই আমার পা প্যাডেল পর্যন্ত পুরো পৌঁছত না। সাইকেলের সিটটা নিচু করার জন্য যে রডের ওপর সেটা বসানো থাকে, সেটা কেটে ছোট করে নিয়েছিলাম।"

"আমাদের চেয়ারম্যান একটা রেসিং সাইকেল বিক্রি করছেন, আপনি কিনবেন?"

"তোমাদের চেয়ারম্যান সাইকেল চড়েন নাকি?"

"উনি নন, ওঁর স্কুলে-পড়া ছোট ছেলে চড়ত। একজন সাইক্লিস্ট সকালে প্র্যাকটিস করার সময় গত বছর ট্রাকের ধাক্কায় মারা গেল জি টি রোডে। চেয়ারম্যানের বউ কাগজে সেটা পড়েই ছেলের সাইকেলটা নিজের শোবার ঘরে তুলে এনে এক বছর হল চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছেন।"

"ছেলে চেঁচামেচি, কান্নাকাটি করেনি?"

"করেছিল। বাবা একটা স্কুটার কিনে দেবে বলায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু সাইকেলটা উনি এখন বিক্রি করে দেবেন। কিনে নিন না!"

" দাম কত নেবে?"

"কিনেছিলেন দু'হাজারে, নিশ্চয়ই একটু কমই চাইবেন। মাস তিনেক মাত্র চালিয়েছে, খুব ভাল কন্ডিশনে আছে।"

বলরামের মনে হল, একটা সাইকেল থাকলে রানিসায়র যাওয়া আর আসার সুরাহা হয়ে যায়। কিন্তু দু'হাজার থেকে একটু কম মানে কত টাকা? দেড় হাজার? অত টাকা দিয়ে কেনা তাঁর দ্বারা হবে না। তবু কিন্তু কিন্তু করে বললেন, "শ' পাঁচেকে যদি হয় তো নিতে পারি, এর বেশি দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।"

"চেয়ারম্যানকে বলে দেখি, যদি রাজি হয়ে যান—তা হলে নেবেন তো?"

"আজই নেব।"

পান্নালাল সাইকেলে উঠে অফিস চলে গেল। বলরাম বাড়ি ঢুকলেন।

"এ কী, বাড়ি ফিরে এলে যে!" তাঁকে দেখেই বিমলা বললেন।

"ট্রেন বন্ধ।"

বলরাম ঘরে ঢুকলেন। পেছনে বিমলা। পাঞ্জাবির বোতাম খুলছেন, তখন বিমলা বললেন, "তোমার সঙ্গে ওই হস্টেলের ছেলেদের নাকি হাঙ্গামা হয়েছে? পাশের বাড়ির কাজের মেয়েটা কোথা থেকে শুনে এসেছে।"

"হাঙ্গামা? আমার সঙ্গে!" বলরাম অবাক হওয়ার ভান করলেন। "অসভ্যতা করছিল তাই বকে দিয়েছি, একে কি হাঙ্গামা বলে? রাস্তা দিয়ে লোক যায় ওরা পেছনে টিপ্পনী কাটে, ছড়া বলে। আমার বকুনির পর এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে।"

বিকেলে পান্নালাল এসে জানাল, "চেয়ারম্যান পাঁচশোতেই রাজি, আজই আপনাকে টাকা দিয়ে দিতে হবে।"

সন্ধ্যাবেলায় তুলসী যখন বর্ষ সঙ্ঘের ক্লাবঘরে দশ কিলোমিটার দৌড়ের এন্ট্রি ফি বাবদ দশ টাকা দিয়ে রসিদ নিল, তখন বলরাম পাঁচশো টাকা গুনে দিচ্ছিলেন

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে।

তুলসী যার হাতে এন্ট্রি ফি-র টাকা দিল তাকে সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা দাদা, প্রাইজ কী দেবেন আপনারা?"

একগাল হেসে এবং ভারিক্কি চালে লোকটি বলল, "অনেক প্রাইজ আছে। আমরা তিনজন স্পনসরার অলরেডি পেয়ে গেছি। সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের, পেইন্টসের আর গুঁড়ো মশলার কোম্পানি দিচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা করে। এখানকার 'আহার' ক্যাটারিং আর 'গৃহলক্ষ্মী' টিভি-র দোকান কথা দিয়েছে তিন হাজার করে দেবে। 'পিকু' হোসিয়ারি ওদের নাম-ছাপা গেঞ্জি দেবে সবাইকে, তাই পরে দৌড়তে হবে। আমরা আরও স্পনসরার জোগাড় করার চেষ্টা করছি, যাতে প্রত্যেককেই কিছু-না-কিছু প্রাইজ দেওয়া যায়। এ বছর মিনিমাম আমরা দেড় হাজার টাকার ফার্স্ট প্রাইজই দেব ছেলে আর মেয়ে-বিভাগে।"

"ফার্স্ট প্রাইজ কী দেবেন?"

"এখনও আমরা ঠিক করিনি, কাল-পরশু মিটিংয়ে বসে কমিটি ঠিক করবে। কেউ বলছে রিস্ট ওয়াচ, কেউ বলছে টেপ রেকর্ডার, কেউ বলছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি, কেউ বলছে সাইকেল...।"

"সাইকেল!" তুলসী উচ্ছ্বসিত হতে গিয়ে ঢোঁক গিলল। "ওটা ছেলেদের, না মেয়েদের জন্য?"

লোকটি একটু তির্যক চোখে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে যেন ফার্স্ট হয়েই গেছেন! ঠাকুরপাড়ার যুব সম্মিলনীর অনেক ছেলেমেয়ে নাম দেবে, ওরা রেগুলার ট্রেনিং করে।"

দমে গেল তুলসী। দৌড় কেন, কোনও খেলার নিয়মিত কোনওরকম ট্রেনিং-ই সে করেনি। রানিসায়রে সাঁতার আর সাইকেলে আট মাইল, একে ট্রেনিং বলে না। তবে তার দম আছে, শরীর কষ্ট নিতে পারে, হাতে-পায়ে জোর আছে। সে বইতে পারে, সইতে পারে, কোনও কিছুতে লেগে থাকতে পারে। এটাই তার পুঁজি, সে হাল ছাড়ে না।

কিন্তু এই দৌড়ে তাকে যদি প্রথম হতে হয়, তা হলে ট্রেনিং তাকে করতেই হবে। বাড়ি ফেরার সময় সে ঠিক করল, প্রতিযোগিতার তো এখনও দু সপ্তাহ বাকি। সকালে, ছটায়, যে সময় দৌড়টা শুরু হবে ঠিক সেই সময়ে সেও রোজ দৌড়বে, ছ মাইল।

চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাইকেলটা হাতে ধরে বলরাম ঝকঝকে চোখে সেটার ওপর দিয়ে বারবার দৃষ্টি বোলালেন। পান্নালাল বলল, "খুব দাঁওয়ে পেয়ে গেলেন কিন্তু। বলুদা, খাওয়াতে হবে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, ওপারে চলো, 'তৃপ্তি মহল'-এর জিভেগজা খাওয়াব।"

"জিভেগজা! এমন একটা সাইকেল পেয়ে তো লোকে নেমন্তন্ন করে মাংস-ভাত খাওয়ায়।"

"খাওয়াব, খাওয়াব।" বলরাম পরিতৃপ্ত স্বরে বললেন।

"এবার সাইকেলটায় চেপে একবার চালিয়ে দেখুন। মনে তো হয়, প্যাডেল করতে অসুবিধা হবে না।"

বহু বছর বলরাম সাইকেল চড়েননি। এখন সাইকেলে উঠতে গিয়ে ব্যালান্স হারিয়ে যদি পড়ে যান, তাও আবার পানুর সামনে!

"কিছু অসুবিধে হবে না, ও আমি দেখে নিয়েছি, সিটটা নিচুই আছে। বুঝলে পানু, সাঁতার আর সাইকেল একবার শিখলে জীবনে কেউ আর ভোলে না। চলো হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই।"

"আপনি এগোন, এখানে আমার একটা কাজ আছে।" দুপা এগিয়েই পান্নালাল ফিরে এল। "বলুদা, শুনলুম হস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে নাকি আপনার গোলমাল হয়েছে ওই প্যারডি গান গাওয়া নিয়ে?"

"গোলমাল? আমার সঙ্গে?" বলরাম আকাশ থেকে পড়লেন এবং মনে মনে সিঁটিয়ে গেলেন। "গুজব, গুজব। আচ্ছা আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি গোলমেলে লোক? আমি শুধু ওদের রিকোয়েস্ট করেছি, নজরুলের গানের এভাবে বিকৃতি করা ঠিক নয়। তোমরা পারলে নিজেরাই গান বাঁধো। ওরা আমার কথা মেনে নিল।"

"ওহ, তাই এখন গান বন্ধ রয়েছে! বোধ হয় ভাবনাচিন্তা করছে নতুন গান বাঁধার জন্য।"

পান্নালাল চলে গেল। বলরাম সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে রেল লাইনগুলো পেরিয়ে স্টেশন রোড ধরে এগোলেন। তাঁর একটু আগেই তুলসী কুলডাঙা রওনা হয়ে গেছে সাইকেলে।

বাড়িতে পৌঁছে বলরাম সাইকেলটা দরজার বাইরে রেখে চেঁচিয়ে বিমলাকে ডাকলেন, "দেখে যাও, কী একটা জিনিস কিনে এনেছি। দেখে চমকে যাবে।"

ব্যস্ত হয়ে বিমলা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন এবং না চমকালেও, অবাক হলেন। "ওম্মা, এটা আবার কী!"

"রেসিং সাইকেল।"

"বলাই আবার রেসে নামবে নাকি পড়াশুনো ফেলে? না না। এখন ওকে এটা দিতে হবে না।"

"বলাইকে দেব কেন? আমি তো নিজের জন্য কিনেছি। খুব সস্তায় পেয়ে গেলাম।"

"তুমি চালাবে সাইকেল!" বিমলা হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন।

"হ্যাঁ চালাব, দেখবে?"

বলরাম হ্যান্ডেল দু-হাতে ধরে ডান পা তুলে লাফ দিলেন চড়ার জন্য। যতদূর তোলা দরকার, পা ততটা উঠল না, ফলে সাইকেল নিয়ে তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

"কাণ্ড দেখেছ!" বিরক্ত হয়ে বিমলা এগিয়ে এসে স্বামীকে টেনে তুললেন এবং বলরাম তুললেন সাইকেল। স্বামীর হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে সাইকেলটা কেড়ে নিয়ে বিমলা আর কথা না বলে সেটাকে হিঁচড়ে টানতে টানতে বাড়িতে ঢুকলেন।

কলঘরের মধ্যে সাইকেলটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে বিমলা জানিয়ে দিলেন, "কাল চেন আর তালা কিনে এনে এটাকে বেঁধে রেখে দেব, এই বয়সে হাড়গোড় ভাঙলে আর জোড়া লাগবে না।"

"এই বয়স মানে?" বলরাম যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রকাশের চেষ্টা করলেন। "তুমি কি আমায় বুড়ো বলছ?"

"হ্যাঁ বলছি। বয়স তো পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কবে!"

"তা হলেই কি লোকে বুড়ো হয়ে যায়? বার্ধক্য কি শুধু বয়স দিয়ে ঠিক হয়?" বলরামকে অবাক দেখাল।

"তবে না তো কী।"

রাত্রে ঘুম এল না বলরামের। ভোরের দিকে বিমলা যখন কাঁথা জড়িয়ে গাঢ় ঘুমে, তখন তিনি নিঃসাড়ে বিছানা থেকে উঠলেন। ট্রাউজার্স, বুশশার্ট আর জুতো পরে, কলঘর থেকে সাইকেলটা নিয়ে সদর দরজা খুলে বেরোলেন।

দরজার বাইরে রক। তার কিনারে সাইকেল রেখে, যেভাবে সেদিন তুলসীকে সাইকেলে উঠতে দেখেছিলেন, সেই ভাবে রক থেকে সোজা সিটে বসলেন। প্যাডেলটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করলেন পা কতটা পর্যন্ত যায়। মোটামুটি পৌঁছচ্ছে। এবার তিনি প্যাডেলে চাপ দিয়ে এগোতে গিয়েই পড়ে গেলেন। কাছেই একটা কুকুর ডেকে উঠল। বলরাম সিঁটিয়ে গিয়ে রকে বসে পড়লেন। এখনও অন্ধকার কাটেনি। কুকুরের ডাকে লোকজন জেগে উঠে তাঁকে চোর বলে যদি ধরে!

মিনিট পনেরো পরে আবার তিনি চেষ্টা শুরু করলেন এবং চতুর্থবারে সফল হলেন, অর্থাৎ পড়লেন না। কিশোর বয়সে প্রথম শিখে সাইকেল চালানোর আনন্দের মতো প্রচণ্ড খুশিতে ভরে গিয়ে তারপর সাইকেল চালিয়ে দিলেন স্টেশনের দিকে।

ফাঁকা রাস্তা। দু-পাশের দোকানগুলি বন্ধ। বহু দোকানের সামনে খাটিয়ায় বা মাটিতে লোকে ঘুমোচ্ছে। লেভেল ক্রশিং পর্যন্ত পৌঁছে তিনি সাইকেল ঘোরালেন। ব্যায়ামের জন্য সাঁতার কাটতে হলে কাটা দরকার ভোরবেলাতেই, আর সেটা রানিসায়রেই। রানিসায়রটা কেমন, সেটা এখন একবার দেখা দরকার। বলরাম কুলডাঙার উদ্দেশে রওনা হলেন। সর্বাগ্রে তাঁকে রমেন স্যারের বাড়িটা খুঁজে বের করে তুলসীকে সঙ্গে নিতে হবে।

বলরাম কোনওদিন এইদিকে আসেননি। তুলসীকে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখেছেন যে রাস্তা দিয়ে, তিনি সেটা ধরেই চললেন। ভোর হতে শুরু করেছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আলোর আভায় রাতের চিহ্নটুকু আকাশ থেকে মুছে গেছে। লোক চলাচল শুরু হয়েছে। তাঁর বাড়ির এত কাছে এমন ধানক্ষেত আর কার্তিক মাসের পাকা ধান তিনি দেখতে পাবেন, স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারেননি। পায়েসের মতো একটা গন্ধ মাটি থেকে উঠে আসছে। তাঁর মনে হচ্ছে, আজন্ম

কলকাতায় আর বিদ্যানগরের মতো শহরতলিতে বাস করে, তিনি এখনও জানেনই না সেই কথাগুলোর মানে—'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল...' বলরাম বেসুরো হেঁড়ে গলায় গানটা গাইতে গাইতে জোরে প্যাডেল শুরু করলেন।

শুধু দুটি লোককে জিজ্ঞেস করেই বলরাম পৌঁছে গেলেন তুলসীদের বাড়ি।

"তুলসী আছ নাকি, তুলসী?" বলরাম ডাকলেন বাঁশের বেড়ার বাইরে থেকে। বাবু বেরিয়ে এল। তার পেছনে ওর মা।

"তুলসী আছে নাকি?" মাকে উদ্দেশ করে বলরাম জিজ্ঞেস করলেন, অবশ্য আগে একটা নমস্কার করে নিয়েছেন।

"তুলসী তো ভোরেই বেরিয়েছে, ছোটার জন্য। ঘণ্টা দেড়েক পর ফিরবে।" তুলসীর মা প্রতিনমস্কার করে বললেন।

"না, না, দিদি তার আগেই ফিরবে।" বাবু শুধরে দিল তার মাকে।

"ওকে কি কিছু বলতে হবে?" মা জিজ্ঞেস করলেন।

"বলবেন মেসোমশাই এসেছিল। আমার নাম বলরাম গড়গড়ি। বিদ্যানগরে থাকি। স্টেশনেই ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওকে বলেছিলাম সকালে রানিসায়রে আমি সাঁতার কাটব, সেইজন্যই এসেছি। সায়রটা তো আমি চিনি না।"

"তুলসী না থাক, বাবু তো আছে। বাবু তুই ওনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দে না।"

মার কথায় বাবু বেরিয়ে পড়ল। মিনিট সাতেক গ্রামের ভেতরের পথ দিয়ে হেঁটে ওরা দুজন রানিসায়রে পৌঁছল। প্রায় দেড়শো বিঘার এক জলাশয়। পাড়ের কাছে জলজ লতাপাতা, গুল্ম থাকলেও মাঝখানটা পরিষ্কার টলটলে। বাঁধানো ঘাট নেই। গ্রামের লোকেরা একটা জায়গা দিয়ে জলে নেমে নেমে সেইখানটায় ঘাট তৈরি হয়ে গেছে।

বলরাম মুগ্ধ হলেন। গা জুড়োনো বাতাস আর জলের সোঁদা গন্ধ তাঁর ফুসফুসকে যেন হাতছানি দিয়ে বলল, "এই হচ্ছে নির্মল তাজা অক্সিজেন টেনে নেওয়ার সময়। ফুসফুস তুমি কাজে নামো, সারা শরীরের কোষে কোষে ছড়িয়ে দাও বিশুদ্ধ বাতাস। মাথার ক্লান্তি, দেহের ক্লান্তি সব মুছে ফেলে দেওয়ার এই তো সুযোগ!

সাইকেলটা ঘাসের ওপর শুইয়ে, বলরাম জুতো এবং জামা খুলে ফেললেন। বাবু অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে। ট্রাউজার্স খুলে জাঙ্গিয়া-পরা বলরাম ছুটে গিয়ে দু-হাত তুলে জলে ঝাঁপালেন।

"আহ্হ্।" একবার তাঁর মুখ থেকে শব্দটা বেরোল। কত বছর পর আবার জলের সঙ্গে তাঁর নতুন করে আলাপ হচ্ছে। তিনি ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে রানিসায়রের পাড় থেকে প্রায় চারশো মিটার ভেতরে গিয়ে ফিরে এলেন। বারবার ডুব দিলেন, জল ছিটোলেন, মড়ার মতো ভাসলেন এবং 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'বলে চিৎকার করলেন।

প্রায় আধঘণ্টা জলে থেকে মুখে হাসি নিয়ে বলরাম রানিসায়র থেকে উঠলেন। বাবু বলল, "গামছা আনেননি? গা মুছবেন কী করে? দাঁড়ান, আমি ছুট্টে বাড়ি থেকে

নিয়ে আসি!"

"আরে না, না, না। গায়ের জল এখনিই বাতাসে শুকিয়ে যাবে । আজ প্রথম দিন তো, কতটা সাঁতরালাম বলো তো?"

বাবু সায়রের দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে বলল, "যাতায়াতে আধ মাইল হবে। দিদি এর থেকেও বেশি যায়।"

"তা তো যাবেই, ওর অভ্যেস আছে। আর আমি তো বলতে গেলে নতুন জলে নামলাম।"

"দিদি, আপনার থেকেও জোরে সাঁতরায়।"

"তা তো সাঁতরাবেই, আমার থেকে বয়স অনেক কম।"

ভিজে জাঙ্গিয়ার ওপর ট্রাউজার্রটা পরে, জুতো পায়ে গলিয়ে বলরাম সাইকেলটা তুলে বললেন, "চলো, আজ এই পর্যন্ত।"

"জামাটা পরুন।"

"নাহ্। সকালের এই নরম রোদে আলট্রা ভায়োলেট আছে। চামড়ায় লাগানো দরকার।"

বাড়ির কাছাকাছি এসে বাবু বলল, "দিদি, একটু পরেই তো আসবে, আপনি বসবেন আমাদের বাড়িতে?"

বলরাম মাথা নাড়লেন। "বাজার যেতে হবে, রান্না হবে, খেয়েদেয়ে অফিস যেতে হবে। দিদিকে বোলো, আমি কাল আসব।" একটু ভেবে যোগ করলেন, "রোজই আসব।"

বলরাম যখন তুলসীদের বাড়ি থেকে সাইকেলে উঠলেন তখন তুলসী রেলওয়ে ট্র্যাকের মাঝের স্লিপারের ওপর দিয়ে ছুটছে। হাতঘড়ি দেখে সে ছোটার বেগ বাড়াল। দশ কিলোমিটার দূরত্বের মাপটা পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সে জানে পরের রেল স্টেশন ঠাকুরপাড়ার দূরত্ব বিদ্যানগর থেকে ছয় কিলোমিটার। যাতায়াতে বারো কিলোমিটার। এটাকেই সে মাপ ধরে নিয়ে আপ লাইনে এক নম্বর ট্র্যাকের স্লিপারের ওপর দিয়ে দৌড়েছে।

ছোটার মধ্যে দুটি আপ ট্রেনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। পেছন ফিরে তাকিয়ে কোনও ট্রেন আসছে কি না দেখে নিয়ে সে দু-নম্বর ট্র্যাকে সরে যায়। স্লিপারগুলো কংক্রিটের এবং তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রায় সমান মাপের নয়, ফলে তার অসুবিধে হচ্ছিল দৌড়ের ছন্দ রাখতে। কিন্তু এটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। সে জানে যে-রাস্তা দিয়ে তাকে দৌড়তে হবে, সেটা এর চেয়েও খারাপ।

বিদ্যানগর-ঠাকুরপাড়া প্ল্যাটফর্ম থেকে প্ল্যাটফর্ম সে যাতায়াত করল, ঘড়ি ধরে পঁয়ষট্টি মিনিটে। শেষের দিকে কষ্ট হচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল দাঁড়িয়ে পড়তে। কোমর, উরু ভারী হয়ে পা যেন আর উঠতে চাইছিল না। তবে সে জানে, প্রথম কয়েকটা দিন এইরকমই হবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে।

বলরাম বাড়ি পৌঁছতেই বিমলা জানতে চাইলেন, "এই সাত সকালে খালি গায়ে

কোথায় বেরিয়েছিলে?"

"সাঁতার কাটতে।"

"সাঁতার! সাইকেলে চেপে?"

"সাইকেলে চেপে সাঁতার কাটা যায় না। সাইকেলে চেপে জলের ধারে যাওয়া যায়, আর সেইজন্যেই এটা কিনেছি। চার মাইল দূরে কুলডাঙায় রানিসায়র, সেখানে গিয়ে সাঁতার কেটে এলাম। দাও, থলে দাও, বাজার যাব। আর বলে রাখছি এবার থেকে রোজ ভোরবেলায় যাব। আমার দারুণ ভাল লাগছে নিজেকে।"

বিমলা হতবাক! তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠবেন।

বলরাম যখন অফিসে পৌঁছলেন, তুলসী তখন ঘরের মেছেয় চিত হয়ে শুয়ে। বাড়ি ফিরেই সে শুনেছে, বলরাম এসে রানিসায়রে সাঁতার কেটে গেছেন। সে অবাক হয়েছে রেসিং সাইকেলে চড়ে বলরামের আসার কথা শুনে। "মেসোমশাইয়ের সাইকেল আছে এটা তো জানতাম না!" তুলসীর দুটো পা মালিশ করে দিতে দিতে মা বললেন, "প্রথম দিনেই কি এত পরিশ্রম করতে হয়... অভ্যাস নেই, ব্যথা তো করবেই। এখন চান করে দুটো ভাত খেয়ে নে, তারপর ঘুমো।"

যা কখনওই হয় না, আজ বলরামের তাই হল। অফিসে কাজ করতে করতে তিনি ঘুমে ঢুলতে শুরু করলেন।

"ও গড়গড়িদা, আজ হল কী আপনার, ঘুমোচ্ছেন যে?" মনোজ সামন্ত সত্যিই অবাক!

চমকে সিধে হয়ে বসে বলরাম বোকার মতো হাসলেন। "বহু বছর পর আজ খুব সাঁতার কেটেছি।"

" সাঁতার? এই বয়সে? ডুবে যাবেন মশাই!"

"তা হলে তো হাফ ছুটি পাবেন।"

"তা পাব। কিন্তু ব্যাপারটা কী, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ানশিপে নামবেন টামবেন নাকি?"

বলরাম গম্ভীর মুখে বললেন, "হ্যাঁ।"

সূর্য সঙ্ঘের প্রতিযোগিতার দিন সকাল ছ'টার আগে সাইকেলে বেরিয়ে পড়লেন বলরাম। সঙ্ঘের সামনে থেকে শুরু হয়ে, পুরুষ ও মেয়েদের প্রতিযোগিতা শেষ হবে ওখানেই। তার মধ্যে বিদ্যানগর লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে মেয়ে প্রতিযোগিরা ছুটবে মাজাভাঙা, হোতর পার হয়ে ডানদিকে বেঁকে জোড়াশোল। সেখান থেকে আবার ফিরে আসবে আগের রাস্তা ধরে। অতঃপর বিদ্যানগর লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে এসে প্রথম হওয়া মেয়েটি সূর্য সঙ্ঘের ক্লাবঘরের সামনে সুতো ছিঁড়বে। ছেলেদের দৌড়ের দূরত্ব যেহেতু দীর্ঘ, তাই তাদের পথ জোড়াশোল থেকে আরও প্রায় পাঁচ কিলোমিটার

দূরে সখিবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে তারপর তারা ফিরে আসবে।

ছেলেরা এবং মেয়েরা মোটামুটি কাছাকাছি সময়ে যাতে দৌড় শেষ করে, সেজন্য তাদের শুরুর সময়টাকে আগে-পিছে করা হয়েছে। ছেলেদের কুড়ি কিলোমিটার দৌড় শুরু হবে ছ'টায়। তার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর শুরু হবে মেয়েদের। ভোর ছ'টাতেই ক্লাবঘরের সামনে মাঠে লোক জমে গেছে। লাউডস্পিকারে অবিরাম নির্দেশ দেওয়া চলেছে। স্বেচ্ছাসেবকরা 'পিকু' লেখা হলুদ গেঞ্জি আর সাদা কাপড়ের টুপি পরে। রানারদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার ও পাশে পাশে থাকার জন্য সাইকেল নিয়ে তারা তৈরি হয়ে রয়েছে। প্রতি সাইকেলের হ্যান্ডেলে ক্লাবের পতাকার রঙের কাপড় কাঠি দিয়ে আঁটা।

প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করার জন্য প্রথমে ঠিক হয়েছিল জেলার মন্ত্রী। কিন্তু সুন্দরবন সফরে যাওয়ায় তাঁর বদলে মনোনীত হন স্থানীয় এম এল এ। কিন্তু তিনি গতকাল একটি জন্মদিনের নিমন্ত্রণে আহারের পরিমাণ ঠিক রাখতে না পেরে ঔদরিক গোলমালে পড়ে গেছেন। সকালে খবর পাঠিয়েছেন, তিনি আসছেন না। অবশেষে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে প্রায় বিছানা থেকেই তুলে আনা হয়েছে। আসার আগে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, অন্তত দাঁত মাজার সুযোগটা তাঁকে দেওয়া হোক। কিন্তু দেওয়া হয়নি।

কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় নলের ডগায় ছিপি আঁটা একটা এয়ারগান আকাশের দিকে তুলে চেয়ারম্যান এগিয়ে এলেন। ছত্রিশজন প্রতিযোগী চুনের দাগ দেওয়া লাইনে হলুদ গেঞ্জি আর সাদা টুপি পরে ঠেলাঠেলি শুরু করল। তাদের অর্ধেকেরই খালি পা। বাকিদের পায়ে কেড্‌স।

"কী বলতে হবে যেন বললে?" চেয়ারম্যান তাঁর পাশে দাঁড়ানো ক্লাব সচিবকে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা স্যার, বাংলা ভাষাকে মাতৃদুগ্ধ গণ্য করি। তাই আপনি বাংলাতেই বলুন—'নিজের জায়গায় দাঁড়াও'... 'তৈরি হও'... এই বলার পর ফায়ার করবেন।"

"গুড, ভেরি গুড। বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে, খেলার মধ্যেও। কিন্তু সকলের আগে একটা স্বাগত বা উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়া উচিত নয় কি?"

"স্যার। এখনও আপনার দাঁতমাজা হয়নি!"

"তা বটে। আচ্ছা, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় আমাকে ডেকো।"

চেয়ারম্যান এয়ারগান তুললেন, সচিব যা বলতে বলেছিলেন বললেন, ট্রিগার টিপলেন, কিন্তু ছিপিটা বেরোল না। দ্বিতীয়বার টিপলেন, এবং 'ফুট' করল।

তাই যথেষ্ট। হইহই করে প্রতিযোগিরা ছোটা শুরু করে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে লাউডস্পিকারে বেজে উঠল রেকর্ড: "চল চল চল। ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল, চল, চল।"

বলরাম স্টেশনের লেভেল ক্রসিংয়ের পাশে সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে শুনতে পায়ে তাল দিচ্ছিলেন। গানটা এখন তাঁর সত্যিই ভাল লাগছে। তিনি অপেক্ষা করছেন মেয়েদের দৌড় শুরু হওয়ার জন্য। লেভেল ক্রসিং খোলা,

এখন কোনও ট্রেন আসছে না, বলরামের সামনে দিয়ে ছত্রিশজন দৌড়ে চলে গেল। তাদের পেছনে একটি জিপ। তাতে রয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে একজন ডাক্তার। স্টেশান রোড এখনও জমে ওঠেনি ভিড়ে। তবে বাড়ির বারান্দায়, জানলায়, ছাদে লোক।

মেয়েদের দৌড় শুরুর দেরি আছে। বলরাম ঠিক করলেন, এই ফাঁকে বাজারটা সেরে নেবেন। থলি নিয়েই বেরিয়েছেন। তাঁর হাঁটার মতো বাজার করাটাও দ্রুত হয়ে থাকে। এখন হাঁটার বেগ সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় তিনি মন্থর হয়েছেন। কিন্তু বাজার করার জন্য সময় তিনি বাড়াননি। ঠিক পনেরো মিনিটে কাজ সেরে, একটা খবরের কাগজ কিনে আবার লেভেল ক্রসিংয়ে ফিরে এসে সেটা পড়তে শুরু করলেন।

তুলসীকে বলা হয়েছিল, দৌড় শুরুর একঘণ্টা আগে হাজির হতে। পৌনে ছ'টায় সাইকেল চালিয়ে এসে পৌঁছে, সে ক্লাবঘরে একটা বেঞ্চে চুপচাপ বসে পড়ে। একে একে পুরুষ ও মেয়ে প্রতিযোগীরা আসতে থাকে।

তার চোখ ছিল মেয়েদের ওপর। অধিকাংশই তারই বয়সি, স্থানীয় মেয়েই সংখ্যায় বেশি। তবে তিনটি অচেনাকে তার মনে হল ঠাকুরপাড়া যুব সম্মিলনীর। ভাল স্বাস্থ্য, পায়ের পেশি সবল। ওদের একই আকাশি রঙের শর্টস, লাল ও নীল পাড় দেওয়া একই মোজা ও কেডস।

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। এক সময় ওরা নানারকম ব্যায়াম শুরু করল। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তুলসীও সমীহ ও কৌতূহলভরে তাই দেখতে দেখতে কিছুটা দমে গেল।

এরা রীতিমতো দু'বেলা ট্রেনিং করে। এরা অ্যাথলিট। কী ভাবে পা ফেলে দৌড়তে হয়, সেটা একটা শেখার ব্যাপার। সে শেখেনি। দৌড়ের আগে শরীর গরম করা যে দরকার, এটাও সে জানত না । একবার সে ভাবল, ওদের মতো শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে, লাফিয়ে, দুলিয়ে, বাঁকিয়ে নেবে নাকি। কিন্তু অদ্ভুত একটা লজ্জাবোধ তাকে বাধা দিল। ওরা তা হলে নিশ্চয়ই মুখ টিপে হাসবে। তবে চার মাইল সাইকেল চালিয়ে আসার পর এখন তার শরীরে চনমনে একটা সজীবতা পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওঠানামা করছে।

ছ'টা চল্লিশে মেয়েদের ডাকা হল স্টার্টিং লাইনে আসার জন্য। নাম দেওয়া আঠারোজনের মধ্যে চারজন অনুপস্থিত। মেয়েদের দৌড়ের উদ্বোধক স্থানীয় থানার অফিসার ইনচার্জ। ইনি বক্তৃতা দেওয়ার বিরোধী এবং এয়ারগান হাতে নিয়ে ক্লাব সচিবকে জানিয়ে দিলেন, "জানি মশাই জানি, স্টার্ট দেওয়ার জন্য কী বলতে হবে।"

"আমরা কিন্তু মাতৃভাষায় স্টার্ট...।"

"অবশ্যই, অবশ্যই...তুলনা হয় নাকি মাতৃভাষার!" এই বলেই দারোগাবাবু বিশেষ এক পুলিশি কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন, "অন ইওর মার্ক...গেট, সেট..." এবং তার পর 'ফুট'। সঙ্গে-সঙ্গে লাউড স্পিকারে বেজে উঠল, "ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...।"

প্রবল উৎসাহে কিছু মেয়ে ছোটা শুরু করল এমনভাবে, যেন বিদ্যানগর স্টেশনে হুটার শুনেছে, তাদের এখন ট্রেন ধরতে হবে। তুলসী চোখ রেখেছে তিনটি মেয়ের

ওপর। ওরা কী করে সেটা তাকে দেখে যেতে হবে।

লেভেল ক্রসিংয়ের ধারে ভিড় জমেছে, তার মধ্যে আছেন বলরামও। মেয়েদের আসতে দেখে ভিড়টা এগিয়ে গেল। হ্রস্বাকৃতি এবং হাতে ধরা সাইকেল এই দুইয়ের কারণে বলরাম সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। দুটি লোকের কাঁধের পাশ দিয়ে কোনওক্রমে মুখটুকু বের করে দেখলেন সাত-আটটি মেয়ে তাড়াহুড়ো করে দৌড়ে গেল। তাদের মধ্যে তুলসী নেই। ওদের দশ-বারো মিটার পেছনে ছ' সাতজন মেয়ের একটি দল। সবার পেছনে একটি জিপ। বলরাম তুলসীকে দেখতে পেলেন। সাদা টুপি, হলুদ গেঞ্জি, কালো শর্টস, নীল কেড্‌স, পায়ে মোজা নেই। চোখের নজর ডান দিকে—বাকি মেয়েদের ওপর।

"গুডলাক্ তুলসী...গুডলাক্।" বলরাম চেঁচিয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হল, তুলসী যেন মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখার চেষ্টা করল।

"পেছনের মেয়েগুলোই ঠিক ছুটছে, সামনের মেয়েগুলো ভুল করছে।" ভিড় ভেঙে যাওয়ার পর স্টেশন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক প্রবীণ বয়স্ক তাঁর পাশের লোককে কথাটা বললেন।

পেছন থেকে সেটা শুনে একজন তরুণ সন্দিগ্ধ গলায় বলল, "সামনের মেয়েরা ভুল করছে বললেন কেন?"

"দশ কিলোমিটার দৌড়তে হবে, সাতটা প্রায় বাজে, রোদ এবার চড়চড় করবে। দু'দিন হল আবার গরম পড়েছে। শুরুতেই অত জোর দিলে পারবে শেষ করতে? তার ওপর এই জঘন্য ভাঙাচোরা রাস্তা।"

বলরামের কানেও কথাগুলো গেল। লোকটির যুক্তিতে সায় দিয়ে তিনি যোগ করলেন, "ভাল মাঠে দৌড়তে যে পরিশ্রম হবে, তার ডবল লাগবে এই রাস্তায় দৌড়তে। এগুলো হিসেবের মধ্যে রেখে দৌড়ের স্পিড ঠিক করতে হবে।"

শুনতে শুনতে তরুণটির মুখ বোকার মতো হয়ে গেল। "আমার বোনকে তো প্রথমেই একটা চার-পাঁচশো মিটারের বড় লিড নিয়ে দৌড়তে বলেছি!"

"ভুল করেছেন।" বলরাম বললেন।

"তা হলে কী হবে? তরুণটি ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে যেন পরামর্শ চাইল। "বারণ করে দিয়ে আসব?"

কথা না বলে বলরাম সাইকেলে উঠলেন। বাজারটা তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। একটু পরেই তিনি দেখলেন, সেই তরুণটি ঊর্ধ্বশ্বাসে তাঁর পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

হোতর থেকে ডান দিকে একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে জোড়াশোলে। এটা মাটির রাস্তা। গোরুর গাড়ি আর ভ্যানরিকশার চাকা রাস্তার দুই ধারে নালার মতো গর্ত করে রেখেছে। প্রায়ই রাস্তার দুই পাশ ধসে পড়া। পঞ্চায়েত থেকে রাস্তা মেরামতের

চেষ্টায় কয়েক বছর আগে যেসব ভাঙা ইট ফেলা হয়েছিল, সেগুলোর উঁচিয়ে থাকা ছুঁচোলো মাথা যুদ্ধক্ষেত্রে পুঁতে রাখা মাইনের মতো আচরণ না করলেও, পদাতিক গ্রামবাসীর কাছে দুঃস্বপ্ন।

হোতর-জোড়াশোল রাস্তার মোড়ে এখন বহু লোক জমা হয়েছে। তার মধ্যেই সাইকেল নিয়ে রয়েছেন বলরামও। মেয়ে প্রতিযোগীদের চোদ্দোজনই জোড়াশোলের দিকে চলে গেছে। সেখানে ঘণ্টার মোড় ঘুরে তারা প্রত্যাবর্তন করবে। সবাই প্রতীক্ষা করছে সেইজন্যই।

এখানকার বহু মানুষই সাইকেল চড়া রমেন স্যারের মেয়েকে চেনে। তারা আশা করে আছে, তাদের পাশের গ্রাম কুলডাঙার মেয়েটিই প্রথম আসবে। বস্তা মাথায় এক চাষি বলরামকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ বাবু, এখানে হতিসে কী?"

"দৌড় হচ্ছে, দৌড়। মেয়েরা দৌড়চ্ছে।"

"কতডা দৌড়িবে?"

"দশ কিলোমিটার।"

"সেডা কতটা?"

"তিন কোশ।"

"অ।" বলে চাষি চলে যেতে গিয়েও ফিরে এল। "দেখি যাই ক্যামন দৌড়ায়।" বলরামের পাশে সে দাঁড়িয়ে গেল।

কে একজন কাঁসর এনেছে। সেটা বাজাতে শুরু করতেই ভিড় থেকে রব উঠল, "আসছে, আসছে।"

প্রথম আসছে ঠাকুরপাড়া যুব সম্মিলনীর দুটি মেয়ে। তাদের পাশে পাশে পতাকা লাগানো সাইকেল নিয়ে এক পথপ্রদর্শক। ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। "রমেন স্যারের মেয়ে কই?...সে অনেক পেছনে পড়ে।"

তুলসী তিনজনের পর এবং প্রথমজনের থেকে প্রায় তিনশো মিটার পেছনে। বলরাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করলেন প্রথম দুটি মেয়ের মুখ। ছ' কিলোমিটার দৌড় হয়েছে। ওদের মুখে শ্রান্তির ছাপ, পদক্ষেপে অবসাদ। বলরামের মনে হল, নিজেদের টানতে টানতে যেন ওরা এগোচ্ছে, একে দৌড় বলে না। অসমান, ভাঙাচোরা রাস্তায় দৌড়ের অভ্যাস না থাকায় এবং বারবার গর্ত আর উঠে-থাকা ইট এড়াবার জন্য সোজা পথে দৌড়ের সুযোগ না পাওয়ায়, ওদের বাড়তি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ছোটার ছন্দও নষ্ট হয়ে গেছে। ওদের চোখে বিরক্তি। যুব সম্মিলনীর আর-একটি মেয়ে ছিল, সে গেল কোথায়? বলরাম তাকে দেখতে পেলেন না।

তৃতীয় মেয়েটি ছুটছে মাথাটি একদিকে হেলিয়ে, আপনমনে কী যেন ভাবতে ভাবতে। চোখ দুটি লাল। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে দূরপাল্লার দৌড়ে অনভ্যস্ত। বলরামের মনে হল, বেশিক্ষণ টিকবে না।

কিন্তু তুলসীর এ কী হল! খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে কেন! সঙ্গের সাইকেলের লোকটি জলের বোতল দিল ওর হাতে। তুলসী থেমে গিয়ে বোতলের জল তার

দু'পায়ের কেড্‌সের ওপর ঢেলে বোতল ফিরিয়ে দিয়ে আবার ছোটা শুরু করল। লোকটি অপেক্ষা করতে লাগল একসঙ্গে আসা পঞ্চম ও ষষ্ঠ মেয়ে দুটির জন্য।

বলরাম লাফিয়ে সাইকেলে উঠলেন। তুলসী হোতরের মোড় থেকে বাঁ দিকে বেঁকে মাজাভাঙার রাস্তা ধরেছে। এই রাস্তাটায় কোনও এক সময় পিচ ও পাথরকুচি ঢালা হয়েছিল তার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও ছড়ানো আছে। এই রাস্তাটা তুলসী ও বলরাম দু'জনেই ভালমতো চেনে।

"কী হল পায়ে?" সাইকেলটা তুলসীর পাশে এনে চালাতে চালাতে উদ্বিগ্ন স্বরে বলরাম জিজ্ঞেস করলেন।

"কেড্‌সটা বাবুর।" ছুটতে ছুটতে এককথায় তুলসী জানিয়ে দিল তার সমস্যাটা।

"খুলে ফেলো। এখন তো রাস্তা একটু ভাল।"

"ঠোক্কর লেগে বুড়ো আঙুলে যন্ত্রণা...বোধ হয় নখটা উঠে গেছে...ভীষণ লাগছে।" তুলসীর মুখ কুঁকড়ে গেল কথা বলার সঙ্গে।

"দাঁড়াও।" ধমকে উঠলেন বলরাম। "খোলো জুতো।"

তুলসী থেমে গেল। নিচু হয়ে জুতো দুটো খুলতেই বলরাম তা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "ছোটো।" তিনি তুলসীর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটায় লাল ছোপ দেখতে পেয়েছেন।

পেছনের মেয়েরা একই দূরত্বে পেছনে রয়েছে। ওদের পক্ষে আর সম্ভব নয় ব্যবধানটা ঘোচানো। তুলসীর সামনের মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল কোমরে হাত রেখে। পেছনের জিপ এসে ওকে তুলে নিয়ে যাবে। মেয়েটি ম্লান হাসল, যখন তুলসী তার সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। প্রথমের দুটি মেয়ে জোড়-বেঁধে এতক্ষণ দৌড়ে এসেছে এবার তাদের একজনকে বলরাম দেখলেন সাত-আট মিটার পিছিয়ে পড়েছে।

মাজাভাঙার তেঁতুলতলায় পৌঁছে বলরামের মনে হল, তুলসীকে যদি এই দৌড় জিততে হয়, তা হলে এখনই ওকে গতি বাড়াতে হবে, নইলে ব্যবধান ঘোচাবার জন্য সময় আর পাবে না।

"তুলসী?"

বলরাম ডাকলেন। তুলসী একবার তাকাল তাঁর দিকে।

"সামনের দুজনকে দেখা যাচ্ছে না, অনেক এগিয়ে গেছে। স্পিড বাড়াও।

"আঙুলে লাগছে মেসোমশাই।"

তুলসীর দৌড়ের গতি বাড়ল না। রাস্তার দু'ধারে দর্শকদের সংখ্যা এবার ক্রমশ বাড়ছে। যতই বিদ্যানগরের দিকে এগোবে, সংখ্যাটা ততই বাড়বে। দর্শকদের অনেকেই তুলসীকে সাইকেলে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছে। এখন তাকে দৌড়তে দেখে তারা অবাক হয়ে যাচ্ছে।

"লাগুক আঙুলে, তুমি শুধু আমাকে তাড়া করো।"

এই বলে বলরাম সাইকেলটা তুলসীর সামনে এনে চালাতে শুরু করলেন। তুলসী দৌড়ের জোর একটু বাড়াল। বলরাম পিছু ফিরে দেখলেন একবার, তারপর আর

একটু জোরে সাইকেলে প্যাডেল করলেন। তুলসীও আর একটু গতি বৃদ্ধি করল।

"এই, এই মশাই, এটা কী হচ্ছে?" পতাকা লাগানো সাইকেল নিয়ে হলুদ গেঞ্জি পরা একজন বলরামের পাশে চলে এল। "আপনি ওকে হেল্প করছেন, পেস সেটারের কাজ করছেন, এটা বে-আইনি জানেন?"

"আরে মশাই, বয়ে গেছে, আমার পেস সেটারের কাজ করতে।" সাইকেলের গতি একটুও না কমিয়ে রাগত স্বরে বলরাম বললেন। "আমি এখন স্টেশনে যাচ্ছি ট্রেন ধরতে। দেখলুম মেয়েটা খোঁড়াচ্ছে, আঙুল দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। তাই বললুম, "খুকি একটু ফার্স্ট এড দিয়ে নাও, নইলে সেপটিক হয়ে যাবে।" মেয়েটিকে আপনারা একটু দেখুন। ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরে গেলে আপনাদেরই তো দুর্নাম হবে।"

"ফার্স্ট এড বক্সটা জিপে আছে। আচ্ছা, আমি দেখছি।"

পতাকাধারী সাইকেলটা পেছন দিকে ঘুরে জিপের খোঁজে চলে গেল। লোকটি যেন ঘাবড়ে গেল ধনুষ্টঙ্কারে মরে যাওয়ার কথা শুনে। বলরাম হাসলেন এবং হাত নেড়ে তুলসীকে গতি আরও বাড়াতে ইশারা করলেন।

সামনের দুটি মেয়ের একজন, যে পিছিয়ে পড়ছিল তুলসী তাকে পার হয়ে গেল বিদ্যানগরে ঢোকার মুখেই। তাকে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে মেয়েটি উৎকণ্ঠিত মুখে গতি বাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু তুলসী এখন ঊর্ধ্বশ্বাসে তাড়া করে যাচ্ছে বলরামের সাইকেলকে। মেয়েটি হাল ছেড়ে দিল। এবার সে প্রথমজনকে দেখতে পাচ্ছে। রাস্তা এখন আঁকাবাঁকা, প্রথম মেয়েটিকে কখনও দেখা যাচ্ছে, আবার কখনও বাঁকের মুখে আড়ালে চলে যাচ্ছে। দু'ধারের ভিড় নেমে এসে রাস্তাটাকে সরু করে দিয়েছে।

বলরাম নির্বিকার মুখে সাইকেলের গতি একটু একটু করে বাড়িয়ে যাচ্ছেন। রামপ্রসাদ হস্টেলের বারান্দায় সার সার মুখ। দেখে বলরামের মনে ফুর্তি জাগল। তিনি গুনগুন গাইলেন, "মাথার ঊর্ধ্বে আছে মাদল, নিম্নে উতলা পদযুগল...পদযুগল...পদযুগল।" দু' পায়ের চাপে বনবন প্যাডেল ঘুরছে।

প্রথম মেয়েটি বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। তার চোখে স্পষ্ট ভীতি। খালি পায়ের, কালো শর্টস পরা মেয়েটা তার কুড়ি মিটারের মধ্যে এসে পড়েছে। নাছোড়বান্দা ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে তার সঙ্গে।

"সরে যান, সরে যান, রাস্তা পরিষ্কার রাখুন...মেয়েদের দশ কিলোমিটার দৌড়ের প্রতিযোগীরা সমাপ্তি-সীমানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা পিছিয়ে যান।" দুই সাইকেল আরোহী চিৎকার করে হাত নাড়তে নাড়তে পেছন থেকে এসে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তায় নেমে আসা ভিড় তাতে একটুও সরল না।

"জায়গা করে দিন, দৌড়োবার জায়গা রেখে আপনারা পিছিয়ে যান।" বলরামও হঠাৎ আগের দুই সাইকেল আরোহীর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে চেঁচাতে শুরু করলেন। তাঁর একটু আগেই যাচ্ছে প্রথম মেয়েটি এবং পিছনে তুলসী। দু'ধার থেকে জনতার উৎসাহধ্বনি আর হাততালিতে বলরামের চিৎকার ডুবে গেল।

"পথ থেকে সরে যান, সরে যান।" বলতে বলতে বলরাম প্রথম মেয়েটির পাশে

চলে এলেন। পেছনে তাকিয়ে দেখলেন তুলসী দাঁতে দাঁত চেপে তাঁর সাইকেলের পেছনের চাকার দিকে তাকিয়ে দৌড়চ্ছে। একবার সে মুখ তুলল। তখন বলরাম তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, "এবার এগোও।" বলেই তিনি রাস্তার ধারে সরে গিয়ে সাইকেল থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

স্টেশনের পুবদিকের লেভেলক্রসিং দেখা যাচ্ছে। প্রথম মেয়েটি বারবার পেছনে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে তুলসীকে। দু'জনের ব্যবধান বড়জোর তিন মিটারের। এখন দু'জনের লড়াই চলছে দম আর সহন-ক্ষমতার মধ্যে। তুলসী জানে দুটো ব্যাপারে সে কারও চেয়ে কম নয়, সুতরাং এবার সে একটা শেষ চেষ্টা করবে। আঙুলের নখটা প্রায় উঠে গেছে। যন্ত্রণা নিয়ে, খোয়া, পাথর, গর্ত আর ঢিবিতে ভরা রাস্তায় খালি পায়ে সে এতটা দৌড়েছে একটা আশার পেছনে। সেই আশা এখন সম্ভাবনা হয়ে দেখা দিয়েছে। এবার নিজেকে নিংড়ে দিয়ে তার এই দৌড়ে নামাকে সার্থক করে তুলতে হবে। নয়তো নিজের কাছে নিজে লজ্জায় মরে যাবে।

পুবের লেভেলক্রসিং পার হয়ে রেলের চার নম্বর ডাউন ট্র্যাকের মধ্যিখানে এক পা ফেলে মেয়েটি হার্ডলারের মতো লাফিয়ে পার হল। তার ঠিক চার হাত পেছনেই তুলসী। তিন নম্বর আপ ট্রাকের মাঝে ডান পা ফেলে মেয়েটি বাঁ পা তুলেছে। পা-টি এবার সে রেললাইনের বাইরে ফেলবে। এই সময়ই তুলসীর চোখ পড়ল জায়গাটায়। মেয়েটি তার বাঁ পা যেখানে ফেলতে যাচ্ছে সেখানেই সেই গর্তটা। ঘাসে আর পাতায় ঢাকা। এই গর্তে পড়েই তার সাইকেলের টিউব পাংচার হয়েছিল। মেয়েটির পেছন থেকে তুলসী চকিতে বাঁ দিকে সরে গেল।

"আহ্হ্...মা গো।"

হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মেয়েটি। "এই আমার শেষ সুযোগ', তুলসীর মনের মধ্যে দপ করে উঠল আশার একটা ঝলকানি। মেয়েটির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে দেখল জমিতে দু' হাত রেখে সে ওঠার চেষ্টা করছে।

ডাউন দু' নম্বর, তারপর আপ এক নম্বর রেল ট্র্যাক, তারপর পশ্চিমের লেভেলক্রসিং পার হয়ে তুলসী এমনভাবে ছুটতে শুরু করল, যেন কোনও উন্মাদ আত্মা তাকে ভর করেছে।

এবার 'প্রথম, প্রথম, প্রথম...' মন্ত্রের মতো শব্দটা সে মনের মধ্যে আওড়ে যেতে যেতে সূর্য সঙ্ঘ ক্লাবঘরের সামনে পৌঁছল।

পনেরো ফুট ব্যবধানে দুটো বাঁশের খুঁটি ধরে দু'জন ছেলে। তাতে বাঁধা লাল পশমের সুতো। তুলসী হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুতোর ওপর। সে দেখল একটি লোক তাকে দু'হাতে ধরে নিল। দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে আসার আগে সে শুনতে পেল কেউ চিৎকার করে বলছে, "জল, জল, অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

দ্বিতীয় হওয়া মেয়েটি সমাপ্তি রেখায় পৌঁছল তুলসীর দশ সেকেন্ড পরে। তৃতীয় মেয়েটি এল দু' মিনিট পরে, মোট আটটি মেয়ে দৌড় শেষ করেছে। ছেলেদের কুড়ি কিলোমিটার দৌড়ে প্রথমজন সহজেই জিতল, প্রতিযোগিতা হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে। দৌড় শেষ করেছে তিনজন ছাড়া সবাই।

তুলসীকে শুইয়ে রাখা হয়েছে ক্লাবঘরের মধ্যে একটা বেঞ্চে। তাকে একটা ইঞ্জেকশন আর ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছে। পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যান্ডেজ। নখটা আধখানা উঠে গেছে। ঘরভর্তি লোক। চারদিকে কর্মব্যস্ততা আর কোলাহল। পুরস্কার দেওয়ার অনুষ্ঠানের জন্য তোড়জোড় চলছে। মেয়ে প্রতিযোগীরা এরই মধ্যে পাশের বাড়ির একটি ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে এসেছে।

তুলসী উঠে বসল। এধার ওধার তাকিয়ে সে বলরামকে খুঁজল। দেখতে পেল তার সাইকেলটা একধারে রাখা। হ্যান্ডেলে ঝুলছে কাপড়ের থলি, তার মধ্যে আছে তার শালোয়ার-কামিজ। কেড্‌স জুতো পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল, সেটা তো পথেই তুলে নিয়েছেন মেসোমশাই। দ্বিতীয় হওয়া মেয়েটি খয়েরি ট্র্যাকসুট পরে দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। তুলসীর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় সে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, "তোমার যা বরাত, আজ একটা লটারির টিকিট কিনে নিয়ো।"

তুলসী ম্লান হেসে মেয়েটির হাতটা ধরেই ছেড়ে দিল। সত্যিই বরাত-জোরে সে জিতেছে। গর্তটাই তাকে জিতিয়ে দিল, নাকি মেসোমশাই মাঝপথ থেকে সাইকেলে তাকে প্রায় টেনেই নিয়ে এলেন, সেটা এখনও সে বুঝে উঠতে পারছে না। তার মনের মধ্যে একটা খচখচানি শুরু হয়ে গেল। এই জয়টাকে পুরো উপভোগ করতে কোথায় যেন তার বাধছে।

"এখন শরীর কেমন লাগছে?" কর্মকর্তাদের একজন গ্লুকোজের জলভরা গ্লাসটা তুলসীর হাতে দিয়ে হেসে বললেন, "খেয়ে নাও। জামাকাপড় বদলে, চুলটুল আঁচড়ে নাও। এখুনি তো প্রাইজ দেওয়া হবে। এই সাইকেলটা তো তোমার?"

"হ্যাঁ।"

"বাড়ি কদ্দুরে?"

"কুলডাঙায়।"

"সে তো অনেকটা পথ। এখনই ফিরে যেতে অসুবিধে হলে কিছুক্ষণ কারও বাড়িতে বিশ্রাম নিতে পারো।"

তুলসীর একবার মনে হল, বলে এখানে তার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় থাকেন, তেমন বুঝলে তাঁর বাড়িতেই যাব। তারপরই ভাবল, জগন্নাথকাকা যদি বিব্রত হন! ছুটির দিন ওঁর বাড়িতে অনেক লোকজন আসে।

মাঠের ওপর কাঠের পাটাতনে তৈরি ছোট মঞ্চ। পুরুষ ও মেয়েদের প্রাইজগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে টেবিলে। ছোট-বড়, চৌকো, লম্বা নানারকম বাক্স আর প্যাকেটের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা নতুন সাইকেলও দেখা যাচ্ছে। টেবিলের পেছনে কয়েকটি চেয়ার, তাতে বসে আছেন সভাপতি, প্রধান অতিথি ও ক্লাবকর্তারা। তাঁদের পেছনে একটি সোনালি কাপড়ের ফেস্টুনে লেখা 'সূর্য সঙ্ঘ। স্থাপিত ১৯৭০। চতুর্দশ বর্ষ দশ ও কুড়ি কি.মি. রোড রেস'।

সাইকেলটা দেখেই তুলসীর দেহ থেকে সব ক্লান্তি এবং আঙুলের যন্ত্রণা নিমেষে উবে গেল। অবশ্যই ওটা প্রথম পুরস্কার। দারুণ দরকারি জিনিস। এই পুরনো সাইকেলটা তার এখন চাপতে ভয় করে, কখন যে বসিয়ে দেবে পথের মাঝে, কে

জানে। তুলসী ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এসে দাঁড়াল 'আর ভাবল' এই সাইকেলটায় চড়ে যদি বাড়ি ফেরে তা হলে বাবা, মা, বাবু কী অবাকটাই না হবে! কিন্তু সে তো পরের কথা। এখন সে এই পুরনোটাকে নিয়ে কী করবে? শেষে কি দু' হাতে দুটোকে ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফিরতে হবে না কি? মেসোমশাই কোথায় যে ডুব মারলেন, উনি থাকলে না হয় পুরনোটা ওঁর হাতে দিয়ে বলতে পারত, এখন আপনার বাড়িতে রেখে দিন, কাল-পরশু নিয়ে যাব। কিংবা জগন্নাথকাকার বাড়িতেও রেখে আসা যায়। পেছনের উঠোনে একটা রাত থাকলে ওঁদের নিশ্চয় অসুবিধে হবে না।

"এবার আমাদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আরম্ভ হচ্ছে।" ক্লাবের সচিব মাইকের সামনে। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নাটুকে ভঙ্গিতে বললেন, "বেলা বাড়ছে, রোদের তেজ তীব্র হচ্ছে, ছুটির দিনে মানুষের নানারকম কাজকর্ম থাকে, তাই অনুষ্ঠানকে আমরা দীর্ঘ করব না। আমরা কথার থেকে কাজে বিশ্বাসী, তাই কোনও বক্তৃতা বা ভাষণ কেউ দিচ্ছেন না। আমাদের এই বাৎসরিক দৌড় উপলক্ষে আগামী মাসে রবীন্দ্র ভবনে যে সাংস্কৃতিক-সন্ধ্যা হবে, সেখানে এনারা বক্তৃতা দেবেন, এখানে নয়।"

সচিবকে থামতে হল জনতার সমর্থনসূচক হাততালিতে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হতাশায় চেয়ারের পিঠে এলিয়ে পড়লেন। ক্লান্ত প্রতিযোগীদের মুখে ফুটে উঠল স্বস্তি।

"প্রথমে পুরুষদের কুড়ি কিলোমিটার দৌড়ের বিজয়ী, বারাসাতের নেতাজি বাহিনী ক্লাবের সদস্য মহম্মদ জয়নুল ইসলামের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন আমাদের পুরসভার প্রধান শ্রীবিজয়কুমার পাল।"

চেয়ারম্যান চেয়ার থেকে উঠে মঞ্চের একপাশে রাখা সাইকেলটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কৃশকায়, ট্রাউজার্স ও বুশশার্ট পরা এক তরুণ মঞ্চের পিছনে লাগানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল হাসিভরা মুখে। তুমুল হাততালি উঠল।

তুলসী দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে ফেলল। তার মনে হচ্ছে, সে বোধ হয় আর-একবার জ্ঞান হারাবে। একটা স্বপ্নের বেলুন সে ফুলিয়ে যাচ্ছিল, এখন তাতে পিনের খোঁচা পড়ল। বেলুন ফাটার শব্দটা বুকের মধ্যে শুনতে পেল।

"এই সাইকেলটি দান করেছেন স্থানীয় সাইকেল ব্যবসায়ী 'দ্য বেঙ্গল সাইকেল স্টোর্স-এর মালিক শ্রীকালিপদ দাস মহাশয়...।"

তুলসী ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। তার আর দেখার বা শোনার কোনও আগ্রহ নেই। ছেলেদের পর মেয়েদের পুরস্কার দেওয়া হবে। নিজেরটা নিয়েই সে সাইকেলে উঠে বাড়িমুখো হবে। তাকে যাই দেওয়া হোক, সাইকেল তো দেওয়া হবে না! এখানে বসে বসে অন্যদের প্রাইজ নেওয়া দেখার কোনও দরকার তার আর নেই। খাবারের বাক্স দেওয়া হয়েছে সব প্রতিযোগীকে। অনেকেই পাওয়ামাত্র খিদের তাড়নায় খেতে শুরু করে দেয়। তুলসী খায়নি। এখন সে বাক্সটা খুলে দেখল, তাতে রয়েছে লুচি, আলুর দম, সন্দেশ, সিদ্ধ ডিম আর কলা। সে কলাটা বের করে বাক্সটা আবার তার ঝুলির মধ্যে রেখে দিল।

ছেলেদের পুরস্কারগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। স্থানীয় একজনও কেউ পুরস্কার পায়নি। বারাসাতের দু'জন, ইছাপুর, চাকদা আর আগরপাড়ার ছেলেরা প্রথম পাঁচটি স্থান জিতেছে।

"এবার মেয়েদের পুরস্কারগুলো দেওয়া হবে। দশ কিলোমিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছে কুলডাঙার তুলসী রায়।" হাততালি পড়ল, কিন্তু তুমুলভাবে নয়।

তুলসী যখন মঞ্চে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে তখন তার কানে এল একটা কথা, "বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে প্রথম। ঠাকুরপাড়ার মেয়েটা হোঁচট খেয়ে না পড়লে..."

তুলসীর দুটো কান গরম হয়ে গেল। কথাটা কে বলল দেখার জন্য মুখ ফিরিয়ে দেখল না। মাথা নামিয়ে সে মঞ্চে উঠল। তার জয়টা পরিচ্ছন্নভাবে নয়, এতে কলঙ্ক লেগে আছে। কিন্তু সে তো ইচ্ছে করে গর্তটা তৈরি করে রাখেনি। কিন্তু লোকে সে যুক্তি মানবে না। তার মনে হল, প্রথম না হলেই যেন ভাল হত! এখন সে অবসাদ বোধ করছে।

"বিজয়িনীর হাতে পুরস্কার তুলে দিতে অসুস্থ শরীর নিয়েও এসেছেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীযুধিষ্ঠির সাহা। তিনি আমাদের বলেছেন, আপনাদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য—খেলাধুলোয় উৎসাহ দেওয়ার জন্য রোগশয্যা কেন, শ্মশানের চিতা থেকেও তিনি উঠে আসবেন।" কিছু করতালিধ্বনি উঠল।

যুধিষ্ঠির সাহা চেয়ার থেকে নিজের ভুঁড়িটি কষ্টেসৃষ্টে তুলে উঠে দাঁড়ালেন। মাইকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সচিব বাধা দিয়ে বললেন, "না, না, ভাষণ নয়, টেবিলের দিকে যান।"

লাজুক স্বরে বিধায়ক বললেন, "অভ্যাস তো!"

একটা বাক্স থেকে টেপরেকর্ডার বের করে সচিব তুলে ধরে দর্শকদের দেখালেন। "স্থানীয় বিখ্যাত ইলেকট্রনিক দ্রব্য ব্যবসায়ী ও টিভি-র দোকান 'রূপ ও বাণী'র মালিক শ্রীঅরুণাভ পাল মহাশয় এই টেপরেকর্ডারটি দান করেছেন। দৌড়বার এই জুতোজোড়া দান করেছেন স্থানীয় 'পদসেবা'র মালিক শ্রীজয়দেব গোস্বামী। আর এই ট্র্যাকস্যুটটি দিয়েছেন 'পিকু হোসিয়ারি'র স্বত্বাধিকারী গোবর্ধন শীল।" সচিব একজোড়া জুতো তুলে ধরে সবাইকে দেখালেন।

পুরস্কারগুলির সঙ্গে তুলসী পেল, পুরুষ বিজয়ীর মতোই একটি কাপ ও সার্টিফিকেট। মঞ্চ থেকে নেমে সে ক্লাবঘরের দিকে যাচ্ছিল তার সাইকেলটা আনতে। তখন দেখল সদ্য পাওয়া নতুন সাইকেলটি হাতে ধরে জয়নুল ইসলাম কয়েকটি ছেলের সঙ্গে গল্প করছে। কিছু একটা ভেবে নিয়ে তুলসী ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

"আপনাকে তো অভিনন্দনই জানানো হয়নি।" তুলসী হেসে হাত বাড়িয়ে দিল। জয়নুল থতমত হয়ে তাড়াতাড়ি তুলসীর হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, "আমারও তো আপনাকে অভিনন্দন জানানো হয়নি।"

"আর অভিনন্দন!" বিষণ্ণ মুখে তুলসী বলল, "লোকে যা বলাবলি করছে!

মেয়েটা নিজে পড়ে গেল, সেটা কি আমার দোষ? অথচ দেখুন, লোকে বলছে আমার প্রথম হওয়াটা নাকি...ইচ্ছে করছে এই প্রাইজ ফাইজ ছুড়ে ফেলে দিই।" তুলসী টেপরেকর্ডার, জুতো, কাপ হাত থেকে ছুড়ে ফেলার ভঙ্গি করল।

"আরে ফেলবেন কেন, লোকের কথার কান দিতে নেই। দশ কিলোমিটার দৌড়েছেন, সেটা তো মিথ্যে নয়।" জয়নুলের পাশে-দাঁড়ানো তরুণটি সহানুভূতি জানিয়ে বলল।

"না, আমার ভাল লাগছে না এইসব জিনিস। আপনি এই রেকর্ডার আর জুতোজোড়া নেবেন?"

"আমি! আপনার জিনিস?" জয়নুল আকাশ থেকে পড়ল।"

"হ্যাঁ। নিন না। বদলে আমি বরং সাইকেলটা নেব। হরেদরে দাম একই হবে। তা ছাড়া এখান থেকে সাইকেল নিয়ে বারাসাত যাওয়াটাও তো এক ঝামেলার ব্যাপার।" তুলসী বহু আশা নিয়ে অবশেষে ঝুলি থেকে তার বেড়ালটি বের করল।

"কিন্তু দিদি, সাইকেলটা অলরেডি তো বুক হয়ে গেছে। ওটা আমিই নিচ্ছি।" সহানুভূতি জানানো তরুণটি একগাল হাসল। "ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি কিনতে জয়নুল দু' হাজার টাকা ধার নিয়েছিল, শোধ হতে এখনও আটশো টাকা বাকি। দোকানে জিজ্ঞেস করে দেখি সাইকেলটার দাম কত হবে। মনে তো হয় টাকা শোধ হয়ে যাবে।"

তুলসী মিইয়ে গেল শুনতে শুনতে। মুখে হাসি টেনে বলল, "দেনার টাকা শোধ তো সবার আগে করতে হয়। আচ্ছা, আমি চলি।"

তিক্ত, ক্লান্ত তুলসী সাইকেলে ফিরছিল। রামপ্রসাদ হস্টেল পার হয়েই দেখল বলরাম। হাত তুলে দাঁড়িয়ে।

"কী ব্যাপার মেসোমশাই! আপনি সেই যে হাওয়া হয়ে গেলেন, তারপর তো আর দেখতেই পেলাম না!"

"পথে সন্দেহ করে আমাকে একজন ধরেছিল পেস সেটারের কাজ করছি বলে। তোমাকে ডিসকোয়ালিফাই করে দিতে পারে, এই ভেবে পরে আর মুখ দেখাতে সাহস পাইনি। প্রায় শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছলুম তো।" বলরাম তৃপ্তির হাসি হাসলেন।

আর জ্বলে উঠল তুলসীর মাথা। আর একজন গর্ত পড়ে গেল বলে প্রথম হতে পারল না...সাইকেলে আগে আগে গিয়ে তার দৌড়ের স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইনি...কোনও কৃতিত্বই নেই আমার, কিছুই নেই, সবই অন্যের দয়ায় পাওয়া।

"আজ আমার বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন। চলো, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।"

"দরকার নেই আপনার নেমন্তন্নের।"

বোকার মতো চেয়ে-থাকা বলরামকে দাঁড় করিয়ে রেখে তুলসী জোরে জোরে প্যাডেল শুরু করল।

তুলসীর ওইরকম রুক্ষ প্রত্যাখ্যানে বলরাম মনে খুবই আঘাত পান। সেদিন বাড়ি ফিরে আসতেই বিমলা বলেন, "কই, মেয়েটি এল না? রান্নাবান্না সব তো হয়ে গেছে, চাটনিটা শুধু বাকি।"

"দেখতে তো পেলাম না। একটা মেয়ে ফিরছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলুম, বলল প্রাইজ তো অনেকক্ষণ দেওয়া হয়ে গেছে। তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আমার মনে হয়, স্টেশনের ওপারে তুলসীর এক কাকা থাকেন, বোধ হয় তাঁর বাড়িতেই ও গেছে।"

"মিছিমিছি তাড়াহুড়ো করে এত রাঁধলুম। তোমার উচিত ছিল ওকে আগেই বলে রাখা। ঘটে এতটুকু যদি বুদ্ধি থাকে!"

বলরাম সেদিন এইভাবে স্ত্রীর কাছে নিজের মুখরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু মনের গভীরে সূক্ষ্ম একটা অপমানের জ্বালা ধরে গেল। নেমন্তন্নটা তো উপলক্ষ, আসলে ওর এই জয়কে মর্যাদা দেওয়ার জন্যই তো তিনি তাড়াতাড়ি মাংস কিনে সঙ্গে দই-রসগোল্লা নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। রাস্তায় অপেক্ষা করতে করতে দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, আচমকা নেমন্তন্নের কথা শুনে তুলসীর মুখ-চোখের অবস্থাটা কেমন হবে!

রানিসায়রে সকালে সাঁতার কাটতে যাওয়া তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি চান না তুলসীর সঙ্গে আর দেখা হোক। রাস্তার আলাপ রাস্তাতেই শেষ হোক, এমন এক মনোভাব তাঁর। সাইকেল নিয়ে আর তিনি বেরোন না। অফিস আর বাড়ি ছাড়া আর তাঁর করার কিছু নেই। এমনই এক সময় কাগজে তিনি দেখলেন ছোট্ট একটা খবর, 'গঙ্গাবক্ষে চার মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা।" সামন্তপুর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে বৈদ্যপাড়া বাঁধাঘাট থেকে সামন্তপুর কালীতলা ঘাট পর্যন্ত। সাঁতার প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর। অফিসের মনোজ সামন্তর বাড়ি তো সামন্তপুরেই। বলরাম খবরের কাগজ হাতে ভাবতে শুরু করলেন।

পরদিন অফিসে ছুটির কিছু আগে বলরাম মনোজকে প্রশ্ন করলেন নিচুস্বরে, "আচ্ছা সামন্ত, তোমাদের ওখানে সামন্তপুর স্পোর্টিং ক্লাব বলে একটা ক্লাব আছে না?"

মনোজ সামন্ত ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ পিটপিট করে বললেন, "আপনি জানলেন কী করে?"

"কাগজে দেখলুম গঙ্গায় একটা সাঁতার প্রতিযোগিতা করছে।"

"আমার ঠাকুর্দার বাবা পতিতপাবন সামন্ত ক্লাবটা এস্টাব্লিশ করেন সেই বছরেই যে বছরে মোহনবাগান ক্লাব হয়, তার মানে এইটিন এইট্টি-নাইনে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের উদ্বোধন করার কথা ছিল, আসতে পারেননি। দু'মাস পরে অবশ্য এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এসেছেন।" মনোজ সামন্ত খুবই সাধারণ একটা খবর জানানোর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে হাই তুললেন। "বিগ নেম কত আর করব, লাস্ট

এসেছিলেন সত্যজিৎ রায়, আমাদের ঠাকুরদালান দেখতে।"

"ক্লাবটা তোমাদের বাড়িতেই কি?"

"ছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকারের যুগ আসতেই ক্লাবঘরটা বাড়ি থেকে তুলে দিলাম। এখন গঙ্গার ধারে আমাদের দেওয়া জমিতেই নতুন ঘরে ক্লাব।"

"ভাই, আমার একটা উপকার করবে! গঙ্গায় যে চার মাইল সাঁতার হবে, তাতে আমার নামটা তুমি এন্ট্রি করে দেবে?" বলরাম লাজুক ফিসফিসে গলায় বললেন। "তা হলে আমায় আর যেতে হয় না নাম দিতে।"

মনোজ সামন্ত প্রথমে বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বলরামের দিকে তাকিয়ে থেকে, গম্ভীরভাবে বললেন, "ঠাট্টা করছেন?"

"একদমই নয়। খুব সিরিয়াস হয়েই বলছি।"

"কেন?"

"তার মানে?"

"কেন এই বয়সে শরীরটাকে মিছিমিছি বেগার খাটাচ্ছেন? সেদিন অফিসে ঘুমোচ্ছিলেন, মনে আছে? আপনি সাঁতার কাটলে কারও কি কোনও উপকার হবে? আপনার কি সেজন্য মাইনে বাড়বে? তা যদি না হয়, তা হলে সাঁতার কেটে লাভ?"

"খাঁটি কথা বলেছ ভাই। এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সাঁতার ফাঁতার কেটে কোনও লাভ হয় না। তবে কী জানো সামন্ত, মানুষ তো একরকমের হয় না। কেউ কেউ মনে করে, জীবন বলতে যদি বেঁচে থাকা বোঝায়, তা হলে বাঁচার একটা মানে থাকা দরকার। জীবন নানা সময়ে নানা রূপ ধরে। আমি এখন জীবনের যেখানে এসে পৌঁছেছি, সেখানে দেখছি, জীবনটা চেন দিয়ে বাঁধা কুকুরের রূপ ধরেছে। আমি তাই চেনটা ছিঁড়ে ফেলতে চাই।"

মনোজ সামন্ত মন দিয়ে শুনছিলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন, "আপনার নাম আমি দিয়ে দেব।" তারপর হেসে উঠে জুড়ে দিলেন, "ডুবেটুবে গেলে কিন্তু লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।"

বলরাম স্ত্রীকে জানাননি সাঁতার প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছেন। শুধু বলেছিলেন, মনোজ সামন্ত রবিবার অফিসের কয়েকজনকে বাড়িতে খেতে বলেছে, তিনিও তাদের মধ্যে আছেন।

সাঁতার শুরু হবে বেলা তিনটেয়, বৈদ্যপাড়া থেকে। বলরাম প্রথমে এলেন শেয়ালদা স্টেশনে। সেখান থেকে বাসে হাওড়া স্টেশনে এসে পেয়ে গেলেন ব্যান্ডেল লোকাল। বৈদ্যপাড়া স্টেশনে নামলেন বেলা দুটোয়। সাইকেল রিকশায় গঙ্গার ধারে পৌঁছে দেখলেন, অস্থায়ী একটা শামিয়ানা আর পোশাক বদলাবার জন্য ঘেরা জায়গা। একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। জনা-তিরিশ ছেলেমেয়ে আর কিছু ক্লাবকর্তা। এদের সঙ্গে মনোজ তার জন্য অপেক্ষা করছে। ওকে দেখে বলরামের একটা চিন্তা থেকে রেহাই ঘটল। প্রতিযোগী বলে শনাক্ত করার জন্য একটা লোক পাওয়া গেল।

বলরাম একজন প্রতিযোগী শুনে দু-চারজন চোখ কুঁচকে তাকালেন। বলরাম অনুমান করেই ছিলেন, এইরকম দৃষ্টির সামনে তাঁকে পড়তে হবে। তিনি কিছু মনে করলেন না। একজন শুধু তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "গঙ্গায় কখনও সাঁতার কেটেছেন?"

"কেটেছি। সাত মাইল কম্পিটিশনের একটা কাপও আছে।" বিনীত ভাবে বলরাম জানিয়ে দিলেন।

মনোজ সামন্ত ক্লাবের লোকেদের সঙ্গে বলরামের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "এনার্জি আছে বটে গড়গড়িদার! এই সব ইয়ং ছেলেমেয়ের সঙ্গে কম্পিট করতে এই বয়সে জলে নামা, চাট্টিখানি কথা! ওঁকে তো একটা স্পেশাল প্রাইজ দেওয়া উচিত!"

"তা যদি দাও, তা হলে ওকেও দেওয়া উচিত।" এই বলে বলরাম পোশাক বদলাবার জায়গা থেকে এইমাত্র বেরিয়ে আসা ছোট্ট বিনুনি ঝোলানো কস্টিউম পরা একটা সাত-আট বছরের মেয়ের দিকে আঙুল তুললেন। "ওর সঙ্গে আমার বয়সের ডিফারেন্স অন্তত অর্ধ শতাব্দীর। গঙ্গায় আজ একটা ব্রিজ হবে, পঞ্চাশটা বছর জোড়া লাগবে।"

বলরাম হা হা শব্দে হেসে উঠলেন। তাঁর মনে হচ্ছে এমনভাবে তিনি কলেজে পড়ার দিনগুলোর পর আজই প্রথম হাসলেন। হাসির সঙ্গে যেন শুকনো হয়ে যাওয়া বছরগুলো ঝরে ঝরে যাচ্ছে শরীর থেকে।

"মেয়েটি কি একা জলে নামবে?" বলরাম তারপর কথাটা শুধরে নিয়ে বললেন, "ওর সঙ্গে সঙ্গে কারও থাকা দরকার।"

"ওর বাবা, দাদা, ওই তো দাঁড়িয়ে...ওরাও নামছে।" মনোজ আঙুল তুলে দেখাল। বছর চল্লিশের একটি লোকের সঙ্গে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে। দু'জনে গায়ে সর্ষের তেল ঘষছে। "ব্যবসা করে, মুদির দোকান আছে। ওর স্ত্রী...মেয়েটার মা, সেও তো এই চার মাইল সাঁতারে নামত বিয়ের আগে পর্যন্ত।"

"আগে কেন, পরেও দু'বার নেমেছে।" মনোজের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুরু চশমা-চোখে লোকটি ভুল শুধরে দিল।

"বুঝলেন গড়গড়িদা, কম্পিটিশনের থেকেও বেশি, এটা একটা উৎসব। ভাটা এই আধঘণ্টা আগে শুরু হয়েছে, টানেই চার মাইল চলে যাবে। এবার আপনি জামা-প্যান্ট ছেড়ে ঝোলাটা আমায় দিন।"

"তুমি নৌকোয় থাকছ তো?"

"আমি বাস কি অটোয় সামন্তপুর চলে যাব...আপনাদের আগেই।"

চৌত্রিশজন সাঁতারু আর চারটে নৌকোয় লাইফ সেভার ও ক্লাবকর্তারা। সাঁতারুদের মাথায় লাল কাপড়ের টুপি। এদের মধ্যে অনেকেই রাজ্য চ্যাম্পিয়ান। বাঁধাঘাটে জলের পারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। প্রতিযোগীরা, কে সামনে থাকবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি চলছে। নৌকো থেকে হুইস্‌ল বাজল। একজন সাদা পতাকা তুলে দাঁড়িয়ে। আবার হুইস্‌ল এবং পতাকা ধরা হাতটি নামল। হইহই করে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সাঁতারুরা। সকলের শেষে নামলেন বলরাম।

সামন্তপুর কালীতলা ঘাটে সকলের শেষে জল থেকে উঠলেন বলরাম। এবং উঠলেন দু'হাত তুলে বিজয়ীর মতো।

"কই, মনোজ কোথায়?"

মনোজ সামন্ত উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এলেন। "গড়গড়িদা, আপনি যে ফিনিশ করবেন, সত্যি বলছি, ভাবিনি।"

"ভেবেছিলে ডুবে যাব, হাফ ছুটি পাবে? মাথা কাটা যায়নি তো?"

"আজ রাতে গরিবের বাড়ি চাট্টি ডালভাত খেয়ে তবে বাড়ি ফিরবেন। স্কন্ধকাটা হইনি, কম আনন্দ হচ্ছে আমার!"

বলরাম হাসতে গিয়ে একটা কাঁটা ফোটার বেদনা অনুভব করলেন। আর-একদিন তিনি একজনকে অনেকটা এইভাবেই খাওয়ার কথা বলেছিলেন। সে রূঢ়ভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছিল।

"নিশ্চয়ই খাব। পেটপুরে খাব। কাল অফিস যদি না যাই—"

"যেতে হবে না, যেতে হবে না, আমি ম্যানেজ করে দেব। এবার থলেটা নিন। জামাপ্যান্ট পরে তারপর প্রাইজ নেওয়া।"

"আমার আবার প্রাইজ কী?" বলরাম অবাক হলেন। "লাস্টের আবার প্রাইজ হয় নাকি?"

"হয়, হয়, চলুন তো!" মনোজ সামন্ত টান দিলেন বিস্মিত বলরামের হাত ধরে।

ক্লাবঘরের সামনে খোলা জায়গায়, দুটো তক্তপোশ দিয়ে মঞ্চ হয়েছে। মাইক্রোফোন আর টেবিল। নিরাভরণ এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার দিলেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। এখানকারই একজন ডাক্তার। কাপ, মেডেল এবং তোয়ালে যারা পেল, তারা সকলেই নিয়মিত সাঁতার কাটে এবং কুড়ির কম বয়সি।

"এবার পুরস্কার দেওয়া হবে প্রতিযোগিতার কনিষ্ঠতম সাঁতারু উমা পালকে। তার হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন প্রতিযোগিতার সব থেকে বয়স্ক সাঁতারু শ্রীযুক্ত বলরাম গড়গড়ি। প্রসঙ্গত জানাই দু'জনের বয়সের পার্থক্য পঞ্চাশ বছরের, এবং দু'জনেই সফলভাবে প্রতিযোগিতা শেষ করেছেন।" ক্লাব-সচিবের ঘোষণা হওয়ামাত্র তুমুল হাততালি আর চিৎকার উঠল। দু'জনকে কাছ থেকে দেখার জন্য মঞ্চের দিকে এগিয়ে এল জনতা। ঠেলাঠেলি শুরু হল।

বলরাম হকচকিয়ে গেলেন এত লোকের আগ্রহ, ঔৎসুক্য দেখে। তাঁকে দেখার জন্য নয়, আসলে ওই পঞ্চাশ বছরের পার্থক্যটাই যে এদের কৌতূহলী করে তুলেছে, সেটা তিনি বুঝতে পারছেন। তিনি নিজেও কিঞ্চিৎ উত্তেজনা বোধ করলেন। মনোজ সামন্ত প্রায় ঠেলতে ঠেলতে বলরামকে মঞ্চের দিকে নিয়ে গেলেন। টাক মাথা, বেঁটে লোকটিকে দেখে বাচ্চা দর্শকরা আবার হাততালি দিল। বলরামের চেয়ে উমা পাল উচ্চতায় মাত্র আধফুট ছোট।

প্রতিযোগিতায় ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে পঞ্চম পর্যন্ত যারা স্থান পেয়েছে

তাদের একটি করে তোয়ালে দেওয়া হয়েছে। বাড়তি রয়েছে দুটি তোয়ালে। তারই একটি উমার হাতে দিয়ে বলরাম তাকে কোলে তুলে নিলেন। বাচ্চা মেয়েটি লজ্জায় তোয়ালেটা দিয়ে মুখ ঢাকল।

আবার ঘোষণা হল, "এবার উমা পাল পুরস্কার তুলে দেবে বলরাম গড়গড়ির হাতে।"

দু'হাত বাড়িয়ে উমার হাত থেকে একটা তিন হাত লম্বা হ্যান্ডলুম তোয়ালে নিলেন বলরাম। ইতিমধ্যে কেউ বলে দিয়েছিল উমাকে, তোয়ালেটা হাতে দিয়েই সে প্রণাম করল বলরামকে। প্রবল হর্ষধ্বনি আর করতালি বলরামের চোখে বাষ্প ঘনিয়ে তুলল।

সভাপতি ডাক্তারবাবু মাইকের সামনে এসে বললেন, "এবার বলরামবাবু আপনাদের দু-চার কথা বলবেন।"

বলরামের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বক্তৃতা! ভাষণ! দু-চার কথা মানে? কিন্তু আমি কেন? তিনি অসহায়ভাবে সভাপতির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হাসতে হাসতে ডাক্তারবাবু বললেন, "আজ আপনিই তো বলবেন। আমাদের এই চার মাইল সাঁতারে আজ পর্যন্ত আপনার বয়সি কেউ কম্পিট করেনি। আপনি বলবেন না তো কি, যে জীবনে সাঁতার কাটেনি, সেই আমি এখানে বাণী দেব? আমার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই! আপনার যা মনে আসে তাই বলুন।"

সামনে থেকে মনোজ সামন্ত চেঁচিয়ে বলল, "গড়গড়িদা, ঘাবড়াবেন না। যা বলবেন আমরা শুনব।"

বলরাম মাইক্রোফোনের সামনে এলেন।

"একটা সময় ছিল যখন আমার বয়স তোমাদের মতোই ছিল।" বলরামের মুখ থেকে হঠাৎই বাক্যটি বেরিয়ে এল। যেটুকু কথাবার্তা দর্শকদের মধ্যে হচ্ছিল, বন্ধ হয়ে গেল।

"বাড়ির কাছেই ছিল গঙ্গা, সাঁতার কাটতাম। স্বপ্ন দেখতাম, ইংলিশ চ্যানেল পার হচ্ছি। স্বপ্ন দেখতাম, ওলিম্পিকে গোল্ড মেডেল গলায় পরছি। আমার দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজছে। তারপর যা হয়!" বলরাম থামলেন। একটু হাসলেন, "আমি সরকারি অফিসের একটা আপার ডিভিশন ক্লার্ক হলাম।"

"আমার বয়স বাড়তে লাগল। বুড়ো বলতে যা বোঝায় কালক্রমে আমি সেই বয়সে প্রবেশ করলাম। কিন্তু বুড়ো তো দু'ভাবে হয়, শরীরে আর মনে। আমার শরীরের ক্ষয় অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু যেভাবেই হোক মনের ক্ষয় আটকাবার কথা আমি ভাবলাম। আমি যেখানে থাকি, সেই বিদ্যানগরে একটি মেয়েকে দেখেছি, সে কী প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারে! তাকে দেখেছি, শুধুই মনের জোরে দশ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম হতে।

"আমার মন বলল, বলরাম, তুমিই বা পারবে না কেন? বয়স হলেই কি ছোটদের কাছে হটে যেতে হবে? জবুথবু হয়ে সংসারের, সমাজের এককোণে পড়ে থাকবে? যৌবন চলে গেলেই কি জীবন শেষ হয়ে যাবে?"

বলরাম জানেন না, তাঁর গলা চড়ে গেছে, তাঁর চোখের মণি বড় হয়ে উঠেছে। জীবনে এই প্রথম তাঁর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে তাঁর কানে ফিরে আসছে। এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও তাঁর হয়নি।

"কবে গঙ্গায় সাঁতার কেটে একটা কাপ জিতেছি, তাই ভাঙিয়ে আজীবন চলে না। বয়সকে কমানো যায় না, ধরেও রাখা যায় না, কিন্তু তাকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেওয়া যায়।

"আমি অতি সাধারণ মানুষ। বৈজ্ঞানিক নই, শিল্পী নই, শিল্পপতিও নই, কিছুই নই। আমি তা হলে বয়স নিয়ে কী করতে পারি? পারি শুধু একটা কাজই—মন থেকে বয়সকে তুলে নিতে। সেই কাজটাই আজ করলাম। এই কাজ আবার করব, যতদিন পারব করে যাব।"

সেদিন রাতে শেয়ালদায়, রাস্তা থেকে ছ' টাকা দিয়ে বড় একটা ফুলকপি কিনে বলরাম ট্রেনে উঠলেন। বিমলাকে দুটো মিথ্যা কথা বললেন বাড়ি পৌঁছে।

"পনেরো টাকায় বিক্রি হচ্ছে দেখে তোয়ালেটা শেয়ালদায় কিনে ফেললাম। সস্তা হয়নি?... আর এই কপিটা ধরো, মনোজের ক্ষেতের। তোমার জন্য দিল।"

"আমায় ডেকেছেন, জগন্নাথকাকা?"

বসার ঘরে খবরের কাগজ পড়ছিলেন জগন্নাথবাবু। কাগজটা নামিয়ে বললেন, "আয়, বোস।"

তুলসী মুখোমুখি সোফায় বসল।

"চাকরিবাকরির খোঁজ পেলি?"

"না। একজন বলল কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হতে, এটা জানলে আজকাল চাকরি পেতে নাকি সুবিধা হয়। গেছিলাম একটা কম্পিউটার শেখানোর টিউটোরিয়ালে। এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে লাগবে পৌনে পাঁচশো টাকা আর মাসে মাসে আড়াইশো।" তুলসী মাথা নামিয়ে চুপ করে গিয়ে বুঝিয়ে দিল টাকাটা তার সাধ্যের বাইরে।

জগন্নাথবাবু কয়েক সেকেন্ড ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "এখানে সূর্য সঙ্ঘের দশ কিলোমিটার দৌড় কম্পিটিশনে তুই নাকি প্রথম হয়েছিস?"

"হ্যাঁ।"

"কই, সে কথা আমায় বলিসনি তো? ক্লাবের সেক্রেটারি পূর্ণেন্দু কথায় কথায় কাল আমায় বলল।"

"এ আর বলার মতো কিছু নাকি?" তুলসীর স্বর লাজুক। মনে মনে বলল, বলে কোনও লাভ হবে না বলেই বলিনি।

"বলার মতো নয়! বলিস কী? দশ কিলোমিটার মানে ছ' মাইল। একটা গেরস্তবাড়ির মেয়ে এই ভাঙাচোরা রাস্তায়...পূর্ণেন্দু বলল নখ উঠে যাওয়ায় খালি

পায়ে যন্ত্রণা নিয়ে দৌড়ে প্রথম হয়েছে! তার মানে ভীষণ কষ্ট সইবার ক্ষমতা আর জেতার ইচ্ছেটা তোর আছে। এটা তো খুব বড় ব্যাপার। এটাই কি তোর প্রথম এই দৌড়ে নামা?"

"হ্যাঁ," বলেই তুলসী লজ্জায় কুঁকড়ে রইল। সেদিনের মিথ্যে কথাটা জগন্নাথকাকা এখনও মনে করে রেখে থাকলে তার সম্পর্কে কী ধারণা করছেন।

"আমাদের অফিসের স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশ আছে, চাকরি দিতে হবে সেই স্পোর্টসে, যেটা ওলিম্পিকে আছে। সামনের ওলিম্পিকে একটা নতুন স্পোর্টস ইনক্লুডেড হয়েছে। এদেশে সেটা নেই বললেই চলে।" জগন্নাথবাবু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন।

"নাম কী স্পোর্টস-টার?" কৌতূহলভরে তুলসী জিজ্ঞেস করল। ডাকিয়ে এনে জগন্নাথকাকা নতুন একটা স্পোর্টসের খবর দিচ্ছেন কেন?

"ট্রায়াথলন।"

জগন্নাথবাবু পিঠের থেকে বালিশটা কোলের ওপর এনে ঝুঁকে বসলেন। "পেন্টাথলন, হেপ্টাথলন, ডেকাথলন শুনেছিস তো, সেইরকমই এটা হল ট্রায়াথলন। তিনটে বিষয়ে স্পোর্টস পর পর করতে হবে। প্রথমে সাঁতার, তারপর সাইক্লিং, তারপর দৌড়।"

জগন্নাথবাবু পিটপিট করে তাকিয়ে রইলেন তুলসীর মুখের দিকে। মুখে পাতলা রহস্যময় হাসি। হাসিটার অর্থ একটু একটু করে তুলসীর কাছে পরিষ্কার হল যখন, তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল, শিরদাঁড়া বেয়ে গরম একটা ধারা নেমে এল।

"কাকাবাবু, আমি পারব। আমি ওই তিনটেই পারি।"

"আরে সেইজন্যই তো ডেকে পাঠিয়েছি। পূর্ণেন্দুর কাছে তোর কথা শুনেই আমার স্ট্রাইক করল। আমাদের কোটার চারটে মেয়ে তো নেওয়া হয়ে গেছে আর্চারিতে, একজন এখনও বাকি, তা হলে ট্রায়াথলনে নিলে কেমন হয়? একটা নতুন ব্যাপার হবে! আর আমার মনে পড়ল, সেদিন তুই বলেছিলি, সাঁতার জানি, সাইক্লিং জানি। মনে আছে?"

তুলসী ঘাড় নাড়ল। পাঁচ মাইল দৌড়ে তার ফার্স্ট হওয়ার কথাটাও কি কাকাবাবুর মনে পড়েছিল? কিন্তু সে-সম্পর্কে কিছু তো বলছেন না!

"নতুন স্পোর্টস বোর্ডের কাছে চিঠি লিখে অ্যাপ্রুভাল আনাতে হবে। যাকে নেব, তাকে তো আগে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। ট্রায়াথলনের কোনও কম্পিটিশন বাংলায় হয় কি না আগে সেটার খোঁজ করি। যদি হয়, তা হলে তাতে নেমে তোকে ফার্স্ট প্লেস পেতে হবে। তারপর তোর নাম বোর্ডের কাছে পাঠাব। ব্যাপারটা বুঝলি?"

তুলসী ঘাড় নাড়ল। সে বুঝেছে বন্ধ দরজাটা একটু ফাঁক হয়েছে। সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে অস্পষ্টভাবে একটা চাকরি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওটা তো অনেক দূরের ব্যাপার, তার আগে কাছের ব্যাপারটা তাকে জেনে নিতে হবে।

"কাকাবাবু, তিনটে বিষয় পর পর কম্পিট করতে হবে, বললেন। কিন্তু কোন

বিষয় কতটা করে করতে হবে?"

জগন্নাথবাবুকে এবার সামান্য বিব্রত দেখাল। "ব্যাপারটা আমার কাছেও নতুন, ডিটেইলে কিছুই জানি না। শুনেছিলাম মাদ্রাজে নাকি ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ানশিপ হয়েছে। আমি কালই খোঁজ নেব, তুই তিন-চারদিন পরে এসে জেনে যাস। তবে এটা জানি, সাঁতার, সাইক্লিং আর দৌড় পর পর তিনটে করতে হবে। তোর তো সাইকেল আছে।"

"আছে, তবে বড্ড পুরনো, বাবা কিনেছিলেন। ওটার অনেক কিছুই পালটাতে হবে।"

"তা হলে পালটে নে। প্র্যাকটিস তো করতে হবে, আর যত শিগ্‌গির শুরু করা যায়, ততই ভাল।"

জগন্নাথবাবুর বাড়ি থেকে তুলসী যখন বেরোল, তখন বলরামবাবু ধাক্কাধাক্কি করতে করতে বিদ্যানগর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলেন। তাঁর হাতে 'স্পোর্টস্‌টাইম' নামে একটি ইংরেজি খেলার পত্রিকা। খবরের কাগজের খেলার পাতাটি খুঁটিয়ে পড়েন কিন্তু খেলার পত্রিকা তিনি কেনেন না, এটিও কেনেননি। পেয়ে গেছেন।

বাড়ি ফেরার জন্য বিধাননগর স্টেশনে বলরাম চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর একটি ট্রেন এল। এত ভিড় যে, কামরার দরজা দিয়ে মানুষ উপচে বেরিয়ে রয়েছে। প্ল্যাটফর্মে যারা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজায়। সেই ঝাঁপানোদের মধ্যে বলরাম নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এবং মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পিছিয়ে আসেন।

ট্রেনটি যখন ছাড়ল, তখনও কেউ কেউ ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে ট্রেনের সঙ্গে ছুটল। বলরাম চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ট্রেনটির দিকে যখন হতাশ চোখে তাকিয়ে, তখন একটি লোক যেতে যেতে থেমে গিয়ে, তাঁর পায়ের কাছ থেকে একটি রঙিন মলাটের পত্রিকা কুড়িয়ে তুলে নিয়ে বলল, "আপনার ম্যাগাজিনটা পড়ে গেছে।"

বলরাম তার হাত থেকে পত্রিকাটা নেওয়ামাত্র লোকটি ব্যস্তভাবে চলে গেল। বলরাম তখন বলতে চেয়েছিলেন, এটা আমার নয়, ট্রেনে ওঠার সময় কারও হাত থেকে পড়ে গেছে। কিন্তু বলার সুযোগই পেলেন না। মলাটে স্টেফি গ্রাফ আর মোনিকা সেলেস-এর ছবি, প্রকাশের তারিখ, চার মাস আগের। 'পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা' গোছের একটা মনোভাব হল বলরামের। আমি না পেলে আমার বদলে অন্য কেউ পেত, ব্যাপারটা তো একই হত। রাত্রে এটা পড়ব স্থির করে পত্রিকাটা ঝুলিতে রেখে তিনি পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

বিদ্যানগর স্টেশন থেকে বেরিয়ে স্টেশন রোডে কলাওয়ালার কাছাকাছি হয়েছেন, তখন বলরাম শুনলেন তুলসীর গলা। "মেসোমশাই, রানিসায়রে আর সাঁতার কাটতে যান না যে?"

অস্বস্তি বোধ করলেন। না যাওয়ার কারণটা এতদিন পর না বলাই ভাল। তুলসীর চোখের এবং কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতা থেকে তিনি বুঝলেন, মেয়েটি মনে করে রাখেনি

রূঢ়ভাবে তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কথা।

"ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়েছিল।"

"তা হলে কলা খাবেন না।"

"না, না, এখন একদম সেরে গেছে। ভাবছি কাল থেকে আবার যাব।" সবুজ সিঙ্গাপুরি কলার একটা ছড়া তুলে বলরাম তাঁর ঝুলিতে ভরতে যাচ্ছেন, তখন তুলসী হাত বাড়িয়ে বলল, "আমার একটা।"

"একটা নয়, দুটো।" বলরাম দুটো কলা ছিঁড়লেন ছড়া থেকে। "সাইকেলে কোথায় গেছিলে?"

"ওপারে জগন্নাথকাকার কাছে। আমিও ভাবছি কাল থেকে জলে নামব। সাইকেলটাও সারাতে হবে। মনে হচ্ছে ভালই খরচ পড়বে।"

তুলসী একহাতে কলা খাচ্ছে অন্য হাতে ধরা সাইকেল—এইভাবে সে বলরামের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। রাস্তার ভিড়ের অংশটুকু পেরিয়ে আসার পর বলল, "আপনার চেনাজানা কেউ আছে যে, টেপরেকর্ডার কিনবে?"

"কেন! তুমি কি বিক্রি করবে?"

"হ্যাঁ। দশ কিলোমিটারে প্রাইজ পেয়েছিলাম। আমি ওটা দিয়ে কী করব বলুন? গান শুনতে হলে তো ক্যাসেট কিনতে হবে, তার মানে খরচ! আপনার জানাশোনাদের মধ্যে যদি কেউ থাকে তো বলবেন, কেমন? একদমই নতুন, পাশের বাড়ি থেকে ক্যাসেট এনে শুধু দু-তিনবার চালিয়েছি। নতুনের থেকে কমেই দেব।"

"তোমার কি খুব টাকার দরকার?"

"হ্যাঁ, সাইকেলটা সারাব। আমাকে ট্রায়াথলনে নামতে হবে।"

"কী থলনে?" বলরাম ঝুঁকে কানটা তুলসীর দিকে এগিয়ে দিলেন।"

"নতুন একটা স্পোর্টস। ট্রা-য়া-থ-ল-ন। প্রথমে সাঁতার, তারপর সাইকেল, তারপর দৌড়। পর পর, মাঝে থামাথামি নেই।"

"সে কী! এ তো খুব কষ্টকর ব্যাপার।"

তুলসীর মুখে আত্মপ্রসাদ ফুটে উঠল, "তা তো বটেই। কষ্ট না করলে আর স্পোর্টস কীসের?"

"তোমার পায়ের নখের অবস্থা এখন কেমন?"

"নতুন নখ উঠছে, ব্যথাট্যাথা নেই।"

"তা এই ট্রায়াথলনে কোথায় নামবে? কবে হবে?"

"কিছুই জানি না। কতটা দৌড়তে হবে, কতটা সাঁতার কাটতে হবে, তাও জানি না। আজই তো জগন্নাথকাকার কাছে প্রথম শুনলাম। উনি খোঁজখবর নিয়ে আমায় জানাবেন বললেন।" তুলসী দাঁড়িয়ে পড়ল, "মেসোমশাই, এবার আমি যাব। টেপরেকর্ডারের কথাটা মনে রাখবেন।"

"হ্যাঁ, মনে থাকবে।"

প্যাডেলে পা রেখে উঠতে গিয়েও তুলসী উঠল না একটা কথা বলার জন্য।

"জগন্নাথকাকা বললেন, একটা চাকরি হতে পারে যদি ট্রায়াথলনে ফার্স্ট হতে পারি।"

তুলসী সাইকেলে উঠে প্যাডেল শুরু করল।

রাত্রের খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে টেব্‌ল-ল্যাম্প জ্বেলে বলরাম খবরের কাগজ পড়েন। পাতাগুলোয় চোখ বুলিয়ে পড়ার মতো কিছু না পেয়ে, স্পোর্টস টাইম পত্রিকাটা তুলে ছবি দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে শেষের দিকে এসে পেলেন একটা লেখা এবং তার সঙ্গে চারটি ছবি। প্রথম ছবিতে একটি কিশোরী সমুদ্রতীরে বালির ওপর দৌড়চ্ছে। পরনে কালো জামা, লাল শর্টস, কেড্‌স, পিঠের ওপর বেণী, বাঁ হাতে ঘড়ি এবং নাকে নাকছাবি। মুখের গড়ন অনেকটাই তুলসীর মতো।

আর-একটি ছবিতে: মেয়েটি একটি রেসিং সাইকেল চালাচ্ছে সমুদ্রতীরের একটি রাস্তায়। তার পেছনে একটি বালক হাসতে হাসতে দৌড়চ্ছে।

আর-একটি ছবিতে: মেয়েটি কস্টিউম পরা, মাথায় আঁট করে বসানো রবারের টুপি। সমুদ্রের কিনারে দাঁড়িয়ে।

আর-একটি ছবিতে: ক্যারামবোর্ড ঘিরে মেঝেয় ছ'জন বসে। ছবিতে বোঝা যায়, এরা একটি পরিবার। স্বামী-স্ত্রী, দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। আগের ছবিগুলির মেয়েটিও এর মধ্যে রয়েছে।

বলরাম একটু কৌতূহল বোধ করলেন প্রথম তিনটি ছবির জন্য। একটি মেয়ে তিনটি খেলায়। হয়তো সাঁতারুই, দৌড় আর সাইক্লিংটা বোধ হয় সাঁতারের ট্রেনিংয়েরই অঙ্গ। পাতা উলটে যাওয়ার আগে লেখার শুরুতে মোটা অক্ষরে কয়েক লাইনের ভূমিকাটা তিনি পড়তে শুরু করলেন।

"ইন অ্যান এরা হয়্যার সাকসেস ইন ইন্ডিয়ান স্পোর্টস ইজ অলমোস্ট নন-এগজিসট্যান্ট, সেভেনটিন ইয়ার ওল্ড সি. আমুদা হ্যাজ ওন দ্য এশিয়ান জুনিয়ার ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়ানশিপ ইন চায়না রিসেন্টলি। হোয়াট মেক্‌স হার অ্যাচিভমেন্ট অল দ্য মোর কমান্ডেবল ইজ দ্যাট, শি কামস ফ্রম অ্যান আন্ডারপ্রিভিলেজড ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড হ্যাড টু স্ট্রাগল এগেনস্ট রিয়েল অডস টু ট্রায়াম্ফ।"

বলরামের হাত দুটো একবার কেঁপে উঠল। চোখ বন্ধ করে উত্তেজনা কমানোর জন্য সময় নিলেন। একেই কি বলে জ্যাকপট পাওয়া। মেঘ না চাইতেই জল। এই ট্রায়াথলনের কথাই তো আজ তুলসী বলল। তিনি পত্রিকাটা চোখের আরও কাছে নিয়ে এলেন।

"হার ফাদার ওয়াজ আ 'হেল্পার' ইন দ্য আন্না সুইমিং পুল ইন ম্যাড্রাস। হার মাদার কুপ্পুস্মা স্টিল সেলস সুগারকেন জুস ফ্রম এ পুশ কার্ট অন মেরিনা বিচ। দ্য ফ্যামিলি অব টু ডটারস অ্যান্ড টু সনস, বিলংগড টু দ্য ফিশারমেন কমিউনিটি। দে লিভড ইন আ স্মল হাট ইন ট্রিপলিকেন...

"দ্য ফাদারস ইনকাম ওয়াজ পুয়োর। ফুড ওয়াজ নট আ রেগুলার অকারেন্স। ইট

ওয়াজ দ্য টিপিক্যাল ইন্ডিয়ান স্টোরি অব আ লাইফ স্টিপড ইন পভার্টি অ্যান্ড আনসারটেনিটি। বাট দ্য গার্ল আমুদা ওয়াজ পজেজড অব হাই স্পিরিটস। ডেস্পাইট দ্য ল্যাক অব ফুড...”

বলরাম বিছানায় উঠে বসলেন। গোগ্রাসে রচনাটি প্রথমবার প্রায় গিলে ফেললেন। তারপর আবার পড়তে শুরু করলেন ধীরে ধীরে। সেই জায়গাটা তিনি দু'বার-তিনবার পড়লেন যেখানে আমুদা চিনের তিয়ানজিনে তার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান হওয়ার কথা বলেছে।

চিনে রওনা হওয়ার আগে আমুদাকে কে যেন বলেছিল, “হয় মেডেল নিয়ে ফিরবি, নয়তো ওখানেই মরবি।” তাই সে ঠিক করেছিল, মরতে হয় তো মরব কিন্তু শেষ একটা চেষ্টা করে যাব। তিয়ানজিন সামার লেক-এ দেড় কিলোমিটার সাঁতার শেষে আমুদা রইল তৃতীয় স্থানে। তারপর চল্লিশ কিলোমিটার সাইক্লিং শেষে সে আরও পিছিয়ে গিয়ে রইল অষ্টম স্থানে। এর পর শুরু হল দশ কিলোমিটার দৌড়! ওর সামনে সাতটি মেয়ে দৌড়চ্ছে। অনেক পিছিয়ে আমুদা।

বলরামের মনে হল, তখন এই মেয়েটার নিশ্চয়ই মনে পড়ছিল, “মরতে হয় তো মরব কিন্তু শেষ একটা চেষ্টা করে যাব।” হাল না ছেড়ে আমুদা দৌড়তে থাকে। পাঁচ কিলোমিটার দৌড় যখন সম্পূর্ণ হল তখন সে ছ'জনকে অতিক্রম করে গেছে। তবুও অনেকদূর এগিয়ে রয়েছে লিন ইয়েন নামে চিনা মেয়েটি। ইয়েন সাঁতারে ও সাইক্লিংয়ে প্রথম হয়েছে। আমুদা তখন, কে প্রথম হয়েছে না হয়েছে, মনে করে রাখেনি। নিশ্চয়ই তখন তার দৃষ্টিতে সামনের চিনা মেয়েটি ছাড়া বিশ্বচরাচরে আর কিছু ছিল না। গতি, গতি, গতি, সে শুধু গতি বাড়িয়ে গেছে। আট কিলোমিটারের মাথায় আমুদা ধরে ফেলল ইয়েনকে। তারপর সে আরও গতি বাড়াল। যখন আমুদা টেপ ছিঁড়ল তখন সে নিঃশেষিত। শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতাটুকু আর তার নেই। অজ্ঞান হয়ে সে লুটিয়ে পড়ল। সে জানে না ইয়েনকে শেষ পর্যন্ত হারাতে পেরেছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দু' ঘণ্টা পর আমুদার জ্ঞান ফিরে আসতেই সে দেখল, তার দিকে তাক করা ক্যামেরার আলো ঝলসে উঠছে। আমুদা ভাবল, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে কাগজের ফোটোগ্রাফাররা তার ছবি তুলছে। “কনগ্র্যাচুলেশনস, আমুদা, তুমিই জিতেছ।” এই কথা শোনার পর মেয়েটির মনের অবস্থা কীরকম হয়েছিল?

অনেকক্ষণ পত্রিকাটার খোলা পাতার দিকে তাকিয়ে বলরাম আনমনার মতো বসে রইলেন। একসময় তাঁর চোখ ভিজে এল। বাড়ি থেকে, দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বিভুঁয়ে, কী লড়াইটাই না করে এল আধপেটা খাওয়া এই গরিবঘরের মেয়েটি।

বলরাম পত্রিকাটি আবার তুলে নিয়ে ভূমিকাটা মনে মনে তর্জমা করলেন: যে আমলে ভারতীয় খেলাধুলোয় সাফল্যের কোনও অস্তিত্বই নেই, তখন সতেরো বছরের আমুদা চিন থেকে জিতে এল এশিয়ান খেতাব। তার এই সাফল্য আরও বেশি সমীহ জাগায় এইজন্যই যে, সে উঠে এসেছে সুযোগ-সুবিধে না পাওয়া পটভূমি

থেকে, বিজয়ী হওয়ার জন্য সত্যিকারের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাকে লড়াই করতে হয়েছে।

দিনের আলো ফোটার আগেই বলরাম সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তুলসীদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যখন "তুলসী, তুলসী" বলে চেঁচিয়ে ডাকলেন, তখনও কুলডাঙা গ্রামের ঘুম ভাঙেনি। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তুলসীর মা। বলরামকে দেখে তো তিনি অবাক।

"এত ভোরে, আপনি?"

বলরাম একটু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "তুলসী একটা ব্যাপার জানার জন্য খোঁজ করছিল, আমি সেটা পেয়ে গেছি, বউদি।"

সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝোলানো ঝুলিটা থেকে তিনি স্পোর্টস টাইম পত্রিকাটি বের করলেন। "ওকে একটু ডেকে দেবেন?"

একটু পরেই ঘুমজড়ানো চোখে তুলসী বেরিয়ে এল। কুণ্ঠিতভাবে সে বলল, "মেসোমশাই, জানেনই তো কেউ এলে ঘরে বসানোর জায়গা নেই।"

"আরে বসার জন্য আমি আসিনি। এই লেখাটা পড়ানোর জন্য এসেছি। পড়ে দ্যাখো। ট্রায়াথলন কী, তা তুমি জানতে পারবে। বলেছিলে না, কতটা দৌড়তে হবে, কতটা সাঁতার কাটতে হবে, কতটা সাইকেল চালাতে হবে তা তুমি জানো না। সব এতে পাবে, আর পাবে একটা মেয়ের কথা।"

"কিন্তু মেসোমশাই—" পত্রিকাটা হাতে নিয়ে তুলসী ইতস্তত করল।

"দেড় কিলোমিটার সাঁতারের পর চল্লিশ কিলোমিটার সাইকেল তারপর দশ কিলোমিটার দৌড়, এর মধ্যে 'কিন্তু'র কী আছে? তুমি তো সেদিনই দশ কিলোমিটার দৌড়লে। রানিসায়রে একবার এপার-ওপার করলেই দেড় কিলোমিটার হয়ে যাবে, আর সেটা তুমি পারো। বাকি রইল চল্লিশ কিলোমিটার সাইকেলে। হ্যাঁ, এতটা তোমার অভ্যাস নেই। এটা তোমায় রেগুলার প্র্যাকটিস করতে হবে।"

"কিন্তু মেসোমশাই—"

"এতে আর একটা জিনিস পাবে।" তুলসীর কথা গ্রাহ্যে না এনে, হাত থেকে পত্রিকাটি টেনে নিয়ে বলরাম পাতা উলটিয়ে বললেন, "আমুদা, মানে যে মেয়েটির কথা এতে আছে, সে রোজ কীরকম প্র্যাকটিস করেছে, তা এখানে লেখা আছে। শোনো, ভোর সাড়ে চারটেয় সে সাইকেল নিয়ে দেড়ঘণ্টা চালায়, তারপর দৌড়য় একঘণ্টা। বাড়ি এসে সে স্কুলে যায়। সওয়া আটটা থেকে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত স্কুল। বাড়ি ফিরে সামান্য কিছু খেয়ে সে সুইমিং পুলে গিয়ে তিন ঘণ্টা সাঁতার কাটে। বাড়ি ফিরে একটু পড়াশুনো, তারপরই শুয়ে পড়া।"

"কিন্তু মেসোমশাই, এই পত্রিকাটা যে ইংরেজিতে লেখা।" অবশেষে তুলসী তার বাক্যটি সম্পূর্ণ বলতে পারল।

"কিন্তু তুমি তো উচ্চ মাধ্যমিক পাস।"

"তা হলেই কি ইংরেজি পড়ে মানে বুঝতে পারব? পড়ার বইয়ের বাইরে তো পড়েছি শুধু নোটবই।"

বলরামকে অপ্রতিভ দেখাল। "তা বটে, তা বটে। তা হলে বাবাকে ধরো। ওঁকে দিয়ে মানে করে নিয়ো। মোটকথা, এটা তোমায় পড়তেই হবে।"

বাড়ি থেকে বাবু বেরিয়ে এসে বলল, "মা চা কচ্ছে, মেসোমশাই খেয়ে যাবেন।"

"অবশ্যই।। আজ আর ইচ্ছে করছে না, কাল থেকে রানিসায়রে যাব। আর তুলসী, তুমিও কাল থেকে লেগে পড়ো। ভোরে সাইকেল নিয়ে—" বলরাম থেমে গেলেন তুলসীর মুখভাব দেখে।

"সাইকেলটা না সারিয়ে, চল্লিশ কিলোমিটার, মানে চব্বিশ মাইল, ওটা দিয়ে চালানো সম্ভব নয়।"

বলরামের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। খুব দ্রুত কী যেন ভেবে নিলেন।

"টেপরেকর্ডারটা কোথায়, বাড়িতে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওটা নিয়ে যাব। মনে হয় খদ্দের একজন আছে।"

তুলসী বাড়ি থেকে টেপরেকর্ডার-ভরা বাক্সটা আনল, আর বাবু আনল কাপে ভরা চা।

বলরাম চা খেয়ে সাইকেলে ওঠার সময় বললেন, "জগন্নাথকাকার কাছে আজকালের মধ্যেই যেয়ো। ট্রায়াথলন কোথাও হচ্ছে কি না জানার জন্য আমিও খোঁজ নেব।"

বাড়ি পৌঁছে বলরাম টেপরেকর্ডারটা বিমলার হাতে দিয়ে বললেন, "তোমার জন্য আনলাম। খুব সস্তায়, মাত্র আড়াইশো টাকায় পেয়েছি। তুমি তো নাটক শুনতে ভালবাস, কালই সিরাজ-উদ্-দৌলার ক্যাসেট এনে দেব।"

অফিসে তিনি মনোজ সামন্তর কাছে খোঁজ নিলেন। "ট্রায়াথালন ব্যাপারটা কী তুমি জানো? এখানে কোনও ক্লাব আছে কি?"

মনোজ জানালেন, জীবনে এই প্রথম শব্দটা শুনলেন। "তবে দোতলায় বিল্ডিং সেকশনের সমরেশবাবু ক্লাবটাব করেন, উনি হয়তো জানতে পারেন।"

একসময় বলরাম দোতলায় বিল্ডিং সেকশনে গিয়ে সমরেশবাবুকে ধরলেন। "আপনি তো খেলাধুলোর লাইনে আছেন, বলতে পারেন ট্রায়াথলনের কোনও ক্লাব এখানে আছে কি না, বা কম্পিটিশন হয় কি না?"

সমরেশবাবু তখন খুবই ব্যস্ত অফিস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের দু'জন কর্তার সঙ্গে আলোচনায়। খুব সংক্ষেপে তিনি বলরামকে জানালেন, "ক্লাব আছে কি না বলতে পারব না, তবে একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপও নাকি করেছে। ওদের অফিস বোধ হয় বিডন স্ট্রিটে। এর বেশি কিছু জানি না।"

বলরাম চেয়ারে ফিরে আসতেই মনোজ সামন্ত জিজ্ঞেস করলেন, "খোঁজ পেলেন?"

"শুধু বললেন, বিডন স্ট্রিটে নাকি অ্যাসোসিয়েশন আছে।"

"আচ্ছা আমি সামন্তপুরে আমাদের ক্লাবে খোঁজ নেব। আমাদের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার পাত্র খেলাটেলার খুব খবর রাখেন, বই টইও পড়েন, ওঁকেই বরং জিজ্ঞেস

করব।"

"আর একটা কথা জানার আছে, সামন্ত। একটা টেপরেকর্ডারের দাম কত পড়বে বলতে পারো?"

"নানা দামের আছে। আটশো, হাজার, দেড় হাজার, দু' হাজার...কিনবেন তো? তা হলে একটু বেশি দামেরটাই—।"

"আরে না না, কিনব না। একজন বেচবে। এই মোটা একটা বইয়ের মতো দেখতে, বোধ হয় সস্তা দামেরই হবে। শ'পাঁচেক টাকা চাইলে অন্যায় হবে না, ব্র্যান্ড নিউ। কী বলো?"

পরদিন সকালে তুলসীদের বাড়িতে গিয়ে বলরাম পাঁচটি একশো টাকার নোট তাকে দিলেন।

"যে কিনল এর বেশি দেওয়ার সামর্থ্য তার নেই।" কুণ্ঠিত স্বরে তিনি বললেন, "আমি প্রথমে আটশো টাকা চেয়েছিলাম।"

"কী উপকার যে করলেন। রেকর্ডার-টা তো টাকা দিয়ে কিনিনি, এর থেকে যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। সাইকেলটা এবার সারাতে পারব।"

"রানিসায়রে যাবে নাকি?"

"যাব, আপনি এগোন।"

দু'দিন পর মনোজ সামন্তের সঙ্গে বলরামের দেখা হল অফিসে ঢোকার মুখে।

"এই যে গড়গড়িদা, ডাক্তারবাবুকে ট্রায়াথলনের কথা জিজ্ঞেস করেছি। আপনি খোঁজ করছেন শুনেই তো উনি রীতিমতো তেতে উঠলেন।"

"তেতে ওঠার কারণ?" বলরাম হালকা চালে বললেন।

"ওই যে সেদিন আমাদের ওখানে বলে এলেন 'এই কাজ আবার করব, যতদিন পারব করে যাব', এটাই ডাক্তারবাবুকে ভীষণ নাড়া দিয়েছে। ওঁর বাড়িতে আজই সকালে গেছিলাম। চেম্বারে যাবেন বলে বেরোচ্ছিলেন, যাওয়া বন্ধ রেখে বসে পড়লেন। বললেন, বলরামবাবুর নামা উচিত ট্রায়াথলনে। ওঁর মতো লোকেরাই পারবে। পড়াশুনো করা লোক তো, ট্রায়াথলন শুরুর ইতিহাসই বলে দিলেন। ভাবতে পারেন, উনিশশো আটাত্তর সালে, তার মানে মাত্র ক' বছর আগে হাওয়াইয়ে এই স্পোর্টস-টার জন্ম দিয়েছে নেভি-র দুটি লোক। চলুন ভেতরে যাই, টেবিলে না বসলে এসব কথা গুছিয়ে বলা যায় না।"

চেয়ারে বসেও মনোজ সামন্ত গুছিয়ে বলতে পারলেন না। "বুঝলেন দাদা, অতসব কথা মনে থাকে না। আমি বরং দু চারটে পয়েন্ট লিখে নিয়ে আসব। তবে ওই দুটো লোক নিজেদের মধ্যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল এই বলে যে, শরীরের সবক'টা প্রধান প্রধান মাসল্‌সের ক্ষমতা আর সহনশক্তি কার কত বেশি তার একটা পরীক্ষা শুরু হয়ে যাক। আর সেই পরীক্ষার জন্য ওরা ঠিক করে—"

"দেড় কিলোমিটার সাঁতার, চল্লিশ কিলো—"

"আরে না না গড়গড়িদা, এসব তো নস্যি। কত দূরত্ব দিয়ে ট্রায়াথলনের শুরুটা হয়েছিল, জানেন? ...সমুদ্রে আড়াই মাইল সাঁতার, একশো বারো মাইল সাইকেল

রেস আর তারপর পুরো ম্যারাথন দৌড় অর্থাৎ ছাব্বিশ মাইল তিনশো পঁচাশি গজ। বাপস। শুনেই তো আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। এই ভাবে শরীরের ক্ষমতার পরীক্ষা মানুষে দিতে পারে। এর নাম হল 'আয়রনম্যান ট্রায়াথলন'। আপনি যেটার কথা বলছেন তার নাম 'টিনম্যান ট্রায়াথলন'।"

"আয়রনই হোক আর টিনই হোক, লোকে তো স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে কম্পিটিশনে নামছে।" বলরাম গম্ভীর স্বরে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন।

"নামছে বলে নামছে।" মনোজের দুই চোখের মণি বিস্ফারিত হল। "শ'য়ে-শ'য়ে ট্রায়াথলন বছরে হচ্ছে পৃথিবীর বহু দেশে, আর আমরাই এ-সম্পর্কে কিছু জানি না। আর লোক বলতে শুধু কি পুরুষ? মেয়েরাও আয়রনম্যান-এ নামছে। কোথায় পড়ে আছি আমরা।" মনোজ মাথা নেড়ে আক্ষেপের সঙ্গে চুকচুক ধরনের একটা শব্দ মুখ দিয়ে বের করলেন।

বলরাম সান্ত্বনা দেবার মতো করে বললেন, "আমাদের দেশে শুরু হোক, দেখবে প্রচুর ছেলেমেয়ে নামবে। দুঃখ হয় কী জানো, এসব স্পোর্টস আমাদের অল্পবয়সে ছিল না।"

"ছিল না তো কী হয়েছে, এখন তো হয়েছে। আপনি নামুন।"

"আমি নামব?" বলরাম হেসে উঠতে গিয়েও হাসলেন না। শুধু মাথা নাড়লেন, "এত কঠিন পরীক্ষা এই বয়সে শরীর দিতে পারবে না।"

মনোজের মুখ এবার হাসিতে উদ্ভাসিত হল। "পারবে না বলছেন? তা হলে এই বছরেরই গোড়ায় মাদ্রাজে যে ন্যাশনাল ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়ানশিপ হল, তার সঙ্গেই হল এশিয়ান কাপ সিরিজের প্রথম দফায় কম্পিটিশন। তাতে নেমেছিলেন জাপান ট্রায়াথলন ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। তাঁর বয়স কত জানেন?" মনোজ একটা নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করলেন। "বলুন, কত হতে পারে?"

বলরাম বুঝলেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মশাই অবশ্যই বয়স্ক, নয়তো মনোজ রহস্যময় করে তুলত না প্রশ্নটাকে। "কত হবে বলব কী করে, এই ধরো পঞ্চাশ-বাহান্ন।" বলরাম যথাসাধ্য বাড়িয়েই বললেন।

"বাহাত্তর।"

বলরামের বিস্ময়ে কোনও ভেজাল নেই। তিনি শুধু "অ্যাঁ" বলে তাকিয়ে রইলেন।

"অ্যাঁ নয়, সত্যিই। বুড়ো পুরো ফিনিশ করেছে, তবে সবার শেষে।" মনোজের গলায় প্রচ্ছন্ন একটা শ্রদ্ধা আবিষ্কার করলেন বলরাম বাহাত্তর বছরের এক জাপানির জন্য।

"এই যে পঞ্চাশ-বাহান্ন বললেন, আমেরিকার একটি লোক তাঁর বাহান্নতম জন্মদিনের বছরটা পালন করেছেন কীভাবে জানেন?" মনোজ উত্তেজিত দৃষ্টিতে বলরামের দিকে তাকিয়ে রইল উত্তরের জন্য।

"আমি কী করে জানব? ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তো আমার কথা হয়নি।"

"বাহান্নটা ট্রায়াথলনে কম্পিট করে। তার মানে হপ্তায় একটা করে। চোখ বুজে

ব্যাপারটা ভাবুন তো। আমরা পারব?"

"লোকটাকে কি লোকাল ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কেরানির চাকরি করতে হয়?"

মনোজ থতমত হয়ে আমতা আমতা করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, সুযোগ না দিয়ে বলরাম বললেন, "সবসময় ওই ডেভেলাপড কান্ট্রির লোকেদের সঙ্গে আমাদের মতো পিছিয়ে থাকা গরিব দেশের তুলনা কোরো না; নিজেদের ছোট চোখে দেখা উচিত নয়।"

বলরামের চাহনিতে এমন কিছু একটা রয়েছে, যেটা মনোজের মাথা নত করে দিল। টেবিলের ড্রয়ার খুলে তিনি কলম, পিন-কুশন, পেপার-ওয়েট ইত্যাদি বের করে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

"মনোজ, কোথাও যদি ট্রায়াথলন হয় আমি নামব। কথাটা কিন্তু এখন কাউকে বোলো না, তবে ডাক্তারবাবুকে জানিয়ে দিয়ো।"

বলরাম তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা বিমলাকেও জানাননি। তুলসীকেও নয়।

স্পোর্টস টাইম পত্রিকাটি নামিয়ে রেখে জগন্নাথবাবু বললেন, "এতে তো যা জানার তা সবই রয়েছে। তুই ভাল করে তা হলে প্র্যাকটিস শুরু কর।"

"শুরু মোটামুটি করেছি। সাইকেলটা মেরামত করতে দিয়েছি ওপারে জটাধারী রিপেয়ারিং শপে। কাল পরশু দেবে। ভোরে এখন সাইকেলের বদলে দৌড়চ্ছি। আমাদের ভেতর দিকে চালতাতলা, রাইহাটা, দেবীপুর যাওয়ার রাস্তাটা পাকা, ভাঙাচোরা নয়। ওটা ধরে গত দু'দিন একঘণ্টা দৌড়ে এসে, জলে নেমে দু'বার রানিসায়রটা এপার-ওপার করেছি।" যেন অনুমোদন চায় এমনভাবে তুলসী তাকিয়ে রইল জগন্নাথবাবুর দিকে। তিনি মাথা নেড়ে বোঝালেন সন্তুষ্ট হয়েছেন।

"তবে সাইকেলটা পেলে আগে সাইকেল তারপর দৌড়, যেভাবে আমুদা করে। আর বিকেলে সাঁতার। সকালে দৌড়বার আগে কিছু খেয়ে নিস। খালি পেটে দৌড়বি না, ভেজানো ছোলা বা বাদাম খাবি।"

তুলসী মাথা নাড়ল।

"খবর নিয়েছি, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ট্রায়াথলনের স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপ হবে। এন্ট্রি ফর্ম আনাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি, বিডন স্ট্রিটে আমাদের অফিসের একটা ছেলে থাকে। তুই এখন বাড়ি যাবি কী করে, সাইকেলটা তো নেই।"

"হাঁটব। বিদ্যাসাগর ছাড়লেই তো অন্ধকার, তখন ছুটব।"

জগন্নাথবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তুলসী এল জটাধারী হালদারের রিপেয়ারিং শপে।

"কতদূর হল জটুবাবু? কাল পাব তো?"

সিলিং থেকে চেন দিয়ে ঝোলানো একটা সাইকেল, তার দুটি চাকাই খোলা। জটাধারী সেটি নিয়ে ব্যস্ত। তুলসীর দিকে না তাকিয়েই বলল, "যা বদলাতে হবে তাতে পাঁচশো টাকার বেশি পড়ে যাবে। হ্যান্ডেলের নীচের রডটা মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে, চেনটা পালটাতে হবে, পেছনের ব্রেক কাজ করে না, সামনের চাকার রিমটা তো গেছে, দুটো স্পোক ভাঙা। চালাতেন কী করে। খুব কম করে আরও তিন-চারশো টাকা লাগবে। বলেন তো করে দিচ্ছি। আর নয়তো ঝালাই করে জোড়া লাগিয়ে কাজ চলার মতো করে দিতে পারি। পাঁচশোর মধ্যেই হয়ে যাবে। এবার বলুন, কী করবেন?"

বিপন্ন বোধ করল তুলসী। আরও তিন চারশো টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া, 'কাজ চলার মতো' বলতেই বা কী বোঝায়?

"দেখুন, এটা নিয়ে একটা কম্পিটিশনে নামব। জোড়াতালি দিয়ে সারালে ভেঙে যাবে না তো?"

"কীরকম কম্পিটিশন সেটা, যাতে এই সাইকেল নিয়ে নামার কথা ভাবছেন?" জটাধারী অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে রইল।

অস্বস্তিতে পড়ল তুলসী। এই লোককে এখন ট্রায়াথালন ব্যাপারটা বোঝানোর সময় তার নেই। বাড়ি ফিরতে হবে চার মাইল হেঁটে বা দৌড়ে।

তুলসীর মুখ দেখে জটাধারীর মনে হল, মাঠে বা রাস্তা বন্ধ করে যেসব অবিরাম সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতা হয়, তেমন কিছুতে বোধ হয় নামবে। তা ছাড়া সাইকেল কম্পিটিশন, তাও এইরকম সাইকেলে চড়ে, এ রাজ্যে কোথাও হয়ে থাকে বলে তো সে শোনেনি। তুলসীকে আশ্বস্ত করার জন্য সে বলল, "চলে যাবে। পঁচিশ-তিরিশ ঘণ্টা টানা চালালেও কিছু হবে না। ও ব্যাপারে গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"তা হলে যা বললেন ওইভাবেই করে দিন। পাঁচশোর বেশি দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই। আমি কখন পাব?"

"কাল নয়, পরশু এই সময় আসুন। কাল কলকাতায় গিয়ে জিনিসপত্র কিনব। আর একটা কথা, ভাল কন্ডিশনে যদি সেকেন্ড হ্যান্ড পার্টস পাই, আনব কি? এতে টাকা বাঁচবে।'

"আনুন। আমি কিন্তু পরশু ঠিক রাত আটটায় আসছি।"

বলরাম রাত থাকতেই বিছানা থেকে ওঠেন। ঘড়ি ধরে সাড়ে চারটের সময়, তাঁর ছেলে বলাইয়ের পরিত্যক্ত একটা পশমের টুপি মাথায় বসিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরোন। তিনি যান বিদ্যানগর স্টেশনের দিকে। লেভেলক্রসিং পেরিয়ে আরও পশ্চিমের বি. টি. রোডে পৌঁছন। অতঃপর বাঁ দিকে ঘুরে, ফাঁকা মসৃণ রাস্তায় বেশ জোরে চালিয়েই বরানগরের টবিন রোড পর্যন্ত এলে পঁচিশ মিনিট সময় সম্পূর্ণ হয়।

দূরত্ব ক্রমশ বাড়িয়ে আপাতত তিনি এই পর্যন্ত আসছেন। তারপর আবার একই পথ ধরে তিনি ফিরে আসেন। ঠিক পঞ্চাশ মিনিটে তিনি রামপ্রসাদ হস্টেলের সামনে এসে পৌঁছন এবং না থেমে আরও চোদ্দো মিনিটে কুলডাঙায় এবং রানিসায়রে। ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা চার মিনিটে তিনি সাইকেলের ওপরে থাকেন। অবশ্য কয়েক মিনিটের হেরফের কোনও কোনওদিন হয়। তাঁর লক্ষ্য সাইক্লিংয়ের সময়টাকে দেড়ঘণ্টা করা। এজন্য তিনি নিজেকে পাঁচদিন সময় দিয়েছেন।

একঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে আসার পর রানিসায়রে পারাপার তাঁর কাছে কষ্টকর হয়। তিনি জানেন পারাপারে যতটা দূরত্ব, প্রায় ততটাই তাঁকে ট্রায়াথলনে অতিক্রম করতে হবে। গঙ্গায় স্রোতের সঙ্গে সাঁতরানো আর স্থির জলে সাঁতার কাটার মধ্যে শারীরিক তাগদের পার্থক্য ঘটে। তাই ওপারে গিয়ে ফিরে আসার সময় তাঁর হাত ভার লাগে, সায়রের মাঝামাঝি বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থেমে যান। কিছুক্ষণ জলে ভেসে থেকে আবার সাঁতার শুরু করেন। কিন্তু তাঁকে না থেমে পারাপার করতেই হবে যত মন্থর ভাবেই হোক না কেন। এজন্য তিনি নিজেকে সারাদিন সময় দিয়েছেন।

বলরাম রানিসায়র থেকে ফিরে যাওয়ার আগেই তুলসী বাড়ির সামনে সাইক্লিং শেষ করে। সাইকেলটা বাবুর হাতে দিয়েই সে দৌড় শুরু করে। বাবু সাইকেল চালিয়ে দিদির সঙ্গে রাইহাটা পর্যন্ত মাইল তিনেক গিয়ে আবার তার সঙ্গেই ফিরে আসে।

জটাধারী কথামতো নির্দিষ্ট দিনেই সাইকেল মেরামত করে তুলসীকে দিয়েছিলেন। দেওয়ার সময় বলেছিলেন, "দেখবেন দিদি, এই সাইকেলই কম্পিটিশনে আপনাকে ফার্স্ট করে দেবে।" শুনে তুলসীর মন খুশিতে ভরে গেছিল। সাইকেলের কিছু কিছু অংশ জটাধারী বদলে দিয়েছেন, কয়েক জায়গায় ঝালাই করেছেন। দুটো মাডগার্ডে এবং রডগুলোর কালো রংও করে দিয়েছেন, যেটা করার কথা ছিল না।

বলরাম কাউকে জানাতে চান না যে, তিনি ট্রায়াথলনে নামতে চান এবং সেজন্য নিজেকে তৈরি করছেন। যেহেতু তিনি মনে করেন, লোকে এ-কথা জানলে হাসবে বা আড়ালে হাসাহাসি করবে। এমনিতেই তো তাঁর চেহারা আর হাঁটা নিয়ে লোকে হাসত। হাঁটাটা সংযত করেছেন। কেউ আর তাঁর দিকে এখন তাকায় না। কিন্তু ট্রায়াথলনে নামবেন শুনলে আবার হাসিটা শুরু হয়ে যাবে। তুলসীকেও তিনি বলেননি। কথায় কথায় পাছে বলে ফেলেন, সেজন্য তিনি ওর সঙ্গে দেখা করেন না, বাড়িতে গিয়ে খবরও নেন না। রানিসায়রে যাওয়ার একটা নতুন পথ তিনি বের করে ফেলেছেন, যেটা তুলসীদের বাড়ির ত্রিসীমানায় নয়। তিনি জানেন, আমুদার ট্রেনিংসূচি তুলসী অনুসরণ করবে। সে ভোরে সাইকেল আর দৌড় নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, রানিসায়রে আসবে বিকেলে। তাই তিনি সাইক্লিং সেরে ভোরেই রানিসায়রে আসেন। তাঁদের মধ্যে আর দেখা হয় না।

বলরাম দৌড়চ্ছেন রাতে। ধাক্কাধাক্কি করে ট্রেনে উঠে তিনি অফিস থেকে সাড়ে

ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন। আটটায় তিনি বাড়ি থেকে দৌড়তে বেরোন। এজন্য তিনি নতুন কেডস, হাফ প্যান্ট এবং স্পোর্টস গেঞ্জি কিনেছেন। মাথায় পশমের টুপিটা পরে তিনি ছুটতে যান গ্রামের দিকে, যেখানে রাত্রে রাস্তায় লোক প্রায় থাকেই না।

কিছু আলো-জ্বলা দোকান পথে পড়ে। দোকানে যারা থাকে, মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকায়। আর কিছু নয়। পথচলতি মানুষরাও তাকায়। বলরাম অন্ধকারে হোঁচট খান, গর্তে পা পড়ে, খোয়া, ইট পায়ে ফোটে। মাঝে মাঝে হাতঘড়ি দ্যাখেন আর একই গতিতে ছুটতে থাকেন এবং গতিটি খুবই মন্থর। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। দাঁড়িয়ে হাঁপান। সারা শরীর অবসন্ন লাগে। সকালে সাইকেল, সাঁতার, অফিস করা, ট্রেনের ভিড় আর ধাক্কাধাক্কি; তারপর রাতে এই ছোটা। এক একসময় রাস্তার ধারের গাছে দু'হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি জিরোন। তিনি জানেন, প্রথম হওয়ার জন্য তিনি ট্রায়াথলনে নামতে চান না। আর এই বয়সে তা সম্ভবও নয়। তিনি চান সমাপ্ত করতে, সকলের শেষে পৌঁছেও।

তুলসী এবং বলরাম একই দিনে খবর পেলেন, রাজা ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়ানশিপ হবে কলকাতার পুবে বেলেঘাটায় সুভাষ সরোবরে, ডিসেম্বরের উনিশ তারিখ রবিবারে।

বলরামকে খবরটা দিলেন মনোজ সামন্ত।

"গড়গড়িদা, আপনাকে ডাক্তারবাবু দেখা করতে বলেছেন, পারলে আজই। উনি ফর্ম আনিয়ে রেখেছেন। আপনি আমাদের সামন্তপুর স্পোর্টিংয়ের হয়ে ট্রায়াথলনে নামবেন।"

"তা হলে ছুটির পর তোমার সঙ্গেই যাব। ওঁর বাড়ি তো আমি জানি না।"

মনোজের সঙ্গেই বলরাম ডাক্তারবাবুর চেম্বারে পৌঁছলেন। রোগীতে তখন অপেক্ষার ঘর ভর্তি। বাইরেও অনেকে দাঁড়িয়ে। মনোজ চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আধ মিনিটেই বেরিয়ে এসে বলরামকে হাত নেড়ে ডাকলেন। ডাক্তারবাবুর সামনে তখন এক মহিলা তাঁর অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে বসে।

"আপনার এন্ট্রি ফর্ম"—ডাক্তারবাবু ড্রয়ার খুলে ব্যস্তভাবে ফর্ম বের করলেন। "কোনও এন্ট্রি ফি নেই। স্পোর্টসটা পপুলারাইজ করার জন্যই ওরা কোনও ফি নিচ্ছে না। ডাক্তারের সার্টিফিকেট লাগবে, সেজন্য তো আমি আছিই। আর সাইক্লিং ইভেন্টের জন্য মাথায় দিতে হবে একটা সেফটি হেলমেট। জোগাড় করতে পারবেন?"

বলরাম অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন। "এ জিনিস আমি পাব কোথায়?"

ডাক্তারবাবু কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বললেন, "অবশ্য না হলেও চলবে। একেবারে নতুন স্পোর্টস তো, ওরা বলেছে এটাকে পপুলার করার জন্য নিয়মকানুনের কড়াকড়ি করবে না। নিজের রিসকে কেউ যদি হেলমেট ছাড়াই সাইকেল চালায় তো চালাক, আপনি এই ওয়েভার অ্যান্ড ইনডেমনিটি ফর্মটায় সই করে দিন। মারা গেলে, পঙ্গু হয়ে গেলে, কি কোনও জিনিস হারালে সেজন্য স্টেট

অ্যাসোসিয়েশন দায়ী থাকবে না বলে এতে লেখা আছে।"

বলরাম দু' পাতা জোড়া ইংরেজি ফর্ম না পড়েই সই করে দিলেন। ডাক্তারবাবু ফর্মটা আবার ড্রয়ারে রেখে বললেন, "কিছু জানাবার থাকলে মনোজবাবুকে দিয়ে খবর দেব, আর উনিশে ডিসেম্বর আমি নিজে সুভাষ সরোবরে থাকব।"

ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে বলরাম যখন বেরোলেন, তুলসীও তখন জগন্নাথবাবুর বসার ঘর থেকে বেরোনোর জন্য সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"অনুকে তো তুই জানিস, আমার ভাগ্নি। ওর শ্বশুরবাড়ি সুভাষ সরোবরের খুব কাছে, হেঁটে তিন-চার মিনিট। আমি ফোন করে বলে রাখব, আগের দিন রাতে ওর বাড়িতে গিয়ে থাকবি। সাইকেলটা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলিস না।"

তুলসী হেসে মাথা নাড়ল। "আর যে ভুলই করি না কেন, এটা করব না।"

"কম্পিটিশনের আগের দিন সকালে কিন্তু অবশ্যই সুভাষ সরোবরে যাবি। সব কম্পিটিটারদের ওরা নিয়মকানুন আর রুট বুঝিয়ে দেবে। এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। চিনে যেতে পারবি তো?"

"পারব। আপনি অনুদির ঠিকানাটা দিন। গ্রামে থাকি বলে কলকাতা চিনি না নাকি? কম্পিটিশনের দিন আপনি ওখানে থাকবেন তো কাকাবাবু?" তুলসী অসহায় চোখে তাকাল। এই ট্রায়াথলন তার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হতে চলেছে। একদম একা হয়ে, নিজের পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে, ভরসা পাওয়ার মতো একটা চেনা মুখও যদি তখন থাকে, তা হলে মনে কিছুটা জোর সে পাবে। কিন্তু সেখানে হাজির থাকার জন্য কাকে সে পাবে? ছোট ভাই বাবু ছাড়া এখান থেকে যাওয়ার মতো আর একজনই, এই জগন্নাথকাকা।

"যাব না মানে?" ঠাণ্ডা মাথার জগন্নাথবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন। "আমাদের স্পোর্টস কমিটিতে দু-তিনজন কথা তুলেছে ট্রায়াথলনে আবার রিক্রুট করা কেন? আমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার মাথা যে ঠিক আছে, সেটা তোকে প্রমাণ করে দিতে হবে। দিল্লি থেকে বোর্ডের অ্যাপ্রুভাল আমি পেয়ে যাব। এখন বোর্ডে যিনি সেক্রেটারি তাঁর আউটলুকটা খুব মডার্ন, খেলার সব খবরাখবর রাখেন। এই রাজ্যে কোনও ট্রায়াথলনিস্ট এখনও কোথাও চাকরি পায়নি। আমার অফিস প্রথম চাকরি দেবে, এটাই হবে আমার সাফল্য।" জগন্নাথবাবু বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের ঘুসি মারলেন।

স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপের আগের দিন বলরাম বাজার করে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোলেন সকাল সাতটায়। শনিবার তাঁর অফিস বন্ধ। তিনি লেভেলক্রসিং থেকে দেখতে পেলেন কলকাতার দিকে একটা ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওই ট্রেনেই উঠেছে তুলসী। সে জানত না, বলরামও ট্রায়াথলনের একজন প্রতিযোগী। তাই সুভাষ সরোবরে স্পোর্টস কাউন্সিলের সুইমিং পুলে জমায়েত ছোট-বড় মিলিয়ে বয়সভিত্তিক তিনটি বিভাগের ষাট-সত্তরজন প্রতিযোগীর মধ্যে হঠাৎ বলরামকে দেখতে পেয়ে সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল।

"মেসোমশাই, আপনি এখানে?"

প্রথমে বলরাম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন। তারপর মনে হল, আর গোপন রেখে কোনও লাভ নেই। কালই তো তুলসী দেখতে পাবে এই প্রতিযোগিতায় তিনিও একজন প্রতিযোগী। এবার সত্যি কথাটা বলে দেওয়াই ভাল।

"আমি তো কাল এখানে নামছি।"

"যাঃ।" তুলসী বিশ্বাস করল না। বলরাম মুহূর্তের জন্য বেদনা বোধ করলেন। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলেন, তুলসীর অবিশ্বাস করাটা খুবই স্বাভাবিক। ট্রায়াথলনের মতো কষ্টসাধ্য খেলায় এদেশে তাঁর মতো বয়সের কেউ যে নামতে পারে, কে সেকথা বিশ্বাস করবে?

"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি, বেশ, কালই দেখতে পাবে।"

"বেশ, দেখব।" তুলসী হেসে বলল বটে, কিন্তু ওর মুখ দেখে বলরাম বুঝলেন, তাঁর নামার কথাটাকে ঠাট্টা হিসেবেই নিয়েছে।

সুভাষ সরোবর ওরা কেউই আগে দেখেনি। প্রথম দর্শনেই তুলসী বলল, "মেসোমশাই, এটা কিন্তু রানিসায়রের থেকে অনেক বড়।"

"হোক না বড়, সেজন্য দেড় কিলোমিটারের বেশি তো আর সাঁতরাতে হবে না।"

সরোবরটি গোল বা চৌকো নয়, কিছুটা ডিম্বাকৃতির। এর পুবে একটি বড় এবং পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট দ্বীপ রয়েছে। ওই দ্বীপ দুটিতে হরিণ রাখা ছিল। এখন আর নেই। রানিসায়রের ঘাট বলতে যা বোঝায়, এখানেও সেইরকম। পাড় থেকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া ভাঙাচোরা জমি, সেটাই হল প্রতিযোগিতার প্রথম বিষয় সাঁতারের শুরুর জায়গা। সংগঠকরা সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন, সাব-জুনিয়ার, জুনিয়ার ও সিনিয়ারদের কোন পথ ধরে কতটা সাঁতরাতে হবে। সিনিয়ারদের অর্থাৎ তুলসী ও বলরামকে প্রথমে বড় দ্বীপটা বেড় দিয়ে বাঁ দিকে পশ্চিমে ছোট দ্বীপের দিকে যেতে হবে। ছোট দ্বীপটিকেও বেড় দিয়ে আরও এগিয়ে ভাসমান একটি পতাকা ঘুরে আবার ফিরে আসতে হবে শুরুর এই জায়গায়। মোট দেড় কিলোমিটার সাঁতার কেটে জল থেকেই উঠেই প্রায় তিরিশ মিটার ছুটে গিয়ে উঠতে হবে সাইকেলে। তার মধ্যেই চটপট পরে নিতে হবে জুতো আর একটা গেঞ্জি। নম্বর লেখা সাঁতারের টুপিটা অবশ্য মাথায় বাঁধাই থাকবে।

সরোবর বেড় দিয়ে যে আড়াই কিলোমিটার পিচের রাস্তা, তাই ধরে সাইকেলে তাদের ষোলোবার পাক দিতে হবে। ওরা সবাই চাক্ষুষ করবার জন্য রাস্তা ধরে হাঁটল। সাইকেল চালাবার পর এই রাস্তা ধরেই তাদের দৌড়তে হবে চারপাক। রাস্তাটি, বলরামের মনে হল, বিদ্যানগরের থেকে অনেক ভাল। তবে অনেক জায়গায় ভাঙাও রয়েছে। কিন্তু যে জিনিসটি তাঁর কাছে মসৃণ গতিতে স্থিরভাবে সাইকেল চালাবার পথে বিঘ্নকারী বলে মনে হল, সেটি হচ্ছে স্পিড ব্রেকার।

"মেসোমশাই, ওই দেখুন, সল্ট লেক স্টেডিয়াম দেখা যাচ্ছে।" রাস্তা দেখার থেকেও তুলসীর চোখ আশপাশের দিকেই বেশি। "আপনি ওখানে কখনও খেলা দেখেছেন? আমি দেখিনি। খুব ইচ্ছে করে, একবার অন্তত রাত্রে একটা ফুটবল ম্যাচ দেখতে।"

"কিন্তু এখন ভাল করে দেখে নাও এই স্পিড ব্রেকারগুলোকে। ফুটবল ম্যাচ দেখার কথা পরে ভেবো। এই দ্যাখো", বলরাম আঙুল দিয়ে দেখালেন, রাস্তার মাঝে আড়াআড়ি স্ফীত হয়ে থাকা জায়গাটি।

"অসুবিধের তো কিছু নেই।" তুলসীর সহজ ও সরল স্বর বুঝিয়ে দিল স্পিড ব্রেকার কোনও সমস্যা নয় তার কাছে। "স্পিড কমিয়ে সাইকেল আস্তে করে নিলেই হবে। কেমন রাস্তা দিয়ে কুলডাঙা থেকে যাতায়াত করতে হয় তা তো জানেন। আচ্ছা মেসোমশাই, এটা কীসের মন্দির বলুন তো?"

"গিয়ে দেখে এসো।"

রাস্তা থেকে সরোবরের দিকের জমিতে সাদা একটি মন্দির গৃহ। তুলসী ছুটে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েই ফিরে এল।

"লেখা রয়েছে লোকেশ্বর বাবার পুরাতন মন্দির। ভেতরে শিবলিঙ্গ। হনুমান মূর্তিও রয়েছে। আচ্ছা মেসোমশাই, আপনি ভগবান মানেন?"

"মানি না, তবে কাল মানব।"

"আপনি কি কাল নামছেন?"

"হ্যাঁ।" বলেই তুলসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, এখনও বিশ্বাস করেনি।

"আচ্ছা, এই যে বিরাট বিরাট কংক্রিটের এত পাইপ পড়ে রয়েছে, এগুলো কী জন্য?"

তুলসীর কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা না করে বলরাম তার নজর টেনে বললেন, "রাস্তাটা দ্যাখো, এখানেও একটা স্পিড ব্রেকার।"

তুলসী দেখে বলল, "এসব এখন দেখে কী হবে মেসোমশাই, যখন চালাব তখন চোখ রেখেই চালাব। সরোবরের এই দিকটা দেখে আমার কিন্তু রানিসায়রের কথা মনে পড়ছে। বেলা হলে রানিসায়রে চান করার জন্য যেরকম লোক হয়, গোরু-বাছুর এনে গা ধোওয়ায়, তাকিয়ে দেখুন অনেকটা সেইরকম। ওরে বাবা কতগুলো মোষও রয়েছে, কেন জানি এদের আমার খুব ভয় করে। আচ্ছা, মোষেরা কি খুব হিংস্র হয়?"

"বোধ হয়, হয়। শুনেছ তো, ওঁরা বললেন আজ রাত্রে এখানে সাইকেল রাখার ব্যবস্থা আছে। তুমি সঙ্গে করে আনলে না কেন? তা হলে আর কাল সকালে ট্রেনে চড়িয়ে আসতে হবে না।"

তুলসী মুচকি হেসে বলল, "সে ব্যবস্থা আমার আছে। এখানে জগন্নাথকাকার ভাগ্নি অনুদির বাড়িতে আজ রাতে আমি আর ভাই থাকব। সাইকেল নিয়ে আজই রাতের ট্রেনে চলে আসব।"

বলরাম ভাবলেন, সাইকেল এনে রেখে দিয়ে আবার তাঁর বিদ্যানগর ফিরে যাওয়ার থেকে বরং কাল প্রথম ট্রেনেই ভেণ্ডার কামরায় উঠে চলে আসাই ভাল। রোজই তো ভোরে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোন, সুতরাং বিমলা বুঝতেই পারবে না কোথায় যাচ্ছি। নিশ্চয়ই দুপুরের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যাওয়া যাবে। দোকান-বাজার আজ রাতেই সেরে রাখতে হবে।

"মেসোমশাই, এই দেখুন একটা মসজিদ। জলের এপারে আর ওপারে মুখোমুখি

মন্দির আর মসজিদ, অদ্ভুত নয়?"

"তুলসী, কাল তোমাকে যাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে তাদের সম্পর্কে কোনও খোঁজখবর কি নিয়েছ? এই যে কুড়ি-পঁচিশজন মেয়েকে দেখছি, এদের মধ্যে মনে হচ্ছে সিনিয়ার মেয়ে খুবই কম, সাত-আটজন বড়জোর। তোমার কী মনে হচ্ছে ওদের দেখে?"

"কিছুই মনে হচ্ছে না।" নির্বিকার মুখে তুলসী বলল। "আগে থাকতে মনের মধ্যে ভয় ধরিয়ে রাখলে সেটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়েই যায়। তিনটে বিষয়ে কম্পিটিশন, সবাই তিনটেতে দড় হবে আপনি কি তাই মনে করেন?"

"না।"

"সাঁতারে কলকাতার মেয়েরা ভাল। ওরা রেগুলার শেখে, প্র্যাকটিস করে, কম্পিটিশনে নামে। আমি শিখিনি, কম্পিটিশনে কখনও নামিনি। আমি জানি সাঁতারে আমি পিছিয়ে থাকব, কিন্তু সাইকেলে আমি অনেকটা মেক-আপ করে নেব। মাঝের এটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমার ভরসা রানিং। দশ কিলোমিটার দৌড়েছি তো, আমি জানি কীভাবে দৌড়তে হবে। আমুদার কথা মনে আছে আপনার?"

"আছে। কিন্তু তুমি কি জানো মাদ্রাজে একজন বাহাত্তর বছরের জাপানি ট্রায়াথলনে কম্পিট করে ফিনিশও করেছেন?"

"কই না তো।" তুলসী বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। "বাহাত্তর বছরের?"

বলরাম আলতো হেসে বললেন, "তা হলে তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করছ কেন? আমি তো বাহাত্তরের অনেক কম।"

"মেসোমশাই...সত্যি।"

তুলসী আবেগের বশে বলরামের দুই হাত চেপে ধরল। "কী দারুণ ব্যাপার, আমরা দু'জনেই কাল নামছি।"

"হ্যাঁ নামছি। আর আমার মন বলছে তুমি জিতবে।"

তুলসী ঝপ করে বলরামকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার মন বলছে আপনি ফিনিশ করবেন।"

তুলসীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলরাম মনে মনে বললেন, "চাকরি যেন পায়। কাল নয়, ভগবান, আজ থেকেই তোমায় আমি মানছি।"

বেলেঘাটা সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘাটে, সুভাষ সরোবরের হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে বারোটি ছেলে ও চারটি মেয়ে। তাদের পেছনে পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় কাপড়ের টুপি ও কস্টিউম-পরা একজন পুরুষ প্রতিযোগী। তাঁর আচরণের মধ্যে কোনওরকম অধৈর্যের বা নার্ভাস হওয়ার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে না। ইনি বলরাম গড়গড়ি। চারটি মেয়ের অন্যতম তুলসী। তার ভাই বাবু উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা নিয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে। ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে জগন্নাথবাবু।

সকাল আটটা থেকে রাজ্য ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রথমে সাব-জুনিয়ার ছেলে ও মেয়েদের দিয়ে শুরু হয়। তারপর হয় জুনিয়ার ছেলে ও মেয়েদের। এখন শুরু হতে চলেছে সিনিয়ারদের প্রতিযোগিতা। অভিভাবক, সংগঠক, ভলান্টিয়ার আর দর্শকদের ভিড় ও ব্যস্ততায় সরোবরের দক্ষিণ দিকটা সরগরম। না উষ্ণ না শীতল, এমন একটা বাতাবরণ বিরাজ করছে সরোবর ঘিরে। ছুটির দিন; তাই প্রচুর মানুষ। তারা ব্যস্ত হয়ে পথ চলছে, ঘাসে বসে গল্প করছে অথবা জলে নেমে স্নান করছে। একটা কিছু প্রতিযোগিতা হচ্ছে জানতে পেরে বহু মানুষ ধারেকাছের বাড়ি থেকে এসে দর্শক হয়েছে।

শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতিযোগীরা। বলরাম কোমর জলে নেমে গিয়ে সামনে তাকালেন। ষোলোজোড়া হাত ও পায়ের তাড়নায় জলে ফেনা কাটছে। ষোলোটি লাল টুপির মধ্যে 'বাইশ নম্বর' লেখা টুপিটিকে খুঁজলেন, কিন্তু দেখতে পেলেন না। একবার পেছনে তাকিয়ে খুঁজলেন ডাক্তারবাবুকে। বলেছিলেন তো আসবেন। অতঃপর সময় নষ্ট না করে তিনি জলের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

বড় দ্বীপটা প্রায় দেড়শো মিটার দূরে। বলরাম সেটিকে বেড় দিয়ে যখন ছোট দ্বীপটার দিকে যাচ্ছেন তখন সামনের ষোলো জনের ঝাঁক থেকে বেরিয়ে সাত-আটটি ছেলে এগিয়ে গেছে। সব থেকে পিছিয়ে থাকা সাঁতারুটির থেকেও বলরাম একশো মিটার পিছিয়ে। তিনি জানেন, ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কোনও তাগিদ তাঁর নেই। তাঁকে দম আর ক্ষমতা সঞ্চয় করে রাখতে হবে।

তুলসী ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে না, সে সিনিয়ার মেয়েদের বিভাগের চারজনের একজন। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকি তিনজনের সঙ্গে এবং তার পূর্ব-অনুমান মতোই সে তাদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় দ্বীপ ছাড়িয়ে আরও প্রায় দুশো মিটার দূরের ফ্ল্যাগটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় সে একবার মুখ তুলে দেখল অন্তত বারোটা লাল টুপি ফ্ল্যাগটাকে ঘুরে স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে যাচ্ছে। এখন তার পাশে শুধু দুটি ছেলে, যারা অর্ধেক পথ এসেই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সে চেষ্টা করল ওদের টুপিতে 'তিপ্পান্ন নম্বর' লেখা আছে কি না দেখতে। কিন্তু দেখতে পেল না। দেখার কথাও নয়, কেননা বলরাম তখন তার প্রায় তিনশো মিটার পেছনে। তুলসী অন্য তিনটি মেয়ের নম্বর মনে করে রেখেছে। একুশ নম্বর একটু বেঁটে, পায়ের ডিমদুটো খুব পুষ্ট, নাকটা বসা। তেইশ নম্বর তারই মতো ছিপছিপে, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, দাঁত উঁচু। চব্বিশ নম্বর বোধ হয় নেপালি মেয়ে, চোখ-মুখ গায়ের রং সেইরকমই। এরা তিনজনই এখন তার থেকে অনেক এগিয়ে।

বলরাম ফ্ল্যাগটাকে ঘুরে যখন প্রায় এক কিলোমিটার অতিক্রম করেছেন তখন প্রথম ছেলেটি সাঁতার শেষ করে জল থেকে উঠল এবং তার অর্ধ মিনিটের মধ্যে আরও সাতজন। এই সময় দেখলেন তাঁর সামনের ছেলেটি জলে ডুবে গিয়ে আবার ভেসে উঠল। দু' হাত তুলে মাথা নেড়ে হাঁ করছে আর ডুবছে। ডাঙায় দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য। একজন লাইফ সেভার জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতারে ছেলেটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে বলরাম থমকে গেলেন। ছেলেটিকে ধরে লাইফ সেভার ডাঙার

দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি আবার সাঁতার শুরু করলেন।

তুলসী সাঁতার শেষ করল দুটি ছেলের সঙ্গে, কিন্তু তিনজন মেয়েরই পেছনে। জল থেকে উঠেই সে দৌড়ে গেল সাইকেলের দিকে। দ্রুত হাতে কস্টিউমের ওপরই পরে নিল হাফ প্যান্টটা, পায়ে পরে নিল কেডস জোড়া এবং গায়ে দিল গেঞ্জিটা। এক মিনিটের মধ্যেই তিনটি কাজ শেষ করে সে সাইকেলে চেপে বসল। তখন তেইশ নম্বর এক কিলোমিটার এগিয়ে গেছে এবং তার পেছনেই চব্বিশ ও একুশ নম্বর।

সকলের শেষে বলরাম জল থেকে উঠে দেখলেন বুকে ব্যাজ আঁটা চার-পাঁচজন লোক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। সবচেয়ে বর্ষীয়ান প্রতিযোগী হিসেবে ইতিমধ্যেই তিনি খ্যাত হয়ে গেছেন। তাঁর প্রতি একটু বেশিই যেন নজর দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁর মনে হল।

অপেক্ষমাণদের একজন রাজ্য ট্রায়াথলন অ্যাসোসিয়েশনের সচিব। তিনি ব্যস্তভাবে বললেন, "বলরামবাবু, চটপট জুতো আর গেঞ্জিটা পরে নিন। প্রথম ছেলেটি দু' পাক এই শেষ করল।"

শ্রান্তিভরা মুখে একটু হেসে বলরাম কেডস পরলেন। গেঞ্জির ঝুলটা তাঁর প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি পৌঁছল। হাফ প্যান্ট পরার দরকার হল না। তিনি সাইকেলে উঠতে উঠতে দেখলেন ডাক্তারবাবু আসছেন প্রায় ছুটেই।

"বেরোবার মুখে হঠাৎ এক হার্ট অ্যাটাকের কল...।" তিনি কথা সম্পূর্ণ করার আগেই বলরাম তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

অনেক পিছিয়ে গেছি, ব্যবধানটা আমাকে কমাতেই হবে, এই চিন্তাটা মাথায় নিয়ে তুলসী সাইক্লিং শুরু করল। বহুদূরে তিন-চারজন সাইক্লিস্টের পিঠের দিকে তাকিয়ে সে জোরে জোরে প্যাডেল করে একশো মিটার যাওয়ার পরই সাইকেলটা ছিটকে লাফিয়ে উঠল। ঘুরে যাওয়া হ্যান্ডেল শক্ত হাতে বশে এনে তুলসী স্পিড ব্রেকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে গেল। আরও দুশো মিটার পর লোকেশ্বর বাবার মন্দিরের আগে আর-একটি স্পিড ব্রেকার। সাইকেলের গতি কমিয়ে সেটা অতিক্রম করে সে গতি বাড়াল এবং ক্রমশই বাড়াতে থাকল।

রাস্তা থেকে ধারে সরে যাচ্ছে পথচারীরা। বাইরে থেকে যেসব রাস্তা এসে ঢুকেছে সরোবরের এই রাস্তায়, তার মুখগুলিতে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। হঠাৎ কোনও সাইকেল, মোটরবাইক ঢুকে এসে বিপত্তি তৈরি যেন না করে, সেটা রোধ করাই তাদের কাজ। কিন্তু বিঘ্ন ঘটায় তো মানুষই। দুটি বাচ্চা মেয়ে এমন সময়ে রাস্তা পার হচ্ছিল যখন এক পুরুষ সাইক্লিস্ট প্রায় তাদের ওপর এসে পড়ছিল। ব্রেক কষে সে টলে পড়ে গেল। মেয়ে দুটি ভয় পেয়ে দৌড় দিল আর তুলসী তখনই সেই সাইক্লিস্টকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

ডান দিকে কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মীদের জন্য বোধ হয়, সারি দিয়ে একতলা টালির চালের কোয়ার্টার। বড় বড় কংক্রিট পাইপ পড়ে রয়েছে, তারপর সরোবরের বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকার একটা চওড়া প্রবেশ পথ। তার আগে একটা স্পিড ব্রেকার। তারপর মসজিদ। তুলসী কুঁজো হয়ে প্যাডেল করতে করতে একবার মুখ

তুলে দেখে নিল তার পঞ্চাশ মিটার দূরে একটি মেয়ের পিঠ। এইবার একে আমি পেছনে ফেলব, নিজেকে এই বলে সে আরও ঝুঁকে, সিট থেকে নিজেকে সামান্য তুলে প্যাডেলে চাপ দিল। পিস্টনের মতো ওঠানামা করতে লাগল তার দুই পা।

একুশ নম্বর পেছনে পড়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তুলসী যখন তাকাল তখনই একটা স্পিড ব্রেকারের উপর উঠল তার সাইকেল। একটা বড় ঝাঁকুনি খেল সে। মনে মনে সে বলল, ভাগ্যিস সাইকেলটা সারিয়ে নিয়েছিলাম, নয়তো এতক্ষণে চাকাটাকা খুলে বেরিয়ে যেত। একুশ গেল, এবার ধরতে হবে তেইশ বা চব্বিশকে।

বলরামের কাউকে ধরার জন্য তাড়া নেই। তাঁকে বনবন করে পেরিয়ে গেল এক সাইক্লিস্ট। বলরাম মুচকি হাসলেন এবং ধাওয়া করলেন। ছেলেটা কত পাক দিয়ে ফেলেছে কে জানে। কিন্তু খুব বেশি পিছিয়ে থেকে কম্পিটিশন শেষ করাটা মর্যাদাকর হবে না। এবার একটু স্পিড বাড়ানো যেতে পারে। এই ভেবে বলরাম গতি বাড়ালেন, আর তখনই তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়া সাইকেল থেকে তুলসী চেঁচিয়ে বলল, "মেসোমশাই, আর একটু জোর লাগান।"

ফিনিশিং পয়েন্টে এখন ভিড়। গণ্যমান্য অতিথিরা রাস্তার ধারে চেয়ারে বসে। সেখানে টাইমকিপার আর রেকর্ডাররা। নম্বর দেখে তাঁরা চেঁচিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন প্রতিযোগিদের, আর কত পাক সাইকেল তাদের চালাতে হবে। প্রত্যেকের নামের পাশে সংখ্যার ঘরে টিক পড়ছে। মেয়েদের মধ্যে এগিয়ে আছে তেইশ নম্বর। টাইমকিপারদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তুলসী শুনল, চিৎকার করে কে বলল "ইলেভেন টু গো।" আর শুনল, "দিদি, সামনেই তেইশ।" সে আড়চোখে দেখল জগন্নাথকাকা ভিড় থেকে একটু দূরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, মুখ ফ্যাকাশে। "তুলসী, আরও জোরে", এইটুকু ছাড়া আর কিছু তিনি বলতে পারলেন না।

আরও জোরে। সামনে তেইশকে সে দেখতে পাচ্ছে। স্পিড ব্রেকার দেখেও সে গতি কমাল না, শুধু সিট থেকে নিজেকে তুলে দিল। এতটা ঝাঁকুনি সহ্য করল সাইকেলটা... আরও জোরে। প্রথম তাকে হতেই হবে।

ডান দিকে কর্পোরেশনের কোয়ার্টারগুলো। তারপর সিমেন্টের পাইপগুলো, তারপর বাইরে যাওয়ার চওড়া রাস্তা। তুলসী এগোচ্ছে রাস্তার দিকে। আর ঠিক তখনই সার দিয়ে বাইরে থেকে সরোবর এলাকায় ঢুকল তিনটি মোষ, তাদের সঙ্গে একটি বাচ্চা মোষ। কী খেয়াল হল বাচ্চাটার সে হঠাৎ ওদের সঙ্গ ছেড়ে বাঁ দিকে ছুট দিল যেদিক থেকে তুলসী আসছে। তিনটি মোষের একটি, বোধ হয় বাচ্চার মা, মুখ ফিরিয়ে বাচ্চাটার উদ্দেশে একটা ডাক দিল।

তুলসী দেখল, বাচ্চা মোষটা তার দিকেই লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে আর তার মা, থলথলে মাংসল চেহারায়, শিংওয়ালা একটি মোষ, বিস্ফারিত চোখে, বোধ হয় তার দিকেই তাকিয়ে ছুটে আসছে, হয়তো ধরে নিয়েছে তার বাচ্চাকে সাইকেল আরোহী আক্রমণ করবে।

কী করব এখন? প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঝলসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তুলসী সাইকেলের হ্যান্ডেল ডান দিকে ঘোরাল। সেইদিকেই পড়ে রয়েছে কংক্রিটের পাইপ। সামনের

চাকা পড়ল স্পিড ব্রেকারে, সে ব্রেক কষল।

এর পর তুলসী নিজেকে দেখতে পেল সাইকেল থেকে উড়ে গিয়ে জমির ওপর পড়তে আর সাইকেলটি পাইপে সজোরে ধাক্কা খেয়ে তার থেকে দশ মিটার দূরে পড়ে আছে। মোষটি তুলসীর দিকে না তাকিয়ে সোজা ছুটে গেল বাচ্চার দিকে। কিছু লোক ঘটনাটি দেখল, কিন্তু তুলসীকে চটপট উঠে দাঁড়াতে দেখে তারা সাহায্যের জন্য আর এগিয়ে এল না। পরপর দু'জন সাইক্লিস্ট তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকিয়ে দেখে গেল।

সময় নষ্ট হল। মোষটা মোটেই হিংস্র নয়, এই ধারণা নিয়ে তুলসী এগিয়ে গিয়ে হ্যান্ডেল ধরে সাইকেলটি তুলেই বজ্রাহত হল। হ্যান্ডেলসহ সাইকেলটি তার হাতে উঠল সামনের চাকাটিকে জমিতে রেখে। হ্যান্ডেল থেকে সামনের চাকায় নেমে যাওয়া রডের যেখানে ঝালাই করা হয়েছে, সেখানেই রডটা দু' টুকরো হয়ে গেছে। শুধু সরোবর আর তাকে ঘিরে যাবতীয় জড় ও চলমান দৃশ্যই নয়, তার সারা জীবনটাই যেন পুড়ে খাক হয়ে গেল। অন্ধকার ছাড়া চোখে আর কিছু সে এখন দেখতে পাচ্ছে না। ধীরে ধীরে সে রাস্তার ধারে বসে পড়ল।

ঠিক সেই সময় বলরাম ছিলেন সরোবরের বিপরীতে, তুলসীর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পেছনে। তিনি বারবার শুধু নিজেকে বলে যাচ্ছিলেন: আঁকুপাকু নয়, মাথা গরম নয়, পাশ দিয়ে সবাই চলে যাচ্ছে তো যাক। নির্দিষ্ট একটা স্পিড ধরে রেখে চালিয়ে যেতে হবে। সেই কচ্ছপ আর খরগোশের গল্পটা মনে রাখা দরকার। স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস...। কম্পিটিশনের এখনও অর্ধেকও হয়নি। এর পর আছে দৌড়। সেজন্য দম জমা করে রাখতে হবে, পা দুটোর ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে, এই ট্রায়াথলন শেষ করতেই হবে।

বলরাম ব্রেক কষলেন তুলসীকে ঘাসের ওপর বসে থাকতে দেখে। তার সামনে দু' খণ্ড হওয়া সাইকেলটি।

"এ কী হল?" বলরাম সাইকেল থেকে নেমে এগিয়ে এলেন। "ভাঙল কী করে?"

তুলসী শূন্য চোখে বলরামের মুখের দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে শুধু মাথা নাড়ল। মাথাটি নামিয়ে নিল। টসটস করে জল পড়ল গাল বেয়ে।

"মেসোমশাই, আমার ভাগ্য। বলেছিলেন, আমি নাকি জিতব। এই আমার জেতা দেখুন।" আঙুল দিয়ে সে ভাঙা সাইকেলটিকে দেখাল।

"আমার কথা মিথ্যে হবে না তুলসী, ওঠো।"

তুলসী মুখ নামিয়ে মাথা নাড়ল।

"ওঠো, ওঠো।" বলরাম চাপা স্বরে চিৎকার করে উঠলেন। তেইশ নম্বর এই সময় সাইকেল নিয়ে তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় আড়চোখে তাকাল।

বলরাম খপ করে তুলসীর ঘাড়ের কাছে গেঞ্জিটা বাঁ মুঠোয় ধরে তাকে টানলেন। হকচকিয়ে তুলসী উঠে দাঁড়াল।

"সময় নষ্ট কোরো না, সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, এক্ষুনি ওঠো।"

নিজের সাইকেলটি বলরাম এগিয়ে দিলেন। তুলসী কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলরাম

তার আগেই তার ডান হাতটা তুলে হ্যান্ডেলে রেখে সাইকেল ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন সরোবরের জলের দিকে। সাইকেল পড়ে যাচ্ছিল, তুলসী শক্ত মুঠোয় হ্যান্ডেলটা ধরে ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কঠিন ইচ্ছা তড়িৎগতিতে তার ডান হাত বেয়ে চেতনায় ঢুকে গেল। সে শক্ত দু' হাতে হ্যান্ডেল ধরে প্যাডেলে পা রাখল।

বলরাম জলের দিকে যেতে যেতে থেমে গেলেন। মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর সাইকেলকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুঁজো হয়ে থাকা একটি পিঠ, যার দুই পা ওঠানামা করছে শিকার তাড়া করা চিতাবাঘের মতো। বলরাম দ্বিখণ্ডিত সাইকেলের কাছে ফিরে এলেন।

তেরো পাক শেষ হওয়ার আগেই তুলসী ধরে ফেলল মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে থাকা চব্বিশ নম্বরকে। বহু আগেই সে একুশ নম্বরকে পেছনে ফেলে দিয়ে এসেছে। এখনও বাকি তিন পাক। তেইশ নম্বর ভাল চালায়, সাইকেলটাও দামি। তুলসীর সাইকেল বদলে যাওয়াটা বাবু প্রথম লক্ষ করে বলল, "দেখুন দেখুন, দিদি মেসোমশাইয়ের সাইকেল দিয়ে চালাচ্ছে।"

"তাই তো। তা হলে বলরামবাবু গেলেন কোথায়?" ডাক্তারবাবু হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। "লোকটা কি উবে গেল?"

"সেইসঙ্গে তুলসীর সাইকেলটারও তো পাত্তা নেই।"

"তা হলে তো খোঁজ করে দেখতে হয়।" ডাক্তারবাবুকে উদ্বিগ্ন দেখাল। "আমি বরং একটা চক্কর দিয়ে আসি।"

পুরুষ বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পাঁচজনের মধ্যে চলেছে। প্রথম ছেলেটি সাইকেল থেকে নেমে দৌড় শুরু করার দুমিনিটের মধ্যে আরও তিনটি ছেলে নামল। ওদের পাশ দিয়ে তুলসীর সাইকেল বেরিয়ে গেল। সরোবরের একদিক থেকে বিপরীত দিকের রাস্তায় চলাচল দেখা যায়। তুলসী লোকেশ্বর বাবার মন্দিরের কাছ থেকে সরোবরের অপর দিকে তাকিয়ে দেখল, কয়েকটা সাইকেল চলেছে। মসজিদের সামনের সাইকেল-আরোহীটিকে তার মনে হল, তেইশ নম্বর হলেও হতে পারে।

অনেক দূর। ওকে ধরতে হলে তাকে অনেক পথের ব্যবধান ঘোচাতে হবে। এটাই ওর শেষ পাক। সাইকেলের ফিনিশিং পয়েন্টে নেমে ও দৌড় শুরু করে দেওয়ার অনেক পরে আমি নামব, তারপর—তুলসী মনে মনে চমকে উঠল। তারপর কী? সূর্য সঙ্ঘের দশ কিলোমিটার রেসের সেই দৃশ্যটা পলকের জন্য চোখে ভেসে উঠল—মেয়েটি হুমড়ি খেয়ে রেল লাইনের আপ তিন নম্বর ট্র্যাকের পাশে, জমিতে দু' হাত রেখে ওঠার চেষ্টা করছে।

ভাগ্য সেদিন তাকে সাহায্য করেছিল। আজও ভাগ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তার হাতে তুলে দিয়েছে সাইকেলটা। কিন্তু বারবার তিনবার ভাগ্য কারও পাশে এসে দাঁড়ায় না। এবার আমাকে নিজেই জিততে হবে, নিজে, নিজে, নিজে...। জিততে হবে এই লোকটির জন্য। "বাহাত্তর বছরে যদি ফিনিশ করতে পারে... আমার কথা অবিশ্বাস করছ কেন? আমি তো বাহাত্তরের অনেক কম।" আমাকে জিততে হবে।

একটা মানুষ নিজের গড়া স্বপ্ন নিজের হাতেই ভাঙলেন... আর আমি অবিশ্বাস করছি না মেসোমশাই। ওহ্‌হও তুলসী, আরও জোরে, আরও জোরে।

সাইক্লিংয়ের সমাপ্তিসীমার দু'ধারে ভিড়। দু'-তিনজন হাত তুলে তুলসীকে থামতে সঙ্কেত দিচ্ছে। ছুটে এল ভলান্টিয়াররা। সাইকেল থেকে নেমেই সেটি তাদের হাতে প্রায় ছুড়ে দিয়ে তুলসী দৌড়তে শুরু করল। তার মাত্র পঁচাত্তর মিটার দূরে তেইশ নম্বর দৌড়ে যাচ্ছে। এবার দশ কিলোমিটার দৌড়তে হবে। এটা আমার নিজের ইভেন্ট।

ডাক্তারবাবু হাঁটতে হাঁটতে দু'ধারে তাকাচ্ছেন। কোথায় বলরাম। রাস্তা থেকে সরোবরের পাড় পর্যন্ত ঘাসের জমিতে প্রচুর লোক। সবাই স্নান করতে এসেছে। বলরাম এমনই এক চেহারার, চট করে খুঁজে বের করাই মুশকিল। তবে হাঁটু পর্যন্ত গেঞ্জি আর মাথায় 'তিপ্পান্ন' সংখ্যা দেওয়া কাপড়ের টুপিটা তাঁকে খোঁজ দিতে সাহায্য করতে পারে।

দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তারবাবু। বহু লোক ঘাসে বসে রয়েছে, কেউ কেউ শুয়ে। একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছ, নীচে বিশাল ছায়া। তিনি দেখলেন, ছায়াতে একটা সাইকেল পড়ে রয়েছে। গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে চমকে উঠলেন। বলরাম চিত হয়ে শুয়ে, চোখ দুটি বোজা। তাঁর পাশে দু' খণ্ড হওয়া একটা সাইকেল।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করলেন, ব্যাপারটা কী? কিছুই বুঝতে না পেরে ডাকলেন "বলরামবাবু, ও বলরামবাবু।"

চোখ খুললেন বলরাম, ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড লোকটিকে চেনার চেষ্টা করে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। লজ্জিতভাবে বললেন, "একটু ঘুমের মতো এসে গেছিল। জলের ওপর দিয়ে কী সুন্দর হাওয়া আর মিষ্টি রোদ...।"

"কিন্তু এখন তো আপনার হাওয়া খাওয়ার কথা নয়, ঘামার কথা।"

"এই দেখুন।" বলরাম ভাঙা সাইকেলটা দেখালেন।

"এটা তো তুলসীর।"

"হ্যাঁ, ভেঙে গেছে। তাই আমারটা দিলাম।" বলরাম খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার জানাবার মতো স্বরে কথাটা বললেন।

"দিয়ে দিলেন?"

বলরাম অবাক হয়ে তাকালেন। "দেব না? আমার মাথায় চুল থাকলে সেগুলো সব সাদা হত। আমিই তো দেব।"

"কিন্তু ফিনিশ করলে দেশে আপনিই প্রথম সব থেকে বয়স্ক ট্রায়াথলিস্ট হওয়ার গৌরব পেতেন, একটা দৃষ্টান্ত হতে পারতেন।" ডাক্তারবাবু ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, "আমি কত আশা করে এসেছি অত দূর থেকে। আমাদের দেশে পঞ্চাশ পেরোলেই বুড়ো বলে বাতিল করে দেওয়া হয়, এটা যে কত ভুল ধারণা, সেটাই আজ স্বচক্ষে দেখব বলে এসেছি।"

বলরাম কথাটা শুনতে শুনতে দূরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটি মেয়ে দৌড়ে চলেছে। একটি মেয়ে তার পেছনে দৌড়ে আসছে। বলরাম চোখ তীক্ষ্ণ করে

বিড়বিড় করলেন, "ওটা তুলসী।"

দুটি মেয়ে পাশাপাশি হয়েছে। প্রথমজন পাশে তাকিয়ে দৌড়ের বেগ বাড়াবার চেষ্টা করছে। বলরাম হেসে মাথা নাড়লেন। "পারবে না। বৃথা চেষ্টা।" তারপর ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, "মেয়েদের কম্পিটিশনটা শেষ হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু, এখানে এমন জল, এমন বাতাস, এমন রোদ, এত ভাল ছায়া, এবার একটু ঘুমিয়ে নিন। এ জিনিস চট করে পাবেন না।"

ডাক্তারবাবুও দূরে তাকিয়ে দৌড় দেখছিলেন। বললেন, "সেকেন্ড মেয়েটা কে, তুলসী? ফার্স্টকে বিট করে বেরিয়ে গেল।"

কথাটা কানে না দিয়ে বলরাম বললেন, "এটা ওর সাইকেল।"

দু'জনে তাকালেন সাইকেলটার দিকে।

"কম্পিটিশন থেকে ও বেরিয়ে গেছিল। আমি ফিরিয়ে আনলাম। ও ফার্স্ট হচ্ছে। ডাক্তারবাবু, আমার মনে হয় এটাই বয়সের ধর্ম, আমি তা পালন করেছি মাত্র। তুলসী আমাকে মর্যাদা দিয়ে জেতার জন্য চেষ্টা করছে। দৃষ্টান্ত হওয়ার থেকে এই পাওয়াটাই বা কম কী?" বলতে বলতে বলরাম মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকালেন।

তুলসী ছুটে আসছে। তার অন্তত পঞ্চাশ মিটার পেছনে তেইশ নম্বর। তুলসী সোজা তাকিয়ে ছুটে যাচ্ছে তাই দেখতে পেল না, তার বাঁ দিকে একটু দূরেই অশ্বত্থের গুঁড়ির আড়াল থেকে এক জোড়া স্নিগ্ধ চোখ তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

"এবার হয়তো চাকরি পাবে।" বলরাম অস্ফুটে বললেন।

"বলরামবাবু, আর আমার থাকার দরকার নেই, আমি এবার চলি।" ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "একটা সিরিয়াস হার্ট পেশেন্ট ফেলে এসেছি।"

ডাক্তারবাবু চলে যাচ্ছেন। বলরাম তাঁকে ডাকলেন, "এক মাঘেই শীত পালায় না, আমিও পালাব না। সামনের বছর—" বলরামের মুখ হাসিতে ভরে উঠল। তারপর আলতো করে ঘাসের ওপর নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে তিনি চোখ বুজলেন।

বলরাম ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

"মেসোমশাই, মেসোমশাই। উঠুন, উঠুন, আমি তুলসী। এই দেখুন ট্রফি।"

বলরাম চোখ খুললেন। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে তুলসী, পাশে সাইকেল হাতে ধরে দাঁড়িয়ে বাবু।

"কী খোঁজা যে খুঁজেছি আপনাকে। সারা সরোবরটা দু'জনে মিলে চক্কর দিয়েছি। মাথাটা তুলুন, প্রণাম করব।"

বলরাম উঠে বসলেন। তাঁর দুই পায়ের পাতার ওপর তুলসীর কপাল নেমে এল। বলরামের হাত নেমে এল তার মাথায়।

"জগন্নাথবাবু কোথায়?"

"উনি ওঁর ভাগ্নির বাড়িতে গেলেন।"

"কিছু বললেন?"

"বললেন, চাকরির জন্য চিন্তা কোরো না, হয়ে যাবে। মেসোমশাই, আমি কিন্তু

ফিনিশিং লাইনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাইনি।" ঝকঝকে চোখে অহঙ্কার ফুটিয়ে তুলসী বলল। "তেইশ নম্বরকে আধ পাক পেছনে রেখে শেষ করেছি।"

"অজ্ঞান হলে না কেন? তা হলে ছবি উঠত।" বলরাম উঠে দাঁড়ালেন।

"অজ্ঞান হব কেন? আমি কুলডাঙার তুলসী রায় না?"

"তা হলে তুলসী রায়, এখন এই ভাঙা সাইকেল নিয়ে কী করব?"

"ট্যাক্সি করে বিধাননগর স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেনে বিদ্যানগর আর তারপর জটাধারীর দোকানে গিয়ে তার পিণ্ডি চটকানো।"

মিনু চিনুর ট্রফি



কলকাতা থেকে আটাশ মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে, লঞ্চঘাট থেকে আধমাইল, জি টি রোড থেকে সিকি মাইল আর রেল স্টেশন থেকে এক মাইল দূরের মহাদেবপুর উপনগরীতে প্রায় চার হাজার লোকের বাস। মহাদেবপুর গড়েছে মহাদেব জুট অ্যান্ড টেক্সটাইল মিল্‌স, সংক্ষেপে যাকে বলা হয় এম জে টি এম, তারই প্রতিষ্ঠাতা-মালিক মহাদেবদাস মাধোকিয়া। এই উপনগরীতে আছে দুটো বাজার, ছোট একটা হাসপাতাল, স্কুল, মন্দির, অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি, পাওয়ার হাউস, খেলার মাঠ, ছোটদের পার্ক, অফিসারদের ক্লাব—যেখানে আছে এক বিঘৎ ঘাস গজিয়ে যাওয়া একটা টেনিস কোর্ট, আর দুটি ক্যারম খেলার বোর্ড। মহাদেবপুর মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানকার অনেক লোকেরই মোটরগাড়ি আছে, দরকার হলে চট করে কলকাতা ঘুরে আসতে পারে।

মহাদেবপুরের পৌরব্যবস্থা এম জে টি এম-এর নিজস্ব। তাদেরই খরচে এবং তদারকিতে এর দেখভাল করা হয়। এজন্য আলাদা একটা বিভাগ আছে এবং তার সর্বোচ্চ কর্তা হলেন তন্ময় বসুমল্লিক। ইনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহী, চোখা নাক মুখ। দূরপাল্লার সাঁতারে নাম ছিল এবং অর্থনীতির এম এ। কলকাতা পৌরসভায় বছর চারেক চাকরি করে ভারত স্বাধীন হওয়ার দু'বছর পরই মহাদেবপুরে আসেন।

তন্ময় যেমন হাসিখুশি, সরল, তেমনই গোঁয়ার প্রকৃতিরও। সাবেকি রীতিনীতি মেনে চলতে অভ্যস্ত এমন পরিবারে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা ; তিনি উদার মনের মানুষ, বড় চাকরি করলেও মেলামেশায় কোনও বাছবিচার করেন না। তাঁর স্ত্রী তপতী ইলাহাবাদের মেয়ে। বাবা সেখানকার নামী উকিল ছিলেন। বাড়িতে টেনিস কোর্ট ছিল। ভাইদের সঙ্গে বাড়িতে, পরে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনিস খেলেছেন। চ্যাম্পিয়ানের তিন-চারটে ট্রফিও পেয়েছিলেন। সাইকেল চালিয়ে বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার সময় একটা খ্যাপা ষাঁড়ের শিং থেকে বাঁচার জন্য তপতী রাস্তার পাশের নালায় সবেগে নেমে যাওয়ায় তাঁর ডান পায়ের গোড়ালির হাড় কয়েক টুকরোয় পরিণত হয়। দু'বার অপারেশনের পর পা যৎসামান্য ছোট হয়ে যায় বলে একটু জোরে হাঁটলেই ধরা পড়ে তিনি খোঁড়া।

স্বামী যতটা কালো, তপতী ততটাই ফরসা। ক্লাবে অনেকেই রসিকতা করে ওঁদের 'পূর্ণিমা-অমাবস্যা' বলে ডাকে। শুনে ওঁরা দু'জন হাসেন। স্বামীর মতো তপতীও জেদি কিন্তু গোঁয়ার নন। কোনও লক্ষ্য একবার স্থির করে ফেললে যতক্ষণ না তা পূরণ হচ্ছে, হাল ছাড়েন না। গোড়ালি ভাঙার পর বগলে ক্রাচ

দিয়ে তাঁকে চলাফেরা করতে হত। বাড়ির সবাই ধরে নেয় আজীবন এইভাবেই তাঁকে চলতে হবে। কিন্তু মনের জোর আর স্বাভাবিকভাবে হাঁটার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই দুইয়ে মিলে তাঁকে এমনই জেদি করে তোলে যে, দিনের পর দিন ব্যায়াম ও মালিশ করে এক বছরের মধ্যেই ক্রাচের ওপর নির্ভরতা থেকে তপতী নিজেকে মুক্ত করে নেন।

এই বসুমল্লিক দম্পতি নিজেরা খেলার চর্চা এক সময় করেছেন, খেলা ভালবাসেন। এঁদের দুই ছেলে, মৃন্ময় আর চিন্ময়। দু'জনেই পড়ে মহাদেবপুরের এম ডি এম স্কুলে, মৃন্ময়ের ক্লাস থ্রি, চিন্ময়ের ক্লাস ওয়ান। আজ ওদের স্কুলের বাৎসরিক স্পোর্টস।

খাওয়ার টেব্‌লে তন্ময় টোস্টে জেলি মাখাতে মাখাতে হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে হাঁক দিলেন, "মিনু, চিনু, হারি আপ। ঠিক সাতটায় আমাদের পৌঁছতে হবে। কুইক ব্রেকফাস্ট শেষ করো, আর সময় নেই।"

"বাবা, আমি রেডি।" বলতে বলতে শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল মিনু। নয় বছর বয়স কিন্তু দেখতে দশ-এগারোর মতো। মায়ের মতো অতটা না হলেও, ফরসা, স্বাস্থ্যবান, চটপটে। সাদা হাফপ্যান্টের মধ্যে গোঁজা সাদা গেঞ্জি, সাদা মোজা, সাদা কেড্‌স। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। তন্ময় স্নেহভরে বড় ছেলের দিকে তাকালেন, চোখে ফুটে উঠল তারিফ। এক্কেবারে স্পোর্টসম্যানের মতো দেখাচ্ছে!

"বোস।" তিনি তাঁর পাশের চেয়ারটা দেখালেন। টোস্ট প্লেটে রেখে সেটা মৃন্ময়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে তন্ময় বললেন, "আজ কিন্তু একটার বেশি নয়। এর সঙ্গে এক গ্লাস দুধ আর একটা কলা। পেট হালকা থাকলে জোরে দৌড়নো যায়... চিনু কী করছে? চিনু হারি আপ। ...দ্যাখো তো দেরি করছে কেন!"

তন্ময় জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন টেব্‌লের উলটো দিকে। তপতী মন দিয়ে সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়াচ্ছেন। কথা না বলে তিনি উঠে গেলেন ছেলেদের ঘরে।

বিব্রত মুখে চিনু তাকাল মায়ের দিকে। বাঁ হাতের মুঠোয় পেটের কাছে প্যান্টটা ধরা।

"কী হল?" তপতী ভ্রূ কুঁচকে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন। "প্যান্ট অমন করে ধরে আছিস কেন?"

"বোতাম।" ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া স্বর চিনুর।

"বোতাম!"

তপতী প্যান্টধরা চিনুর হাতটা টানতেই সেটা হাঁটুর কাছে নেমে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা ধরে চিনু টেনে তুলল। আধুলি মাপের একটা সাদা বোতামের ভাঙা অংশ প্যান্টে আটকে রয়েছে।

"হাতে আর সময় নেই, ব্রেকফাস্ট করেই বেরোতে হবে, আর এখন কিনা তোর প্যান্টের বোতাম ভাঙা... ইচ্ছে করছে তোকে একটা...।" ডান হাতটা তুলেও

তপতী নামিয়ে নিলেন। অসহায় ফ্যালফ্যাল চোখে চিনু তাকিয়ে রয়েছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রং, রুগ্‌ণ, দুর্বল শরীর। গেঞ্জি পরা না থাকলে ওর কণ্ঠা আর পাঁজরের হাড় দেখা যেত। পা দুটো সরু, দুটো হাতও তাই। তপতীর চোখের রাগ ধীরে ধীরে মায়ায় ভরে এল। স্কুল থেকে বলে দিয়েছে স্পোর্টসে সাদা প্যান্ট গেঞ্জি পরে যেতে হবে। দ্বিতীয় আর সাদা প্যান্ট নেই। চট করে যে লাগিয়ে দেবেন, ওই মাপের তেমন বোতামও ঘরে নেই। কী করা যায় এখন ?

"বউদি, বরং একটা সেপটিপিন লাগিয়ে দাও।" ঘরের দরজা থেকে রাতদিনের কাজের লোক বেলা পরামর্শ দিল। হাতের চুড়ি থেকে সেফটিপিন খুলে তপতীর হাতে দিতে দিতে বলল, "দাদা তাড়া দিচ্ছে, চেঁচামেচি শুরু করবে।"

তপতী আর কথা না বলে হাঁটু গেড়ে বসে কোমরের কাছে প্যান্টটা টেনে ধরে সেফটিপিন লাগিয়ে দিলেন। চিনুর হাত ধরে যখন তিনি খাবার ঘরে এলেন, তন্ময় তখন উৎসাহভরে মিনুকে স্টার্ট নেওয়ার কৌশল দেখানোয় ব্যস্ত। ছোট ছেলের দিকে তাকাবার ফুরসত নেই।

"যখন বলবে অন ইওর মার্ক... গেট... সেট..." তন্ময় ঘরের মেঝেয় হামা দেওয়ার ভঙ্গিতে, একটা পা সামনে, অন্যটা পিছিয়ে। সামনের পায়ের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দু'হাতের আঙুলে ভর রেখে সামনে ঝুঁকে। "কান খাড়া করে রাখবি, এটা খুব দরকারি ব্যাপার,... এই কানটা, বুঝলি ? পিস্তল ফায়ারের আওয়াজ শোনামাত্রই...।"

"বাবা, আমাদের আন্টি বলেছেন হুইস্‌ল বাজানো হবে।"

"অ। একই ব্যাপার, মোটকথা ওই আওয়াজটা শোনার জন্য তুমি কান খাড়া করে রাখবে। যেই হুইস্‌ল বাজল অমনই তুমি...", তন্ময় মোজাইক করা মেঝেয় পায়ে চাপ দিয়ে স্টার্ট নিতে গিয়ে প্রথম পদক্ষেপটিতেই পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে প্রথমেই তিনি সবার মুখ দেখে নিলেন। কোনও মুখেই হাসির টান পড়েনি। দেখে স্বস্তি বোধ করে বললেন, "তা হলে মিনু স্টার্টিং ব্যাপারটা বুঝে গেলে, কেমন। এবার ঝালিয়ে নাও একবার।"

মিনু বাবার দেখানো মতোই মেঝেয় হামা দেওয়ার ভঙ্গিতে শরীরটাকে রেখে কানখাড়া করে রইল।

"কারেক্ট, নাউ... অন ইওর মার্ক... গেট... সেট... ফর্‌র্‌র্‌র্‌।" তন্ময় মুখেই হুইস্‌ল বাজালেন। মিনু স্টার্ট নিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

"এ কী, পড়ে গেলি কেন ?" তন্ময় বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন। "বারে ! তুমি তো এইভাবেই স্টার্ট নিলে।" মিনুর ভ্যাবাচাকা মুখ। গলদটা কোথায় হল বুঝতে পারছে না।

খুকখুক হাসির শব্দে তন্ময় মুখ ফেরালেন স্ত্রীর দিকে। জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বললেন, "এতে হাসির কী আছে ?"

"তোমার বলে দেওয়া উচিত ছিল পিছলে পড়াটা স্টার্টিং টেকনিকের মধ্যে পড়ে

না।" গম্ভীর মুখে কথাটা বলে তিনি ছোট ছেলের চেয়ারটা টেব্‌লের নীচে আর একটু ঠেলে দিলেন। প্যান্টে আঁটা সেফটিপিনটা এখনকার মতো স্বামীর নজরে না পড়াই ভাল।

"গাড়ি বার করছি। তাড়াতাড়ি এসো।" তন্ময় দুটো ওয়াটারবট্‌ল্ টেব্‌ল থেকে তুলে বেরিয়ে গেলেন মিনুকে সঙ্গে নিয়ে।

"মা, আমি খাব না, খিদে নেই।" চিনু করুণ স্বরে বলল।

"ওসব বললে হবে না, খেয়ে নাও। বাবা মাখন মাখিয়ে দিয়েছে, একটা অন্তত খাও। কখন ফিরব তার ঠিক নেই, খালি পেটে থাকলে... আচ্ছা দুধটুকু খাও।" দুধের গ্লাস ছেলের মুখে তুলে ধরলেন তপতী। পাঁচন গেলার মতো মুখ করে চিনু গ্লাস শেষ করল।

"মা, আমিও কি ওইভাবে স্টার্ট নেব?"

"যেমন খুশি তেমনি ভাবে স্টার্ট নিবি, এটা ওলিম্পিক্‌স নয়। এবার চল... আমার পেছন পেছন আয়, বাবার নজরে যেন সেফটিপিনটা না পড়ে, তা হলে দক্ষযজ্ঞ বেধে যাবে।"

"মা, দক্ষযজ্ঞ কী?"

"পরে বলব।"

বাইরে থেকে মোটরের হর্ন শোনা গেল। ওরা দু'জন প্রায় ছুটেই বাংলো থেকে বেরোল। একতলা টালির ছাদের বাড়ি। সামনের দিকে ছোট ফুলের বাগান। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছের সারি এবং একই ধরনের বাংলো রাস্তার দু'ধারে। সম-পদমর্যাদার লোকেরা এই রাস্তায় বাস করে। পুরনো ভক্সহল গাড়ির সামনে বসল তন্ময় ও তপতী, পেছনে দুই ছেলে। মোটরগাড়িটা এক সাহেবের কাছ থেকে কেনা।

স্কুলটা মহাদেবপুরের দক্ষিণ প্রান্তে গঙ্গার ধারে। স্কুলের লাগোয়াই, দুটো ফুটবল ম্যাচ একসঙ্গে খেলা যায় এত বড় মাঠ। একধারে শামিয়ানা, চেয়ার, টেব্‌ল, ফুলদানি, মাইক্রোফোন, স্তূপ করা প্রাইজসামগ্রী, খাবারের বাক্স ইত্যাদি। শামিয়ানার সামনে অভিভাবকদের জন্য কয়েক সারি চেয়ার। রঙিন কাগজের তৈরি শিকল গোটা বারো বাঁশের খুঁটিতে মালার মতো দুলছে। এক আন্টি অবিরাম ঘোষণা করে চলেছেন মাইকে। অনুষ্ঠান সভাপতি এম জে টি এম-এর জেনারেল ম্যানেজার এবং প্রাইজ হাতে তুলে দেবেন প্রধান অতিথি এক প্রাক্তন ফুটবলার, এঁরা দু'জন আসবেন স্পোর্টস শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে। সারামাঠে উদ্দীপনা, উৎসাহ, কেমন একটা উৎসব উৎসব ভাব।

বসুমল্লিক দম্পতি দুই ছেলে নিয়ে যখন হাজির হলেন তখন স্পোর্টস শুরু হয়ে গেছে। উঁচু ক্লাসের ছেলেদের ইভেন্টগুলো মাঠের অন্যদিকে পুরুষ শিক্ষকদের তদারকিতে চলছে। তাদের আটশো মিটার দৌড় তখন মাঝপথে। মাঠের মাঝে চুনকাম করা খুরি দশ মিটার অন্তর বসানো ট্র্যাক ঘিরে। গাড়ি থেকে নেমেই চিনু ফিসফিস করে মাকে বলল, "ওইখানে আমাদের দৌড়তে হবে?"

"ওখানে বড় ছেলেদের দৌড় হবে। তুই তো পঞ্চাশ মিটারে দৌড়বি। এদিকে ওই যে লম্বা লম্বা দাগ, ওখানে তোদের দৌড়তে হবে।"

ওঁরা 'গেস্ট' লেখা সংরক্ষিত জায়গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন— তখন সুবেশা, স্থূলকায়া এক মহিলা হাতছানি দিয়ে তপতীকে ডাকলেন। "মিসেস বসুমল্লিক, আগে ওই টেব্‌লে বসা মিস দাসের কাছে গিয়ে জানিয়ে আসুন আপনার ছেলেরা এসেছে। ...ক'টা ইভেন্টে ওরা নামবে ?"

"অনেক ইভেন্ট। মিনুর তো রানিং ইভেন্টই তিনটে, তা ছাড়া স্যাক রেস, অঙ্ক রেস, জিলিপি রেস, ব্যালান্স রেস... এক মিনিট মিসেস সেন, এসে বলছি।" তপতী কথা অসমাপ্ত রেখে মিস দাসের টেব্‌লের দিকে ছুটলেন। সেখানে বাবা-মায়েদের ভিড়। সবাই হাজিরা জানাবার জন্য ব্যস্ত।

"প্রতীক ঘোষ, ক্লাস ফোর, সেকশন 'এ'।"

"বিশ্বনাথ জানা, ক্লাস ফোর, সেকশন 'এ'।"

"কিংশুক চ্যাটার্জি..."

"সুভাষ দত্ত..."

মিনিটপাঁচেক পর তপতী সুযোগ পেলেন। নাম, ক্লাস, সেকশন শুনে মিস দাস খাতা দেখে বললেন, "মৃন্ময় তো সাতটা ইভেন্টে নাম দিয়েছে আর চিন্ময় চারটেতে। সবক'টাতেই ওরা নামবে তো ?"

"নিশ্চয়।"

"পঁচাত্তর মিটার এখনই শুরু হবে। মৃন্ময়কে রেডি রাখুন। নাম অ্যানাউন্স করলেই স্টার্টিং লাইনে পৌঁছে দেবেন। তারপরই আছে চিন্ময়ের পঞ্চাশ মিটার।"

তপতী ফিরে এসে দেখলেন চিনু একা দাঁড়িয়ে।

"বাবা, দাদা কোথায় ?"

"ওইদিকে।" আঙুল দিয়ে চিনু দেখাল ভিড়ের শেষে মাঠের একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে তন্ময়ের নির্দেশে মৃন্ময় গা-ছাড়ানোর ব্যায়াম করছে।

"মা, আমিও কি এখন দাদার মতো করব ?"

"না। অত করার তোর দরকার নেই।"

"মা, আমার কেমন ঘুমঘুম পাচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে না দৌড়তে।"

"ঘুম পাচ্ছে বললে কি এখন চলে ? ওই শোন দাদার নাম অ্যানাউন্স হল। দৌড়ে গিয়ে ওদের ডেকে আন।"

ডাকতে আর হল না। তন্ময় আর মিনুকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল স্টার্টিং লাইনে হাতে কাগজ-কলম আর মাথায় সাদা কাপড়ের ক্যাপ পরা ব্যস্তসমস্ত এক আন্টির দিকে।

মিনু পঁচাত্তর মিটার দৌড়ে শুধু প্রথমই হল না, দ্বিতীয় জনকে প্রায় পনেরো মিটার পেছনে রেখে দিল। দর্শকদের সবার চোখে তারিফ আর মুগ্ধতা। দৌড় শেষ করেই মিনু ছুটে এসে ফিনিশিং লাইনের ধারে দাঁড়ানো মাকে জড়িয়ে ধরল। ছেলের মুখ চুম্বনে ভরিয়ে তপতী তাকালেন স্বামীর দিকে। মিনু কোমর জড়িয়ে

ধরেছে বাবার। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তন্ময়ের মুখে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ফুটে উঠল অহঙ্কার।

"যেভাবে স্টার্ট নেওয়াটা শিখিয়েছিলাম তাতে ফার্স্ট না হয়ে কোনও উপায় নেই। টেকনিক... ইট্‌স টেকনিক, বুঝলে!"

"তার মানে, তোমার স্টার্টিং টেকনিকের জন্যই মিনু ফার্স্ট হল, ওর নিজের কোনও কৃতিত্ব এতে নেই?"

থতমত হয়ে তন্ময় বললেন, "না, না, সে কী কথা! অবশ্যই মিনু নিজের ক্ষমতায় প্রথম হয়েছে।"

"তুমি শুধু মিনুকেই টেকনিক শিখিয়েছ, চিনুকে কিন্তু কিছুই শেখাওনি।"

"ওকে আর কী শেখাব, একদমই বাচ্চা, তা ছাড়া খুবই দুব্‌লা, ভেরি, ভেরি উইক।"

তপতী চুপ করে রইলেন। কথাটা খুবই সত্যি। তাঁর ছোট ছেলে খুবই দুব্‌লা। ক্লাস ওয়ানের পঞ্চাশ মিটার দৌড়ের জন্য যখন নাম ডাকা হল, তপতী তখন চিনুকে স্টার্টিং লাইনে পৌঁছে দেওয়ার সময় বললেন, "তুমি যেমন পারো তেমনই দৌড়িও, কেমন? এটা ওলিম্পিক্‌স নয় যে, গোল্ড মেডেল পেতেই হবে। মজা মনে করো এই দৌড়টাকে। তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে না।"

চিনু কথাগুলোর কী অর্থ করল কে জানে, তবে ঘাড় নাড়ল। স্টার্টিং লাইনে সব প্রতিযোগীই বাচ্চা ছেলে, তার মধ্যে চিনুকে তার রুগ্‌ণতার জন্য আরও বাচ্চা দেখাচ্ছে। লাইনে দাঁড়িয়ে সে অসহায়ের মতো বারবার তাকাল মার দিকে। তপতী হাত নাড়লেন।

শুরুর হুইস্‌ল বেজে উঠতেই হইহই করে উঠল দর্শকরা, যার অধিকাংশই বাবা-মা। উৎসাহভরে অনেকেই প্রতিযোগীদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগলেন দূরত্ব রেখে। দৌড় শুরু হতেই চিনু দশ মিটার মতো গিয়েই পেটের কাছে প্যান্টটা ধরে দাঁড়িয়ে মার দিকে তাকাল। তপতী হাত নেড়ে ওকে ছুটতে ইশারা করলেন।

"চিনু, দাঁড়িয়ে থেকো না, দৌড়ও।"

প্যান্ট মুঠোয় ধরে চিনু দৌড় শুরু করল আবার এবং সমাপ্ত করল হাসফাঁস করতে করতে সবার শেষে পৌঁছে। সফল প্রতিযোগীদের মায়েরা ছুটে গেল ছেলেদের কাছে, তাদের জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। চিনু দৌড় শেষ করে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তপতী পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে ঝুঁকে কপালে চুমু দিয়ে বললেন, "তুমি ফিনিশ করেছ, এতে আমি খুব খুশি হয়েছি।"

কাঁধের কাছে জামায় চোখ মুছে চিনু হাসল। "সেফটিপিনটা খুলে গেল।"

তন্ময় এগিয়ে এসে বললেন, "তুই ওভাবে দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?" তারপরই প্যান্টে আঁটা সেফটিপিনটার দিকে তাঁর নজর পড়ল। "এ কী, প্যান্টে ওটা কী?"

"দোষটা আমারই। লন্ড্রি থেকে কেচে আসার পর লক্ষ করিনি বোতামটা ভেঙে গেছে। বেরোবার তাড়ায় আর সময় পাইনি নতুন বোতাম লাগাবার, তাই—।" তপতী অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন। তারপরই গলায় উচ্ছ্বাস

এল, "কিন্তু চিনু রেসটা কেমন শেষ করল বলো !"

"ইয়েস, ইয়েস," চিনুর পিঠে হালকা চাপড় দিলেন তন্ময়। "শেষ পর্যন্ত দৌড়েছে, রণে ভঙ্গ দেয়নি। এটাই তো চাই। মিনু তোর নেক্সট ইভেন্টের কল দিচ্ছে। এর পর চিনুর কী আছে ?"

"বোধ হয় জিলিপি রেস।"

"মিনু চল, এটাতেও কিন্তু ফার্স্ট হতে হবে।"

ওরা দু'জন চলে যেতেই চিনু মায়ের কোমর জড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমি আর নামব না... আমার ভাল লাগছে না।"

"সে কী ! জিলিপি রেস কী মজার, তা জানিস ? দড়িতে জিলিপি ঝুলিয়ে দেবে, দৌড়ে গিয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে।"

"না মা, আমার ভাল লাগছে না। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।" চিনু অনুনয় করল। তপতী ছেলের কপালে হাত রেখে ভ্রূ কোঁচকালেন।

"তোর গা তো বেশ গরম ! জ্বর হয়েছে বোধ হয়। থাক তা হলে, আর দৌড়োদৌড়ি করতে হবে না। আয় বসি।"

চিনুকে কোলে নিয়ে তপতী বসলেন একটা চেয়ারে। পেছন থেকে ঝুঁকে মিসেস সেন বললেন, "আপনার বড় ছেলেটি খুব ভাল দৌড়েছে।"

মুখ ফিরিয়ে তপতী হাসলেন শুধু।

"মনে হয় সব ক'টাতেই ও ফার্স্ট হবে।"

তপতী আবার হাসলেন।

"আপনার ছোট ছেলের তখন হল কী, দাঁড়িয়ে পড়ল কেন ?"

"প্যান্ট খুলে পড়ছিল। বোতামটা ভেঙে গেছে।"

"অ অ। আমি ভাবলুম ঘাবড়ে গিয়ে... ওর সঙ্গে যারা দৌড়চ্ছিল তাদের স্বাস্থ্য তো খুবই ভাল।"

তপতীর মাথা গরম হয়ে উঠল কথাটা শুনে। ভাল স্বাস্থ্য দেখে চিনু ভয় পেয়ে গেছল, এমন একটা ধারণা হল কী করে এই মহিলার ! চিনু মায়ের বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। তপতী ওর মাথায় গালে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "বাড়ি যাবি ?" চিনু মাথা নাড়ল।

ছেলেকে নিয়ে তপতী উঠলেন। তন্ময়কে খুঁজে বার করে বললেন, "চিনুকে বাড়ি নিয়ে যাব, পৌঁছে দাও। জ্বর জ্বর লাগছে। আমার মনে হয় এখন ওর শুয়ে থাকা দরকার।"

"আমি এখন যাব কী করে, এই শুরু হতে যাচ্ছে মিনুর ফিফটি মিটারটা। বরং তুমিই গাড়ি নিয়ে চলে যাও, আমরা রায়চৌধুরীর গাড়িতে চলে যাব।" তন্ময় গাড়ির চাবি তপতীর হাতে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন।

তপতী গাড়ি চালান, তবে মহাদেবপুরের মধ্যেই। কলকাতা বা অন্য কোথাও যেতে হলে তিনি স্টিয়ারিং ধরেন না। জি টি রোডের ট্র্যাফিককে তিনি ভয় পান।

বাড়ি যাওয়ার পথেই ডাক্তার সিন্‌হার কোয়ার্টার। তপতীর মনে হল চিনুকে একবার ওঁকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া ভাল।

ডাক্তার কোয়ার্টারে নেই, কলকাতায় গেছেন সপরিবারে। তপতী ফিরে এসে চিনুকে শুইয়ে দিলেন। থার্মোমিটারে তাপ মাপলেন, প্রায় একশো ডিগ্রি। ছেলেকে জড়িয়ে তিনিও শুয়ে পড়লেন।

রীতিমতো হইহই করে তন্ময় ও মৃন্ময় বাড়িতে ঢুকল।

"হিপ হিপ হুর্‌রে... থ্রি চিয়ার্স ফর মৃন্ময় বসুমল্লিক... হিপ হিপ... হুর্‌রে।" তন্ময় বাড়ি কাঁপিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। তপতী প্রায় ছুটেই বসবার ঘরে এলেন। বাবা আর ছেলের হাত ভর্তি কাপ, মোট সাতটা। তার সঙ্গে একটা বাক্সে রুপোর মেডেল, চ্যাম্পিয়ানের পুরস্কার। এ ছাড়াও একটা তোয়ালে, একটা কিট ব্যাগ, একটা ওয়াটার বট্‌ল আর সার্টিফিকেটগুলো।

"ওম্‌মা, মিনু তো বিপদে ফেলে দিল! এত কাপ এখন আমি রাখি কোথায়?" তপতী ছেলেকে কাছে টেনে নিলেন। মিনুর মুখ লাজুক হয়ে উঠল।

"এই তো সবে শুরু।" কাপগুলো টেব্‌লে সাজিয়ে রাখতে রাখতে তন্ময় বললেন। "এবার থেকে বছর বছর গণ্ডায় গণ্ডায় কাপ-মেডেল আসবে। এগুলো এখন এখানেই থাক, লোকে দেখুক।"

"দাদা, একটা কাচের আলমারি তৈরি করিয়ে তাতে সাজিয়ে রাখুন।" পরামর্শটা দিল বেলা।

"সেটা আমিও ভেবেছি। আসার সময় রায়চৌধুরীর বউ তো আজ রাতে মিনুকে নেমন্তন্ন করেছে। পায়েস খাওয়াবে। চিনুকেও পাঠিয়ে দিতে বলেছে।"

"চিনু যেতে পারবে না, জ্বর প্রায় একশো।" তপতী জানালেন।

"ডাক্তার দেখাতে হয় তা হলে।" তন্ময় ব্যস্ত পায়ে ছেলেদের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ঘুমন্ত চিনুর কপালে হাত দিয়ে চিন্তিত মুখে বললেন, "সিন্‌হাকে কি একবার ডাকব?"

"ওঁরা সব কলকাতায় গেছেন। তুমি বরং কলকাতায় ফোন করে অপূর্ববাবুর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো। চাইল্ড স্পেশালিস্ট দেখানোই ভাল।"

"হ্যাঁ দাদা, কলকাতার ডাক্তারই দেখান। চিনুর প্রায়ই জ্বর হয়, রাতে খুকখুক করে কাশেও।" বেলা এসব জানে, কেননা রাতে সে ছেলেদের ঘরের মেঝেয় শোয়।

রায়চৌধুরীরা, শুভা এবং রাজেন, বছরখানেক রয়েছে মহাদেবপুরে। মাসছয়েক মাত্র ওদের বিয়ে হয়েছে। ধনী পরিবারের সন্তান। রাজেন টেক্সটাইল এঞ্জিনিয়ার। মা আর বাবা মাঝে মাঝে এসে ছেলের কাছে থাকেন। রাজেন সাউথ ক্লাবে টেনিস খেলত, ক্যালকাটা হার্ডকোর্ট চ্যাম্পিয়ানশিপে দু'বার সেমিফাইনালে উঠে প্রেমজিত লাল নামে জুনিয়ার ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানের কাছে হেরে গেছল। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যায় আর এক তরুণ জয়দীপ মুখার্জির কাছে। অতঃপর রাজেন বুঝে যায় টেনিসে বড় খেলোয়াড়

হওয়ার মতো প্রতিভা তার নেই, অতএব পড়াশুনোয় মন দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। টেনিস ছেড়ে দিলেও রাজেন ক্লাব ছাড়েনি। ছুটির দিনে মোটরে সে কলকাতায় যায় শুভাকে নিয়ে। এলগিন রোডে তাকে বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে যায় কাছেই সাউথ ক্লাবে। অল্প খেলা, আড্ডা বেশি এবং পরদিন সকাল ছ'টার মধ্যেই মহাদেবপুরে ফিরে কাজে লেগে যাওয়া। এইভাবেই তারা কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে যাচ্ছে।

আজ তারা কলকাতায় যায়নি স্কুলের স্পোর্টস দেখবে বলে। রাজেনের মা পায়েস রেঁধেছেন। বেলার সঙ্গে রাতে মিনু গেল পায়েস খেতে। অবশ্য পায়েসের সঙ্গে লুচি-বেগুনভাজাও ছিল। মিনুকে পৌঁছে দিয়ে বেলা ফিরল একটা বড় বাটি ভর্তি পায়েস নিয়ে।

"শুভাদির শাশুড়ি দিলেন।" খাওয়ার টেব্‌লে বাটিটা রেখে বেলা জানিয়ে দিল।

"কার জন্য দিলেন ?" তন্ময় প্রশ্নটা করেই চামচেতে খানিকটা পায়েস তুলে মুখে দিল। "নলেন গুড় আর গোবিন্দভোগ চাল, ফাস্ ক্লাস,... কত দিন যে টেস্ট করিনি এই গন্ধটা !"

"কার জন্য আবার, সবার জন্যই দিয়েছেন।" তপতী সতর্ক গলায় বললেন। 'ফাস্ ক্লাস' শব্দ দুটির আড়ালে কী ইচ্ছা উঁকি দিচ্ছে সেটা অনুমান করতে তাঁর অসুবিধে হয়নি।

"এইটুকু জিনিস কী করে সবাইকে দেবে তুমি !" তন্ময় যেন একটু বেশি রকম অবাক হলেন, "তার থেকে বরং..." কথা শেষ হওয়ার আগেই তপতী হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বেলাকে বললেন, "দাদা আজ রাতে কষ্ট করে ওইটুকু পায়েস খেয়েই থাকবেন, ওঁর খাবারটা তুলে রাখো।... মিনুকে ওদের বাড়ি থেকে কখন আনতে যাবে ?"

"আনতে যেতে হবে না। শুভাদির শ্বশুর বললেন, পৌঁছে দেবেন। মিনু তো ওনার সঙ্গে দাবা খেলতে বসে গেছে।"

"দাবা ?" স্বামী-স্ত্রী প্রায় একসঙ্গেই অবাক প্রশ্ন তুললেন।

"মিনু দাবা খেলতে পারে ?" তন্ময় স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন।

তপতী বললেন, "আমি তো জানি না ! কোনও দিন তো খেলতে দেখিনি !"

বিস্মিত তন্ময় চেয়ারে বসে পায়েসের বাটিটা টেনে নিয়ে একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, "একটু চেখে দেখবে নাকি ?"

"কালই আমি নলেনগুড় আর গোবিন্দভোগ চাল আনিয়ে পায়েস করে একা সব খাব।" তপতী ঘরে চলে গেলেন, ঝাঁঝালো স্বরে কথাগুলো বলে। থার্মোমিটারে চিনুর তাপ দেখলেন। একই রকম রয়েছে।

"মা আমি কি পায়েস খাব ?" দুর্বল স্বরে চিনু বলল।

"খাবে, তবে আজ নয়। আগে সেরে ওঠো।"

"যদি ডাক্তারবাবু বারণ করেন ?"

"তা হলে খাবে না।" কথাটা বলে তপতী কষ্ট পেলেন। পায়েস খাওয়ার ইচ্ছা কার না হয়! কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য, বিশেষ করে সন্তানের মঙ্গলের জন্য তিনি কঠোর হতে দ্বিধা করবেন না।

"যতদিন না ডাক্তারবাবু তোমায় পায়েস খেতে দিচ্ছেন ততদিন আমিও পায়েস খাব না!"

"কেন তুমি খাবে না?"

"খাব না এই জন্যই, আমার ছোট্ট চিনু পায়েস খেতে না পেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, আমিও সেই কষ্টের ভাগ নেব। তা হলে চিনুর কষ্টটা অনেক কমে যাবে। তাই না?"

তপতীর মনে হল চিনুর জ্বরক্লিষ্ট মুখে হালকা একটা হাসি ফুটে উঠল। "যাঃ, তুমি বাজে কথা বলছ। এইভাবে কি কষ্ট কমে? তোমার যখন পা ভেঙেছিল তখন তো তুমি বিছানায় শুয়ে থাকতে, তোমার মাও কি বিছানায় শুয়ে থাকত তোমার কষ্টের ভাগ নিতে?"

"সবার কষ্ট কি একরকমের হয়? তুমি ছোট, তোমার কষ্ট একরকমের, যখন আমার পা ভাঙে তখন তো আমি যথেষ্ট বড়, তাই আলাদা রকমের কষ্ট হত।"

"কী কষ্ট হত্ তোমার?"

তপতী একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, "খুব ভোরবেলায় উঠে বাগানে গিয়ে দেখতুম ফুলের নতুন কোনও কুঁড়ি ফুটেছে কি না, খালি পায়ে ভিজে ঘাসের ওপর হাঁটতুম, আমায় দেখলে টমি ছুটে এসে আমাকে ঘুরে ঘুরে লাফালাফি করত আর ল্যাজ নাড়ত, আমি তখন ছুটতুম, টমিও ছুটত... বিকেলে টেনিস খেলতুম দাদার সঙ্গে, বাবা তাড়াতাড়ি কোর্ট থেকে ফিরলে আমাদের সঙ্গে খেলতেন। এইসব কিছুই করতে না পারার জন্য কষ্ট হত।"

"মা, আমি টেনিস খেলব তোমার সঙ্গে। তোমার তো একটা র‍্যাকেট আলমারিতে তোলা আছে, আমি দেখেছি। ওটা দেবে আমায়?"

"নিয়ে কী করবি?"

"বাইরে বাগানে গিয়ে দেয়ালে বল মেরে মেরে খেলব। আমাকে একটা টেনিস বল কিনে দেবে?"

"দেব। এখন আর কথা নয় চিনু, এবার ঘুমো।"

"দাদাকে একটা র‍্যাকেট কিনে দিও, তা হলে দু'জনে খেলব।"

"কিনে দোব... এবার ঘুমো।"

"আমাদের এখানে টেনিস খেলার মতো জায়গা নেই, সেই ক্লাবে গিয়ে খেলতে হয়। এখানে একটা কোর্ট থাকলে খুব ভাল হত, তাই না?"

"হ্যাঁ, ভাল হত।"

"কপালে হাত দিয়ে দেখো, এখন আমার জ্বর নেই।" চিনু মায়ের হাতটা তুলে নিয়ে নিজের কপালে রাখল। তপতীর মনে হল, সত্যিই যেন জ্বরটা কম।"

"রাতে তোর কাশি হয়?"

"হ্যাঁ।"

"একদম ঠাণ্ডা লাগাবি না। এবার থেকে সবসময় সোয়েটার পরে থাকবি।"

ঘরের দরজা থেকে বেলা বলল, "বউদি, দাদার খাবার কি তুলে রাখব, উনি তো পায়েস খাননি।"

তপতী তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে খাওয়ার ঘরে এসে দেখলেন বাটিতে পায়েস যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। তন্ময় বসার ঘরে বড় সোফায় টানটান শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। তপতী বাটিটা থেকে একটা প্লেটে অর্ধেক পায়েস ঢেলে নিয়ে বেলাকে বললেন, "এটা দাদাকে দিয়ে এসো। আর বোলো কাল পায়েস করব সবার জন্য।"

বেলা ফিরে আসতেই তপতী বললেন, "এই পায়েসটা তুমি খেয়ে নিয়ো।"

"সে কী বউদি, তুমি খাবে না!"

"না। চিনু ভাল হোক, ওর সঙ্গে খাব।"

এই সময়ই ধুপধাপ পায়ের শব্দ করে মিনু ফিরল, তার সঙ্গে রাজেনের বাবা ব্রজেন রায়চৌধুরী। বয়স প্রায় সত্তর। তামাটে রং, লম্বায় ছয়-দুই, ওজন একশো সত্তর পাউন্ড, মাথাভর্তি ধবধবে ব্যাকব্রাশ করা চুল। চোখে পড়ার মতো হল ওর গোঁফ! খুবই পুষ্ট এবং গোরুর শিঙের মতো ডগা দুটো ওপর দিকে তোলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি মেজর ছিলেন সেনাবাহিনীতে, স্বাধীনতার পর মিলিটারি ছেড়ে এক বিলিতি সওদাগরি অফিসে যোগ দেন। বছর তিনেক আগে বিভাগীয় ম্যানেজারের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। হাতের অফুরন্ত সময় কীভাবে কাটাবেন, ধর্মচর্চায় না গ্রামের বাড়িতে পোলট্রি করে, এই ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে অবশেষে দাবায় মন দেন। এখন তাতেই ডুবে আছেন।

পায়েসের নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে মিনুর চোখ পড়ে বসার ঘরের টেব্‌লে রাখা দাবার ছকের ওপর। কৌতূহলী হয়ে সে ঘুঁটিগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে। ব্রজেন ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সিগার খেতে খেতে তিনবার পড়া আগাথা ক্রিস্টির একটা গোয়েন্দা-বই পড়ছিলেন সময় কাটাবার জন্য আর কিছু না পেয়ে। হঠাৎই তাঁর চোখ পড়ল মিনুর ওপর। তাঁর মনে হল এই বাচ্চা ছেলেটি দাবায় আগ্রহী। একে যদি খেলাটা শিখিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে সারাদিনে গোটা চল্লিশ হাই তোলা থেকে বোধ হয় রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

"দাবা খেলবে?"

"হ্যাঁ।"

"খেলেছ কখনও?"

"না, তবে খেলতে দেখেছি।"

মিনুর সপ্রতিভ উত্তর ব্রজেনের ভাল লাগল। তিনি টেব্‌লে উঠে গিয়ে সাদা ঘুঁটিগুলো ছকে সাজিয়ে বললেন, "এবার তুমি কালো ঘুঁটিগুলো সাজিয়ে দিতে পারবে?"

মিনু সাজানো সাদা ঘুঁটি দেখে দেখে সাজিয়ে দিল কালো ঘুঁটি এবং বেশ দ্রুতই।

"ঘুঁটিগুলোর নাম জানো ?"

"হ্যাঁ। এটা গজ, এটা ঘোড়া, এটা নৌকো, এটা রাজা।"

"কোনটের চাল কীরকম তা জানো ?"

"জানি।"

"ঘোড়ার চাল দেখাও তো।"

মিনু আড়াই চাল দেখাল। ব্রজেন অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি শিখলে কার কাছে ? বাড়িতে কেউ খেলে না কি ?"

"স্কুলে দু'জন সার টিফিনের সময় টিচার্স রুমে খেলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।" মিনুর দাঁত ঝলসে উঠল হাসিতে। "দেখতে দেখতে খানিকটা শিখে গেছি।"

"দেখি তো কেমন তুমি শিখেছ !" ব্রজেন উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন। যদি একটা খেলার সঙ্গী জোটে। "তোমার সাদা ঘুঁটি, আমার কালো। নাও চাল দাও।"

মিনু রাজার সামনের বোড়ে দু'ঘর এগিয়ে দিল। ব্রজেন তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে প্রথম চাল দিলেন। দশ-বারো চাল খেলার পর তাঁর মনে হল, ছেলেমানুষি বুদ্ধিতে খেললেও এই বাচ্চা ছেলেটিকে এক মাসের মধ্যে চলনসই প্রতিপক্ষ হওয়ার মতো করে গড়ে তুলতে পারবেন। মিনু তার প্রথম খেলায় হারল পনেরো চালে।

"ঘুঁটি সাজাও, এবার আমার সাদা।" ব্রজেন উত্তেজনা বোধ করছেন। নিভে যাওয়া সিগারটা ধরালেন।

"দাবা এখন থাক।" ব্রজেনের স্ত্রী তাড়া দিলেন। "খেয়ে নিয়ে বরং আবার বোসো, লুচি ভাজতে শুরু করেছে বউমা।"

খাওয়ার সময় ব্রজেন মিনুর পিঠে হাত রেখে শুভাকে বললেন, "মিনু যে এত তাড়াতাড়ি খেলাটা ধরে ফেলবে, ভাবতেই পারিনি। আমার একটা সমস্যা মিটে গেল বউমা।"

"মিনু আজ কত প্রাইজ পেয়েছে যদি দেখতেন ! আপনার ছেলে বলছিল, ও ন্যাচারাল অ্যাথলিট, যে খেলা ধরবে তাতেই ওপরে উঠবে। হবে নাই-বা কেন, বাবা-মা দু'জনেই অল্পবিস্তর স্পোর্টসের মধ্যে ছিল, বাবা সাঁতারে, মা টেনিসে। পরিবারের আবহাওয়াও তো অনেক সাহায্য করে ছেলেমেয়েদের।"

"তোমার এক ভাইকে দেখেছি, কী যেন নাম ?" ব্রজেন জানতে চাইলেন মিনুর দিকে তাকিয়ে।

"চিন্ময়, চিনু। ... কাকিমা, আমি আর একটা বেগুনভাজা খাব।"

ব্রজেন তারিফ ভরা স্বরে বললেন, "মিনু তো দেখছি ভাল খাইয়েও। বউমা, একটা নয়, দুটো বেগুনভাজা আর লুচি, চলবে তো ?" মিনু সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল।

"চিনু আজ ক'টা প্রাইজ পেল ?" ব্রজেন প্রশ্ন করলেন মিনুকে।

"একটাও নয়। জ্বর এসে গেল, একটায় নেমে আর নামেনি।"

শুভা বলল, "বড় রুগ্‌ণ ছেলেটা, খেলাধুলো ওর দ্বারা হবে না।"

খাওয়ার পর ওরা দু'জন আবার খেলতে বসল। মিনু প্রতিপক্ষের ঘুঁটির দিকে হুঁশ না রেখে চাল দিলেই ব্রজেন প্রত্যেকবারই তার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন।

"তুমি যে মন্ত্রীটা ওইখানে দিলে কিন্তু লক্ষ করলে না আমার গজ ওই কোণ থেকে এসে একে মেরে দেবে। নাও, চাল ফিরিয়ে নতুন চাল দাও।... আমি কিন্তু আর চাল ফেরত দেব না বলে রাখলাম।"

মিনু একবার ঘোড়া দিয়ে একটা বোড়েকে খেতেই ঘোড়ার খালি করে দেওয়া ঘরে ব্রজেন তাঁর মন্ত্রীকে তুলে মিনুর রাজাকে কিস্তি দিলেন। "আমি ইচ্ছে করেই বোড়েটাকে তোমার ঘোড়ার মুখে ফেলে দিয়েছিলাম, দেখি তুমি টোপ গেলো কি না। তুমি গিলে ফেললে আর আমারও কিস্তি দেওয়ার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল।... ভাবো, সময় নিয়ে প্রত্যেকটা চাল দেওয়ার আগে ভাবো। সবদিক বিবেচনা করো। একদম তাড়াহুড়ো করবে না!"

হেরে গিয়ে মিনুর মুখ প্রায় লাল হয়ে উঠল। চোখে হেরে যাওয়ার লজ্জা, সেটা লক্ষ করে ব্রজেন বললেন, "খেলা শিখেই কেউ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান বটভিনিকের মতো খেলতে পারে না। তুমি এখন বারবার আমার কাছে হারবে, তারপর এমন একটা সময় আসবে যখন তুমিই আমায় বারবার হারাবে। হারা আর হারানো এই দুইয়ের মাঝে শুধু প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস।"

"আর এক হাত খেলব।" মিনু চোখ নামিয়ে বলল।

"আর নয় আর নয়, রাত হয়ে গেছে।" শুভা তাড়া দিল। "মিনু, বাড়ির সবাই ভাববে, এবার বাড়ি যাও।"

"খেলুক না বউমা।"

"না বাবা, দশটা বাজে। ওইটুকু ছেলের এখন শুয়ে পড়ার কথা।"

"ঠিক আছে, তা হলে কাল আবার আমরা বসব, কেমন ? এবার চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

॥ ২ ॥

তন্ময়ের বন্ধু অপূর্ব হালদারের চেম্বার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে ধর্মতলা স্ট্রিটে। লন্ডন থেকে ডিগ্রি পাওয়া শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, তন্ময়ের স্কুলের সহপাঠী। চিনুকে দেখাবার জন্য তারিখ ও সময় ঠিক করতে তন্ময় ফোন করেছিল অপূর্বকে। "তোর ছেলেকে দেখাবার জন্য আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে নাকি! যেদিন খুশি, রবিবার বাদে সন্ধে ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে চলে আয় চেম্বারে।" তন্ময় এই উত্তর পেয়েছিল।

"তা হলে আর দেরি করে লাভ নেই, কালই চলো।" উদ্বিগ্ন স্বরে বলেছিল

তপতী। "জ্বরটা রয়েই গেছে। বাড়ছে কমছে, সঙ্গে কাশিটাও, ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।"

সুতরাং পরদিন যাওয়াই ঠিক হল। বিকেল পাঁচটা নাগাদ তারা মহাদেবপুর থেকে রওনা হয়। মিনুকে নিয়ে সামান্য ঝামেলা হল রওনা হওয়ার আগে। সাড়ে তিনটের সময় স্কুল থেকে ফিরেই সে বাড়ির কাছে একটা ছোট মাঠে ফুটবল খেলতে যেত। এখন আর যায় না। এখন যায় ব্রজেনদাদুর সঙ্গে দাবা খেলতে। দাবা তাকে রীতিমতো আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বল খেলার বদলে রোজ সে ঘণ্টা তিনেক বসে থাকে দাবার ছকের সামনে, একটা বুড়োমানুষের মতো।

সেদিন যথারীতি সে দাবার ছকের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় বেলা গিয়ে তাকে ডাকল। "মিনু শিগ্‌গির এসো, ওরা সবাই রেডি হয়ে গেছে, তুমি গেলেই গাড়িতে উঠবে।"

মিনু তখন তার ঘোড়াকে বাঁচাবার জন্য কোথায় সরাবে ভেবে পাচ্ছে না। বেলার কথা শুনে রেগে উঠে সে বলল, "আমি যাব না যাও। চিনুকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে তো আমি গিয়ে কী করব ? এখন ভাগো।"

বেলা ফিরে এসে তন্ময় ও তপতীকে শুনিয়ে দিল মিনুর কথাগুলো। তন্ময় প্রায় লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তপতী বললেন, "তোমায় যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি।" তপতী দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

"মিনু, বাবা অপেক্ষা করছেন।" তপতী কথাটা বলে ব্রজেনবাবুর দিকে তাকালেন, "আমরা কলকাতা যাব, মিনুও সঙ্গে যাবে। আজ আর ও খেলবে না।"

"তোমরা যাও না..." আবদেরে নাকি সুরে মিনু বলতে শুরু করেছিল।

"মিন্‌নু।" কঠিন চাপা স্বরে তপতী তাকে থামিয়ে দিলেন, "উঠে এসো।"

মায়ের চোখে ধকধকে আগুন দেখে মিনু উঠে পড়ল।

"মায়ের কথা শুনতে হয়। খেলা আজকের মতো অ্যাডজোর্নড রইল।" মিনুর পিঠে হাত রেখে স্নেহভরে ব্রজেনবাবু বললেন, "ছকে ঘুঁটিগুলো যেমন আছে ঠিক তেমনই থাকবে। কাল আবার শুরু হবে, আমি প্রথমে চাল দেব, কেমন ? এখন যাও। বাবা-মার অবাধ্য হতে নেই।"

তারা অপূর্ব হালদারের চেম্বারে পৌঁছল সওয়া ছ'টায়। বসার ঘর ভর্তি রোগী আর সঙ্গের লোক। তন্ময় ছাপা স্লিপে নাম লিখে পাঠাল। ডাক্তারকে দেখিয়ে একজন বেরিয়ে আসতেই তাদের ডাক পড়ল। অপূর্ব ছোটখাটো গোলগাল চেহারার মানুষ, চোখে চশমা, মুখে সবসময় হাসি। অনেকদিন পর দেখা হলে যেরকম কথাবার্তা হয় তাদের মধ্যে, তাই হল। বাইরে রোগীরা অপেক্ষা করছে, তাই ডাক্তার কথা বদল করে চিনুর দিকে নজর দিলেন। চোখ, জিভ, বুক, শ্বাস-প্রশ্বাস, গলার ভেতর, পেট ইত্যাদি শরীরের সাধারণ পরীক্ষাগুলো করতে করতে তিনি তপতীর কাছ থেকে চিনুর নিয়মিত জ্বর হওয়া, কাশি হওয়া সম্পর্কে খবর নিয়ে ভুরু কোঁচকালেন।

"ছেলেটা বড় রোগা। ওকে কি বড় ছেলেটার মতো স্বাস্থ্যবান করা যায় না?" তন্ময় কথাটা বলে মিনুর কাঁধে হাত রাখলেন সস্নেহে।

"কেন মোটা করা যাবে না! শরীরের যত্ন নিলে, ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলো, ছোটাছুটি করলে, মন প্রফুল্ল থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হবেই। তার আগে এখন দেখতে হবে ওর শরীরে অসুখটা কী।" অপূর্ব চিনুর মুখের দিকে চোখ রাখলেন। ডাক্তারের মুখে হাসি থাকলেও তপতীর বুক ছমছম করে উঠল। বেচারা চিনু! বসে-যাওয়া চোখমুখ এখন যেন আরও বসে গেছে।

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে তন্ময়ের হাতে দিয়ে বললেন, "বুকটা এক্স-রে করিয়ে নে আর সেইসঙ্গে মান্টু টেস্টও।"

শুনেই তপতী প্রায় আর্তনাদের মতো স্বরে বললেন, "সে কী! এসব তো...।" ভয়ে আর বাকি কথাগুলো বললেন না।

"এগুলো রুটিন চেক-আপ। টিবি যে হয়েছেই আপনি তা ধরে নিচ্ছেন কেন?" তপতীর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে ডাক্তার তাকালেন। "কিংবা যদি হয়েই থাকে তাতেই বা ভয় পাওয়ার কী আছে! টিবির অ্যালার্জি আছে কি না সেটা বোঝার জন্যই মান্টু টেস্ট। অন্য অনেক রোগের ব্যাপারেও এই টেস্ট করা হয়। তা ছাড়া এমন এমন সব ওষুধ বেরিয়েছে, কমপ্লিটলি সারিয়ে দেবে। এখন প্রোটিন, ভিটামিন, আয়রন এইসব ওর দরকার। ওষুধগুলো লিখে দিলাম, ঠিকমতো খাওয়াবেন।" ডাক্তার খুব সহজ ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গেলেন। কিন্তু তপতী তাতে আশ্বস্ত বোধ করলেন না। ছোট্ট চিনুর অবোধ সরল মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ জলে ভরে এল।

"তন্ময়, এক্স-রে-টা ভাল জায়গা থেকে করবি। তোদের ওখানে তো মিলের হাসপাতাল আছে, কেমন সেটা?"

"অফিসারদের জন্য ব্যবস্থা ভালই, তবে লেবারদের জন্য নয়।"

"এক্স-রে প্লেট আর মান্টু টেস্টের রিপোর্ট আমাকে দেখিয়ে যাবি, আর ওষুধগুলো এখনই যাওয়ার পথে কিনে নিয়ে যা, আজ থেকেই খাওয়াতে শুরু কর। লিখে দিয়েছি কখন কতবার খাওয়াতে হবে।"

ওরা চেম্বার থেকে যখন বেরিয়ে আসছে ডাক্তার তখন বললেন, "তন্ময়, তোর বড় ছেলেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন শরীরের ওজন একটু বেশিই। কত ওজন এখন? বয়স কত হল?"

"বলতে পারব না, ওজন কখনও করাইনি। বয়স নয় চলছে। জিজ্ঞেস করলি কেন, খারাপ কিছু?" তন্ময়কে উৎকণ্ঠিত দেখাল।

"বয়সের তুলনায় তো বড়ই দেখাচ্ছে। খারাপ কেন হবে, বেশ ভাল হেল্‌থ। তবে এক্সারসাইজ না করলে মোটা হয়ে যেতে পারে। খেলাধুলো করে?"

"তা করে। স্কুলের স্পোর্টসে সাতটাতে ফার্স্ট হয়েছে।"

"গুড, ভেরি গুড।"

মহাদেবপুরে ফেরার পথে তন্ময় ওষুধগুলো কিনে নিলেন। গাড়ির পেছনের

সিটে তপতী দুই ছেলেকে নিয়ে বসে ছিলেন। সারা পথ তারা খুব কমই কথা বলল। একসময় মিনু জিজ্ঞেস করল, "মা, টিবি কি একটা অসুখ ?"

"হ্যাঁ।"

"চিনুর কি টিবি হয়েছে ?"

তপতী চমকে উঠে চিনুকে জড়িয়ে ধরলেন। "না, হয়নি।"

পরদিন তপতী মিলের হাসপাতালে চিনুকে নিয়ে গেলেন। তাকে দেখে অল্পবয়সি ডাক্তার সিন্‌হা অবাক হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বউদি, আপনি এখানে ! কিছু হয়েছে নাকি ? দাদা কোথায় ?"

"কারও কিছু হয়নি। সবাই ভাল আছে, শুধু আমার এই ছোট ছেলেটা ছাড়া। আপনাকে ভাই দুটো কাজ করে দিতে হবে। আপনার দাদার বন্ধু ডাক্তার হালদার কাল চিনুকে পরীক্ষা করে ওর বুকের এক্স-রে আর মান্টু টেস্ট করাতে বললেন।" তপতী প্রেসক্রিপশনটা বিস্মিত ডাক্তার সিন্‌হার হাতে তুলে দিলেন। সেটা পড়তে পড়তে ডাক্তার বার-দুই চিনুর দিকে তাকালেন। তপতীকে কিছু বলতে গিয়েও বললেন না।

"আপনি একটু বসুন, ব্যবস্থা করছি।" ঘর থেকে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন এবং ফিরলেন মিনিট পাঁচেক পর। "ওকে নিয়ে আসুন। আপনার ভাগ্য ভাল, এক্স-রে মেশিনটা আজ সুস্থ আছে, চারদিন ধরে কাজ করছিল না।"

চিনুর বুকের ছবি নেওয়া হল। ডাক্তার ওর বাঁ হাতের পুরো বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে ওষুধ ঢুকিয়ে হাতের সেই জায়গাটায় একটা টাকার মাপের বৃত্ত এঁকে দিলেন কালি দিয়ে। বৃত্তের মধ্যে চামড়ার রং বদলায় কি না বা ফুলে ওঠে কি না সেটা তিনদিন লক্ষ করতে হবে। ব্যাপারগুলো চিনু কৌতূহলভরে দেখে গেল।

তিনদিন ধরে তপতী বারবার চিনুর হাতটা নজর করলেন। বৃত্তের মধ্যে চামড়া ক্রমশই গোলাপি হতে শুরু করল, ওখানকার চামড়াটা ফুলেও উঠল। আর সেই সঙ্গে তপতীও মনে মনে ভেঙে পড়লেন। যা ভয় করেছিলেন বোধ হয় সেটাই তবে ঘটেছে। এবার আর নিজে নয়, তন্ময়কে তিনি চিনুর সঙ্গে পাঠালেন, হাসপাতালে। গম্ভীর মুখে আধঘণ্টা পর তন্ময় ফিরলেন ডাক্তার সিন্‌হার মান্টু টেস্ট রিপোর্ট পকেটে নিয়ে।

"কী লিখেছে রিপোর্টে ?" ব্যাকুল তপতী জিজ্ঞেস করলেন।

"যা ভয় করেছিলে তাই, পজিটিভ। কালই ওকে নিয়ে অপূর্বর কাছে যাব। দেরি করব না চিকিৎসা শুরু করতে।" তন্ময় অধৈর্য কণ্ঠে বললেন।

এক্স-রে থেকে চিনুর ফুসফুসে সামান্য একটা স্পট পেয়েছিলেন ডাক্তার হালদার। তন্ময়কে তিনি বলেন, "খাওয়ার ওষুধগুলো লিখে দিচ্ছি, ইঞ্জেকশন ওখানকার ডাক্তারকে দিয়ে দিইয়ে নিবি। তিন মাস পর আবার এক্স-রে করিয়ে আমায় দেখাবি। একদম ভয় পাবি না, ওর যা হয়েছে সেটা প্রায় কিছুই নয়।" এ ছাড়াও তিনি চিনুর খাওয়া, থাকা, পোশাক, ঘোরাফেরা ইত্যাদি বিষয়ে কী কী যত্ন

নিতে হবে তাও তন্ময়কে বলে দেন।

এর পরই বসুমল্লিক পরিবারে একটা পরিবর্তন এসে গেল। আলো বাতাস রোদ আসে এমন ঘরে চিনুর থাকা দরকার আর সেরকম দক্ষিণ-পুব খোলা ঘর বাড়িতে একটাই। বসবার ঘর। তপতী বললেন, "দরকার নেই আমার বাইরের লোকজন আসার, তাদের বসাবার জন্য ঘর। চিনু ওই ঘরেই থাকবে।" তন্ময় তাতে সায় দিয়ে বলেন, "সোফাটোফাগুলো খাওয়ার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, কেউ এলে ওখানেই বসবে।"

পরিবর্তন এল খাওয়ার ব্যাপারেও। শুধু চিনুর জন্যই নয়, মিনুর জন্যও দুধ, মাখন, ছানা, ডিম, ভেজানো ছোলা-মটর। বেড়ে গেল ডাল ও সবুজ শাকপাতা, ডাঁটা, মাটির নীচে জন্মানো আনাজ। পেয়ারা, কলা বা মরসুমি ফল। মাছের পরিমাণও বাড়ল। সপ্তাহে তিনদিন চিকেন স্টু।

"রোগটা ছোঁয়াচে, আমার মনে হয় আলাদা বাসন থাকা দরকার চিনুর জন্য।" তন্ময়ের এই কথায় সায় দিলেন তপতী। সাবধানের মার নেই, বাড়িতে আরও একটা ছেলে রয়েছে। অতঃপর চিনুর জন্য প্লেট, গ্লাস, বাটি ইত্যাদি কেনা হল।

একদিন রাত্রে সকলের খাওয়াদাওয়ার পর চিনুকে ঘুম পাড়িয়ে তন্ময় ও তপতী খাওয়ার ঘরে বসে কথা বলছিলেন।

"এবার থেকে জল ফুটিয়ে খাওয়াই উচিত। এখানে ট্যাঙ্কের যে জল, তাতে কত যে ব্যাকটিরিয়া।" তপতীর কথাটাকে সমর্থন করলেন তন্ময়। যদিও তিনি মহাদেবপুরের পৌর বিভাগের কর্তা, তবু তিনি জলের পরিশুদ্ধতায় পুরো আস্থা রাখেন না।

"আমাদের এখন মনেপ্রাণে ছেলেদের স্বাস্থ্যের কথাটা ভাবতে হবে। কে ভেবেছিল এমন একটা রোগ, যেটা না খেতে পাওয়া, অস্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকা লোকেদেরই হয়, সেই রোগ কিনা আমার ছেলের হল!" তন্ময়ের গলায় ক্ষোভ আর অসহায় ক্রোধ। "কেন হবে চিনুর, কেন, কেন? এবার থেকে একটা রোগকেও আর বাড়িতে ঢুকতে দেব না। সাধ্যে যতটা কুলোয় আমি চেষ্টা করে যাব।"

"সেজন্য তা হলে খরচ করতে হবে।" তপতী দ্বিধাভরে বললেন। সংসারটা তাঁকেই চালাতে হয় এবং সেজন্য নির্ভর করতে হয় স্বামীর বাঁধা বেতনের ওপর।

"করব খরচ। ছেলেদুটোই তো আমাদের সবকিছু। ওদের সবল, সুস্থ রাখা, লেখাপড়া শিখিয়ে দশজনের একজন করে তোলা, এজন্য আমার শেষ কপর্দকও খরচ করব।" কথাগুলো বলে তন্ময় এমনভাবে তপতীর দিকে তাকালেন, যেন জটিল একটা অঙ্ক কষে ফেলে ফলটা ঠিক হয়েছে কি না জানতে চাইছেন।

"এজন্য আমাদের কষ্ট করতে হবে।" তপতী শান্তস্বরে বললেন।

"হবেই তো। কষ্ট না করলে কি সফল হওয়া যায়?" তন্ময় উত্তেজিত হয়ে তালুতে ঘুসি বসালেন।

"দেখো, আমার মনে হচ্ছে মিনুর এই দাবা খেলাটা বন্ধ করতে হবে। এটা

নেশার মতো ওকে পেয়ে বসেছে। আগে বিকেলে মাঠে খেলতে যেত, এখন যায় না। এইটুকু ছেলের পক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকাটা ভাল নয়।"

"তা তো নয়ই, কিন্তু করবটা কী ?" তন্ময়কে অসহায় দেখাল।

"কিছু একটা তো করতে হবে।" তপতীর স্বরে দৃঢ়তা ফুটে উঠল।

প্রতিদিনের মতো মিনু আর চিনুকে নিয়ে তপতী ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছেন। রোজই তারা হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে যায়। পিচঢালা রাস্তাটা ফেরিঘাটে শেষ হয়েছে। সেখানে একটা কাঠের বেঞ্চে তারা বসে। ভোরের নির্মল বাতাস নদীর ওপর দিয়ে এসে তাদের শরীরকে তাজা করে তোলে। বুকভরে তারা টাটকা বাতাস জমা করে। ফেরার সময় মিনু দৌড়য়। তখন চিনু বলে, "মা, দাদার সঙ্গে আমিও দৌড়ে বাড়ি যাব।" তপতী ওকে দৌড়তে দেন না। "আগে ডাক্তারবাবু বলুন, তারপর।"

কিন্তু আজ চিনু বায়না ধরল, সে দৌড়বেই। কী ভেবে তপতী বললেন, "আচ্ছা। কিন্তু জোরে নয়।"

মিনু লম্বা কদমে জোরেই ছুটতে শুরু করল, তার পেছনে চিনু। ভোরের নির্জন রাস্তায় তখন গাড়ি চলা শুরু হয় না। ওরা নিশ্চিন্তেই ছুটছিল। বড় রাস্তা থেকে বাঁ দিকে বেঁকে ওরা একটা সরু রাস্তায় ঢুকে গেল। তপতী হাঁটার বেগ বাড়ালেন, ছেলেরা তাঁর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হতেই।

মিনুর অনেক পেছনে চিনু। রাস্তার দু'ধারে মিলের ব্যারাক। কম মাইনের শ্রমিকরা এখানে থাকে। একতলা টানা লম্বা বাড়িগুলো ছাড়িয়ে কিছুটা ফাঁকা মাঠ, তারপর ডান দিকে ফিরে আবার একটা চওড়া রাস্তা। মিনু ব্যারাকটার শেষপ্রান্তে যখন পৌঁছেছে তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়েই থেমে পড়ল। চিনু ভয়ে সিঁটিয়ে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আর দুটো কুকুর তাকে কামড়াবার জন্য তেড়ে যাচ্ছে পায়ের গোড়ালি তাক করে।

"চিইনউউ।" বলে চিৎকার করে মিনু পাগলের মতো ছুটতে শুরু করল ছোট ভাইয়ের দিকে। দাদাকে ছুটে আসতে দেখে চিনু প্রায় চোখ বুজে মিনুর দিকে ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুর দুটো তার পিছু নিল। মিনু যখন জড়িয়ে ধরল ভাইকে, একটা কুকুর তখন চিনুর কেড্‌সে প্রায় দাঁত ছুঁইয়ে ফেলেছে। চিনুকে পিছনে ঠেলে দিয়ে মিনু দু'হাত মুঠো করে শূন্যে এলোপাথাড়ি ঘুসি চালাতে শুরু করে দিল। কুকুর দুটো আর না এগিয়ে দাঁত বার করে বারবার তেড়ে যেতে লাগল।

সেই সময় ব্যারাক থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে, দুটো তেরিয়া কুকুরের সামনে একটি ছেলেকে ঘুসি চালিয়ে যেতে দেখে কুকুরদুটোকে ধমকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বলল, "আর কিছু করবে না, এবার তোমরা যাও। তবে ছুটো না।"

মিনু ভাইয়ের কাঁধ একহাতে জড়িয়ে ধরে টানল, "ভয় কী রে ? আমি থাকতে ভয়ের কিছু নেই। চল, এবার হেঁটে হেঁটে যাই। খানিকটা গিয়ে আবার

দৌড়ব।"

চিনু থরথর কাঁপছে। ভয়ে ফ্যাকাসে মুখে রক্ত তখনও ফিরে আসেনি। দাদার হাত আঁকড়ে ধরে বলল, "কামড়ে আমার মাংস খুবলে নিত, না রে ?"

"অত সোজা যেন, খোবলাব বললেই যেন খোবলানো যায়। টেনে এমন একটা লাথি মারতাম যে, দাঁতগুলো ভেঙে যেত।" মিনু লাথি ছুড়ে দেখাল। তাচ্ছিল্যে ঠোঁট বাঁকাল।

"দাদা, তুই মাকে বলে দিবি না তো ?"

"বললে কী হয়েছে ?"

"মা তা হলে আমায় আর ছুটতে দেবে না।"

"তা হলে ছোট আমার সঙ্গে। না ছুটলে অসুখ সারবে না।"

ঘটনাটার কথা তপতী জানতে পারেননি। তার বদলে জানতে পারলেন আর একটা কথা। যেভাবেই হোক চিনুর অসুখটার কথা গোপন করা সত্ত্বেও অনেকেই জেনে গেছল। একদিন মিনু স্কুল থেকে ফিরে এসে তপতীকে বলল, "জানো মা, সুব্রত আজ আমার ওয়াটারবট্‌ল থেকে জল খেল না।"

"কেন ? তুই জল দিতে গেছলি কেন ?"

"ও আজ ওয়াটারবট্‌ল নিয়ে যেতে ভুলে গেছল। ক্লাসে ওর খুব তেষ্টা পেয়েছিল তাই দিলীপের কাছে জল চাইল। আমি বললুম, 'আমারটা থেকে খা', ও বলল, 'তোর ওয়াটারবট্‌ল থেকে জল খাব না। তোদের বাড়িতে ক্ষয়রোগের রুগি আছে। তোর জল খেলে আমারও ক্ষয়রোগ হবে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্ষয়রোগ কাকে বলে ?' ও বলল, 'ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভ্যানিশ হয়ে যায় বলে এর নাম ক্ষয়রোগ।' হ্যাঁ মা, সত্যি ? চিনু ভ্যানিশ হয়ে যাবে ?"

শুনতে শুনতে তপতীর চোখে জল এসে গেল। কথাগুলো নিশ্চয় সুব্রত বাড়িতে শুনেছে বলেই বলেছে। বাড়ির লোকরা কী নিষ্ঠুরের মতো এইরকম কথাবার্তা বলেছে ! সুব্রত মজুমদারের মা প্রতিভা খুবই অমায়িক, মিষ্টভাষী, প্রায়ই স্বামীর সঙ্গে অফিসার্স ক্লাবে যান, সেখানে গল্পের আসর বসান। তপতীকে দেখলেই বলেন, "এই যে পূর্ণিমা, তোমার অমাবস্যাটি কোথায় ?"

গরম লোহার শিকের মতো 'ভ্যানিশ' শব্দটা ঢুকে গিয়ে তপতীর মাথাটা গরম করে দিল। একটা জেদ তাঁকে ধীরে ধীরে পেয়ে বসল। তিনি স্থির করলেন আজই ক্লাবে যাবেন এবং চিনুকে সঙ্গে নিয়ে।

সন্ধ্যার পর বসুমল্লিকরা চিনুকে নিয়ে ক্লাবের সামনে ভক্সহল থেকে নামলেন। সঙ্গে ফুটোনো জলে ভরা ওয়াটারবট্‌ল। মিনুকে তাঁরা সঙ্গে আনেননি। ক্লাবের লনে ছোট ছোট টেব্‌ল ঘিরে চেয়ার। দশ-বারোটি দম্পতি এবং তাঁদের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা চেয়ার ভরিয়ে রেখেছে। একটি টেব্‌ল ঘিরে পাঁচজন মহিলা, তাদের মাঝে প্রতিভা মজুমদার হাত নেড়ে নেড়ে, ভ্রূ নাচিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন, বাকি চারজন মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। তপতী আর তন্ময়কে দেখে প্রতিভা আজ আর হাত তুললেন না। ফিসফিস করে অন্যদের কী যেন বললেন। সকলেই মুখ ঘুরিয়ে

বসুমল্লিকদের দিকে তাকাল।

লনের মাঝখানে লোহার পোস্টের মাথায় উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলো। তার নীচে একটা ফাঁকা টেব্‌লে ওঁরা বসলেন। বেয়ারা এল, কিছু খাবে কি না জানতে।

"কী আছে আজ ?" তন্ময় জানতে চাইলেন।

"চিকেন পকৌড়া, শিঙাড়া, চানা-মটর।"

তন্ময় হাত তুলে বেয়ারাকে থামিয়ে দিলেন। "ওসব খাবার চলবে না।"

"তিন গ্লাস জল দাও আগে, তারপর এক পট চা আর তিনটে কাপ।" তপতী ফরমায়েশ দিলেন। তারপর চিনুকে বললেন, "যা, দোলনায় চড় গিয়ে।"

একধারে দুটি দোলনা, স্লিপ এবং সি-স্য রয়েছে বাচ্চাদের খেলার জন্য। কিছু বাচ্চা খেলছে। দোলনায় দুলছে দুটি মেয়ে। চিনু গিয়ে দোলনার পাশে অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎই প্রতিভাদের টেব্‌ল থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "শিলু, শিগগির চলে এসো এখানে।" কিন্তু শিলু নামের মেয়েটি মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে দুলেই চলল। তার মা উঠে গিয়ে দোলনা থামিয়ে শিলুর গালে চড় কষিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এলেন।

খালি দোলনাটায় চিনু উঠতে পারছিল না, তপতী উঠে গিয়ে তাকে বসিয়ে দিয়ে দোল দিতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক পর ছেলেকে নিয়ে টেব্‌লে ফিরে এলেন। বেয়ারা চা ও জল দিয়ে গেছে। একটা গ্লাস থেকে জল ফেলে দিয়ে বাড়ি থেকে আনা জল তাতে ভরে চিনুকে বললেন, "একটু জল খা।"

চিনু যখন জল খাচ্ছে, তপতী আড়চোখে দেখলেন প্রতিভা তাঁদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তিনটি কাপে তিনি চা ঢাললেন, তবে একটিতে যৎসামান্য। সেটি চিনুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "এক চুমুক, ব্যস।" জীবনে চা খায়নি চিনু, সে অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। "যা বলছি কর, ঠিক এক চুমুক।"

চিনু তাই করল। তপতী আড়চোখে তাকালেন আবার এবং মনে মনে হাসলেন। সেই সময় ক্লাবে ঢুকল রাজেন এবং শুভা। বসুমল্লিকদের দেখতে পেয়ে তাদের টেব্‌লেই ওরা এসে বসল। বেয়ারা এল। কী খাদ্য আছে, জানতে চাইল রাজেন এবং শুনে নিয়ে সে তন্ময়কে বলল, "দাদা তা হলে পকৌড়াই আনাই। বউদি, শিঙাড়া চলবে ?"

"না।" হেসে তপতী বললেন, "কোনওটাই না।"

"সে কী ! আমি তো আপনাদের খেতে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।"

"যে খাবার আমার ছেলেদের খেতে দিই না, সে খাবার এখন আমরাও খাচ্ছি না।" তন্ময় উত্তর দিলেন। "আসলে চিনুর এই অসুখটাই আমাদের সচেতন করে দিয়েছে। আমাদের, মানে ছেলেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা। ওদের ভাল স্বাস্থ্য গড়ে দেওয়ার কাজে আমরা নেমেছি। সেজন্য কিছু বিধিনিষেধ আমরা মানছি। তার মধ্যে রয়েছে এই খাওয়ার ব্যাপারটা। মুখরোচক এইসব খাবার ওদের খেতে দিই না, সেজন্য আমরাও খাই না।" তন্ময় হাসতে শুরু করলেন।

"দারুণ কাজে নেমেছেন তো।" এই বলে রাজেন পাশে দাঁড়ানো বেয়ারাকে বলল, "শুধু চা দাও।"

"কিছু খাবে না তোমরা!" তন্ময় বললেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে।

"না দাদা। কিছু বিধিনিষেধ আমিও আজ জারি করলাম। যে খাবার আপনারা খাবেন না, সে খাবার...।"

রাজেন শেষ করার আগেই তন্ময় হেসে উঠলেন। "নিষেধ মেনে শেষ পর্যন্ত চলতে পারবে তো? বাঙালির নোলা বিশ্বাসঘাতকতায় খুব পটু।"

"আপনাদের একটা কাজের তো পরিচয় পেলাম, এর পর আর কী কাজে নেমেছেন?"

"নামা হয়নি, তবে নামার জন্য চিন্তা করছি।" তপতী বললেন। "ওদের কোনও একটা খেলা শেখানোর ব্যবস্থা করা। শুধুমাত্র পুষ্টিকর খাওয়া দিয়েই তো স্বাস্থ্য হয় না, শরীর গড়তে পরিশ্রমেরও দরকার হয়।"

"আচ্ছা রাজেন, ওদের কোন খেলা শেখানো যায় বলো তো?"

তন্ময়ের বলার ভঙ্গিতে বোঝা গেল তিনি এটা নিয়ে চিন্তিত।

"এখানে খেলা শেখানো!" ভ্রূ কপালে তুলে রাজেন হতাশভাবে মাথা নাড়ল। "এখানে মাঠটাঠ আছে, কিন্তু লোকের কোনও উৎসাহ নেই। এই দেখুন না ওই যে টেনিস কোর্টটা, কত বড় বড় ঘাস গজিয়ে গেছে, কেউ খেলে না বলেই তো! সবাই তাস আর ক্যারম খেলে চা-শিঙাড়া খেয়ে বাড়ি চলে যায়। অথচ খেলার জন্য নেট, কিছু পুরনো বল ক্লাবে পড়ে আছে। ঘাস ছাঁটাইয়ের জন্য একটা লন মোয়ারও রয়েছে।

"একদিন মিস্টার ভটচাযকে বলেওছিলাম, নতুন সেক্রেটারি হলেন, ক্লাবের হালটা একটু ফেরান। শুধু আড্ডা দেওয়া ছাড়াও মেম্বাররা যাতে একটু ছোটাছুটি করে ঘাম ঝরাতে পারে, তার ব্যবস্থা করুন না! উনি বললেন, 'কী ব্যবস্থা করব বলুন? টেব্‌ল টেনিস বোর্ড কেনার জন্য কমিটি মিটিংয়ে প্রপোজাল দিলাম, সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, 'বোর্ড পাতবেন, জায়গা কোথায়?' আসলে বোর্ড পাতলে তাস খেলার টেব্‌লগুলো তুলে দিতে হবে তো। বললাম, 'টেনিস কোর্টটাকে ঠিকঠাক করে দেখুন না আবার চালু করা যায় কি না।' উনি বললেন, 'কিস্‌সু হবে না, খেলার লোকই পাওয়া যাবে না। আপনাকে একা একাই খেলতে হবে।' ভেবে দেখলাম, মিস্টার ভটচায বাজে কথা বলেননি। তবে লোকটা খেলা ভালবাসেন।"

রাজেন নিরুৎসাহিত গলায় কথাগুলো বলে চায়ের কাপ নেওয়ার জন্য শুভার দিকে হাত বাড়াল। তপতী মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকার টেনিস কোর্টটার দিকে তাকালেন। কিছু একটা তিনি ভাবছেন। প্রতিভাদের টেব্‌লের মহিলারা উঠলেন। বাড়ি যাওয়ার জন্য ছেলেমেয়েদের ডাকাডাকি শুরু হল।

"আমি একবার মিস্টার ভটচাযের সঙ্গে দেখা করব।" তপতী বললেন।

"কেন?" তন্ময় জানতে চাইলেন।

"যদি কোর্টটাকে আবার জাগিয়ে তোলা যায়। দেখি উনি ক্লাবঘরে আছেন কি না।" তপতী চেয়ার থেকে উঠলেন। কয়েক পা যেতেই পড়লেন প্রতিভার সামনে।

"তোমার ছোট ছেলের নাকি খুব অসুখ হয়েছে শুনলাম," অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখ প্রতিভার। অসুখটা যেন তাঁর নিজের ছেলেরই হয়েছে।

"হ্যাঁ।"

"আহা রে, একেই তো বরাবরের রুগ্‌ণ, তার ওপর আবার অসুখ, ছেলেটার যে কী কপাল ! অসুখটা কী ?"

"টিউবারকুলাসিস, যাকে বলে ক্ষয়রোগ।" তপতী ধীর স্বরে বললেন।

"ও মা ! টিইবিই ! ভাল ডাক্তার দেখাচ্ছ তো ?"

"দেখাচ্ছি।"

"এখন কেমন আছে ? মুখ দিয়ে রক্ত টক্ত ওঠে ?"

"ওই তো বসে রয়েছে দেখুন না ! এখন চিনু ভোরে ওর দাদার সঙ্গে ছোটে।"

"না, না, না, ছোটাছুটি করিও না, ফুসফুস ড্যামেজ হলে ধুঁকতে ধুঁকতে সারা জীবন কাটাবে, চিরকালের মতো অক্ষম হয়ে যাবে।"

"আর নয়তো ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভ্যানিশ হয়ে যাবে।" তপতী হাসতে শুরু করলেন। প্রতিভা সন্দিহান চোখে তপতীর হাসি দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।" বলে প্রতিভা হনহনিয়ে এগিয়ে গেলেন।

ক্লাবের অফিসে বসে কমল ভটচায দু'জন মেম্বারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। প্লাইউডের পার্টিশন করা খোপের মতো একটা ঘর। দরজায় পাল্লার বদলে একটা পরদা ঝুলছে। তপতীকে দেখে কমল ভটচায অবাক হলেন।

"আপনি ! কী ব্যাপার ? বসুন, বসুন।"

"একটা বিষয়ে একটু কথা বলতে এসেছি।" একমাত্র খালি চেয়ারটায় বসে তপতী কোনও ভণিতা না করে বললেন, "ক্লাবের টেনিস কোর্টটাতে খেলার ব্যবস্থা করুন। জানি মেম্বারদের খুব একটা উৎসাহ নেই, কিন্তু তাদের ছেলে মেয়েদের তো থাকতে পারে।"

কমল ভটচায আচমকা এমন একটা অনুরোধের সামনে পড়ে ভেবে পেলেন না কী জবাব দেবেন। কিন্তু কিন্তু করে বললেন, "এমন একটা প্রস্তাব অবশ্য রাজেন রায়চৌধুরী একবার আমাকে দিয়েছিলেন। উনি তো একসময় কলকাতায় টেনিস খেলতেন, শুনেছি ভালই খেলতেন, তাই হয়তো টেনিস প্রীতিতেই কথাটা তুলেছিলেন। কিন্তু মিসেস বসুমল্লিক, অসুবিধেটা কী জানেন, মেম্বাররা সারাদিন নানান শিফ্‌টে মিল আর অফিস করে রিল্যাক্স করার জন্য এখানে আসেন, তাই কেউ আর টেনিস নিয়ে উৎসাহী হন না। তবে আপনি যেটা বললেন, ছেলেমেয়েদের কথাটা, হ্যাঁ, এটা ভেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু করে কে ? কোর্টটায় শুধু বড় বড় ঘাসই নয়, বড় বড় গর্তও আছে। খোয়া, নুড়ি ছড়ানো, জমি অসমান। রীতিমতো মেহনত করতে হবে ওটাকে নিয়ে। এদিকে ক্লাবে একজন

বেয়ারা, একজন কুক। মালি ছিল, তাকে এই মাসেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাসের অর্ধেক দিন তার দেখাই পাওয়া যেত না।"

"আপনার অসুবিধেগুলো আমি বুঝতে পারছি।" তপতী নম্র আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন। "কিন্তু কেউ যদি দায়িত্বটা নেয় তা হলে কি আপনি সাহায্য করবেন?"

"নিশ্চয় করব। কিন্তু সাহায্য বলতে কী বোঝাচ্ছেন? আপাতত আমার লোকবল নেই। বেয়ারা কি কুক, মাঠের কাজ করবে না বললে তাদের দিয়ে করাতে পারব না। অর্থবলও তেমন নেই যে, লোক ভাড়া করতে পারব। নামেই অফিসার্স ক্লাব, অর্ধেক মেম্বারই তিন-চার মাসের চাঁদা বাকি ফেলেছেন। তাই নিয়েই তো এঁদের সঙ্গে কথা বলছিলাম।" কমল ভটচায হাত দিয়ে দেখালেন এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা দু'জনকে।

"লোকজন বা টাকা কিছুই দিতে হবে না, শুধু কোদাল, ঝুড়ি, বালতি, জল এইসব; আর লন-মোয়ারটা দিলেই হবে।"

"মোয়ারটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। একটা চাকা আর কী যেন ভেঙেছে।"

"সে আমি সারিয়ে নেব। ... তা হলে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন।"

"অবশ্যই। যদি দায়িত্ব নিয়ে কোর্টটাকে উদ্ধার করতে পারেন তা হলে সত্যিই একটা কাজের কাজ হবে। কিন্তু মিসেস বসুমল্লিক—" কমল ভটচায থেমে গলা নামিয়ে বললেন, "খেলার জন্য লোক পাবেন তো?"

"নেটের দু'ধারে দাঁড়াবার জন্য ইতিমধ্যেই দু'জনকে পেয়ে গেছি—আমার বড় ছেলে আর আমি।"

॥ ৩ ॥

পরদিন ভোরে ফেরিঘাট থেকে মিনু ও চিনু দৌড় শুরু করার পর তপতী হাঁটতে শুরু করলেন বাড়ির বদলে ক্লাবের দিকে। উদ্দেশ্য, দিনের আলোয় ভাল করে কোর্টের অবস্থাটা দেখে নেওয়া।

মিনিট কুড়ি পর তিনি পৌঁছলেন। রাত্রে ক্লাবঘরে শোয় বেয়ারা কান্তি। তার দেশ নদিয়া জেলার এক গ্রামে। বাড়িতে বউ, ছেলে মেয়ে আছে। বয়স্ক লোক, মানুষ ভাল। সে তপতীকে চেনে। এত সকালে 'মেমসায়েব'কে ক্লাবে দেখে কান্তি হতভম্ব।

"মালি তার জিনিসপত্র কোথায় রাখে কান্তি, আমি একটু দেখব।"

ক্লাবঘরের পেছনে একটা ঢাকা জায়গায় মোয়ারটা দেয়ালে ঠেস দেওয়া। একটা চাকা খোলা, তবে ভাঙেনি। ছাঁটাই হওয়া ঘাস যে লোহার ডালাটায় পড়ে, সেটা ঝুলে রয়েছে। ঘাস ছাঁটাই করার একটা ব্লেড ভাঙা। কোদাল একটা আছে বটে, তার বাঁশের হাতলটা নেই। একটা শাবলও রয়েছে। কোনও ঝুড়ি নেই। টেনিসের নেটটা খুঁজে পাওয়া গেল না।

"আপনি কী করবেন এসব দিয়ে?" কান্তি তো অবাক!

"মাঠ বানাব। ওই টেনিস কোর্টটাকে খেলার যোগ্য করে তুলতে হবে।"

"আপনি করবেন ?"

"লোক দিয়ে করাতে হবে।"

কোর্টের অবস্থা দেখে তপতীর কপালে দু-তিনটে ভাঁজ পড়ল। ঘাস এত লম্বা যে, প্রথমে হেঁসো দিয়ে না কাটলে মোয়ার চালানো যাবে না। জমিতে কয়েকটা জায়গায় মাটি ফেলতে হবে, গর্ত বোজাতে হবে, ঢিপির মতো উঁচু জায়গায় মাটি চাঁছতে হবে আর ভাঙা ইটের টুকরো, কাঁকর বাছতে হবে। এত 'হবে' কিন্তু তাঁকে দমাতে পারল না। প্রথমেই মোয়ারটা সারাতে হবে, একটা কি দুটো মাটি ফেলার ও তোলার ঝুড়ি চাই, কোদালের জন্য হাতলও।

"কান্তি, একজন কি দু'জন মজুর জোগাড় করতে পারবে ? আর একজন ঘেসুড়ে ?"

"তা পারা যাবে।"

"তোমাকে আমি পরশু বলব।"

তপতী যখন বাড়ি ফিরলেন সবাই তখন খাওয়ার টেব্‌লে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।

"কেমন দেখলে ?" তন্ময় জানতে চাইলেন।

"যা দেখব ভেবেছিলাম তাই দেখলাম। তবে হয়ে যাবে। তোমার একটু সাহায্য চাই। মোয়ারটা ভাঙাচোরা, ওটাকে সারাতে হবে। তোমার তো অনেক মিস্ত্রি আছে, একজনকে পাঠিয়ে দাও না ওটা ঠিক করে দেবে।"

"পাঠাব। আর কী দেখলে ?"

"দেখলাম বেশ কিছু টাকা খরচ করতে হবে, মিস্ত্রি লাগাতে হবে।"

"টাকা !" তন্ময় নড়েচড়ে বসলেন। চিনুর চিকিৎসা আর সুষম পুষ্টিকর খাদ্য চালু হয়ে সংসার খরচ যথেষ্ট বেড়ে গেছে। মাইনের টাকা হিসেব করে খরচ করতে হচ্ছে এবং খরচটা করে তপতী। সুতরাং টেনিস কোর্ট সংস্কারের জন্য খরচের টাকা যে তাঁদের পক্ষে দেওয়া কষ্টকর হবে, এটা তপতী জানেন।

"টাকা আমাদের খরচ করতে হবে নাকি ! ক্লাব দেবে। মেম্বারদের ছেলেমেয়েরাই তো খেলবে।" তন্ময় মৃদু স্বরে আপত্তি জানালেন।

"মনে রেখো মেম্বারদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমাদেরও দুটো ছেলে আছে। ওদের মুখ চেয়ে একাজ আমায় করতেই হবে। আমি মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলব।" তপতীর চোখ জ্বলজ্বলে, কণ্ঠস্বরে আবেগ এবং দৃঢ়তা !

"চাঁদা তুলবে ! কত করে চাঁদা ?"

"দশ টাকা প্রতি ফ্যামিলি। একবারই শুধু দিতে হবে।"

"দঅঅশ টাকা !" তন্ময়ের চোয়াল ঝুলে পড়ল। "জানো, এই দশ টাকায় বারো সের চাল পাওয়া যায়, আড়াই মাস খবরের কাগজ কেনা যায়...।"

"দুটো হরলিক্‌স কেনা যায়, চার সের সর্ষের তেল কেনা যায়, চার সের পাঁঠার মাংস কেনা যায়... তাতে কী হল ?" তপতীর চোখে চ্যালেঞ্জ।

"এত টাকা কি কেউ বাচ্চার খেলার জন্য দেবে ?" তন্ময় স্পষ্টতই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। "প্রাইভেট টিউটর রাখার জন্য টাকা খরচ করতে বললে করবে কিন্তু ছেলে মেয়ের খেলার জন্য... ।" তন্ময় কথা অসম্পূর্ণ রেখে মাথা নাড়লেন।

"এসব হতাশার কথা। আগে সবাইকে বলে তো দেখি।"

"ঠিক আছে, বলে দেখো।" তন্ময়ের মুখ দেখে মনে হল না তিনি হতাশা কাটাতে পেরেছেন।

মিনু-চিনু চুপ করে খেয়ে যাচ্ছিল আর বাবা-মার কথা শুনছিল। এবার মিনু বলল, "মা, আমি টেনিস খেলব ?"

"হ্যাঁ।"

"আর কে খেলবে ?"

"এখানকার সবাই খেলবে।"

চিনু ফিসফিস করে বলল, "মা আমি ?"

"সোমবার তোমার এক্স-রে করার দিন। কলকাতায় ডাক্তারকাকা সেটা দেখবেন। তারপর তিনি যদি খেলতে বলেন তো খেলবে।"

"মা, তুমিও খেলবে ? আগে তো খেলতে !" মিনু বলল।

"হ্যাঁ, আমিও খেলব... যদি দরকার পড়ে।"

"আরে মিসেস বসুমল্লিক ! কী ব্যাপার ?" সুধা ঘোষাল অবাক হয়ে অভ্যর্থনা জানালেন তপতীকে। বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে বললেন, "বসুন, বসুন। অনেকদিন পর এলেন।"

"মাস তিনেক প্রায়। ছোট ছেলের অসুখের জন্য কোথাও আর যেতে পারি না।" চেয়ারে বসলেন তপতী। সুধা ঘোষালের স্বামী এখানকার চিফ লেবার অফিসার। ওঁদের এক ছেলে সুধেন্দু ক্লাস সেভেন-এ পড়ে।

"ছেলে এখন কেমন আছে ?"

"ভাল। অল্প অল্প ছুটছে, কোনও কষ্ট হচ্ছে না।"

"ভোরে তো দেখি দুই ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন, খুব ভাল এটা। আমিও মাঝে মাঝে ভাবি সকালে একটু বেড়াই। কিন্তু মুশকিল কী জানেন, ডান হাঁটুতে একটু বাতের মতো হয়েছে, তা ছাড়া সুধেন্দুকে নিয়ে পড়াতে বসতে হয়। ক্লাস সেভেন থেকে যদি পড়ায় জোর না দেয় তা হলে স্কুল ফাইনালে ভাল রেজাল্ট করবে কী করে ?"

"স্কুল ফাইনালের তো এখনও অনেক দেরি।"

"অনেক দেরি !" সুধা ঘোষাল আর্তনাদ করে উঠলেন। "মাত্র চারটে বছর, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। একে আপনি অনেক দেরি বলছেন ?"

তপতীর মনে হল, সুধা ঘোষাল এমনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে, যেন একটা মানুষকে হঠাৎ বনমানুষে রূপান্তরিত হতে দেখলেন। তিনি অপ্রতিভ বোধ করে সুধা ঘোষালকে তুষ্ট করার জন্য বললেন, "সুধেন্দু তো পড়াশোনায় খুবই ভাল,

অমন ছেলে ক'টা আর হয়, এবারও তো ফার্স্ট হয়ে উঠল।"

"সেটা তো স্কুলের ফার্স্ট, কিন্তু গোটা বাংলার তো নয়! ওর বাবা এম এসসি-তে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিল, আমি বি এ-তে ডিস্টিংশন পেয়েছি। সুধেন্দুকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট তো হতেই হবে। ওর বাবা তো বলে, 'ছেলে বাপকে ছাড়িয়ে না গেলে সে আর ছেলে কীসের?' তবে ছেলেও বাপ-মায়ের মন বোঝে, সবসময় পড়ার বই নিয়ে থাকে।"

"কিন্তু মিসেস ঘোষাল, আপনাদের যেমন ইচ্ছে তেমনি ছেলেরও তো কিছু ইচ্ছে থাকতে পারে।"

"ছেলের ইচ্ছে! সুধেন্দুর? ওর একটাই ইচ্ছে, বাপ-মার মুখ উজ্জ্বল করা, আই এ এস, কি আই পি এস হয়ে সমাজের একজন হওয়া। সেইভাবেই আমরা ওকে তৈরি করতে চাই।"

"ওর বয়স এখন কত, তেরো?"

"হ্যাঁ।"

"এই বয়সের ছেলেদের তো খেলতে ইচ্ছে করে, আর সেইজন্যই আপনার কাছে আসা।" সুধা ঘোষালকে কথা বলার কোনও সুযোগ না দিয়ে তপতী বলে চললেন, "ক্লাবে যে টেনিস কোর্টটা পড়ে আছে সেটাকে সংস্কার করে ছেলে মেয়েদের খেলার ব্যবস্থা করতে চাই, সেজন্য কিছু টাকার দরকার, তাই আপনার কাছে এসেছি যদি দশটা টাকা চাঁদা দেন। সুধেন্দুর বিকেলে একটা কিছু খেলা তো দরকার।" তপতী শেষ বাক্যটির ওপর ভরসা করলেন। ছেলের খেলার একটা ব্যবস্থা হলে কোন মা আর টাকা না দিয়ে থাকতে পারবেন! কিন্তু ফল হল বিপরীত।

"বিকেলে খেলা? ...পাঁচটার সময় সুধেন্দুর ইংলিশ টিউটর আসে। এই তো ভেতরের পড়বার ঘরে ও এখন পড়ছে। সকালে আমি পড়াই, বিকেলে টিউটর, অফিস থেকে ফিরে ওর বাবা ওকে নিয়ে বসেন। ওর খেলার সময় কোথায়? আমরা তো ওকে বারবার বলি জীবনে এখনই পড়ার সময়, যা কিছু জ্ঞান এখনই আহরণ করে নাও, খেলার জন্য পরে অনেক সময় পাবে, ঠিক কি না বলুন?"

তপতী ঢোঁক গিললেন। "বলছিলাম কী, যদি দশটা টাকা চাঁদা—"

"না, না, না, সুধেন্দুকে পড়া ফেলে খেলতে আমরা পাঠাব না। এই দেখুন আপনাকে চা দেওয়া হল না।"

"চা খাব না, আমি এখন উঠি। আরও কয়েকজনের কাছে যেতে হবে।" তপতী চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন।

"তপতীদি, আপনি যা করতে চাইছেন সেটা তো খুবই ভাল। ছেলে মেয়েদের সত্যিই এখানে নিয়মিত খেলার কোনও ব্যবস্থা নেই।" চন্দ্রিমা দত্ত তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে লঘিমাকে কোলের কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে বললেন। "আমি তো সেইজন্যই লঘুকে নাচের স্কুলে ভর্তি করিয়েছি।"

"খুব ভাল করেছ। তবে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজটাও যদি ওই সঙ্গে করে, তা হলে নাচটা আরও ভাল হবে।"

"তা হয়তো হবে। কিন্তু তপতীদি, টেনিস আর নাচ দুটো চালানো ওর পক্ষে অসম্ভব! বাড়িতে রেগুলার নাচের প্র্যাকটিস, তার সঙ্গে টেনিস, এইটুকু বাচ্চা, দেখছেনই তো শরীরের হাল, নিতে পারবে না।"

তপতী বুঝে গেলেন, চন্দ্রিমার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। নিজের ছেলে মেয়েরা না খেললে তারা চাঁদাও দেবে না। তবু তিনি বললেন, "বেশ, লঘু নয় খেলতে পারবে না, কিন্তু অন্য অনেকের ছেলে মেয়ে তো খেলবে, তুমি চাঁদার দশটা টাকা দাও। স্রেফ চ্যারিটি।"

"উনি তো এখন নেই, বাড়ি আসুন, ওঁকে বলব।"

তপতী আর কথা বাড়ালেন না। ধরে নিলেন কিছু পাওয়া যাবে না।

সুভাষ সেন অমায়িক, মার্জিত এবং এম জে টি এম-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার। তপতীর কথা মন দিয়ে শুনে চশমার কাচ রুমালে মুছতে মুছতে বললেন, "মিসেস বসুমল্লিক আপনার উদ্যোগের সঙ্গে আমি শতকরা একশো ভাগ একমত। কিন্তু মুশকিল একটাই, আর দু'মাস পর শঙ্কু শান্তিনিকেতন চলে যাচ্ছে। ওখানে পাঠভবনে পড়বে।"

"তা হলে তো আর কিছু বলার নেই।" তপতী মুখে হাসি টেনে আনলেন। বাংলোর সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছেন, পেছন থেকে ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন সুভাষ সেনের হাতে মানিব্যাগ, তাই থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করেছেন। "এটা নিয়ে যান।"

তপতী বাড়ি ফিরলেন তিরিশ টাকা সংগ্রহ করে। অনিরুদ্ধ আর গৌতমের বাবা-মা খুব উৎসাহিত হয়েই চাঁদা দিয়েছেন। তন্ময় জানালেন কাল সকালে মেশিন শপের একজন যাবে লন-মোয়ারটা নিয়ে আসার জন্য। একদিনেই সম্ভবত সারানো যাবে।

"কিন্তু তিরিশ টাকায় কী হবে?" তন্ময় প্রশ্ন তুললেন।

"বাকিটা আমাদেরই দিতে হবে।" তপতী শান্ত স্বরে স্বামীর চোখে চোখ রেখে বললেন। "আমাদের ছেলেদের মুখ চেয়েই খরচ করতে হবে। একদিন বলেছিলে, ওদের সুস্থ সবল রাখা, ভাল স্বাস্থ্য গড়ে দেওয়ার দায়িত্ব বাবা-মার। এজন্য শেষ কপর্দকটুকুও খরচ করবে।"

"বলেছিলাম।"

"তা হলে অমন চোখ করে তাকিয়ে আছ কেন?

"তাকিয়ে নেই, শুধু ভেবে যাচ্ছি। আমার অফিসের একটা ছেলের বিয়ে, নেমন্তন্ন করেছে। এগারোশো টাকা মাইনে থেকে সংসার খরচ, চিকিৎসা, গাড়ির পেট্রল, মেজ জ্যাঠার বাড়িতেও বিয়ে এই মাসেই। বিয়ের উপহার আর টেনিস কোর্ট— ম্যানেজ করব কী করে?"

"কিছু কিছু খরচ কমিয়ে ম্যানেজ করতে হবে। কমানোর প্রথম ধাপ হোক গাড়ি আর না চড়া। চিনু স্কুলে যায় না, মিনু হেঁটেই যাতায়াত করতে পারবে, আমি সঙ্গে যাব। তুমিও হেঁটে অফিস যাবে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে তাই হাঁটছি।"

"পরশু এক্স-রে করিয়ে চিনুকে কলকাতা নিয়ে যেতে হবে। কীসে যাব, ট্রেনে ?"

"মোটরে। এটা ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হবে।"

পরদিন মিনুকে নিয়ে তপতী বেরোলেন স্কুলে পৌঁছে দিতে। দু'জনের মাথায় দুটো ছাতা। মিনু প্রথমে অবাক হয়েছিল হেঁটে স্কুলে যেতে হবে শুনে। তপতী তাকে বুঝিয়ে বললেন, "আধ মাইল তো রাস্তা, এর জন্য গাড়িতে চড়ার কী দরকার ? তুই তো রোজ এক মাইল হেঁটে ফেরিঘাট যাস আর দৌড়ে ফিরিস। পারবি না স্কুলে হেঁটে যেতে ? অক্ষম তো নোস। তোর বাবা দু'মাইল হেঁটে স্কুলে যেতেন, দু'মাইল হেঁটে ফিরতেন।"

এই শেষ কথাটাতেই কাজ হয়ে গেল। "মা আমি দৌড়ে স্কুলে যাব ?" মিনু টগবগ করে উঠল।

"না, না, অত বাহাদুরিতে কাজ নেই।"

"জানো মা, আমাদের স্কুলের অনেক বড় ছেলে সাইকেলে আসে। আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেবে ?"

"দোব, যখন তুমি বড় ছেলে হবে।"

মিনুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তপতী ক্লাবে গেলেন। কান্তির কাছে শুনলেন, সাহেবের পাঠানো একটা লোক সাইকেল রিকশায় তুলে মোয়ারটা নিয়ে গেছে।

"কিন্তু কান্তি, ঘাস কাটার ব্যবস্থা তো তাড়াতাড়ি করতে হবে। আর কোদালের হাতলের জন্য একটা বাঁশ কিংবা কাঠের ডাণ্ডা দরকার।"

"যে লোকটা দুধ আর ডিম দিয়ে যায় তাকে কালই আমি বলে দিয়েছি। ও থাকে এই মাইল দুয়েক দূরে বল্লভপুরে। বলেছিল আজ সকালে পাঠিয়ে দেবে লোক। তা এখনও তো এল না !" কান্তিকে বিব্রত দেখাল।

"ততক্ষণে একটা কাজ করা যাক। নেট-টা কোথায় আছে দেখো তো।"

"দেখেছি। সেক্রেটারির আপিস ঘরে যে কাঠের আলমারিটা তার পেছনে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। বার করব কী ! যা ধুলো ঝুল ময়লা, হাত দিতে ঘেন্না করে !"

"দেখি তো।" তপতী একাই দেখতে গেলেন অফিস ঘরে।

তপতী আলমারির পেছনে উঁকি দিয়ে দেখলেন। কান্তি মোটেই বাড়িয়ে বলেনি। তালগোল পাকানো নেটটা যেন ধুলোর ঢিপি। তিনি ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে নেটের খানিকটা আঁকড়ে টেনে বার করলেন। সেই সঙ্গে বেরিয়ে এল তাঁত ছেঁড়া একটা র‍্যাকেট, যার হাতলে মুঠো করে ধরার জায়গার কাঠটা ফাটা। এটাও বোধ হয় ক্লাবেরই সম্পত্তি। নেটটাকে ঘর থেকে টানতে টানতে বাইরের লনে এনে ফেললেন। হাঁ হাঁ করে কান্তি ছুটে এল। "আপনি কেন, আপনি কেন... আমাকে

বললেই তো পারতেন।"

"কান্তি তুমি একদিকের দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি আর একদিক ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে এটা খুলব।"

পুরো নেটটা খুলে তপতী হতবাক! অন্তত সাত-আট জায়গায় জালের সুতো ছিঁড়ে গর্ত হয়ে রয়েছে। সুতো কিনে ছেঁড়া গর্ত মেরামত করতে হলে যারা জাল বোনে তাদের কাউকে ডাকতে হবে। তার মানে খরচ! কিন্তু তার আগে নেটটাকে না ধুলে হাতই দেওয়া যাবে না। মহাদেবপুরে পানীয় জল সরবরাহ হয় উঁচু ট্যাঙ্ক থেকে। চব্বিশ ঘণ্টাই জল পাওয়া যায়। নেটটাকে তাঁরা দু'জন জলের কলের নীচে টেনে এনে কল খুলে দিলেন।

"এইভাবে থাকুক ঘণ্টাখানেক। ঝুল কালিটা অন্তত বেরিয়ে যাক।"

ইতিমধ্যে ঘাস কাটার লোক এসে গেছে। বৃদ্ধ এক চাষি। তপতী টেনিস কোর্টটা দেখিয়ে তাকে বললেন, "এই যে জমিটা এরই ঘাস মুড়োতে হবে, কত নেবে?"

চোখমুখ কুঁচকে জমিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, "পাঁচ টাকা দিতে হবে।"

"পাঁ-আ-আচ!" তপতী যতটা বিস্মিত হওয়া দেখানো সম্ভব দেখালেন। "পারব না। ঘণ্টা দুয়েকের কাজ, আর বলছ কিনা পাঁচ টাকা!"

"ঘণ্টা দুয়েকের কাজ নয় মা, খাটুনি আছে। সাড়ে চার টাকা হলে করব।"

শেষ পর্যন্ত রফা হল সাড়ে চার টাকায়। তপতী কিছু পয়সা তো বাঁচালেন। ঘাস কেটে দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলার জন্য ঝুড়ি নেই। কান্তি রান্নাঘরের একটা বালতি এনে দিল। রান্না করে তার নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়। কান্তি সেইদিকে মন দিল। এরমধ্যেই ক্লাবের ক্যান্টিনের রাঁধুনিও এসে গেছে। সেও তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। কল থেকে তোড়ে নেটের ওপর জল পড়ছে। তপতী শাড়িটা একটু তুলে নেটের ওপর দাঁড়িয়ে লেফ্‌ট-রাইট শুরু করলেন। গলগল করে কালো জল বেরোতে লাগল। মিনিট দশেক পর তিনি হাঁফিয়ে উঠে থামলেন। এর পর নেটটাকে টেনে আনলেন ক্লাব লনের ওপর, ছড়িয়ে দিলেন শুকোবার জন্য।

মাথায় গামছা জড়িয়ে, খালি গায়ে বৃদ্ধ উবু হয়ে বসে ঘাস নিড়িয়ে চলেছে। কাটা ঘাস বালতিতে রেখে কিছুক্ষণ পরপর বালতিটা খালি করে আসছে দূরে গিয়ে। ছাতা মাথায় তপতী কোর্টের ধারে একটা চেয়ারে বসে। কান্তি এক কাপ চা নিয়ে এল।

"এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবেন মেমসাব, বাড়ি গিয়ে খাওয়াদাওয়া করবেন না?"

"করব, ঘাসকাটাটা শেষ হোক আগে। না দেখলে তো যা-তা করে কাটবে। আর শোনো, নেটটা শুকিয়ে গেলে ভাঁজ করে পাকিয়ে তুলে রেখো। জালের মোটা সুতো কিনে এনে বুনে নেব।"

"আপনি বুনবেন ? গঙ্গার ধারে ক'ঘর জেলে থাকে, ওদের বললে তো হয় ?"

"লোক দিয়ে করাতে গেলে তো পয়সা লাগবে। কী আর এমন শক্ত কাজ ! আর মাঠের ইট পাথর কাঁকর বাছার জন্য দুটো লোক চাই, জোগাড় করতে পারবে ?"

"সে আর এমন শক্ত কী, আমি এই বুড়োকেই বলে দিচ্ছি।" কান্তি কথাগুলো বলে ঘাসকাটা বৃদ্ধের কাছে গেল। দু-চারটে কথা বলে ফিরে এসে জানাল, "বুড়ো বলল ও নিজেই করবে, নাতনিকে সঙ্গে আনবে। মাটি চেঁছে দেবে, গত্তে মাটি ফেলবে, দশ টাকা নেবে।"

"দঅশ !" তপতী হতাশ হলেন। "এইটুকু কাজ, কোনও খাটুনিই নেই আর বলে কিনা দশ টাকা ! দরকার নেই আমার।"

দুপুর দুটোর সময় ঘাস কাটা শেষ হল। তপতী কোর্টে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। প্রায় একফুট লম্বা ঘাস চার ইঞ্চিতে নামিয়ে দিয়েছে। এরপর মোয়ার চালিয়ে আরও ছাঁটা হবে।

"এ কী ! এখানে ঘাস তো একদমই কাটোনি।" তপতী দাঁড়িয়ে পড়ে আঙুল দেখালেন।

"কাটব কী মা ! ওখানটায় তো মাটি উঁচু হয়ে রয়েছে। জমি সমান করতে গেলে তো আপনাকে মাটি তুলতেই হবে, সেইসঙ্গে ঘাসও।"

কথাটা সত্যি। মাটি তোলার মতো মাটি ফেলতেও হবে, তারপর সমান করা। সমান করতে তো জল ঢেলে মাটি নরম করে রোলার চালাতে হবে। কিন্তু রোলার কোথায় পাবেন ?

"মা, আমার মজুরিটা দিয়ে দেন," বৃদ্ধ গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "জমিতে ঢেলা বাছাইয়ের কাজ করাবেন তো কাল আসব।"

"দশ টাকা দিতে পারব না।"

"মা, ঘাসকাটার থেকেও এ কাজে খাটুনি বেশি। দেখছেন তো রোদ্দুর কেমন। দু'দিন তো লাগবেই।"

রোদে পোড়া বৃদ্ধের মুখ আর সারা দেহ দেখে তপতীর মায়া হল। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, কাল সকাল সকাল এসো।"

এবার তপতীর হুঁশ হল এখন তাকে বাড়ি যেতে হবে। বৃদ্ধকে টাকা দিয়ে, কান্তিকে নেটটা গুটিয়ে তুলে রাখতে বলে বাড়ির দিকে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। পঞ্চাশ গজ হেঁটেই থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে এলেন।

"কান্তি, ওই যে ভাঙা র‍্যাকেটটা দেখলাম ওটা এনে দাও তো। দেখি সারানো যায় কি না।"

র‍্যাকেটটা নিয়ে ছাতা মাথায় বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে তপতীর মনে হল এইমাত্র যেন টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের খেলা জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন। এর পর আছে তৃতীয় রাউন্ড, চতুর্থ রাউন্ড...। এতক্ষণে তপতী অনুভব করলেন তাঁর ভীষণ খিদে পেয়েছে।

সন্ধ্যায় তপতী আজকের অভিজ্ঞতা তন্ময়কে জানিয়ে বললেন, "এখন দরকার জালের জন্য মোটা সুতো আর জমিটাকে সমান করা। এখানকার বাজারে সুতোটা যদি না পাওয়া যায় তা হলে কলকাতা থেকে তোমায় কিন্তু আনিয়ে দিতে হবে, সেইসঙ্গে দুটো টেনিস বলও। আর জমি লেভেল করার জন্য তোমাদের একটা রোলার যদি পাঠিয়ে দাও।"

"দোব। কাল চিনুকে নিয়ে কলকাতা যাব, তোমার যা যা দরকার তার একটা লিস্ট করে ফেলো। যে র‍্যাকেটটা এনেছ তাতে তাঁত বাঁধাতে কোন দোকানে যেতে হবে সেটাই তো জানি না।" তন্ময়ের হঠাৎই এই সময় মনে পড়ে গেল একটা কথা। "আচ্ছা, তোমার একটা র‍্যাকেট মনে হচ্ছে যেন আলমারিতে তোলা আছে দেখেছি!"

তপতীকে সচকিত দেখাল। তিনি ভুলেই গেছলেন ওটার কথা। বিয়ের দু' বছর পর একবার বাপের বাড়ি থেকে ফেরার সময় তাঁর দাদা র‍্যাকেটটা হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "মিছিমিছি এটা এখানে পড়ে আছে, তুই বরং সঙ্গে নিয়ে যা। যদি খেলার সুযোগ টুযোগ পাস তো দরকারে লাগবে।" র‍্যাকেটটা আলমারির ওপর তাকে জামাকাপড়ের তলায় সেই যে ঢুকেছে গত আট বছরে একবারও আর বেরোয়নি।

তপতী আলমারি খুলে জামাকাপড়ের স্তূপের তলা থেকে র‍্যাকেটটা বার করলেন। আট বছর আগের অবস্থাতেই রয়েছে। র‍্যাকেটের গায়ে সোনালি অক্ষরে 'ডানলপ' লেখাটা নতুনের মতোই ঝকঝকে। মুঠোয় ধরতেই অদ্ভুত একটা শিহরণ তিনি বোধ করলেন। তেরো বছর আগে পা ভাঙার পর আর খেলেননি। বাঁ হাতের তালুতে র‍্যাকেটের মাঝখানের তাঁত দিয়ে তিন-চারবার আঘাত করলেন পুরনো অভ্যাসবশে। এভাবে ঘা দিলে টানটান করে বাঁধা তাঁতে 'পিং' করে আওয়াজ ওঠে। আওয়াজটা শুনতে তাঁর ভাল লাগত। কিন্তু এখন আওয়াজের বদলে তিন-চারটে তাঁত ছিঁড়ে গেল। তিনি অপ্রতিভ হয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন।

"ছিঁড়ে তো যাবেই। গোরু কি মোষের নাড়িভুঁড়ি দিয়ে তৈরি তাঁত এত বছর পরও কি পচবে না? ভালই হল দুটো র‍্যাকেটই নিয়ে যাব, কিন্তু কোথায় এসব বাঁধায় তা তো জানি না।"

তপতী কয়েক সেকেন্ড ভেবে বললেন, "এ ব্যাপারে সেরা লোক রাজেন ঠাকুরপো। টেনিস খেলেছে, এখনও অভ্যাসটা ছাড়েনি। নিশ্চয় ও জানে কোথায় তাঁত বাঁধানো হয়।"

তন্ময় ঘড়ি দেখে বললেন, "এখনি চলো।"

দু'জনের হাতে দুটো র‍্যাকেট, একটায় তাঁত নেই, রাজেন তো অবাক! "কী ব্যাপার দাদা, খেলতে যাচ্ছেন কোথাও?"

"এই র‍্যাকেট নিয়ে খেলতে যাওয়া? ঠাট্টা হচ্ছে?" তন্ময় চেয়ারে বসলেন। "তোমার বউদি তো টেনিস কোর্ট করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আজ ঘাস

ছাঁটিয়েছে। নেটটা বার করে দেখে তাতে বড় বড়ছিদ্র, হাতি না হোক বেড়াল গলে যেতে পারে। সেটা সারাবার জন্য সুতো আনার হুকুম হয়েছে। উনি নিজে বসে বসে ছিদ্র বন্ধ করবেন। তারপর ইট পাথর বাছাই। পয়সা বাঁচাতে সেটাও বোধ হয় উনি নিজে করবেন। জমি লেভেলিং করার জন্য রোলার টানানোর অর্ডারও হয়েছে।"

"উরিব্বাস।" রাজেন চেয়ারের ওপর উবু হয়ে বসল। "করেছেন কী! আপনি তো দেখছি যা ভাবেন তাই করেন।"

"তা করতেই হয়। এখানে এত শিক্ষিত লোক, সবাই ভাল চাকরিও করেন কিন্তু নিজেদের সন্তানদের জন্য ঠিকভাবে চিন্তা করেন না। আমার সন্দেহ হয় ছেলেমেয়েদের যথার্থই ওঁরা ভালবাসেন কি না। কিন্তু আমার সন্তানদের আমি ভালবাসি— অন্যদেরও।" বলে তপতী তাঁর চাঁদা তোলার অভিজ্ঞতার কথা রাজেনকে বললেন।

"কিন্তু শুধু চাঁদা দিলেই তো টেনিস খেলা যায় না, বউদি নিজের র‍্যাকেটও থাকা দরকার। বাচ্চার বাবারা কি সেটা কিনে দেবে?... তবে দিক বা না দিক আমি দুটো র‍্যাকেট ডোনেট করব। ওদের জন্য দরকার হালকা ছোট মাপের র‍্যাকেট।"

"তা হলে আমাদের এই দুটোরও ব্যবস্থা করে দাও রাজেন।"

রাজেন ক্লাবের র‍্যাকেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, "এটার যা অবস্থা, উনুনে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।" তারপর দ্বিতীয় র‍্যাকেটটা তুলে "ওরে বাবা এটা তো দেখছি ডানলপ! পেলেন কোথায়?"

"তোমার বউদির..... এক সময় খেলত। ইলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়ানও হয়েছিল।"

রাজেনের বিস্ফারিত চোখ দুটি তপতীকে লজ্জায় ফেলে দিল। পা নামিয়ে বসে রাজেন সিরিয়াস গলায় বলল, "এবার বুঝলাম কেন আপনি টেনিস চালু করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। নিজে খেলাধুলো না করলে কেউ খেলার মর্ম বোঝে না। কথা দিচ্ছি সাধ্যে যতটা কুলোয় আপনাকে আমি সাহায্য করব।"

"তা হলে কোর্টটা যাতে ভালভাবে তৈরি করা যায় সেই ব্যাপারে পরামর্শ দিন।" তপতী সাগ্রহে বললেন।

"বউদি, এখানে খেলবে সেইসব বাচ্চা, যারা জীবনে কখনও র‍্যাকেট ধরেনি। ওদের জন্য উইম্বলডনের কি সাউথ ক্লাবের মতো সারফেস এখনই দরকার নেই। বলটাকে নেটের এপার ওপার করাটাই আগে শিখুক, র‍্যাকেটের সঙ্গে বলের সম্পর্কটা আগে গড়ে তুলুক, তারপর গ্রাউণ্ড স্ট্রোক শিখবে। নেটে বড় বড় ছ্যাঁদা থাকলেও কিছু আসে-যায় না। আপনি মাঠটাকে সমান করে দিন তারপর আমি মাপজোক করে চুনের দাগ কেটে দেব। সাউথ ক্লাবে পুরনো বল পাওয়া যাবে, এনে দেব। আপনার প্রধান যেটা দরকার সেটা হল খেলার লোক। খেলার জন্য দু'জনের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন আর আপনার বড় ছেলে, মোট তিনজন।"

"চারজন। আমার ছোট ছেলের কথাটা ঠাকুরপো ভুলে যাচ্ছেন। আসলে সবাই চিনুকে ভুলে যায় ওর রুগ্‌ণ দুর্বল শরীরের জন্য। শরীরটা তৈরি করানোর জন্যও ওকে খেলায় আনব।" তপতীর স্বরে ফুটে উঠল প্রত্যয় আর জেদ। "একবার যখন ঠিক করে নিয়েছি কী করতে চাই, তখন যত পরিশ্রমই হোক, যত অর্থকষ্টই হোক কাজটা আমরা করবই।"

তপতী কথাটা বলে তন্ময়ের দিকে তাকালেন। সায় জানিয়ে তন্ময় মাথা নাড়লেন।

রাজেন অস্ফুটে বলল, "অদ্ভুত আপনারা!"

॥ ৪ ॥

সকালে তপতী মিনুকে পৌঁছে দিয়ে হেডমিস্ট্রেস জয়ন্তী বসুর সঙ্গে দেখা করলেন।

"চিন্ময় তো ক্লাস করতে পারছে না, পড়াশুনোয় পিছিয়ে পড়ছে। আমি অবশ্য রোজ সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে পড়াতে বসি। তা হলেও যেভাবে লেসন্‌গুলো স্কুলে করানো হচ্ছে সেটা ফলো করা দরকার। বাড়িতে আমার পড়ানো আর স্কুলের পড়ানো একই হওয়া উচিত। তাই বলছিলাম কী, আমি যদি ক্লাসে বসে নোট নিই, তা হলে কি আপনার আপত্তি হবে? আপত্তি না থাকলে যদি অনুমতি দেন।" তপতী আবেদন জানালেন।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপত্তি হবে কেন। তবে ক্লাস ওয়ানে এমন কিছু পড়া হয় না যে, আপনাকে নোট নিতে হবে। যাই হোক আপনি চলুন এখন মিসেস বসাক ইংলিশ ক্লাস নিচ্ছেন, আপনাকে ক্লাসে বসিয়ে দিয়ে আসি।" জয়ন্তী বসু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, "চিন্ময় এখন আছে কেমন?"

"ভালই। আজ ডাক্তার ওর এক্স-রে দেখে জানাবেন সেরে উঠেছে কি না।"

"কমপ্লিটলি সেরে উঠলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে ওকে স্কুলে পাঠাবেন। বুঝলেন তো অনেক গার্জিয়ান আবার খুব খুঁতখুঁতে হন। মিসেস বসুমল্লিক আপনার বড় ছেলেটি কিন্তু দারুণ অ্যাথলিট, পড়াশুনাতেও তেমনই ভাল।"

"হুঁ" বলা ছাড়া তপতী কোনও উত্তর দেননি। 'খুঁতখুঁতে' শব্দটিকে তিনি প্রসন্ন মনে নিতে পারেননি। সংক্রামক বিপজ্জনক রোগ কি শুধু তাঁর ছেলেরই হল? কত তো ছেলেমেয়ে রোগজীবাণু শরীরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সবাইকে যদি পরীক্ষা করা যেত!

পরপর দুটি ক্লাসে পেছনের বেঞ্চে বসে তিনি পড়া বুঝে নিলেন। তাঁর মনে হল বাড়িতে তিনি চিনুকে যা পড়ান তার থেকে স্কুলের পড়া অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এখানে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে পড়ায়, তাই গতিটা প্রথম দিকে মন্থরই হয়, এটা তপতী জানেন। এখন তাঁর মনে হচ্ছে, চিনুকে তিনি একটু বেশিই এগিয়ে দিয়েছেন, এটা ভাল না মন্দ হচ্ছে তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

ক্লাবের কাছাকাছি এসে দেখলেন, সেই বুড়ো আর একটা বছর দশেকের মেয়ে কোর্টের এক প্রান্তে উবু হয়ে বসে। তাদের সামনে বালতিটা। কান্তি জানাল, ঘণ্টাখানেক হল ওরা এসে কাজ শুরু করেছে। তপতী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের দেখলেন। দু'জনে ইট-পাথর বাছাই করে জড়ো করছে নিজেদের পাশে, পরে মেয়েটি দু' হাতে সেগুলো তুলে বালতিতে ফেলছে। বালতি ভরে গেলে বুড়ো ফেলে দিয়ে আসছে কোর্টের অন্তত তিরিশ হাত দূরে।

তপতীর মনে হল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকার চেয়ে যদি তিনি নিজেও হাত লাগান তা হলে কাজগুলো এগিয়ে থাকবে, সময়ও বাঁচবে। কী কাজ করা যায় ? সুতো থাকলে জালটার ফুটোগুলো বোনার কাজ করতে পারতেন। রাজেন ঠাকুরপো অবশ্য বলেছেন, ফুটোগুলো এখন তেমন অসুবিধে করবে না। কোর্টটার মাঝে উঁচু একটা বাধা তুলে দু'ভাগ করা, আপাতত এটাই হবে নেটের কাজ। বাচ্চারা এখন প্রচণ্ড জোরে বল হিট করবে না। লন-মোয়ারটা যদি মেরামত করে দিয়ে যেত তা হলে সেটা দিয়ে ঘাস ছাঁটার কাজ শুরু করে দিতে পারতেন। কিন্তু মোয়ারটা এখনও ফেরত আসেনি।

কান্তি থলি হাতে কোথায় যেন বেরোচ্ছিল। তপতীকে দেখে বলল, "মেমসাব, কোদালের বাঁশটা খুঁজে পেয়েছি। দোকানে যাচ্ছি। এসে লাগিয়ে দেব।"

তপতীর নজরে পড়ল, কোর্টের অসমান জায়গাগুলো। কোদাল দিয়ে তো সমান করে ফেলার কাজটা করা যায় ! যেমন ভাবা তেমনই শুরু করে দেওয়া। ভেতরে গিয়ে কোদালটায় বাঁশের হাতল লাগাবার চেষ্টা শুরু করলেন। বাঁশটা একটু সরু, কোদালে লাগালে ঢলঢল করছে। একটা কাঠের গোঁজ দিলে টাইট হবে। তিনি রান্নার জায়গা থেকে চ্যালাকাঠের একটা টুকরো সংগ্রহ করে এনে সেটা কোদালে গুঁজলেন হাতলের সঙ্গে। একটা আধলা ইট দিয়ে ঘা মেরে মেরে কাঠটাকে বসালেন। হাতল ধরে কোদালটা নাড়িয়ে পরীক্ষা করলেন, টাইট হয়ে বসেছে কি না। মনে হল এবার ব্যবহার করা যাবে। তাঁর মুখে সাফল্যের হাসি ফুটল।

কোর্টের যে জায়গাটা উঁচু বেশি, তপতী সেটাকেই প্রথম লক্ষ্যবস্তু করলেন। ঘাসের নীচে কয়েকটা ইটের মাথা জেগে রয়েছে। মাটির নীচে ইটের অনেকটাই গাঁথা। তপতী একটু ঝুঁকে কোদালটা খানিকটা তুলে জমিতে ঘা দিতেই 'ঠক' আওয়াজ হল। শক্ত করে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, ঠোঁট চেপে মনে মনে বললেন, 'দেখাচ্ছি মজা, সবক'টাকে তুলব।'

প্রথমে তিনি কোদাল দিয়ে ঘাস চেঁছে জমির অনেকটা পরিষ্কার করলেন। গোটাপাঁচেক ইট, ভাঙা ভাঁড় মাটিতে গাঁথা। তপতী আড়চোখে দেখলেন, কাজ ফেলে বুড়ো আর নাতনি তাঁর দিকে তাকিয়ে অবাক চোখে। 'দেখবেই তো, ওদের ধারণা এসব মেহনতের কাজ শুধু ওরাই পারে ... ফুঃ, করে দেখিয়ে দিচ্ছি।' মনে মনে কথাগুলো বলে কোদালটা মাথার ওপর তুলে বড় একটা ইটের মাথা লক্ষ্য করে সজোরে কোদাল নামালেন। কোদালটার ধারালো দিকটা শক্ত ইটের ওপর

পড়ে ছিটকে এসে তপতীর বাঁ পায়ের গোছের কাছে আঘাত করল জোরে। হাত থেকে কোদালটা পড়ে গেল।

তপতী কয়েক সেকেন্ড বিমূঢ় হয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে শাড়ির প্রান্ত খানিকটা তুলে পায়ের দিকে তাকিয়েই তাঁর মাথা ঘুরে গেল। প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়ে পায়ের মাংস চেরা আর তার মধ্য থেকে উঁকি দিচ্ছে সাদা হাড়। মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোলেন ক্লাবঘরের দিকে। বৃদ্ধ আর নাতনি তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়েই ছুটে এল।

"হাসপাতাল যাব। তার আগে এটা ভাল করে বাঁধতে হবে, দেখছ কী রক্ত পড়ছে!"

"হাসপাতাল তো অনেকটা রাস্তা, যাবেন কী করে মা?" বৃদ্ধ বিশাল সমস্যার সামনে পড়ে গেল। "এটা বাঁধার কাপড়ই বা এখানে পাব কোথায়?"

"দাদু, একটা গামছা শুকোচ্ছে।"

"না, না, না।" তপতী আঁতকে উঠলেন। "আমার শাড়ির আঁচলটা থেকে বরং ছিঁড়ে বেঁধে নিচ্ছি।"

বৃদ্ধ নাতনিকে বলল, "খানিকটা ঘাস চিবিয়ে জায়গাটায় চেপে ধর।" নাতনি ছুটে গিয়ে এক মুঠো ঘাস ছিঁড়ে মুখে পুরল।

তপতী বারণ করতে গিয়েও করলেন না। তিনি শুনেছেন, এইসব টোটকা চিকিৎসা খুব কাজ দেয়। মেয়েটি চিবোনো ঘাস তাঁর থেঁতলানো কাটা জায়গায় চেপে বসিয়ে দিল। তপতী শাড়িটা ছিঁড়লেন।

এইসময় দূরে দেখা গেল একটি ছেলে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। হ্যান্ডেলে ঝুলছে স্কুলব্যাগ, "খুকি, দৌড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাক তো ছেলেটাকে।"

বৃদ্ধের নাতনি চিৎকার করতে করতে ছুটল। "অ্যাই সাইকেল, অ্যাই সাইকেল...।"

ছেলেটি সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। সেই সময় বৃদ্ধ তপতীকে বোঝাচ্ছিল, "মা, যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। ... আপনি কেন মিছিমিছি কোদাল ধরতে গেলেন? আমাদের পয়সা দিতে তো আপনাদের কষ্ট লাগে, দর কষাকষি করে পয়সা কমান। ... আমাকে বললে তো পারতেন, আমি করে দিতুম, তা হলে এই কাণ্ডটা ঘটত না।"

"তা হলে তো আবার টাকা চাইতে।" কাপড়ের পটি পায়ে জড়াতে জড়াতে তপতী বললেন।

"তা তো চাইতুমই।"

"আমার পুঁজি তিরিশ টাকা আর আমার চাঁদা দশ টাকা মোট চল্লিশ টাকা, ..." তপতীর কথার মধ্যেই ছেলেটি এসে পড়ল।

"কী হয়েছে আপনার? মেয়েটা বলল পা নাকি দু-আধখানা হয়ে গেছে!" কিশোর ছেলেটির চোখে মুখে উৎকণ্ঠা।

"হতে পারত বাবা, কপালজোরে বেঁচে গেছি। আমাকে এখনই হাসপাতাল

যেতে হবে।" পটিতে একটা গিট দিলেন তপতী। "তুমি কি মহাদেব হাই স্কুলে পড়ো ?"

"হ্যাঁ, ক্লাস টেন-এ। আপনি আমার সাইকেলের পেছনে বসবেন ? তা হলে আমি সাইকেলটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিয়ে যেতুম। ... মাসিমা, আপনাকে আমি স্কুলের স্পোর্টসে দেখেছি। আপনার ছেলে তো অনেক প্রাইজ পেল ! ... সাতটা, তাই না ?"

"হ্যাঁ, মৃন্ময়, ক্লাস থ্রিতে পড়ে।" যন্ত্রণা হচ্ছে, তার মধ্যেই তিনি আরাম পেলেন 'অনেক প্রাইজ পেল' শুনে। পড়ায় ফার্স্ট হলে মিনু কি এমন বিখ্যাত হত ?

তপতীকে সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে উঠে বসতে সাহায্য করল ছেলেটি এবং বৃদ্ধ। দু'জনে সাইকেলের দু'দিকের হ্যান্ডেল ধরে সন্তর্পণে হাঁটতে শুরু করল। মিনিট পাঁচেক পরই থলি হাতে কান্তিকে দেখা গেল বাজার থেকে ফিরতে। চোখ কপালে তুলে ঘটনার কথা শুনে কান্তি বৃদ্ধকে বলল, "তোমাকে আর হাসপাতাল যেতে হবে না, আমি সাইকেল ধরছি। থলিটা নিয়ে যাও আর গিয়ে কাজে লেগে পড়ো।"

সাইকেল এবার ধরল ছেলেটি আর কান্তি। কয়েক গজ এগোবার পর তপতী ব্যস্ত হয়ে বললেন, "থামো, থামো, কান্তি, বুড়োকে জিজ্ঞেস করে এসো তো কোর্টটা সমান করে দিতে কত টাকা নেবে ?"

কান্তি ছুটে গিয়ে বৃদ্ধকে ধরল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল। "মেমসাব, বলল পাঁচ টাকা, দরাদরি চলবে না।"

"পাঁ-আ-আচ টাকা ! বুড়োটা আমাকে মেরে ফেলবে কান্তি, ফতুর করে দেবে। চার টাকায় হয় না ?"

"মনে তো হল, এক পয়সাও কমাবে না। বলল, মায়ের পা কেটেছে বলে পাঁচ টাকা, নয়তো ছ'টাকা চাইত।"

"কিন্তু টাকাটা তো আমার নিজের নয়, চাঁদার টাকা, পাঁচজনের টাকা। আমার তো অধিকার নেই নয়ছয় করে খরচ করার।" তপতী করুণ মুখে বললেন।

"মেমসাব, আপনার কী অত মাথাব্যথা খরচ বাঁচাবার ! আমি বলে আসছি বুড়োকে, পাঁচ টাকাই পাবে।" কথাটা বলেই কান্তি উত্তরের অপেক্ষা না করে বৃদ্ধকে ধরার জন্য দৌড়ল।

ওরা যখন হাসপাতালে পৌঁছেছে, তন্ময় তখন চিনুকে এক্স-রে করিয়ে বেরোচ্ছেন। দ্রুত এমার্জেন্সিতে ভর্তি হলেন তপতী। তাঁর পায়ে আঠারোটা সেলাই হল এবং পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হল একটি কেবিনে।

"অতি অবশ্যই আজ চিনুকে নিয়ে কলকাতায় যাবে।" তন্ময়কে এই নির্দেশ দিয়ে চোখ বন্ধ করে তপতী ঘোষণা করলেন, "না গেলে আমি মরে যাব।"

"উতলা হচ্ছ কেন, আমি অপূর্বর কাছে আজই যাব।" উদ্বিগ্ন তন্ময় নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করলেন তপতীকে।

"সুতো আনবে। লন-মোয়ারটা আজ এসে পৌঁছয়নি। কালই যাতে আসে

একটু দেখো। মিনুকে যদি পারো স্কুলে পৌঁছে দিয়ো আর বাড়ি এনো, গাড়ি করেই। এটা ব্যতিক্রম বলে ধরতে হবে। ... যে বুড়োটা কাজ করছে তাকে টাকা দেওয়া হয়নি। দশটা টাকা এক্ষুনি কান্তির হাতে দিয়ে এসো, বেচারা গরিব মানুষ। আমি দিনকয়েক বোধ হয় হাঁটাচলা করতে পারব না। আজই আমি বাড়ি যাব।"

ডাক্তার রাজি হলেন না। আঘাতটা মোটেই হালকা ধরনের নয়। অন্তত তিনদিন তপতীকে পর্যবেক্ষণে থাকতেই হবে। তন্ময়ও ডাক্তারের সঙ্গে একমত। গম্ভীর স্বরে স্ত্রীকে তিনি শুধু বললেন, "ডাক্তারবাবুর কথার ওপর আর একটা কথাও নয়।" কথা শেষ করেই তিনি কেবিন থেকে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

তন্ময় কেবিনে আবার ঢুকলেন রাত আটটা নাগাদ, সঙ্গে দুই ছেলে। চোখ-মুখ উদ্ভাসিত, হাতে এক্স-রে প্লেটের খাম, কলকাতা থেকে গাড়ি চালিয়ে সোজা হাসপাতালে এসেছেন। "চিনু কিওর্‌ড ... চিনু সেরে গেছে!" তন্ময় দু' হাত তুলে ঝাঁকালেন।

ধড়মড় করে তপতী খাটে উঠে বসলেন এবং ফ্যালফ্যাল করে চিনুর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। লাজুক মুখে চিনু মা'র দিকে এগিয়ে গেল। দু' হাতে ছেলেকে বুকে চেপে, চুম্বনে-চুম্বনে, মুখ ভরিয়ে দিয়ে তপতী বললেন, "আমাদের একটা দুশ্চিন্তা দূর হল, এবার টেনিস খেলাটা শুরু করতে পারলেই হয়।" দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি ভগবানকে প্রণাম জানালেন।

গলাখাঁকারি দিয়ে তন্ময় বললেন, "এখনও কিন্তু চিনু কমপ্লিটলি সেরে ওঠেনি। লাংয়ের ওপর স্পটটা প্রায় মিলিয়ে এসেছে, সেরে উঠেছেই বলা যায়, তবে ওষুধপত্তর আরও তিন মাস চালিয়ে যেতে বলল অপূর্ব।"

"তিনটে মাস তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।" তপতী চিনুর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

কিন্তু তিনটে মাস তপতীর পক্ষে দেখতে দেখতে কাটল না। তাঁর ক্ষতটা তিনদিনের মধ্যেই বিশ্রী দিকে মোড় নিল। পায়ের মাংস, হাড়, স্নায়ু, শিরা, সব মিলিয়ে জখমের জের মারাত্মক হয়ে উঠল। ইঞ্জেকশনে ঝাঁঝরা হলেন, মুঠো মুঠো ওষুধের ট্যাবলেট গিলতে হল এবং বাড়ি ফিরলেন পাঁচ সপ্তাহ পর। তাঁর উঠে দাঁড়াতে সময় লাগল আরও দু' সপ্তাহ। ততদিন সংসার চালিয়েছে বেলা। আর দুই ছেলেকে দু' হাতে আগলে রেখেছিলেন তন্ময়।

এই সময় প্রায় প্রতিদিনই রাজেন এসে দেখা করে যেত তপতীর সঙ্গে। কোর্ট তৈরি করার দায়িত্ব রাজেন নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে এতদিনে প্রায় শেষ করে এনেছে, তাকে সহযোগিতা করেছে কান্তি। বুড়ো আর তার নাতনি ইট, পাথর, কাঁকর বেছে, জমি সমান করে দেয় মাটি ফেলে। লন-মোয়ার চালিয়ে কান্তি ঘাস ছেঁটে এক ইঞ্চি করে দিয়েছে। বহু জায়গায় জমিতে টাক দেখা দেয়, সেইসব

জায়গায় নতুন করে ঘাস লাগানো হয়েছে। কোর্ট মেপে দড়ি বেঁধে সেই দড়ি বরাবর চুনগোলা দিয়ে লাইনগুলো টানার কাজও শেষ। নেটের ফুটোগুলো কান্তি লোক ধরে এনে সারিয়ে ফেলেছে। নিয়মিত জল দিয়ে জমি ভেজানো হয়। ক্লাবে যারাই আসে তকতকে সবুজ ঘাসে ঢাকা কোর্টটার দিকে প্রশংসাভরা চোখে তাকায়।

"কবে খেলা শুরু হবে রাজেন ?" তন্ময় একদিন জানতে চাইলেন।

"বউদি সেরে উঠলে। উনি প্রথম সার্ভিস করে এই কোর্ট ওপেন করবেন। তার আগে এখানে কোনও খেলা হতে পারে না।"

অনিরুদ্ধ আর গৌতম, যাদের বাবা চাঁদা দিয়েছেন, তারা প্রায়ই উঁকি দিয়ে দেখে যায় তাদের তপতী কাকিমাকে। খেলার জন্য তারা অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তপতীর র‍্যাকেটের তাঁত বাঁধিয়ে দিয়ে গেছে রাজেন, সেইসঙ্গে ছোট দুটি নতুন র‍্যাকেট আর কয়েকটা পুরনো বল !

তপতী সবকিছুই শোনেন বিছানা থেকে। এমনকী, বিকেলে খাওয়ার ঘরের দেওয়ালে লাগা টেনিস বলের শব্দ আর সেইসঙ্গে বেলার শাসানি। "জিনিসপত্তর ভাঙলে কিন্তু দু'জনের ব্যাট-বল উনুনে দিয়ে দেব।"

"বেলামাসি, ব্যাট নয় র‍্যাকেট।" মিনুর গলা।

"ওই হল।"

মিনু দাবা খেলতে আর যায় না। এখন স্কুল থেকে ফিরেই তার নতুন নেশা র‍্যাকেট আর বল। আলমারির কাচ ভাঙা। আর দেওয়ালে বলের ছোপ ধরানোর পর এখন সে বাড়ির বাইরে গিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে খেলে। চিনু স্কুলে যাচ্ছে না এখনও। তার কাজ বসে বসে দাদার খেলা দেখা। সে যথেষ্ট জোর দিয়ে মুঠোয় র‍্যাকেট ধরতে পারে না, কয়েকবার বল মারার জন্য চালালেই হাত ভার হয়ে যায়।

"মা, ফোরহ্যান্ড তো এইভাবে মারে।" মিনু শোওয়ার ঘরে একটা কাল্পনিক বলের দিকে র‍্যাকেট চালাল।

"হ্যাঁ, কে শেখাল ?" বালিশে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে তপতী খাটের ওপর। মিনুর উৎসাহ তাঁকে তাজা করে তুলল।

"রাজেনকাকা দেখিয়ে দিয়েছে। ... সার্ভিস করা দেখবে মা ?"

"ঘরের মধ্যে সার্ভিস-ফোরহ্যান্ড কিচ্ছু নয়। সবকিছু বাড়ির বাইরে।"

"তুমি কবে সেরে উঠবে মা ?"

তপতীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি তাঁকে সেরে উঠতেই হবে। ডাক্তার বলেছেন, দিন সাতেকের মধ্যেই শোওয়ার ঘর থেকে বসার ঘর পর্যন্ত হাঁটার অনুমতি দেবেন।

অবশেষে তিনি এক বিকেলে হাঁটলেন দুই ছেলের কাঁধে হাত রেখে। এক-পা এক-পা করে বসার ঘরে পৌঁছতেই হাততালি দিয়ে উঠল মিনু আর চিনু। দু'হাত তুলে তপতী মুঠো ঝাঁকালেন। "পেরেছি।" কথাটা দুই ছেলের মাথার মধ্যে ঢুকে গেল মায়ের দুই হাত তোলা ছবিটাকে সঙ্গে নিয়ে।

কোর্টের উদ্বোধনের জন্য ঠিক হল রবিবারের বিকেল। তন্ময়, রাজেন আর শুভা শনিবার সন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়ে টেব্‌ল ঘুরে-ঘুরে সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানাল। নোটিশ বোর্ডেও একটা বিজ্ঞপ্তি শুভা সেঁটে দিল। প্রত্যেকেই তাঁরা আসবেন। প্রতিভা মজুমদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন তপতী সম্পর্কে। "দেখাল বটে তপতী ! একা মেয়েমানুষ সাহস করে শুরু করেছিল বলেই তো আজ ছেলেমেয়েদের জন্য একটা খেলার ব্যবস্থা হল। তার ওপর ভাবো কী ঝঞ্ঝাটই না পোয়াতে হল, প্রথমে ছোট ছেলেটা, তারপর নিজে পড়ল বিছানায়। অবশ্য রাজেন আর তন্ময়বাবু যে পরিশ্রম করে শেষ করলেন, সেটাও বলতে হবে।"

আর-একজন বললেন, "কত খরচ হল বলুন তো ? ক্লাব থেকে একটা পয়সাও তো দেওয়া হয়নি !"

"আচ্ছা, টেনিস তো খেলা হবে, কিন্তু খেলাটা তো শিখতে হবে, নাকি ছেলেমেয়েরা আপনাআপনিই শিখে যাবে ?"

"তা বটে ! মিসেস ঘোষাল তো মোক্ষম প্রশ্ন করেছেন !" প্রতিভা ঝুঁকে বসলেন। "খেলা শেখাতে তো মাস্টার লাগবে।"

"মাস্টার নয়, মাস্টার নয়, কোচ লাগবে বলুন।" শুধরে দিলেন চন্দ্রিমা দত্ত।

"ওই হল। তা বাপু কোচ কোত্থেকে আসবে ? তাকে তো পয়সা দিতে হবে।"

"কেন, মিসেস বসুমল্লিক নিজেই কোচিং করবেন। শুনেছি তো একসময় খেলতেন-টেলতেন, অনেক কাপ-মেডেলও পেয়েছেন।"

"আরে রাখো তো তোমার কাপ-মেডেল, অমন কাপ-মেডেল অনেকের ঘরেই পাবে।" প্রতিভা চাপা ধমক দিলেন। "একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে সেটা কি লক্ষ করেছ ? বিয়ের আগে একটা পা ভেঙেছিল, এবার আর-একটা পা-ও গেছে। ও শেখাবে খেলা !"

"প্রতিভাদি, কাল আসছেন তো ?"

"কাল তো রোববার। কখন লোকজন এসে পড়ে তার কি ঠিক আছে ?"

"যা বলেছেন। আমাকেও কাল দিদির বাড়ি যেতে হবে।" মিসেস ঘোষাল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

পরদিন বিকেল পাঁচটায় ভক্সহল থেকে ওঁরা নামলেন ক্লাবের সামনে। তন্ময়ের হাত ধরে তপতী গাড়ির বাইরে পা রেখেই টলে পড়েছিলেন। মিনু তাড়াতাড়ি মায়ের হাত চেপে ধরল।

"আমি ঠিক আছি মিনু ... হাত ছেড়ে দে।"

রাজেন এগিয়ে এল, সঙ্গে শুভা। কোর্টের ধারে একটা টেব্‌ল। তাতে রাখা হয়েছে দুটো র‍্যাকেট আর দুটো বল। চেয়ারে বসে আছেন ছ'-সাতজন। নেট খাটানো রয়েছে। চুনের দাগ দুপুরে টানা হয়েছে। শুভা হাত ধরে এনে তপতীকে টেব্‌লের পেছনে একটা চেয়ারে বসিয়ে বলল, "বউদি আপনার র‍্যাকেট কই ?"

"গাড়িতে আছে।"

তপতী আজই প্রথম দেখলেন তাঁর বহু কাঙ্ক্ষিত টেনিস কোর্টটিকে। তাঁর মুখ প্রসন্নতায় ভরে উঠল। গৌতম, অনিরুদ্ধর হাফশার্ট, শর্ট্স, মোজা, কেড্স মিনুর মতোই সাদা। ওদের বাবা ও মায়েরাও এসেছেন। কিন্তু কোর্টের ধারেকাছে কোনও লোক নেই, শুধু কান্তি ছাড়া।

"আজ আমাদের টেনিস কোর্টের উদ্বোধন হবে।" রাজেন এবার টেব্লের ধারে দাঁড়িয়ে স্বরটা একটু উঁচু করে বলল, "বক্তৃতা শোনাতে গেলে যত শ্রোতার দরকার হয়, তত লোক এখানে নেই। সুতরাং বেশি কথা বলব না। ছোটদের নিয়মিত খেলা দরকার, তারা খেলতে চায়। এই সত্যি কথাটা আমরা, বড়রা, বুঝতে চাই না। কিন্তু ছোটরা নিজেরা খেলার ব্যবস্থা করতে পারে না, পারার কথাও নয়। সংগঠন না থাকলে খেলা যায় না, আর এইটুকু-টুকু ছেলেমেয়ের পক্ষে একটা সংগঠন গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। এটা গড়ে দেয় বড়রা।

"এখানে ছোটদের খেলাধুলার কোনও ব্যবস্থা নেই, এই অভাবটা লক্ষ করেই শ্রীমতী তপতী বসুমল্লিক প্রথম উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসেন। কাজ শুরুও করেন, কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে হয়। তিনি যে-কাজ শুরু করেছিলেন, অবশেষে আমরা তাকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ দেব গৌতম আর অনিরুদ্ধর অভিভাবকদের। তাঁরা তাঁদের ছেলেদের খেলার জন্য এখানে পাঠিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। আর ধন্যবাদ জানাব অফিসার্স ক্লাবের কর্মী কান্তি সাঁতরাকে। সে তদারক না করলে এই কোর্ট তৈরি হয়ে উঠতে পারত না। যাই হোক, বেশি কথা বলব না বলেও বলে ফেললাম। এবার অনুরোধ করব বউদি আপনি কোর্টে এসে প্রথম সার্ভিসটা করুন।"

তপতী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই কান্তি ছুটে এল সাত-আটটা জবাফুলে গড়া একটা স্তবক নিয়ে। "মেমসাব, আপনার জন্য।"

স্তবকটা হাতে নিয়ে টেব্লে রাখলেন। গাড়ি থেকে তন্ময় তপতীর ডানলপ র‍্যাকেটটা নিয়ে এসেছেন, সেটা স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিলেন।

"ঠাকুরপো, সার্ভিস তো করব, রিসিভ করবে কে ?"

"কেন, আমি ! ... র‍্যাকেট তো আমিও এনেছি, শুভা, দাও তো।"

বল হাতে তপতী দাঁড়ালেন বেস লাইনে। তাঁর পায়ে নতুন কেড্স। বাঁ পায়ের পাতা লাইনের বাইরে রেখে বাঁ হাতের মুঠোয় বলটা চেপে ধরে সামনে তাকালেন এবং তাকিয়েই ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর মনে হচ্ছে নেটটা অনেক দূরে। জীবনে তিনি টেনিস কখনও খেলেননি। সার্ভ করে বলটাকে নেটের ওপারে তিনি কখনওই পাঠাতে পারবেন না। সবাই কত আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ওদের মুখগুলো ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে, পা কাঁপছে। খুব অন্যায় করতে চলেছেন বলে তাঁর মনে হল। এভাবে লোক হাসাতে কেন তিনি রাজি হলেন ?

"মা," তপতী চমকে পেছনে তাকালেন। গুটিগুটি চিনু কখন যেন তাঁর

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তার রুগ্‌ণ দুটি হাতের মুঠি তুলে ঝাঁকাল, "মা, পেরেছি বলো।"

বাঁ হাত সামনে বাড়িয়ে তিনি বলটা শূন্যে ছুড়লেন। হাতটা আকাশমুখো সোজা হল। বল থেকে চোখ সরালেন না। র‍্যাকেট ধরা ডান হাতটা পেছনে টানলেন। শিরদাঁড়া, পিঠ পেছনে বাঁকল। তারপর সামনের দিকে একটা ধাক্কায় র‍্যাকেটটা আছড়ে পড়ল নেমে আসা বলের ওপর।

সবাইকে অবাক করে বলটা নেটের মাথা ঘেঁষে ওপারে গিয়ে পড়ল। রাজেন বলটা রিটার্ন করার জন্য দু'পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। তপতী মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন, পায়ে জোর না থাকায়।

"মা পেরেছ, দেখো।"

॥ ৫ ॥

"হল না, হল না... আবার মারো। দেখালাম তো, কতবার বলেছি র‍্যাকেটটা এইভাবে উঁচু করে, কাঁধ পর্যন্ত তুলে পেছনে টানো, তারপর নীচের দিকে নামাও।"

তপতী একটা কাল্পনিক বল লক্ষ্য করে ধীরগতিতে ফোরহ্যান্ড মারলেন। নেটের ওধারে দুটি ছেলে গভীর মনোযোগে তাঁকে নকল করে র‍্যাকেট চালাল।

"অনিরুদ্ধ, তোমার চোখ বল থেকে কিন্তু সরে গেল আর মিনু ফোরহ্যান্ড মারার সময় বাঁ পায়ে ভর রেখে ফিনিশটা ঠিক হচ্ছে না। ...আচ্ছা, আবার আমি বল দিচ্ছি।" তপতী বল মারলেন অনিরুদ্ধর ডান দিকে। বলটা তার পাঁচ গজ আগে পড়ে উঠে এল কাঁধের ওপর। অনিরুদ্ধর ফোরহ্যান্ড বলের নাগাল পেল না।

"মুভ। মুভ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেনিস খেলা যায় না। ...লক্ষ করো কোথায় বলটা পড়ছে, অনুমান করো কতটা লাফাবে, সেইমতো তুমিও এগিয়ে এসো। দু'পা এগোলেই বলটা পেয়ে যেতে... আচ্ছা, আবার...।"

গৌরবর্ণ, এগারো বছরের অনিরুদ্ধর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে তাকে আর মিনুকে ফোরহ্যান্ড গুলে খাওয়াতে চেষ্টা করছেন তপতী। দু'জনকে অন্তত তিরিশবার করে তিনি ফোরহ্যান্ড মারিয়েছেন। মিনু তাঁর কাছে সমস্যা নয়, কিন্তু গোলগাল, ভারী দেহের অনিরুদ্ধ তাঁকে বিব্রত করছে। ছেলেটির চলাফেরা কিঞ্চিৎ গদাইলশকরি, চটপট মাথাটাও কাজ করে না। কোর্টের ধারে চেয়ারে অনিরুদ্ধর ঠাকুমা চোখ কুঁচকে বসে রয়েছেন।

চিনুর হাতে র‍্যাকেট। সে একাই খেলছে নিজের সঙ্গে। বল আকাশের দিকে মেরে ছুটে যাচ্ছে জমিতে পড়ার আগেই বলটাকে আবার আকাশে তুলে দেওয়ার জন্য। গৌতম আজ আসেনি। সে থাকলে চিনু তার সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে, যখন তপতী ব্যস্ত থাকেন মিনু আর অনিরুদ্ধকে নিয়ে।

"এবার মিনু।"

তপতী একটু জোরেই বল পাঠালেন এবং তাঁকে অবাক করে মিনু সপাটে বলটা ফেরত দিল তিন ফুট উঁচু নেট ঘেঁষে, ফোরহ্যান্ডে। মারটাকে তারিফ জানাবার সুযোগ পাওয়ার আগেই তাঁর র‍্যাকেটের দু'গজ বাইরে দিয়ে বলটা বেরিয়ে গিয়ে ক্লাবের সুরকির রাস্তা পেরিয়ে একটা নিমগাছের গুঁড়িতে ধাক্কা দিল। তপতী বলটা পাওয়ার জন্য দু'পা দৌড়বার চেষ্টা করেই থেমে গিয়ে হতাশ চোখে বলটার দিকে তাকালেন। চিনু ছুটে গেল বলটা ফিরিয়ে আনতে।

বলটা হাতে নিয়ে চিনু আলতো করে আকাশের দিকে ছুড়ে নেমে আসার সময় র‍্যাকেট দিয়ে মাথার ওপর থেকে হিট করল। তপতী দেখে অবাক হয়ে গেলেন। প্রায় নিখুঁত সার্ভিস ! ওইটুকু ছেলে। কী চমৎকার তাঁকে নকল করে ফেলেছে।

"চিনু, তুই দাদার পাশে গিয়ে দাঁড়া। যেরকম করে ফোরহ্যান্ড দেখিয়ে দিয়েছি, মারতে পারবি ?"

অনেকখানি মাথা হেলিয়ে চিনু বলল, "হ্যাঁ-আআ।"

তপতী পরপর দশটা বল চিনুকে দিলেন আর সদ্য ছ'বছর পার হওয়া বাচ্চা ছেলেটি হুবহু মাকে নকল করে ফোরহ্যান্ড মারল। গায়ে জোর কম, দুটো বল নেটে আটকে গেল, বাকিগুলো এপারে এল দুর্বল গতিতে।

"অনিরুদ্ধ, দেখলে তো ? ওইটুকু ছেলে কী সুন্দরভাবে শট নিল। তাও ওকে কিছুই শেখাইনি। আর তোমাকে কতবার দেখালাম তবু তুমি পারছ না। নাও, আবার করো।"

তপতী অনিরুদ্ধকে নিয়ে আবার শুরু করলেন। কোর্টের একধারে মিনু আর চিনুও ফোরহ্যান্ড আয়ত্ত করার কাজে মন দিল। রীতিমতো গরম পড়ে গেছে। বাতাস নেই, গাছের পাতা নড়ছে না। দরদর ঘামছে সবাই। মহাদেবপুরের একটা কিনারে নির্জন এলাকায় এই ক্লাব। সন্ধ্যার আগে ক্লাব মেম্বাররাও এদিক মাড়ান না। এদিকে লোকচলাচলও কম। তবু পথিকরা, সাইকেল আরোহীরা পথ দিয়ে যাওয়ার সময় টেনিস কোর্টের দিকে একবার তাকাবেই। তাদের দ্রষ্টব্য বিষয় হল তপতী। সাদা তাঁতের শাড়ি গাছকোমর করে বাঁধা, পায়ে কেড্‌স জুতো, অবিরাম চেঁচিয়ে যাওয়া একটা বউ, আর চারটি বা তিনটি বাচ্চা ছেলে প্রকাশ্যে একটা অপরিচিত খেলা খেলছে, হোক না শিল্পশহর বা কলকাতা থেকে মাত্র আটাশ মাইল দূরে, এখানে সেটা দেখার মতো ব্যাপার।

কিন্তু ক্লাব মেম্বারদের বাড়ির কেউ কৌতূহলবশে বা নিছক উৎসাহ দিতেও বিকেলে আসেন না। রাজেনের কাজের ছুটি যখন হয় তখন তপতী ছেলেদের নিয়ে বাড়ির পথে। তবু ছুটির দিনে কলকাতার আড্ডা ফেলে দু'-তিনবার সে এসেছে।

"বউদি, বাচ্চাদের আমি ঠিক হ্যান্ডল করতে পারি না, আমার ধৈর্যটা একটু কম। তা ছাড়া ছুটির পর এত টায়ার্ড লাগে !" রাজেন বলেছিল। "কিন্তু প্রাথমিক যা করা দরকার, অ আ ক খ শেখানো, সেটা তো আপনি ভালভাবেই শেখাচ্ছেন।"

"ইলাহাবাদে যার কাছে প্রথম শিখেছিলাম, তিনি যা-যা করেছিলেন আমি সেটাই করে যাচ্ছি ঠাকুরপো। কিন্তু আমারও তো বিদ্যের একটা সীমা আছে। ওপরের দিকের খেলার কিছুই জানি না। খেলার বই কি ম্যাগাজিন, বিশেষ করে টেনিসের, কিছুই আমাদের দেশে নেই যে, পড়ে-পড়ে শিখব। বিদেশ থেকে হয়তো বইটই আসে, কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় তাও জানি না।

"ছোটবেলায় আমরা খবরের কাগজে উইম্বলডনের রেজাল্ট কি দু-একটা ছবি দেখতাম। বিয়ের আগে দাদার কাছে অনেকের নাম শুনতাম। এখনও কয়েকটা নাম মনে আছে— ডোনাল্ড বাজ, ববি রিগস্, ক্র্যামার, বরোত্রা, পাঞ্চো গঞ্জালেস ; মেয়েদের মধ্যে লুই ব্রাও, মুডি, হার্ট। বিয়ের পর খেলা থেকে এতদূরে চলে গেলাম যে, খবরের কাগজের খেলার পাতাটাও আর দেখতাম না।" তপতীর স্বর ছেলেবেলার স্মৃতি আর বর্তমানের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে যেন বিষণ্ণতায় ভরে রয়েছে।

"বউদি, ছোটদের খেলা শেখানোর সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি কী জানেন ? ভাল প্লেয়ারদের খেলা ওদের নিজের চোখে দেখানো। ওরা তা হলে নিজেরাই বুঝে নিতে পারবে কোনটা করতে হবে আর কোনটা করতে হবে না। একটা ছেলে দশটা বই পড়ে যা জানবে, মাত্র একটা ভাল ম্যাচ দেখেই সেটা সে শিখে নিতে পারবে। অবশ্য যদি তার মনে ইচ্ছা আর ঘটে কিছু বুদ্ধি থাকে। আর কিছুদিন পরই তো সাউথ ক্লাবে ইস্ট ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ হবে। সুইডেনের হলস্ট্রোম ইন্ডিয়ান সার্কিটে এখন খেলছে, ওকে আনার চেষ্টা চলছে। আমাদের কৃষ্ণন, প্রেমজিত, জয়দীপ তো থাকবেই। ফাইনালের দিন ছেলেদের নিয়ে চলুন।" রাজেন অনুরোধ করেছিল খুব আন্তরিকভাবে। "আমি আপনাদের সবাইকে নিয়ে যাব। এই বয়সে ওদের খেলা দেখাটা খুব দরকার।"

কিন্তু এখন তিনি অনিরুদ্ধকে বারবার বল দিয়ে দেখিয়ে এবং মুখে বলেও, ফোরহ্যান্ড মারার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ কাঁধ কতটা ঘুরবে আর র‍্যাকেট কতটা উঠবে ফলো-থ্রুতে সেটা ঠিক করাতে পারলেন না।

"মা, অনিরুদ্ধটা একটা ভোঁদা।" মিনু বলে উঠল। চিনুর সঙ্গে খেলতে খেলতে সে লক্ষ করছিল তপতীর নাকাল অবস্থাটা।

"তুমি বরং আমাদের সঙ্গে খেলো।"

তপতীও তাই ভাবছিলেন, শুধুই পণ্ডশ্রম করে যাচ্ছেন। বাড়ির আদুরে এই ছেলেটির টেনিস কেন, কোনও খেলাই হবে না। বরং চিনু-মিনুকে বল দিয়ে গেলে ওরা ঝালাই করার কাজে এগোতে পারবে।

"ঠিক আছে অনিরুদ্ধ, তুমি এখন একটু রেস্ট নাও, আর দেখো ওরা কীভাবে স্ট্রোক করছে।"

তপতীর কথা সবে শেষ হয়েছে তখন একটা গম্ভীর গলা বলে উঠল, "অনি, চলে আয়। আর তোকে খেলতে হবে না।" গলাটা অনিরুদ্ধর ঠাকুমার। তিনি মিনুর কথা শুনতে পেয়েছেন।

বাধ্য নাতির মতো অনিরুদ্ধ ঠাকুমার কাছে হাজির হল।

"বাড়ি চল।" ঠাকুমা উঠে দাঁড়ালেন। তপতী ছুটে গেলেন ওদের কাছে।

"সে কী মাসিমা, অনিরুদ্ধকে যে আবার প্র্যাকটিস করাব।"

"করিয়ে কাজ নেই, ভোঁদা ছেলের পেছনে সময় নষ্ট না করে বরং নিজের ছেলেদেরই দেখো।" ঠাকুমা আর রাগ চাপতে পারলেন না। "আমার নাতিটাকেই শুধু খাটিয়ে যাচ্ছ, যেন ও একটা কুলিমজুর। কই, নিজের ছেলেদের তো খাটাচ্ছ না। আমি তখন থেকে বসে বসে লক্ষ করে যাচ্ছি তুমি খালি ওর পেছনেই লাগছ।... দরকার নেই বাপু অমন খেলায়... এমন একচোখামি জন্মে কখনও দেখিনি, আয়।" ঠাকুমা অনিরুদ্ধর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন।

"আমি তো ওর ভালর জন্যই খাটাচ্ছি মাসিমা।" তপতীর গলায় করুণ মিনতি। যাও-বা দুটো ছেলে পেয়েছেন, তার একটি যদি চলে যায় তা হলে মিনু-চিনু ছাড়া তো কিছুই থাকবে না!

"না, না, আর ভাল করতে হবে না, দেখেছ বাছার মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে। আয়, খেলে তো চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করবি।"

"ঠাকুমা, বাবা গাড়ি নিয়ে আসবে যে!" অনিরুদ্ধ নিরস্ত করার চেষ্টা করল। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় অনিরুদ্ধর বাবা ওদের তুলে নিয়ে যান। নাতির কথা শুনে ঠাকুমা বসে পড়লেন।

কয়েক সেকেন্ড তপতীর নিজেকেই ভোঁদা মনে হল। তারপর ধীরে-ধীরে তাঁর দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল। চোয়ালের পেশি দপদপ করে উঠল কয়েকবার। তিনি দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন না।

"মিনু, এবার ভলি... দেখছিস তো আমার দুটো পা-ই পঙ্গু, তুই কি আমাকে কষ্ট দিবি? যদি কষ্ট না দিতে চাস, তা হলে এমনভাবে ভলিতে রিটার্ন করবি যেন আমাকে এক পা-ও নড়তে না হয়, সব বল যেন আমার র‍্যাকেটে আসে।... চিনু, যা বললাম শুনলি?"

দুই ভাই মাথা হেলাল। আড়চোখে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তপতী সহজ করে বল জোগাতে লাগলেন। একবার মিনুকে, তারপর চিনুকে। মুখের সামনে, বুকের সামনে, কাঁধের পাশে, মাথার ওপর থেকে আসা জমি না ছোঁয়া বলগুলো দুই ভাই নেটের ওধারে মায়ের র‍্যাকেটে পৌঁছে দিতে লাগল। যদি কোনও রিটার্ন তপতীর থেকে একটু আগে বা একটু বেশি দূর হয়ে যায় তা হলে অন্য ভাই উৎকণ্ঠিত চোখে পাশের দিকে তাকায়।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ওরা বল ফেরাচ্ছে। তপতী এবার বলগুলো ফোরহ্যান্ডের দিকে একটু-একটু করে সরাতে লাগলেন। ডান হাত লম্বা করে পাশে বাড়িয়ে ওদের ভলি করতে হবে। দু'বার চিনু পারল না, ওর থেকে বলিষ্ঠ মিনু পারল। তপতী একটা ব্যাপারে সচেতন হলেন, গায়ের জোর না বাড়ালে তাঁর ছেলেরা খেলোয়াড় হতে পারবে না। এই প্র্যাকটিস বেশিক্ষণ নেওয়ার মতো গায়ের তাগদ চিনুর নেই, মিনুর কিছুটা আছে। কিন্তু যথেষ্ট নয়।

নিমগাছের সামনে অনিরুদ্ধর বাবার গাড়ি এসে থামল। তিনি গাড়ি থেকে নেমে দেখলেন, ছেলে চেয়ারে বসে তার ঠাকুমার সঙ্গে। অন্য দুটি ছেলে তাদের মায়ের সঙ্গে খেলছে। ভ্রূ কুঁচকে গেল তাঁর।

"অনি খেলছ না ?" বাবা জানতে চাইলেন।

অনিরুদ্ধ ঠাকুমার দিকে তাকাল। ঠাকুমা ব্যাজার মুখে বললেন, "ওঠ।" নাতি চেয়ার থেকে উঠল র‍্যাকেট হাতে।

"কী ব্যাপার !" বিস্মিত বাবা তাঁর মায়ের দিকে তাকালেন।

"খেলবে না অনি।" ঠাকুমা নাতিকে টানতে টানতে গাড়ির দিকে রওনা হলেন।

"কী ব্যাপার মিসেস বসুমল্লিক, অনি খেলবে না কেন ?"

তপতী ঘামে ভেজা মুখ আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, "আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে মাসিমার কথা থেকে মনে হল উনি পছন্দ করছেন না অনিরুদ্ধর ওপর কোনওরকম চাপ দিই। ওর ফোরহ্যান্ডটা ঠিক করার জন্য বারবার ওকে বল দিচ্ছিলাম। মাসিমা সেটাকে কুলিমজুরের মতো খাটানো মনে করলেন।"

অনিরুদ্ধর বাবার মুখ অপ্রতিভ দেখাল। তিনি আড়ষ্ট স্বরে বললেন, "খেলাধুলো করতে গেলে তো খাটতেই হবে। আর খাটবার জন্যই তো ওকে এখানে পাঠিয়েছি ! দিন-দিন কীরকম মোটা হয়ে যাচ্ছে !"

তপতীর মনে হল ভদ্রলোক তাঁর মায়ের উলটোটি। ছেলেকে মাত্রাতিরিক্ত যত্ন-আদর দিয়ে নষ্ট করতে চান না।

"অনিরুদ্ধর শরীর যথেষ্ট ফিট নয় বলেই ওর বডি কোঅর্ডিনেশন খারাপ। ওর হাত, পা, মাথা, কোমর একসঙ্গে কাজ করে না। সেটাই যথাসম্ভব করাবার চেষ্টা করছিলাম।"

"ঠিকই করেছেন। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে কী জানেন, আমার মার আবার নাতি-অন্ত প্রাণ, আমার স্ত্রীও একমাত্র ছেলেকে নয়নের মণি করে রেখেছেন। মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলাও যায় না। অনি সম্পর্কে একটু কড়া হলেই সংসারে অশান্তি বেধে যায়, তাই আমি আর কিছু বলি না। যাই, ওকে খেলতে আসার জন্য বলি গিয়ে।" হতাশ এবং তিক্ত মুখ করে তিনি গাড়ির দিকে এগোলেন।

ওরা তিনজন গাড়ির দিকে তাকিয়ে। অনিরুদ্ধর বাবা তাঁর মার সঙ্গে কথা বলছেন। মা হাত নেড়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কিছু বলতে শুরু করলেন। তারপর গাড়ির দরজা খুলে নাতিকে নিয়ে উঠে বসলেন। তপতীদের দিকে একবার তাকিয়ে অনিরুদ্ধর বাবা মাথা নামিয়ে গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং ধরলেন।

"মা, অনি বোধ হয় আর আসবে না।" মিনু বলল।

"না।"

"ভালই হল, মা শুধু গৌতম আর আমাদেরই এবার থেকে শেখাবে।" চিনু তারিয়ে মন্তব্য করল।

"গৌতমও আসবে না," মিনু বলল, "জানো মা, গৌতম আমাকে বলেছে টেনিস ওর ভাল লাগে না, ওর ভাল লাগে ক্রিকেট। ও বলেছে টেস্ট ম্যাচ খেলবে। হাফ প্যান্ট পরে খেলার থেকে ফুলপ্যান্ট পরে খেললে দেখতে সুন্দর লাগে।"

"মিনু আয়, ভলি এখনও বাকি।" তপতী কোর্টের দিকে এগোলেন।

"মা আমি ?" চিনুর চোখে ভীরু আবেদন। তপতী ছোট ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন।

"তোর শরীরের সামর্থ্যের থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে না ? একদিনেই এতটা করা ভাল নয়।" কথাগুলো বলে কী ভেবে তিনি মত বদলালেন, "আচ্ছা আয়।"

রোদ পড়ে আসছে। আকাশ ম্লান, দূরের গাছপালা, বাড়ির রং ধূসর-কালো হয়ে উঠছে। তপতী এইরকম সময়েই খেলা বন্ধ করে ছেলেদের নিয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরেন।

"মা, আর পাঁচটা।" মিনু বলল।

তপতী পাঁচবার ভলির জন্য বল দিলেন। "আর নয়, এবার বাড়ি।"

"মা, আরও পাঁচটা, এই শেষ, আর বলব না।" মিনু মিনতি জানাল।

তপতী দু'বার দিলেন চিনুকে। ব্যাডমিন্টনের শাট্‌লকক ফেরাবার মতো করে মুখের সামনে থেকে ভলি মেরে সে উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে রইল। মাকে এক পাও নড়তে হল না দেখে আনন্দে ভরা চোখে সে দাদার দিকে তাকাল।

"মিনু, লাস্ট বল।" তপতী ইচ্ছে করেই বলটা মিনুর ডান দিকে প্রায় পাঁচ গজ দূরে উঁচু করে ফেললেন। দেখা যাক ছেলেটা পারে কি না। মিনু আশা করেনি তার অতদূরে বল আসবে। হুঁশ হওয়া মাত্র সে ডান দিকে দ্রুত দু'পা ছুটে ঝুঁকে র‍্যাকেট বাড়িয়ে দিল। কোর্ট প্রায় ছুঁয়েছে সেই অবস্থা থেকে সে বলটাকে তুলে দিল। আর নিজে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আলতো হয়ে উঁচুতে উঠে নেট পেরিয়ে বলটা অবাক তপতীর মাথার ওপর নেমে এল।

ধড়মড়িয়ে কোর্ট থেকে দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত তুলে মিনু লাফাল। "পেরেছি... মা, আমি পেরেছি।"

ইস্ট ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনাল। হলস্ট্রোম খেলছে রামনাথন কৃষ্ণনের সঙ্গে।

মিনু আর চিনু বসেছে রাজেনের দু'পাশে। তপতী ও তন্ময় আসেননি। তপতীর বাঁ পায়ে যেখানে কোদালের আঘাতটা লেগেছিল সেই জায়গাটা গত রাতে ফুলে উঠে যন্ত্রণা শুরু হয়। ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন, ওষুধ দিয়ে গেছেন। তাঁর অবস্থা হাঁটাচলার মতো নয়। তন্ময় তাঁর জন্যই বাড়িতে রয়ে গেছেন।

চতুর্থ সেট, নবম গেম। হলস্ট্রোম ৩-৫ এবং নিজের সার্ভিসে ০-৩০ পিছিয়ে। সে প্রথম সেট জিতেছিল ৬-৪, পরের দুটি সেট হেরেছে ১-৬ ; ২-৬। খেলা প্রায় দু' ঘণ্টা গড়িয়েছে, জয়ের জন্য কৃষ্ণনের দরকার আর মাত্র দুটি পয়েন্ট।

হলস্ট্রোম সার্ভ করছে। রাজেন আড়চোখে তার ডানপাশে বসা চিনুর ডান হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকাল। হলস্ট্রোম বলধরা বাঁ হাত সামনে বাড়িয়ে উঁচুতে তুলতে-তুলতে বলটাকে শূন্যে ছুড়ে দিল। রাজেন দেখল, বাচ্চা ছেলেটার বাঁ হাত গলার কাছে উঠে ফুলের পাপড়ির মতো আঙুলগুলো খুলে গিয়ে কাল্পনিক বলটাকে শূন্যে ভাসিয়ে দিল। ডান হাতের মুঠো কাঁধের কাছে, র‍্যাকেট ধরা কব্জিটা মোচড়ানো, পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে চেয়ারে কাঁধ ঠেকে গেছে। তারপরই চিনুর কোমর থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গ হলস্ট্রোমের সার্ভিসের সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকল আর ডান কব্জিটা চাবুক মারার মতো সামনে ঝাপটা দিল।

রাজেনের অবাক চোখ হঠাৎ চিনুর নজরে আসতেই সে লজ্জা পেয়ে হাত দুটো কোলের কাছে গুটিয়ে নিল। হলস্ট্রোমের সার্ভিস কৃষ্ণনের ডান দিকে সার্ভিস কোর্টের মাঝামাঝি পড়েছে, সে ডান দিকে সামান্য হেলে সপাটে ফোরহ্যান্ড রিটার্ন মারল ডাউন দ্য লাইন। বেস লাইনের ছ' ইঞ্চি আগে সাইড লাইনে বল পড়ল। উত্তেজনায় মিনু উঠে দাঁড়িয়েছে।

"লাভ ফর্টি।" মাইকে ঘোষণা করলেন আম্পায়ার।

"মারটা মনে থাকবে তো?" রাজেন ফিসফিস করে বলল। মিনু মাথা হেলাল। "কৃষ্ণনের ব্যাক হ্যান্ড মনে থাকবে তো?"

"হ্যাঁ। আর একটু হলেই বলটা বাইরে পড়ত।... রাজেনকাকা, কৃষ্ণন খুব প্র্যাকটিস করে?"

"করে, আর সেজন্যই মারগুলো এত মাপা হয়।"

"ফিফ্‌টিন ফর্টি।"

হলস্ট্রোমের লব কৃষ্ণনের মাথার ওপর দিয়ে বেস লাইনের কাছে পড়েছিল, কৃষ্ণন পিছু হটতে পারেনি।

"দেখলে মিনু, ফিজিক্যাল ফিটনেসে কৃষ্ণন কত পিছিয়ে। শুধু শট নিতে পারলেই হয় না, খুব চটপটে খুব ফাস্ট মুভ করার জন্য শরীরও তৈরি করতে হবে।"

"দৌড়লে হবে?" চিনুর প্রশ্ন।

"বড় প্লেয়াররা রোজ সাত-আট মাইল দৌড়য়! ব্যায়ামও করে।" রাজেন ফিসফিসিয়ে বলল।

"দাদা, আমরা কতটা দৌড়ই রে?"

"চুপ, চুপ।" রাজেন ঠোঁটে আঙুল দিল। হলস্ট্রোম সার্ভ করছে। ম্যাচে এই নিয়ে প্রায় আশিবার। এত সার্ভিস দেখার পর, রাজেনের মনে হল, বাচ্চা দুটো নিশ্চয় এর ছবি মনের মধ্যে তুলে রেখে দেবে। প্রচণ্ড জোরালো সার্ভিস করে এই সুইড। কিন্তু শুধু জোরে সার্ভ করতে পারলেই যে ম্যাচ জেতা যায় না, কৃষ্ণন সেটা আজ বুঝিয়ে দিয়েছে।

"থার্টি ফর্টি।" হলস্ট্রোমের সার্ভিস এস হয়েছে।

আবার সার্ভ করল। ফোরহ্যান্ড রিটার্ন কৃষ্ণনের। বলটা উঁচু হয়ে মাঝ কোর্টে। ডান দিকে ভলি মারল হলস্ট্রোম। কৃষ্ণন যেন আগাম জানতই বল কোথায় আসবে। বাঁ দিকে সরে গিয়ে সে অপেক্ষা করছিল। হলস্ট্রোমের কোমরের পাশ দিয়ে আড়াআড়ি মারা একটা ঝলসানো ব্যাকহ্যান্ডে বলটা বেস লাইনের কাছে পড়ে বেরিয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে হলস্ট্রোম একবার তাকিয়ে দেখে নেটের দিকে এগিয়ে গেল হাত বাড়িয়ে। হাজার দুয়েক লোক দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে মিনু-চিনুও। উত্তেজনায় দু'জনের মুখ টসটস করছে।

মহাদেবপুরে ফেরার সময় গাড়ি চালাবার ফাঁকে রাজেন পাশে বসা দুই ভাইকে বলল, "আজ যা-যা দেখলে সব যেন মনে থাকে।"

"অত জোরে জোরে মারলে যদি মায়ের পাশ দিয়ে বল বেরিয়ে যায়!" চিনুর সামনে এখন এটাই প্রকাণ্ড সমস্যা।

"তুমি কি এখনই অত জোরে জোরে মারতে পারবে?" হালকা সুরে রাজেন বলল।

"না। তবে দাদা জোরে মারতে পারে।"

"ধ্যাত, জোরে মারি নাকি? জোরে মারলে বল এধার-ওধার চলে যায়, মার তাতে অসুবিধে হবে না? জানেন রাজেনকাকা, মা যেখানে দাঁড়ায় ঠিক সেই জায়গাটা লক্ষ্য করে আমরা দু'জনেই বল মারি। আস্তে না মারলে কি ঠিক জায়গায় বল পাঠানো যায়?" বিচক্ষণের মতো মিনু বলল।

"তা বটে, আস্তে আস্তে মেরেই শুরু করতে হয়। কিন্তু মিনু, মার অসুবিধের কথা ভেবে কতদিন তুমি আস্তে মারবে? জোরে জোরে না মারলে বড় প্লেয়ার হবে কী করে? তুমি তো বড়ই হতে চাও, চাও না?"

রাজেনের কথাগুলো এবার মিনুকে সমস্যায় ফেলে দিল। মাকে সে ভালবাসে, আবার বড় প্লেয়ার হওয়ার ইচ্ছাটাও কৃষ্ণনকে দেখার পর তার মধ্যে আলোড়ন তুলছে। তার ছোট্ট মাথা এমন একটা কঠিন অবস্থায় আগে কখনও পড়েনি।

"তুমি তো দাবা খেলেছ। রাজার কিস্তি হতে পারে এমন একটা অবস্থা তো খেলায় একসময় আসবেই। সেজন্য তুমি আগে থেকে নিশ্চয়ই ভেবে রাখো কী কী চাল দেবে, রাখো না কি?" রাজেন সামনের ভিড়-রাস্তায় রাখা সতর্ক দৃষ্টিটা পলকের জন্য ঘুরিয়ে মিনুর মুখটা দেখার চেষ্টা করল। তার মনে হল ছেলেটি উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ চিনু বলে উঠল, "আচ্ছা রাজেনকাকা, কৃষ্ণন কি মায়ের সঙ্গে খেলত?"

হো হো করে হেসে ওঠার ইচ্ছেটা দমন করতে হল রাজেনকে। জি টি রোডের সালকিয়া, লিলুয়া, বেলুড়ের দিকটায় গাড়ি চালাতে চালাতে সন্ধ্যার মুখে হেসে ওঠা যায় না। সরু রাস্তা, রাস্তায় দোকান, গাঁক গাঁক করা ট্রাক আর বাস এবং ছুটির দিনের বিশৃঙ্খল ভিড় ঠেলে মোটর গাড়িকে এগোতে হয় চোখ কান খুলে।

"চিনু, তুমি কিন্তু নিজের অজান্তেই একটা ভাল বিষয় তুলেছ। কৃষ্ণন ছোট

বেলায় মায়ের সঙ্গে নয়, বাবার সঙ্গে খেলত। ভদ্রলোক দিল্লিতে চাকরি করতেন। ঠিক করলেন ছেলেকে বড় টেনিস প্লেয়ার করবেন।" রাজেন ব্রেক কষল। এক স্ত্রীলোক ছুটে রাস্তা পার হচ্ছিল কোমরে একটা শিশুকে নিয়ে। হঠাৎ গায়ের পাশে গাড়ি দেখে দিশাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মিনুর তর সইছে না। আবার গাড়ি চলা মাত্র সে বলল "তারপর ?"

"তারপর তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সবকিছু বিক্রি করে যা টাকা পয়সা পেলেন তাই নিয়ে দিল্লি থেকে তামিলনাড়ুতে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলেন। সেখানে একটা ক্লে কোর্ট বানালেন, গ্রামে মাটি দিয়ে লেপা উঠোন দেখেছ তো ?"

"না দেখিনি।" মিনু বলল।

"মহাদেবপুরের পাশেই তো গ্রাম, একদিন গিয়ে দেখে নিয়ো। গোবর জল আর মাটি দিয়ে লেপা, একেবারে সিমেন্টের মেঝের মতো তকতকে হয়। সেইরকম কোর্টে তিনি ছেলেকে দিনের পর দিন হাতে ধরে টেনিস শেখালেন। ছেলেও রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্র্যাকটিস করল, সেই সঙ্গে লেখাপড়াও। তারপর এল মাদ্রাজ শহরে। তারপর একের পর এক চ্যাম্পিয়নশিপ জিতল। এখন কৃষ্ণন ভারতের সেরা।

"বুঝলে মিনু, বাবা বিরাট ঝুঁকি নিয়ে ছিলেন ছেলেকে বড় প্লেয়ার বানাবার জন্য, ছেলেও সেটা বুঝেছিল। আর তাই সে মন প্রাণ দিয়ে খেটে গেছে বাবার স্বপ্নকে সত্যি করে তুলতে।"

"মাও খুব খাটে।" চিনু বলল।

কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। একসময় রাজেন আড়চোখে দেখল মিনু তার ভাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলছে। তার কানে এল দুটো কথা, "মারও স্বপ্ন আছে।" চিনু বলল, "বাবারও আছে।" শুনে রাজেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

অধীর হয়ে তপতী অপেক্ষা করছিলেন ওদের ফেরার জন্য। ফিরে এসেই দুই ভাই কলকল করে শুরু করল যা দেখে এসেছে তার বর্ণনা দিতে। কৃষ্ণন আর হলস্ট্রোমের ভলি, লব, সার্ভিস, ফোরহ্যান্ড, ব্যাকহ্যান্ড যা কিছু দেখেছে, দুই ভাই র‍্যাকেট হাতে মাকে সেগুলো দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তন্ময় মুখে হাসি নিয়ে তপতীর মতোই চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে দেখে গেলেন।

বেলা এসে তাড়া দিল রাতের খাবার খেয়ে নেবার জন্য। এই ব্যাপারে বাড়ির নিয়ম ভীষণ কড়া। অনিচ্ছুক দুই ভাই খাবার ঘরে চলে যেতেই তপতী বললেন, "ঠাকুরপো, এদের উৎসাহ তো আপনি চাগিয়ে দিলেন, এবার আমি সামলাই কী করে।"

"উৎসাহের আগুন তো আপনিই জ্বালিয়েছেন, আমি শুধু একটু বাতাস দিলাম। কিন্তু সমস্যাটা সত্যিই এবার এসে পড়েছে। টপ ক্লাস টেনিস কী বস্তু, ওরা আজ তা দেখল ; কিছু বুঝেছেও হয়তো। ওরা এবার চাইবে কৃষ্ণন কি হলস্ট্রোমের নকল করে বল মারতে। এবার তো সেই সুযোগগুলো ওদের জন্য করে দিতে হবে,

অবশ্য যদি...” রাজেন থেমে গেল।

উৎকণ্ঠিত তন্ময় বললেন, “যদিটা কী ?”

“আগে ঠিক করুন ওদের বড় খেলোয়াড় বানাতে চান, না ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার করতে চান ? যদি ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার করতে চান তা হলে খেলাটাকে সিরিয়াসলি নেবার দরকার নেই। দুজনে যেভাবে চালাচ্ছে চালাক, একটু আধটু ছুটুক আর মন দিয়ে পড়াশুনো করুক। কিন্তু দাদা, দেশে প্রচুর ডাক্তার, উকিল, জজ-ব্যারিস্টার আছে, কজনের নাম দেশের লোক জানে ? কিন্তু কৃষ্ণনের নাম করুন, বহু লোক তাকে চিনবে। মিলখা সিং, শৈলেন মান্না, পঙ্কজ রায়, ভিনু মানকাদ, লক্ষ লক্ষ লোক এঁদের নাম জানে, ঠিক কি না ?”

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মাথা নাড়লেন।

“আমি লক্ষ করেছি টেনিস ওরা ভালবাসে, খেলতেও চায়। বড় প্লেয়ার হওয়ার জন্য যে ইচ্ছাটা থাকা দরকার, এই বয়সেই ওদের মধ্যে সেটা ফুটে উঠছে। সেটাকে যদি আরও ফুটিয়ে তোলা যায়, আমার ধারণা ওরা টেনিসে কিছু একটা করে দেখাবে।”

“তুমি বলছ রাজেন ?” তন্ময়ের চোখ জ্বলজ্বল করছে ভেতরের উত্তেজনায়।

“হ্যাঁ বলছি। বিরাট ঝুঁকি নেওয়া হবে ঠিকই, কিন্তু কোনও বড় কাজই ঝুঁকি না নিয়ে করা যায় না। আপনি দুটো বছর ওদের সময় দিন। যদি বোঝেন কিছু হবে না, ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে, তখন নয় বন্ধ করে দেবেন, যদি বোঝেন হবে, তা হলে অল আউট ওদের পিছনে খরচ করবেন।”

“খরচ !” তপতী নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন।

“হ্যাঁ খরচ। ওদের জন্য কোচ রাখতে হবে, তাকে টাকা দিতে হবে।”

“কত টাকা।”

“এখনই বলতে পারব না। খোঁজখবর করে দেখি ভাল কাউকে পাই কি না। এতটুকু ছেলেদের কোচ করতে কলকাতা থেকে আসতে কেউ রাজি হবে কি না সেটাও তো দেখা দরকার। তবে দাদা-বউদি, আপনাদের একটা কথা বলে রাখি, ভেবেচিন্তে নামবেন। শুধু আমার কথা শুনে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেবেন না। ...টেনিস খেলে টাকা রোজগার করা যায় না ঠিকই, কিন্তু নাম করতে পারলে ভাল চাকরি, খ্যাতি, সম্মান এগুলো তো পাবে। ..প্রতি বছর ভারতে লক্ষ লক্ষ ছেলে কলেজ থেকে বেরোচ্ছে, কিন্তু কৃষ্ণন তো একটাই।”

॥ ৬ ॥

রাজেন চলে যাবার পর তন্ময় ও তপতী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। দুজনের মাথায় ঘুরছে একই চিন্তা আর কয়েকটা কথা— ‘দুটো বছর ওদের দিন’.... ‘ওরা টেনিসে কিছু একটা করে দেখাবে’... ‘কৃষ্ণন তো একটাই।’

“তা হলে কী করা যায়, কোচ রাখব ?” তন্ময় স্ত্রীর কাছে পরামর্শর থেকে যেন

সমর্থনই চাইলেন।

"খরচ বাড়বে, তা ছাড়া ঝুঁকিও রয়েছে।" তপতী চিন্তিত স্বরে মনে করিয়ে দিলেন।

"তোমার পায়ের যা অবস্থা তাতে ডাক্তার যা বলে গেলেন সেটাই করা উচিত, কোর্টে নামা একদম বন্ধ। আবার যদি ফুলে ওঠে কি যন্ত্রণা শুরু হয়, তা হলে কী হতে পারে সেটাও তো শুনলে ওঁর কাছে।"

"জন্মের মতো পঙ্গু হয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমি কোর্টে না নামলে কে ওদের...।" তপতী থেমে গেলেন। স্বামীর মুখের দিকে অপলক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আচমকা বললেন, "আমি ঝুঁকি নেব।"

"পঙ্গু হয়ে যেতে পার শুনেও?" তন্ময় বিরক্তি চাপতে পারলেন না।

"ঝুঁকি নেব দুটো বছর। খরচ যাই হোক, মিনু কি চিনুকে দেশের লোক চিনবে— আমি তাই চাই। তুমিও কি চাও না ওরা টেনিসের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পাক? ...ঝুঁকির ভয়ে আমি পিছিয়ে যাব না।" ধীর অচঞ্চল স্বরে তপতী বললেন। সঙ্কল্পে তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে।

"ভোরে বেরোনো বন্ধ হয়ে রয়েছে, আমিই ওদের নিয়ে বেরোব।" তন্ময় উঠে দাঁড়ালেন। ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত এমন একটা ভাব তাঁরও মুখে।

পরদিন ভোরে মিনু এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল। বাথরুমে পা পিছলে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে তার কপাল কাটল, গালে কালশিটে পড়ল আর ডান হাঁটু ফুলে উঠল। দিন সাতেক লাগল তার সবগুলো আঘাত সেরে উঠতে।

অতঃপর এক ভোরে তন্ময় দুই ছেলের সঙ্গে ছুটতে বেরোলেন। যে পথ ধরে মিনু আর চিনু ফেরিঘাট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসত, তিনজন সেই পথই ধরল। তন্ময়ের অভ্যাস নেই এতটা দৌড়বার। তিনি ফেরিঘাটে পৌঁছবার আগেই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"হ্যাঁ রে তোদের মা এতটা ছুটত কী করে?"

"মা তো ছুটত না, জোরে হাঁটত। আমরা ছুটতাম।" চিনু বলল, "তুমি হাঁটো আমরা ছুটে ফেরিঘাট ছুঁয়ে ফিরে আসছি।" মিনু খুবই সহানুভূতির সঙ্গে জানিয়ে দিল "দশ মিনিটেই ফিরব।"

"তাই যা, আমি একটু জিরোই।" দুই হাঁটুতে হাত রেখে তন্ময় ঝুঁকে পড়লেন।

বাড়িতে ফিরেই তিনি স্ত্রীকে বললেন, "আমার দ্বারা ছোটা হবে না, রাজেনকে আজই বলব একজন কোচ ঠিক করে দিক।"

"বিকেলে মিনুকে কি স্কুল থেকে ক্লাবে নিয়ে যেতে পারবে?"

"পারব। কিন্তু খেলতে তো পারব না তোমার মতো।"

"তোমায় খেলতে হবে না, ওরাই খেলবে। নিজেদের মতো করে। ....অফিস থেকে বাড়ি এসে চিনুকে নিয়ে গাড়িতে করেই যেয়ো।"

তন্ময় যথেষ্ট আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়িতে এলেন। গাড়ি বার

করে চিনুকে নিয়ে স্কুলে গেলেন, সেখান থেকে মিনুকে তুলে নিয়ে ক্লাবে। কোর্টের ধারে একটা চেয়ারে বসলেন।

নেটের দুধারে দুই ভাই, বয়স দশেরও কম। মিনু বলল, "আমি জোরে জোরে মারব তুই বল ধরে সঙ্গে সঙ্গে ছুড়ে ফেরত পাঠাবি। আমি আবার মারব।"

কথা মতোই চিনু কাজ করল। অবশ্য বল ধরতে তাকে কোর্টের নানা দিকে ছুটতে হল, কেননা মিনুর জোরালো মারের মধ্যে কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। একসময় চিনু হাঁফিয়ে পড়ল।

"দাদা, আমি আর পারব না। তুই একাই মারবি আর আমি বুঝি মারব না।"

"তা হলে তুই র‍্যাকেট ধর, আমি ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছি।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে ফোরহ্যান্ড, ব্যাকহ্যান্ড, সার্ভিস ও ভলি মারায় ব্যস্ত সেই সময় নিমগাছের তলায় সাইকেল থেকে একটি বয়স্ক লোক নামলেন। এক হাতে সাইকেলটা ধরে তিনি দুটি ছেলের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে রইলেন।

লোকটির পরনে সাদা শর্ট্স আর নীল স্পোর্ট্স শার্ট। পায়ে সাদা ময়লা কেড্স। লম্বায় ছ' ফুটের ওপর, গড়ন ছিপছিপে হলেও পেশিগুলো শুকনো দরকচা নয়। বলিষ্ঠ দুটো পা দেখে বোঝা যায় লোকটি পরিশ্রমী, দুই কাঁধের পেশিতেও সেই আভাস। মুখ ঈষৎ লম্বাটে, নাকের পাশে গভীর ভাঁজ, গালেও। মুখখানি বহু অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া। ছোট করে কাটা চুল কাঁচাপাকায় মেশানো। লোকটিকে ঘিরে রয়েছে কঠিন এমন এক আবরণ, যা থেকে মনে হতে পারে তিনি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন না। তাঁর বয়স অনুমান করা শক্ত, তবে পঞ্চাশের নীচে নয়, এইটুকু বলা যেতে পারে।

প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে তিনি দুটি বাচ্চার নিজেদের মধ্যে খেলা দেখলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখে কখনও হাসি ফুটে উঠল, কখনও প্রসন্নতা, কখনও কুঁচকে উঠল কপাল। একটা বল তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়লে তিনি বলটা হাতে তুলে দাঁড়িয়ে থাকেন। চিনু ছুটে এসেছিল।

"কার কাছে খেলা শিখছ?" লোকটি বললেন। মৃদু গম্ভীর অন্তরঙ্গ স্বর।

"মার কাছে।"

লোকটির ভ্রূ কুঁচকে উঠল। "কোথায় মা, তোমরা তো একা একাই খেলছ!"

"মার পায়ে ব্যথা, আসেনি... বলটা দিন।"

"উনি কে, ওই যে চেয়ারে বসে?"

"বাবা।... দিন না।"

"নাম কী তোমার?"

"চিন্ময় বসুমল্লিক।"

চিনুর হাতে বলটা দেওয়ার সময় তিনি বললেন, "জুতোর ফিতেটা খুলে গেছে, বেঁধে নাও।"

পরের দিন সন্ধ্যায় রাজেন এল। তপতী তখন দুই ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন।

"বউদি, একজনকে পেয়ে গেছি। সহদেব মিশ্র। আজ দুপুরে অফিসে এসে

বলে গেলেন তিনি রাজি।... খুব অভিজ্ঞ, আমিও ওঁর কাছে কোচিং নিয়েছি কিছুদিন... খুব কড়া কোচ, সাউথ ক্লাবে অনেকদিন আছেন। এই মাইল ছয়েক দূরে হুগলিতে ওঁর বাড়ি, একা মানুষ, বউ মারা গেছে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন, বাড়ির একটা ঘরে থাকেন, বাকিটা ভাড়া দিয়েছেন। কোচিং আর ভাল লাগছে না তাই ছেড়ে দেবেন ঠিক করেছেন। বড়লোকদের ছেলেমেয়ে, কেউ বড় প্লেয়ার হওয়ার জন্য তো কোচিং নেয় না, অত খাটুনি ওদের পোষাবে কেন? একশো-দুশো টাকা দিয়ে কোচ রেখেছি, হাতে র‍্যাকেট নিয়ে ঘুরছি, অভিজাত ক্লাবে যাচ্ছি, এইটে দেখাবার জন্যই তো ওদের খেলার ভান করা। সহদেব মিশ্র তাই বিরক্ত হয়ে ঠিক করেছেন আর কোচিং করে সময় নষ্ট করবেন না। তবে মাসকাবারে কিছু টাকা তো ওঁর দরকার, তাই বাড়িতে গিয়ে ওঁকে ধরে বললাম, 'সহদেবদা, দুটো বাচ্চা ছেলে আছে, আপনার বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়, নেবেন ওদের?' রাজি হননি। অনেক বলার পর বললেন, 'আগে ওদের দেখব, তারপর হ্যাঁ কি না জানাব।' আমার কাছ থেকে ক্লাবের হদিসও নিলেন।"

"মা, কাল একটা লোক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখছিল!" চিনু বলল।

"আমিও লোকটাকে দেখেছি। কাঁচাপাকা চুল, সাইকেলে এসেছিল!" তন্ময় বললেন।

"তা হলে এই লোকটাই সহদেবদা। উনি সাইকেলেই কাছেপিঠে ঘোরেন।"

"বললে ছ' মাইল, সেটা কি খুব কাছেপিঠে হল!" তন্ময় অবাক হলেন।

"ছ' মাইলটা ওঁর কাছে নস্যি, কোনও ব্যাপারই নয়। বারো-চোদ্দো মাইল রেগুলার সাইকেলে ঘোরেন শরীরটাকে ফিট রাখার জন্য।"

"ঠাকুরপো, মিনু-চিনু সম্পর্কে কী বললেন উনি?" তপতী অধীর হয়ে উঠেছেন তাঁর ছেলেদের দেখে কী ধারণা হয়েছে জানার জন্য।

"সহদেবদা কম কথার মানুষ, শুধু বললেন, 'গুড'। আর জিজ্ঞেস করলেন বাবা-মা লেগে থাকতে পারবে তো? আমি ওঁকে আপনাদের সম্পর্কে সবই বলেছি।"

"কত নেবেন?" ভয়ে ভয়ে তপতী জানতে চাইলেন।

রাজেন কিন্তু কিন্তু করে বলল, "এক একজনের জন্য একশো টাকা মাসে, একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উনি এর কমে রাজি নন।"

তপতী চোখ বন্ধ করলেন। কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, "রাজি।"

"মাসে দুশো টাকা তো, হয়ে যাবে।" তন্ময় যোগ করলেন খুব সহজ গলায়।

তপতী দু' হাতের তালু দুই ছেলের মাথায় রেখে হাসলেন। ওরা জড়িয়ে ধরল মাকে।

অতঃপর এক একটি ঋতু আসে আর চলে যায়, মিনু আর চিনু ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। দেখতে দেখতে কেটে গেল পাঁচটা বছর। সহদের মিশ্রর কঠিন শিক্ষায় তারা ধাপে ধাপে খেলায় উন্নতি করে চলল। কোর্টের বাইরে তাদের

প্রতিটি পদক্ষেপ স্নেহ আর শাসনের সতর্ক প্রহরার দ্বারা মসৃণ করে তোলার জন্য তপতী আর তন্ময় তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিলেন। প্রতিদিন ভোরে কি শীতে কি বর্ষায় দুই ভাইকে ছুটতে দেখায় মহাদেবপুর অভ্যস্ত হয়ে গেছে। খরচ বেড়েছে। নতুন দু' জোড়া র‍্যাকেট কিনতে হয়েছে। আর কিনতে হয় প্রতি মাসে দু' ডজন বল। দু' দিকের বেস লাইনের পেছনে ছ্যাঁচাবাঁশের দরমা দিয়ে দশ ফুট উঁচু বেড়া তোলার জন্য প্রায় পাঁচশো টাকা খরচ করতে হয়েছে তন্ময়কে। এই বেড়া দেওয়ার ব্যাপারে ছোটখাটো অশান্তিও ঘটে গেল ক্লাবে। কমিটির অনেকেই আপত্তি তুলেছিল এই বলে, টেনিস কোর্টের জমিটা ক্লাবের সম্পত্তি। সেটা প্রাইভেট কোচিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে এবং বেড়া তুলতে দেওয়া যায় না।

প্রতিবাদ করেছিল রাজেন। তার বক্তব্য : মেম্বারদের ছেলেমেয়েদের যে কেউই চাঁদা দিয়ে খেলতে পারে, টাকা দিয়ে কোচিং নিতে পারে। কিন্তু দুটি ছেলে ছাড়া যদি আর কেউ না আসে তা হলে ক্লাব কী করতে পারে ? ছেলে দুটিকে কি খেলা বন্ধ করে দিতে হবে ? তা ছাড়া ক্লাবকে তো এখনও পর্যন্ত একটা পয়সাও খরচ করতে হয়নি ? ক্লাব থেকে পাওয়া গেছে শুধু পুরনো ফুটোয় ভরা একটা নেট। কোর্টের ঘাসকাটা, জল দেওয়া, ঘাস লাগানো ইত্যাদি কাজ করে কান্তি। সেজন্য ক্লাবের কাছ থেকে সে বাড়তি পারিশ্রমিক কখনও চায়নি। তা হলে আপত্তি উঠছে কেন ? রাজেন আরও বলেছিল, শুধু তাস আর ক্যারম খেললেই ক্লাব হয় না, আউটডোর খেলারও ব্যবস্থা থাকা চাই। এর পরও রাজেন এম জে টি এম-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে সবিস্তার জানায় তপতী ও তন্ময়ের এই টেনিস কোর্টটিকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা। এজন্য তাদের কত কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, সে কথাও রাজেন বলে। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং সেক্রেটারি কমল ভট্টাচার্যকে ডাকিয়ে এনে এম ডি নির্দেশ দেন ক্লাব মেম্বারদের ছেলেরা প্রাইভেট কোচিংয়ের জন্য কোর্ট ব্যবহার করতে এবং খেলার সুবিধার জন্য বেড়াও তুলতে পারবে। তিনি মনে করিয়ে দেন মহাদেবপুরের যাবতীয় জমির মালিকই এম জে টি এম।

এই ধরনের ছোটখাটো বাধা ছাড়া মিনু বা চিনুর খেলা তরতরিয়ে এগিয়েছে। তপতী ভোরে আর ছেলেদের সঙ্গে বেরোন না, তবে অতিরিক্ত ধকল এড়াতে দুই ছেলেকে বাড়ি থেকে স্কুলে আর স্কুল থেকে টেনিস কোর্টে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি গাড়ি নিয়ে বেরোন। শুধু দু'বারই সারাদিনে ভক্সহলকে ব্যবহার করা হয়। সাড়ে তিনটেয় স্কুল ছুটি হওয়ামাত্র দু'জনে ছুটতে ছুটতে এসে গাড়িতে ওঠে। যেতে যেতে গাড়ির মধ্যেই তপতীর হাতে গড়া চিজ স্যান্ডুইচ আর কলা খেয়ে নেয়, জুতো, শর্ট্স, জামা বদলে নেয় যাতে কোর্টে নামতে একমিনিটও দেরি না হয়। 'সার' ছ' মাইল সাইকেল চালিয়ে এসে কোর্টের ধারে চেয়ারে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য। দেরি হলে বলবেন, "পাঁচ মিনিট পিছিয়ে পড়লে, পঁচিশটা সার্ভিস কমে গেল।"

ভোর ঠিক পাঁচটায় বাংলোর ফটকে 'ক্রিং ক্রিং' দুবার সাইকেলের বেল

বাজবে। অন্ধকার থাকতেই সহদেব ছ' মাইল সাইকেল চালিয়ে এসে হাজির হয়ে যান। মিনু-চিনু অপেক্ষা করে থাকে, বেল বাজার সঙ্গেই বেরিয়ে আসে র‍্যাকেট হাতে। ওরা ছুটতে শুরু করে, ওদের পাশে পাশে একটা নির্দিষ্ট গতিতে সাইকেল চালান সহদেব। প্রথমে দৌড়ত তিন মাইল, এখন সেটা উঠেছে পাঁচ মাইল। সারা মহাদেবপুরটাকে তিনবার চক্কর দিয়ে ওরা আসে কোর্টে।

বালতি ভর্তি দু' ডজন বল নিয়ে শুরু হয় প্র্যাকটিস। কোর্টের একদিক থেকে পরের পর সার্ভ করে যায় মিনু। অন্যদিক থেকে সেগুলো রিটার্ন করে চিনু। সহদেব কোর্টের ধারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে শুধরে দেন কারোর কোনও ভুল হলে। নিজে পাশে গিয়ে দেখিয়েও দেন।

মিনুর একটা সার্ভ রিটার্ন করতে গিয়ে চিনুর র‍্যাকেটের কাঠে লাগল। বলটা অবশ্য মিস হিট সত্ত্বেও ফিরে এল নেটের এধারে।

"এখন তুমি নিজেকে কী বলবে ?" সহদেব প্রশ্ন করলেন চিনুকে।

"বলটাকে নজর করো, বলটাকে নজর করো।"

"জোরে জোরে বলো যাতে শোনা যায়। ম্যাচ খেলার সময় তোমার হয়ে এই কথাগুলো আমি তো আর বলতে পারব না। তোমাকেই এটা সবসময় নিজেকে মনে করাতে হবে। জোরে বলো, কেউ শুনতে পেল কি না তাতে বয়েই গেল, নিজেকে শোনানোটাই আসল কথা।"

পরের বলটা যখন চিনুর দিকে আসছে সে চেঁচিয়ে বলল, "বলটাকে নজর করো।" বলের দিকে চোখ রেখে সে মারল র‍্যাকেটের ঠিক মাঝখান দিয়ে। এর পর আবার একটা বল মিস হিট করতেই সারের শেখানো মতো সে চেঁচিয়ে নিজেকে ধমকাল, "বলটাকে নজর করছিস ?"

সহদেব লক্ষ করেছেন মারের পেছনে জোর দেওয়ার জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রয়োগের মধ্যে যে সামঞ্জস্য দরকার, চিনুর সেটা চমৎকারভাবে রয়েছে। ফলে সে তার শরীরের ওজন প্রতিটি স্ট্রোকে চাপিয়ে দিয়ে যে জোরটা বার করে আনে সেটা তার চেয়ে বেশি বলবান মিনুরই সমান বা তার চেয়েও বেশি। তিনি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যান ছোটভাইটির দৈহিক পরিবর্তন দেখে। পাঁচ বছর আগে দেখা রোগা, ছোটখাটো, দুর্বল গড়নের ছেলেটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তার বদলে সতেজ চারার মতো বাহু ও পায়ের পেশি নিয়ে পাঁচ ফুটের কাছাকাছি লম্বা ছেলেটি যেন মহীরুহ হয়ে ওঠার আভাস দিচ্ছে। তিনি জানেন এর জন্য দায়ী হাড়ভাঙা নিয়মিত পরিশ্রম আর ছেলেটির মা।

সকালের কাজ, সহদেব বলেন, 'ওয়ার্ক আউট', চলে দেড়ঘণ্টা। কোর্টের দু' ধার থেকে অবিরাম একজন ব্যাকহ্যান্ড অন্যজন রিটার্নে ফোরহ্যান্ড মেরে যায় সহদেবের নির্দেশিত জায়গাগুলোয়। তিনি মনে মনে গোনেন।

হাত ব্যথা করায় কেউ যদি র‍্যাকেট নামিয়ে নেয় অমনই গর্জন ওঠে, "ডোন্ট স্টপ, কন্টিনিউ, কন্টিনিউ... এখনও তেরোটা বাকি।"

ঘড়ি ধরে ঠিক আটটায় ওরা তিনজন বাড়ির পথ ধরে। মিনু জিজ্ঞেস করে,

"সার, আজ বিকেলে ভলি না সার্ভিস ?"

"দুটোই। সার্ভ, রিটার্ন অ্যান্ড ভলি। ... তিনবার বল হিট করার জন্য যদি কুড়ি সেকেন্ড ধরি, তা হলে মিনিটে তিনটে সার্ভ হলে দু' ঘণ্টায় ক'টা হয় ?" সহদেব নিরাসক্ত স্বরে সাইকেল ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলেন। দুই ভাই আমতা আমতা করছে দেখে বললেন, "দু' ঘণ্টায় হয় তিনশো ষাট... এত জানি পারবে না। আমাদের পাঁচ-ছ' ডজন বল নেই যে মেশিনগানের মতো ফায়ার করে যাবে। তার চেয়েও বড় কথা, এজন্য যে স্ট্যামিনা আর পাওয়ার দরকার, সেটাও এখনও তোমাদের গড়ে ওঠেনি... কিন্তু না উঠলেই বা, খাটতে খাটতেই গড়ে উঠবে। আজ দেখব কতখানি তোমরা পারো।"

দুই ভাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

"একটা ভাল ম্যাচ পাঁচ সেট গড়ালে কম করে পাঁচ মাইল কোর্টে ছোটাছুটি, বল হিট করতে হয়। এজন্য সবার আগে দরকার দুটো পায়ের জোর, শক্তি। যদি না বলের কাছেই যেতে পারো তা হলে বল মারবে কী করে ?... যখন খুব টায়ার্ড হয়ে পড়ো তখন শরীরের কোন জায়গাটায় প্রথম ব্যথা শুরু হয় ? তলপেটে। দৌড়লে তলপেটের মাস্‌ল মজবুত হয়। তোমরা এখন যতটা দৌড়চ্ছ সেটা আস্তে আস্তে এবার বাড়াতে হবে।"

"সার, স্কুলে যে ন'টার মধ্যে যেতে হবে !" দুই ভাইয়ের মধ্যে চিনু কিঞ্চিৎ অলস। সহদেবের দৌড় বাড়াবার পরিকল্পনাতে রাশ টানার চেষ্টায় সে বলল।

"ওইটেই তো হয়েছে মুশকিল... তোমাদের আর একটু বেশিক্ষণ কোর্টে থাকা দরকার।"

বাড়ি ফিরে স্নান সেরে খাওয়ার টেব্‌লে বসে তিনজন। সহদেব আবার ছ' মাইল সাইকেল চালিয়ে বাড়ি না গিয়ে, তন্ময় ও তপতীর অনুরোধে ছেলেদের ভাত খাওয়ার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে নেন। চারখানা হাতে-গড়া রুটি, ডাল, তরকারি আর সামান্য আচার। মাছ-মাংস খান না। খেতে খেতে তিনি নজর রাখেন মিনু-চিনুর পাতের দিকে। ছেলেদুটির খিদে অসম্ভব বেড়ে গেছে, কিন্তু সেজন্য গোগ্রাসে পেট ভরিয়ে খাওয়া সহদেবের চোখের সামনে অন্তত চলবে না। তাঁর কথায়, "খাদ্যগুলোকে হজম হওয়ার জন্য নড়াচড়ার জায়গা দরকার, পেটটা একটু খালি রাখো। বলটা গায়ের কাছে এসে পড়লে স্ট্রোক নেওয়ার জন্য জায়গা করে নিতে হয়। মিনু, কথাটা বুঝলে ?"

"বেলামাসি, আর ভাত নেব না।"

"নেবে না কেন ? ভাত না খেলে গতর হবে কী করে ?" বেলা ভাতের থালা হাতে কটমটিয়ে সহদেবের নির্বিকার মুখের দিকে তাকাল।

"গতর হবে, তবে গণেশ মার্কা নয়।"

"তবে কী মার্কা, মহিষাসুর ?"

"হোক না মহিষাসুর ! তবে ও নয়, ওর র‍্যাকেটটা।" সহদেব মুচকি হাসলেন, যেটা কদাচিৎ দেখা যায়। টেব্‌ল থেকে দুই ভাই উঠে পড়ল।

"দিদি, একটা কথা।" সহদেব তাকালেন এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা তপতীর দিকে। "ওদের ওয়ার্ক আউটের সময় বাড়াতে হবে। স্কুল থেকে কি একঘণ্টা আগে ওদের ছুটি করানো যায় ?"

"বলা মুশকিল। ওদের এখনকার হেডমাস্টার মিস্টার আচার্য চান মাধ্যমিকে ওঁর স্কুল থেকে নাইন্টি পারসেন্ট ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করুক। ছাত্ররা খেলাধুলো করুক, এটার ঘোর বিরোধী তিনি।"

"দুই ভাই স্কুল স্পোর্টসে এত যে ট্রফি জেতে, তার কোনও মূল্য নেই ? ওদের জন্য স্পেশ্যাল কনসিডার করা উচিত, শুধু ওদেরই জন্য।"

"আজ বলব, জানি না কনসিডার করবেন কি না।...একটা কথা সহদেববাবু, আমরা দু' বছরের জন্য মিনু-চিনুর টেনিসের পেছনে টাকা খরচ করব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আপনার হাতে পড়ে ওদের উৎসাহ আর খেলার মান এমন বাড়তে শুরু করল যে, আমরা আর বন্ধ করতে পারলাম না। এতে আমাদের আর্থিক দিক থেকে খুবই অসুবিধে হচ্ছে। ওদের ভাল জামা জুতো কিনে দিতে পারি না, প্রায়ই কলকাতায় বেড়াতে নিয়ে যেতাম, কিন্তু খরচের কথা ভেবে এখন আর তাও যেতে পারি না। বছরে একবার বাইরে কোথাও— দার্জিলিং, কি পুরী, কি জয়পুর বেড়াতে গেছি, কিন্তু গত পাঁচ বছর এই মহাদেবপুর ছেড়ে কোথাও আমরা যাইনি। খরচের ভয়ে অনেক সামাজিক কাজেও আমরা মিথ্যা অজুহাত দিয়ে যাইনি। আড়ালে অনেকেই আমাদের কঞ্জুস বলে থাকে। এই সবই আমরা সয়েছি একটা লক্ষ্য সামনে রেখে— আমাদের ছেলে দুটোর দিকে একদিন দেশের লোক তাকিয়ে থাকবে। এখন বলুন আমাদের আশা, আমাদের স্বপ্ন সফল হতে পারবে কি না, মিথ্যা মরীচিকার পেছনে ছুটছি কি না ?" তপতী আবেগ চাপতে চাপতে একটানা কথাগুলো বলে উন্মুখ হয়ে সহদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সহদেব মাথা নামিয়ে জবাবটা গুছিয়ে নিতে সময় নিলেন। তিনি আবেগপ্রবণ নন। শুকনো স্বরে বললেন, "আজ যদি বলেন আর আপনাকে টাকা দিতে পারব না আপনি বিদায় হোন, তা হলেও আধপেটা খেয়ে সাইকেল চালিয়ে এসে ভোরবেলায় আমি বেল বাজাব...।"

কথা অসমাপ্ত রাখলেন সহদেব, মিনু-চিনু পিঠে ব্যাগ আর ওয়াটারবট্‌ল হাতে হাজির হয়েছে। তপতী উঠলেন গাড়ি বার করার জন্য। এখান থেকে সহদেব আবার ফিরে যাবেন ক্লাবে। সেখানে দুপুরে দুটো টেব্‌ল জোড়া দিয়ে টানটান শুয়ে থাকেন চিত হয়ে। কান্তি তার মাথার বালিশটা দিতে চেয়েছিল, নেননি।

তপতীকে চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হল হেডমাস্টার আচার্যের দেখা পেতে। একজন শিক্ষক আসেননি, তাঁর ক্লাসটা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে তিনি তপতীকে ডেকে পাঠালেন।

তিন মিনিটেই তপতী তাঁর আবেদন শেষ করলেন।

"তা কী করে হয় !" হেডমাস্টার চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিলেন। "একঘণ্টা

আগে ছুটি দিতে হবে খেলার জন্য ? এ তো বড় অবাস্তব কথা। আপনার ছেলেরা শুধু খেলে, তার বেশি কিছু নয়। ওরকম তো শত শত ছেলে খেলে। তারা সবাই এসে যদি ছুটি চায় তা হলে স্কুল থেকে লেখাপড়ার পাট তো তুলে দিতে হয়। হ্যাঁ, যদি বুঝতাম ওরা কিছু একটা করেছে, এবার নিজেদের উন্নতির জন্য আরও বেশি ট্রেনিং দরকার, সেজন্য সময় দরকার, তা হলে কনসিডার করে দেখতে পারি। কিন্তু আপনার ছেলেরা যে মস্ত প্লেয়ার হবে সেই প্রতিশ্রুতির প্রমাণ তো চাই। একটা ট্রফি ফ্রফি এনে আগে তো দেখাক। মাপ করবেন মিসেস বসুমল্লিক, আমি ছুটি দিতে পারব না।"

পাংশু মুখে তপতী একটি কথাও না বলে হেডমাস্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। বিকেলে দুই ছেলেকে নিয়ে গেলেন ক্লাবে। সহদেব একটা বালতিতে চব্বিশটা বল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডানদিকের কোর্টের বেস লাইনের কাছে। নেটের ওধারে সার্ভিস বক্সের বাঁ কোণে একটা নীল রুমাল পাতা।

"মিনু, সার্ভিসগুলো ওই রুমালটায় ফেলতে হবে,...যাও শুরু করো।"

মিনু বালতি থেকে একের পর এক বল তুলে সার্ভ করে যেতে লাগল। শুধু দ্বাদশ সার্ভটা রুমালের কানা ছুঁয়ে গেল, তা ছাড়া পাঁচটা সার্ভ নেটে লাগল, চারটে পড়ল বাইরে। ওধারের বেস লাইন থেকে চিনু এগারোটা বল রিটার্ন পাঠাল। তার মধ্যে মিনু পাঁচটা ভলি করল চিনুর নাগালের বাইরে। সহদেব মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "কিস্‌সু হয়নি। রুমালে মাত্র একবার পড়ল, অন্তত দশবার ফেলতে হবে। ... আবার।"

চিবুক থেকে ঘাম ঝরছে, মিনুর মুখ থমথমে। আড়চোখে চেয়ারে বসা মায়ের দিকে তাকাতেই তপতী মুখটা আকাশের দিকে তুললেন। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে মিনু আবার শুরু করল। এবার রুমালে বল পড়ল তিনবার। তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম আর র‍্যাকেটের হাতল মুছে, মাটিতে তালু ঘষে মিনু বলল, "আবার।"

নেটের কাছে এগিয়ে এসে চিনু বলল, "সার, আমি সার্ভ করব না ?"

"না। যতক্ষণ না চব্বিশটায় বারোটা বল ফেলছে, মিনু সার্ভ করে যাবে।"

মিনুর ছিয়ানব্বইটা সার্ভ শেষে সহদেব বললেন, "মোট তেরোবার, ফিফটিন পার্সেন্টও নয়। মিনু, তুমি সার্ভ করতে শিখেছ ?"

"না সার। আমি আবার করব।" জেদি গলায় দাঁত চেপে মিনু বলল।

"হাত ভেরে গেছে তোমার, এবার চিনু।"

"না সার, আবার সার্ভ করব।"

"এখন থাক। তুমি কনসেনট্রেট করতে পারছ না। রুমালটা ছাড়া আর সব কিছু চোখ থেকে মুছে ফেলতে হবে মিনু। ওইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকো পাঁচ মিনিট।"

সহদেব রুমালটা তুলে এনে এধারের সার্ভিস বক্সের মাঝামাঝি জায়গায় পাতলেন। "শুরু করো।" রিটার্ন করার জন্য মিনুর বদলে র‍্যাকেট হাতে তিনি বেস লাইনে দাঁড়ালেন।

চিনু সার্ভ করল চব্বিশটা, তার মধ্যে আটটা পড়ল রুমালে। সহদেবের মুখে পলকের জন্য খুশির ছোঁয়া লেগেই মিলিয়ে গেল।

"মিনু এবার ওধারে যাও, চিনু আমার পাশে এসো।" সহদেব আর চিনু ডানদিকের কোর্টে বেস লাইনের মাঝামাঝি দাঁড়াল, নেটের ওধারে মিনু। দু' জনে সোজাসুজি বল মারছে তার দিকে। মিনু ব্যাকহ্যান্ড বা ফোরহ্যান্ডে বল ফেরত দিতে লাগল। সহদেব ক্রমশ একটু দূরে দূরে বল পাঠিয়ে তাকে বাধ্য করলেন যাতে ছুটে গিয়ে বল মারতে হয়। এর পর তিনি মারের তীব্রতা বাড়ালেন। সারা কোর্ট চষে ফেলে, এগিয়ে-পিছিয়ে দু' পাশে ছুটে গিয়ে মুহূর্তের জন্যও থামার অবকাশ না পেয়ে মিনুকে বল ফেরাতে হচ্ছে। কখনও ডানদিকে ছুটে লম্বা করে হাত বাড়িয়ে, তার থেকে ভলি করে বা বেস লাইন থেকে কুড়ি গজের ব্যাকহ্যান্ড মেরে। এলোপাতাড়ি ফেরানো নয়, যতটা সম্ভব চিনু আর সহদেবের নাগালের মধ্যে তাকে বল রাখতে হচ্ছে।

পাঁচ মিনিট পরই মিনু দাঁড়িয়ে পড়ল। হাপরের মতো ওঠানামা করছে তার বুক। র‍্যাকেট কোর্টের ওপর ঠেকিয়ে তাতে শরীরের ভার দু' হাতে রেখে মুখ নামিয়ে। সহদেব দু' মিনিট মিনুর দিকে তাকিয়ে থেকে কঠিন স্বরে বললেন, "আবার।"

"একটু জিরোই সার।"

"না।" সহদেব চেঁচিয়ে বললেন, "ম্যাচ খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে পড়লে কি পেটে যন্ত্রণা শুরু হলে, তখন কি তুমি খেলা বন্ধ করে জিরিয়ে নেবে?...যন্ত্রণার সঙ্গে সড়গড় হও। যন্ত্রণাকে হেসে উড়িয়ে দাও।"

"সার, আমি তো এখন ম্যাচ খেলছি না।" মিনু কাতর স্বরে বলল।

"না খেললেই বা! মনে মনে নিজেকে দেখো একটা শক্ত ম্যাচ খেলছ। তুমি পাঁচ মাইল দৌড়েছ, হাজারবার বল মেরেছ, শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি যন্ত্রণায় টাটাচ্ছে। এগুলো সহজ করে দিতে পারবে যদি আগেই যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়, যদি বুঝে নাও এটা কোনও বড় ব্যাপার নয়, এটা থাকবে না।" সহদেব কথা বলতে বলতে নেটের কাছে এলেন। ওয়ার্ক আউট থামিয়ে দিয়ে মাঝে মাঝে তিনি কথা বলেন দুই ভাইকে কাছে ডেকে নিয়ে। হাতছানি দিয়ে তিনি চিনুকে ডাকলেন।

"তোমরা হয়তো ভাবতে পারো চার মাইল পর্যন্ত দৌড়বার ক্ষমতা তোমাদের আছে, কিন্তু একটা কথা শুনে রাখো, যদি একটা বন্দুক তোমাদের মাথায় ঠেকাই তা হলে আবিষ্কার করবে আরও একটা মাইলও দৌড়তে পারো। এটা টেনিস ম্যাচেও খাটাও। বড় বড় প্লেয়াররা যখন খেলে, তখন একে অপরকে যন্ত্রণায় বিঁধোয়, তখন শুধু একটাই প্রশ্ন, কে আর একটু বেশি যন্ত্রণা দিতে ইচ্ছুক আর কে প্রথম পালাবে। হারতে যতটা সময় লাগে জিততেও ততটা সময় লাগে। ব্যাপারটা যদি তাই হয় তা হলে না জিতে শুধু শুধু যন্ত্রণার শাস্তিটা নেবে কেন? জেতার জন্য নিজেদের তৈরি করো। জিরোবার সবচেয়ে সহজ উপায় কী জানো?" সহদেব

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেন। "ওই চেয়ারটায় গিয়ে বসে পড়া। চলো, আমরা বসব এখন।"

"না।" মিনু তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, "আপনি গিয়ে বসুন... আয় চিনু।"

সহদেব চোখ কুঁচকে নেটের দু' দিকে দুই ভাইকে এগিয়ে যেতে দেখলেন। কী ভেবে তিনি কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে তপতীর পাশের খালি চেয়ারে বসলেন।

"আজ গেছলাম হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে।" তপতী প্রথম সুযোগেই কথাটা পাড়লেন। মিনু বা চিনু শুনুক এটা তিনি চান না। "উনি বললেন, এক ঘণ্টা আগে ছুটি দিতে পারবেন না। ওরা শুধুমাত্র খেলে, তার বেশি কিছু নয়। মস্ত প্লেয়ার হবে এমন প্রতিশ্রুতির প্রমাণ না পেলে উনি ছুটি দিতে পারবেন না।"

"কী প্রমাণ চান উনি?" সহদেব ভ্রূকুটি করলেন।

"বলেছেন আগে একটা ট্রফি এনে দেখাক।... আমার মনে হয় হেডমাস্টার অন্যায্য কিছু বলেননি। সত্যিই তো, যে লোক খেলাধুলো বোঝেন না তিনি ট্রফি দিয়েই প্রমাণ চাইবেন।"

"তা হলে আমাদের এখন দরকার একটা ট্রফি। তার মানে ছেলেদুটোকে এবার বাইরে বেরোতে হবে।" সহদেব মাথা নিচু করে জমির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"আপনার কি মনে হয় আরও একটা-দুটো বছর—" ইতস্তত করে তপতী থেমে গেলেন।

"না, না, এই বয়সেই কম্পিটিশনের মুখে পড়া দরকার। কাল আমি বি এল টি এ অফিসে যাব কোথায় কী টুর্নামেন্ট হবে খোঁজখবর করতে।"

॥ ৭ ॥

দশদিন পর মিনু, চিনু এবং তপতী, বেলা বারোটায় সহদেবের সঙ্গে ট্রেন থেকে নামল হাওড়া স্টেশনে। তারা যাবে নর্থ ক্যালকাটা টেনিস ক্লাবের টুর্নামেন্টে। মিনু আর চিনু এন্ট্রি করেছে। প্রতিযোগিতাটা খুবই ছোট মাপের এবং বড়দের জন্য। সহদেব এন্ট্রি তালিকাটা আগেই দেখে নিয়েছেন। নামী খেলোয়াড় একজনও নেই। কিছু জুনিয়ার আর কিছু সদ্য খেলা ছেড়ে দেওয়া প্রাক্তন নাম দিয়েছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে তারা ট্যাক্সি ধরে ক্লাবের ফটকে এসে নামল। বিরাট একটা পার্কের একধারে ক্লাব। ফটক থেকে মোরামের সরু পথ কিছুটা গিয়ে দু' ভাগ হয়ে দুটো টেনিস কোর্টকে বেড় দিয়ে মিলেছে ক্লাব-তাঁবুর সামনে। তাঁবুর বাইরে কয়েকটা বেঞ্চ আর চেয়ার। দু-তিনজন কথা বলল সহদেবের সঙ্গে। তাঁবুর বাইরে অল্প কিছু লোক। ওদের চেয়ারে বসিয়ে সহদেব তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেলেন। দুই ভাই সাউথ ক্লাব দেখেছে। সেখানকার গ্যালারি, ভিড়, ক্লাববাড়ি আর টানা বারান্দা তাদের মনে যে ছাপ ফেলেছে তার সঙ্গে এখানকার কোনও মিলই তারা পাচ্ছে না। তারা ভেবেছিল স্কুল স্পোর্টসের মতো জমজমাট একটা

ব্যাপার দেখবে।

চিনু ফিসফিস করে মিনুকে বলল, "খেলবে কে রে ?"

মিনু দু'ধারে তাকিয়ে বলল, "বোধ হয় আমরা আগে এসে পড়েছি।"

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে সহদেব জানালেন, মিনুর খেলা যার সঙ্গে পড়েছে সে আসতে পারবে না জানিয়েছে, পা মুচকে এখন সে বিছানায়। মিনু সেকেন্ড রাউন্ডে উঠে গেছে। চিনুর সঙ্গে খেলবে অদ্বৈত মল্লিক, এই ম্যাচটা দিয়েই টুর্নামেন্ট শুরু হবে এখনই! সহদেবের কথা শোনা মাত্রই মিনুর মুখ থেকে উদ্দীপনার চকচকে ভাবটা মুছে গেল। আর চিনু খুঁজতে লাগল অদ্বৈত মল্লিককে।

ইতিমধ্যে কোর্টের ধারে কিছু লোক জমা হয়েছে। মালি কয়েকটা টুল রেখে গেল সাইডলাইন আর বেসলাইনের ধারে লাইন্সম্যানদের জন্য। বকের মতো গলা, কোট, প্যান্ট, টাই পরা এক লম্বা লোক, চোখে পুরু কাচ দেওয়া চশমা, স্কোরশিট হাতে নিয়ে আম্পায়ারের উঁচু চেয়ারে বসলেন। তাঁর মুখের কাছে মাইক্রোফোন। লাইন্সম্যানরা টুলে বসল। দু' দিকের বেসলাইনের এবং নেটের দু' দিকে বলবয়রা হাজির হল। আম্পায়ার দু' বার গলাখাঁকরি দিয়ে মাইক পরীক্ষা করে প্লেয়ারদের নাম ডাকলেন।

চিনু ঢোঁক গিলে সহদেবের কানে চুপিচুপি কী একটা বলতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "টেন্টের মধ্যে ঢুকে একেবারে শেষে গিয়ে ডান দিকে। দেখবে দরজায় 'জেন্টস' লেখা আছে।"

মিনু ফিসফিস করে তপতীকে বলল, "চিনুটা ঘাবড়ে গেছে।"

"জীবনের প্রথম ম্যাচে সবাই ঘাবড়ায়, তুইও ঘাবড়াবি।"

"দেখা যাবে।"

অদ্বৈত মল্লিক কোর্টে নেমে পড়েছেন। হৃষ্টপুষ্ট, মাথায় সামান্য টাক, বয়স প্রায় চল্লিশ। অ্যাডভোকেট। বছর পনেরো আগে পর্যন্ত নিয়মিত প্রতিদিন খেলতেন, এখন শুধু শনি- রবিবারে। নর্থ ক্যালকাটা টুর্নামেন্ট দু' বার জিতেছেন। মল্লিক গেলেন বাঁ দিকের কোর্টে। গোটা ছয়েক নতুন বল একজন গড়িয়ে দিল। মল্লিক একটা বল তুলে নিয়ে সার্ভ করলেন ওধারের ফাঁকা কোর্টে। বলবয় বল ছুড়ে দিল তাঁকে। তিনি আবার একটা সার্ভ করে তাকালেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পাওয়ার আশায়।

"মা, চিনুর বোতামটা !" মিনু আঙুল দিয়ে দেখাল। তারপর চাপা গলায় বলল, "অ্যাই চিনু, কোমরের বোতাম লাগা।" কোমরে হাত দিয়ে চিনু জিভ কাটল।

কোর্টের ধারে একটা চেয়ারে নিরাসক্ত মুখ করে সহদেব একা বসে। চিনু মাকে প্রণাম করে, কপালে চুমু নিয়ে কোর্টের দিকে এগোতেই তপতী মনে করিয়ে দিলেন, "সারকে।"

সহদেব তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে প্রণামে নত চিনুকে দু' কাঁধ ধরে তুললেন। বুকে জড়িয়ে মৃদু স্বরে বললেন, "আমার দিকে তাকাবে না, মনে রেখো কোর্টের

মধ্যে তুমি একা, নিজেকে নিজেই দেখতে হবে।"

অদ্বৈত মল্লিক হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন চিনুর দিকে অন্তত কুড়ি সেকেন্ড। তিনি ভাবতে পারেননি একটা বালকের সঙ্গে তাঁকে খেলতে হবে। টস করার সময় মল্লিক জিজ্ঞেস করলেন, "খোকা, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?"

চিনু গম্ভীর স্বরে বলল, "ক্লাস সিক্স।"

মল্লিক টস জিতে সার্ভিস নিলেন। ওয়ার্ম-আপের শুরুতে তিনি ফোরহ্যান্ডে প্রথম বলটা পাঠালেন নেটের ওধারে। চিনুর ফোরহ্যান্ড রিটার্ন লাগল নেটে। মল্লিক আবার বল পাঠালেন। চিনু আবার নেটে বল মারল।

মল্লিক নেটের কাছে এসে হাতছানি দিয়ে চিনুকে ডাকলেন। "র‍্যাকেট কাঁধের আর একটু ওপরে তুলে এইভাবে নামিয়ে ফোরহ্যান্ড মারো।" তিনি র‍্যাকেট চালিয়ে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে মারতে হবে। "মনে থাকবে?"

চিনু বিনীতভাবে মাথা নাড়ল।

প্রথম সার্ভিস করলেন মল্লিক। চিনুর ফোরহ্যান্ড নেটের এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে সাইডলাইন বরাবর বেসলাইনের কাছে পড়ল। জীবনের প্রথম ম্যাচে প্রথম পয়েন্ট! সে প্রথমে সহদেবের, তারপর মা আর দাদার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল। সহদেব মাথাটা সামান্য হেলালেন, মিনু দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিল, তপতী দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজলেন। মল্লিক দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। পরের সার্ভিসটার সঙ্গে চিনু একই আচরণ করল। মল্লিকের চোখ আর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। তৃতীয় সার্ভিসের ফোরহ্যান্ড রিটার্ন মল্লিকের বুকের কাছে এল, তিনি ভলি করে চিনুর ডান দিকে বল ফেলতেই ফোরহ্যান্ডে সে বাঁ দিকের ফাঁকা কোর্টে বল মারল। চিনু জীবনের প্রথম গেমটা পেল মল্লিক ডাব্‌ল-ফল্ট করায়। সময় লাগল দু' মিনিট। ম্যাচ শেষ হল পঁচিশ মিনিটে : ৬-১, ৬-০। হ্যান্ডশেক করার সময় মল্লিক বললেন, "আমার কথাগুলো মনে রেখেছিলে তা হলে...গুড মেমারি।"

ঘড়ি দেখে সহদেব বললেন, "মাত্র দুটো বাজে। চলুন দিদি, একবার সাউথ ক্লাব ঘুরে আসি। বেঙ্গলের ভাল জুনিয়াররা ওখানে প্র্যাকটিস করছে। ওরা একবার দেখুক।"

বাইরে বেরিয়ে এসে সহদেব বললেন, "বাসে করে চলে যাই, মিছিমিছি কেন ট্যাক্সি ভাড়া দেবেন।"

তপতী বললেন, "দোব। এটা ছেলেদের ব্যাপার।"

কিন্তু ছেলেরা একসঙ্গে বায়না ধরল তারা জীবনে কখনও বাসে-ট্রামে চড়েনি, সুতরাং বাসেই যাবে। চিনু বলল, "সার ট্রামে যাব।" সহদেব বললেন, "এখান থেকে ট্রাম টানা এলগিন রোড পর্যন্ত যায় না, এসপ্ল্যানেডে নেমে আবার ট্রামে উঠতে হবে। তা ছাড়া বাস তাড়াতাড়ি যায় ট্রামের থেকে।"

বাসে উঠে কুড়ি মিনিট পর চৌরঙ্গি-এলগিন রোডের মোড়ে নেমে ওরা হেঁটে সাউথ ক্লাবে পৌঁছল। আটটা কোর্টে তখন খেলা চলছে। চারদিকে শুধু খল্‌ব

খল্‌ব খল্‌ব শব্দ। তিনজন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। একটা কোর্টের ধারে সহদেব ওদের নিয়ে গেলেন, মাঝবয়সি একটি লোক সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ষোলো-সতেরো বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে খেলছে। সহদেব বললেন, "যে ট্রেনিং করাচ্ছে ওর নাম সৈদুল। আগে বলবয় ছিল, আমার চেনা।"

খুব জোরে মারা একটা ক্রশকোর্ট ফোরহ্যান্ডে সৈদুল র‍্যাকেট ছোঁয়াতে পারল না। বলটাকে কোর্টের বাইরে লুফল মিনু। সৈদুল বলটা চাইল র‍্যাকেট বাড়িয়ে ধরে, আর সেই সময় দেখতে পেল সহদেবকে। হাত তুলে সে চেনা দিল।

"সৈদু শোন," সহদেব হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

"আরে দেবুদা, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" একগাল হেসে সৈদুল হাত জড়িয়ে ধরল সহদেবের। "কী করছ এখন? আছ কোথায়?"

"এই ছেলে দুটোকে নিয়ে আছি মহাদেবপুর বলে একটা জায়গায়, আমার বাড়ির কাছেই।"

সৈদুল হাসিমুখে মিনু-চিনুর দিকে তাকাল। "এদের শেখাচ্ছ? ভাল।"

"তোর ওই ছেলেটা তো বেশ ভালই খেলে। নাম কী?"

"অরুণ, অরুণ মেটা। এখন জুনিয়ার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান। লাস্ট ইয়ারে জুনিয়ার ন্যাশানাল রানার্স হয়েছে, ফাইনালে হেরেছিল ম্যাড্রাসের মুথান্নার কাছে।"

"সৈদু একটা কাজ করবি? তোর ওই ছেলেটার সঙ্গে একে একটা সেট খেলাবি?" সহদেব আঙুল দিয়ে মিনুকে দেখালেন, "ওর নাম মৃন্ময়।"

"বেশ তো, খেলুক। তুমি যখন চাইছ তখন নিশ্চয় ওর স্ট্যান্ডার্ড ভাল।"

"সেইটে দেখার জন্যই খেলাতে চাই। মিনু এখনও পর্যন্ত একটা গেমও বাইরের কারো সঙ্গে খেলেনি।"

সৈদুল নেটের কাছে গিয়ে অরুণের সঙ্গে কথা বলে হাতছানি দিয়ে মিনুকে কোর্টে নামতে বলল। সহদেব মিনুর কাঁধ ধরে সাইডলাইন পর্যন্ত গেলেন, "এটা ম্যাচ খেলা নয় ফ্রেন্ডলি খেলা, রিল্যাক্সড থাকবে। সঙ্কোচে গুটিয়ে যেয়ো না, মনে রেখো অরুণ তোমার মতই জুনিয়ার, ঘাবড়াবার কিছু নেই। খোলাখুলি সহজ মনে হিট করো।"

"দাদা," চাপা স্বরে চিনু বলল, "তুই 'জেন্টসে' যাবি না?"

আগুনে-চোখে ভাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে মিনু কোর্টে নামল। ওয়ার্ম-আপ করার সময় কামানের গোলার মতো অরুণের প্রথম সার্ভিসটায় র‍্যাকেট ছোঁয়াতেই মিনুর মুঠোর মধ্যে র‍্যাকেটটা সামান্য ঘুরে গেল। সে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরল। মিনিট তিনেক পর সৈদুল নেটের পাশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, "নাউ স্টার্ট...সার্ভিস অরুণ মেটা, লাভ-অল।"

দশ মিনিটের মধ্যেই মিনুর সার্ভিস দু'বার ভেঙে অরুণ স্কোর নিয়ে গেল ৩-০। প্রচণ্ড জোরালো মারগুলো কোর্টের ঘাসগুলোকে নয়, যেন মিনুর মাথার মধ্যে আঘাত করে করে তাকে অসাড় করে দিয়েছে। তার র‍্যাকেট উঠছে না, দুটো পা

মধ্যে তুমি একা, নিজেকে নিজেই দেখতে হবে।"

অদ্বৈত মল্লিক হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন চিনুর দিকে অন্তত কুড়ি সেকেন্ড। তিনি ভাবতে পারেননি একটা বালকের সঙ্গে তাঁকে খেলতে হবে। টস করার সময় মল্লিক জিজ্ঞেস করলেন, "খোকা, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?"

চিনু গম্ভীর স্বরে বলল, "ক্লাস সিক্স।"

মল্লিক টস জিতে সার্ভিস নিলেন। ওয়ার্ম-আপের শুরুতে তিনি ফোরহ্যান্ডে প্রথম বলটা পাঠালেন নেটের ওধারে। চিনুর ফোরহ্যান্ড রিটার্ন লাগল নেটে। মল্লিক আবার বল পাঠালেন। চিনু আবার নেটে বল মারল।

মল্লিক নেটের কাছে এসে হাতছানি দিয়ে চিনুকে ডাকলেন। "র‍্যাকেট কাঁধের আর একটু ওপরে তুলে এইভাবে নামিয়ে ফোরহ্যান্ড মারো।" তিনি র‍্যাকেট চালিয়ে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে মারতে হবে। "মনে থাকবে?"

চিনু বিনীতভাবে মাথা নাড়ল।

প্রথম সার্ভিস করলেন মল্লিক। চিনুর ফোরহ্যান্ড নেটের এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে সাইডলাইন বরাবর বেসলাইনের কাছে পড়ল। জীবনের প্রথম ম্যাচে প্রথম পয়েন্ট! সে প্রথমে সহদেবের, তারপর মা আর দাদার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল। সহদেব মাথাটা সামান্য হেলালেন, মিনু দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিল, তপতী দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজলেন। মল্লিক দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। পরের সার্ভিসটার সঙ্গে চিনু একই আচরণ করল। মল্লিকের চোখ আর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। তৃতীয় সার্ভিসের ফোরহ্যান্ড রিটার্ন মল্লিকের বুকের কাছে এল, তিনি ভলি করে চিনুর ডান দিকে বল ফেলতেই ফোরহ্যান্ডে সে বাঁ দিকের ফাঁকা কোর্টে বল মারল। চিনু জীবনের প্রথম গেমটা পেল মল্লিক ডাব্‌ল-ফল্ট করায়। সময় লাগল দু' মিনিট। ম্যাচ শেষ হল পঁচিশ মিনিটে : ৬-১, ৬-০। হ্যান্ডশেক করার সময় মল্লিক বললেন, "আমার কথাগুলো মনে রেখেছিলে তা হলে...গুড মেমারি।"

ঘড়ি দেখে সহদেব বললেন, "মাত্র দুটো বাজে। চলুন দিদি, একবার সাউথ ক্লাব ঘুরে আসি। বেঙ্গলের ভাল জুনিয়াররা ওখানে প্র্যাকটিস করছে। ওরা একবার দেখুক।"

বাইরে বেরিয়ে এসে সহদেব বললেন, "বাসে করে চলে যাই, মিছিমিছি কেন ট্যাক্সি ভাড়া দেবেন।"

তপতী বললেন, "দোব। এটা ছেলেদের ব্যাপার।"

কিন্তু ছেলেরা একসঙ্গে বায়না ধরল তারা জীবনে কখনও বাসে-ট্রামে চড়েনি, সুতরাং বাসেই যাবে। চিনু বলল, "সার ট্রামে যাব।" সহদেব বললেন, "এখান থেকে ট্রাম টানা এলগিন রোড পর্যন্ত যায় না, এসপ্ল্যানেডে নেমে আবার ট্রামে উঠতে হবে। তা ছাড়া বাস তাড়াতাড়ি যায় ট্রামের থেকে।"

বাসে উঠে কুড়ি মিনিট পর চৌরঙ্গি-এলগিন রোডের মোড়ে নেমে ওরা হেঁটে সাউথ ক্লাবে পৌঁছল। আটটা কোর্টে তখন খেলা চলছে। চারদিকে শুধু খল্‌ব

খল্‌ব খল্‌ব শব্দ। তিনজন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। একটা কোর্টের ধারে সহদেব ওদের নিয়ে গেলেন, মাঝবয়সি একটি লোক সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ষোলো-সতেরো বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে খেলছে। সহদেব বললেন, "যে ট্রেনিং করাচ্ছে ওর নাম সৈদুল। আগে বলবয় ছিল, আমার চেনা।"

খুব জোরে মারা একটা ক্রশকোর্ট ফোরহ্যান্ডে সৈদুল র‍্যাকেট ছোঁয়াতে পারল না। বলটাকে কোর্টের বাইরে লুফল মিনু। সৈদুল বলটা চাইল র‍্যাকেট বাড়িয়ে ধরে, আর সেই সময় দেখতে পেল সহদেবকে। হাত তুলে সে চেনা দিল।

"সৈদু শোন," সহদেব হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

"আরে দেবুদা, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" একগাল হেসে সৈদুল হাত জড়িয়ে ধরল সহদেবের। "কী করছ এখন? আছ কোথায়?"

"এই ছেলে দুটোকে নিয়ে আছি মহাদেবপুর বলে একটা জায়গায়, আমার বাড়ির কাছেই।"

সৈদুল হাসিমুখে মিনু-চিনুর দিকে তাকাল। "এদের শেখাচ্ছ? ভাল।"

"তোর ওই ছেলেটা তো বেশ ভালই খেলে। নাম কী?"

"অরুণ, অরুণ মেটা। এখন জুনিয়ার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান। লাস্ট ইয়ারে জুনিয়ার ন্যাশানাল রানার্স হয়েছে, ফাইনালে হেরেছিল ম্যাড্রাসের মুথান্নার কাছে।"

"সৈদু একটা কাজ করবি? তোর ওই ছেলেটার সঙ্গে একে একটা সেট খেলাবি?" সহদেব আঙুল দিয়ে মিনুকে দেখালেন, "ওর নাম মৃন্ময়।"

"বেশ তো, খেলুক। তুমি যখন চাইছ তখন নিশ্চয় ওর স্ট্যান্ডার্ড ভাল।"

"সেইটে দেখার জন্যই খেলাতে চাই। মিনু এখনও পর্যন্ত একটা গেমও বাইরের কারো সঙ্গে খেলেনি।"

সৈদুল নেটের কাছে গিয়ে অরুণের সঙ্গে কথা বলে হাতছানি দিয়ে মিনুকে কোর্টে নামতে বলল। সহদেব মিনুর কাঁধ ধরে সাইডলাইন পর্যন্ত গেলেন, "এটা ম্যাচ খেলা নয় ফ্রেন্ডলি খেলা, রিল্যাক্সড থাকবে। সঙ্কোচে গুটিয়ে যেয়ো না, মনে রেখো অরুণ তোমার মতই জুনিয়ার, ঘাবড়াবার কিছু নেই। খোলাখুলি সহজ মনে হিট করো।"

"দাদা," চাপা স্বরে চিনু বলল, "তুই 'জেন্টসে' যাবি না?"

আগুনে-চোখে ভাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে মিনু কোর্টে নামল। ওয়ার্ম-আপ করার সময় কামানের গোলার মতো অরুণের প্রথম সার্ভিসটায় র‍্যাকেট ছোঁয়াতেই মিনুর মুঠোর মধ্যে র‍্যাকেটটা সামান্য ঘুরে গেল। সে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরল। মিনিট তিনেক পর সৈদুল নেটের পাশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, "নাউ স্টার্ট...সার্ভিস অরুণ মেটা, লাভ-অল।"

দশ মিনিটের মধ্যেই মিনুর সার্ভিস দু'বার ভেঙে অরুণ স্কোর নিয়ে গেল ৩-০। প্রচণ্ড জোরালো মারগুলো কোর্টের ঘাসগুলোকে নয়, যেন মিনুর মাথার মধ্যে আঘাত করে করে তাকে অসাড় করে দিয়েছে। তার র‍্যাকেট উঠছে না, দুটো পা

চলছে না। শুধু দেখল তার দুপাশ দিয়ে বলগুলো ঘাসে পড়ে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

অরুণ কোমরে হাত রেখে সৈদুলের দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে। 'আরও কি খেলতে হবে ?' এমন একটা ভাব তার দাঁড়াবার ভঙ্গিতে। মিনু তাকাল সহদেবের দিকে। 'দেখি এবার তুমি কী করো', এমন একটা ভাব সহদেবের মুখে।

চতুর্থ গেমে সার্ভিস করেই মিনু এতক্ষণ যা করেনি, নেটের দিকে ছুটে গেল। রিটার্নটা উঁচু হয়ে তার বাঁ দিকে এল। অরুণের নাগালের বাইরে সেটা ভলি করে মিনু পয়েন্ট পেল। তার পরের সার্ভিস পড়ল বক্সের কোণে। অরুণ দাঁড়িয়ে থেকে 'এস'টা দেখল। পরের দুটো সার্ভিসও একই জায়গায় পড়ল। পরপর তিনটে সার্ভিস 'এস' হতে দেখে বিস্মিত সৈদুল হাততালি দিয়ে হাঁকল, "ওয়ান-থ্রি।"

চিনু ফিসফিস করে তার মায়ের কানে বলল, "সারের রুমালটাকে তিন বলে তিনবার হিট করল।"

মিনুর মাথার মধ্যে যে খিলটা পড়ে ছিল এবার সেটা খুলে গেছে। অরুণের জোরালো মারগুলো আর তাকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছে না । সহজ বাতাস তার সারা শরীরের মধ্যে ভাসছে। সে স্বচ্ছন্দে এগোচ্ছে, পিছোচ্ছে, পাশে ছুটছে দ্রুতগতিতে। চার মিনিটের মধ্যে অরুণের সার্ভিস ভেঙে সে ৩-৩-এ স্কোর নিয়ে গেল। অরুণ তখন হাঁফাচ্ছে।

অরুণ সৈদুলের কাছে গিয়ে বলল, "আর খেলব না, পিঠের ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে।" র‍্যাকেট-ধরা হাতটা মিনুর দিকে একবার তুলে সে ক্লাবহাউসের দিকে হাঁটতে শুরু করল কোনওদিকে দৃকপাত না করে।

"বড়লোকের ছেলে, কখন কী মর্জি হয় !" সৈদুল অপ্রতিভ স্বরে বলল। "দিনে দেড়ঘণ্টার বেশি ট্রেনিং করে না। বলে বলেও ওকে দৌড় করাতে পারিনি। মৃন্ময়ের স্পিড, স্ট্যামিনা তো খুব ভাল !"

"অরুণের খেলা উচিত ছিল।" সহদেব বললেন। তাঁর মনে হয়েছে, অরুণের পিঠব্যথাটা অজুহাত, আসলে সে পালাল। যারা পালায় তারা কখনওই জেতে না। তবে মনে মনে তিনি খুশি। আজ একটা ব্যাপার তিনি জেনে গেলেন, মিনু বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হওয়ার মতো খেলা খেলতে পারে।

নর্থ ক্যালকাটা টুর্নামেন্টে চিনু দ্বিতীয় রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে হেরে গেল প্রদীপ ঘোষের কাছে। যে গত বছর সিনিয়ার স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল। তিনদিন পর রবিবারে মিনু ২-১ সেটে প্রদীপ ঘোষকে হারাল ফাইনালে। একটা বড় কাপ, একটা মেডেল আর তিনজন আরোহীকে ভক্সহলে বসিয়ে তন্ময় মহাদেবপুর ফিরলেন। সহদেবকে এক পুরনো বন্ধু বাড়িতে ধরে নিয়ে যাওয়ায় তিনি আর এদের সঙ্গে ফেরেননি।

বাড়ির কাছে এসে তন্ময়ের কী মনে হল, তিনি বললেন, "চলো একবার ক্লাবটা

ঘুরে আসি। রোববারে অনেকেই থাকবে।"

ক্লাব-লনের প্রায় সবক'টা টেব্‌লই ভরা। একটা বড় কাপ দু' হাতে ধরে মিনু আর তার পেছনে তন্ময়, চিনু আর তপতীকে ঢুকতে দেখে সকলেই অবাক চোখে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইল।

তন্ময় একটু গলা চড়িয়ে বললেন, "আমাদের টেনিস কোর্টের প্রথম ফসল।" কাপটা তিনি মাথার ওপর তুললেন। "মিনু আজ নর্থ ক্যালকাটা টুর্নামেন্ট থেকে জিতে আনল।"

হই-হইয়ের সঙ্গে হাততালির শব্দ উঠল। অবশ্য কেউ কেউ হাততালি দিলেন না, গলা থেকে আওয়াজও বার করলেন না। কান্তি চায়ের ট্রে নিয়ে আসছিল। একটা টেব্‌লে ট্রে-টা রেখে ছুটে এসে কাপটা মাথায় তুলে এমনভাবে ঘুরতে শুরু করল, যেন সেটা সে নিজেই জিতেছে! টেনিস কোর্টটা প্রথম দিন থেকে তার হাতেই লালিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। উচ্ছ্বাস ধরে রাখা তার পক্ষে সত্যিই খুব কঠিন। প্রত্যেক টেব্‌লে সে কাপটা দেখাতে দেখাতে অবশেষে প্রতিভা মজুমদারের টেব্‌লে রাখল।

"দেখুন মেমসাব, সেই ছোট্ট মিনু কাপ জিতে এনেছে।"

"দেখেছি, এবার এটা টেব্‌ল থেকে সরাও, আর চায়ের একটা পট দিয়ে যাও।"

"দিচ্ছি। রুপোর কাপ তাই না? দাম কত হবে বলুন তো?"

"রুপো না ছাই। পেতলের ওপর রুপোর জল-করা।"

কান্তি অপ্রতিভ হয়ে কাপটা তুলে নিল।

"হোক পেতল, সবাইকে হারিয়ে জিতেছে তো!"

কান্তি চলে যেতেই সুধা ঘোষাল বললেন, "নর্থ ক্যালকাটা টুর্নামেন্টের নাম তো কখনও শুনিনি।"

"এরকম টুর্নামেন্ট কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় হয়, শুনবে কী করে?" প্রতিভা বললেন।

"প্রতিভাদি, দোকান থেকে কিনে এনে দেখাচ্ছে না তো?" চন্দ্রিমা দত্ত ফোড়ন কাটলেন।

"ওহ্‌হো, একটা কথা তো বলা হয়নি।" সুধা ঘোষাল টেব্‌লে ঝুঁকে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো মাথা। "মিসেস বসুমল্লিক ছেলেদের খেলার প্র্যাকটিসের জন্য এক ঘণ্টা আগে স্কুল থেকে ছুটি করাতে হেডমাস্টার আচার্যর হাতে পায়ে ধরেছিলেন, জানেন কি?"

"না তো! তারপর কী হল?" প্রতিভার দমবন্ধ হয়ে এল এমন একটা খবরের সন্ধান পেয়ে। "কে বলল তোমায়?"

"রমু বলল। ওর ক্লাসেই তো পড়ে হেডমাস্টারের ভাগ্নে। কিন্তু হেডমাস্টারকে জানেন তো, খুব কড়া লোক। তিনি ওসব হাতে পায়ে ধরাধরি, কান্নাকাটিতে গলে যাওয়ার পাত্র নন। দিলেন এককথায় তাড়িয়ে। বললেন, 'কী এমন করেছে আপনার ছেলে। ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান হয়েছে কি? একটাও বড়

টুর্নামেন্ট জিতেছে কি ? কী দেখে আমি ছুটি অ্যালাও করব ?' শুনেই মুখ চুন করে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।"

"এবার তো উনি এই কাপটা নিয়ে গিয়ে হেডমাস্টারকে দেখিয়ে ছুটি আদায় করবেন।" চন্দ্রিমা বিপন্ন স্বরে বললেন।

"করলেই হল ? রমুর বাবা কী বলল জানেন, তা হলে একটা কাপ কিনে হেডমাস্টারকে দেখিয়ে বলব, রমুকে এক ঘণ্টা আগে ছুটি দিতে হবে, ডায়মন্ড হারবারে ওয়াকিং কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে, হাঁটায় ওর দারুণ প্রতিভা, ওর আরও প্র্যাকটিস দরকার।" বলেই সুধা ঘোষাল হাসতে হাসতে চন্দ্রিমার গায়ে প্রায় গড়িয়ে পড়লেন। অন্য দু'জনও খুকখুক শব্দ করলেন।

"একটা জিনিস লক্ষ করেছ, টেনিস খেলাকে ছুতো করে বসুমল্লিকরা জমিটাকে নিজেদের সম্পত্তি করে ফেলেছে। কাউকে তো খেলতেই দেয় না!" প্রতিভা বললেন গলায় ক্ষোভ নিয়ে।

"যা বলেছেন!" চন্দ্রিমা সূত্রটা ধরে নিয়ে যোগ করলেন, "অনিরুদ্ধ বাগচির কেসটা জানেন তো ? ছেলেটা যে কী ভাল, কী বলব! রীতিমতো চাঁদা দিয়ে টেনিস খেলতে পাঠিয়েছিল ওর বাবা। কোথায় খেলা! শুধু নিজের ছেলে দুটোকে খেলাতেই উনি ব্যস্ত, অনিরুদ্ধ বেচারি চুপচাপ শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে ওর ঠাকুমা রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই বলে নাতিকে নিয়ে চলে আসেন।"

"যাক গে এসব কথা, কান্তি চা আনছে, চুপ করো।" প্রতিভা হুঁশিয়ার করে দিলেন।

ওদের টেব্‌লের পাশের টেব্‌লেই স্ত্রী বরুণাকে নিয়ে বসে ছিলেন এম জে টি এম-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার সুভাষ সেন। ওঁর ছেলে শঙ্কু শান্তিনিকেতনে চলে যাবে, টেনিস খেলবে না, তবুও তিনি তপতীকে চাঁদা দিয়েছিলেন, কারণ বাচ্চাদের খেলাধুলোর প্রয়োজনটা তিনি বোঝেন। পাশের টেব্‌লের কথাবার্তার অনেকটাই তাঁদের কানে এসেছে।

"শুনলে, কী সব কথা বলল ?" সুভাষ সেন স্ত্রীকে বললেন।

"কেউ ভাল কিছু করলে এইসব পুরস্কারই তার জোটে।"

"শঙ্কু যদি এখানে থাকত, তা হলে নিশ্চয় আমি ওকে টেনিস খেলতে পাঠাতাম। লক্ষ করেছ ওঁর দুটি ছেলের কী চমৎকার স্বাস্থ্য তৈরি হয়েছে! হাঁটাচলায় কত স্মার্ট! ছোটটি পাঁচ বছর আগে কী রুগ্‌ণ দেখতে ছিল, রীতিমতো তো ধুঁকত। আর এখন ?" সুভাষ সেনের স্বরে প্রশংসার সঙ্গে শ্রদ্ধাও ফুটে উঠল। "সবই ওই দু'জনের জন্য।"

"সত্যিই, কষ্ট করেছেন ওদের বাবা মা।" বরুণার গলায় অকৃত্রিম সহানুভূতি। "মিসেস বসুমল্লিককে ছেঁড়া ব্লাউজ সেলাই করে পরতে দেখেছি। তন্ময়বাবুর জুতোটা দেখেছ ? তোমার বেয়ারাও ওর থেকে ভাল জুতো পরে। অথচ ছেলেদের জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করেন না। টেনিসের কোচকেই ওঁরা দেন মাসে দুশো টাকা, ভাবতে পারো ?"

ভাবতে পারেননি তপতী, মিনুর নর্থ ক্যালকাটা টুর্নামেন্ট জেতার প্রতিক্রিয়া এমন হবে।

সোমবার তিনি ছেলেদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার সময় কাপটাও সঙ্গে নিয়ে গেছলেন হেডমাস্টারকে দেখাবার জন্য। গিয়ে শুনলেন তিনি আজ স্কুলে আসবেন না, কলকাতায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মিটিংয়ে গেছেন। কাপটা হেডমাস্টারের টেব্‌লের একধারে রেখে তপতী বেয়ারাকে বলে আসেন, "ওঁকে বোলো, ক্লাস এইটের বি সেকশনের মৃন্ময় বসুমল্লিক এটা জিতে এনেছে কলকাতা থেকে। আমি কাল এসে নিয়ে যাব।"

পরদিন গাড়ি থেকে নেমে তপতী দুই ছেলের সঙ্গে স্কুলের বড় ফটক দিয়ে ঢুকে স্কুলবাড়ির কোলাপসিব্‌ল ফটকের দিকে এগোচ্ছেন, তখন একটি বড় ছেলে চেঁচিয়ে বলল, "কী রে মৃন্ময়, কাকে হারিয়ে কাপটা পেলি, কৃষ্ণনকে, না জয়দীপ মুখার্জিকে ?"

ওরা তিনজন থমকে পাঁচটি ছেলের জটলার দিকে তাকাল। চিনু চাপা গলায় বলল, "দাদা প্রণবেন্দু বলল, চুপ করে থাক, কথা বলিসনি।"

তিনজন কোলাপসিব্‌ল ফটকের কাছে পৌঁছেছে তখন তাদের কানে এল, "জিতে আনলি না কিনে আনলি ?"

কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওদের পা অচল হয়ে পড়ল। তপতী তাকালেন মিনুর মুখের দিকে। অপমানে আর বেদনায় মুখটা দিশাহারা। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, জল ভরে আসছে চোখে। কথাগুলোর ধাক্কা ওর বুকে বেজেছে। "তাড়াতাড়ি ক্লাসে যা।" তপতী দুই ছেলের পিঠে হাত রেখে ঠেলা দিলেন। "এসব কথায় জবাব দিলে ওরা আশকারা পেয়ে আরও বলবে, ক্লাসে যা।"

"মা, আমি প্রণবেন্দুকে মারব।" চিনু জ্বলন্ত চোখে ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে হাত মুঠো করল।

"মারবে ? কেন ?"

"দাদাকে অপমান করেছে, আমাদের সবাইকে, তোমাকে, বাবাকে মিথ্যেবাদী, জোচ্চর বলল।"

"বলতে দে। মিনু, ক্লাসে যা। চিনু খবর্দার, যদি মারপিট করিস তা হলে আমি লজ্জায় মরে যাব।"

ছেলেরা দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোল। তপতী ঠোঁট কামড়ে চোখ বুজলেন। শরীরের ভেতরটা থরথর করছে। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন, দেয়ালে হাত রেখে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে মনে শুধু বলে গেলেন, "হায় ভগবান, এত পরিশ্রম, এত কষ্ট, এত সাধনা করল মিনু আর ওইটুকু ছেলের মাথায় কিনা এমন অপবাদের বোঝা তুলে দিল ! ওর জীবন তো শুরুই হয়নি, আর এখনই ঈর্ষা হিংসার আঘাত ওকে পেতে হল ! ভেঙে না পড়ে মিনুর নরম কাঁচা মন ! ভগবান ওকে শক্তি দাও।"

তপতী হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন কাপটা টেব্‌ল থেকে মেঝেয়

নামানো।

"আসুন মিসেস বসুমল্লিক।" হেডমাস্টার আচার্য তিনটি চেয়ারের মধ্যে একমাত্র খালি চেয়ারটার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, "বসুন।" অন্য দুটি চেয়ারে দু'জন অভিভাবক বসে।

"কাল এসে কাপটা রেখে গেছেন। বেশ বড় কাপ। আজ সকালে তিনটে কাগজে খুঁজলাম—কিন্তু মৃন্ময়ের নাম তো কোথাও দেখতে পেলাম না!" হেডমাস্টারের বিস্মিত চোখে তপতী দেখতে পেলেন প্রশ্ন, 'কেন পেলাম না?'

"কেন পেলেন না সেটা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, আমি তো কাগজের সম্পাদক নই।" তপতী শান্ত স্বরে পরিহাস মিশিয়ে বললেন।

"হয়তো ছাপার যোগ্য খবর নয় বলেই ছাপেনি।" হেডমাস্টারের গলা ঈষৎ তির্যক।

"তা হতে পারে।" তপতী উঠে দাঁড়ালেন। "আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওটা তো দেখা হয়ে গেছে।"

তপতী যত্নভরে কাপটা দু'হাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ধীর পায়ে।

বাড়ি ফিরে তিনি বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। বেলা একসময় খেতে ডাকল। "মাথা ধরেছে", "খিদে নেই" বলে কিছু খেলেন না। গাড়ি নিয়ে স্কুলে গেলেন ঠিক সাড়ে তিনটেয়। চিনু-মিনু যখন গাড়ির দিকে আসছে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে তাকালেন। দুই ছেলেরই মুখ গম্ভীর। জামাপ্যান্টে মারামারির কোনও চিহ্ন নেই দেখে তিনি খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। তবে মুখের ভাব তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলল। সকালে শোনা কথাগুলো বোধ হয় ওদের মন থেকে মুছে যায়নি।

গাড়িতেই ওরা প্যান্ট শার্ট বদলে খাবার খেয়ে নেয়। কিন্তু আজ খানিকটা খেয়ে রেখে দিল। পোশাক বদলাল না।

"ড্রেস চেঞ্জ করবি না?" গাড়ি চালাতে চালাতে তপতী বললেন।

"না।" চিনু বলল।

"খেলবি না?"

"ভাল লাগছে না। ...মা এই স্কুলে আর পড়ব না।" চিনুর স্বরে ক্ষোভ আর বিরাগের সঙ্গে তিক্ততা মাখানো রয়েছে। মিনু চুপ করে আছে।

তপতী উত্তর দিলেন না। তিনি বুঝতে পারছেন দু'জনের মনের অবস্থা। এখন কথা না বলাই ভাল। জমে ওঠা রাগ আর বেদনা ওরা বার করে দিক আগে।

সহদেব অপেক্ষা করছিলেন। তপতী নিজেই বললেন, "আজ আর ওয়ার্ক আউট করাবেন না সহদেববাবু, ওদের মন খুব বিক্ষিপ্ত রয়েছে।"

"সে কী! একটা তো মোটে টুর্নামেন্ট জিতল, এখনও অনেক জিততে হবে মিনুকে। আমি তো ঠিক করে রেখেছি ওকে এ-বছরই কলকাতার সব টুর্নামেন্টে

নামাব।"

"তা নামাবেন। কিন্তু আজ থাক, কারণটা আমি পরে বলছি। বরং ওরা নিজেদের মধ্যে খেলুক তা হলে মনটাকে কিছুটা গুছিয়ে নিতে পারবে।"

সহদেব দু'জনকে ডাকলেন। "ড্রেস করোনি কেন? যাও চেঞ্জ করে এসো... আজ দু'জনে সেকেন্ড সার্ভ প্র্যাকটিস করো। মিনু কাল তিনটে ডাব্‌ল-ফল্ট করেছ।"

"আজ আমি কোর্টে নামব না।" মুখ নিচু করে গোঁয়ারের মতো মিনু দাঁড়িয়ে রইল।

"চিনু?"

"আমিও না।"

সহদেব চোখে প্রশ্ন নিয়ে তপতীর দিকে তাকালেন।

"তা হলে আজ থাক।" তপতী বললেন।

"বেশ, তা হলে মন গুছিয়ে নেওয়ার খেলাই ওরা খেলুক।" সহদেব একটা বল তাঁর হাতের র‍্যাকেটের ওপর রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বলটাকে প্রায় পনেরো ফুট শূন্যে ছুড়ে দিলেন। পড়ন্ত বলটা তাঁত ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাকেটটা নীচে নামিয়ে নিতে নিতে বলটাকে তিনি তাঁতের ওপর স্থিরভাবে বসিয়ে নিলেন, যেন জালে ধরা পড়ল বলটা। দু'বার-তিনবার করলেন।

"মিনু র‍্যাকেট নাও। বলেছ যখন কোর্টে তোমায় আজ নামতে হবে না। এখন তুমি ওদিকে কুড়ি পা যাও।"

নির্দেশ মতো কোর্টের বাইরের জমিতে মিনু গুনে গুনে কুড়ি পা দূরত্বে গেল। সহদেব র‍্যাকেটে রাখা বলটা ছুড়ে দিয়েই বললেন, "র‍্যাকেটে ধরো।"

মিনু র‍্যাকেট আলতো করে বলের সঙ্গে নামিয়ে নিতে নিতে তাঁতের ওপর বলটা ধরল।

"ছুড়ে দাও, যেমনভাবে আমি দিলাম।"

এর পর সহদেব বলটাকে মিনুর পেছনে, দু'পাশে কখনও-বা পাঁচ গজ সামনে পাঠাতে লাগলেন। মিনু নিখুঁতভাবে প্রতিটি বল র‍্যাকেটে ধরে পাঠিয়ে দিল।

সহদেব ইশারা করলেন চিনুকে। "তুমি এবার আমার জায়গা নাও।... এটা করে যাও তা হলে 'টাচ' তৈরি হবে, কন্ট্রোল আসবে।" কথাগুলো বলে তিনি তপতীর পাশে এসে বসলেন। "হ্যাঁ বলুন কী বলবেন।"

তপতী সকালে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বললেন, "ওরা কতটা দাগা পেয়েছে বুঝতেই পারছেন, খেলতে এত ভালবাসে অথচ খেলতে চাইল না।"

শুনতে শুনতে সহদেবের মুখ থমথমে হয়ে গেল রাগে। কিছুক্ষণ কথা না বলে মুখ নামিয়ে রইলেন। একসময় মুখ তুলে বললেন, "দিদি, খেলাটা কোর্টে যতটা না হয় তার থেকেও বেশি হয় মনে। আর মন যদি এইসব কথা শুনে ছত্রাকার হয়ে যায় তা হলে খেলার অবস্থাটাও তাই হবে। ওদের যদি আর একটু বয়স বা অভিজ্ঞতা হত, তা হলে নিজেরাই নিজেদের সামলাতে পারত।... এই কাজটা কি

এখন আপনাকেই করতে হবে। ওদের আড়াল করা, ওদের মনের চার পাশে দেয়াল তুলে শুধু ছাদটা খুলে রাখা, সেখান দিয়ে টেনিস ছাড়া আর কিছু যেন না দেখতে পায়। ... পারবেন ?"

"পারতে হবে।"

॥ ৮ ॥

"মিনু, চিনু তোমরা কী হতে চাও, তোমাদের জীবনের লক্ষ্য কী ?"

"বড় টেনিস প্লেয়ার হতে চাই।"

"আমিও।"

খাওয়ার টেব্‌লে ছড়ানো বই, খাতা, স্কুলব্যাগ। তপতীর ডান দিকে চিনু, টেব্‌লের ওধারে মিনু। কোর্ট থেকে ফিরে প্রতি সন্ধ্যার মতো তিনি ছেলেদের নিয়ে পড়াতে বসেছেন। চিনুকে অঙ্ক বুঝিয়ে দিয়ে প্রশ্নমালা থেকে দশটা অঙ্ক করতে দিয়েছেন। তারপর মিনুকে করতে দেওয়া ট্রানস্লেশন সংশোধন করতে করতে হঠাৎই তিনি ছেলেদের প্রশ্নটা করলেন। বসার ঘরে সোফায় শুয়ে তন্ময় খবরের কাগজ পড়ছেন, কাগজটা নামিয়ে তিনি দরজা দিয়ে একপলক তাকিয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন।

"বড় প্লেয়ার হতে গেলে প্রথমেই কী দরকার ?"

উত্তরটা দুই ছেলেরই বহুবার মায়ের কাছ থেকে শোনা আছে।

"কঠোর পরিশ্রম।" মিনু বলল।

"আর ?"

"লক্ষ্যপূরণের জন্য মনকে—" চিনু দাদার দিকে তাকাল।

"একমুখীন করতে হবে।" মিনু সম্পূর্ণ করে দিল।

"তোমরা কি তাই করছ ?" তপতী ছেলেদের যখন গভীর কোনও কথা বলেন তখন 'তুই' হয়ে যায় 'তুমি'। "আজ তোমরা কোর্টে নামতে চাইলে না কেন ? তোমাদের লক্ষ্য বড় প্লেয়ার হওয়া, কিন্তু আজেবাজে কথা শুনে...।"

"আজেবাজে ? প্রণবেন্দু যে কথাটা বলল সেটা আজেবাজে ?" রাগে ফুঁসে উঠল মিনু।

"হ্যাঁ আজেবাজে।" শান্ত ধীর স্বরে তপতী কথাটা বলে ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মিনু চোখ নামিয়ে নিল।

"তুমি জানো, পরিশ্রম করে কোনও অন্যায় সুযোগ না নিয়ে, পাঁচজন প্লেয়ারকে পরিচ্ছন্নভাবে হারিয়ে কাপটা জিতেছ। ...নিজের কাছে তুমি সৎ। এটাই হল বড় কথা, একমাত্র কথা। জেতার জন্য তোমার মনের মধ্যে একটা সুন্দর অনুভূতি পেয়েছ, তোমার কাজ এই অনুভূতিটাকে বাঁচিয়ে রাখা। তা করতে পারলে দেখবে একটা দুর্লভ ট্রফি তুমি জিতে ফেলেছ।" তপতী কথা শেষ করে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। চিনু-মিনু উৎসুক কৌতূহলভরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

"নিজেকে নিজের ভাল লাগছে—এটাই হল ট্রফি আর এই ট্রফিটা তোমাদের জিততে হবে। সেজন্য যা কিছু সুন্দর জিনিস, সংগ্রহ করে মনে ভরে রাখতে হবে। তা করতে পারলে দেখবে মন একমুখীন হয়েছে। কুৎসা ঈর্ষা রটনা এসব হল আবর্জনা। এগুলো দিয়ে মন ভরিয়ে ফেললেই দেখবে তোমাদের ভেতর দুর্গন্ধ জমে উঠেছে, শ্বাস নিতে পারছ না, ছটফট করছ। তখন মন আর একমুখীন হতে পারবে না... তোমরা বড় প্লেয়ার কেন, কিছুই হতে পারবে না।"

তপতীর নম্র স্বর সারা ঘরে একটা গম্ভীর পরিবেশ তৈরি করেছে। মিনু একদৃষ্টে টেব্‌লের একটা বইয়ের দিকে তাকিয়ে। চিনু ইরেজারটাকে নখ দিয়ে খুঁটছে। তপতী আড়চোখে দেখলেন বসার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তন্ময় নিঃশব্দে হাসছেন।

"তাই বলে আমরা হজম করে যাব ?" চিনু এখনও মানতে পারছে না সকালে স্কুলের ঘটনাটা।

"হজম করতে না পারলে কোরো না। আমরা কত আশা নিয়ে তোমাদের দিকে তাকিয়ে, তোমরা বড় প্লেয়ার হবে, আমাদের বুক গর্বে ভরে উঠবে। আমাদের দেখে লোকে বলবে 'ওই যে মৃন্ময় বসুমল্লিকের মা, ওই যে চিন্ময় বসুমল্লিকের বাবা।' আর আমরা বলব, 'ওই দেখো আমাদের মিনু, ওই দেখো আমাদের চিনু, ওদের জন্য আমরা কত কষ্ট করেছি, কত অপমান-কুৎসা সয়েছি। আজ দ্যাখো ওদের কত নাম, কত যশ, ওরা বাবা-মা'র মুখ রেখেছে, ওরা বাবা-মা'কে ভালবাসে।...'" তপতী থেমে গেলেন মিনুর চোখ ছলছল করছে দেখে। চিনু দু' হাতে আঁকড়ে মায়ের ডান বাহুতে মুখ চেপে ধরল।

"...কিন্তু মিনু আর চিনু একটা বড় ভুল করে বসল। মায়ের কথা না শুনে ওরা লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে মনকে অশান্তিতে ভরিয়ে তুলল, তাই ওরা বড় হতে পারল না। মা আর বাবাকে দুঃখ দিল। কেউ আর বলবে না ওই যে মৃন্ময় বসুমল্লিকের মা, ওই যে চিন্ময়—।" তপতীকে থেমে যেতে হল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মিনু টেব্‌লের বইগুলিকে দু'হাত দিয়ে ছত্রখান করে টেব্‌লে একটা ঘুঁসি বসিয়ে চিৎকার করল, "না, না, না।" তারপরই সে ছুটে নিজেদের ঘরে চলে গেল।

"চিনু !" তপতীর বাহু কামড়ে ধরেছে চিনু।

"আমি হজম করব।"

মিনিটখানেক পর ব্যস্ত হয়ে বেলা হাজির হল। "কী হয়েছে গো বউদি ? মিনু বিছানায় উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেন গো ?"

"ও কাঁদছে আর এ কামড়াচ্ছে, কী করি বলো তো ?" কৃত্রিম অসহায়তা ফোটালেন তপতী তাঁর গলায়।

দিনকয়েক পর তপতী কোর্টের ধারে বসে। চিনু-মিনুকে দাঁড় করিয়ে সহদেব কথা বলছেন।

"ভলি মারার জন্য, রিফ্লেক্সের স্পিড বাড়াবার জন্য, তোমাদের কব্জির আর

হাতের জোর বাড়াবার জন্য নেট গেম প্র্যাকটিসটা আজ অন্যভাবে করতে হবে। বাঁ হাতটা পিঠে ঠেকিয়ে তোমাদের খেলে যেতে হবে। ব্যালেন্সের জন্য একটা হাত না থাকলে দেখবে তোমাদের আরও চটপট মুভ করতে হচ্ছে, উপরন্তু যাবতীয় চাপ পড়বে ডান হাতের ওপর। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ?" দু'জনে মাথা নাড়ল। "এবার করে দেখা যাক।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু'জনেই তিন-চারবার কোর্টে পড়ে গেল ভারসাম্য হারিয়ে।

"আস্তে খেলো আস্তে, প্রথম দিনেই অত ফাস্ট মুভ করতে যেয়ো না...মিনু ব্যাকহ্যান্ডটা বড় দেরিতে হিট করছ তাই বল বাইরে যাচ্ছে, আরও তাড়াতাড়ি র‍্যাকেটটা পেছনে নাও, মাথাটা নামিয়ে দাও স্ট্রোক নেওয়ার সময়...লবটা আরও তুলে দাও চিনু, সূর্যের দিকে তাকাতে মিনুকে বাধ্য করো" সহদেব সমানে চিৎকার করে গেলেন এবং দশ মিনিট পরই ছেলে দুটি দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁফাতে শুরু করল।

"কী হল?" সহদেব ধমকে উঠলেন।

"সার দু' মিনিট।" মিনু আবেদন জানাল। সহদেব ঘড়ি দেখতে লাগলেন।

"দু' মিনিট হয়ে গেছে, স্টার্ট।"

বিকেল গড়িয়ে গেছে। চারদিক ধূসর হয়ে উঠছে। গাছে গাছে পাখিদের কিচিরমিচির। চিনু, মিনু ক্লাবের কলে মুখ হাত পা ধুয়ে ফিরে এল।

"চারটে ক্লাব টুর্নামেন্টে তোমাদের এন্ট্রি করিয়েছি, দুটো হবে হার্ডকোর্টে। শ্যামবাজার, কাশীপুর, অর্ডন্যান্স, স্যাটারডে, টানা প্রায় একমাস।

"নানারকমের কোর্টে, নানা কন্ডিশনে, নানা ধরনের প্লেয়ারদের সঙ্গে তোমাদের এখন খেলা দরকার, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য।"

সহদেব জুতোর ভেতর থেকে কাঁকর ঝেড়ে ফেলে ফিতে বাঁধলেন।

"একমাস তা হলে স্কুল করা হবে না।" মিনু মনে করিয়ে দিল।

"তা হবে না। যদি কলকাতায় থাকতে তা হলে হাফ স্কুল করেও খেলতে যেতে পারতে। কিন্তু এখান থেকে পৌঁছতেই তো দেড়-দু ঘণ্টা লেগে যাবে।...স্কুল কামাই করতেই হবে।" সহদেব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালেন।

"একমাস কামাই করলে আমাদের তো নাম কেটে দেবে।"

তপতী গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "আমি বরং একবার হেডমাস্টারমশাইকে বলে দেখি যদি মাসখানেকের জন্য ছুটি দেন।"

"যদি না দেয়?" চিনুর চোখে সংশয়।

"না দিলে কী আর করা যাবে, নাম কেটে দিলে দেবে।" তপতী সহজ সুরে কথাগুলো বললেন কিন্তু ঋজু ভঙ্গিতে। "কেউ যদি অসুখে পড়ে একমাস স্কুলে না যায় তা হলে কি তার নাম কাটা যাবে?"

"আমাদের তো অসুখ নয়।" চিনুর আবার সংশয়।

"তার থেকেও বড় ব্যাপার, সুস্থ থাকার জন্য খেলা! হয়েছে এবার, চলো। সহদেববাবু আপনি টুর্নামেন্টের তারিখগুলো যদি দেন তো কথা বলতে সুবিধে

হবে। তবে একটা কথা, ছুটি না দিলেও ওরা কিন্তু খেলতে যাবে।"

এক সপ্তাহ পর তপতী দেখা করলেন হেডমাস্টারের সঙ্গে। তপতীর কথা শুনে পুরো পনেরো সেকেন্ড তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, "ছেলে দুটো লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক, বড় হোক, এটা কি আপনি চান না ?"

"মানুষ হোক এটা তো অবশ্যই চাই। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই মানুষ হবে, এ-ধারণাটাও তো ঠিক নয়। জীবনের আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখান থেকে বড় হওয়া যায়। ছবি আঁকা, গানবাজনা, অভিনয় নাচের মধ্য দিয়ে যেমন, তেমনই খেলার মধ্য দিয়েও তো বড় হওয়া যায়, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। এই স্কুলের সব ছেলেই কি স্টার পেয়ে পাশ করে ? আমার ছেলেরাও নয় স্টার লেটার পাবে না কিন্তু অন্যদিকে তো স্টার পেতে পারে।" তপতীর গলা আবেগে একটু চড়ে গেল, সেটা বুঝতে পেরেই তিনি লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

"তা ঠিক। সবাই স্টার লেটার পায় না।" হেডমাস্টার গম্ভীর মুখে সামনে ঝুঁকে বললেন। "মৃন্ময়, চিন্ময় স্ট্যান্ড করে না বটে, কিন্তু পরীক্ষার রেজাল্টও খারাপ নয়। কিন্তু এতদিন স্কুল কামাই করে খেলে বেড়ানো, এটা আমি সমর্থন করতে পারছি না।"

"আমরা ঝুঁকি নিয়ে দু'জনকে টেনিস প্লেয়ার তৈরি করছি, আপনিও একটু ঝুঁকি নিন না আমাদের সঙ্গে। এই স্কুলের দুটি ছেলে যদি খেলায় নাম করে তা হলে তো স্কুলেরও সুনাম হবে।" তপতী আশাভরে হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল, 'স্কুলের সুনাম' কথাটায় বোধ হয় কাজ হয়েছে। হেডমাস্টার ঠোঁট টিপে মাথা নাড়লেন, চোখ দুটো একটু বড় হল।

"এক মাস স্কুলে না এলে পড়াশুনোয় পিছিয়ে পড়বে।"

"আমি বাড়িতে পড়িয়ে সেটা মেকআপ করে দেব...গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

"বেশ, ওরা খেলুক। মিসেস বসুমল্লিক এই ফেভার কিন্তু এই একবারই ; আর কিন্তু দেব না। আশা করি আপনিও আর চাইবেন না।"

"চাইব না।"

মিনু চারটে টুর্নামেন্টের তিনটিতে জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান হল একটা সেটও না হারিয়ে। চিনু তিনটির দুটিতে কোয়ার্টার ও একটিতে সেমিফাইনালে উঠেছিল। সহদেব শুধু অর্ডন্যান্স ক্লাবের টুর্নামেন্টে মিনুকে সিনিয়ার বিভাগে এন্ট্রি করিয়েছিলেন ওর যোগ্যতা ও ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য। সেমিফাইনালে উঠে সে ভারতের ডেভিস কাপার প্রেমজিত লালের সামনে পড়ে। ২-৬, ৩-৬-এ হেরে যায় মিনু। ম্যাচটা গড়িয়েছিল পঁয়ষট্টি মিনিট। প্রতিটি পয়েন্টের জন্য মিনু লড়াই করেছে আর সেটাই ভাল লেগেছে দর্শকদের, বিশেষ করে বেঙ্গল লন টেনিসের প্রেসিডেন্ট ভাস্কর মুখার্জির, তিনি অল ইণ্ডিয়া লন টেনিসেরও ট্রেজারার। মিনুকে কাছে ডেকে বলেন, "শুনলাম তুমি সহদেবের হাতে তৈরি, তা হলে তো আর কিছু বলার নেই। তবে এখন তুমি স্টেট আর ন্যাশনাল লেভেলে খেলার কথা ভাবো।

প্রেমজিতের কাছে তুমি যে হারবে এটা আমি ধরেই নিয়েছিলাম, কিন্তু কীভাবে হারো সেটাই দেখার ছিল। আমি খুশি তোমার খেলা দেখে। বয়স কত ?"

"চোদ্দোয় পড়েছি।"

ভাস্কর মুখার্জির ভুরু উঠে গেল। "তোমাকে তো ষোলো-সতেরো ভেবেছিলাম। এই বয়সেই প্রেমজিতের কাছ থেকে পাঁচটা গেম নিয়েছ !" মিনুর পিঠ চাপড়ে তিনি অন্য লোকের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত হলেন। ওদের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এক ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক। তিনি ভাস্কর মুখার্জির কথা শুনেছিলেন। সাংবাদিক এক ফাঁকে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন "বসুমল্লিক সম্পর্কে আপনার ধারণা কী ?" "ওয়ান অব দ্য মোস্ট প্রমিসিং জুনিয়ারস ইন দ্য কান্ট্রি।" পরদিন সাংবাদিক তাঁর রিপোর্টে দুটি বাক্য লিখলেন মিনু সম্পর্কে : "বসুমল্লিকের বয়স মাত্র চোদ্দো, কিন্তু লালকে ব্যস্ত রেখে সে পাঁচটা গেম ছিনিয়ে নিয়েছে। টেনিস রসিকদের ধারণা, এই কিশোর ভারতীয় টেনিসে একদিন উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠবে।"

পরদিন তপতী বাক্য দুটি পড়তে পড়তে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। 'একদিন উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠবে' এই স্বপ্নই তো তাঁদের চালিয়ে নিয়ে এসেছে পাঁচটা বছর।

সকালে খাওয়ার টেব্‌লে কাগজটা সকলের হাতে ঘুরল। এর আগে মিনু যে তিনটি টুর্নামেন্টে জুনিয়ার খেতাব জিতেছে তাতে শুধু সিনিয়ারদের ফল কাগজে বেরিয়েছিল। আর এবার নামের সঙ্গে দুটো কথাও। তন্ময় বললেন "এর কারণ অবশ্য প্রেমজিত লালের সঙ্গে খেলেছে বলে।"

তপতী প্রতিবাদ করলেন, "সে তো অনেকেই খেলেছে, কই এমন ভাবে তো তাদের সম্পর্কে লেখা হয়নি।"

"সহদেববাবু, মিনুর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেটা এখনই বলার মতো খেলা কি খেলেছে ?" তন্ময় সিরিয়াস স্বরে জানতে চাইলেন।

"ভাস্কর মুখার্জি বহু বছর ধরে বহু প্লেয়ারকে দেখেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, কৃষ্ণন, প্রেমজিত, জয়দীপের পরের একটা ব্যাচ তৈরির জন্য এ আই এল টি এ চারজন জুনিয়ারকে ইউরোপ ট্যুরে পাঠাবে। মিনু যদি জুনিয়ার ন্যাশনালের সেমিফাইনালেও উঠতে পারে তা হলে ট্যুরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।" সহদেব মিনুর দিকে তাকালেন। মুখে পাতলা হাসি। মুখ নামিয়ে মিনু ভাত খেয়ে যাচ্ছে।

"পারবি না মিনু ?" তন্ময় আশান্বিত স্বরে জানতে চেয়ে একটা ইতিবাচক উত্তরের আশায় তাকালেন।

মুখ না তুলে মিনু ভাত মুখে একটা শুধু শব্দ করল। যেটা 'হ্যাঁ' বা 'না' দুইই হতে পারে।

"সেমিফাইনালে যেতে পারবি ?" তন্ময় আবার বললেন।

"তন্ময়বাবু এসব কথা থাক এখন।" সহদেব প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য তাড়াতাড়ি

যোগ করলেন, "আগে জুনিয়ার বেঙ্গলটা উতরোক। ধাপে ধাপে জিনিসগুলো হওয়া ভাল।"

খাওয়া শেষ করে মিনু হাত ধোওয়ার জন্য উঠে যেতেই সহদেব বললেন, "জুনিয়ার ন্যাশনাল নিয়ে একটা কথাও ওকে বলবেন না। অযথা মনের ওপর একটা প্রেশার তৈরি হবে। আপনাদের আশা যত বাড়বে, প্রেশারটাও তত বাড়বে, বাচ্চা ছেলে সেটা নিতে পারবে না।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন।" কথাটা বলে তপতী চাহনি দিয়ে স্বামীকে ভর্ৎসনা জানালেন। "চিনু, এসব নিয়ে কারও সঙ্গে গল্প করবে না।"

খাওয়া চিনুরও শেষ হয়েছে। চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে সে বলল, "খবরের কাগজটা আমি স্কুলে নিয়ে যাব, সবাইকে দেখাব। নর্থ ক্যালকাটার কাপ জেতার থেকেও স্টাফ রিপোর্টারের এই কথাগুলো দাদার মান বাড়িয়েছে।"

"একদম নয় চিনু।" তপতী ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো দাঁড়িয়ে উঠলেন। "কাউকে কিছু দেখাতে হবে না।... এখানকার কারোর কোনও প্রশংসা আমার দরকার নেই, আমার ছেলেদেরও দরকার নেই।" তপতী উত্তেজনায় কাঁপছেন। "চিনু যদি তুমি এই কাগজ নিয়ে কাউকে দেখাও বা কাউকে এর উল্লেখ পর্যন্ত করো তা হলে র‍্যাকেট দিয়ে তোমার পিঠ ভাঙব।"

তুই নয় তুমি ! মার মুখের দিকে তাকিয়ে চিনু বুঝে গেল র‍্যাকেট তার পিঠের সঙ্গে মাথাও ভেঙে দিতে পারে। সে একটি কথাও আর না বলে বেরিয়ে গেল। তপতীর হঠাৎ এমন আচরণে তন্ময় ও সহদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এভাবে ওঁকে রেগে উঠতে তাঁরা কখনও দেখেননি।

"এখানকার কয়েকটা লোক এমন সব কথা রটিয়েছে, যা শুনলে মনে হবে পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা ...আমি চাই ছেলেরা জানুক পৃথিবীটা খুব ভাল জায়গা। ...এরপর হয়তো শুনব কাগজের রিপোর্টারকে টাকা খাইয়ে লিখিয়ে নিয়েছি। এরা সব কিছুই বলতে পারে।"

তপতী বেরিয়ে গেলেন গাড়ি বের করতে। সহদেব নিচু গলায় বললেন, "দিদিকে কিন্তু আর রাগতে দেবেন না, তা হলে ছেলেদের ক্ষতি হবে।"

"আমি কি রাগিয়েছি না কি ! রাগ বহুদিন জমে ছিল, আজ সেটা ফেটে বেরোল। তবে এটুকু বলতে পারি, আর কখনও রাগবে না।" তন্ময় নিশ্চিত স্বরে জানালেন।

বাইরে হর্ন বাজল। মিনু চিনু স্কুলব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

"তা হলে এবার ?" তন্ময় বললেন।

"এবার জুনিয়ার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানশিপ।" সহদেব আড়মোড়া ভাঙলেন।

ছেলেদের পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় তপতী একটা শক্ত মলাটের সাদা এক্সারসাইজ খাতা কিনে আনলেন। বাড়ি এসে দেখলেন তন্ময় স্নান করতে কলঘরে গেছেন। খবরের কাগজ থেকে টেনিস ম্যাচের রিপোর্টের অংশটি কাঁচি দিয়ে কেটে গঁদ লাগিয়ে তিনি কাটিংটা খাতার প্রথম পাতায় সেঁটে দিলেন।

আঙুল ঠেকল।

"ঘুম আসছে না ?"

"না।"

"কী ভাবছিস ?"

"অনেকদিন আগে আমায় কুকুরে তাড়া করেছিল। তুই আমাকে আড়াল করে ঘুঁসি চালাচ্ছিলি। একটা লোক এসে কুকুরদুটোকে তাড়িয়ে দিল। তুই আমাকে পরে বললি 'ভয় কী রে, আমি থাকতে ভয়ের কিছু নেই।' এখন আবার বলবি কথাটা।"

"কেন ?"

"আমার খুব ভয় করছে। কাল তুই বোধ হয় ইচ্ছে করে হেরে যাবি।"

মিনু হাত টেনে নিল। অনেকক্ষণ পরে সে বলল, "কাল আমি জিতব।...এবার ঘুমো।"

তপতী আর তন্ময় ইচ্ছে করেই দুই ছেলের খেলা দেখতে কলকাতায় গেলেন না। সন্ধ্যায় সহদেবের সঙ্গে তারা ফিরতেই বাবা-মা প্রথমেই দুই ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে খেলার ফল বোঝার চেষ্টা করলেন। দু'জনের মুখেই তৃপ্তির ছোঁয়া লেগে। তাঁরা সহদেবের দিকে তাকালেন। সেখানেও সুখের আভাস।

"সিক্স-থ্রি, সেভেন-ফাইভ। চিনু যে এমন খেলা খেলবে ভাবতে পারিনি। আপনারা যদি যেতেন তা হলে খেলার মতো খেলা একটা দেখতে পেতেন। কোর্টের ধারে অন্তত জনা ষাটেক লোক জমে গেছল। এত লোক এখনও কোনও ম্যাচে হয়নি। সেকেন্ড সেটটা নরেশকুমার দেখে বলল, ছোটভাইয়ের টাচ খুব ভাল, কৃষ্ণনকে মনে পড়িয়ে দেয় কিন্তু পাওয়ার আর স্পিড এই দুটোতেই ও বড় ভাইয়ের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এমন হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ দেখে কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে এরা দুই ভাই ! রীতিমতো লড়ে মিনুকে জিততে হয়েছে।"

"যাক, আমার দুশ্চিন্তা দূর হল, বোধ হয় আপনারও।" তপতী বললেন সহদেবকে।

"কোথায় দূর হল, এখন তো চিনুর স্পিড আর পাওয়ার নিয়ে আমায় ভাবতে হবে। এখানে দু'জনের মধ্যে খেলায় তো এমন প্রচণ্ডভাবে ভেতরের জিনিস বেরিয়ে আসে না, যা আজকে দেখা গেল।"

আম্পায়ারের উঁচু চেয়ারের দু'পাশে দুটি চেয়ার। তার একটি মৃন্ময় বসুমল্লিকের জন্য, অপরটি অরুণ মেটার।

মিনু তার র‍্যাকেট কভারের চেন টেনে খুলল। সারের উপদেশ মনে পড়ল, 'যতক্ষণ না রেডি হচ্ছ ততক্ষণ কোর্টে নামবে না।' বাঁ কব্জিতে সোয়েটলেটটা আর একবার ঘুরিয়ে একটু তুলল। এখন তার দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এসেছে। র‍্যাকেটটা চোখের সামনে ধরে হাতের তালুতে আঘাত করে তাঁতের বাঁধন টানটান আছে কি না অনুভব করল। বাতাসে কয়েকবার সে র‍্যাকেট চালিয়ে ব্যাকহ্যান্ড ও ফোরহ্যান্ড

মারল।

"দেয়ার উইল বি আ থ্রি-মিনিট নক আপ।" আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন দু'জনকে।

মিনু প্রথম বল মারার আগে হাতের খিল ছাড়াবার জন্য র‍্যাকেটটা ঘোরাতে লাগল। অরুণ বেস লাইনে এগিয়ে গেছে। এর পর দু'জনে র‍্যালি শুরু করতেই মিনুর হাতের আড়ষ্টতা কেটে যেতে লাগল। চারপাশের দর্শক, বাবা-মা, সার আর চিনুকে চোখের বাইরে রেখে ধীরে ধীরে সে তার দৃষ্টিকে গুটিয়ে আনল সাদা লাইন কাটা ঘাসের জমির মধ্যে, যে জমিতে শুধু টেনিস বল আর অরুণ মেটাকে নিয়ে এবার সে থাকবে।

"ওয়ান মোর মিনিট।"

অরুণ পরপর দুটো ভলি নেটে মারল। মিনুর মনে হল ও ভাল করে হাতটা তুলতে পারছে না, বল নজর করতেও যেন ওর অসুবিধে হচ্ছে।

প্রথম সার্ভ করল অরুণ। মিনু একটা পয়েন্টও নিতে না দিয়ে ওর সার্ভিস ভেঙে নিজের সার্ভিস ধরে রেখে ২-০ গেমে এগিয়ে গেল।

পরের দুটো গেম, মিনুর সার্ভিস ভেঙে অরুণ দখল করল। ২-২-এর পর পঞ্চম গেমে শুরু হল যেন তলোয়ারের খেলা। ভোঁতা ডগার তলোয়ার নিয়ে ওলিম্পিকসে যে প্রতিযোগিতা হয়— এই বাড়িয়ে দিচ্ছে, পাঁয়তারা করছে, ঝনঝন ঠোকাঠুকি হচ্ছে, একে অপরকে বুঝে নিচ্ছে— সেইভাবে যেন তারা খেলতে শুরু করল। ৩-৩, ৪-৪, ৫-৫। এর পরই খোঁচাখুঁচি আর আত্মরক্ষার ভঙ্গিটা বদলে এসে গেল আক্রমণ। এবার ভোঁতা ডগার তলোয়ারের বদলে ওদের হাতে উঠে এল তীক্ষ্ণ ডগার ধারালো ফলার বাঁকা তলোয়ার। বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে এবার তারা নিধনের জন্য মেতে উঠল।

মিনুর কপাল থেকে গাল আর নাকের দু'ধার দিয়ে ঘাম ঝরছে। আঙুল দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল। সে জানে অরুণের থেকে তার শরীর মজবুত, ফুসফুসের ক্ষমতাও বেশি। এখন তাকে শুধু একটা কাজই করতে হবে— কোর্টে টিকে থাকা আর অরুণকে ছুটিয়ে খাটিয়ে ধীরে ধীরে যন্ত্রণার মধ্যে নিয়ে ফেলা।

প্রথম সেট মিনু জিতল ৭-৫। দ্বিতীয় সেট অরুণ পেল ৮-৬। তৃতীয় সেটে আবার শুরু হল জাঁতাকলে পেষাই। ঘাসের কোর্টে খেলার ধরন হয় সার্ভ আর ভলি, পয়েন্ট জেতা হয় খুব অল্প সময়ে। কিন্তু মিনু খেলার ধরনটা এমনই মন্থর করে দিয়েছে যেন খেলা হচ্ছে ক্লে কোর্টে। বুদ্ধিটা, বলা বাহুল্য, সহদেবের। অরুণকে তার স্বাভাবিক খেলা খেলতে না দেওয়ার জন্যই এই কৌশল। কিছুদিন আগেই সৈদুলের কাছ থেকে সহদেব শুনে নিয়েছেন অরুণ সহনশীলতা বাড়াবার জন্য দৌড়য় না। ওকে অবসন্ন করে শেষ করে দেওয়ার নির্দেশ মিনুকে তিনি দিয়েছেন।

এখন দু'জনেই পরীক্ষায় নেমেছে শরীর আর মন কতক্ষণ কষ্ট সইতে পারবে তাই নির্ধারণের জন্য, কতক্ষণ অরুণ মনে রাখতে পারবে খেলায় সে জিততে

চায়। যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মিনুর আগে আগুনের ওপর থেকে সে কখন হাত সরিয়ে নিয়ে জেতার বাসনা জুড়িয়ে ফেলবে, তারই খেলা চলেছে।

অরুণ বুঝতে পেরেছে মিনুর কৌশল। মরিয়া হয়ে এবার সে চেষ্টা শুরু করল দ্রুত পয়েন্ট জেতার জন্য। র‍্যালি কমিয়ে একটা মার থেকেই পয়েন্ট জেতার জন্য সে শট নিতে থাকল। কোর্টের এধার-ওধার থেকে প্রায় অসম্ভব শট ছোটাছুটি করে নিল। মিনুর র‍্যাকেট ধরা মুঠোয় আঙুলের ছাল উঠে গেছে। জড়ানো টেপের ফাঁক দিয়ে ঘাম ঢুকে আঙুল জ্বলছে। সে মুঠো শক্ত করল।

দর্শকরা শ্রান্ত হয়ে পড়ছেন টেনশনের জন্য। নিশ্বাস ধরে রেখে বেশিক্ষণ খেলা দেখা যায় না। অনেকে চেয়ার থেকে উঠে কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন, তখন কোর্টে খেলোয়াড় দু'জনও তাদের কাঁধে, তাদের মুঠোয়, পায়ের তলায় এবং হাজার হাজারবার সার্ভিস করায়, পাঁচ-ছ' মাইল দৌড়োনোয় সাহায্য করা পেশিগুলোয় সেই শ্রান্তি বোধ করছে। বোধ করেও তারা কোর্টে দাঁড়িয়ে। পরস্পরের দিকে ওত পেতে। একে অন্যকে ডাইনে বাঁয়ে ছোটাচ্ছে, পেছনে হটাচ্ছে, নেট থেকে ঠেলে দিচ্ছে, শরীরকে শাস্তি দিচ্ছে, ক্রমশ চুপসিয়ে আসছে এবং এইরকমই চলবে যতক্ষণ না কোনও একজনের পেশির ওপর থেকে তার মস্তিষ্ক কর্তৃত্ব হারায়।

অরুণের মস্তিষ্ক তার দুই পা, দুই হাত এবং দুই চোখের কাছে কাজ করার দাবি জানাতে লাগল। কিন্তু পা দুটো মন্থর হতে শুরু করেছে, হাত দুটো দুর্বল হয়ে পড়ছে আর চোখ দুটো সেকেন্ডের ভগ্নাংশের দেরিতে বল দেখছে।

মিনু এবার সংহার শুরু করে দিল। ফেরত দেওয়া অসম্ভব, এমন কিছু সার্ভ আর ভলি পরপর মেরে সে অরুণকে ব্যতিব্যস্ত করল ; আর অরুণের সার্ভগুলো গুঁড়িয়ে ভলিগুলোকে ঘুসিয়ে, আঘাতের পর আঘাত হেনে গেল যতক্ষণ না ১১-৯-এ অরুণ পরাজয় মানতে বাধ্য হল।

কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে মিনু চেয়ারে বসল। কথা বলার, জল খাওয়ার, এমনকী হাসার মতো ক্ষমতাও তার নেই। মুখটা ফ্যাকাসে, চোখ বসা। বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। সহদেব জলের বোতল হাতে দিয়ে বললেন, "এখন চুপ করে বসে থাকো।"

সৈদুলের কাঁধে হাত রেখে ছাপান্ন গেম খেলা শ্রান্ত দেহটাকে টানতে টানতে প্রাক্তন রাজ্য জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান হেঁটে চলে গেল ড্রেসিং রুমে।

তপতী আঁচল দিয়ে মিনুর মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, "কষ্ট হচ্ছে ?"

মিনু মাথা নাড়ল। মায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "মা, আমি জিতেছি।" তার মুখে পাতলা একটা হাসি ভেসে উঠল। "মা, তুমি খুশি ?"

তপতী বুকে টেনে নিলেন ছেলের মুখ। চুম্বন করলেন ছেলের মাথা আর আশীর্বাদ জানালেন চোখের জল দিয়ে।

বিজয়ীর ট্রফি মিনু নিল ভাস্কর মুখার্জির হাত থেকে। ট্রফি দেওয়ার পর তিনি মৃদুস্বরে বললেন, "সামনের মাসে জুনিয়ার ন্যাশনাল বাঙ্গালোরে, জিতে আসতে পারবে তো ?"

"চেষ্টা করব।"

খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ বাল্‌ব মুহুর্মুহু ঝলসাল। বহু অপরিচিত লোক মিনুর পিঠ চাপড়ে বলে গেলেন : "দারুণ খেলেছ।"

দাদার ট্রফিটা বুকে জড়িয়ে ধরে চিনু তার মাকে বলল, "এবার কি স্কুলে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারি ?"

"না, কারও দেখার ইচ্ছে হলে আমাদের বাড়িতে এসে দেখে যাবে।"

তন্ময় একবার বললেন, "রাজেন এই সময়ই দেশের বাইরে। থাকলে খুব খুশি হত।" চার মাসের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে রাজেনকে স্কটল্যান্ডের ডান্ডিতে পাঠিয়েছে এম জে টি এম। শুভ্রা, ব্রজেনবাবু ও তাঁর স্ত্রী এখন রয়েছেন বাংলোয়। "কাল বাংলা, ইংরেজি সবক'টা কাগজ কিনতে হবে, রাজেন এলে দেখাব।" আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে যোগ করলেন "দুটো করে কিনতে হবে।"

"সরি সৈদুল।" সহদেব হাত ধরে বললেন।

"কনগ্রাচুলেশন্‌স দেবুদা। আমি কিন্তু খুশি হয়েছি মৃন্ময় জেতায়। ছেলেটা অনেক উঠবে।"

"খেটেছে তাই উঠেছে, আরও খাটলে নিশ্চয় উঠবে।"

"আমিও কোচিং করি দেবুদা, ওর খাটনির পেছনে আর একজনকেও যে খাটতে হয়েছে সেটা বুঝতে পারি। তুমি ভাগ্যবান তাই এমন ছেলে পেয়েছ, আমি কুড়ি বছরেও পেলাম না।"

পরদিন বহু লোক এলেন অভিনন্দন জানাতে। কাপটা রাখা হয়েছে বসার ঘরের টেব্‌লে। সকালেই এসেছিলেন সুভাষ আর বরুণা সেন। তাঁরা ছোট্ট একটা পোর্সেলিন টব হাতে করে আনলেন, তাতে একটা পাতাবাহার গাছ। গাছটায় কচুপাতার মতো পাতা, তাতে অজস্র সিঁদুরে টিপ। মিনুর হাতে দিয়ে সুভাষ বললেন, "তোমার জন্য আমাদের ভালবাসা এই গাছটার সঙ্গে বাড়বে।" মিনু প্রণাম করল।

এলেন রাজেনের বাবা ব্রজেনবাবু। বগলে দাবার বোর্ড আর ঘুঁটির বাক্স। তপতীকে বললেন, "বউমা, তুমি আমার পার্টনারকে কেড়ে নিয়ে গেছলে, তারপর থেকে আমি আর দাবা খেলি না, এগুলো মিনুকে দিয়ে যাচ্ছি। কবে সরে যাই তার ঠিক নেই। টেনিস থেকে রিটায়ার করার পর এই বোর্ড পেতে মিনু খেলবে আর আমাকে মনে করবে।" মিনুকে বুকে জড়িয়ে বিশালদেহী বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, "সেই ছোট্ট মিনু আজ কত বড়টি হয়ে গেছে !"

চিনু ফিসফিস করে মাকে বলল, "আজ কি আমরা স্কুলে যাব ?"

"যাওয়ার সময় তো পার হয়ে গেছে, ক'টা বাজে দেখেছিস ?"

"সার বলেছেন দু'দিন ওয়ার্ক আউট বন্ধ থাকবে, উনি বুধবার থেকে আসবেন। আমরাও কি তা হলে বুধবার থেকে স্কুলে যাব ?"

"না। কালই যাবে। এই ক'দিন কেউ বই নিয়ে বসোনি।" তপতী মনে

রেখেছেন হেডমাস্টারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি।

কান্তি এল শালপাতার ঠোঙা ভর্তি গুজিয়া নিয়ে। সেটা মিনুর হাতে দিয়ে বলল, "খেও। একদিন দুটো মিষ্টি খেলে মা কিছু বলবে না।" কান্তি তপতীর দিকে তাকিয়ে সম্মতি দিতে মিনতি করল চাহনি দিয়ে।

তপতী হেসে বললেন, "খাও।"

"অত! ওইটুকু ছেলে খাবে?" তন্ময় ঠোঙাটা মিনুর হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিলেন।

"তুমি অফিস যাবে না? চান করে খেতে বোসো, ক'টা বাজে দেখছ?" তপতীর স্বরে কিছু একটা ছিল যেজন্য তন্ময় ঠোঙাটা মিনুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "তাই তো, এখন তো ভাত খেতে হবে।"

বারোটা নাগাদ হইহই করে জনা দশেক ছেলে হাজির হল। মিনুর ক্লাসের বন্ধু। কী ব্যাপার?

"মৃন্ময়, আজ স্কুলে যাসনি কেন?"

"আজ থার্ড পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, তোর জন্য।"

আনন্দ আর লজ্জায় আপ্লুত মিনু শুধু বলল, "য্যাহ্হ!"

"নোটিসে কী লিখেছে জানিস? ...গর্বের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি আমাদের স্কুলের ছাত্র—"

"থাক, থাক, আর বলতে হবে না।" মিনু থামিয়ে দিল।

"কেন বলতে হবে না?" চিনু প্রতিবাদ করল। "কী সব কথা শুনতে হয়েছে ভুলে গেছিস?"

বন্ধুদের প্রত্যেকে ট্রফিটা হাতে নিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। ট্রফির গায়ে লেখা কথাগুলো পড়ল। সারা বাড়ি ভরে গেল খুশির কলকল উচ্ছ্বাসে। কান্তির গুজিয়াগুলোর সদ্ব্যবহার করলেন তপতী প্রত্যেকের হাতে একটা করে তুলে দিয়ে।

রাত্রে শোবার আগে ছেলেরা দুধ খায়। তপতী দুটো গ্লাস হাতে নিয়ে ছেলেদের ঘরে ঢুকতে গিয়ে ভেতর থেকে আসা চাপা স্বরের কথা শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

"না না, অনেক টাকা.. এখন বলতে হবে না।"

"মোটরে স্কুলে যেতে ভাল লাগে? লজ্জা করে না? দুটো সাইকেলের কত আর দাম হবে?"

"যতই হোক... বাবার কষ্ট হবে, মারও।"

গলাখাঁকারি দিয়ে তপতী ঘরে ঢুকলেন। "অনেকেই তো উপহার দিল, আমি কিছু দেব না।"

ওরা অবাক হল। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

"আমি তো ভাবছি, মিনু তো বড় হয়েছে, এবার দেখেশুনে সাইকেল চালাতে পারবে।"

"মা, আমিও বড় হয়েছি।" চিনু তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল।"

"হয়েছিস নাকি !" তপতী গম্ভীর হলেন। "মিনু, ওর পাশে দাঁড়া তো।"

মিনু দাঁড়াল চিনুর পাশে। পলকের জন্য তপতী চোখ নীচে নামালেন। "চিনু গোড়ালি নামা।"

ধীরে ধীরে চিনুর উচ্চতা হ্রাস পেল।

পরদিন সকালে তন্ময় গাড়ি বার করলেন, তপতীও উঠলেন।

বাবাকে স্টিয়ারিংয়ে বসতে দেখে ওরা অবাক ! গম্ভীর মুখে তন্ময় বললেন, "একটা জরুরি দরকার, আমাদের কলকাতায় যেতে হবে।" দুই ছেলেকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে ওঁরা চলে গেলেন কলকাতায়। স্কুল ছুটির পর ছেলেদের গাড়ি করে আনলেন তপতী। তিনি গাড়ি গ্যারাজ করতে করতে শুনলেন দুই ভাইয়ের উল্লসিত চিৎকার। বাড়িতে ঢুকছেন যখন, ছুটে বেরিয়ে এল দুই ভাই। মিনু দু'হাতে মায়ের হাঁটু জড়িয়ে মেঝে থেকে দু' ফুট ওপরে তাঁকে তুলে বনবন পাক দিতে লাগল। ঘুরে ঘুরে দু' হাত তুলে নাচছে চিনু।

"ওরে ছাড় ছাড়, আমার পায়ে ব্যথা। ...মাথা ঘুরছে।"

"আমাদের ট্রফি, ...মা আমাদের ট্রফি...।" চিনু সুর করে গেয়ে চলেছে। "হিপ হিপ হুররে... মা আমাদের ট্রফি, আমরা বড় হয়েছি ...মাকে ট্রফি পেয়েছি...।"

"মা কখনও ট্রফি হয় নাকি !" তপতী দুহাতে মাথা টিপে ধরে বড় বড় চোখ বললেন।

"হয়, আমাদের মা হয়।" মিনু বলল।

"আমাদের কাছে তুমি আমাদের ট্রফি।" চিনু যোগ করল। "এর থেকে সেরা ট্রফি আর কিছু নেই।"

"তোরা ট্রফি পেলি, আর আমার ট্রফি তা হলে কোথায় ?"

দুই ভাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তপতী হাসতে হাসতে বললেন, "একটা নয়, আমার দুটো ট্রফি।"

দু'হাতে তিনি দুই ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "মিনু এরপর ভারতের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হবে তারপর হবে সিনিয়র চ্যাম্পিয়ন.....তারপর উইম্বলডন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া.....লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমাকে বলবে ওই যে মৃন্ময়ের মা।"

"চিন্ময়ের মা বলবে না ?" চিনু ভারী গলায় অভিমানী স্বরে বলল।

"বলবে, দাদার পরেপরেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠে আসবে ভাই। আমরা তো এত বছর সেই স্বপ্নই দেখেছি রে।" তপতীর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল।

ভেতর থেকে তখন বেলার গজগজানি শোনা গেল। "খাবার ঘরে এ দুটো রাখা চলবে না, তা হলে কিন্তু চারটে চাকাই ফুটো করে দোব।"

রেখেছেন হেডমাস্টারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি।

কান্তি এল শালপাতার ঠোঙা ভর্তি গুজিয়া নিয়ে। সেটা মিনুর হাতে দিয়ে বলল, "খেও। একদিন দুটো মিষ্টি খেলে মা কিছু বলবে না।" কান্তি তপতীর দিকে তাকিয়ে সম্মতি দিতে মিনতি করল চাহনি দিয়ে।

তপতী হেসে বললেন, "খাও।"

"অত! ওইটুকু ছেলে খাবে?" তন্ময় ঠোঙাটা মিনুর হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিলেন।

"তুমি অফিস যাবে না? চান করে খেতে বোসো, ক'টা বাজে দেখছ?" তপতীর স্বরে কিছু একটা ছিল যেজন্য তন্ময় ঠোঙাটা মিনুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "তাই তো, এখন তো ভাত খেতে হবে।"

বারোটা নাগাদ হইহই করে জনা দশেক ছেলে হাজির হল। মিনুর ক্লাসের বন্ধু। কী ব্যাপার?

"মৃন্ময়, আজ স্কুলে যাসনি কেন?"

"আজ থার্ড পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, তোর জন্য।"

আনন্দ আর লজ্জায় আপ্লুত মিনু শুধু বলল, "য্যাহ্হ!"

"নোটিসে কী লিখেছে জানিস? ...গর্বের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি আমাদের স্কুলের ছাত্র—"

"থাক, থাক, আর বলতে হবে না।" মিনু থামিয়ে দিল।

"কেন বলতে হবে না?" চিনু প্রতিবাদ করল। "কী সব কথা শুনতে হয়েছে ভুলে গেছিস?"

বন্ধুদের প্রত্যেকে ট্রফিটা হাতে নিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। ট্রফির গায়ে লেখা কথাগুলো পড়ল। সারা বাড়ি ভরে গেল খুশির কলকল উচ্ছ্বাসে। কান্তির গুজিয়াগুলোর সদ্ব্যবহার করলেন তপতী প্রত্যেকের হাতে একটা করে তুলে দিয়ে।

রাত্রে শোবার আগে ছেলেরা দুধ খায়। তপতী দুটো গ্লাস হাতে নিয়ে ছেলেদের ঘরে ঢুকতে গিয়ে ভেতর থেকে আসা চাপা স্বরের কথা শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

"না না, অনেক টাকা.. এখন বলতে হবে না।"

"মোটরে স্কুলে যেতে ভাল লাগে? লজ্জা করে না? দুটো সাইকেলের কত আর দাম হবে?"

"যতই হোক... বাবার কষ্ট হবে, মারও।"

গলাখাঁকারি দিয়ে তপতী ঘরে ঢুকলেন। "অনেকেই তো উপহার দিল, আমি কিছু দেব না।"

ওরা অবাক হল। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

"আমি তো ভাবছি, মিনু তো বড় হয়েছে, এবার দেখেশুনে সাইকেল চালাতে পারবে।"

"মা, আমিও বড় হয়েছি।" চিনু তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল।"

"হয়েছিস নাকি !" তপতী গম্ভীর হলেন। "মিনু, ওর পাশে দাঁড়া তো।"

মিনু দাঁড়াল চিনুর পাশে। পলকের জন্য তপতী চোখ নীচে নামালেন। "চিনু গোড়ালি নামা।"

ধীরে ধীরে চিনুর উচ্চতা হ্রাস পেল।

পরদিন সকালে তন্ময় গাড়ি বার করলেন, তপতীও উঠলেন।

বাবাকে স্টিয়ারিংয়ে বসতে দেখে ওরা অবাক ! গম্ভীর মুখে তন্ময় বললেন, "একটা জরুরি দরকার, আমাদের কলকাতায় যেতে হবে।" দুই ছেলেকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে ওঁরা চলে গেলেন কলকাতায়। স্কুল ছুটির পর ছেলেদের গাড়ি করে আনলেন তপতী। তিনি গাড়ি গ্যারাজ করতে করতে শুনলেন দুই ভাইয়ের উল্লসিত চিৎকার। বাড়িতে ঢুকছেন যখন, ছুটে বেরিয়ে এল দুই ভাই। মিনু দু'হাতে মায়ের হাঁটু জড়িয়ে মেঝে থেকে দু' ফুট ওপরে তাঁকে তুলে বনবন পাক দিতে লাগল। ঘুরে ঘুরে দু' হাত তুলে নাচছে চিনু।

"ওরে ছাড় ছাড়, আমার পায়ে ব্যথা। ...মাথা ঘুরছে।"

"আমাদের ট্রফি, ...মা আমাদের ট্রফি...।" চিনু সুর করে গেয়ে চলেছে। "হিপ হিপ হুররে... মা আমাদের ট্রফি, আমরা বড় হয়েছি ...মাকে ট্রফি পেয়েছি...।"

"মা কখনও ট্রফি হয় নাকি !" তপতী দুহাতে মাথা টিপে ধরে বড় বড় চোখ বললেন।

"হয়, আমাদের মা হয়।" মিনু বলল।

"আমাদের কাছে তুমি আমাদের ট্রফি।" চিনু যোগ করল। "এর থেকে সেরা ট্রফি আর কিছু নেই।"

"তোরা ট্রফি পেলি, আর আমার ট্রফি তা হলে কোথায় ?"

দুই ভাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তপতী হাসতে হাসতে বললেন, "একটা নয়, আমার দুটো ট্রফি।"

দু'হাতে তিনি দুই ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "মিনু এরপর ভারতের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হবে তারপর হবে সিনিয়র চ্যাম্পিয়ন.....তারপর উইম্বলডন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া.....লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমাকে বলবে ওই যে মৃন্ময়ের মা।"

"চিন্ময়ের মা বলবে না ?" চিনু ভারী গলায় অভিমানী স্বরে বলল।

"বলবে, দাদার পরেপরেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠে আসবে ভাই। আমরা তো এত বছর সেই স্বপ্নই দেখেছি রে।" তপতীর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল।

ভেতর থেকে তখন বেলার গজগজানি শোনা গেল। "খাবার ঘরে এ দুটো রাখা চলবে না, তা হলে কিন্তু চারটে চাকাই ফুটো করে দোব।"

গ্রন্থপরিচিতি

ননীদা নট আউট। অষ্টম মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৯২।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৭২ + ৪। মূল্য ১২.০০।
উৎসর্গ: তপনকুমার ঘোষকে
ঘটনাক্রমে যে
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ হয়েছে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুধীর মৈত্র।
প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৭৩।

স্ট্রাইকার। অষ্টম মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৯৬।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৬৩। মূল্য ২০.০০।
উৎসর্গ: মৈত্রেয় দাশগুপ্ত-কে।
প্রচ্ছদ: অসিত পাল।
প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৭৩।

স্টপার। সপ্তম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১২৪ + ৪। মূল্য ৩০.০০।
উৎসর্গ: সুজিত মুখোপাধ্যায়কে
যার ক্রিকেটদলে একজন স্টপারও থাকা দরকার।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।
প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৭৪।

অপরাজিত আনন্দ। দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১৩১ + ৪। মূল্য ১২.০০।
উৎসর্গ: সুব্রত কুমার-কে।
প্রচ্ছদ: সুনীল শীল।
প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৮০।

নারান। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১০৭। মূল্য ১৬.০০।
উৎসর্গ: সুনীল মহাপাত্র প্রিয়বরেষু।
প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী।

ফেরারি। প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯০।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৯০। মূল্য ১৫.০০।
উৎসর্গ: কল্যাণীয়, শ্রীমান সাগর নন্দীকে।
প্রচ্ছদ: অনুপ রায়।

দলবদলের আগে। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯২।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১২৩। মূল্য ১৮.০০।
উৎসর্গ: ছোটদের ফুটবলে যাঁরা নিবেদিত প্রাণ
তাঁদেরই একজন
শৈলেন সরকার-কে
প্রচ্ছদ: অনুপ রায়।

শিবার ফিরে আসা। প্রথম সংস্করণ জানুয়াবি ১৯৯৩।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১২৮। মূল্য ২০.০০।
উৎসর্গ: শ্রীমান মানস চক্রবর্তী-কে
যার কলম খড়দা থেকে কলকাতার খেলার মাঠ পর্যন্ত তার মতই লম্বা।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

তুলসী। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১৩৮। মূল্য ৩৫.০০।
উৎসর্গ: ওস্তাদ ফোটোগ্রাফার
শ্রীমান উৎপল সরকারকে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী।

মিনু চিনুর ট্রফি। প্রথম সংস্করণ মে ১৯৯৬।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১৫৭। মূল্য ৪০.০০।
উৎসর্গ: মনামি ও নমামি-কে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী।


9 788177 561180